বঙ্গলক্ষ্মী

সম্পাদিকা
শ্রীহেমলতা দেবী

Price 5 annas. May, 1932. নগদ মূল্য ।৵০ বার্ষিক ৩।০

কালীয়-দমন
(প্রাচীন পট হইতে)

Printed by C. H. Aran & Co.

"বাঁচ্‌লে সবাই তবেই বাঁচি,—
সবার ভালো তাই ত' যাচি।"

৭ম বর্ষ] জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৯ [৭ম সংখ্যা

শিল্পকলা ও বঙ্গনারী

কুমারী ছায়া দেবী

আজ নারী-জাগরণের যুগ। সর্ব্বত্রই নারীজাতির ভিতর চঞ্চলতা প্রকাশ পাইতেছে। জাগরণ মানে পারিপার্শ্বিক অবস্থার সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া নিজেকে শক্তিশালী করিয়া তোলা। সমাজ গতিশীল—স্থিতিশীল নহে। যে সমাজ পারিপার্শ্বিক অবস্থার সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া চলিতে পারিবে সেই বর্ত্তমান যুগে স্থিতিলাভ করিবে। বঙ্গনারী কোনদিন নিশ্চেষ্ট ছিল না—জড়তায় কোনদিন তাহাকে অভিভূত করিতে পারে নাই। বঙ্গনারী কোনদিন নিস্ক্রিয় ছিল না—সর্ব্বদাই সজাগ ছিল এবং আছে। সভ্যতার তারতম্যে বা কৃষ্টির তারতম্যে মানবমনে বিভিন্ন ভাবের উদয় হয়। প্রত্যেক ভাবই (idea) ভালমন্দমিশ্রিত। আবার উচ্চস্তরে মানবমনে যখন একতা বা সমতার প্রতিষ্ঠা হয়, তখন ভালমন্দ বা সু ও কু বলিয়া কোন বস্তু থাকে না। স্থবির যে, সে এই নারী-জাগরণের ভিতর মৃত্যুর চিহ্ন দেখিবে; কবি যে, সে এই জাগরণের ভিতর সজীবতার সন্ধান পাইবে।

সাধারণতঃ আমাদের দেশে চৌষট্টি প্রকার কলাবিদ্যার কথা চলিত আছে। কোন কোন পণ্ডিতের মতে ইহারও অধিক কলাবিদ্যা আছে। রসকলার উদ্দেশ্য—মানবমনে সৌন্দর্য্যস্পৃহা জাগরিত করা। সৌন্দর্য্যজগতে জাতিবিভাগ নাই—সেখানে নরনারীর প্রভেদজ্ঞান নাই, দেহবুদ্ধির খুঁটিনাটি বিচার-বিতর্ক নাই। সৌন্দর্য্য-আস্বাদনে মানবমন স্নিগ্ধ, শান্ত ও নম্র হয়। দেহাত্মবুদ্ধির নীচ কামনা এখানে বিলুপ্ত হইয়া যায়। মানবমন নববস্তুর রসাস্বাদনে নবচেতনায় উদ্বুদ্ধ হইয়া কল্যাণের পথে অগ্রসর হয়। এই সৌন্দর্য্যজগতে মানব দেবতায় পরিণত হয়। তাহার পূর্ব্বজগৎ অতর্কিত ভাবে বিদায়-গ্রহণ করে। সৌন্দর্য্যরসাস্বাদন দ্বারা মানব-জগতে প্রীতির মিলন হয়; এ মিলনে প্রত্যেকেই প্রত্যেকের চরিতার্থতা ও কল্যাণ কামনা করে। মানবমনে যখন সৌন্দর্য্যবোধের অভাব হয় তখনই জগতে অশান্তির বাত্যা বহে। যে জাতি যত উচ্চস্তরের শিল্পীর সৃষ্টি করিতে

পারিবে সে জাতি কৃষ্টিতেও তত অগ্রসর হইবে। জাতিকে—মানবমনকে উন্নীত করিতে হইলে রসকলার চর্চ্চা ও প্রসার প্রত্যেক জাতির প্রত্যেক নরনারীর কর্ত্তব্য।

সৌন্দর্য্যরসানুভূতি আস্বাদনের বস্তু—ইহা পূর্ণভাবে প্রকাশ পায় না। উচ্চস্তরের রসবস্তু বাক্য দ্বারা প্রকাশ পায় না; ইহা চোখ দিয়া, মুখ দিয়া, অঙ্গপ্রত্যঙ্গের চালনার দ্বারা সামান্য মাত্র প্রকাশ পায়। নরনারীর দেহের ও মনোভাবের তারতম্যের জন্য প্রকাশও বিভিন্নভাবে হয়। উচ্চস্তরের রসবস্তু কেবলমাত্র উদ্বোধক্ দ্বারা, মাত্র আভাস-ইঙ্গিত দ্বারা প্রকাশ পায়। কারণ এ ভাব প্রকাশ করিবার ভাষার আজ পর্য্যন্ত আবিষ্কার হয় নাই। ভাষা সে স্থানে অচল—বাক্যের অগম্য সে-স্থান। সেইজন্য শিল্পী তাহার বিষয়বস্তুর ভিতর মৃদু ভাব-আভাস দ্বারা, উদ্বোধক্ দ্বারা মানবমনকে—দ্রষ্টাকে উচ্চস্তরে লইয়া যাইবার চেষ্টা করে। এইখানে প্রত্যেকের জানা উচিত শিল্পী খানিকটা পথ উদ্বোধক্ দ্বার দেখাইয়া দিতে পারেন মাত্র, কিন্তু বাকী পথ দ্রষ্টাকে ও শ্রোতাকে সেই আভাস-ইঙ্গিতকে অবলম্বন করিয়া অগ্রসর হইতে হইবে। ইহাই সর্ব্বদেশের সর্ব্ব উচ্চস্তরের শিল্পীদের সনাতন পথ।

নারীকে কর্ম্মঠা ও শক্তিশালিনী করিবার জন্য বঙ্গদেশে নানাস্থানে প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়াছে ও ভবিষ্যতেও যথেষ্ট উঠিবে। বর্ত্তমানে নারীজাতি স্বাবলম্বী হইবার জন্য নানা শিল্পের চর্চ্চা করিতেছেন। আমার বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য হইতেছে—অতীতে বঙ্গনারীরা শিল্পজগতে কিরূপ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন তাহারই যৎসামান্য আভাস দেওয়া। বর্ত্তমানকে শক্তিশালী করিতে হইলে অতীতের জ্ঞান থাকা অতীব প্রয়োজন। অতীতের গর্ভ হইতে বর্ত্তমানের উৎপত্তি। যাঁহারা অতীতকে ঘৃণার চক্ষে পরিত্যাগ করিয়া বর্ত্তমানের সংস্কারপ্রয়াসী তাঁহারা প্রায়ই বিফলমনোরথ হইয়াছেন।

চিত্রকলা

নরনারীর স্বভাবই হইল চিত্র করা। ইহা তাহাদের সহজাত বৃত্তি। মানসিক বৃত্তি যাহা রঙ ও তুলির দ্বারা পটে অঙ্কিত হয় তাহার নাম চিত্র; এবং এই বৃত্তি যাহা বাক্য দ্বারা প্রকাশিত হয় তাহার নাম কাব্য। মানবমন, হয় মানসিক বৃত্তি নয় বাহ্যিক দৃশ্য, পটে অঙ্কিত করিবার চেষ্টা করিবে। চিত্রকলায় মানবমন আনন্দ পায়। চিত্র দেখিবার জন্য পণ্ডিত, মূর্খ, ধনী ও ভিক্ষুক সকলেই ব্যগ্র। সকলেই সুশ্রী চিত্র দেখিয়া আনন্দ উপভোগ করে। কবি ও চিত্রকরের উদ্দেশ্য এক, শুধু পন্থা বিভিন্ন। দু'জনারই উদ্দেশ্য অনির্ব্বচনীয় আনন্দ প্রদান করা। উভয়েই সৃষ্টিকর্ত্তা। সৃষ্টি দ্বিবিধ—দৈবী ও আসুরী। যাহা দ্বারা সমাজে মঙ্গল সাধিত হয় তাহা দৈবী এবং যাহা দ্বারা সমাজে অকল্যাণ হয় তাহা আসুরী। সেই জন্য স্রষ্টা দুই প্রকার—প্রেয়স্কাম ও শ্রেয়স্কাম। যাহার সৃষ্টিতে সমাজে অশান্তি আনয়ন করে তাহার নাম প্রেয়স্কাম এবং যাহার সৃষ্টির দ্বারা কল্যাণ সাধিত হয় তাহার নাম শ্রেয়স্কাম। চিত্রকলার ডাকনাম হইল ছবি। যদিও এই বাংলা তথা ভারতবর্ষে একদিন চিত্রকলার চরমোৎকর্ষ সাধিত হইয়াছিল, কিন্তু দুঃখের বিষয় জনসাধারণ চিত্রকলার উদ্দেশ্য কি এবং ইহা দ্বারা সমাজে কি মঙ্গল সাধিত হয় সে বিষয়ে এখন সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। জনসাধারণকে এ বিষয়ে শিক্ষিত করিয়া তোলা কলাবিদ্‌দের বর্ত্তমানে প্রধান কর্ত্তব্য হওয়া উচিত। ইহার ফলে উভয়েরই কষ্টের লাঘব ও সুবিধা হইবে।

মানুষ যে সমাজের বা ধর্ম্মেরই অন্তর্গত হউক না কেন, চিত্র অঙ্কিত করিবার, দেখিবার এবং নিজগৃহে ব্যবহার করিবার প্রবৃত্তি তাহার সহজাত। মানবচরিত্র বিশ্লেষণ করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, সময় সময় কোন বাহ্যিক জড়শক্তি তাহার সুকোমল বৃত্তিগুলিকে কিছুদিনের জন্য পঙ্গু করিয়া রাখে। শিক্ষার প্রভাবে সেই বাহ্যিক জড়তা যখন তিরোহিত হয় তখন আবার সেই সুকোমল সহজাত বৃত্তিগুলি প্রস্ফুটিত হয়। চিত্রকলা অতি প্রাচীন পদ্ধতি। জগতে কোন্ সময় আদিম মানব প্রথম চিত্রের রেখাপাত করিয়াছিল সে বিষয় এখন অজ্ঞাত। ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া যায় অতি প্রাচীনকালে যাহারা বাস করিত তাহারা একখণ্ড কাঠের কয়লা দ্বারা নানা জীবজন্তুর ছবি আঁকিত।

বনে শিকার করিতে করিতে যে সব জন্তুর সাক্ষাৎ মিলিত, তাহারা তাহাদেরই নকল করিবার জন্য ঘরে বসিয়া অনুকৃতি অঙ্কিত করিত। ইহাতে তাহারা এবং তাহাদের পরিবারবর্গ আনন্দ পাইত। জীবজন্তুর নকল করিবার প্রেরণাই ছিল প্রথম উদ্দেশ্য এবং ত সাথে অজানা এক আনন্দ জড়িত থাকিত। চিত্রবিদ্যার ইতিহাসের প্রথম অঙ্কে দেখিতে পাওয়া যায় বাহ্যিক দৃশ্য অঙ্কিত করাই ছিল ইহার প্রথম ও প্রধান উদ্দেশ্য। হয় ত বা এই বাহ্যিক দৃশ্যাঙ্কন করিবার মূলে কোন সামাজিক ও অর্থনীতিক ব্যাখ্যা থাকিতে পারে। তাহাদের অঙ্কিত যে সমস্ত চিত্র আজও দেখিতে পাওয়া যায় তাহা অতি সুন্দর এবং চমৎকার। এই সমস্ত চিত্র - নর ও নারী উভয়েই অঙ্কিত করিত। নর ও নারীর চিত্র অঙ্কিত করিবার এই সহজ প্রবৃত্তি নানা স্তরের ভিতর দিয়া বর্ত্তমানে চিত্রকলা নামে অভিহিত হইয়াছে।

উল্কি

গাত্রে উল্কি দ্বারা সজ্জিত হইয়া আনন্দ উপভোগ করা অতীব প্রাচীন প্রথা। সমস্ত কার্য্যের মূলে আনন্দ রহিয়াছে; আনন্দ ব্যতিরেকে মানব কোন কর্ম্মই করিতে পারে না,—কর্ম্মে আনন্দ পাইতেছে বলিয়াই সে কর্ম্ম করিতেছে। নর ও নারী অতি প্রাচীন কালে উল্কি দ্বারা নিজেদের সুশোভিত করিত। বর্ত্তমানেও এ প্রথা সমাজে অল্পবিস্তর প্রচলিত আছে। নর-নারীর গাত্রে অলঙ্কার দ্বারা শোভিত হইবার স্পৃহার মূল উৎস হইল—এই উল্কি। এই উল্কিই কালক্রমে স্বর্ণালঙ্কারে পরিণত হইয়াছে। বর্ত্তমানে শিক্ষার তারতম্যে নরসমাজে স্বর্ণালঙ্কার ব্যবহার ক্রমশঃ উঠিয়া যাইতেছে। অলঙ্কার মানেই শোভা। অবশ্য স্বর্ণালঙ্কার ব্যবহারের মূলে অর্থনৈতিক ব্যাখ্যাও যথেষ্ট আছে।

চিত্রকলার সংজ্ঞা

এখন প্রশ্ন হইতেছে চিত্রকলা (painting) কাহাকে বলে? এ বিষয় বিভিন্ন ব্যক্তির বিভিন্ন মত আছে। ভারতবর্ষের মত এস্থলে আলোচনা করা সুশোভন। জনৈক শিল্প-সমালোচক লিখিয়াছেন, "Painting is an attempt to represent or reproduce a picture of the mind through colour or lines or by certain suggestives, or painting might be called a system of philosophy written out by symbols and colours."

পূর্ব্বেই বলিয়াছি মানসিক বৃত্তিকে রং এবং রেখার দ্বারা প্রকাশ করার নামই হইল চিত্রকলা। বর্ত্তমানে চিত্রকলার একটি নিজস্ব দর্শনশাস্ত্র আছে—নিজস্ব নিয়ম কানুন আছে। চিত্রকলাজগতে আজ ইহা প্রভূত কল্যাণ সাধিত করিতেছে। মোটেই ইহা অপ্রয়োজনীয় বিষয়বস্তু নহে; মানবসমাজে ইহার একটি গভীরতম উদ্দেশ্য আছে। চিত্রবিদ্যা জনসাধারণের ভিতর শিক্ষাবিস্তারেরও একটি উৎকৃষ্টতম পন্থা। চিত্রকলার প্রচার ও প্রসার দ্বারা জাতি শোভন ও শক্তিশালী হয়।

আল্পনা

চিত্রকলায় বঙ্গনারী যথেষ্ট পারদর্শিতা দেখাইয়াছে। বঙ্গনারীর চিত্র অঙ্কিত করা যেন একটি নেশা। সর্ব্ব-কার্য্যের ভিতর একটি সুশ্রী চিত্র অঙ্কিত করাই ইহাদের একমাত্র কামনা। আল্পনা একটি বিশিষ্ট চিত্রকলা। এ বিষয়ে ভারতবর্ষের ভিতর বঙ্গনারী অদ্বিতীয়া। বঙ্গদেশের প্রতি শুভকার্য্যে আল্পনার প্রয়োজন হয়। ইহা ভাল কাঠের পিঁড়ার উপর বা ভাল ঘরের মেজে বা উঠানের উপর দেওয়া প্রচলিত আছে। এই আল্পনার ভিতর দিয়া বঙ্গনারীরা নানাপ্রকার চিত্র নিত্য অঙ্কিত করিয়া থাকে। বাংলা-দেশে যত পূজাপার্ব্বণ আছে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে তত নাই। সেজন্য বঙ্গনারীরা তাহাদের চিত্রকলার উৎকর্ষ লাভ করিবার যেরূপ সুযোগ ও সুবিধা পাইয়াছে অন্যান্য প্রদেশের নারীরা তত পায় নাই এবং এজন্য অন্য প্রদেশের নারীরা বঙ্গনারীর সহিত এ বিষয়ে সমকক্ষা নয়। নারী-জাতির ইহা স্বাভাবিক বৃত্তি। ইহা দ্বারা নারীজাতির সংবৃত্তিগুলি বিকাশ পায়, উন্নত হয়।

এই আল্পনার ভিতর নানা বস্তু বা বিষয়ের চিত্র অঙ্কিত করা হয়। আল্পনা দেওয়া বঙ্গনারীর

গর্ব্বের ও শ্লাঘার কথা। ইহা লইয়া আমাদের নারীমহলে প্রতিযোগিতা হয়। প্রতিযোগিতায় যিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করেন তাঁহাকেই প্রতি শুভকর্ম্মে গ্রামবাসীরা নিমন্ত্রণ করে—ইহা নারীজাতির মহা সম্মানের নিমন্ত্রণ। সেজন্য আল্পনা দিবার সময় বঙ্গনারী তাঁহার সমগ্র মনপ্রাণ দিয়া সফলতা লাভ করিবার চেষ্টা করেন। ইহার ভিতর শুধু যে নানাপ্রকার বস্তু, পক্ষী বা জন্তুর চিত্র অঙ্কিত করেন তাহা নয়; ইহা ছাড়া বঙ্গনারীরা নানাপ্রকার ঠকান কৌশল অঙ্কিত করিয়া থাকেন এবং পারিবারিক ব্যাপারবিশেষও অঙ্কিত হয়। এই আল্পনা লইয়া একটি বৃহৎ পুস্তক লেখা যায়। এত-প্রকারের আল্পনা আছে যে তাহাদের নাম ঠিক করাও মুস্কিল। এই আল্পনাকে অবলম্বন করিয়া নানাপ্রকার ছড়ার প্রচলনও হইয়াছে—শুনিতেও সেগুলি বেশ মিষ্ট। আল্পনার ভিতরকার চিত্রের উদ্দেশ্য বা অর্থ সাধারণকে বুঝাইয়া দিবার জন্য ছড়ার উৎপত্তি। বঙ্গনারীর চিত্রকলা জানিতে হইলে প্রথম আল্পনা জানিতে হইবে।

পট

পটুয়া শ্রেণী ছাড়াও, পটের উপর চিত্র বঙ্গনারীরা অঙ্কিত করিত। দেব-দেবীর মূর্ত্তি লইয়া এই সব চিত্র অঙ্কিত হইত। সত্তর- আশী বৎসর পূর্ব্বেকার বঙ্গনারীর হাতের অঙ্কিত চিত্র এখনও অনেক প্রাচীন গৃহে দেখিতে পাওয়া যায়। দেয়ালের গাত্রের চিত্রও (mural painting) তাহারা অঙ্কিত করিত। এখনও এ বিষয় বাংলাদেশে যথেষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। বর্ত্তমানে অনেক নারী চিত্র-কলা শিক্ষালাভ করিতেছেন। ইঁহাদের কিছু কিছু চিত্র প্রদর্শনীতে দেখান হয়। নারীজাতির চিত্রকলা ভালভাবে শিক্ষালাভ করা উচিত। ইহাতে নারীজাতির এবং চিত্র-কলার নূতন জগৎ সৃজন হইবে। স্বভাবতঃ পুরুষেরাই এ বিষয় আলোচনা করেন; নারী নামে মাত্র। বর্ত্তমানে বাংলাদেশে যে সমস্ত চিত্র প্রদর্শিত হয় তাহার মধ্যে শত-করা আশীখানি চিত্র নারীচরিত্র লইয়া অঙ্কিত হয়। পুরুষ-চিত্রকরেরা যদি কেবলমাত্র নারীর মনস্তত্বই অঙ্কিত করিবার চেষ্টা করেন তাহা হইলে তাঁহারা ত সে বিষয়ে বিফলমনোরথ হইবেনই এবং তৎসাথে নিজেদেরও চিন্তাশক্তির দুর্ব্বলতা আনয়ন করিবেন। নারীর দ্বারাই নারীর মনস্তত্ব আলোচনা সম্ভবপর। আজিকার দিনে পুরুষ-শিল্পীরা যদি বীর্য্যবান্ শক্তিবান্ ভাব চিত্রের দ্বারা দেশের মধ্যে বিস্তার করিতে পারেন তবে তাঁহারা দেশের প্রভূত মঙ্গল সাধিত করিবেন। পরাধীন জাতির শিল্পীর নিকট শিল্পকলা বিলাসিতার সামগ্রী না হওয়াই বাঞ্ছনীয়। বঙ্গনারীরা যদি এ বিদ্যা সাগ্রহে গ্রহণ করেন তাহা হইলে চিত্রজগতে নূতন সম্পদ সৃষ্ট হইবে এবং ইহাতে অর্থের দিক দিয়াও যথেষ্ট সুবিধা হইবে। একজন বড় শিল্পবিদ্ সত্যই লিখিয়াছেন, "In painting, soulpture and clay-moulding, woman is found to surpass man in many respects, as they require a delicate touch and clear knowledge of the differences in colours, and the woman has an instinctive aptitude for the selections of colours. If painting and similar other arts be taught her, she will go ahead of the malefolk of the community."

চিত্রকরের উপর জাতির মান-মর্য্যাদা নির্ভর করে। চিত্রকর মনে করিলে জাতির উত্থান-পতন করাইতে পারেন। সু-চিত্রকর হইলেন—মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি।

সঙ্গীত

পূর্ব্বে বাংলাদেশে দুই শ্রেণীর সঙ্গীত প্রচলিত ছিল —কীর্ত্তন ও শ্যামাসঙ্গীত। বাংলার জলবায়ু ভক্তিরসে পরিপূর্ণ। বাংলা শ্যাম ও শ্যামার দেশ। কীর্ত্তন ও শ্যামাসঙ্গীত দুইই ভক্তিরসের সঙ্গীত। ইহাই হইল বাংলা-দেশের নিজস্ব সঙ্গীত। বোধহয় রাজা রামমোহন রায়ই প্রথম বিভিন্ন প্রকৃতির সঙ্গীতচর্চ্চা প্রবর্ত্তিত করেন। বর্ত্তমানে বাংলা ভাষায় বহুপ্রকৃতির ভাবপ্রকাশক সঙ্গীতচর্চ্চা হইতেছে। আদান-প্রদানে জাতি শক্তিমান হয়। পারিপার্শ্বিক অবস্থার সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া অগ্রসর হইতে পারিলে সেই সমাজ বলবান হইবেই। বাঙালী জাতি ও বাংলা ভাষার দ্রুত উন্নতির মুখ্য কারণ হইল বহির্জাতির সহিত আদান-

প্রদান। সঙ্গীতচর্চ্চা করা নারীজাতির সহজাত বৃত্তি। বাংলাদেশে পূর্ব্বে বৌদ্ধপ্রাধান্য ছিল। বাংলার অনেক ক্রিয়াকাণ্ডের ভিতর বৌদ্ধভাব ওতঃপ্রোত ভাবে মিশান আছে। যদিও "গম্ভীরা"র উৎসবকে অবলম্বন করিয়া বঙ্গনারীরা নানাস্থানে সঙ্গীতচর্চ্চা করিতেন, কিন্তু সঙ্গীত-চর্চ্চায় পূর্ব্বে বঙ্গনারীরা কৃতিত্বলাভ করিতে পারেন নাই; করিবার উপায়ও ছিল না। তখনকার সামাজিক মনস্তত্ত্ব নারীর সঙ্গীতচর্চ্চার বিপক্ষে ছিল। তখনকার দিনে বঙ্গনারী নৃত্য বা গীত করিলে সমাজে তাহার অপযশ হইত। নরসমাজে তাহার চরিত্রের দুর্নাম পর্য্যন্ত বহুমুখে শতধারায় বহিত। স্বেচ্ছায় কেহই সহজে দুর্নাম বহন করিতে চাহে না। রাজা রামমোহন রায় প্রথম গতানুগতিক জীবনধারা পরিবর্ত্তন করিয়াছিলেন। নব-জাগরণের তিনিই প্রথম গুরু। নানা ঘাত-প্রতিঘাতে আজ বঙ্গসমাজে মনোবৃত্তির পরিবর্ত্তন হইয়াছে। জাগরণের ইহাই স্বাভাবিক পন্থা। জাগরণের চিহ্নই হইল নরনারীর সুপ্রবৃত্তি বিকাশের সর্ব্বপথমুক্তি। সমাজ তখন বিকাশের পথের পরিচালক হয়। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গণ্ডী লইয়া মাথা ঘামাইবার তখন তাহার সময় থাকে না। বিরাটের তখন সে পূজারী। আজ নারী সঙ্গীত গাহিলে কেহ অপযশ গাহিবে না। সমাজ আজ নারীর সঙ্গীতচর্চ্চার সহায়ক। আজ বঙ্গনারীর সঙ্গীত চর্চ্চার বিশেষ প্রয়োজন। সঙ্গীতচর্চ্চার দ্বারা জাতি কৃষ্টিবান হয়। সঙ্গীতচর্চ্চা মানবমনকে সুখদুঃখের অতীতাবস্থায় লইয়া যায়। সাধক-জীবনেও ইহা মহা ফলদায়ক। ইহার চর্চ্চা নারীজাতির মঙ্গলপ্রদ।

সঙ্গীতচর্চ্চার প্রবৃত্তি মানব কাহারও নিকট হইতে শিক্ষালাভ করে নাই। ইহা তাহার সহজাত বৃত্তি। সঙ্গীতচর্চ্চার ছন্দ সাতটি প্রাণীর নিকট হইতে লওয়া হইয়াছে। স্তবের ছন্দ ও সঙ্গীতের ছন্দ সম্পূর্ণ বিভিন্ন। স্তবের ছন্দ সরিৎবরার হিল্লোল-কল্লোল হইতে উৎপন্ন। সঙ্গীতের ছন্দ পশুপক্ষীর ডাক হইতে সংজাত। ষড়জাদি সপ্তস্বর পশুপক্ষীর ডাক। সাতটি পশুপক্ষীর নাম হইল— ময়ূর, বৃষভ, ছাগ, ক্রৌঞ্চ, কোকিল, ঘোটক ও হস্তী। ইহাদেরই সুসজ্জিত নাম হইল—ষড়জ, ঋষভ, গান্ধার, মধ্যম, পঞ্চম, ধৈবত ও নিষাদ। প্রথমে সঙ্গীতের সৃষ্টি, তার পর তান-লয়ের উদ্ভব। সঙ্গীত শিক্ষালাভ করিতে হইলে সংযমী হওয়া বিশেষ প্রয়োজন। সংযমী ব্যক্তি ব্যতীত উচ্চস্তরের গায়ক হয় না। সঙ্গীতচর্চ্চা মহা পবিত্র বস্তু। সাধক সঙ্গীতচর্চ্চা দ্বারা তাঁহার ইষ্ট দর্শন করেন।

নৃত্য

নৃত্য করিবার প্রবৃত্তিও নরনারীর সহজাত। হৃদয়বৃত্তির স্ফুরণ হইতে নরনারী নৃত্য করে। নৃত্য করিলে মানব বড়ই আনন্দ অনুভব করে। নৃত্য তিন প্রকার—যথা, দেবনৃত্য, নরনৃত্য ও কামনৃত্য। মানবমন যখন উচ্চস্তরে গমন করে তখন তাহার দেহে একপ্রকার পুলক হয়। এই পুলকই তাহাকে সমতালযুক্ত নৃত্য করায়। সাধক সেই অবস্থায় নৃত্য করিতে ভালবাসে। এই নৃত্যের নাম হইল দেবনৃত্য। "নটরাজের" মূর্ত্তি হইল এই ভাবের উচ্চ বিকাশ। যাঁহারা দাক্ষিণাত্যের নটরাজের মূর্ত্তি দেখিয়াছেন তাঁহারা দেবনৃত্যের ভাব বুঝিতে পারিবেন। বঙ্গদেশের শ্রীচৈতন্য প্রভৃতি সাধকগণ এইপ্রকার দেবনৃত্য করিতেন। উচ্চ ভাবের সহিত মানবের বাহ্যিক আবরণ পরিবর্ত্তিত হয়। যে যেরূপভাবে হৃদয়ে চিন্তা করিবে তাহার বাহ্যিক দেহের আবরণও সেইরূপ হইবে। মন করে শরীর সৃজন। মন মানে—ভাব। উল্লাস হইতে সাধারণের যে নৃত্য করিবার স্পৃহা জাগে তাহার নাম হইল নরনৃত্য। নীচ প্রবৃত্তি উদ্দীপক যে নৃত্য তাহার নাম হইল কামনৃত্য। নর ও নারী উভয়েই চিরকাল নৃত্য করিয়া আসিতেছে। বর্ত্তমানেও নর অতি উচ্চস্তরের নৃত্য দেখাইতেছে। নারীজাতির সুমার্জ্জিত নৃত্য অভ্যাস করা কর্ত্তব্য। রসতত্ত্ব ব্যতীতও, নৃত্য হইল একটি উৎকৃষ্ট ব্যায়াম। নারীজাতির পক্ষে নৃত্য ও সন্তরণ উৎকৃষ্ট ব্যায়াম। নৃত্য করিতে হইলে দেহের সমস্ত পেশীর সঞ্চালন করিতে হয়। পেশীসঞ্চালনের দ্বারা স্বাস্থ্য ভাল হয় এবং তজ্জন্য দেহের লাবণ্য ফুটে। নারীজাতির সুস্থ ও সবল দেহ হইবার পক্ষে নৃত্য একটি উৎকৃষ্ট ব্যায়াম। ব্যায়ামের প্রকৃত উদ্দেশ্য হইল স্বাস্থ্য ভাল রাখা।

আনন্দের হাটে নৃত্যের আসর বসে। পূর্ব্বে বিবাহোৎসবে, বসন্তোৎসবে ও নানা দেবদেবীর উৎসব উপলক্ষে নারীরা নৃত্য করিত। এখনও দাক্ষিণাত্যে সন্ধ্যাকালে নিত্য

প্রদীপ হস্তে নারীরা কোন কোন বৃক্ষকে ঘিরিয়া নৃত্য করিয়া থাকে। তৎকালীন সমাজবিন্যাসের জন্য পূর্ব্বে বঙ্গনারীরা নৃত্যে পারদর্শিতা দেখাইতে পারেন নাই; দেখাইবার উপায়ও ছিল না। নৃত্য করিলে সমাজে অপযশ রটিত। এখনও এই মনোবৃত্তি সম্পূর্ণ শিক্ষিত সমাজ হইতে বিদূরিত হয় নাই, কিন্তু ধীরে ধীরে মতপরিবর্ত্তন হইতেছে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি শিক্ষা ও কৃষ্টির তারতম্যে মানবের world-viow পরিবর্ত্তিত হয়। বর্ত্তমানে বঙ্গনারীর (নারীসমাজে) নৃত্য অভ্যাস করা কল্যাণপ্রদ হইবে। আজ নারী সঙ্ঘবদ্ধ হইতে শিক্ষালাভ করিয়াছে, তজ্জন্য তৎসমাজে ইহার প্রচলন কষ্টকর হইবে না। বর্ত্তমানে বঙ্গনারীকে নৃত্য শিক্ষালাভ করিতে হইলে প্রাচীন ভারতের নৃত্য সম্বন্ধে পুস্তকাবলী পাঠ ও চিত্রগুলি বিশেষভাবে নিরীক্ষণ করা উচিত। এ বিদ্যা আয়ত্ত করিতে হইলে পুস্তকপাঠ অপেক্ষাও চিত্রপাঠ করা বিশেষ ফলদায়ক। চিত্রে সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ভঙ্গিমাগুলি সরলভাবে দেখিতে পাওয়া যাইবে। পুস্তকপাঠ হইতে চিত্রে pose এর জ্ঞান শীঘ্র লাভ হয়। Pose হইল নাটক, নৃত্য ও চিত্রের মেরুদণ্ড। যাহার যত ভাল pose দিবার শক্তি থাকিবে সেই তত সফলকাম হইবে। নর ও নারীর pose (অধিষ্ঠান) দিবার ভঙ্গিমা স্বতন্ত্র। নৃত্য দ্বার নানা মূর্ত্তি (figure) দেখান হয়। সময় সময় নৃত্য দ্বারা মানবজীবনের সময়-বিশেষের ঘটনাবলী প্রকাশ করা হয়। নৃত্য দ্বারা মানবমনের নানা স্তরের নানা ভাব প্রকাশ করা যায়। যাহার যত পেশীশক্তি স্ববশে আয়ত্ত করিবার শক্তি থাকিবে তিনি তত ভাল নৃত্যকার হইবেন। জাতির মানসিক চিন্তারাশির উপর তাহার সমাজবিন্যাস ঘটে; তজ্জন্য প্রত্যেক জাতির কলাজ্ঞানও স্বতন্ত্র ছিল। বর্ত্তমানে পরস্পরের ভিতর ভাবের আদান-প্রদানের ফলে অল্পবিস্তর সকলের চিন্তা-জগতের পরিবর্ত্তন আরম্ভ হইয়াছে। জাগ্রত সচল জাতির নৃত্য-উৎসব হইল এক শ্রেষ্ঠ কলাবিদ্যা। নৃত্য দ্বারা নারীর দেহ ও মন সুস্থ থাকিবে।

সূচিকার্য্য

সূচিকর্ম্ম দ্বারা কাপড়ে নানাপ্রকার ফুল, পাতা, বাড়ী, বাগান, জীবজন্তু প্রভৃতি অঙ্কিত করায় বঙ্গনারীর অদ্ভুত কৃতিত্ব। পটের উপর রঙ ও তুলির সাহায্যে চিত্রকর যেমন চিত্র অঙ্কিত করেন সেইরূপ সূচি ও সূতার সাহায্যে বঙ্গনারী নানাপ্রকার নয়নমনোমুগ্ধকর ছবি ফুটাইয়া তুলেন। সামান্য অপ্রয়োজনীয় কাপড় লইয়া সূচিকার্য্যের সাহায্যে ইঁহারা অরূপের রূপ ফুটাইয়া তুলেন। দৃষ্টান্ত—ছোট ছোট কাঁথা তৈয়ারি। যে সমস্ত অপ্রয়োজনীয় ছিন্ন পরিধেয় সচরাচর মানুষে পরিত্যাগ করে তাঁহারা সেইগুলি লইয়া তাঁহাদের সূচিকর্ম্মের কৌশল দ্বারা এমন সুশ্রী নানাপ্রকার কাঁথা তৈয়ারি করেন যে তাহা জগতের যে কোন কলাবিদের নিকট সম্মান প্রাপ্ত হইতে পারে। অশোভনকে শোভনে পরিণত করাই হইল শিল্পীর শিল্পিত্ব। সাধারণ ব্যক্তি যে বস্তুকে অকেজো, বাজে বলিয়া পরিত্যাগ করে সেই বস্তুই শিল্পীর হস্তে নব সৌন্দর্য্যের রঙে রঞ্জিত হইয়া লোকচক্ষুর সম্মুখে আসিয়া সম্মানিত হয়। শিল্পী প্রকৃতির অনুককরণ করে না; কারণ প্রকৃতিকে (nature) অনুকরণ (copy) করা যায় না। প্রাকৃতিক দৃশ্য ও শিল্পীর দৃশ্য স্বতন্ত্র রসবস্তু। মাঠে গরু ঘাস খাইতেছে ইহা হইল প্রাকৃতিক দৃশ্য; এ দৃশ্য দেখিয়া আমরা আনন্দ উপভোগ করি না—কিছু জানিবার জন্য উৎকণ্ঠা প্রকাশ করি না। কিন্তু এই দৃশ্যটি যখন শিল্পী তাঁহার মন হইতে প্রকাশ করেন তখন দেখিবার ও জানিবার জন্য আমাদের আর আগ্রহের সীমা থাকে না। শিল্পীর চিত্রে আনন্দ মাখান থাকে। ইহাই হইল শিল্পীর শিল্পিত্ব। সৎসাহস ও সৎবৃত্তি শিল্পীর একান্ত প্রয়োজন।

কাঁথা ও দোলাই

অল্প খরচে কৌশল দ্বারা সুশ্রী ও সুন্দর জিনিষ সম্পাদন করিবার শক্তি বঙ্গনারীর অসীম। সুযোগ ও সুবিধার অভাবে অনেকে তাহাদের স্বাভাবিক সুকোমল বৃত্তগুলিকে লোকচক্ষুর সম্মুখে প্রকাশ করিতে পারে না। পরিত্যক্ত কাপড়ের পাড় হইতে নানা রঙের সূতা বাহির করিয়া পরিত্যক্ত কাপড়গুলি লইয়া সূচিকর্ম্ম দ্বারা শীতকালে গায়ে দিবার জন্য বড় কাঁথার সৃষ্টি বঙ্গনারীর সূচিকার্য্যের শ্রেষ্ঠ পরিচয়। পূর্ব্বে শীতকালে গায়ে কাঁথা দিবার প্রচলন ছিল। প্রত্যেকেই স্ব স্ব প্রয়োজনানুযায়ী দোলাই ও কাঁথা

নিজগৃহে তৈয়ারি করিত। এখনকার মত র‍্যাপার তখন প্রচলিত ছিল না। বঙ্গনারী তাঁহাদের সুবিধামত সময়ে নিত্য সামান্য সূচিকর্ম্ম দ্বারা এই দোলাই ও কাঁথা তৈয়ারি করিতে পারেন। গায়ে দিবার এই দোলাই ও কাঁথা একটি দেখিবার বস্তু। ইহা এত দেখিতে সুন্দর হয় যে ধনী ব্যক্তিকেও শাল ত্যাগ করিয়া কাঁথা ব্যবহার দ্বারা আনন্দ অনুভব করিতে হয়। তাঁহারা সংসারধর্ম্মের যাবতীয় কর্ম্ম সম্পাদন করিয়া এইরূপ সৃষ্টি করিতেন। ইহা নানা-প্রকার হয় এবং ইহাতে নানাপ্রকার কারুকার্য্য থাকে। দূর হইতে ইহা দেখিলে সময় সময় সুস্থ চক্ষুতেও ভাল কাশ্মীরী শাল বলিয়া ভ্রমে পড়িতে হয়। ইহা বঙ্গনারীর শ্লাঘার, গৌরবের ও সম্মানের সামগ্রী। বর্ত্তমানে দুঃস্থা নারীরা যদি এইরূপ ভাল ভাল কাঁথা তৈয়ারি করিয়া বাজারে বিক্রয় করেন তাহা হইলে তাঁহাদের কিছু অর্থও লাভ হইতে পারে।

রেশম ও জরীর কাজ

তাঁহারা রেশমের কাজ, জরীর কাজও ভাল রকম জানিতেন। আসন ও বরের বিছানা প্রভৃতিতে বঙ্গনারীরা তাঁহাদের কার্য্যের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। ঢাকাই চাদর ও কাপড়ে ফুল তোলাতে (চিড়িয়-বুটি) ইঁহারা সিদ্ধহস্ত ছিলেন। ঢাকাই মস্‌লিন্ ও হাতেকাটা সূতায় প্রস্তুত কাপড় সম্বন্ধে নূতন করিয়া বলিবার কিছুই নাই। ছাঁচের কার্য্যও (moulding) খুব ভাল জানিতেন। নানা ফুলের, ফলের ও জন্তুর ছাঁচ তৈয়ারি করিয়া বাজারে বিক্রয় করিতেন। তুলার দ্বারা তৈয়ারি পুতুল ও খেলনা বিক্রয় করিতেন। ইহাতে সামান্য সামান্য অর্থও সঞ্চয় হইত। ইহা ব্যতীত সূতা দ্বারা তৈয়ারি সাজি, খুঞ্চেপোষ, সুজনী ও হাতপাখার ঝালর,—বেতের দ্বারা, বাঁশের চ্যাচারির দ্বারা প্রয়োজনীয় সামগ্রী নিত্য তৈয়ারি করিতেন।

প্রতিমা ও কেশবিন্যাস

বাল্যকাল হইতেই বঙ্গনারী প্রতিমা গড়িতে অভ্যস্ত। ছেলেবেলা হইতে বেনে পুতুল, মুড়কি পুতুল, আহ্লাদী পুতুল প্রভৃতি ইঁহারা সুন্দর ভাবে গড়েন। সোলা দ্বারা নানা ফুল, ফল, পাখী, জন্তু ও পুতুল প্রভৃতি তৈয়ারি করিয়া থাকেন। কড়ি দিয়া নানা প্রয়োজনীয় বস্তু ইঁহারা তৈয়ারী করিতেন। কড়ির আলনা, প্যাঁটরা, সিকে ও মশারির ঝালর প্রভৃতি সুন্দরভাবে তৈয়ারী করিতেন। এ সমস্ত জিনিষ আজকাল সমাজে চলিত নাই। কিন্তু বাংলাদেশে পূর্ব্বে এইসব কাজ খুব চলিত ছিল। বঙ্গনারীরা কলাবিদ্যার পরিচয় দিয়া থাকেন—বিবাহের ফুলসজ্জার তত্ত্বে। এই ফুলসজ্জার তত্ত্বে ইঁহারা নানাপ্রকার কৌশল দেখাইয়া থাকেন। এই তত্ত্বের ভিতর পানের ফুলবাগান, খয়েরের ফুলবাগান, কড়ি ও সুপারির ফুলবাগান, পাণ ও সুপারির ঝাড়লণ্ঠন প্রভৃতি বহুবিধ কারুকার্য্য দর্শাইয়া থাকেন। ইহাকে তাঁহারা চলিত কথায় শিপ্পি-(শিল্প) কার্য্য বলেন। এই ফুলসজ্জার তত্ত্বে মাখনের হাঁস, ছানার হাতী, সন্দেশের নানা মূর্ত্তি গঠন করিয়া কলাবিদ্যার সুন্দর পরিচয় দিয়া থাকেন। বিবাহে ছিরি-গড়া ইঁহাদের অন্যবিধ সুন্দর কলাবিদ্যার পরিচয়। গৃহসজ্জা ও কেশবিন্যাসেও ইঁহারা যথেষ্ট পারদর্শিতা দেখাইয়াছেন। এরূপ কেশবিন্যাসের পারিপাট্য অন্যত্র দেখিতে পাওয়া যাইবে না। এক খোঁপারই নাম কত,—মুটকি খোঁপা, ঝুটকি খোঁপা, বেলে খোঁপা, ফিরিঙ্গী খোঁপা, বিউনি খোঁপা, টিয়াপাখী খোঁপা, চূড় খোপা, পেতেপাড়া খোঁপা, সিঁথিকাটা খোঁপা, চ্যাটাই খোঁপা, প্রজাপতি খোঁপা, ধারের সিঁতে খোঁপা, এলবার্ট খোঁপা ইত্যাদি। পশমের কার্য্য ইঁহাদের নিকট কিছুই নহে। পশম দ্বারা নানা-প্রকার ছবি, আসন, খেলনা গোলাপপাসের কারপা ও হুঁকার বৈঠক প্রভৃতি ইঁহারা সুন্দর ভাবেই তৈয়ারি করিয়া থাকেন। রন্ধনের কার্য্যে বঙ্গনারী সিদ্ধহস্তা। এক নারিকেলচূর্ণ দিয়াই নানাপ্রকার মিষ্টান্ন তৈয়ারি করিয়া থাকেন। এ বিষয় বলিতে গেলে প্রবন্ধ দীর্ঘকলেবর হইয়া যাইবে; তজ্জন্য সংক্ষেপে উল্লেখ করিলাম। বঙ্গনারীর কলাবিদ্যার পরিচয় আমি সামান্যই এস্থলে উল্লেখ করিলাম। ইহা ব্যতীতও তাঁহাদের যথেষ্ট কলাবিদ্যার পরিচয় আছে।

বর্ত্তমানে নানাপ্রকার কলাবিদ্যার আমদানি হইয়াছে। আজকাল নারীরা ঐ সকল কলাবিদ্যার অনেকগুলিই উত্তমরূপে শিক্ষালাভ করিতেছেন। বাংলাদেশে সতরঞ্জি

হইত না। বর্ত্তমানে কোন কোন নারী কাপড়ের পাড়ের দ্বারা এমন সুন্দর সতরঞ্চি তৈয়ারি করিয়াছেন যে তাহা একটি দেখিবার জিনিষ হইয়াছে। ইহা তাঁহাদের পক্ষে গৌরবের সামগ্রী। কেহ কেহ নারিকেল-বাল্‌দোর কাঠি লইয়া সুন্দর সুন্দর Straw-hat, Wastepaper-box প্রভৃতি তৈয়ারি করিয়াছেন। কেহ কেহ শঙ্খকে নানা প্রকারে রঞ্জিত করিয়া কলাবিদ্যার পরিচয় দিতেছেন। চাল দিয়া, মৎস্যের আঁশ দিয়া, ডাল, তিল প্রভৃতি দিয়া চিত্র সৃষ্টি করা বর্ত্তমানে ইঁহাদের নিকট কিছুই নয়। আসনের উপর পশম দ্বারা ছয় সাত হস্তের বাঘ বা সিংহের মূর্ত্তি চিত্র করাও অধুনা ইঁহাদের নিকট অতি সহজ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আধুনিক নারীরা প্রত্যেক জিনিষ খুব সরু সরু করিয়া কাটিতে পারে। বর্ত্তমান নারীপ্রদর্শনীতে ইহা একটি দেখিবার বস্তু। বঙ্গনারী শিক্ষা, সুযোগ ও সুবিধা পাইলে কলাবিদ্যায় জগতে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিতে পারিবেন। ইহা স্তুতিবাক্য নহে—অতীব সত্য।

বর্ত্তমানে পাশ্চাত্য সভ্যতার সংস্পর্শে আসিয়া বঙ্গনারীর চিন্তারাশির দ্রুত পরিবর্ত্তন হইতেছে। আদান-প্রদানে জাতির ভিতর নবপ্রাণ সঞ্চারিত হয়। পাশ্চাত্য সভ্যতা হইল যান্ত্রিক সভ্যতা। যান্ত্রিক সভ্যতায় জিনিষ-পত্র খুব প্রচুর উৎপাদন হয় এবং সেজন্য জিনিষের মূল্যও সস্তা হয়। যান্ত্রিক সভ্যতায় ধনী দিন দিন প্রচুর ধনশালী হয় এবং সাধারণ ক্রমশঃ দরিদ্র হইয়া যায়। আমরা কৃষকজাতি; কুটীরশিল্প আমাদের প্রাণ। কুটীর শিল্প যান্ত্রিক শিল্পের সহিত অবাধ প্রতিযোগিতায় হটিয়া যায়। বর্ত্তমান জগতে স্বাধীন দেশেও অবাধ প্রতিযোগিতায় যান্ত্রিক শিল্পই যান্ত্রিক শিল্পের নিকট নত হইয়া যাইতেছে; ফলে স্বাধীন দেশে যাঁহারা যান্ত্রিক শিল্পকেই একমাত্র সভ্যতার পৃষ্ঠপোষক মনে করিয়াছিলেন তথায়ও বেকার-সমস্যা দিন দিন ঘনীভূত হইয়া আসিতেছে। পরাধীন জাতির শিল্প স্বাধীন জাতির শিল্পের নিকট অবাধ প্রতিযোগিতায় মৃত্যুমুখে পতিত হয়। কুটীরশিল্পই হইল জাতির মেরুদণ্ড। কুটীরশিল্প ও যান্ত্রিক শিল্প এই দুয়ের সামঞ্জস্য ও সমন্বয়ে জাতি জাগ্রত ও বলবান হয়। দরিদ্র পরাধীন কৃষক-জাতি সহজে যান্ত্রিক সভ্যতায় উন্নত হইতে পারিবে না; সময় যথেষ্ট লাগিবে। সেজন্য জাতিকে বাঁচিতে হইলে কুটীর-শিল্পকে প্রথম রক্ষা করিতে হইবে। একমাত্র দৃঢ় আত্মবোধ এক্ষেত্রে কুটীরশিল্পকে রক্ষা করিতে পারে এবং তজ্জন্য জাতিকে নানা কৃচ্ছ্রসাধনা করিতে হইবে। কারণ, সর্ব্ব সভ্যতার মূল বিষয় হইল অন্ন। অন্নের উপর জাতির গতি নির্ভর করে। বিনা অন্নে কোন জাতি শক্তিমান হয় না।

বর্ত্তমান প্রতিযোগিতাক্ষেত্রে বঙ্গনারীকে সজীব ভাবে বাঁচিয়া থাকিতে হইলে নানা কলাবিদ্যার শিক্ষা আয়ত্ত করিতে হইবে। এ কথা সত্য, উচ্চস্তরের কলাবিদ্যা সুলভ হয় না; কিন্তু এক্ষেত্রে যে কোন উপায়ে হউক জিনিষের মূল্য হ্রাস করিতে হইবে। বর্ত্তমানে স্থানে স্থানে নারীদের শিল্পকলার প্রদর্শনী হইতেছে। নারীরা তাঁহাদের নানা রকমের কারুকার্য্য এই সব স্থানে দেখাইতেছেন। এই সব স্থানের জিনিষের মূল্য সাধারণের পক্ষে যথেষ্ট বেশী। যদি সাধারণে জিনিষ না খরিদ করে তাহা হইলে অর্থাগম হওয়া কঠিন হইবে। সাধারণ হইল জাতির প্রাণ! সাধারণে জিনিষ ক্রয় করিলে অনেক দুঃস্থা নারী কষ্ট হইতেও পরিত্রাণ পায়।

বর্ত্তমানে বঙ্গনারীকে স্বাবলম্বী হইতে হইবে। অভাবগ্রস্ত বঙ্গনারীরা ক্ষুধার তাড়নায় দিন দিন হীনকর্ম্মে অভ্যস্ত হইয়া যাইতেছে। নারীজাতির মানসম্ভ্রম বজায় রাখিতে হইলে বঙ্গনারীকে ইহার পথ বাহির করিতে হইবে। কুটীরশিল্পে নারীজাতি স্বাধীনভাবে জীবিকা উপার্জ্জন করিতে পারে। আমাদের এখন প্রথম ও প্রধান কর্ত্তব্য হইতেছে যাহাতে স্থানে স্থানে প্রতিমাসে একটি করিয়াও বঙ্গনারীর শিল্পকলা-প্রদর্শনী হয় তাহার চেষ্টা করা। জনকয়েক ধনী-ব্যক্তি কৃপাদৃষ্টিতে নারীজাতির সামগ্রী কিনিবে এরূপ প্রদর্শনীর প্রয়োজন নাই। আজ উচ্চশিক্ষিতা নারীদের বৃথাগর্ব্ব ত্যাগ করিয়া তাঁহাদের ভগ্নীদিগের উন্নতিসাধন করিতে হইবে। আভিজাত্যের দিন চলিয়া গিয়াছে। ইহার জন্য চাই সৎসাহস, সহানুভূতি, বুকভরা ভালবাসা ও সর্ব্বোপরি অকৃত্রিম দৃঢ় স্বজাতীয়তা। নারীজাতি সাধারণতঃ ভাবপ্রবণ। একবার যদি সুবিধা ও সুযোগ পায় তাহা হইলে উন্নতির পথে দ্রুত অগ্রসর হইবে।

অনুশীলনে অতীতের কলাবিদ্যা ভবিষ্যতে উজ্জ্বলতর হইবে।

জয়ী হইতে হইলে নানাস্থানে স্থায়ী প্রদর্শনী খুলিতে হইবে। প্রদর্শনীতে প্রতিযোগিতা আরম্ভ করিতে হইবে। নিজদেশজাত দ্রব্যসামগ্রী ব্যবহার করিবার জন্য লেখা ও বক্তৃতা দ্বারা জনমত গঠন করিতে হইবে। দেশজাত উৎকৃষ্ট কলাবিদ্যা শিক্ষা দিবার জন্য বর্ত্তমানে নানাস্থানে অবৈতনিক শিল্পালয় খুলিতে হইবে; সঙ্গে সঙ্গে বৈদেশিক শ্রেষ্ঠ কলাবিদ্যাগুলিও আমাদের চিন্তাজগতে আনয়ন করিতে হইবে। সাধারণকে আকৃষ্ট করিবার জন্য মাঝে মাঝে practical demonstration দ্বারা শিল্পবিদ্যা দর্শাইতে হইবে। বর্ত্তমানে লোকশিক্ষার ইহা একটি সুন্দর পন্থা। নূতনে সাধারণতঃ মানব আকৃষ্ট হয়, তজ্জন্য যত নূতন নূতন সুন্দর সুন্দর নক্সা প্রদর্শিত হইবে তত অর্থাগম হইবে। পূর্ব্বের বিলাসিতার সামগ্রীকে এখন ব্যবসায়জগতে আনিতে হইবে। অধ্যবসায় ব্যতীত সফলতা লাভ হয় না। বঙ্গনারীর আজ দৃঢ় অধ্যবসায় প্রয়োজন। আজ দৃঢ় সঙ্কল্প লইয়া কার্য্য আরম্ভ করিতে হইবে। যাহাতে কলাবিদ্যার প্রসার দেশমধ্যে বৃদ্ধি পায় তাহার চেষ্টা সর্ব্বাগ্রে করিতে হইবে। সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার বিস্তার করিতে হইবে। বিনা শিক্ষায় বর্ত্তমানে কোন জাতি সংঘর্ষে বাঁচিতে পারিবে না। মানব হিসাবে কেহই উৎকৃষ্ট নিকৃষ্ট নয়; শিক্ষার অভাবে মানবের ভিতর কৃষ্টির তারতম্য হয়। আমরা যত শিক্ষা লাভ করিব আমাদের চিন্তাজগতও (world-view) তত বৃদ্ধি পাইবে। স্বাধীন সৎবৃত্তি দ্বারা চালিত হইয়া আমরা দেশের শ্রী, সম্পদ ও সম্মান বৃদ্ধি করিব। আজ আমাদের সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া কাজ করিতে হইবে। বর্ত্তমানে সঙ্ঘই হইল শক্তি। বঙ্গনারী যদি সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া একবার দৃঢ় সঙ্কল্প করিয়া যাত্রা সুরু করেন তাহা হইলে তাঁহাদের জয় অবশ্যম্ভাবী। বিলাসিতা করিবার দিন চলিয়া গিয়াছে। আজ কঠোর জীবনসংগ্রাম সম্মুখবর্ত্তী। বঙ্গনারী কি এই সংগ্রামে তাঁহাদের শক্তি প্রদর্শনে পশ্চাৎপদ হইবেন?

গাজনে আনন্দোৎসব ও ধর্ম্মমঙ্গলের প্রভাব

শ্রী মনমোহন নরসুন্দর

পুরাতন বৎসরের জীর্ণক্লান্ত দিনগুলি যখন ধীরে ধীরে বাঙ্‌লার বুক হইতে বিদায় গ্রহণ করে এবং অপরদিকে নববর্ষ তাহার অজ্ঞাত রূপটি লইয়া নিঃশব্দ পদসঞ্চারে অগ্রসর হইতে থাকে, তখন সারা বাঙ্‌লার উপরে দিক্‌দিগন্ত-কম্পিতকারী ঢক্কানিনাদের সঙ্গে শিবের ও ধর্ম্মের গাজন সকলকে মাতাইয়া তুলে। বহু যুগের শিক্ষা, সভ্যতা ও রুচি-বিপর্য্যয়ের ঝঞ্ঝাবাত অতি-প্রাচীন এই উৎসব-অনুষ্ঠানকে এখনও সম্পূর্ণরূপে ম্লান করিয়া দিতে পারে নাই। ইহা আপামর-সাধারণ বাঙালী-জীবনের ধর্ম্ম, মঙ্গল ও নির্ম্মল আনন্দোৎসব-ইতিহাসের এক অধ্যায়। সে প্রাচীন ধারা আজ আর নাই; এখন তাহা ক্ষীণ, তরঙ্গ তাহার মৃদু। প্রতিঘাত হয় ত সামান্য, কিন্তু বিচার করিয়া দেখিতে গেলে, সভ্যতার প্রাচীন উৎসের সন্ধান করিতে গেলে, বাঙালীর বর্ত্তমান ধর্ম্মজীবন ও লোক-সাহিত্যের এই নিগড়বদ্ধ আড়ষ্টতার মধ্যেও তাহার অতীত রূপটি ধরা পড়ে—ক্ষীণকায়া মরাগঙ্গার মৃদু ধারা হিমালয়স্থ উচ্ছ্বসিত গোমুখী-প্রপাতের মতই আনন্দ দান করে। গাজনোৎসবের আনুষ্ঠানিক কর্ম্মের সঙ্গে সভ্য শিক্ষিত বাঙালীর যোগাযোগ না থাকিলেও তাহাদের সরল বিশ্বাস সহজ আনন্দকে কেহই প্রত্যাখ্যান করিতে পারে না, প্রকারান্তরে নানাভাবে তাহাদিগকে সাহায্য করে এবং আংশিক আনন্দও উপভোগ করে।

গাজনোৎসবের আনুষ্ঠানিক কর্ম্মের মধ্যে হাস্যকৌতুকময় নৃত্যগীত উহার একটি অঙ্গ। গ্রামের বিভিন্ন দিক হইতে বিভিন্ন দল আসিয়া ধর্ম্ম বা শিবের মণ্ডপে উপস্থিত হয়। একজন ছড়াদার বা মূল গায়েন, দুই তিন জন বাদ্যকর, নারীবেশে সজ্জিত দুই চারি জন পুরুষ এবং আরও কয়েক-

জন লোক লইয়া এক একটি দল গঠিত হয়। উহারা ঢাক, ঢোল, একতারা ও কাঁসি সহযোগে তালে তালে নৃত্যগীত আরম্ভ করে। আবার কখনও বাজনা থামাইয়া শিব বা শ্রীকৃষ্ণ-প্রেমের ছড়া বলিয়া দর্শকের মনোহরণ করে। কোন কোন দল ভূত-প্রেতের কাল্পনিক রূপে অদ্ভুত বেশে সজ্জিত হইয়া নৃত্যে যোগদান পূর্ব্বক সকলের কৌতুক উৎপাদন করিয়া থাকে। অনেক সময়ে দেখিতে পাওয়া যায়, ছড়াদার, মণ্ডপে সমবেত গ্রামের সমগ্র নরনারীর সম্মুখে, সারা বৎসরে অনুষ্ঠিত সামাজিক অপকর্ম্মগুলি পাঁচালীর ভঙ্গীতে বলিয়া যায়—কাহাকেও বাদ দেয় না বা খাতির করে না। একটি দিনের জন্য যেন তাহারা পল্লী-আসরের নির্ভীক সমালোচক; তাহাদের সেই সমালোচনা যতই কঠোর বা গ্রাম্য রসিকতা-পূর্ণ হউক না কেন কেহই তাহাতে রুষ্ট হয় না। অপকর্ম্মের উপর যেন কথার এই মিষ্ট মিষ্ট কশাঘাত সকলেরই আনন্দদায়ক—কাহারও মনে দুঃখ বা ক্ষোভের সৃষ্টি করে না অথচ দৃঢ় সংযমের জন্য হৃদয়ে প্রেরণা সঞ্চার করে।

নির্দ্দোষ আমোদপ্রমোদ সুন্দর ও পরিণত দেহমনের নিদর্শন। ইহা মানুষকে শক্তিসঞ্চয়ে সাহায্য করে, কর্ম্মে উৎসাহ দান করে। কর্ত্তব্যপূর্ণ কঠোর কর্ম্মজীবনে এগুলিকে সুশীতল ছায়া, উত্তম পানীয় বা স্নিগ্ধ খাদ্য বলা যাইতে পারে। এই নৃত্য ও গীত উভয়ই আমাদের জাতীয় প্রকৃতির 'লীলাময় আত্মপ্রকাশ বা অভিব্যক্তি'। সমগ্র মানবজাতির চরিত্র অনুসন্ধান করিলে মনে হয় ইহা মানবপ্রকৃতির 'ছন্দাত্মক ক্রীড়া বিশেষ'।—"মানুষ যখন জড়দেহের ও বাহ্যেন্দ্রিয়ের প্ররোচনামূলক প্রবৃত্তি হইতে আপনাকে উচ্চস্তরে উত্তোলিত করিয়া আত্মার গভীর ও বিশুদ্ধ আশা, আকাঙ্ক্ষা, আদর্শ ও লক্ষ্যের অভিব্যক্তি দ্বারা আত্মপ্রকাশ করিতে চেষ্টা করে তখনই তাহার প্রক্রিয়াগুলি রসকলার রূপ গ্রহণ করে। সুতরাং আমরা দেখিতে পাইতেছি যে রসকলা মানুষের আত্মার মুক্তভাবেরই একটি লক্ষণ এবং মানবের আত্মার মুক্তভাব হইতেই ইহার উদ্ভব।"

এই জন্যই এই নৃত্যের কোনপ্রকার ধরাবাঁধা নিয়ম নাই। মানবমনের গোপন অন্তরালে যে আনন্দরসের উদ্রেক হয়, বাহিরে তাহাই সহজ ও সরলভাবে লীলায়িত হইয়া দেখা দেয়। আধুনিক থিয়েটারের ললিত বিভ্রমপূর্ণ নর্ত্তকীর হাবভাব যেমন করিয়া লালসার উদ্রেক করে এই নৃত্যক্রীড়া তাহা করে না—ইহা সরল পল্লীকৃষকের অনাড়ম্বর জীবনের আনন্দ-রঞ্জিত সহজ গতিপ্রবাহ মাত্র এবং নব বর্ষে পুরাতনের পুঞ্জীভূত জড়ত্বকে দূর করিয়া জীবনের পথে পাথেয় সঞ্চয় করিবার প্রকৃত উপায়।

গাজনোৎসবের নৃত্যগীতরূপ আনুষ্ঠানিক অঙ্গ—ধর্ম্ম ও শিবের সন্ন্যাসী বা ভক্তের সব চেয়ে বড় বস্তু নয়; তাহাদের সরল ধর্ম্মবিশ্বাস ও কষ্টসহিষ্ণুতাই দেখিবার বিষয়। শিক্ষিত বাঙালীর চক্ষে উহা জড়মনের বিবেচনারহিত অন্ধবিশ্বাস বলিয়া ভ্রম হইতে পারে; কিন্তু তবু সেই বিশ্বাস, অলৌকিকত্ব, দৈবানুগ্রহ লাভের জন্য সম্পূর্ণ নির্ভরতাকে কেহই অবিশ্বাস করিতে পারিবে না। উহা অজ্ঞাতসারে মনের মধ্যে আপনার স্থানটুকু দখল করিয়া বসে।

ইহাকে ভিত্তিহীন অনার্য্যের পূজা বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া যায় না। বাঙালী ধর্ম্মভীরু জাতি—তাহার প্রত্যেক কর্ম্মে, প্রত্যেক আচার-অনুষ্ঠানে ধর্ম্মমঙ্গলের এমন একটা প্রভাব আছে যাহা আমাদের কুপ্রবৃত্তিকে সতর্কই করিয়া দেয়—'কুৎসিৎ কোনপ্রকার অনুষ্ঠান এদেশে চলিবে না'। এই গাজন ছাড়া আরও বহুপ্রকার ব্রত ও উৎসব বাঙালীর মনে বিরাট স্থান জুড়িয়া বিরাজ করিতেছে। এদেশে প্রাচীন কবিরা শীতলা, ষষ্ঠী, মনসার পাঁচালী, চণ্ডী-উপাখ্যান রচনা করিয়াছিলেন—দেশের অধিবাসীরা তাহাকে অন্তরের সহিত গ্রহণ করিয়াছিল, আর ক্ষীণপ্রাণ হইলেও আজও তাহা চলিয়া আসিতেছে। বাহ্যরূপ দেখিয়া কামনামূলক পূজা বলিয়া উপেক্ষা হয় ত অনেকে করেন কিন্তু মনে রাখিতে হইবে সেই সব আচার-অনুষ্ঠান ও পূজার মধ্যে বাঙালীর শিল্প ও সুকুমার মনের পরিচয় আছে, বিচিত্র তত্ত্বানুসন্ধানের আবিষ্ক্রিয়া-শক্তি আছে। পরমাত্মার অসীম গুণরাশির সেগুলি এক একটি রূপক মাত্র; মনকে সংযত করিয়া অসীমের পথেই লইয়া যায়। মানবাত্মাকে নিয়ন্ত্রিত করিবার উপায় উহা—উচ্ছৃঙ্খলতা বা অন্যায়ের পরিপোষক নয়।

এখন শিব ও ধর্ম্মের গাজনে কোন কবি বা পুরাণ-কারের প্রভাব আছে কিনা আলোচনা করা যাক্। বৌদ্ধ পালরাজাদের আমলে সাধারণের মধ্যে কিঞ্চিৎ বিকৃত বৌদ্ধ

মতেরই সমধিক প্রচলন ছিল। বৌদ্ধ মহাযান মত নানা ভাবে ভারতের নানা প্রদেশে দেখা দিয়াছিল। বঙ্গে প্রাচীন হিন্দু ও বৌদ্ধ তান্ত্রিকতার মিশ্রণে নূতনভাবের সাধনা ও পূজা-পদ্ধতির সৃষ্টি হইয়াছিল। এই সকল পূজা-পদ্ধতি সমাজের উচ্চস্তর হইতে অবতরণ করিয়া নিম্নে আসিয়া রূপান্তরিত হইয়াছিল। শিব ও শক্তিপূজা উচ্চ শ্রেণীর মধ্যে প্রসারলাভ করিলেও নিম্ন শ্রেণীতে বৌদ্ধ শূন্য-মূর্ত্তির রূপান্তর—ধর্ম্মপূজার গাজন ও শিবের গাজনে পর্য্যবসিত হইয়াছিল। রাজা গণেশের পরবর্ত্তী কালে বিরচিত রামাই পণ্ডিতের শূন্যপুরাণ ও 'ধর্ম্মপূজাপদ্ধতি' উভয় তান্ত্রিকতার বা ধর্ম্মের সামঞ্জস্যসাধন করিয়াছিল। তিনি শিবের মুখে ধর্ম্ম অর্থাৎ শূন্যমূর্ত্তির বন্দনা করাইয়াছেন। একালের ধর্ম্মপূজা বা শিবপূজায় বাগ্দী, হাড়ি ও ডোমেরা যে 'দেয়াসীন' হইয়া থাকে তাহা শূন্যপুরাণেরই প্রভাব। 'নমো ধর্ম্ম নিরঞ্জন,' 'ভাবসিদ্ধি শূন্যমূর্ত্তিঃ' অথবা—

'নিরঞ্জনং নিরাকারং নির্ব্বিকার গুণাশ্রয়ং।
বন্দে পরময়া ভক্ত্যা ধর্ম্মমনাদিরূপিনং॥'

প্রভৃতি মন্ত্র বৌদ্ধভাবেরই পরিপোষক। কালক্রমে শৈব ধর্ম্মের প্রাধান্য বশতঃ ধর্ম্মের গাজন লোপ পাইয়া শিবের গাজনই প্রাধান্য লাভ করিয়াছে।

ধর্ম্মপূজা-পদ্ধতির গাজন অনুষ্ঠান ও হরিবংশের বাণো-পাখ্যানকে উপজীব্য করিয়াই শিবের গাজন অনুষ্ঠিত হয় বলিয়া মনে হয়। বাণোপাখ্যানকে শৈব ও বৈষ্ণবের জয়-পরাজয়ের কাহিনী বলা যাইতে পারে। ইহাতে বৈষ্ণবগণের নিকৃষ্টতা প্রতিপাদন করিতে চেষ্টা করা হইয়াছিল তাহার ইঙ্গিত আছে। ইহা ছাড়া আরও বহু প্রাচীন গ্রন্থে শৈব ও বৈষ্ণবের ঘোর বিদ্বেষ ও সমরাভিনয়ের কথা লিখিত আছে।

পরম শিবভক্ত বাণকন্যা উষার সঙ্গে দ্বারকাধিপতি শ্রীকৃষ্ণের পৌত্র অনিরুদ্ধের গুপ্তপ্রণয় সংঘটিত হয়; বাণ তাহা জানিতে পারিয়া অত্যন্ত রুষ্ট হন এবং অনিরুদ্ধকে লৌহপিঞ্জরে আবদ্ধ করেন। অনিরুদ্ধ কালীভক্ত ছিল, তাই দেবীর প্রসাদে জ্যৈষ্ঠ মাসের কৃষ্ণাচতুর্দ্দশীর নিশীথ-সময়ে মুক্তিলাভ করে। অমানিশায় শ্রীকৃষ্ণের সহিত বাণ-রাজের ঘোর যুদ্ধ হয়। সেই মহাযুদ্ধে শ্রীকৃষ্ণ সুদর্শনচক্র দ্বারা বাণরাজের বাহুসমূহ ছেদন করিয়া যেমন শিরশ্ছেদনের জন্য প্রস্তুত হইলেন, অমনি শঙ্কর বলিয়া উঠিলেন—

'মা বাণস্য শিরশ্ছিন্দি সংহরস্ব সুদর্শনম্।'

৭।১৮৬—ধর্ম্মসংহিতা।

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—'আপনার বাণ জীবিত থাকুক, এই আমি চক্র প্রতিসংহার করিলাম। নন্দী তখন বাণকে বলিলেন—'বাণ, তুমি শঙ্কর সমীপে গমন কর।' বাণ গমন করিতে উদ্যত হইলে নন্দী তাহাকে রথে আরোহণ করাইয়া মহাদেবের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং বলিয়া দিলেন—'বাণ, তুমি শঙ্কর সমীপে নৃত্য করিতে থাক তাহাতে তোমার কল্যাণলাভের সম্ভাবনা আছে।' জীবনপ্রার্থী বিহ্বলচিত্ত বাণ রক্তাক্ত কলেবরে মহাদেবের সম্মুখে গিয়া পুনঃপুনঃ নৃত্য করিতে লাগিল।—হরিবংশে এই প্রকার বর্ণনা আছে, কিন্তু শিবপুরাণে বা ধর্ম্মসংহিতায় এই নৃত্যের ভাবান্তর পরিলক্ষিত হয়।

'শির কম্পসহস্রাণি প্রত্যনীকান্ সহস্রাণঃ
চারীশ্চ বিবিধাকারা দর্শয়িত্বা শনৈঃ শনৈঃ॥'

৭।১৯৬।১৯৭—ধর্ম্মসংহিতা।

ভক্তবৎসল মহাদেব প্রিয় ভক্তকে এইরূপ দুর্দ্দশাগ্রস্ত ও হতচৈতন্য অবস্থায় বারংবার নৃত্য করিতে দেখিয়া বলিলেন—'বৎস! আমি প্রসন্ন হইয়াছি, এখন অভিলষিত বর প্রার্থনা কর।' বাণ বলিল—'প্রভো, এই বর দান করুন যেন আমি অজর অমর হইয়া থাকিতে পারি।'

'বাণঃ সদা শিবো দেবো বাণান্তরোঽপি চ।
তেন যস্মাৎ কৃতং তস্মাদ্বাণলিঙ্গ মুদাহৃতম্॥'

—বীরমিত্রোদয়।

শঙ্কর বর দান করিলেন এবং বলিয়া দিলেন অন্য কোন কামনীয় থাকিলে প্রার্থনা করিতে পার। বাণ কহিল—'দেব! আমি যেমন বাণপ্রপীড়িত ও দুঃখার্ত্ত হইয়া রক্তাক্ত-কলেবরে আপনার নিকট নৃত্য করিলাম, আপনার কোন ভক্ত যদি এইরূপ করে সে যেন আপনার পুত্রত্ব লাভ করিতে পারে।' শঙ্কর বলিলেন—'সত্যসন্ধ সরল কোন ভক্ত নিরাহার থাকিয়া তোমার মত নৃত্য করিলে সে তোমার আকাঙ্ক্ষিত ফললাভ করিবে।' ইহার পর

মহারাজ বাণ শঙ্করপ্রসাদে আরও দুইটি বরলাভ করিয়াছিল। তৃতীয় বরে তাহার অস্ত্রপ্রহারের উপশম হয় এবং চতুর্থ বরে প্রমথগণের প্রধান হইয়া মহাকাল নামে চিরকাল সে খ্যাতিলাভে সমর্থ হয়। চড়ক পূজায় বাণফোঁড়া ইত্যাদি ক্লেশকর ব্যাপার, উপবাস, নৃত্যাদির মূলসূত্র ইহাই।

সিন্দুররঞ্জিত লৌহশলাকাবিদ্ধ 'বাণ'—রক্তাক্ত কলেবর বাণেরই প্রতীক। তাহাকে কেন্দ্র করিয়া যে অর্ঘ্য দেওয়া হয় সে মহারাজ বাণেরই স্মৃতিপূজা। বাণকে স্মরণ করিয়া ভক্তেরা শিবের পুত্রত্ব বা অনুগ্রহ লাভ করিবার জন্য উপবাসী থাকিয়া বাণবিদ্ধ দেহে শিব সকাশে নৃত্য করিতে থাকে। বাণের মত প্রক্রিয়াকারীও পরমায়ু, ধন, মান এবং জীবনান্তে অমরত্ব লাভ করিবে, এই তাহাদের বিশ্বাস। এই গেল সন্ন্যাসীদের অনুষ্ঠান ও নৃত্যের মূল সূত্র। এখন ভূতপ্রেতের বেশে সজ্জিত ভক্তগণের কৌতুককর নৃত্যের মূলে কোন পুরাণ বা সংহিতায় কোনপ্রকার আখ্যান আছে কিনা দেখা যাক্।

নটরাজ আশুতোষ নৃত্যকৌতুকপ্রিয়, বোধ হয় তাই ভক্তেরা নৃত্যগীত দ্বারা তাঁহার সন্তোষবিধানের চেষ্টা করিয়া থাকে। ধর্ম্মসংহিতায় একস্থানে আছে—একদা নটরাজ নন্দীকে আদেশ করিলেন—'হে বানরানন! তুমি কৈলাস পর্ব্বতে গমন করিয়া গৌরীকে শীঘ্র আমার নিকটে আনয়ন কর।' নন্দী প্রস্থান করিলে অপ্সরাগণ বলাবলি করিতে লাগিল—'সতী ব্যতিরেকে কে ইঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে?' চিত্রলেখা বলিল—'তোমাদের মধ্যে কেহ যদি নন্দীর রূপ ধারণ করিতে পার তাহা হইলে আমি গৌরীর রূপ ধারণ করিয়া শঙ্করকে স্পর্শ করিতে পারি। উর্ব্বশী বৈষ্ণব-যোগ জানিত, সে সহজেই অবিকল নন্দীর রূপ ধারণ করিল। চিত্রলেখা হইল গৌরী। অন্যান্য অপ্সরাগণ ঐ পরিবর্ত্তন সন্দর্শন করিয়া নিজেরাও একে একে পার্ব্বতীর এক-একজন সহচরীর বেশ ধারণ করিল। তাহাদের সেই কৃত্রিম রূপকে কাহারও কৃত্রিম বলিয়া চিনিবার জো ছিল না। নন্দীবেশে উর্ব্বশী শঙ্কর সমীপে গমন করিয়া বলিল—'গৌরীর সহিত মাতৃগণ আপনার নিকট আগমন করিয়াছে, এখন কৃপাকটাক্ষ দান করুন।' শিব তখন পার্ব্বতীর হস্ত ধারণ করিয়া শয়নাগারে প্রবেশ পূর্ব্বক শয্যাতে সমারূঢ় হইয়া নানাবিধ ক্রীড়া করিতে লাগিলেন।

'এবমুক্তস্তয়া রুদ্রস্ত্যক্তা শয্যান্তু হৃষ্টবৎ।
পুরস্তান্নির্যযৌ শৌর্য্যাঃ শনৈঃ সপ্ত পদানি তু॥' ৩৬

তৎপরে—

'রুদ্রং গায়ন্তি নৃত্যন্তি সর্ব্বাঃ কপট মাতরঃ।
কশ্চিদ্ গায়ন্তি নৃত্যন্তি রময়ন্তি হসন্তি চ॥' ৩৭

—ধর্ম্মসংহিতা।

অপ্সরাদের এই ব্যবহারে বিন্দুমাত্র দোষ ছিল না—ছিল কেবল কৌতুক-বাসনা মাত্র। শিব একেবারে মোহিত ও আনন্দিত হইয়াছিলেন। পরে নন্দীর সহিত গৌরী আসিয়া যখন উপস্থিত হইলেন—তখন মহা বিস্ময়ের অবতারণা হইল।

'কিমিয়ং পার্ব্বতী দেবী কিমিয়মিত্য চিন্তয়ন।
তাং দৃষ্ট্বা চকিতা সর্ব্বে কিমিয়ং ব সুশোভনা॥' ১২

—ধর্ম্মসংহিতা।

এখন প্রকৃত পার্ব্বতীকে বোঝা বড় শক্ত হইল—পার্ব্বতী দুইজন। অনন্তর মহাদেবের পার্শ্বস্থিতা পার্ব্বতী, অপ্সরাগণের কৃত্রিম রূপ শঙ্করের প্রেম উৎপাদন করিয়াছে জানিতে পারিয়া হাস্য করিতে লাগিলেন। সকলেই তখন কৌতুকে যোগদান করিল। শিবেরও যথেষ্ট আনন্দের উদয় হইল। এই শিবসন্তোষ উপাখ্যান হইতে শিবপ্রীতি-সম্পাদন কামনায় মণ্ডপে সেবকগণ অদ্ভুত কৃত্রিম বেশে নৃত্য-গীত উৎসব করিয়া থাকে বলিয়া মনে হয়।

সন্ন্যাসী বা ভক্তগণ ব্যতীত যে সকল অন্যান্য লোক এই নৃত্যগীত উৎসব করিয়া আনন্দ উপভোগ করে এবং লোকের প্রীতি উৎপাদন করিয়া থাকে তাহারা সব সময়ে এই ধারা বা আদর্শকে মানিয়া চলে না—নিজের নিজের সুকুমার মনের উপাস্য বা বরণীয় দেবতার স্তুতিগান করে। বাঙ্‌লা দেশে রামায়ণী ভাব বা আদর্শের প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধা থাকিলেও শৈব ও বৈষ্ণব ভাবেরই প্রাধান্য বেশী। তাই শিবের স্তুতির সঙ্গে সঙ্গে অনেক স্থলে কৃষ্ণপ্রেমের গানও শুনিতে পাওয়া যায়। তা ছাড়া হরিবংশের বাণোপাখ্যানের সঙ্গে যে শ্রীকৃষ্ণ প্রভাব বিদ্যমান তাহাকেও উপেক্ষা করিতে পারা যায় না। যাহা হউক এই সার্ব্বজনীন আনন্দোৎসবের

মধ্যে যে বাঙ্‌লার কবির সৌন্দর্য্যসাধন ও পুরাণ-সংহিতা-কারদের ধর্ম্মমঙ্গলের প্রভাব আছে তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

গাজনোৎসবের মূল তত্ত্বগুলি আলোচিত হইল। উহাকেই কেন্দ্র করিয়া নানাভাবে গাজনোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রাঢ়, নদীয়া ও মুর্শিদাবাদের গাজনোৎসবই মালদহে গম্ভীরায় রূপান্তরিত হইয়াছে। অনুসন্ধিৎসু হইয়া বিচার করিতে গেলে ইহার মধ্যে বাঙালীর নানাপ্রকার বৈশিষ্ট্যের পরিচয় পাওয়া যায়। কৌতুককর নৃত্যগীত যেমন একদিকে বাঙালীর নির্ম্মল আনন্দ করিবার অভি-ব্যক্তি, সন্ন্যাসীদের বেত্রহস্তে নূপুরপায়ে নৃত্য তেমনি পৌরুষ-মনের পরিচায়ক। ঢাক, ঢোল আর কাঁসির শব্দ উহাদের মনে যেন শিবের রুদ্রভাব আনয়ন করে, সঙ্গে সঙ্গে মুখেও সেই ভাব ফুটিয়া বাহির হয়—'হর হর ব্যোম্ ব্যোম্ ভোলা মহেশ্বর'। বাদ্যের তালে তালে পা নাচিতে থাকে, সাঁওতাল নৃত্যের মাদলের মতই কতকটা ঐ বাদ্যের গতি—নৃত্যের সঙ্গেও সাদৃশ্য আছে। সাধারণ গানের যে বাজনা, ইহার সঙ্গে তাহার কোন মিল নাই—যেন শুধু নৃত্যের বাদ্য—মহাদেবের ডমরুর ধ্বনি। নৃত্যের সঙ্গে সাত্ত্বিকতার এই সংমিশ্রণই বাঙালীর নৃত্যসাধনার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। নৃত্যগুরু নটরাজকে নৃত্যের দ্বারা সন্তুষ্ট করা সহজ ছিল না; সেই নৃত্য দ্বারা যখন ভক্তকে প্রীতি উৎপাদন করিতে হইয়াছিল বা মূলে সেই বাসনা ছিল, তখন যে তাহাকে নৃত্যকলায় পারদর্শিতা লাভ করিতে হইয়াছিল সে বিষয়ে আর কোন সন্দেহ নাই। শিব-পুরাণে—ধর্ম্মসংহিতায় বাণের নানাপ্রকার নৃত্য করার কথা আছে। তাহা পাঠ করিলে মনে হয় উহাতে পৌরুষ-ভাবেরই প্রাচুর্য্য বিদ্যমান। বাদ্যকর ও ধুনাদায়কের চতু-র্দ্দিক ঘিরিয়া এখন যে প্রকার নৃত্যপদ্ধতি প্রচলিত আছে তাহাতে মনে হয় পূর্ব্বে এই নৃত্যের উন্নত কোনপ্রকার রূপ ছিল। কালক্রমে সাধারণের অবজ্ঞা ও অশ্রদ্ধার ফলে বাঙালী তাহার প্রাচীন ধারাকে হারাইয়া ফেলিয়াছে। তবু আজও যাহা আছে তাহা দেখিয়া সহজেই মনে হয়—বাঙালী আনন্দ করিতে জানিত এবং তাহাদের নৃত্যকলা চরম উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল। তাহারা জড়কে প্রশ্রয় দেয় নাই—আত্মাকে সঙ্কুচিত করে নাই। তাই যেমন তার সৈন্য ছিল, পতাকা ছিল, বাণিজ্যপোত ছিল, শিল্প ছিল, রণহুঙ্কার ছিল, ঐশ্বর্য্য ছিল, বীর্য্য ছিল, সাহস ছিল, তেমনি তাহার আনন্দ ও আনন্দের প্রকাশও ছিল।

নব জাগরণের নবীন প্রভাতে বাঙ্‌লার বুকে আজ সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। বাঙালী যদি আজ তাহার নিজস্ব সম্পদকে পুনরায় লাভ করিতে চায়, তাহা হইলে এই সব অবজ্ঞাত, অশ্রদ্ধেয় প্রাচীন ঐশ্বর্য্যের মধ্যে তাহাকে ডুব দিয়া মণি আহরণ করিতে হইবে, তাহা সাধারণের হাতে পরিবেষণ করিতে হইবে।

* এই প্রবন্ধ-রচনায় মাসিক বঙ্গলক্ষ্মী পত্রিকায় প্রকাশিত শ্রীযুক্ত গুরুসদয় দত্ত মহাশয়ের 'রসকলা' প্রবন্ধ এবং 'মধ্যযুগে বাঙলা' (শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়), 'আদ্যের গম্ভীরা' (শ্রীযুক্ত হরিদাস পালিত) প্রভৃতি পুস্তক হইতে নানাভাবে সাহায্য পাইয়াছি। তজ্জন্য তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞ রহিলাম।—লেখক।

পথিক

শ্রী প্রতাপ সেন বি-এস্-সি

মাধবী-কঙ্কণ-করে এসেছ পথিক
নিদাঘ-সঙ্কেত ল'য়ে চোখে,
তোমার বরণ তরে রচিনু যে গীত
সে গীত ধ্বনুক লোকে-লোকে।
এ গান নহে ক', বন্ধু, নন্দন-সভার
প্রশস্তি—কুসুম দিয়ে গাঁথা;

এর ছন্দ মন্দ্ররবে ধ্বনিবে এবার
রুদ্রের ডম্বরু-তালে বাঁধা।
মসৃণ তৃণের পথে নহে যাত্রা তব,
নাহি তা'র ছায়া সুশীতল;
তোমার চলার সাথী—কঙ্কাল-মানব,
সত্যশিব—পথের সম্বল।

ন যযৌ ন তস্থৌ

শ্রী অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত এম্-এ, বি-এল্

হঠাৎ সেদিন সকাল-বেলায়ই শচীনের নামে এক টেলি-গ্রাম এসে হাজির।

মা শুক্‌নো মুখে শুধোলেন,—কে কর্‌লে টেলি? কা'র কী হলো?

শচীন পিওনের হাতের কাগজে নম্বর মিলিয়ে সই করে' দিতেই পিওন সাইক্লে করে' অন্তর্হিত হলো—মাতা পুত্রের কাছে সে কী হৃদয়-বিদারণ দুঃসম্বাদ বহন করে' এনেছে তা জান্‌বার জন্যে সেখানে সে আর দাঁড়ালো না।

টেলির মোড়কটা খুলতে গিয়ে শচীনের হাত কাঁপ্‌ছে। মা'র মুখ ব্লটিং-কাগজের মতো শাদা। খবরটা শোন্‌বার অধীর আগ্রহে দু' চোখ ঠিক্‌রে পড়্‌ছে।

টেলিটা পড়ে' শচীন একেবারে পাথর হ'য়ে গেল। এক বার—দু' বার, তিন বার সে পড়্‌লে—কথাটার ঠিক অর্থবোধ হচ্ছে কি না সন্দেহ হওয়াতে আরো একবার। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে আরো একবার।

মা ব্যস্ত হ'য়ে জিগ্‌গেস কর্‌লেন,—কী খবর? বল্‌ছিস কেন কিছু?

কী যে বল্‌বে, কেমন করে' যে বলা যায় শচীন কিছুই ভেবে পেলো না। বল্‌তে গিয়ে টের পেলো গলা দিয়ে স্বর ফুট্‌ছে না, মাথা কেমন ঘুর্‌তে সুরু করেছে,—অথচ পৃথিবীর কোথাও একটু পরিবর্ত্তন হচ্ছে না।

তাকে তখনো চুপ করে' দাঁড়িয়ে থাক্‌তে দেখে মা শোকাকুল কণ্ঠে বলে' উঠ্‌লেন—শিগ্‌গির বল্‌, কোথায় কী সর্ব্বনাশ হ'ল—

শচীনের এতক্ষণে হয় ত' হুঁস্ হোল। তাড়াতাড়ি সে সদর দরজার কাছে এসে রাস্তায় উঁকি মেরে বল্‌লে,—পিওনটা বেরিয়ে গেল বুঝি?

মা বল্‌লেন,—কেন, আমাদের বাড়ির টেলি নয়?

শচীনের বুক কেঁপে উঠ্‌লো। তাড়াতাড়ি আবার সে টেলিটা পড়্‌লে,মোড়কের গায়ে পেন্সিলের শাদা লেখাটুকুও—না, না, পিওন ভুল করে নি। নিশ্চয় নয়। ভুল অমনি কর্‌লেই হ'ল!

মা ছেলের উদ্‌ভ্রান্ত চেহারা দেখে অস্থির হ'য়ে উঠলেন;

বল্‌লেন,—আমাকে কিছু বল্‌ছিস না কেন? তোর দিদির টেলি নাকি? কেন পিওনকে খুঁজ্‌ছিস—

শচীন বল্‌লে,— কাছাকাছি ওকে দেখ্‌তে পেলে কিছু বক্‌শিস দিতাম।

মা অবাক হ'য়ে বল্‌লেন,— বকশিস!

—হ্যাঁ। শচীন আরেকবার অক্ষরগুলির উপর চোখ বুলিয়ে নিলে: আমার চাকরি হ'ল, মা। দিনাজপুর ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের সেই চাকরিটা।

খবরটা শচীন নিতান্তই সহজ শাদা গলায়, অনুচ্ছ্বসিত উদাসীন কণ্ঠে মাকে জানালে। এ-খবরে বিশেষ যেন উৎসাহিত হ'বার কিছু নেই। এ সংবাদ যেন তার জীবনের খবরের কাগজে পৃষ্ঠা-জোড়া প্রকাণ্ড হেড্‌-লাইন নয়, স্মল্‌-পাইকায় ছাপা নিতান্তই মামুলি একটা ছোট খবর,—পৃষ্ঠা উল্‌টে গেলেও চোখে পড়্‌বে না। এ চাকরি পেয়ে সে যে বাবার ঋণ শোধ করে' বাড়িটাকে মুক্ত কর্‌তে পার্‌বে, ছোট ভাইটাকে স্কুলে ও বোনটাকে সৎপাত্রে দিতে পার্‌বে, আসন্ন অনশন থেকে এতগুলি গ্রাসকে স্বচ্ছন্দে রক্ষা কর্‌তে পার্‌বে—খবরটা পেয়ে আনন্দে সে একটা আর্ত্তনাদ করে' উঠ্‌লো না। চোখ কচ্‌লে আবার সে টেলিটা পড়্‌লো। রাস্তার দিকে একবারটি শুধু চেয়ে দেখ্‌লো—পৃথিবীর কোথাও এতটুকু পরিবর্ত্তন হচ্ছে না।

অথচ এই একটা চাকরির জন্যে সে অন্ধের মত স্বর্গ-পাতাল অন্বেষণ করেছে। উত্তরমেরু-আবিষ্কারের একাদিক্রম বৈফল্যের চেয়ে তার পরাজয় কম মহত্তর ছিলো না। দরখাস্ত টাইপ করে' করে' সে এখন দস্তুরমতো টাইপিষ্ট-এর কাজের জন্যে দরখাস্ত কর্‌তে পারে—এত তার স্পিড্‌। চাকরির জন্যে কী না করেছে সে! দেবত্ব-প্রাপ্ত কোন বটের ঝুরিতে সে পরনের কাপড় ছিঁড়ে হতো বেঁধে দিয়েছে, শেকড় বেটে খেয়েছে, গলায় মাদুলি ধারণ করে' ত্রিসন্ধ্যা ছেড়ে বাকি তিরিশ বছরই হয় ত' তাকে সেই মাদুলি-খোয়া জল খেতে হ'ত। করতলের ভাগ্য-রেখাটা গ্রহবৈগুণ্যে নিস্তেজ কৃতবৃদ্ধি হ'য়ে আছে, কোনো সুযোগান শুভলগ্নে সেটা ঊর্দ্ধমুখে অভিযান কর্‌লো কি না দেখ্‌বার জন্যে সেই করতলের উপর কম অত্যাচার হয় নি—মাঝে-মাঝে কপালকেও সেই অত্যাচার ভাগ করে' নিতে হ'ত।

সেই চাকরি! সেই চাকরি আজ এলো—একেবারে অনায়াসে, হাতের মুঠোর মধ্যে, রূঢ় প্রত্যক্ষ দিনের আলোয়।

অথচ সে কি না পাথরের মতো নিশ্চল, গলা দিয়ে তার স্বর ফুট্‌ছে না!

আশ্চর্য্য,—শচীন পরম উদাসীনের মতো, রুগীর শয্যাপার্শ্বে বিচক্ষণ ডাক্তারের মতো পরিষ্কার খবখবে গলায় বলে' যাচ্ছে:

—সেই যে ডিষ্ট্রিক্ট-বোর্ডের কেরানির চাকরিটা, মা। পঞ্চাশ টাকায় সুরু,—বছরে দু' টাকা করে' বেড়ে চুয়াত্তর টাকা পর্য্যন্ত। মনে নেই? সেই দিন অনুকূল-দাদা যে-খবরটা দিলেন—তোমার কিছু মনে থাকে না, মা।

আশ্চর্য্য! মা'র-ও সে-কথা মনে নেই।

বিপুলা পৃথ্বী নিরবধি কাল ধরে' অচলা থাকুন ক্ষতি নেই, কিন্তু মা'র মুখ—আমাদের মা'র মুখ—যে-মুখ ছাইয়ের মতো শাদা ছিলো সহসা আগুনের মতো দীপ্ত হ'য়ে উঠ্‌লো। তাড়াতাড়ি তিনি ছেলের একান্ত কাছে সরে' এসে চীৎকার কর্‌তে গিয়ে শিশুর মতো হেসে উঠ্‌লেন,—সেই চাকরিটা? হ্যাঁ, বুঝ্‌তে পেরেছি বৈ কি! পঞ্চাশ টাকা মাইনে? তারা টেলি করে' জানিয়েছে বুঝি! দেখি—দেখি টেলিটা।

বলে' মা টেলিটা ছেলের হাত থেকে কেড়ে নিয়ে আঁকা-বাঁকা অক্ষরগুলির দিকে ফ্যালফ্যাল করে' তাকিয়ে রইলেন। বল্‌লেন, কোত্থেকে না এসেছে বল্‌লি টেলি-টা?

শচীন বল্‌লে, -দিনাজপুর থেকে।

—হ্যাঁ হ্যাঁ, দিনাজপুর থেকেই ত'। পঞ্চাশ টাকা মাইনে দেবে ত'—সত্যি?

শচীন গম্ভীর হ'য়ে বল্‌লে,—বি-এটা ত' যে করে' হোক্ পাশ করেছিলাম—কি বলো?

—না, না, তা ত' করেছিলি। আর কী লিখেছে তারা? তর্জ্জমা করে' বল্‌ না আমাকে।

টেলিটা হাতে নিয়ে ফের আরেকবার পড়ে' শচীন মানেটা মাকে বুঝিয়ে দিলে। মা ততক্ষণ নিশ্বাসরোধ করে' মাথার চুল থেকে পায়ের নোখ পর্য্যন্ত উৎকর্ণ করে' সে-ব্যাখ্যা আয়ত্ত কর্‌লেন। পরেই দীর্ঘ নিশ্বাস ছেড়ে নিমিষে তাঁর শরীর বন্ধনমুক্ত হ'ল—পাখীর ডানার মতো হাল্কা হ'য়ে গেল।

শচীন বল্‌লে,—কিন্তু আজ রাত্রের ট্রেনেই রওনা হ'তে হ'বে। পর্শু গিয়ে জয়েন্ করা চাই-ই।

যেন তাতে কতো অসুবিধে! দাঁড়াও, সে-সব ব্যবস্থা পরে হ'বে। এখন ত' মোটে সকাল। মা হাত বাড়িয়ে বল্‌লেন,—দে, দে, টেলিটা আমার হাতে দে—তোর পিসিমাকে শুনিয়ে দিয়ে আসি—

টেলিটা মা'র হাতে ছাড়্‌বার আগে শচীন আরেকবার পড়ে' নিল। মা একটু থাম্‌লেন। না, ঠিকই আছে—কোথাও এতটুকু ভুলচুক নেই।

মা ঘরের মধ্যে ঢুকে'ই চেঁচিয়ে উঠ্‌লেন,—শাঁক বাজাও ঠাকুরঝি, খোকার চাকরি হয়েছে। বলে'ই তিনি ছোট খুকির মতো কল্‌কল্ করে' উলু দিয়ে উঠ্‌লেন।

পিসিমা রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এসে ব্যস্ত হ'য়ে প্রশ্ন কর্‌লেন,—কী হ'ল বৌঠান?

টেলিটা শূন্যে নাড়্‌তে নাড়্‌তে মা বল্‌লেন,—আমার খোকা গো খোকা—

আনন্দে কথাটা আর তিনি শেষ কর্‌তে পার্‌লেন না।

পিসিমা উঠানে নেমে বল্‌লেন,—কী হ'ল? য়্যাদ্দিনে বিয়ে কর্‌বে বলে' মত্ দিলে বুঝি?

—না গো না, খোকার চাকরি হয়েছে। এই টেলি এসেছে দেখ।

—হয়েছে? দেখি দেখি—

বলে', আর দ্বিরুক্তি না করে' পিসিমাও উলু দিয়ে উঠ্‌লেন।

মা বল্‌লেন,—সত্যনারায়ণকে সিন্নি দেবার ব্যবস্থা কর আজ।

পিসিমা বল্‌লেন,—তুমিও এবার বৌ ঘরে আনবার [illegible]

সকাল বেলায় শচীন যে-টিউশানিটা করে, আজ সেখানে যাবার প্রয়োজন নেই। খানিকটা সময় সে একেবারেই কিছু কর্‌লে না—ক্লান্তের মতো তক্তপোষটার উপর শুয়ে রইলো।

খানিকক্ষণ। মনে হ'ল আজ থেকে তার ছুটি।

এখুনি উঠে পড়ে' দিনাজপুর যাবার সব বন্দোবস্ত তার ঠিক কর্‌তে হ'বে। তার এখনো দেরি আছে। আরো খানিকক্ষণ সে বিশ্রাম নিতে পারে। খানিকক্ষণ চোখ বুজে থেকে পরে চোখ চাইলেই সে-খবর আর মিথ্যে হ'য়ে যাবে না।

বাইরে বারান্দায় ননদ-ভাজে তখনো জটলা কর্‌ছে। উনুন বসে' আছে, তরকারি কোটা হয় নি। হোক্ না একটু দেরি। শচীন এসে বল্‌লে,—মা, কিছু টাকা লাগ্‌বে যে। ট্রেন-ভাড়া, জিনিষ-পত্রও ত' কিন্‌তে হ'বে কিছু। টাকা এখন পাই কোথায়?

মা ম্লানমুখে বল্‌লেন,—তুই আজই যাবি নাকি?

—বা, আজই না গেলে পর্শু চাকরিতে গিয়ে জয়েন কর্‌বো কী করে'?

—তাই একেবারে আজই যেতে হ'বে? কিছুই ত' তোর তৈরি নেই। গিয়ে উঠ্‌বি কোথায়?

শচীন বল্‌লে,—সে পরের কথা। এখন আপাতত কিছু টাকা চাই ত'। কে দেবে!

মা ঘরের মধ্যে এসে বল্‌লেন,—আমার কাছে একখানা গিনি ছিলো। সেইটাই বেচ্‌তে হ'বে দেখ্‌ছি। উপায় নেই। পার্‌বিনে? এখন সোনার দর কত?

মা তাঁর ট্রাঙ্ক খুলে বহুদিনকার পুরোনো একটি কাঠের বাক্স বা'র কর্‌লেন। তার মধ্যে থেকে বেরুলো সিঁদুর-কৌটো—তার ভেতরে ময়লা ন্যাকড়ার একটা থলি—তাতে চক্‌চকে একখানি গিনি—ভিক্টোরিয়ার আমলের। আজকের মা'র আনন্দের মতোই ঝক্‌ঝক্ কর্‌ছে।

মা বল্‌লেন,—ট্রেন-ভাড়া বাবদ রেখে বাকিটায় [illegible] যা ছু' একটা লাগে কিনে ন্যাল্। এই নে।

এই গিনি দিয়ে বিয়ের সময় মাকে আশীর্বাদ করা হয়েছিলো। জীবনের প্রথম যৌবন-স্বপ্নটিকে মা এ-যাবত সযত্নে রক্ষা করে' এসেছেন।

—দিনাজপুরের ভাড়া কত? কি-কি তোর কিন্‌তে হ'বে?

—তাই ভাব্‌ছি।

—এক জোড়া জুতো কেন্, ধুতি, জামা—

—না না, ও-সব যা আছে তাতেই চল্‌বে। তুমি কেচে একবারটি ফর্সা করে' দিলেই চলে' যাবে। জামাগুলোয় বোতাম লাগিয়ে দিয়ো। জুতো একজোড়া নেহাৎ না হ'লেই নয়।

মা আশ্বাস দিয়ে বল্‌লেন,—না, কিন্‌বি বৈ কি। ফিতে-বাঁধা জুতো কিনিস্ বাপু, ও সব শুঁড়-তোলা জুতোয় দু' মাসও চলে না। একটা মশারি নিবি নে?

—মশারি দিয়ে কী হ'বে?

—কি-জানি, যদি ম্যালেরিয়া ধরে। তা, আমাদের ঘরেরটাই দিয়ে দেব 'খন। চাল্-এর ওপরে একটা কাপড় ঝুলিয়ে নিলেই চল্‌বে। সেলাই কর্‌বার পথ নেই।

শচীন বল্‌লে,—মশারি লাগ্‌বে না।

—না, না—একটি মোটে মাস ত' তার পরেই ত' মাইনে পাবি,—আমরা কাটিয়ে দিতে পার্‌বো। তোষকই নেই—ছোট লেপখানা পেতে শুতে পার্‌বিনে?

—স্বচ্ছন্দে। শোবার আবার কী ভাবনা?

মা বল্‌লেন,—তবে ঐ লেপখানাই দিয়ে দেব। গায়ে দেবার জন্যে একখানা চাদর নিস্।

—ও-সব বাবুগিরি করে' লাভ কী?

—না না, গায়েও দে'য়া যাবে, দরকার হ'লে বিছানায়ও পাত্‌তে পার্‌বি। একটা ছাতা নিস্ কিন্তু। নতুন রোদ—জ্বরজারি হ'তে পারে। যা তোমার স্বাস্থ্য। টোট্‌কা-টাট্‌কি যা দু'চারটে ওষুধ লাগে—নিস্ মনে করে'। একটা ফর্দ করে' ফ্যাল্।

পেন্সিল-কাগজ আন্‌বার কথা মনে হ'তেই মা সহসা চোখ-মুখ বিবর্ণ করে'—গভীর অরণ্যের পুঞ্জীকৃত বিপুল অন্ধকার দেখে অসহায় কণ্ঠে বলে' উঠ্‌লেন—এঁ্যা, টেলিটা কোথায় ফেলে এলাম!

বলে'ই ছুটে বাইরে বারান্দায় বেরিয়ে গেলেন। মাটির ওপর নিতান্ত অবহেলায় সেটা পড়ে' আছে। দূর থেকে মনে হয় সামান্য এক টুক্‌রা কাগজ।

টেলিগ্রামটার থেকে কাল্পনিক ধূলো মুছ্‌তে মুছ্‌তে মা বল্‌লেন—ভাগ্যিস্ হাওয়ায় উড়ে যায় নি। পঞ্চাদের গরুটাও আবার উঠোনে ঢুকেছে—খেয়ে ফেল্‌তেও ত' পার্‌তো। ভ্যাগ্যিস। ট্রাঙ্কেই রেখে দি—বাবা।

ট্রাঙ্কে রাখ্‌বার আগে শচীন আরেকবার খবরটা পড়্‌লে। মা আবার একটু থাম্‌লেন। না, খবরটা অতি-মাত্রায় সত্য—কোথাও এতটুকু ভুলচুক নেই।

পঞ্চাদের গরুটা যে উঠোনের এক কোণে পালং-শাকের ক্ষেতটা সাবাড় করছে, সে দিকে মা'র পরে নজর দিলেও চল্‌বে।

টেলিটা ট্রাঙ্কে বন্ধ করে' রেখে মা বল্‌লেন,—কোন্ বাক্সটা নিবি? আছেই ত' মাত্র দুটো—ওটা ত' একেবারে ভাঙা। আমার বড়োটাই তা হ'লে নিস্।

শচীন বল্‌লে,—দরকার কি? ভাঙাটাতেই চল্‌বে। কিন্তু আর কি কেনা যায় বলো দেখি।

—তুইই ভেবে দ্যাখ্ না কি আর লাগ্‌বে।

—আমার আবার কী লাগ্‌বে! আমি ভাব্‌ছি তোমার জন্যে এক জোড়া কাপড়—পিসিমাকে না-হয় একখানা দিয়ো—আর ঘুনি সেদিন আমার কাছে চাকরি হ'লে একখানা বাগেরহাটি শাড়ি নেবে বলে' বায়না ধরেছিলো—ওর জন্যে—

মা ধমক দিয়ে উঠ্‌লেন—দূর পাগল! ও-সব এখন থাক্। দু' মাস হোক্ আগে চাকরি। আমার এত কষ্টের গিনি ভাঙিয়ে কাপড় কিন্‌তে হ'বে! শোন কথা!

ছেলের সঙ্গে দু'পা এগিয়ে এসে ফের বল্‌লেন,—একটা ছাতা আনিস্ কিন্তু অবশ্যি। একটা লণ্ঠন লাগ্‌বে না? ভাখ্ ভেবে। রাত্রে আলো চাই ত'।

শচীন বল্‌লে,—কী হ'বে!

শচীন এগোচ্ছিল, মা কাছে এসে গলা নামিয়ে বল্‌লেন,—চাকরির কথা সবাইকে যেন বলে' বেড়াস্ নে। কে জানে কে কোথা থেকে ভাঙচি দিয়ে বস্‌বে। আমাদের শত্রুর ত' আর অভাব নেই—

শচীন আমতা-আমতা করে' বল্লে,—অনুকূল-দাদাকে ত' অন্তত বলতে হ'বে।

—হ্যাঁ, অনুকূলকে বল্বি বৈ কি। আর পারিস্ ত' কামিনী-ডাক্তারকেও বলে' আসিস্। তোকে সেই মস্ত অসুখটা থেকে ভালো করলে। আর—আর, হ্যাঁ, সে আমিই গিয়ে বলতে পার্‌বো।

বাজার করে' শচীন যখন বাড়ি ফির্‌লে, মা তখন ঘরে নেই। ঘুনি বল্লে, পিসিমাকে সঙ্গে করে' কেদারবাবুর বাড়ি গেছেন, সেখান থেকে যাবেন চণ্ডী-দাদামশায়ের বাড়ি। অনুকূল আর কামিনী-ডাক্তারকে ত' শচীনই খবর দেবে।

ঘুনি দাদার বাক্স গুছিয়ে দিতে বস্‌লো।

মা উঠোনে ঢুকে বল্লেন,—ওদের সবাইর আক্কেলটা একবার দেখ্‌লে ঠাকুরঝি। পরের ভালো চোখ মেলে কেউ সইতে পারে না। চাকরিটা পেতে না পেতেই সবাই ধুয়ো ধরেছে—পাকা বাড়ি তুলছ কবে খোকার মা! তুলবো বৈ কি—একশো বার তুলবো। রাজলক্ষ্মী বৌ ঘরে আন্‌বো। দেখ্‌তে দেখ্‌তে পায়ের তলায় কাঁচা মাটি সোনা হ'য়ে উঠ্‌বে।

পরে শচীনের দিকে চোখ পড়্‌তেই তিনি এগিয়ে এলেন, প্রসন্নমুখে বল্লেন,—এসেছিস্? কত দর পেলি গিনিটার? কই, ছাতা আনিস্ নি?

শচীন বল্লে,—ছাতা দিয়ে কী হ'বে? এই এক বাক্স সাবান এনেছি, মা।

—তা বেশ করেছিস্। লণ্ঠন?

—লণ্ঠন লাগ্‌বে কিসে? তোমারো সব যেমন! আর, এই একটা হাফ্-প্যাণ্ট।

মা অনায়াসে সায় দিলেন,—হাফ্-প্যাণ্ট? তা মন্দ নয়।

শচীন বল্লে,—এই সাবানের বাক্সটা ঘুনির, আর—এই টুনু, তোর জন্যে খাকির এই হাফ্-প্যাণ্ট এনেছি ছ্যাখ্। ইস্কুলে যাবি নে?

[illegible] ছেড়ে টুনু লাফিয়ে এলো। মালকোঁচা মেরে কাপড়ের উপর দিয়েই প্যাণ্টটা দিলে। আর সাবানের বাক্স খুলে নতুন টাট্‌কা গন্ধে ঘুনি বিভোর হ'য়ে গেল।

মা বল্লেন,—ছালায় বেঁধে কিছু বাসন দিই সঙ্গে। যদি দরকার হয়—বলা যায় না।

শচীন বল্লে,—একা মানুষ, থাক্‌ব গিয়ে মেস্‌এ, বাসন দিয়ে কী হ'বে?

পিসিমা বল্লেন,—হ্যাঁ, বিয়ে করে' নতুন যখন সংসারি পাত্‌বে তখন ও সব বেঁধে-ছেঁদে দিয়ো। ভাব্‌তে গিয়ে মা'র চোখ ছলছল করে' উঠ্‌লো। ভারাতুর কণ্ঠে বল্লেন,—দু'জনকেই ছেড়ে দিয়ে একলা আমি থাক্‌ব কি করে'?

ঘুনি সাবানের ঘ্রাণ নিতে-নিতে বল্লে,—আমরাও থাক্‌বো গিয়ে।

পিসিমা বল্লেন,—তুই ত' যাবি শ্বশুরবাড়ি।

টুনু লাফিয়ে বল্লে—আর আমি থাক্‌বো ইস্কুলে।

চোখের জল মুছে মা বল্‌লেন,—এই ভিটে-কোঠা ছেড়ে যেতেও যে বুকটা ফেটে যাবে, ঠাকুরঝি।

শচীন বল্‌লে,—সেজন্যে এখন থেকেই ব্যস্ত হ'য়ে লাভ নেই। সেরটাক্ মাংস এনেছিলাম, মা। রান্নাঘরে রেখে এসেছি। কি রে টুনু, মাংস খাবি নে?

টুনুকে তখন দেখে কে!

আর ঘুনি গেল আলু কুট্‌তে।

যতোই বেলা পড়্‌তে লাগ্‌লো মা'র মন ততোই [illegible] হ'য়ে আস্‌তে লাগ্‌লো। তাঁর খোকা আজ চলে' যাবে—নির্বান্ধব অপরিচিত জায়গায়—কোলাহলকীর্ণ বৃহৎ জনতার মধ্যে। এই ঘর-বাড়ি মাঠ-আকাশ তাঁর খোকার বিরহে নিমেষে শূন্য হ'য়ে যাবে। আজ মাঝরাতে [illegible] ঠাণ্ডার ভয়ে খোকার শিয়রের জান্‌লাটা চুপি-চুপি [illegible] তাঁর বন্ধ করে' দিতে হ'বে না।

মা বল্‌লেন,—আজকে তোর না গেলেই নয়? [illegible] দিন দেরি করে' গেলেই কি চাকরিটা [illegible]? শেষের কথাটা বলে' ফেলেই মা তাড়াতাড়ি [illegible]

—খবর পেয়েই ত' তক্ষুণি আর দৌড়ুনো যায় না! এটুকু ওরা বুঝবে।

শচীন হেসে বললে,—ওরা বুঝলেও আমি-তুমি কী করে' বুঝি বলো?

বিকেল হ'তেই মেঘ করে' এলো—তারপর এলো বৃষ্টি। গাছ-পালা অন্ধকার করে'—আকাশ আচ্ছন্ন করে', প্রবল প্রগাঢ় বৃষ্টি।

আর বৃষ্টি নিয়ে এলো মা'র মনে অসীম ব্যাকুলতা।

মা বললেন,—এই বৃষ্টি মাথায় করে'ই যাবি?

শচীন বললে,—আমি ত' আর নৌকা নিচ্ছি না, যাবো ট্রেনে। ট্রেন সেই রাত বারোটায়। ততক্ষণে ফর্সা হ'য়ে যাবে।

—গাড়ি বলেছিস্?

—গাড়ি লাগবে কী করতে? মিছিমিছি খরচ করে' লাভ কী! একটা ট্রাঙ্ক আর বিছানা—হরলাল ষ্টেশনে পৌঁছে দিয়ে আস্‌তে পারবে না? খুব পারবে। ওকে বলে' রাখো আগে থাকতে। আর জল না ধরলে তখন দেখা যাবে। গাড়ি করলেই বারো গণ্ডা পয়সা।

মা ছেলেকে কাছে নিয়ে বসলেন। বৃষ্টিতে সান্নিধ্যটি আরো করুণ ও শোকাবহ হ'য়ে উঠেছে। শচীন মা'র কোল ঘেঁষে শুয়েছে অসহায় শিশুর মতো, আর মা তার চুলে হাত বুলুচ্ছেন ও নতুন জায়গায় কেমন সে থাকবে বা থাকবে না, কার সঙ্গে মিশবে বা মিশবে না, আফিস থেকে ফিরে কী সে খাবে বা খাবে না—এই নিয়ে অসংখ্য উপদেশ দিয়ে যাচ্ছেন। বৃষ্টির সঙ্গে মিলিয়ে-মিলিয়ে শচীন মা'র কথা শুনছে।

যাবার সময় কাছে এলো। মেঘ কেটে গিয়ে ফিকে একটু জ্যোৎস্না উঠেছে। হরলাল লণ্ঠন ও লাঠি নিয়ে তৈরি। মোট-ঘাট প্রস্তুত।

অবিশ্রান্ত ঝিঁঝিঁ ডাকছে।

মা সন্তর্পণে শচীনের হাতে টেলিটা তুলে দিয়ে বললেন, —কোটের ভেতরের পকেটে রেখে দে। বারে বারে নাড়াচাড়া করিস্ নে।

কোটের ভেতরের পকেটে রাখবার আগে শচীন আরেকবার টেলিটা পড়লে।

তারপর মাকে প্রণাম করলো। পিসিমাকে প্রণাম করলো। ঘুনি উঠে দাদাকে প্রণাম করতে এসে প্রায় কেঁদে ফেললে। টুনু ঘুমিয়ে পড়েছিলো—কান্না থামাতে গিয়ে ঘুনি তাকে ঠেলে জাগিয়ে দিলে। আড়মোড়া ভেঙে দুটো কাঁইকুঁই করে' টুনুও এসে দাদাকে প্রণাম করলে।

দাদা না চলে' গেলে তার ফের ঘুমুতে যাওয়া হচ্ছে না।

মা ধরা গলায় বললেন,—পৌঁছেই কিন্তু চিঠি দিস্।

—নিশ্চয়।

শচীন রাস্তায় নামলো—হরলাল চলেছে আগে আগে, কাঁধের উপর লাঠির ডগায় লণ্ঠন বেঁধে। চারদিক নিঝুম—ঝিঁঝিঁর ডাকে সেই নিঃশব্দতা আরো বেশি গাঢ় হ'য়ে উঠেছে।

লণ্ঠনটা আর দেখা গেল না। এতক্ষণে মাঠ পেরিয়ে ওরা ষ্টেশনের রাস্তা নিয়েছে।

পথে জল আর কাদা। সোঁ সোঁ করে' হাওয়া বইছে। ষ্টেশনে পৌঁছুতে আর কতোক্ষণ না-জানি লাগবে!

ঘরের অন্ধকারে এসে মা আর চোখের জল চেপে রাখতে পারলেন না। ঘুনিও বালিশের কোণে চোখ মুছছে। পিসিমা কাছে এসে বসলেন।

মা বললেন,—কী বিচ্ছিরি ঠাণ্ডা পড়েছে দেখেছ! কোটের ওপর চাদর একটা কিছুতেই জড়িয়ে নিলে না। যা কিছু জিনিস-পত্র—সব আমাদের জন্যেই রেখে যাবে। এখন ঠাণ্ডা লেগে জ্বর-জারি না হ'লে হয়—

পিসিমা বললেন,—ছেলের যা স্বাস্থ্য।

—এই স্বাস্থ্য নিয়েই এতো বড়ো হ'ল! আবার মেঘ করলো বুঝি! ষ্টেশনে পৌঁছুবার আগেই বৃষ্টি এসে যাবে নাকি?

পিসিমা জান্‌লা দিয়ে আকাশের দিকে চেয়ে বল্‌লেন,—না, আস্‌তে-আস্‌তে ঘণ্টাখানেক।

—ও! ততক্ষণে পৌঁছে যাবে। কি বলো?—বাইরে অন্ধকারের দিকে শূন্য দৃষ্টিতে চেয়ে থেকে মা বল্‌লেন,—ছাতা একটা কিছুতেই কিন্‌লে না—নিয়ে এলো কি না টুনুর জন্যে একটা হাফ্‌-প্যাণ্ট! নিজের জন্যে পারতপক্ষে একটা আধলাও খরচ কর্‌বে না—তুমিই ত' তা নিজ চোখে দেখ্‌ছ ঠাকুরঝি, যা-কিছু কুড়িয়ে-মুড়িয়ে পায় সব ঢাল্‌বে এই সংসারে।

পিসিমা বল্‌লেন,—সত্যনারায়ণের কৃপায় দিন ত' এবার ফির্‌তে চল্‌লো।

মা মনে মনে প্রণাম করে' বল্‌লেন,—ঠাকুরের কৃপায় শরীরটা ভালো থাকে—শুভবেলাতে গিয়ে পৌঁছুতে পারে—পথ ত' আর একটুখানি নয়! তুমি শুয়ে পড়ো—হ্যাঁ, তুমি আর জেগো না—রাত কিন্তু কম হয় নি। আমার এখুনি ঘুম আস্‌বে না। খোকার ট্রেনটা আগে ছাড়ুক্।

রাত্রির বিস্তীর্ণ স্তব্ধতা বিদীর্ণ করে' বহু দূর হ'তে কখন এঞ্জিনের বাঁশি বাজ্‌বে তা শোনবার জন্যে মা কান পেতে বসে' রইলেন। এত দূর থেকে শোনা অবশ্যি যায় না, কিন্তু মা শুন্‌তে পান্।

পিসিমা শুয়ে পড়্‌লেন। মা তখনো তাঁর খোকার কথাই বলে' চলেছেন—একেবারে ওর সেই ছেলেবেলাকার কথা,—যখন ও হয়, যখন ও নতুন কথা বল্‌তে শেখে, যখন ও প্রথম প্রাইজ পায়।

মা হঠাৎ পিসিমার গায়ে ঠেলা দিয়ে বল্‌লেন,—ঘুমিয়ে পড়্‌লে নাকি ঠাকুরঝি? শুন্‌তে পাচ্ছ না, এতক্ষণে ট্রেন ছেড়ে দিয়েছে। ঘুমোবার একটু জায়গা পেয়েছে কি না কে জানে!

শচীন যদি ঘুমোবার জায়গা না পায় তবে বিছানায় গা ছড়িয়ে মা-ই বা কী করে' ঘুমোন?

মেঘ ডাক্‌ছে—আসুক এবার বৃষ্টি। শচীন নিশ্চয়ই [illegible] জান্‌লা তুলে দিয়ে নিশ্চিন্ত হ'য়ে বসেছে—গোয়ালন্দের ষ্টিমার ত' সেই সকালে। ষ্টিমারে ওঠ্‌বার পথটুকু পেরবার সময় বৃষ্টি না হ'লেই হয়!

না, মা'র জন্যে ছোট ভাই-বোনের জন্যে কষ্ট কিসের! চাকরি করে' সবাইকে সে কাছে নেবে—একদিন এ-শহরেও ত' বদলি হ'তে পারে। এখন একটু ঘুমা,' খোকা! আজকে আর রাত জাগিস্ নি।

মা'র একটু তন্দ্রা এসেছিলো,—দরজায় কে যেন ধাক্কা মার্‌ছে, ডাক্‌ছে—মা, মা, ওঠ, দরজা খোল।

মা ধড়মড় করে' উঠে বস্‌লেন।

গাছ-পালা কাঁপিয়ে সোঁ সোঁ করে' হাওয়া বইছে।

স্বপ্নের মধ্যেও মা শচীনের ডাক শুন্‌ছেন। জান্‌তেন ও কিছু নয়—তবু মা দরজা খুল্‌লেন।

এবং দরজা খুল্‌তেই দেখ্‌তে পেলেন—চোখের সামনে অবারিত শূন্য মাঠ নয়, সশরীরে শচীন দাঁড়িয়ে। পেছনে মোট-মাথায় হরলাল, হাতের লণ্ঠনটা তার নিবে' গেছে। আলোটাকে এতটা সময় পর্য্যন্ত বাঁচিয়ে রাখ্‌বার জন্যে পর্য্যাপ্ত তেল ছিলো না।

শচীন কেমন ম্লান, অপরাধী। গলা দিয়ে তার স্বর ফুট্‌ছে না।

মা'র সমস্ত শরীর কাঁপ্‌তে লেগেছে—চেঁচিয়ে উঠ্‌লেন,—কী হ'ল? ফিরে এলি যে?

শচীন বল্‌লে,—ট্রেনটা মিস্ কর্‌লাম ষ্টেশনে যেতে-যেতেই চোখের সামনে দিয়ে বেরিয়ে গেল।

—সে কি? মা বসে' পড়্‌লেন,—এত আগে গিয়েও ট্রেন ধর্‌তে পার্‌লি নে? তখন বল্‌লাম গাড়ি নিতে—মা'র কথা ত' গ্রাহ্য করিস্ না তোরা।

ঘরে ঢুকে ভিজে কোটটা ছাড়্‌তে-ছাড়্‌তে শচীন বল্‌লে,—সে জন্যে নয় মা। এই মে-মাস থেকে ট্রেনের সময় বদ্‌লে দিয়েছে। গাড়ি আজকাল ছাড়্‌ছে সাড়ে-এগারোটায়। অনেকেই খবর পায় নি, অনেকেই ফিরে এসেছে।

মা নিষ্প্রাণ কণ্ঠে বল্‌লেন,—ওরা ত সব আর চাকরি কর্‌তে যাচ্ছিলো না। কিন্তু কী হ'বে?

শচীন অস্থির হ'য়ে ঘরের মধ্যে পাইচারি কর্‌তে লাগ্‌লো।

মা আর্ত্তনাদ করে' বল্‌লেন,—চাকরিটা তা হ'লে গেল ?

শচীন থমকে দাঁড়ালো। বল্‌লে,—না, না যাবে কেন ? গেলেই হ'ল আর কি! কাল যাবো। খবর পেয়েই তক্ষুণি যাওয়া যায় নাকি ? ওরা তা বুঝ্‌বে না ? ওরা চাকরি কর্‌ছে না ?

মা বল্‌লেন,—আজ রাত্রে আর কোনো ট্রেন নেই ?

—আজ আর আবার ট্রেন কোথায় ? কাল আবার সেই রাত বারোটায়।

মা থম্‌কে উঠ্‌লেন,—বারোটায় ?

—না, সাড়ে-এগারোটায়। কাল ঠিক মনে থাক্‌বে। কিন্তু ষ্টেশন থেকে ফিরে আস্‌তে জলে কাপড়-জামা প্রায় ভিজে গেছে। বাইরে যা জলো হাওয়া!

মা অবুঝের মতো বল্‌লেন,—আজ রাত্রেই কোনো উপায়ে আর যাওয়া যায় না ?

শচীন বল্‌লে,—তুমি যে এখন আমাকে তাড়াতে পার্‌লে বাঁচো।

—ও দিকে সব যে গেল—

মা'র অস্ফুট আর্ত্তনাদ শুনে শচীনের গায়ের রক্ত হিম হ'য়ে এলো। সব সত্যি গেল নাকি ? বাড়িটাকে ঋণের দায় থেকে মুক্ত করা যাবে না, ছোট ভাইবোন দু'টো শীতের পাতার মতো শুকিয়ে মর্‌বে, মা বুড়ো বয়সেও দু'বেলা হাঁড়ি ঠেল্‌বেন—আর, আর শচীনের কল্পনাতীত নববধূটি আরো বহুদিন অপরিচয়ের কুজ্ঝটিকার আড়ালে অজ্ঞাতবাস কর্‌বে!

শচীন দীর্ঘ নিশ্বাসে বুকের পাথরটা নামিয়ে দিয়ে বল্‌লে,—না, চাকরি যাবে কি করে' ? তা কি কখনো হয় ?

মা অসহায়ের মতো বলে' উঠ্‌লেন,—পর্শু কাজে যেতে না পার্‌লে যদি তারা অন্য লোক নিয়ে নেয়!

—নিলেই ত' আর হ'ল না।

—হ'ল না কী! যদি নেয়, তুই কী কর্‌তে পারিস্ ?

শচীন বল্‌লে,—সে পরে দেখা যাবে, তুমি এখন আমাকে একখানা শুক্‌নো কাপড় দাও দিকি। বেশিক্ষণ ভিজে কাপড়ে থাক্‌লে অসুখ কর্‌বে।

সেই কথা সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে' মা বল্‌লেন,—আর কোনো ট্রেনে অন্য রাস্তা দিয়ে যাওয়া যায় না ? সত্যি ?

—জানি না। গেলে হয় ত' দু দিন পরে গিয়ে পৌঁছুতে হ'বে।

মা দুই হাতে মুখ ঢেকে বল্‌লেন,—তবে আর কি ওরা তোকে নেবে ? ওদের কথামতো পৌঁছুতে পার্‌লি না—ওরা কড়া লোক নিশ্চয়ই—কথার একটুমাত্র নড়চড় হ'লে কাজ ছাড়িয়ে দেয়। যে দিনকাল পড়েছে—কাজ ছাড়াবার ছুতো একবার ওদের পেলেই হ'ল। আর,—আর কোনো উপায়েই যাওয়া যায় না আজ ? ত্থাখ্ না ভেবে। অনুকূলকে একবার ডেকে পাঠাবো ?

শচীন বল্‌লে,—কাজ ছাড়াবে কী! দস্তুরমতো টেলি করেছে না ?

মা হঠাৎ উৎসাহিত হ'য়ে উঠ্‌লেন, বল্‌লেন,—হ্যাঁ, টেলি—আছে ত' ওটা পকেটে ?

শচীন তাড়াতাড়ি পকেট হাত্‌ড়াতে লাগ্‌লো।

মা শুক্‌নো গলায়—বিশাল সমুদ্রের মধ্যে ডুবে গিয়ে বল্‌লেন,—কী ? নেই ?

—কী যে বলো তুমি, মা। আছে বৈ কি। কোথায় যাবে ? দস্তুরমতো ভেতরের পকেটে রেখেছি। আলোটা জ্বালো।

মা বালিশের তলা থেকে দেশলাই বার করে' কুপিটা জ্বালালেন।

শচীন বল্‌লে,—এগিয়ে আনো আলোটা।

পকেট থেকে টেলিগ্রামটা বেরুলো। সামান্য খানিকটা ভিজে' কাগজটা একটু নরম হয়েছে বটে। মোড়ক থেকে টেলিটা বা'র করে' শচীন আরেকবার পড়্‌লো—আরো একবার।

মা নিশ্বাস বন্ধ করে' বল্‌লেন,—ঠিক আছে ত' ? দে, আমার কাছে দে—ট্রাঙ্কে রেখে দি। দেখিস্ ঠিক আছে ত' ?

বলে' মা নিজেই কুপির আলোতে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে টেলিটায় একবার চোখ বুলিয়ে নিলেন।

শচীন বল্‌লে,—হ্যাঁ, ঠিক আছে বৈ কি। খবর কি আর মিথ্যা হ'তে পারে ?

মা বল্‌লেন,—পর্শুই ঠিক হাজিরা দিতে বলেছে ?

—তা বলুক্। দেখি আরেকবার। বলে' শচীন টেলিটা আরো একবার পড়্‌লে।

হ্যাঁ, ঠিকই আছে। কোথাও এতটুকু ভুলচুক নেই।

বাহিরের পথে

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

শ্রী হিমাংশুবালা ভাদুড়ী

কেম্ব্রিজ

লণ্ডন থেকে অক্সফোর্ডে গিয়েছিলাম রেলে—আর কেম্ব্রিজ রওনা হলাম 'বাসে' ক'রে—উদ্দেশ্য সেই গ্লাসগোর মতনই সহরের বাইরের দৃশ্য দেখা। কিন্তু ঠিক আমাদের দেশের মত পাড়াগাঁ চোখে পড়্‌ল না, দেখ্‌লাম—অতি পরিপাটি রাস্তা। মাইলের পর মাইল যতদূরই যাও না কেন মোটর চলাচলের জন্য অতি সুন্দর বাঁধানরাস্তা সর্ব্বত্র। এই রাস্তার সুবিধা আছে ব'লেই পাড়াগাঁ ঠিক পাড়াগাঁ নেই —অনবরত মোটর বাস্ চল্‌ছে—সহর ও পাড়াগাঁর ব্যবধান ক'মে গেছে—গ্রামের লোকেরা সহরের সঙ্গে যোগ রেখে নানারকম ব্যবসায় ও কাজকর্ম্মে উন্নতিলাভ করেছে।

বাসের ভেতর থেকে উঁকি মেরে আশে পাশে যতটা দেখা যায় দেখ্‌ছি—আর মনের ভেতর থেকে উঁকি মেরে চাইছে আমাদের নিজের দেশের পথ ঘাটের দুরবস্থার স্মৃতি। পাড়াগাঁ কেন, আমাদের দেশের অনেক সহরের রাস্তার সঙ্গেও এ সমস্ত রাস্তার তুলনা হয় না। রাস্তার দু'ধারে সারি-সারি গাছ, এমন একটা মাঠের ভেতর দিয়ে দ্রুতগতিতে বাস্ চল্‌ছে আর আমি—"ভাল রাস্তা থাক্‌লে হয় ত আমাদের দেশের অবস্থাও অন্য রকম হ'ত" ইত্যাদি—কত-কি ভাব্‌ছি এমন সময়ে হঠাৎ একটা ঝাঁকি দিয়ে বাস্ থেমে গেল। গাড়ী শুদ্ধ সব লোক নেমে পড়্‌ল—আমরাও নাম্‌লাম। চালক বল্‌লে—ইঞ্জিনের কি রোগ হয়েছে সার্‌তে একটু সময় লাগ্‌বে।

নেমে দেখি রাস্তার এক পাশে গাছতলায় দাঁড়িয়ে আছে এক বুড়ী। আমি তার কাছে এগিয়ে গেলাম—জিজ্ঞাসা কর্‌লাম—"এখানে কেন দাঁড়িয়ে আছ বাছা?" বুড়ী আমার মত একটা পুঁটুলি দেখিয়ে বল্‌লে যে তার বাগানে কিছু তরিতরকারি হয়েছে তাই নিয়ে যাচ্ছে সহরে—সেখানে বিক্রি কর্‌লে যাতায়াতের বাস্ ভাড়া দিয়েও দু'পয়সা ঘরে আস্‌বে। জিজ্ঞাসাবাদ ক'রে জান্‌লাম প্রায় অর্দ্ধমাইল দূরে এক পল্লীতে বুড়ীর বাস—ছেলে বউ আছে তারা সহরে কাজ করে—সপ্তাহে এসে মাকে দেখে যায়। বউটি খুবই ভাল—বুড়ীকে কাজকর্ম্ম কর্‌তে মানা করে। কিন্তু বুড়ী বলে, "যতদিন শক্তিসামর্থ্য আছে কেন নিষ্কর্ম্মা ব'সে থেকে ওদের গলগ্রহ হই?" দেখ, এদের মনোবৃত্তি! দেখ, কি রকম স্বাবলম্বী এরা! অশীতিপরা বৃদ্ধাও ব'সে থেকে নিজের ছেলে-বৌর উপার্জ্জন ভোগ কর্‌তে নারাজ।

বুড়ীর সঙ্গে এই সব নানা কথা বল্‌তে বল্‌তে বাসের হর্ণ বেজে উঠ্‌ল। আমিও বুড়ীর কাছে বিদায় নিয়ে দৌড়ে গিয়ে বাসে উঠ্‌লাম।

যথাসময়ে কেম্ব্রিজ পৌঁছা গেল। লণ্ডন থেকে ৫৪ মাইল উত্তরে 'ক্যাম' (Cam) নদীর পারে কেম্ব্রিজ। পৌঁছতে লাগ্‌ল আড়াই ঘণ্টা।

ট্রাম্পিংটন ষ্ট্রীট দিয়ে সহরে প্রবেশ ক'রে ডান দিকে বোটানিক গার্ডেন ও 'চেসাণ্ট' (Cheshunt) কলেজ এবং বাঁ দিকে 'লে' স্কুলের (Ley School) নূতন বাড়ী-ঘরগুলি রাস্তা থেকেই দেখে কিছু দূর এগিয়ে গিয়ে Fitz William মিউজিয়মে প্রবেশ কর্‌লাম। Viscount Fitz William নামক জনৈক সম্পন্ন ব্যক্তি এই মিউজিয়ম প্রস্তুত জন্য নগদ একলক্ষ পৌণ্ড এবং তিনি যে সকল চিত্রাদি সংগ্রহ করেছিলেন সমস্ত কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের হস্তে অর্পণ ক'রে যান। তারপর আরও অনেকে অনেক টাকা, অনেক মূল্যবান চিত্র, প্রাচীন মুদ্রা ও পুস্তকাদি দান করেন। এখানে দেখার এত জিনিষ আছে যে তার ইয়ত্তা নাই। অনেক জিনিষের মূল্য বুঝ্‌বার শক্তিও আমাদের নাই। বিল্ডিং যেমন প্রকাণ্ড তেমনি মনোরম

ও বৈচিত্র্যময়—উহা ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে শেষ হয়। মোট ব্যয় হয় এক লক্ষ কুড়ি হাজার পৌণ্ড। দর্শক মাত্রেরই এ মিউজিয়মটি দেখা কর্ত্তব্য। প্রবেশ কর্‌তে কোন ফিঃ লাগে না।

(১) Petor House College—মিউজিয়মের উত্তরেই 'পিটার হাউস' কলেজ—কেম্ব্রিজে সব চেয়ে পুরান কলেজ। ১২৮৪ খৃঃ অব্দে স্থাপিত। কবি 'গ্রে' (Gray) এই কলেজেই প্রথম পড়্‌তেন, পরে 'প্রেম্ব্রোক কলেজে যান।

(manuscript) আছে। তিনি প্রথম পিটার হাউস কলেজে ভর্ত্তি হ'য়ে পরে এখানে আসেন।

(৩) Queen's College—ট্রাম্পিংটন ষ্ট্রিট থেকে পশ্চিম মুখে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাপাখানার উত্তরের রাস্তা দিয়ে গেলেই 'কুইনস্ কলেজ'। রাজা ষষ্ঠ হেন্‌রি স্থাপন করেন King's College—রাণীরও খেয়াল হ'ল একটা Queen's College চাই। তাই রাণী মার্গারেট এই কলেজ স্থাপন করেন ১৪৪৮ খৃষ্টাব্দে। দুর্ভাগ্যক্রমে এই সময়ে ইংলণ্ডে গৃহ-

নদী হইতে ট্রিনিটি কলেজ—কেম্‌ব্রিজ

(২) Pembroke College—পিটার হাউস কলেজ দেখে রাস্তার অপর পারে পেম্ব্রোক কলেজে প্রবেশ কর্‌লাম। Earl of Pembroke একটা মল্লযুদ্ধে (Tournament) বিবাহের রাত্রেই মৃত্যুমুখে পতিত হন। আর্লের বিধবা পত্নী মৃত স্বামীর স্মৃতিরক্ষার্থে ১৩৪৭ খৃঃ অব্দে এই কলেজ স্থাপন করেন। এই কলেজের মন্দিরটি লণ্ডন নগরীর বিখ্যাত (St. Paul's Cathedral) সেণ্টপলস্ ক্যাথিড্রেলের নির্ম্মাতা স্থপতিবিদ্যাবিশারদ Sir Christopher Wren সাহেবের প্রথম কাজ। কলেজ লাইব্রেরীতে কবি গ্রে'র অর্দ্ধমূর্ত্তি (bust) এবং তাঁর Elegy নামক কবিতার পাণ্ডুলিপি

যুদ্ধ (Civil War) আরম্ভ হয়। ফলে কলেজটি একরকম উঠেই যায়। সৌভাগ্যক্রমে বিজয়ী রাজা চতুর্থ এডওয়ার্ডের পত্নীর সহিত রাণী মার্গারেটের বিশেষ সখ্য ছিল। তিনি ১৪৬৫ খৃষ্টাব্দে এই কলেজটির পুনঃপ্রতিষ্ঠা পূর্ব্বক প্রিয় সখীর কীর্ত্তি রক্ষা করেন। কলেজের ফটকটি বেশ—উপরে গুম্বজ এবং গুম্বজের চার কোণায় ৪টি চূড়া। ভেতরে কয়েকটি আঙিনা; আঙিনার চারদিকেও সুন্দর সুন্দর বিল্ডিং। উপাসনা-মন্দিরটি অতি রমণীয়। কলেজ কম্পাউণ্ডের ভেতর দিয়েই ক্যাম্ নদী প্রবাহিত। পোল পার হ'য়ে নদীর অপর পারে কলেজের বাগান ও খেলার মাঠে যেতে হয়।

(৪) St. Catherine College—কুইন্স কলেজের লাগ পূর্ব্বদিকে ট্রাম্পিংটন ষ্ট্রীটের উপরই 'সেণ্ট ক্যাথেরিন' কলেজ। ১৪৭৩ খৃঃ অব্দে স্থাপিত। এ কলেজের প্রাঙ্গণ ও উপাসনা মন্দিরটি অতি রমণীয়।

(৫) Corpus Christe College—রাস্তার অপর পারেই 'কর্পাস ক্রিষ্টি কলেজ' কেম্ব্রিজ মিউনিসিপালিটি কর্ত্তৃক ১৩৫২ খৃঃঅব্দে প্রতিষ্ঠিত। রাস্তা থেকে দেখ্‌তে অতি চমৎকার দেখায়। লাইব্রেরীতে অনেক হাতে-লেখা পুঁথি আছে। লাইব্রেরী ও হলের ভিতরের দৃশ্যও বেশ বৈচিত্র্যময়। হলে অনেকগুলি ছবি আছে।

(৬) King's College—ট্রাম্পিংটন ষ্ট্রীট বরাবর উত্তর মুখে গিয়ে ব্রীজ ষ্ট্রীটে পড়েছে। তার যে অংশ 'Caius' কলেজের সামনে প'ড়ছে তার নাম King's Parade, যে অংশ ট্রিনিটি কলেজের সম্মুখে তার নাম ট্রিনিটি ষ্ট্রীট এবং যে অংশ (St. John's) 'সেণ্ট জন্‌স্‌' কলেজের সম্মুখে তাকে বলে "সেণ্ট জন্‌স্‌ ষ্ট্রীট"। 'কিংস প্যারেড' রাস্তার উপরেই বিখ্যাত 'কিংস্‌ কলেজ'। রাজা ষষ্ঠ হেন্‌রি ১৪৪০ খৃষ্টাব্দে এই কলেজ স্থাপন করেন এবং পূর্ব্বেই বলেছি যে এই কলেজ দেখেই রাণীও কুইনস্‌ কলেজের প্রতিষ্ঠা করেন। এখানে আগে কেবলমাত্র 'ইটন' কলেজের ছাত্রদেরই ভর্ত্তি করা হ'ত—বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে এ কলেজের বড় একটা সম্পর্ক ছিল না। প্রায় ৪০০ বছর এই ভাবে চলার পর এই কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনতা স্বীকার করেছে এবং তদবধি অন্যান্য স্কুলের ছাত্রও এখানে ভর্ত্তি হ'চ্ছে। কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজের বর্ত্তমান অধ্যক্ষ শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত ভূপতিমোহন সেন মহাশয় এই কলেজ থেকে র‍্যাংলার (wrangler) উপাধি এবং পরে গণিতবিদ্যা চর্চ্চায় অসাধারণ কৃতিত্ব প্রদর্শন পূর্ব্বক স্মিথস্‌ প্রাইজ (Smith's Prize) লাভ করেন। শ্রীযুক্ত সেনের পূর্ব্বে আমাদের দেশের আর কেউ এই উচ্চ সম্মান লাভ করেন নাই।

আইভিলতা-মণ্ডিত উচ্চ সিংহাসনের মধ্যস্থলে কিংস্‌ কলেজের গেট—তার পরই প্রকাণ্ড প্রাঙ্গণ। প্রাঙ্গণের মধ্যস্থলে ফোয়ারা। ডান দিকে উপাসনা-মন্দির,বাঁ দিকে 'হল' ও অন্যান্য বিল্ডিং। সম্মুখে উচ্চ খিলান এবং খিলানের উত্তর পার্শ্বে ফেলোদিগের থাকার ঘর। এই খিলানের পথ দিয়ে এগিয়ে গেলেই সুবিস্তৃত 'লন'—যেন সবুজ রংয়ের মখ্‌মল পাতা রয়েছে—আর লনের গা ঘেঁসেই চলেছে ক্যাম্‌ নদী। নদীর উপর পোল—পোল পার হলেই কলেজের বাগান ও খেলার মাঠ। কলেজটি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর। উপাসনা-মন্দিরটি এত বড় যে অক্সফোর্ডের বড় গির্জ্জাও এর কাছে মাথা নীচু করে। লম্বে ৩১০ ফিট, পাশে ৪০ ফিট, উচ্চতায় ১৪৬ ফিট। দুপাশে ১২টি ক'রে ২৪টি কাচের জানালা—৪৯ ফিট উঁচু ও ১৬ ফুট পরিসর। এই সমস্ত জানালার কাচে দেশ-বিদেশের খ্যাতনামা চিত্রকর কর্ত্তৃক কুমারী মেরি এবং বাইবেল-ঘটিত নানাপ্রকার চিত্র অঙ্কিত। বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে একমাত্র এই কলেজের এই অমূল্য কাচগুলিই কালাপাহাড় 'ডাউসিংয়ের' হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে।

তোমরা অবশ্যই আমাদের দেশের কালাপাহাড়ের নাম শুনে থাকবে। কালাপাহাড় ছিল একজন দেবদ্বেষী মুসলমান সেনাপতি। বাংলার কোন এক উচ্চ ব্রাহ্মণ বংশে তার জন্ম—কিন্তু কোন নবাব-কন্যার প্রণয়ে প'ড়ে মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করে। আসাম, বাংলা, উড়িষ্যা এবং পশ্চিমে বেহার ও বেনারস মধ্যে এমন দেবমূর্ত্তি ছিল না যা কালাপাহাড় ধ্বংস অথবা অঙ্গহীন করে নাই। প্রকাশ আছে যে কালাপাহাড় পুরীর জগন্নাথ মূর্ত্তি পুড়িয়ে সমুদ্রে ফেলে দেয় এবং সেই পাপে তার হাত-পা খ'সে পড়ে এবং তার মৃত্যু ঘটে। কালাপাহাড়ের ন্যায় বিলাতে 'ডাউসিং' (Dowsing) নামক একজন প্রবল প্রতাপান্বিত মূর্ত্তিবিদ্বেষী লোক ছিল। এই 'ডাউসিং' কেম্ব্রিজের সমস্ত উপাসনা-মন্দিরের নানা দেশের নামজাদা চিত্রকর দ্বারা চিত্রিত মূল্যবান কাচের জানালাগুলি ভেঙে চুরমার ক'রে দেয়। কেবলমাত্র কিংস্‌ কলেজের কাচগুলিই রক্ষা পায়। কেউ বলেন যে ক্রমওয়েলের আদেশে 'ডাউসিং' কিংস্‌ কলেজে প্রবেশ করে নাই; আবার কেউ বলেন যে 'ডাউসিং' অনেক টাকা ঘুষ পেয়ে কিংস্‌-কলেজ মন্দিরে হাত দেয় নাই।

(৭) Clare College—কিংস্‌ কলেজের উত্তরপূর্ব্ব কোণে ক্লেয়ার কলেজ। রাজা প্রথম এডওয়ার্ডের দৌহিত্রী Domina de Clare কর্ত্তৃক ১৩৩৮ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত। কলেজের পিছনেই ক্যাম্‌ নদী। এ কলেজের (War Memorial Buildings) যুদ্ধ-স্মৃতি[illegible] বিশেষ

উল্লেখযোগ্য—অন্য কোন কলেজেই যুদ্ধস্মৃতি-রক্ষার্থ এরূপ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর নূতন বিল্ডিং নাই। এই স্মৃতি-ভবনের ভিতরের খিলানের উচ্চতা ৮০ ফিট। ক্লেয়ার পোল পার হ'য়ে নদীর অপর পারে লাইম এভিনিউ নামক পরিপাটি রাস্তা দিয়ে কয়েক পা হেঁটে গেলেই এই 'যুদ্ধ-স্মৃতিভবন' ও খেলার মাঠ। এই পোলের নাম "Bridge of uncountable balls"—এই অপূর্ব্ব অসংখ্য বলের পোলের উপর থেকে দুপাশের দৃশ্য অতি চমৎকার দেখায়।

University Library—কিংস্ কলেজের উপাসনা-মন্দিরের ঠিক উত্তরে কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরী। ভিতরে গিয়ে দেখ্‌তে হ'লে আগে অনুমতি নিতে হয়। অনেক মূল্যবান পুস্তক ও চিত্রাদি এখানে আছে। বিলাতে যত পুস্তক ছাপা হয় বডলিয়ান লাইব্রেরীর মত এই লাইব্রেরীও বিনামূল্যে ঐগুলির এক-এক কপি পেয়ে থাকে।

Senate House—য়ুনিভার্সিটি লাইব্রেরীর পাশেই সিনেট হাউস। এখানে বিশ্ববিদ্যালয়ের আফিস ও সভা-সমিতি হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা নেওয়া এবং ডিগ্রি দেওয়াও এখানেই হয়।

৮। Caius College—সিনেট হাউস রাস্তার বাঁ দিকে এই কলেজ ১৩৪৮ খৃঃ অব্দে স্থাপিত। এখান থেকেই ট্রিনিটি ষ্ট্রীট আরম্ভ। এ কলেজে (১) বিনয়-তোরণ (Gate of Humanity), (২) সম্মান-তোরণ (Gate of Honour) এবং (৩) পুণ্য-তোরণ (Gate of Virtue) নামক তিনটি ফটক আছে। কলেজটি বেশ বড়। এখানে ভেষজ-বিজ্ঞান ও প্রাকৃতিক বিজ্ঞান শিক্ষারও বিশেষ বন্দোবস্ত আছে।

Trinity College—১৩২৩ খৃষ্টাব্দে 'মাইকেল হোম' নামক একটা বাড়ী মাষ্টারদের থাকার জন্য প্রস্তুত হয়, পরে ১৩৩৬ খৃঃ অব্দে 'কিং হল' নামে আর একটা ছেলেদের থাকার জন্য হয়। এই উভয় বাড়ী দিয়ে রাজা অষ্টম হেনরি ১৫৪৬ খৃষ্টাব্দে বর্ত্তমান ট্রিনিটি কলেজ স্থাপন করেন। রাজা অষ্টম হেনরির প্রতিমূর্ত্তি এখানে আছে। এ কলেজের যেমন 'গেট'—তেমনি প্রাঙ্গণ—তেমনি ঘর বাড়ী—সবই প্রকাণ্ড। প্রাঙ্গণ আছে পাঁচটি। প্রথমটির নাম (Great Court) 'গ্রেট কোর্ট'—এর মত বড় প্রাঙ্গণ অন্য কোন কলেজেই নাই। এমন কি অক্সফোর্ডের Christ কলেজের 'টম কোয়াড' (Tom Quad) নামক প্রাঙ্গণও এর কাছে হার মানে—দৈর্ঘ্য ৩৩৪, প্রস্থ ২২৮ ফিট। এই প্রাঙ্গণে প্রবেশের গেট আছে তিনটি। আমরা ট্রিনিটি ষ্ট্রীট্ থেকে "Great Gate Way" নামক ফটক দিয়ে এই প্রাঙ্গণে প্রবেশ করি। প্রাঙ্গণের মধ্যস্থলে ফোয়ারা; ডান দিকের

নদী হইতে কিংস্ কলেজ—কেম্ব্রিজ

গেটের নাম 'রাজার ফটক' (King's Gate), বাঁ দিকের গেটের নাম 'রাণীর ফটক' (Queen's Gate)। হল (Hall) অর্থাৎ ভোজনাগার আছে তিনটি। ছেলেদের থাকার হোষ্টেল আছে সাতটা—তাতেও সঙ্কুলান হয় না ব'লে অনেক ছেলেকে কলেজের বাইরে থাকতে হয়। কলেজ লাইব্রেরীটি আমার কাছে বড়ই ভাল লাগ্‌ল। সুন্দর সুন্দর আলমারীতে বইগুলি অতি সুন্দর ভাবে সাজান। আলমারীর মাথায় মাথায় প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ লোকের অর্দ্ধমূর্ত্তি (busts) এমন ভাবে রেখেছে, যেন তাঁরা—এই লাইব্রেরী যাঁরা ব্যবহার করেন উপর থেকে তাঁদের আশীর্ব্বাদ কর্‌চেন। লক্ষাধিক পুস্তক লাইব্রেরীতে আছে—তা'ছাড়া প্রায় দু'হাজার হাতের লেখা বই আছে। নিউটন, মিল্টন ও অন্যান্য প্রসিদ্ধ লেখকের অনেক পাণ্ডুলিপি পুঁথি আছে। নিউটনের অর্দ্ধমূর্ত্তি ও তাঁর মৃত্যুকালের মুখের ছাঁচ আছে। অতি যত্নে তাঁর দূরবীক্ষণ যন্ত্রটি এখানে রক্ষিত হ'চ্ছে। নিউটন, ম্যাকলে, থ্যাকারে, বায়রণ ও টেনিসন এখানে পড়্‌তেন। অতি আগ্রহ ও সম্ভ্রমের সহিত তাঁদের থাকার ঘরগুলি দর্শকগণকে দেখান হয়। লাইব্রেরীর পশ্চিমেই ক্যাম নদী—লাইব্রেরী থেকেই নদীর জল দেখা যায়। পোল পার হ'য়ে ওপারে কলেজের 'লন', 'এভিনিউ' ও বাগান প্রভৃতি। পোলের উপর থেকে কলেজের দৃশ্য অতি চমৎকার দেখায়।

(১০) St. John's College—ট্রিনিটি কলেজের পরই সেণ্ট জনস্‌ কলেজ। ১৫১১ খৃঃ অব্দে রাজা সপ্তম হেনরির মাতা লেডী মার্গারেট কর্ত্তৃক স্থাপিত। এ কলেজের গেটের মত বিচিত্র কারুকার্য্যময় গেট আর কোন কলেজেই নাই। উপাসনা-মন্দিরটিও বেশ। লাইব্রেরীর পিছনেই ক্যাম নদী।

সেণ্ট জনস্‌ কলেজ দেখে, সেণ্ট জনস্‌ ষ্ট্রীট্‌ দিয়ে বরাবর এগিয়ে গিয়ে আমরা গোলগির্জ্জার কাছে ব্রীজ ষ্ট্রীটে পড়্‌লাম। গোলগির্জ্জা ডান দিকে রেখে ব্রীজ ষ্ট্রীট দিয়ে কয়েক পা এগিয়ে গেলেই ক্যাম নদীর উপরে বড় পোল (Great Bridge)। এই বড় পোলের উপরে উঠে চারদিকে যতটা দেখা যায়—বিশেষতঃ ক্যাম নদীর বক্ষে সারিসারি কলেজের নৌকা এবং নদীতীরে নৌকার ঘরগুলি—কিছুকাল দেখে আমরা বাসায় ফিরে এলাম। বড় পোল পার হলেই ডান দিকে ম্যাগডালেন (Magdalen) কলেজ; কিন্তু অসময় ব'লে এবং ক্লান্ত বোধ করাতে সে কলেজ তখন দেখা হ'ল না।

(১১) Christ College—ক্রাইষ্ট কলেজও রাজা সপ্তম হেনরির মাতা কর্ত্তৃক ১৫০৫ খৃঃ অব্দে প্রতিষ্ঠিত। এ কলেজের গেটটিও ঠিক সেণ্ট জনস্‌ কলেজের গেটেরই মতন—তবে অনেকে বলেন সেণ্ট জনস্‌ কলেজ গেটের শিল্পকাজ অপেক্ষাকৃত ভাল। কবি মিল্টন এখানে পড়্‌তেন ব'লে পৃথিবীর নানাস্থান থেকে দর্শকগণ এই কলেজ দেখ্‌তে আসেন। কবি যে ঘরটিতে থাক্‌তেন তা খুলে দর্শকদিগকে দেখান হয়।

(১২) Emmanuel College—ইমানুয়েল কলেজ ১২৮৪ খৃঃ অব্দে স্থাপিত। St. Andrew's Street থেকে দেখ্‌তে অতি মনোরম দেখায়। ফটক দিয়ে প্রথম আঙিনাতে প্রবেশ ক'রে সম্মুখেই উপাসনা-মন্দির—গুম্বজ,ঘড়ি ও চূড়া সহ দূর থেকে বেশ দেখায়। লাইব্রেরী, মাষ্টারদের বাড়ী, ছেলেদের হোষ্টেল, ভোজনাগার, লেকচার ব্লক সমস্তই দেখা গেল। বাগানটি অতি রমণীয়। একটি দীঘি আছে। স্নান ও সন্তরণের বন্দোবস্ত অতি সুন্দর। ঠিক সময়মত গিয়েছিলেম বলেই এ সবগুলি দেখা গেল। অবশেষে মাটির নীচের রাস্তা দিয়ে ইমানুয়েল ষ্ট্রীটের অপর পারে কলেজের নূতন আঙিনা ও ঘরবাড়ী দেখে ফির্‌লাম। আমেরিকার Harvard বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা Harvard সাহেব এখানে পড়্‌তেন। বীরভূমের ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত গুরুসদয় দত্ত আই, সি, এস্‌, মহাশয় এবং তাঁর পুত্র শ্রীমান বীরেন্দ্রসদয় দত্ত উভয়েই এই কলেজের ছাত্র।

কেম্‌ব্রিজে ছিলাম তিন দিন। আমাদের এক বন্ধুর সাহায্যে আগে থেকেই রুম ঠিক ক'রে রেখেছিলাম—সুতরাং আমাদের কোন অসুবিধা হয় নাই। এসেছিলাম 'বাসে' ক'রে, ফিরে গেলাম রেল গাড়ীতে। লণ্ডনে পৌছতে লাগ্‌ল মাত্র দেড় ঘণ্টা। ফের্‌বার আগে আমরা সহরের অন্যান্য অনেক জায়গা ঘুরে দেখেছি। দ্বিতীয় দিন সকাল বেলাটা কুইন রোড, ক্যাম নদীর পার এবং

কলেজের পোলের রাস্তায় হেঁটে হেঁটে ঘুরে ফিরে 'কাটিয়েছি। কুইন রোডের উভয় দিকে কলেজের বাগান, এভিনিউ ও খেলার মাঠগুলি দেখে বড়ই তৃপ্তি লাভ করেছিলাম। বেড়াতে বেড়াতে আমরা অনেক দূরে—রিড লি হল (Ridley Hall) ছাড়িয়ে Newnham College নামক মেয়ে কলেজের গেটের কাছে গিয়ে ক্লান্ত হ'য়ে ব'সে পড়ি। ইতিমধ্যে গেরেট গোষ্টেল পোলের ঘাটে নৌকা-ভাড়া ক'রে কিছুকাল ক্যাম নদীতেও বেড়িয়ে দেখেছি। বাস্তবিক পক্ষে কলেজগুলি পিছনে দিক থেকে দেখতেই খুব ভাল দেখায়।

অক্সফোর্ড ও কেম্‌ব্রিজ উভয়ই অতি ছোট ও পুরান সহর—উভয়ই বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য প্রসিদ্ধ। ৭।৮ শত বৎসর পূর্ব্বে প্রধানতঃ ধর্ম্মতত্ত্ব শিক্ষার জন্যই বিশ্ববিদ্যালয় দু'টির প্রতিষ্ঠা হয়। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে এমন কোন বিদ্যাই নেই যার চর্চ্চা এখানে হয় না এবং যার উন্নতি এখানে হয় নাই। এখানকার প্রত্যেক কলেজই বহু লেখক, বহু কবি, বহু বৈজ্ঞানিক ও বহু রাজনৈতিকের স্মৃতির সহিত জড়িত। এখানকার প্রবীণ অধ্যাপকেরা আমাদের দেশের প্রাচীন মুনি-ঋষিদের ন্যায় একনিষ্ঠ ভাবে আপন আপন গবেষণায় মগ্ন থাকেন এবং সঙ্গে সঙ্গে ছাত্রদিগকেও অনুপ্রাণিত করেন। সাধারণতঃ আর্টের জন্য অক্সফোর্ড ও সায়েন্সের জন্য কেম্‌ব্রিজ প্রসিদ্ধ।

অক্সফোর্ডের ২৪টি কলেজের মধ্যে ১৩টি এবং কেম্‌ব্রিজের ২৫টি কলেজের মধ্যে মাত্র ১২টি কলেজের ভেতরে গিয়ে দেখা ঘটেছিল। মেয়ে কলেজের মধ্যে আমরা অক্সফোর্ড Somerville কলেজ এবং কেম্‌ব্রিজ Newnham কলেজ দেখেছি বটে কিন্তু ভিতরে গিয়ে ভালরকম দেখার সুবিধা ঘটে নাই। এই উভয় কলেজেই পুরুষের কলেজের ন্যায় পড়াশুনা ও খেলাধূলার সর্ব্বপ্রকার ব্যবস্থা আছে। এমন কি মিস্ ফিলিপ্পা ফসেট নাম্নী Newnham কলেজের একটি বিদুষী ছাত্রী নাকি সিনিয়ার র‍্যাংলার অপেক্ষাও উচ্চস্থান অধিকার করেছিলেন। কলেজ ছাড়া আমরা আর আর দ্রষ্টব্য স্থানও যতটা পেরেছি দেখেছি। একটি ভাল গাইড জুটেছিল বলেই আমরা এত অল্প সময়ে এতটা দেখতে শুনতে পেরেছিলাম। সব সময়ে সব জায়গা খোলা থাকে না—কোন কোন জায়গায় আগে অনুমতি নিয়ে যেতে হয়—কোন কোন জায়গায় দর্শনী দিয়ে প্রবেশ করতে হয়—কাজে কাজেই ভাল ক'রে কোন কিছু দেখতে গেলে সময় লাগে অনেক। যা হোক্, আমরা যতটা দেখতে পেরেছি তাতেই সন্তুষ্ট।

তোমরা হয় ত লক্ষ্য করেছ যে ঠিক একই নামের কলেজ উভয় বিশ্ববিদ্যালয়েই আছে, যথা—কর্পাস ক্রিষ্টি, জেছার, ম্যাগ্‌ডালেন, পেম্‌ব্রোক, কুইনস্, সেণ্ট জন্‌স এবং ট্রিনিটি নামে কলেজ অক্সফোর্ডেও আছে কেম্‌ব্রিজেও আছে।

প্রত্যেক কলেজেই শিক্ষকদের ও ছেলেদের থাকার ঘর-বাড়ী, রন্ধনশালা, ভোজনাগার, লাইব্রেরী, উপাসনা-মন্দির, নানা কারুকার্য্যখচিত ফটক, আঙিনা, বাগান, খেলার মাঠ, বজরা, নৌকা ইত্যাদি আছে। কোন কলেজে ঘর-বাড়ী বড় ও সংখ্যায় বেশী—কোন কলেজে ছোট ও সংখ্যায় কম, এই যা।

গত জার্ম্মান যুদ্ধে এই উভয় বিশ্ববিদ্যালয়ের বহু ছাত্র যুদ্ধে যোগ দিয়েছিলেন—তন্মধ্যে যাঁরা যুদ্ধক্ষেত্রে জীবন বিসর্জ্জন দিয়েছেন প্রত্যেক কলেজেই তাঁদের স্মৃতিরক্ষার্থ তাঁদের নাম প্রস্তর, পিত্তল অথবা কাষ্ঠফলকে স্পষ্টাক্ষরে, অনেকস্থলে স্বর্ণাক্ষরে লিখে রাখা হয়েছে। অধিকাংশ কলেজের উপাসনা-মন্দিরেই এই প্রকার স্মৃতিলিপি দেখা গেল। এতদুদ্দেশ্যে 'ক্লেয়ার' কলেজে একটি অতি সুন্দর "যুদ্ধ-স্মৃতি-ভবন" নির্ম্মাণ করা হয়েছে। কেম্‌ব্রিজে একমাত্র Pembroke কলেজেরই ৩০০ ছাত্র, অক্সফোর্ডের New কলেজের ২৫০ এবং Balliol কলেজের ১৯১ জন ছাত্র যুদ্ধক্ষেত্রেই প্রাণদান করেছেন। একস্থানে লেখা আছে যে অক্সফোর্ডের ১৪,৫৬১ জন যুদ্ধে গিয়েছিলেন তন্মধ্যে ২,৬৬০ যুদ্ধক্ষেত্র থেকে আর ফিরে আসেন নাই।

অক্সফোর্ড ও কেম্‌ব্রিজ উভয় বিশ্ববিদ্যালয়ে চ্যান্‌সেলারই কর্ত্তা। সাধারণতঃ বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন খ্যাতনামা ছাত্রই এ পদের জন্য মনোনীত হন এবং একবার মনোনীত হ'লে আজীবন এ পদে থাকেন! প্রকৃত কর্ত্তা কিন্তু ভাইস্ চ্যান্‌সেলার। এই পদে প্রত্যেক কলেজের প্রধান শিক্ষক এক এক বৎসরের জন্য পর পর নিযুক্ত হন। প্রত্যেক বিশ্ববিদ্যালয়ে দু'জন (Proctor) প্রক্টর আছে। প্রক্টরের

কাজ—ভাইস্ চ্যান্সেলারকে আফিসের কাজ-কর্ম্মে সাহায্য করা এবং কলেজের ছেলেদের তত্ত্বাবধান করা। প্রক্টরের অধীনে অনেক চর বা গুপ্তদূত আছে—তাদের Bulls বা Bull-dogs বলে। ছেলেরা যদি কলেজের ভেতরে কোন অন্যায় কাজ করে তার বিচার করেন কলেজ কর্ত্তৃপক্ষ; কিন্তু কলেজের বাইরে কোন অন্যায় কাজ বা নিয়মভঙ্গ কর্‌লে উহা প্রক্টরের শাসনাধীন। কোন ছেলেই কলেজের পোষাক ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের এলাকার বাইরে যেতে পারে না—কোন কোন স্থানে ছেলেদের যাওয়াই নিষেধ। রাত ন'টার মধ্যে সকল ছেলেকেই আপন আপন কলেজে ফিরে যেতে হয়। ছেলেদিগকে এই রকম অনেক নিয়ম মেনে চল্‌তে হয়। কিন্তু ছেলেদের এমন জিদ যে কোন কোন নিয়ম ভঙ্গ করা চাইই চাই! কিন্তু দূতের চোখ এড়ানও সহজ নয়; কোন ছেলে নিয়মভঙ্গ কর্‌লেই তৎক্ষণাৎ দূত এসে তাকে জানায়—"প্রক্টর সাহেব সেলাম দিয়েছেন (Proctor pays his compliments to you)!"—প্রক্টরকে ছেলেরা খুব ভয় করে।

অক্সফোর্ড ও কেম্‌ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের Union এবং Debating Club বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এতে অনেক সময় ইংলণ্ডের বড় বড় বক্তা ও রাজনীতিজ্ঞেরা যোগদান করেন। কখন কখন রাজনৈতিক গবেষণায়—বিশেষতঃ সাময়িক রাজনীতি সম্বন্ধে বাদানুবাদে রাজমন্ত্রীরা পর্য্যন্ত উপস্থিত থাকেন। ইংরেজ জাতির চরিত্রগঠনে এই দুই বিশ্ববিদ্যালয় কম সাহায্য করে নাই।

এই উভয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্যেক কলেজেই খেলাধূলার বিশেষ বন্দোবস্ত আছে এবং সকল ছাত্রই এ সম্বন্ধে সুযোগ পায়। লেখাপড়ায় ভাল ছেলের যেমন খাতির, ভাল খেলোয়াড়েরও সেই রকম খাতির। Senior Wrangler-এর মতনই Full Blueর খাতির। এক কলেজের সঙ্গে অন্য কলেজের প্রতিযোগিতায় যারা কলেজ থেকে খেলার জন্য মনোনীত হয় তা'দি'কে হাফ ব্লু (Half Blue) এবং এক বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনস্থ সমস্ত কলেজ থেকে মনোনীত হ'য়ে যারা অন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় খেলতে যায় তা'দি'কে ফুল ব্লু (Full Blue) বলে। কেম্‌ব্রিজের ব্যাজ (Badge) ঈষৎ নীলাভ আর অক্সফোর্ডের ব্যাজ গাঢ় নীল।

অক্সফোর্ড ও কেম্‌ব্রিজের খেলাধূলার বাৎসরিক-প্রতিযোগিতা সমস্ত ইংলণ্ডের জাতীয় উৎসব ব'লে বিবেচিত হয়। এই সব খেলার মধ্যে রাগ্‌বি (Rugby), ক্রিকেট এবং নৌকা বাচ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বার্ষিক প্রতিযোগিতার খেলা সবগুলিই হয় লণ্ডনে। তখন সামান্য মুটে মজুর থেকে প্রধান মন্ত্রী পর্য্যন্ত তাতে মেতে যায়। নির্দ্দিষ্ট সময়ের অনেক পূর্ব্বে প্রতিযোগিতাস্থল লোকে লোকারণ্য হ'য়ে পড়ে। যাঁরা যেতে পারেন না তাঁরা পর্য্যন্ত এই প্রতিযোগিতার আলোচনায় মত্ত থাকেন। ক'লকাতায় মোহন বাগান ক্লাব যখন I. F. A. Shieldএ semi final অথবা final খেলে তখন আমাদের দেশের ছেলেদের মধ্যে অনেকটা এই প্রকার উদ্দীপনা ও উন্মাদনা দেখা যায়।

নৌকা-বাচ খেলার মত আনন্দময়, উদ্দীপক ও উন্মাদক খেলা আর নেই। প্রত্যেক বাচের নৌকায় ৮জন দাঁড়ি থাকে। অক্সফোর্ড ও কেম্‌ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাছা বাছা খেলোয়াড়েরা যথাক্রমে আইসিস নদী ও ক্যাম নদীতে একমাস ধ'রে প্র্যাক্‌টিস করে। পরে লণ্ডনের টেম্‌স (Thames) নদীতে ২০ দিন প্র্যাক্‌টিস করে। অবশেষে নির্দ্দিষ্ট দিনে টেম্‌স নদীতে প্রতিযোগিতা আরম্ভ হয়। প্রতিযোগিতার স্থান (course) এক মাইল লম্বা। নদীর দু'ধারে চা'র পাঁচ লক্ষ দর্শক এই নৌকা-বাচ দেখ্‌তে জড় হয়। সকলেই জামা বা টুপিতে একটা ব্যাজ লাগায়। যারা অক্সফোর্ডের জয় কামনা করে তারা গাঢ় নীল এবং যারা কেম্‌ব্রিজের পক্ষপাতী তারা ঈষৎ নীলাভ রংয়ের ব্যাজ পরে। এই ব্যাজ যে কেবল বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যাদের সম্বন্ধ আছে তারাই পরে তা নয়—যারা কখনও বিশ্ববিদ্যালয় দেখে নাই তারাও মনে মনে অক্সফোর্ড অথবা কেম্‌ব্রিজের আদর্শকে পূজা করে। সেদিন ইংলণ্ডের সমস্ত সংবাদপত্র এই বাচ খেলার কথাতেই পূর্ণ এবং আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই এই আলোচনাতে মত্ত থাকে।

সমস্ত জাতিটাই এই বিশ্ববিদ্যালয় দু'টিকে ঠিক আপনার জিনিষ ব'লে মনে করে—তাই এ দুটি

প্রতিষ্ঠান এত বড় হ'তে পেরেছে এবং সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত জাতিটার উপর প্রভাব বিস্তার কর্‌তে পেরেছে। হায়, কবে আমাদের দেশের প্রাচীনেরা আমাদের ছেলেদের খেলাধূলায় এমন প্রাণ খুলে মিশ্‌তে পার্‌বেন! কবে আমাদের দেশে তরুণের সম্মান হবে! কবে আমাদের জাতটা আবার নবীন হবে! (ক্রমশঃ)

উৎকলী সঙ্গীত ও কবিতা

শ্রী রামকৃষ্ণ দেবশর্ম্মা

গত মাসে আমরা উৎকলী লিরিক্ সম্বন্ধে কিছু আলোচনা কর্‌বার চেষ্টা করেছি। আজ এই প্রবন্ধে উৎকলী সঙ্গীত ও কবিতা এবং উভয়ের মধ্যে যে সম্বন্ধ বর্ত্তমান, তাই নিয়ে কিছু বল্‌বো

উৎকলে, সাধারণ কথায় বল্‌তে গেলে, যা উত্তমরূপে গান কর্‌তে পারা যায়, যার পদবিন্যাস-কৌশল এবং স্বর-মাধুর্য্য শ্রোতার ও গায়কের কর্ণরসায়ন হয়, তাই হ'চ্ছে সঙ্গীত। বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে এর সংজ্ঞা কথঞ্চিৎ রূপান্তরিত হ'তে পারে, কিন্তু স্থূলভাবে আমরা সঙ্গীতের সংজ্ঞাকে (definition) উল্লিখিত ভিত্তির উপরেই প্রতিষ্ঠা করে' থাকি। যে পদ্য গীতযোগ্য এবং যাতে স্বরসম্পদ বিদ্যমান, তা'ই সঙ্গীত এই জন্যই যে, নিস্বনের মধ্যে ললিত-মধুর এমন গুণ রয়েছে যা শ্রোতার কর্ণপ্রীতিকর হয় এবং যা ক্ষণেকের জন্যও আমাদের হৃদয়কে পুলকিত করে;—রসপুলক-উৎপাদন-কারী সুরময় বাণীপ্রবাহই ত সঙ্গীত! তাই আমরা সঙ্গীত আখ্যা দিয়ে থাকি: জলের কল্‌কল্—সঙ্গীত, বাতাসের সন্‌সন্—সঙ্গীত, বৃক্ষের মর্ম্মর—সঙ্গীত, পক্ষীর কূজন—সঙ্গীত, কোকিলের কুহু—সঙ্গীত, বর্ষার ঝর্ঝর—সঙ্গীত। মানুষ এ সকল সঙ্গীতের অর্থ বোঝে না বটে কিন্তু এদের স্বরের ললিত-মধুর গুণে—সুরে মুগ্ধ হয়ই। কিন্তু কবিতার সম্বন্ধে এ রীতি প্রযোজ্য নয়।—আমরা যাকে কবিতা বলি তা সঙ্গীত নাও হ'তে পারে। সঙ্গীত কর্ণপথে প্রবেশ করে, কিন্তু কবিতার প্রভাব নীরবে হৃদয়তন্ত্রীতে অনুভূত হয়। কবিতায় ভাব, অনুভব এবং ঐকান্তিকতা হ'চ্ছে প্রধান সামগ্রী কিন্তু সঙ্গীতে স্বরমাধুর্য্য এবং কর্ণপ্রীতি এই দুটিই মুখ্য পদার্থ।

উৎকলী পণ্ডিতদের মধ্যে অনেকেই বলেন, সঙ্গীত ও কবিতা তাঁদের ভাষায় দুটি পৃথক্ বস্তু—সঙ্গীতের রাজ্য এবং কবিতার রাজ্য ভিন্ন ভিন্ন। তবে অনেকে এই মতের প্রতিবাদও যে করেন না, তা নয়। তাঁরা বলেন,—যা আমরা সুর করে' গাইতে পারি ও যা পড়্‌বার সময় বা শোন্‌বার সময় আমাদের মনে অতিমাত্রায় আনন্দ দেয়, সে'ই আমাদের সঙ্গীত; কিন্তু যার ভেতর থেকে কিছু শেখ্‌বার আছে, তা আমাদের কবিতা। এ মত ভ্রান্ত; কারণ পনের আনা কবিতার উদ্দেশ্যই হ'ল কিছু শিক্ষা দেওয়া নয়,—আনন্দ দেওয়া। কবি কদাচিৎ নিজের লেখনীর সাহায্যে জগতে জ্ঞানপ্রচারের প্রয়াসী হ'য়ে থাকেন। তিনি যে ভাবে বিভোর হন, যে আনন্দে উন্মত্ত হন, যে রসে আপ্লুত হন, সেই ভাব, সেই আনন্দ ও সেই রসকে সহৃদয় পাঠকের হৃদয়ে প্রেরণ করাই তাঁর লেখনীর অভিপ্রায়। এমন কবিও থাক্‌তে পারেন যাঁরা জগৎকে শিক্ষা দেবার জন্য সমুৎসুক—তবে তাঁদের সংখ্যা অতি অল্প। জগতকে শিক্ষা দান করা যে-কবিদের উদ্দেশ্য তাঁরা অতি নীরস ও অতীব কৃপার পাত্র। পৃথিবীর বরেণ্য শ্রেষ্ঠ কবিরা এরূপ ধরণের নন। কারণ তাঁরা নিজের শ্বাস-প্রশ্বাসের মধ্যেও আনন্দ এবং অশ্রু ঢেলে দিয়ে গেছেন! সুতরাং দেখ্‌তে গেলে পূর্ব্বোক্ত মতে উৎকলী সঙ্গীত ও উৎকলী কবিতার সীমা নির্ণয় করা নিতান্ত ভ্রমাত্মক বা অমূলক।

উৎকলী সঙ্গীত বা উৎকলী কবিতা—এই উভয়ের ক্রিয়ায় কেউ কেউ ভ্রান্ত সংজ্ঞার সমতা এনে ফেল্‌লেও, তারা যে সকল সময় একই বস্তু নয়, এ আমরা

নিঃসন্দেহ বল্‌তে পারি। পদ্য ও কবিতার মধ্যে যে প্রভেদ, উৎকৃষ্ট ও নিকৃষ্ট গুণ হিসাবে সঙ্গীত ও কবিতার মধ্যে সেই প্রভেদ বা সম্বন্ধ বিদ্যমান। পদ্য হ'চ্ছে ভাববিহীন নিকৃষ্ট রচনা, কিন্তু কবিতা ঠিক্ বিপরীত অর্থাৎ ভাবগর্ভ এবং উচ্চশ্রেণীর। সমস্ত কবিতা পদ্য হ'তে পারে কিন্তু সমস্ত পদ্য কবিতা নয়। আমরা কবিতা-পাঠে মোহিত হ'য়ে যাই কিন্তু পদ্যপাঠ আমাদের প্রাণে কোনো স্পন্দন আনে না। সঙ্গীত ও কবিতার মধ্যে ঠিক্ এমনিই একটা সম্বন্ধ আছে: উচ্চ জাতীয় সঙ্গীতের অপর নাম কবিতা, কিন্তু যে সঙ্গীত কবিতা নয় তাকে আমরা নিকৃষ্ট শ্রেণীভুক্ত মনে করি। পদ্য এবং নিকৃষ্ট সঙ্গীত একই জাতীয়। সময়ে সময়ে পদ্যেও একটু মোহকরী রসের রঞ্জিতভাব পরিলক্ষিত হয়—নিকৃষ্ট সঙ্গীতও কখনো কখনো আমাদের কর্ণ ও মনকে হরণ করে' থাকে। তাই বলে' আমরা পদ্যকে কবিতা বল্‌ব না বা নিকৃষ্ট সঙ্গীতকে উচ্চস্থান দিব না। যা প্রাণ স্পর্শ করে না, যা হৃদয়ে স্পন্দনের সঞ্চার করে না—সেটা অতি তুচ্ছ সামগ্রী। কেবল পদ্যের শব্দ-যোজনা-কৌশলে কিম্বা নিকৃষ্ট সঙ্গীতের স্বর-সম্পদে আমরা তন্ময় বা মোহিত হই না।

সঙ্গীত উচ্চজাতীয় হ'লেই কবিতার আশ্রয় খোঁজে। উৎকৃষ্ট এবং চিরস্থায়ী সঙ্গীত ও কবিতার মধ্যে অপরিহার্য্য সম্বন্ধ। উৎকৃষ্ট সঙ্গীতকেই আমরা প্রকৃত সঙ্গীত আখ্যা দিব। যথা:—

দীনবন্ধু দইত্যারি, দুঃখো ন গলা মোহরি
হেলো কি নিঠুর চিত্ত নীলাচলে বিজে করি'।
অগাধ জলরে গজো
ডাকিলা হে দেবরাজো
তা' ডাক কু চতুর্ভুজো শ্রবণ যা' থিলো ডেরি।
দীনবন্ধু দইত্যারি······ইত্যাদি॥

কুরুপতি সভাতলে
দ্রৌপদী বিবস্ত্র কালে
তা' ডাকো শুনিলো হেলে লজ্জারু করিলো পারি।
দীনবন্ধু দইত্যারি······ইত্যাদি॥

রখো বা ন রখো মোতে
শরণো তো পাদোগতে
কহে বাই ধরো গীতে কে এথুঁ করিব পারি।
দীনবন্ধু দইত্যারি······ইত্যাদি॥

নিকৃষ্ট সঙ্গীতকে সঙ্গীত না বলে' কেবল গীত নাম দেওয়া যাক্। উৎকলী সাহিত্যে নিকৃষ্ট সঙ্গীত বা গীতের লক্ষণ এই যে, যে স্বরগরিমায় সেগুলি ক্ষণিকের জন্য আদরণীয় হয়, কয়েকবার শোন্‌বার বা গান কর্‌বার পরে তার সে গরিমা লুপ্ত হ'য়ে যায় এবং শুন্‌তেও ভাল লাগে না। যেমন:—

মান উদ্ধারণো করহে কারণো
শরণো মুঁ ভুন্ত পাদতলে।
মারকণ্ড ঋষি যাউথিলে ভাসি'
উদ্ধরি' ধরিল বাহুবলে।
রাবণকু মারি ধরাকু রখিল
সীতাকু আনিলো কেতে ছলে।
মান উদ্ধারণো······ইত্যাদি॥

কিন্তু সঙ্গীতের মাধুর্য্য অক্ষুণ্ণ ও স্থায়ী। সুতরাং সংক্ষেপে এই কথা বলা যেতে পারে যে, সব কবিতা সঙ্গীত হ'তে পারে না কিন্তু সঙ্গীত মাত্রেই নিশ্চয় কবিতা। পুষ্পের মধ্যে সৌরভ যেমন প্রচ্ছন্ন ভাবে নিহিত থাকে, সঙ্গীতের মধ্যে কবিতা তেমনি থাকে ডুবে।

নির্গন্ধ কুসুমের বাহ্য সৌন্দর্য্যে আমরা ক্ষণকাল মুগ্ধ হ'য়ে—তারপর ফেলে দিয়ে থাকি, কিন্তু সুরভিত ফুলের বেলায় তা করি না। সেইরূপ কবিতা-সম্পদে মণ্ডিত সঙ্গীত চিরদিন থাকে, কিন্তু কবিতাবিহীন সঙ্গীত সৌরভহীন পুষ্প সদৃশ ক্ষণস্থায়ী। কবিতায় ভাবই হ'চ্ছে প্রাণ—কিন্তু সঙ্গীতে কবিতাই প্রাণ। প্রকৃত সঙ্গীতের স্বরগ্রাম হ'চ্ছে অবয়ব, কিন্তু কবিতা হৃৎপিণ্ড।

কবিতা:—

জগতর সিংহদুয়ারে
জ্ঞান-অর্ণব-তীরে
বিজ্ঞানর রত্নবেদিকা
দেখ রাজে রুচিরে।

তহিঁ সিংহাসনো পুণ্যরো
স্বর্ণ বর্ণে রঞ্জিত
তথি পরে বিজে নবীন
যুগ চির-বাঞ্ছিত।
মস্তকে শোভই কিরীট
প্রেমমণি-খচিত,
হস্তে রাজদণ্ড ন্যায়রো
মহামহিমান্বিত।
একোতানে বিশ্ব কবিত্র
ধরি অমর বীণা,
গাউছন্তি অভিনন্দন-
গীত অমৃতজিনা।"
—মধুসূদন রাও।

সঙ্গীত :—

কলাকলেবর কহ্নাই
সঙ্গে রোহিণীসুতো
করন্তি মথুরা বিজয়ে
দাণ্ডে দেখ সঙ্গাতো।
পসি পড়ুছি কি আকাশুঁ
যেহ্নে গঙ্গা যমুনা,
ক্ষীর সঙ্গে প্রাণ শোষিলে
নাশো গলা পুতনা।
.........ইত্যাদি॥

এইজন্ত প্রকৃত কবিতা হোক্ বা সঙ্গীত হোক্ প্রত্যেকের মর্য্যাদা বোঝা পাঠক বা শ্রোতার ধৈর্য্য, সৌহৃদ্য ও সমপ্রাণতার উপর অনেকটা নির্ভর করে। আয়র্ল্যাণ্ডের নবযুগের বরেণ্য কবি W. B. Yeats সত্যই বলেছেন—"One afterall writes poetry for a few careful and sympathetic friends." অনেক সময় কেউ কেউ ইচ্ছা করেন, সঙ্গীতের ভাবমাধুর্য্য এত বেশী প্রকাশমান হওয়া দরকার যে শ্রবণ বা পঠনের সঙ্গে সঙ্গে যেন সেটা বোঝা যায়—শুনতে শুনতে সঙ্গীতের ভাব প্রকাশ না হ'লে তজ্জাতীয় সঙ্গীত আদরণীয় নয়। প্রকারান্তরে কবিতার প্রতিও এই মত দেওয়া যেতে পারে; তবে সমস্ত কবিতা সকলের পক্ষে পড়্তে পড়্তে বা শুনতে শুনতে বোধগম্য হওয়া অস্বাভাবিক হ'তে পারে। এই মত যে কতদূর সমীচীন তা আমরা বলতে পারি না।—মেঘের কাছে জলের জন্য চাতক একটি বৃক্ষবিতানে বসে' "বর্ষা, বর্ষা" বলে' চেঁচালে নিশ্চয়ই মেঘ তার মুখে ঢলে' পড়ে না। বর্ষার জলের জন্য চাতককেই বর্ষার স্থলে উড়ে যেতে হবে!

গভীর জলাশয়ের উপর ভেসে-বেড়ানো একটা কথা, আর তার তলস্পর্শ করা আর একটা কথা। অনেক সন্তরণপটু লোকই জলরাশির উপর বহুদূর ভেসে যেতে পারে কিন্তু সবাই তলস্পর্শ কর্‌তে পারে না—এটি একটি ভিন্ন শক্তির অপেক্ষা করে। তেমনি কবিতা ও সঙ্গীতের ভাবের মধ্যে প্রবেশ করার জন্য একটা ভিন্ন শক্তির প্রয়োজন। শ্রোতা বা পাঠকের রসিকতা, ধৈর্য্য, সৌহৃদ্য, সহানুভূতি ও সমপ্রাণতা এই শক্তিরই বিভিন্ন অঙ্গ। ক্ষণিকের জন্য আত্মবিস্মৃত হ'য়ে কবিদত্ত পক্ষের দ্বারা উড়্‌তে পার্‌লে পাঠকের অনুভব কবির অনুভবের সঙ্গে সমকক্ষ হয়। সঙ্গীতের স্বরগ্রাম ও কবিতার ছন্দক্রীড়া প্রত্যেক ব্যক্তিরই চিত্তাকর্ষক হয়—কিন্তু ভাবময়ত্ব কেবল রসিক এবং সহৃদয় পাঠক বা শ্রোতার অবধারণায়ই আসে।—যেমন সর্প একটি সঙ্গীতপ্রিয় জীব সে সঙ্গীতের সুরে যত মুগ্ধ হয় ভাবে তত বিভোর হয় না। রসিক ও ভাবুক কবি প্রকৃতির পূর্ব্বকথিত সঙ্গীতগুলির চিরমধুর নিস্বনে যত আত্মবিস্মৃত হ'য়ে পড়ে তদপেক্ষা অধিক মুগ্ধ হয় সেই সঙ্গীতগুলির অপ্রত্যাশিত ভাবে। প্রকৃতির সঙ্গীত সাধারণের নিকটে গূঢ় ও রহস্যময় হলেও কারো কারো কাছে সে সকলের ভাব লুকানো থাকে না, কিন্তু তাকে বোঝ্‌বার জন্যে কবিপ্রকৃতির প্রয়োজন। প্রকৃতি-সঙ্গীতে শাশ্বত মাধুর্য্য বর্ত্তমান।

কবিতা বা সঙ্গীত সহজে বোধগম্য না হ'লেই যদি সেটি নিকৃষ্ট শ্রেণীর হয় তবে পৃথিবীর অনেক উৎকৃষ্ট সঙ্গীতই আমাদের বাদ দিতে হয়। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীত অনেকে না বুঝ্‌তে পার্‌লেও তার এমন একটা মাধুর্য্য আছে যে আপাত-অর্থবোধহীনতা রসের পরিপন্থী হয় না। তাঁর গীতাঞ্জলিগত সঙ্গীতগুলি জগৎবিখ্যাত হ'লেও বিশ্ব এখনও তা সুস্পষ্ট বোঝে নি'। তা বলে' তা কি নিকৃষ্টজাতীয় বলে' আমরা মনে কর্‌বো? ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ, ইমার্সন, ব্লেক,

ব্রাউনিং প্রভৃতি অনেক বিখ্যাত কবিদের সঙ্গীত প্রকৃতি-সঙ্গীতের মতই ভাবগূঢ় (Mystic)। সঙ্গীতরাজ্যের মধ্যে ভাবগূঢ় সঙ্গীতগুলির একটা বিশিষ্ট স্থান আছে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে সহজবোধগম্যতা সঙ্গীত বা কবিতার উৎকৃষ্টতার একটা বৈশিষ্ট্য হ'তে পারে কিন্তু অপরিহার্য্য লক্ষণ নয়। পুরাণোক্ত ফল্গু নদীর মত অনেক কবিতা ও সঙ্গীতের ভাব অন্তর্নিহিতই থাকে। অবশ্য, যে সেই বালুকারাশির আবরণ মোচন করতে পারবে সে নিশ্চয়ই অন্তর্বাহিনী মন্দাকিনীধারার সন্ধান পাবে। ভাব,ভাবের আত্যন্তিক গাম্ভীর্য্যে গূঢ় হ'য়ে যায় এবং সময় সময় কবির দ্ব্যর্থবোধক বক্রোক্তি-ছটায় সঙ্গীত বা কবিতা ভাবগূঢ় হওয়া স্বাভাবিক। কাজেই শুন্‌তে শুন্‌তে অর্থ বুঝে নেওয়ার যে বিধি, তা কবিতা ও সঙ্গীতের সম্পর্কে নির্দ্দেশক মাপকাঠি বলা যেতে পারে না।

এস্থলে উপরোক্ত দুই প্রকারের ভাবগূঢ় কবিতার উদাহরণ দেওয়া গেল :—

(ক) ভাবের আত্যন্তিক গাম্ভীর্য্য হেতু 'ভাবগূঢ়' : যথা—

বকে বসিথিলা ধ্রুব উপরে,
বিষ্ণু পদকু লভিলা উত্তারে,
বলক্ষ পক্ষকু অম্বরে বহি,
বহন সে তমঃনাশন বিহি,
বকতা এ গিরো,
বিশ্রামবার্ত্তা কহিবা সুন্দরে ॥১॥
বধূ কামধর্ম্মে অছি জীবনে,
বধূ কামবশে ভ্রমে এ বনে,
বাহুহু অছ খেড়ে রমণীরে
বিশেষ শোভা তহুঁ রমণী এ
বিংশ বাহু রথে,
বিলোকিছি গলা দক্ষিণ পথে ॥২॥
ইত্যাদি······'বৈদেহীশ বিলাস'
(উপেন্দ্র ভঞ্জ)

(খ) দ্ব্যর্থবোধক বক্রোক্তি ছটা হেতু 'ভাবগূঢ়' : যথা—

দেখি নব কালিকা বকালিকা মালিকা
আলি কালিকা কান্ত স্মরি,
রক্ষা কেমন্তে করি করিবা মত্তকারী গতিকি
এমন্ত বিচারি সে ·· চরী,
ভাবে বঞ্চি·· এ-কালোকু
কথা থিবো কালোকালোকু
একেত ক্ষীণোদিনো হেলা দুর্দ্দিনো দিনো
নলভু বল্লভ মেলোকু রে,
হিত আন মানঙ্কু সত কামীজনঙ্কু
অহি পরা অহিত এহি,
হত কৃশানু সানু মানরু ভানু ভানু—
তাপরু নিস্তারিলা মহী রে, সহচরী,
বিরহানলো হৃদোছলে
জলে সে হত নাহে জলে
করুছি জাতো জাতো বেদকু শতো শতো
হৃদাছলোরে ঘন কোলেরে।
·········ইত্যাদি ॥
— লাবণ্যবতী।

এইরূপ অনেক কবিতা ও সঙ্গীত। কিন্তু দুর্ব্বোধ্য ভাব সেগুলিকে অনেক স্থলে অসুন্দরও করেছে।

যদি সঙ্গীতের বাহ্য সৌন্দর্য্য (স্বরমাধুর্য্য ও পদবিন্যাস-কৌশল প্রভৃতি) মনোমুগ্ধকর হয় তবে রসিকদের পক্ষে যথেষ্ট বলে' গণ্য হবে। উৎকৃষ্ট সঙ্গীত বা কবিতা রচনা করা যেমন একটি শক্তির পরিচায়ক তেমনি সেগুলিকে হৃদয়ঙ্গম করা আরেকটি বিশেষ সাহিত্য-প্রতিভার নিদর্শন। আনন্দ দান করা স্রষ্টার প্রাথমিক উদ্দেশ্য হ'লেও মানুষ অত সহজে সেই আনন্দের অধিকারী হ'তে পারে না। বহির্ভাগ সৌন্দর্য্যসম্পন্ন হ'লেই অন্তর্ভাগ সুন্দর হয় না। বাহ্য সৌন্দর্য্যে যারা মুগ্ধ তারা আভ্যন্তরীণ সরসতা উপলব্ধি করতে পারে না। উৎকলের গীতি-কবি 'অভিমন্যু', কবিসূর্য্য বলদেব, গোপালকৃষ্ণ, বনমালী প্রভৃতি—এঁরা মিষ্টিক ন'ন। তাঁদের ভাবসম্পদ সামান্য চেষ্টায় পাওয়া যায়, যদিও রসবোধ সকল শ্রেণীর লোকের পক্ষে সহজ নয়।

যথা :—

"বান্ধিবি কাহারো কেশো কুসুমে করি সুবেশো
কাহা ললাটরে দেবি চিতা।

কাহার কর্ণে কুণ্ডলো খজিবি রে মোর বালো
কাহাপাইঁ কল্পিবি চিন্তা রে
জীবধনো।
কাগ অশ্রুধুলি দেবি পেছি,
কাহাকু বা পিন্ধাইবি বাছি রে।"
—কবিসূর্য্য বলদেব রথ।

উৎকলী সঙ্গীতে স্বরমাধুরী ও শব্দসম্পদ ছাড়া তার উচ্চ রস ভাবগুলিই চরম উৎকর্ষের লক্ষণ। এই ভাবের অপর নাম—যাকে আমরা বলি কবিতা। সুতরাং উৎকৃষ্ট সঙ্গীতে কবিতার অস্তিত্ব একটি অপরিহার্য্য লক্ষণ। একটা উৎকলী সঙ্গীত শুন্‌লে বা পাঠ কর্‌লে তার বাহ্য-বিলাস আমাদের মনকে দীর্ঘকাল আকর্ষণ কর্‌তে পারে না। যথা:—

প্রীতি-লতাকু তু কুঠার পরায়ো
ছেদনো কল্লু মুলোরু
অবিশ্বাসী বোলি এবে সে জানিলু
রাজা ডগর হেবাঠারু।
অক্রুর নপ সেবকে বড় রাড়ো,—
কিঞ্চিতো আজ্ঞারে অতি প্রতিজ্ঞারে
মানন্তি নাহিঁ যানো বড়ো।
......ইত্যাদি॥—কবিসূর্য্য বলদেব রথ।

এই সঙ্গীতের বাহ্যবিলাস ভাল না হ'লেও এতন্নিহিত কবিতা সঙ্গীতকে চিরস্থায়ী গরিমায় জীবিত করে' রাখে। মানুষের কথা দূরে থাক্, পশু-পক্ষীরাও সঙ্গীতে মুগ্ধ হ'য়ে যায়। তাই সঙ্গীতের সাহায্যে মানুষের হৃদয়কে গঠন করা বা তাতে রস সঞ্চার করা বাস্তবিকই একটা উৎকৃষ্ট পন্থা। যে জাতি যত উন্নত এবং যে জাতির সাহিত্য যত উৎকর্ষ লাভ করেছে, তার সঙ্গীত তত মহান্, তত উচ্চ। অবশ্য সঙ্গীত বল্‌তে আমরা এখানে উচ্চ শ্রেণীর সঙ্গীতকেই লক্ষ্য করে' বলছি। অতি প্রাচীন উৎকলী সঙ্গীত বা কবিতা আধুনিক সঙ্গীত বা কবিতার চেয়ে উন্নততর বলেই বোধ হয়। তার কারণ এই যে, সঙ্গীতের উৎকর্ষ জাতির আনন্দ, স্বাস্থ্য, সন্তোষ ও সাংসারিক সুখস্বাচ্ছন্দ্যের উপরেই বিশেষ ভাবে নির্ভর করে' থাকে। সঙ্গীতের সাহায্যে উচ্চ উদার ভাব প্রচার করা জাতীয় উন্নতির একটা প্রধান চিহ্ন। আধুনিক উৎকলী সাহিত্যে সঙ্গীতের অভাব অত্যন্ত বেশী। উৎকলীরা উৎকৃষ্ট সঙ্গীত শিখ্‌তে তত চেষ্টা করেন না। ওঁদের জাতীয় বৈঠকে বা বিলাস-মিলনে বাংলা ও প্রাচীন উৎকলী সঙ্গীতই অপেক্ষাকৃত প্রভাব বিস্তার করে' থাকে। পরপ্রাদেশিক সাহিত্য হিসাবে নয়, কিন্তু বাংলা সঙ্গীতের প্রতি এতাদৃশ বিশেষ আদর ও উৎকলী সঙ্গীতের উৎকর্ষের প্রতি অনাস্থা সত্যই নিন্দনীয় এবং সাহিত্যিক দাসমনোভাব ছাড়া আর কিছু নয়।

পূর্ব্বেই বলেছি, উৎকৃষ্ট কবিতা সঙ্গীতের রূপান্তর মাত্র। তাই কবিতা সঙ্গীতময় না হ'লে তারও আদর নাই। 'সঙ্গীতময়' অর্থে আমরা কেবল সরল ভাষাকে লক্ষ্য কর্‌ছি না। কবিতা সঙ্গীতময় হওয়া উচিত—অর্থাৎ ও'তে একটা বিশেষ মনোমুগ্ধকর স্বরমাধুরী থাকা আবশ্যক। সঙ্গীত হোক্ বা কবিতা হোক্ প্রত্যেকটাই গীতযোগ্য হওয়া প্রয়োজন বলেই মনে হয়। পৃথিবীর আদি-কবি থেকে সুরু করে' আজ পর্য্যন্ত প্রত্যেক কবিই গেয়ে গেছেন, কিন্তু কখনো কবিতাকে কথায় বা গদ্যরীতিতে বলেন নি'। তাই কবিতার ভাষা পৃথক্ বলে' নির্দ্দেশ করা হয়েছে। কবিতার স্বরগ্রামরীতি কতক পরিমাণে 'ছন্দ' নামে অভিহিত হ'তে পারে। পৃথিবীর কত লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখক গদ্যকে পদ্যের ছাঁচে ঢেলে দিয়েছেন, তাই বলে' কি সেগুলিকে কবিতা বলে' মেনে নিতে হবে? যে কবিতায় উল্লিখিত ছন্দ নাই বা যা একসময়েই গীতযোগ্য নয়, সে তার প্রধান উৎকর্ষ হারিয়েছে নিশ্চয়ই;—যৌবনের উদ্দাম আনন্দ যা, মানুষের জীবনের স্বাস্থ্য ও শক্তি যা, কবিতার স্বরমাধুরীও তা'ই। সঙ্গীতবিহীন কবিতা হীনাঙ্গ বা বিকলাঙ্গ। আমরা কবিতার স্বর-উচ্ছ্বাস প্রকৃতির ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্র থেকে (জল, বাতাস, মেঘ, পাখীর কাকলী, পশুর ডাক, জনতার চীৎকার ইত্যাদি থেকে) লাভ করি। সুতরাং প্রকৃতিপ্রদত্ত স্বরগরিমায় আমাদের কবিতাও সরস ও সজীব হ'য়ে পড়ে। সসঙ্গীত কবিতা যত হৃদয়গ্রাহী, সঙ্গীতবিহীন কবিতা তত নয়। তাই কবিতার সঙ্গে সঙ্গীতের সম্বন্ধও সর্ব্বদা অপরিহার্য্য।

উৎকলী সাহিত্যে যে সব উৎকৃষ্ট সঙ্গীত আছে তার প্রধান একটি দোষ এই যে শব্দের কঠিনতা হেতু তার অর্থবোধ অধিকাংশ স্থলে আটকে যায়—শব্দবিন্যাসপ্রণালী সরল হ'লেও। যেমন :—

শুভ্র দ্বিরদোরদন-আধারে
ঢলি ঢলি দোলি পক্ষি,
অমল ধবল কিরণ-ছটারে
মোহন ভুবন রচি।
......ইত্যাদি॥

উৎকলী পণ্ডিত বা কাব্যামোদীদের মতে উক্ত সাহিত্যের সঙ্গীত বা কবিতায় সংযুক্ত বর্ণ কিম্বা সন্ধি-সমাস-উদ্ভূত শব্দ শব্দের অতিপ্রয়োগ অনলঙ্কার; তাতে বিশেষ যতিপাত ও ছন্দপতন হয়—আর সেই নিয়ম লঙ্ঘন করলে সঙ্গীত বা কবিতাও সুন্দর ও সুশ্রাব্য হয় না। প্রকৃত সঙ্গীত বা কবিতা একাধারে কর্ণ, মন, হৃদয় এবং মস্তিষ্কে অমৃত বর্ষণ করে। যতির নিয়ম লঙ্ঘন করলে বা পদবিন্যাসে বর্ণ বা শব্দ বেড়ে গেল তার সমস্ত মাধুর্য্য বিনষ্ট হ'য়ে যায়। এইরূপ কতকগুলি বিধিনিয়ম আছে যার একটু ব্যতিক্রম ঘটলেই উক্ত কবিতা বা সঙ্গীতের সৌন্দর্য্য তথা গৌরব হানি হয়। সংস্কৃতের মত উৎকলী সঙ্গীত বা কবিতায় কতক পরিমাণে গুরু-লঘু নিয়ম আছে। সে-গুলিকে রক্ষা করে' শব্দবিন্যাস করলে রচনা দোষমুক্ত ভাবেই পরিপুষ্ট হয়। উত্তম সঙ্গীতজ্ঞ বা দক্ষ কবিরা সে সব মেনে চলেন। দীর্ঘ উচ্চারণের স্থলে হ্রস্বস্বর-বিশিষ্ট শব্দ বা লঘু উচ্চারণের স্থলে দীর্ঘস্বর-যুক্ত বর্ণ প্রয়োগ নিতান্ত কদর্য্য ও কুৎসিত। দেখা যায়, উৎকলী সঙ্গীত ও কবিতায় আজকাল এই রীতি অনেক পরিমাণে অবহেলিত হ'চ্ছে।

নিম্নের কাব্যাংশটি দেখুন :—

তু সিনা পুজু মো মানসমুরতি
মুঁ পূজে সাক্ষাত দেবতা,
তু সিনা ভজিলু বীজমন্ত্র করি,
মুঁ কহে পরাণ-বারতা।
......ইত্যাদি॥
—জনৈক উদীয়মান উৎকলী কবি।

এই কাব্যাংশটিতে অনেকগুলি দোষ রয়েছে। প্রথমতঃ, দীর্ঘস্বর স্থানে হ্রস্বস্বর প্রয়োগ; দ্বিতীয়তঃ, হ্রস্বস্বরের স্থলে দীর্ঘস্বরের প্রয়োগ; তৃতীয়তঃ, কতকগুলি যুক্তাক্ষরকে কবি তাঁর অক্ষমতা হেতু ভেঙে দিয়ে সরল করেছেন। দ্বিতীয় পংক্তির 'মুঁ পূজে'র স্থলে 'পূজেঁ মু' করলে অথবা 'পূজেঁ' শব্দটির স্থলে একটি যুক্তাক্ষর দিলে বোধ হয় ভাল হ'তো। আবার ঐ পংক্তির 'সাক্ষাতে'র 'ক্ষ'টি ও তৃতীয় পংক্তির 'মন্ত্র'র 'ন্ত্র'টিকে একটি হ্রস্বস্বরের স্থলে বসান হয়েছে জোর করে'। পড়তে গেলেই কানে বাজে। এইরূপ 'মুরতি' 'পরাণ' এই দুটি শব্দও কবির অক্ষমতার পরিচয় দেয়, কেন না যুক্তাক্ষর 'মূর্ত্তি' ও 'প্রাণ'কে এখানে ভাঙা হয়েছে। এইরূপ কাব্যের অবহেলা উৎকলের আধুনিক অনেক কবিই করছেন; কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে নূতন সৃষ্টি তাঁরা করলেও কবিতার ও সঙ্গীতের কোন ছন্দ বা ধারার পরিবর্ত্তন ঘটাতে পারেন নি। সে সব বিষয়ে তাঁরা প্রাচীনই র'য়ে গিয়েছেন। একমাত্র এই অবহেলাই যেন তাঁদের নূতনত্ব! কিন্তু এই অবহেলার কারণ দুর্ব্বলতা বা স্বেচ্ছাচারিতা ছাড়া আর কি হ'তে পারে? বিশুদ্ধ উৎকৃষ্ট সঙ্গীত বা কবিতা লেখা কঠিন সাধনার বস্তু। শক্ত বলে' আমরা তাকে পরিহার করতে বলছি না। কিন্তু স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য—লিখতে লিখতে পটুতা জন্মে এবং পটুতা থেকেই সরলতা বিশুদ্ধতা প্রভৃতি আসে।

উত্তম গায়কের কণ্ঠে সঙ্গীত সুষ্ঠুরূপ ধারণ করে। বাদ্যযন্ত্রগুলির তানলয়গুলিও এবিষয়ে বিশেষ সাহায্য করে' থাকে। এই জন্য গান ও বাজনা গান্ধর্ব্ব বিদ্যা নামে আর একটি পৃথক কলা। উত্তম গায়ক হ'লে নিকৃষ্ট সঙ্গীতও মনোমুগ্ধকর হয়, দেখা যায়। উৎকল দেশীয় "পল্লী-চৌপদী", গউড়দিগের "ওগালো," শবর প্রভৃতি জাতির "জামুড়ালি" গান গাহিবার দক্ষতায় সময় সময় অত্যন্ত প্রীতিকর সুশ্রাব্য হয়। এইখানে মনে রাখা উচিত যে, যা এতজ্জাতীয় নিকৃষ্ট সঙ্গীতগুলিকে মাধুরী দিয়ে থাকে, তা সেই সঙ্গীতগুলির স্বাভাবিক গুণ নয়,—কেবল গায়কের মধুর কণ্ঠেই এর সৌন্দর্য্য। কোন উত্তম গায়কের কণ্ঠে একটি গান শুনলে আমরা তাতে

মুগ্ধ হ'তে পারি কিন্তু তা বলে' আমরা সে সঙ্গীতটিকে উচ্চ স্থান দিব না। কলাবিৎ গায়ক নিকৃষ্ট সঙ্গীতে যে মাধুরী মাখিয়ে দেন তাই নিয়ে সেই সঙ্গীত সরস হ'য়ে উঠে; কিন্তু সেই মাধুরীর অভাবে সেই সঙ্গীতই সাধারণ গায়কের মুখে সুশ্রাব্য হয় না। সঙ্গীতের অনুকরণ প্রবৃত্তিতে সাধারণ লোকের একটা প্রবল পিপাসা। অনেক নিকৃষ্ট সঙ্গীতও ভাল গায়কের কাছে শুনলে লোকে সেটাকে শিখে ফেলে ও যখন তখন আবৃত্তি কর্‌তে থাকে। তাই সঙ্গীতকলাবিৎ উত্তম গায়কদের উচিত, সব সময় সমাজে রুচিসম্পন্ন উচ্চ শ্রেণীর সঙ্গীতগুলো লোককে শোনানো। সমাজে উত্তম গায়কদের স্থান বাস্তবিক দায়িত্বপূর্ণ এবং সঙ্গে সঙ্গে উচ্চ।

আমরা এখানে আর একটি বিষয়ের আলোচনা করে' এই প্রবন্ধের উপসংহার কর্‌ব। যদিও গত মাসে খণ্ডকবিতার (Lyric) কথা কিছু বলা হয়েছে তা'হলেও এস্থলে তার কথঞ্চিৎ পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন। একটা প্রশ্ন হ'চ্ছে, —উৎকলী ভাষায় খণ্ডকবিতা (Lyric) পূর্ব্বে আদৌ ছিল কি না? একজন উৎকলী লেখক সম্প্রতি লিখেছেন যে— প্রাচীন উৎকলী সাহিত্যে লিরিক ছিল না, বর্ত্তমান যুগে কেবলমাত্র আরম্ভ করা হয়েছে। এই মত নিতান্ত অসমীচীন। যাঁরা প্রাচীন উৎকলী সাহিত্যে অভিনিবিষ্ট হবেন তাঁরাই দেখ্‌বেন যে সেকালের প্রায় বারো আনা কবিতাই লিরিক। লিরিক কি? যে কবিতা ভাবনাত্মক, যাতে একটি বিশেষ চিন্তার পূর্ণ অবতারণা হ'য়ে থাকে, যার ভাষা তরল, সঙ্গীতময় ও সুবোধ্য—আর যাকে গান কর্‌তে পারা যায়। এই নিয়মগুলির সঙ্গে মিলিয়ে দেখ্‌লে জানা যাবে যে প্রাচীন কবিতাগুলির অধিকাংশই লিরিক। উৎকলের প্রাচীন "ছান্দ"গুলি এক একটি লিরিক। অসংখ্য সঙ্গীতও আছে—সেগুলিতেও লিরিকের সমস্ত গুণ ও নিয়ম বর্ত্তমান। সামন্ত সিংহার, কবিসূর্য্য বলদেব, গোপালকৃষ্ণ, বনমালী প্রভৃতি বিখ্যাত লিরিক লেখকগণের নাম এস্থলে বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য। উপেন্দ্র ভঞ্জ, দীনকৃষ্ণ,—এঁরাও লিরিক লেখক হিসাবে কম পারদর্শী ন'ন। আজকাল ভক্তকবি দেবদুর্ল্লভ দাস একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ লিরিক লেখক হ'য়ে উঠেছেন। প্রাচীন উৎকলী সাহিত্যের যে কোন দিকে দৃষ্টিপাত কর্‌লে দেখা যায় লিরিকের সংখ্যাই বেশী। এতেও যদি কেউ এর প্রতিবাদ করেন তবে তাঁকে নিতান্ত ভ্রান্ত বলে' স্বীকার কর্‌তে হবে। এখন আধুনিক ও প্রাচীন লিরিকের সঙ্গে তুলনা কর্‌লে দেখা যায় আধুনিক লিরিক প্রাচীন লিরিকের সমকক্ষ নয়। প্রাচীন লিরিকও আধুনিক লিরিকের মত হৃদয়ের সূক্ষ্ম প্রবৃত্তি অর্থাৎ প্রীতি, স্নেহ, দয়া ইত্যাদি গুণ ও কোমল রসের আধার। এ ছাড়া প্রাচীন লিরিকে বিভিন্ন রস যত পাওয়া যায় আধুনিক লিরিকে তত যায় না। আবার আধুনিক লিরিকগুলো কতকগুলি কারণে প্রকৃত লিরিক নামেরই যোগ্য নয়। গীতযোগ্য হওয়া লিরিকের একটা প্রধান গুণ, কিন্তু সে গুণ আধুনিক লিরিকে বিরল। প্রাচীন লিরিক তা অক্ষুণ্ণ রেখেছে। প্রাচীন যুগে অনেক সঙ্গীতস্বর সৃষ্ট হয়েছে যা স্বতঃই লিরিক স্বর। আজকাল আর উৎকলী ভাষায় কেউ লিরিক-স্বর সৃষ্টি কর্‌ছেন না। বিশেষ আবশ্যক হ'লে উৎকলীরা বাংলা, হিন্দী, তামিল কিম্বা তেলেগু ভাষা থেকে সে সকল সংগ্রহ করে' থাকেন। যাঁরা বলেন পূর্ব্বে লিরিক ছিল না আমরা তাঁদের একবার ভাল করে' প্রাচীন উৎকলী সাহিত্যের প্রতি সশ্রদ্ধ দৃষ্টি ফেরাতে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করি।

কাক-জ্যোস্‌নায়

বন্দে আলী

তোমারে ফিরায়ে পেনু বরষার অগ্র-মেঘ সাথে,
আধো ছায়া আধো আলো কাক-জ্যোস্‌নায়—
এলে আজ মোর আঙিনাতে।
দূরের পথিক বেশে, হে অতিথি এলে দ্বারে,
নাহি মোর কোনো আয়োজন;
রিক্ত বক্ষ-বাস মেলি' ভিখারীর সাজে এ যে
কাঁদে মোর বিরহী ভবন।
ভেবেছিনু কাছে বসি' জীবনের কাঁদা-হাসা
একে একে কহিব সকলি,
কহিব মনের কথা,—গূঢ় মগ্ন-মন মোর
যারে তুমি গেছ পায়ে দলি'!
তোমার পায়ের তলে ফুল ওঠে বিকশিয়া—
স্থলশতদল দল মেলি';
বাজে বাঁশী, ফোটে গান,—নিখিলের কামনারে
জয় যেন করো অবহেলি'!

সেদিন তোমার মুখে পড়েছিলো সবটুকু আলো—
মুখের রহস্য-হাসি,—কেশের সৌরভ তব,
বড় মোর লাগিল যে ভালো!
আমারি সমুখে বসি' পড়েছো নয়নে মোর
যে-পিপাসা—কাহার লাগিয়া?
এতদিন পরে বুঝি মোর তরে জাগিয়াছে
ও' কঠিন অকরুণ হিয়া।
তোমার সমুখে আজ আলো রেখে নিরিবিলি
দেখিবারে চাহি মুখখানি,
নিজেরে ঢাকিয়া তুমি আমারে দেখিতে চাহো
সে-আলোরে আব্‌ডালে আনি'।
সেদিনের সব কথা মনে পড়ে বেদনায়—
দুঃখময় সুখের স্বপন;
আমার চোখের জল সেদিন দখনি চেয়ে,
আজি অশ্রু করিছ গোপন!

তুমি হাতে তুলে' মোরে দিলে আজি যেই মধুফল
তাহার আস্বাদ ল'য়ে বিহ্বল অন্তর মোর—
যৌবনের ভাবনা চঞ্চল।
ভেবেছিনু কবো আজ না-বলা বিষের ব্যথা—
অকথিত সুগোপন বাণী;
পাষাণ বলিয়া নিজে করেছো গরব হেসে
—ঝরণা রয়েচে তা'য় জানি।
তোমারে একেলা পেয়ে কিছুই হ'লো না বলা,
কোনো কথা ফুটিল না ভাষে,
তোমার মুখেতে চাহি' ভুলে গেনু সব দুখ
—তুমি মোর বসেচো যে পাশে!
রাঙা চুমা ভরে' দিলে মোর দুটি করতলে
আমি ছাড়া জানিবে না কেহ,
তোমার হাসির তা'য়—পরশের ছন্দে শুধু
পরিপূর্ণ হ'ল গেহ—দেহ।

তোমারে বিদায় দিনু বরষার ভরা-মেঘ সাথে,—
আলোহীন আঁধারেতে সুদূরের পথ ধরি'
চলে' গেলে আধ্‌-প'র রাতে।

ভুত-ভারতী

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

শ্রী সুধীরকুমার চৌধুরী বি-এ

বেচারা নিত্যগোপাল! এত বেশী এ-জিনিসটাকে যে ভয় পেত, বেছে বেছে শেষটা তারই এই অবস্থা! ভয় পাওয়া দূরে থাক্, নিজেকে সর্ব্বনাশের মুখে সঁপে' দিয়েও আজ আনন্দই অনুভব কর্ছে সে!

হঠাৎ একদিন সমস্ত দিন এবং সমস্ত রাত তার মূর্চ্ছা ভাঙ্‌ল না। পরদিন তার জ্ঞান ফিরে এল, কিন্তু বুঝ্‌তে পার্‌লাম, সে চোখে কিছু দেখ্‌ছে না, কানেও কিছু শুন্‌ছে না কয়েকবার ঐ কথাটাই সে বল্‌লে, আর কিছু বল্‌তেও পার্‌ল না। দু'তিন জন ভালো ডাক্তার এনে দেখালাম, কিন্তু কেউ কিছু বল্‌তে পার্‌ল না। তৃতীয় দিনে সন্ধ্যার দিকে হঠাৎ নিজে থেকেই তার শ্রবণশক্তি ফিরে এল, হাঁ-না করে' সে কথার জবাব দিতে লাগ্‌ল। কিন্তু দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেতে বেশ কিছুদিন লাগ্‌ল। যখন সবদিক্ দিয়ে সে বেশ সুস্থ স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আস্‌ছে তখন হঠাৎ আবার একদিন মূর্চ্ছিত হ'য়ে পড়্‌ল। সেই দ্বিতীয় মূর্চ্ছা যখন ভাঙ্‌ল, তখন অসুস্থতার কোনো চিহ্ন কোথাও রইল না বটে, কিন্তু যে সুস্থ মানুষটা জাগ্‌ল সে নিত্যগোপাল নয়, কোকোজী।

পাঁচ দিন একটানা নিত্যগোপালের দেহকে আশ্রয় করে' কোকোজী বেঁচে রইল। তার কোনো প্রতিবিধান আমরা কর্‌তে পার্‌লাম না। তবু যথাসম্ভব তাকে চোখে চোখে রাখ্‌লাম। সে যতবার Normaর বাড়ীতে Phyllisএর সঙ্গে দেখা কর্‌তে গেল, আমরা সঙ্গে গেলাম। Phyllisও অবসর-মতো আমার বাড়ীতে এসে তার সঙ্গে গল্পগুজবে কাটিয়ে যেতে লাগ্‌লেন। প্রতিকার কিছু কর্‌তে পার্‌ব না জেনেই তাতে আর আমরা কোন বাধা দিলাম না। ছয় দিনের দিন ভোরে ঘুম ভেঙে নিত্যগোপাল আবার বিছানা ছেড়ে উঠ্‌ল।

আমি বল্‌লাম, "ব্যাপার ক্রমেই গুরুতর হ'য়ে দাঁড়াচ্ছে। হয় তুমিই দেশে ফিরে যাও, নয়ত তোমার মাকে আমরা খবর দিয়ে এখানে আনাচ্ছি, তোমার যা বল্‌বার তাঁকেই তুমি বল্‌বে।"

সে বল্‌লে, "মা বেচারী বেশ আছেন, মিছিমিছি তাঁকে তোমরা ভয় পাওয়াবে।"

আমি বল্‌লাম, "তা হোক্, তাঁকে ভয় পাওয়ানোই এখন দরকার।"

সে বল্‌লে, "যা তোমাদের খুসি কর্‌তে পার। কিন্তু এটা জুন মাস, বুড়ো মানুষকে ঝড়ের সমুদ্র পাড়ি দিয়ে আস্‌তে বলা কতখানি সুবিবেচনার কাজ হবে সেটাও তোমরাই ভেবে দেখো।"

আমরা তবু তার মাকে আনানোই স্থির কর্‌লাম, এবং ব্যাপারটা যথাসম্ভব সংক্ষেপে বিবৃত করে' তাঁকে চিঠি লিখ্‌লাম। বিলেতের বিখ্যাত spiritualistদের যে আড্ডাগুলো জানা ছিল, Stead Bureau, London Spiritual Alliance, Psychic College প্রভৃতিকে চিঠি লিখে তাদের পরামর্শ চাইলাম। তারপর নিজেরা সারাক্ষণ সতর্ক হ'য়ে নিত্যগোপালের উপর চোখ রাখ্‌তে লাগ্‌লাম। তার প্রকৃতিস্থ অবস্থায় দু'তিন জন বৌদ্ধ 'ফুজি' ও 'পোনা' ওঝা ডেকে এনে তাকে দেখালাম, একদিন স্ট্র্যাণ্ড হোটেলে একজন professional ইংরেজ spiritualistএর কাছেও তাকে নিয়ে গেলাম, কিন্তু কিছুতেই কোনো ফল হলো না। কোকোজী আবার এল এবং এবারে পাঁচ দিন নয় বারো দিন একটানা সে রইল।

একদিন নিজে থেকেই সে আমায় বল্‌লে, "তোমাদের ভয় পাওয়াটা কি এবার কিছু কমেছে?"

আমি বললাম, "ভয়ের জিনিসটা ঘাড়ে এসে পড়লে লোকে আর তাকে ভয় করে না। কিন্তু এটা কি তোমার উচিত হচ্ছে?"

সে বললে, "উচিত-অনুচিতের বিচার মৃত্যুর পরপারে এসে ঠিক তোমাদের দৃষ্টি নিয়ে করা যায় না।"

আমি বললাম, "তোমার বিচারের কথাই বলছি।"

সে বললে "যাতে করে' দুদিকই বজায় থাকে তার ব্যবস্থা আমি করব। এই ক'দিন তোমরা ভালো করে' আমার সঙ্গে কথা বলনি, অথচ Phyllisএর পর তোমাদের বন্ধুত্বের আকর্ষণই জীবনের প্রতি সবচেয়ে বড় আকর্ষণ আমার ছিল। তোমাদের দুঃখ দিতে আমি চাই না।"

আমি বললাম, "নিত্যগোপালের মা আর দু'চার দিনের মধ্যেই এসে পড়বেন, তখনো কি এই অবস্থাটাই চলবে?"

সে বললে, "ঠিক এ অবস্থাটা চলবে না, তারই চেষ্টা কিছুদিন ধরে' আমি করছি। তার মায়ের কাছে নিত্যগোলের এই শরীর নিত্যগোপালেরই থাকবে, বাকী সময়টা প্রয়োজনানুযায়ী এ দেহের অধিকার আমার। ইচ্ছামতো আসা-যাওয়া করবার ক্ষমতা ইতিমধ্যেই আমার অনেকটা বেড়ে গিয়েছে তা ত দেখতেই পাচ্ছ।"

আমি বললাম, "তোমার যে রকম অভিরুচি!"

তারই তিন দিন পরে দেশ থেকে নিত্যগোপালের মা এসে পৌঁছলেন। সঙ্গে দেশের বহু বিখ্যাত অবিখ্যাত কবিরাজদের বিধানপত্র, অবধৌতিক মাদুলী, স্বপ্নাদ্য ঔষধ ইত্যাদি রাশীকৃত তিনি নিয়ে এলেন। কিন্তু সে সমস্ত সত্ত্বেও নিত্যগোপালের দেহে কোকোজীর আনাগোনা যথানিয়মে চলতে লাগল। কিন্তু নিজের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী যতক্ষণ নিত্যগোপালের মা কাছে থাকতেন ততক্ষণ কোকোজী আসত না, এবং যখনই আসত আমার বাড়ী ছেড়ে সে চলে' যেত। প্রায়ই রাত বারোটা একটা বাজিয়ে সে Normaর বাড়ী থেকে ফিরে আসত, অবশ্য যে ফিরত সে নিত্যগোপাল। Reggieও Normaর বাড়ীর আড্ডাতে গিয়েই এর পর জুটল। তার কাছে শুনলাম, সে বাড়ীতে আড্ডা জমাবার একটা সুবিধা এই যে সেখানে পানীয় দ্রব্য আমদানী করতে কিছু বাধা নেই।

এই অবস্থাটাই যখন প্রায় নিয়মের মধ্যে দাঁড়িয়ে গেল, তখন একদিন মাকে নিয়ে নিত্যগোপাল তার পুরনো পরিত্যক্ত বাড়ীটাতে ফিরে গেল। আমি বললাম, "আরও কিছুদিন থেকে গেলে হ'ত না?"

সে বললে, "কি দরকার? যতটা তোমাদের জ্বালিয়েছি, তাই ত ঢের।"

আমি একটুক্ষণ চুপ করে' থেকে বললাম, "তুমি ঠিক জানো তোমার ভয় করবে না?"

সে বললে, "ভয়টা যে কেটেছে তার থেকেই ত প্রমাণ হচ্ছে যে কোকোজী আমার সত্যিই কত বড় বন্ধু। আজ বহুদিন পরে আবার সহজ স্বাভাবিক মানুষের মতো বোধ করছি।"

তারপর আমাকে আড়ালে ডেকে নিয়ে বসে' বললে, "একটা কথা তোমাকে কিছুদিন ধরে' বলব মনে করছি, কিন্তু একটু ভালো করে' না দেখে বলতে সাহস হয়নি। কিছুদিন ধরে' নিজের মনের মধ্যে একটা আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন আমি লক্ষ্য করছি। আমি ঠিক সেই আগের মানুষ ত আর নেইই, সারাক্ষণ যে একটা ভয়ের ভাব নিয়ে কাটাতাম সেটা গিয়েছে, মনের জোর ফিরে এসেছে, কাজের উৎসাহ বেড়েছে, আমার সেই inferiority complexএর বদলে এখন মনে হচ্ছে পৃথিবীকে কিছু একটা দেব বলেই যেন আমি জন্মেছি। আমি এও লক্ষ্য করেছি যে সব-বিষয় সম্বন্ধে আমার মনটায় সজাগ-সচেতন ভাব আর আমার বুদ্ধির প্রাখর্য্য পর্য্যন্ত এই ক'দিনে বহুগুণ বেড়ে গিয়েছে। কিন্তু সেটা বিশেষ কিছু নয়। আসল যে পরিবর্ত্তনটা হয়েছে আমার মধ্যে তার কথাই তোমাকে জানাতে চাচ্ছি।"

এই পর্য্যন্ত বলে' একটু চুপ করে' থেকে আবার সে বলতে লাগলো, "তোমার মনে আছে, প্রথমটা তোমরা যখন Seanceএ বসতে এবং আমার trance হ'ত, জেগে উঠে কোনো কথাই আমার মনে থাকত না? এই অবস্থাটা অনেকদিন পর্য্যন্ত চলেছিল। কিন্তু কিছুদিন থেকে tranceএর সময়ে যা যা ঘটে তার বেশ অনেকখানিই আমার মনে থাকছে। যতক্ষণ আমার শরীরটা অধিকার করে' কোকোজী থাকে,

আমি যেন তখনো একেবারে সে শরীরের অধিকার ছেড়ে যাই না, মস্তিষ্কের কোন্ একটা ছোট কোণ অধিকার করে' আমিও যেন জেগে থাকি। সে যা করে বা বলে বা ভাবে, তার ওপর সাক্ষাৎভাবে আমার কোনো হাত থাকে না, কিন্তু আমি সেগুলোর সাক্ষী থাকি এবং কোকোজী চলে' যাবার পরে তার অনেকখানিকেই আমি মনে আন্‌তে পারি। কেবল তাই নয়। আমার মনে হয়, এই শরীরটাকে অধিকার করে' আমি নিজে যখন থাকি, তখনও আমার মধ্যে কোনো একটা জায়গায় কোকোজীকে আমি বহন করি। আমার কোনো স্বাধীনতায় সে-সময়টা সে হস্তক্ষেপ করে না, কিন্তু আমি কোথায় কি রকম ব্যবহার করলে সে সুখী হয় তা আমি স্পষ্ট বুঝ্‌তে পারি, এবং তদনুযায়ী ব্যবহার স্বেচ্ছাক্রমেই অনেক সময় আমি করে' থাকি। কোকোজীর বিগত জীবনের আশৈশবের অনেক স্মৃতি খুব সহজেই এখন আমি মনে আন্‌তে পারি, মাঝে মাঝে কোন্‌গুলো যে আমার জীবনের স্মৃতি এবং কোন্‌গুলো কোকোজীর তাই নিয়ে আমার গোল বাধে। মোটকথা, এই শরীরটার মধ্যে এখন একসঙ্গে একই সময়ে দুটো মানুষ বাঁচ্‌ছে, তাদের একজন নিত্যগোপাল, আর একজন কোকোজী।"

এর পর আবার কিছুদিন পরে তার সঙ্গে যখন দেখা হলো সে বল্‌লে, "এসো বন্ধু! কিন্তু এবারে আর দুজনের হয়েও তোমাকে অভিবাদন করছি না, আমার মধ্যে দুটো personality আস্তে আস্তে মিলে এক হ'য়ে গিয়েছে। নিজের খুসিমতো আমাকে নিত্যগোপাল বা কোকোজী যখন যা ইচ্ছা মনে করতে পার। কিন্তু তুমি একবারও আসনি কেন এতদিন?

আমি বল্‌লাম, "আসতে সাহস হয় নি। বন্ধুত্বের জায়গায় একজনের মন রেখে চলাই যথেষ্ট শক্ত, একসঙ্গে দুজনের মন রেখে চল্‌তে যে পারব সে ভরসা একেবারেই করিনে।"

সে বল্‌লে, "কেন কর না? নিত্যগোপাল এবং কোকোজী দুজনেই ত তোমার বন্ধু ছিল?"

আমি বল্‌লাম, "যে যতদিন তারা আলাদা ছিল। তখন একজনের ওপর রাগ হ'লে অপরের কাছে তাই নিয়ে নালিশ চল্‌ত। কারুর প্রতি মনের টানের কমিবেশী হ'লে সেটা গোপনে প্রকাশ করতে কোনো বাধা ছিল না। কিন্তু এর পর সারাক্ষণ ওজন করে' কথা বল্‌তে হবে, কোকোজীকে বাদ দিয়ে নিত্যগোপাল বা নিত্যগোপালকে বাদ দিয়ে কোকোজীকে কিছু বলা চল্‌বে না, একজনকে বাদ দিয়ে আর-একজনের জন্য কিছু করা চল্‌বে না।"

সে হোঃ হোঃ হোঃ করে' হেসে উঠ্‌ল, বল্‌লে, "সে অসুবিধাটা কি আমার চেয়ে তোমার বেশী হবার কথা? আমারও অসুবিধা হ'ত যতদিন মানুষ দুটো আমার মধ্যে আলাদা ছিল। কিন্তু তোমাকে বল্‌ছি কি তা হ'লে? এক অর্থে নিত্যগোপাল ও কোকোজী দুজনেরই আজ মৃত্যু হয়েছে। দুজনকে মিলিয়ে এক করে' আমার মধ্যে নূতন একটা মানুষের জন্ম হয়েছে। সেই নূতন মানুষটাকে ভালোবাস্‌তে চেষ্টা কর, দেখ্‌বে কোনো অসুবিধাই হবে না।"

ঘণ্টাদুই তার সঙ্গে বসে' গল্পগুজবে কাটিয়ে তার এ কথার সত্যতা মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করলাম। মনে হলো সত্যই নিত্যগোপাল ও কোকোজী উভয়ের মধ্যকার যা-কিছু ভালো, যাকিছু ভালোবাসার যোগ্য তাই মিলিয়ে এই নূতন মানুষটার সৃষ্টি হয়েছে। কোকোজীর দর্প আর নিত্যগোপালের inferiority complex দুইই চলে' গিয়ে একটি সুন্দর আত্মপ্রতিষ্ঠ আত্মনির্ভরের ভাব তার স্থান অধিকার করেছে, অন্তরের তেজটা আছে কিন্তু তার ওপরকার রূঢ়তার খোঁচাগুলো আর নেই। মনে হলো একটি নিবিড় আত্মিক মিলনের মধ্যে ব্রহ্মদেশের দুঃসাহস আর ভারতবর্ষের ধৈর্য্য, ব্রহ্মদেশের বেহিসাব আর ভারতবর্ষের কৃচ্ছ্রসাধন, ব্রহ্মদেশের উচ্ছৃঙ্খলতা আর ভারতবর্ষের শাসন এই মানুষটিতে একসঙ্গে হ'য়ে মিলেছে।

নিত্যগোপাল আগে ছবি আঁকত, ভারতশিল্প ছিল তার রীতি এবং ভারতবর্ষ ছিল তার প্রেরণা, ব্রহ্মদেশে সে ছবির কোনো আদর ছিল না। এখন সে ছবি আঁকে, তার প্রেরণা জোগায় ব্রহ্মদেশ আর তার রীতিটিও ঠিক ভারতবর্ষীয় আর নেই, সেটা ব্রহ্মদেশের প্রভাবে অনেকখানি প্রভাবান্বিত, কিন্তু সব জড়িয়ে একেবারে তার নিজস্ব। তার আশ্চর্য্য প্রতিভার সমাদর এখন চতুর্দ্দিকে, তার নাম এখন শিল্পরসিকদের মুখে মুখে।

কোকোজীর বাড়ীর সান্ধ্য আড্ডাটা এর পর নিত্য-গোপালের বাড়ীতে জমতে লাগ্‌ল। তার দু'একজন আটিষ্ট বন্ধুর সমাগমে আমাদের কিঞ্চিৎ দলবৃদ্ধি হলো। Reggie আসে, Phyllis ত আসেনই আর আসেন Normal;—spiritualism-এর চর্চ্চাটা আর হয় না, কবিতা, শিল্প, সাহিত্য, এ সমস্তের আলোচনা নিয়েই আসর সরগরম হ'য়ে থাকে। তাছাড়া আর একটা যে বিষয়ের আলোচনা হয় সেটা হয় আসরের বাইরে, গোপনে গোপনে। কিন্তু গোপনে হলেও সেটা আমাদের চোখ এড়ায় না, তাই Reggie যেদিন বারান্দা থেকে Normaকে একহাতে জড়িয়ে ধরে' ভেতরে এনে তার ভাবী পত্নীরূপে তাঁকে সকলের সঙ্গে পরিচিত করিয়ে দিলে সেদিন আমরা একটুও অবাক্ হলাম না। আরও আগেই সে ব্যাপারটা ঘট্‌বে বলে' আমরা আশা করে-ছিলাম।

কিন্তু সত্যিই একটু অবাক্ হলাম যেদিন শুনলাম, Phyllisও নিত্যগোপালকে বিয়ে কর্‌তে রাজি হয়েছেন আর নিত্যগোপালের বুড়ী মায়ের তাতে অমত নেই। Reggie আর Norma খুব উচ্ছ্বাসের সঙ্গে এসে খবরটা দিয়ে গেল, কিন্তু আমার কেমন যেন জিনিসটা ভালো লাগ্‌ল না। যদি সত্যিই নিত্যগোপাল নিজে হ'ত ত নিশ্চয়ই খুব খুসি হতাম,—কিন্তু এই ভূতুড়ে বিয়ে!

এর পর অবস্থাবৈগুণ্যে রেঙ্গুনের বাস উঠিয়ে কল্‌-কাতায় ফির্‌বার আয়োজনে কিছুদিন আমার অত্যন্ত ব্যস্ত থাক্‌তে হলো, অত্যন্ত ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও নিত্যগোপালের বাড়ীর আড্ডায় কয়েকদিন যেতে পার্‌লাম না। একদিন আল্‌মারী থেকে বই নামিয়ে সেগুলোকে গুছিয়ে বাক্সে বোঝাই কর্‌তে গিয়ে দেখি, এক সার বইয়ের পেছনে আল্‌-মারীর গায়ে তিনখানি মাঝারি রকম মোটা খাতায় কোকোজীর একটি ডায়েরী! মৃত্যু নিশ্চিত জেনে মৃত্যুর পূর্ব্বে নিজের শৈশব থেকে সমস্ত ইতিহাস তাতে সে গুছিয়ে লিখ্‌ছিল, একেবারে শেষ হয়নি। প্রথম খাতাটার মাঝ-খানে একটুক্রা একটি চিঠি:—

"নিত্য, বইটা কাছছাড়া কোরো না, আর কাউকে দেখ্‌তেও দিও না, পড়ে' যত শীগ্‌গির পার ফিরিয়ে দিও। শেষ করে' যাবার সময় যেন পাই।—কোকোজী।"

দরজার খিল লাগিয়ে শুয়ে শুয়ে সমস্ত দিন ধরে' কম্পিত-বুকে ডায়েরীর আদ্যোপান্ত পড়্‌লাম। নিত্যগোপালের মধ্যেকার দুটো মানুষের রহস্য উদ্ঘাটিত হ'য়ে গেল। Suffolk-এর Walberswick-এ বেড়াতে যাওয়া থেকে Health Exhibition-এ Reggieকে অতি গোপনে বলা সেই কথা, এমন কি Phyllis-এর জন্যে ডাক্তারের ব্যবস্থা দেওয়া gland extractটির রহস্য পর্য্যন্ত বুঝ্‌তে আর আমার বাকী রইল না।

উত্তেজনায় বুক কাঁপ্‌ছিল, এর পর রাগে আমার সমস্ত শরীর কাঁপ্‌তে লাগ্‌ল। লক্ষ্মীছাড়া বাঁদর, ওর জন্যে এত করেছি, আর শেষে ওই কি না এমন ভাবে আমাকে বোকা বানাল। কত বড় দুশ্চিন্তার দুর্ভোগই না দিনের পর দিন ঐ হতভাগাটার জন্যে আমাকে ভুগ্‌তে হয়েছে! বাইরে ভালোমানুষ সেজে থাক্‌ত, ভেতরে ভেতরে এতবড় বজ্জাতি। ভূতের ভয়টয়গুলো পর্য্যন্ত সব ওর মিথ্যে, কেবল আমাদের চোখে ধূলো দেবার জন্যে ভড়ং। উঃ, একদিন নয়, দুদিন নয়, কতবড় বদমায়েসী ভেতরে থাক্‌লে সকলের চোখে ধূলো দিয়ে এমন অভিনয় মাসের পর মাস গুছিয়ে মানুষ কর্‌তে পারে! সুন্দর মুখ দেখে কাণ্ডজ্ঞান লোপ পেয়েছে, তাই এম্‌নিতে পাত্তা পাবে না জেনে কোকোজীর ভূত সেজে হতভাগা তাঁর বিধবা স্ত্রীকে বিয়ে কর্‌তে চলেছে। কিন্তু কোকোজীর ভূত সত্যিই কি নেই? পার্‌ল না একদিন ওকে ধরে' ওর গলাটা টিপে দিতে।

কাঁপ্‌তে কাঁপ্‌তেই ডায়েরীগুলো বগলে করে' পথে বেরোলাম। ঠিক কর্‌লাম সেখানে Phyllis, Reggie, Norma এবং তার জন্য সমস্ত admirerদের সামনেই ওর সমস্ত চালাকী আমি ধরিয়ে দেব। তখন সন্ধ্যা, বেশ অন্ধকার হ'য়ে এসেছে। রেঙ্গুনে সূর্য্যাস্তের পর অন্ধকার হ'য়ে যেতে বেশী দেরি লাগে না। দূর থেকেই দেখ্‌লাম, তার বাড়ীর সব ক'টা জানালায় আলো জ্বলছে। সিঁড়িতে উঠ্‌বার পথে ছাদে দেয়ালে সর্ব্বত্র নানাবর্ণের উৎসব-সজ্জা। নীচে দাঁড়িয়ে উপরের উৎসব-কোলাহল অস্পষ্ট করে' শুনতে লাগ্‌লাম, পিয়ানোর সঙ্গে বেহালার

সঙ্গীত কানে আস্‌তে লাগ্‌ল। একটু দূরে সরে' গিয়ে অন্ধকারে নিজেকে যথাসাধ্য আড়াল করে' দাঁড়ালাম। সেখান থেকে বস্‌বার ঘরের মধ্যেটা অনেকখানি দেখ্‌তে পাওয়া যাচ্ছিল। দেখ্‌লাম, চতুষ্পার্শ্বের বন্ধুদের মিলিত মুগ্ধদৃষ্টির মাঝখানে শরৎপ্রভাতের প্রজাপতির মতো Phyllisএর নৃত্য হচ্ছে। আজ আর বেহুলার নৃত্য নয়, আজ এ নৃত্যশীলা অগ্নিশিখা,-আজ আর সে কামনা করে না, কাম্যকে আজ সে দর্পের সঙ্গে গ্রহণ করে। তার সেই প্রদীপ্ত কামনার তেজের সম্মুখে আমার রোষবহ্নিকে আমি স্থাপিত কর্‌তে পারি সে তপোতেজ আমার কোথায়? নিজেরই অজ্ঞাতে হাতের ডায়েরীগুলোর উপরে আমি কোঁচার কাপড়টা টেনে দিলাম।

যখন বাড়ী ফির্‌লাম তখন রাত বেশ অনেকখানি হয়েছে। না খেয়েই গিয়ে দরজা বন্ধ করে' আলো নিবিয়ে শুয়ে পড়্‌লাম। অনেকক্ষণ স্থির হ'য়ে কিছুই ভাব্‌তে পার্‌লাম না, ভারাক্রান্ত মাথাটির মধ্যে রাশি রাশি বিচ্ছিন্ন চিন্তা উল্কার মতো ছুটোছুটি কর্‌তে লাগ্‌ল। কোকোজী, Phyllis, Reggie, নিত্যগোপাল, সকলের সঙ্গে প্রথম-পরিচয়ের দিন থেকে সুরু করে' আজ পর্য্যন্ত সহস্র দিনের স্মৃতির টুক্‌রা ঘূর্ণীপাকে কাগজের টুক্‌রার মতো জট পাকিয়ে ঘুর্‌তে লাগ্‌ল। মনটা একটু স্থির হ'লে ভাব্‌তে লাগ্‌লাম, বেচারী Phyllis! অদৃষ্ট তাকে নিয়ে কি নিষ্ঠুর খেলাই না খেলছে! কোকোজীর অকালমৃত্যুর পরে, সত্যিকারের tragedy যেটা সেটা ত Phyllisএরই জীবনে, তারই মনের মধ্যে,—বাকীটা এই পৃথিবীর অতি সাধারণ একটা দুর্দ্দৈব। যার জন্যে তিনি স্বদেশ স্বজন অবলীলায় ছেড়ে এই সুদূর নির্ব্বাসনকে বরণ করেছিলেন, কোনো দুঃখকে দুঃখ মনে করেন নি, কোনো দুর্গতির ভয়ে পেছপা হননি, সে তো তাঁর স্বামী মাত্রই কেবল ছিল না, সে একাকীই তাঁর মনের মধ্যে তাঁর স্বদেশ স্বজন, তাঁর সমস্ত সুখ-আশা, জীবনের প্রতি তাঁর সমস্ত অনুরাগের মর্ম্মস্থানটিকে অধিকার করেছিল। স্বামীকে হারিয়ে তাঁর মতো সর্ব্বহারা ক'জন মানুষে হয়? তাঁর দুঃখ, তাঁর নিরাশার তুলনা নেই বলেই ত এত সহজে নিত্যগোপাল তাঁকে প্রবঞ্চনা করতে সমর্থ হয়েছে। কোথাও আর কোনো অবলম্বন তাঁর নেই বলেই ত যে-জিনিষ মানুষের সহজ বিচারবুদ্ধির অতীত তারও ওপরে এমন ঐকান্তিক ভাবে তাঁর নির্ভরকে তিনি স্থাপন করেছেন। তাঁর এই সুন্দর মিথ্যার আশ্রয়টিকে কোন্ প্রাণে আমি নষ্ট কর্‌ব? ভুলেও তিনি যদি একটুখানি সান্ত্বনা পান কেন আমি তাঁকে তা পেতে দেব না? না দেবার কি অধিকারই বা আমার আছে? যে সত্যকে নিদারুণ নিষ্ঠুর আঘাতে আমি উন্মোচিত কর্‌তে চাচ্ছি, তাঁর সুন্দর জীবনটির সার্থকতার মূল্য কি তার চেয়ে কম?

পাছে কোথাও ভুলে নিজেকে প্রকাশ করে' ফেলি সেই ভয়ে কলকাতায় আস্‌বার আগে তাদের সঙ্গে আমি দেখাও কর্‌লাম না। যদিও অত্যন্ত ইচ্ছা হচ্ছিল, Phyllis সুখী হয়েছেন চোখে সেটা একবার অন্ততঃ দেখে আসতে।

তাদের বিয়ে হ'য়ে গেল কি না?

তারপর কল্‌কাতায় এসেছি আমি আজ দিন-পঁচিশেকের বেশী নয়। একদিন বালিগঞ্জের দিকে বেড়াতে গিয়ে দেখি, ষ্টেশনের খুব কাছে একটা একতলা বাড়ীর বারান্দায় একটা ইজিচেয়ারে শুয়ে রোদ পোয়াচ্ছে কোকোজী! নিশ্চয় দিনের আলোকার পোলা আলোয় ভূত দেখ্‌ছি না ঠিক করে' চলেই আস্‌ছিলাম, এমন সময় পিছন থেকে নারীকণ্ঠে কে আমার নাম ধরে' ডাক্‌লে। ফিরে দেখি Phyllis ছুটে আস্‌ছেন!

বল্‌লাম, "কি ব্যাপার?" বিস্ময়ে আমার বাক্‌রোধ হবার উপক্রম হ'ল!

তিনি বল্‌লেন, ভূতুড়ে ব্যাপার নয়। আসুন, সবই জান্‌তে পার্‌বেন।"

আমি দোরগোড়ায় পা দেবা মাত্র কোকোজী বল্‌লে, "আমার স্ত্রীকে এতটা রাস্তা এই রোদে তোমার পিছন পিছন না ছুটিয়ে তোমাদের জাতের আশ্চর্য্য gallantryর পরিচয়টা না হয় একটু কম করেই দিতে!" তারপর স্মিতমুখী Phyllisএর দিকে চেয়ে বল্‌লে, "Phyllis, ও sausage খেতে ভালবাসে তা ভুলো না যেন, আর mayonnaise দিয়ে ডিম। হ্যাঁ, আর তুমি নতুন যে lemon frietা কর্‌তে শিখেছ সেইটে।"

আমি বললাম, "হঠাৎ আলাদীনের প্রদীপের সন্ধান পেয়েছ না কি কোথাও?"

সে বললে, "প্রদীপ গোড়াগুড়িই ছিল, মরচেটা সম্প্রতি কেটেছে।" বলে' কলকাতার কোন্ স্কুলের একটি বাঙালী শিক্ষক পেঁপের রসের সঙ্গে আরও কি কি সব উপাদান মিশিয়ে তাকে খাইয়ে খাইয়ে প্রায় সুস্থ করে' তুলেছেন সেই ইতিহাস সে বিবৃত করলে। এখন সে কলকাতারই একটা কলেজে বেশ ভালো মাইনের চাকরী পেয়েছে।

সমস্ত দিনটা তার ওখানেই কাটল। কাকেও কিছু না বলে' রেঙ্গুন ছেড়ে চলে' যাবার পর থেকে আজ পর্য্যন্ত কবে কোথায় কিভাবে তার কেটেছে, কেমন করে' খবর পেয়ে নিত্যগোপালের সঙ্গে Phyllisএর বিয়ের ঠিক আগের দিন রেঙ্গুনে গিয়ে হাজির হ'য়ে সে তাঁকে উদ্ধার করে' কলকাতায় নিয়ে এসেছে, এখানে কি করে' তাদের চলছে, খুঁটিনাটি শুদ্ধ সব তার কাছে শুনলাম।

বললাম, "কিন্তু তোমার সেই চিঠি?"

সে বললে, "সেইটুকু আমার অপরাধ। Phyllisএর ভালোবাসাকে এই সুযোগে একটু পরীক্ষা করে' নেব স্থির করেছিলাম।"

আমি বললাম, "তোমার নিতান্ত মাথা খারাপ। আর তা যদি না হয় ত Phyllisকে তুমি ভালোবাসো না। এত-বড় দুঃখ জেনে-শুনে কেউ কাউকে দিতে পাবে?"

সে বললে, "মাথা তখন আমার খারাপ হয়েছিল সেটা ঠিক। কিন্তু তখন আমার শরীরের অবস্থা এমন ছিল, যে, যে-কোনোদিন আমার মৃত্যু হ'তে পারত। যে দুঃখ Phyllisকে পেতেই হবে, তা কিছুদিন আগে তাঁকে দিলে আসল ক্ষতি কিছুই হবে না মনে করেছিলাম।"

আমি Phyllisএর দিকে একবার অপাঙ্গে তাকিয়ে নিয়ে হেসে বললাম, "পরীক্ষার ফলে কি বুঝলে?"

সে বললে, "কিছুই না। কেবল বুঝলাম স্ত্রীচরিত্র চিরকালই পুরুষের অবোধ্য। এ হওয়া খুবই সম্ভব যে Phyllis সত্যিসত্যিই নিত্যগোপালের মধ্যে আমাকে ফিরে পাবেন মনে করে' তাকে বিয়ে করতে রাজি হয়েছিলেন। কিন্তু সত্যই যে তিনি নিত্যগোপালকে ভালোবাসতেন না এবং শুদ্ধমাত্র সেই জন্যেই তাকে বিয়ে করতে যাচ্ছিলেন না তাও নিঃসংশয় ভাবে জানবার কোনো উপায় আমার নেই।"

Phyllis একমনে একটা কুশনের ওপরে রেশমের সুতায় ফুল তুলতে ব্যস্ত ছিলেন, সুতার রীলটা প্রচণ্ড বেগে এসে কোকোজীর নাকের ওপর পড়ল।

দুহাতে নাকটাকে চেপে সে চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠে পড়ল। বললে, "আর স্ত্রীচরিত্রের রহস্যে নাক ঢোকাতে যাওয়ার শাস্তিটা যে কি হয় তা ত দেখতেই পাচ্ছ।"

তারপর থেকে এখন বালিগঞ্জের সেই একতলা বাড়ীতেই আমাদের সেই পুরনো দিনের আড্ডাটা জমে। যদিও পুরনো দিনের বন্ধুরা দুজনই আর তার মধ্যে নেই। কোকোজীর ধন্বন্তরি সেই বাঙালী শিক্ষকটির সঙ্গেও আমার আলাপ হয়েছে, আপনাদের মধ্যে কারুর যদি টুবার্কুলোসিসের ওষুদের দরকার থাকে ত বলবেন, আলাপ করিয়ে দেব।

গল্প থামবার পর কিছুক্ষণ আমরা কেউ কোনো কথা কইলাম না। গল্পের ঘোরটা একটু কাটলে জীবন প্রথম কথা কইল। বললে, Reggieর সঙ্গে Normaর বিয়ে আশা করি এতদিনে হয়েছে, কিন্তু নিত্যগোপাল, তার শেষ অবধি কি হলো তা ত বললেন না?"

বন্ধু বললেন, "কোকোজীকে তার কথা জিজ্ঞেস করে-ছিলাম, বলেছিলাম, তাকে আসবার আগে আচ্ছা করে' ধরে' ঠেঙিয়ে দাওনি একদিন? সে আমার কানের কাছে মুখ এনে বললে, তারই সাহায্যে ত Phyllisএর ভালোবাসা সম্বন্ধে আমি নিঃসংশয় হ'তে পেরেছি,—তাকে চিরকাল আমি বন্ধু বলেই স্মরণ করব। তোমার বাঙালী বন্ধুরা সেখানে তাকে ব্রহ্মদৈত্য বলে' ঠাট্টা করে, কিন্তু বেচারার সত্যি কিছু দোষ নেই।"

সতীন, জীবন, হরিপদ সকলে প্রায় একসঙ্গে বলে' উঠল, "দোষ নেই কি রকম?"

বন্ধু বল্লেন, "কোকোজীর মতে নিত্যগোপাল প্রবঞ্চক নয়। যে কাজগুলোকে তার অভিনয় বলে' আমরা এখন মনে কর্‌ছি তার একটাও তার ইচ্ছাকৃত নয়। অত্যন্ত ভয়ের মুখে ভীরু nervous ধরণের মানুষের এ-রকম অবস্থা হওয়া খুবই স্বাভাবিক। তার মতে এটা একটা সত্যকারের double personalityর case। তার কল্পনার কোকোজী, ডায়েরীগুলোর সাহায্যে তার দ্বিতীয় personalityটাকে একটা খুব সুনির্দ্দিষ্ট-রকম রূপ দিয়েছিল এই মাত্র।"

সতীন্ বল্লে, "তা যদি সত্যি হয় তাহ'লে তাকে অবশ্য ক্ষমা করা ছাড়া উপায় নেই।"

জীবন বল্লে, "তা সত্যি না হলেও তাকে ক্ষমা আমি কর্‌তে পারি যদি —"

সতীন্ বল্লে, "যদি কি ?"

জীবন বল্লে, "যদি জান্‌তে পারি শুদ্ধমাত্র Phyllisএর নিরানন্দ জীবনে একটুখানি আনন্দ এনে দেবার জন্যেই প্রবঞ্চনার আশ্রয় সে গ্রহণ করেছিল।"

সতীন্ বল্লে, "এ নিয়ে অনেক তর্ক করা যেতে পারে, কিন্তু রাত এখন একটা, সুতরাং আজকের মতো আলোচনাটা থাকুক।"

বৃষ্টি তখন থেমে গিয়েছিল। সকলে উঠে পড়্‌লাম। সিঁড়ির পথে সমর হঠাৎ বল্লে, "কিন্তু এ-বিষয়ে আর আলোচনা সুরু হবার আগে আমি একটা প্রশ্নের notice দিয়ে রাখ্‌ছি।"

সমর এতক্ষণ একটাও কথা বলেনি। এত কথার পরেও হঠাৎ আবার কি নূতন সমস্যার কথা তার মনে এল জান্‌তে পথে নেমে সকলে সাগ্রহে তার চারদিকে ভিড় কর্‌লাম।

সে বল্লে, "আমার প্রশ্ন হচ্ছে এই যে, যে-ব্যক্তিকে তোমরা এখন কোকোজী বলে' মনে কর্‌ছ, সে যে সত্যি সত্যি materialise-করা কোকোজীর ভূত নয় সেটা কি-করে' প্রমাণ হবে ?"

শেষ

মিলন-মঙ্গল

শ্রী গুরুসদয় দত্ত আই-সি-এস্

একে অপরের সাথে আজি দুয়ে
যে ডোরে হ'তেছ বন্দী —
অনাদি নিয়মে এ শুধু মরতে
অমর প্রেমের ফন্দি।

বাসনা আমার তাই বিভুপদে
তোমা দোঁহাকার চিত্ত —
অসীম লোকের অশরীরী দানে
ভরি' উঠে যেন নিত্য।

মিলন-সুখের মাধবী কুসুম
ত্রিদিবের হোক্ অর্ঘ্য—
ভোগের ত্যাগেতে হোক্ পরিণতি
ধরাতল হোক্ স্বর্গ!

সে-কালের কথা

রায় শ্রী জলধর সেন বাহাদুর

ডাক্তার-কবিরাজ

২

বৈশাখ মাসের 'বঙ্গলক্ষ্মী'তে সে-কালের কথা উপলক্ষে কবিরাজী চিকিৎসার কথা বলেছি। এবার ডাক্তারী চিকিৎসার কথা নিবেদন কর্‌ব।

চিকিৎসার কথা বলতে গিয়ে কবিরাজদিগের কথা আগে বলায় শ্রদ্ধাস্পদ ডাক্তার মহাশয়েরা যেন অভিমান না করেন; তাঁদের দ্বিতীয়-স্থানীয় কর্‌বার জন্য তাঁদের কথাটা আগে বলিনি, এ কথা যেন কেহ মনে না করেন। কবিরাজী চিকিৎসা আমাদের নিজের জিনিস, আমাদের দেশের একটা গৌরবের কথা; ডাক্তারী চিকিৎসা আগন্তুক, আমাদের দেশে এ চিকিৎসার বয়স খুব বেশী নয়—ঐতিহাসিকেরা বোধ হয়, এ দেশে এ চিকিৎসার আগমন দুই শত বৎসরও বল্‌বেন না।

আরও একটা চিকিৎসা আমাদের দেশে মুসলমান আমলে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল; সেটা হকিমী চিকিৎসা। এ চিকিৎসাটা আমাদের দেশের জনসাধারণের মধ্যে যে বিস্তৃত হয়েছিল, তা আমার মনে হয় না। আমাদের পল্লী-অঞ্চলে এ চিকিৎসা প্রবেশলাভই কর্‌তে পারেনি। শুনেছি, এ চিকিৎসা নাকি আমিরী চিকিৎসা। বোধ হয় সেই জন্যই আমাদের গরীব-প্রধান গ্রাম-পল্লীতে এ চিকিৎসা প্রচলিত হয় নি। এবং বলতে লজ্জা নেই, সুলেখক শ্রীযুক্ত পরশুরামের 'চিকিৎসা-সঙ্কট' প্রবন্ধেই এই হকিম-শ্রেণীর চিকিৎসকের দর্শনলাভ আমি প্রথম করেছি। সুতরাং হকিমী চিকিৎসা সম্বন্ধে আমার, কি সে-কালের কি এ-কালের, কোন অভিজ্ঞতাই নেই। এই কারণেই ঐ প্রসঙ্গটা আমি বাদ দিলাম।

এইবার ডাক্তারী চিকিৎসার কথা বলি। আমাদের অঞ্চলে এই ডাক্তারী চিকিৎসা কে প্রথম প্রবর্ত্তন করেছিলেন, তার ইতিহাস আমার জানা নেই। যাঁদের কাছে জান্‌বার সম্ভাবনা ছিল, তাঁরা সকলেই এখন পরলোকগত—আমরাই যে এখন প্রবীণ হ'য়ে দাঁড়িয়েছি। এই সব কথা লিখ্‌তে হবে, এই সকল বিষয়ের ইতিহাস সংগ্রহ কর্‌তে হবে, এ বাসনা যদি আমাদের প্রথম-যৌবনকালেও মনে হোত, তা হ'লে আমাদের গ্রাম-পল্লীর কত, অধুনাবিস্মৃত ইতিহাস আমরা সংগ্রহ কর্‌তে পার্‌তাম; এখন আর সে উপায় নেই। কাজেই, আমাদের পল্লী-অঞ্চলে কবে ডাক্তারী চিকিৎসা প্রথম প্রবেশ করেছিল, তার সঠিক বা বেঠিক কোন খবরই দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

আমার যখন জ্ঞান হয়েছে, অর্থাৎ যখন আমি সাত আট বছর বয়সের, তখনকার কথা আমার মনে আছে। সেই সময় আমাদের গ্রামে, বোধ হয় আমাদের অঞ্চলেই আমরা প্রথম যে ডাক্তার বাবুর আবির্ভাব দেখেছিলাম, তাঁর নাম প্যারীমোহন গুপ্ত। আমার বেশ মনে আছে, তাঁর বাড়ী ছিল এই কলিকাতার কাছেই অর্থাৎ নৈহাটীর নিকট হালিসহরে। বাঙ্গালা দেশে এত সহর, গ্রাম, পল্লী থাক্‌তে এই হালিসহর থেকে বহুদূরে আমাদের গ্রামে তিনি কেন, কোন্ সূত্রে, কোন্ সহবতে উপস্থিত হয়েছিলেন, সে কথা বলতে পার্‌ব না। তিনি আমাদের গ্রামে একেলাই থাক্‌তেন, পরিবার নিয়ে যান নি; আর সে সময় পরিবার নিয়ে কর্ম্মস্থলে যাওয়ার রেওয়াজ তখনও হয় নাই; পথ-ঘাটে যাতায়াতেরও তেমন সুবিধা ছিল না, দস্যুভয়ও ছিল। বিশ্বনাথ, বৈদ্যনাথের সৎদৃষ্টান্ত অনুকরণ ক'রে আমাদের অঞ্চলে অনেক ছোটখাটো বিশ্বনাথও জন্মেছিল। পারি ত সে সব ডাকাতের কথা, সে সব 'গামছা মোড়া'র দলের কথা পরে বল্‌ব; এখন ডাক্তার বাবুর কথাই বলি।

আমাদের এই ডাক্তার বাবু অতি নিরীহ ভালমানুষ ছিলেন। প্রথম প্রথম যে সব ক্যাম্বেল-ছোঁয়া যুবক পল্লী-অঞ্চলে চিকিৎসা কর্‌তে গিয়ে একেবারে আহাজী গোয়া

হ'য়ে বস্‌তেন, এই সব স্বর্গীয় দুর্গাদাস কর মহাশয়ের বাঙ্গালা ডাক্তারী বই সম্বল যুবকেরা রোগের নাম 'কামস্‌কট্‌কা' এবং ঔষধের নাম 'পাটাগিনিয়া' ব'লে লোকের মনে বিস্ময় ও আতঙ্কের সঞ্চার ক'রে দিতেন, আমাদের এ ডাক্তার বাবু সে শ্রেণীর ছিলেন না; অথবা সে শ্রেণীর আমদানী তখনও হয় নি। প্যারীমোহন বাবু কোথায়, কোন্ বিদ্যালয়ে, কার্ কাছে শিক্ষা লাভ করেছিলেন, তা বল্‌তে পার্‌ব না। তবে, তিনি যে সুচিকিৎসক ছিলেন, অর্থাৎ তাঁর হাতে যে শতকরা চল্লিশ-পঞ্চাশ জন রোগী আরোগ্য লাভ কর্‌ত, এ আমরা দেখেছি এবং জানি।

আমাদের বাড়ীর কাছেই তাঁর বাসা ছিল। আমরা অনেক সময় প্রাতঃকালে কারণে বা অকারণে তাঁর বাসায় যেতাম। অনেক রোগী তাঁর কাছে ঔষধ নিতে আস্‌ত; তিনি রোগ পরীক্ষা ক'রে ঔষধ দিতেন। যে সব রোগী আস্‌তে পার্‌ত না এবং একটাকা দর্শনী দিয়ে ডাক্তার বাবুকে বাড়ীতে নিয়ে যেতেও অসমর্থ, তাদের রোগের বর্ণনা শুনেই ডাক্তার বাবু ঔষধ দিতেন এবং তাদের অনেকের ব্যাধি নিরাময়ও হোতো। সিসির গায়ে দাগ কেটে প্রতিদাগ দুই আনা, দশ পয়সা, কোন কোন ক্ষেত্রে চার আনা হিসাব ক'রে ডাক্তার বাবু মূল্য আদায় কর্‌তেন না। কোন রোগীকে যদি বেশী দামের ঔষধ দিতেন, আর সে যদি চার আনা, কি ছয় আনা মূল্য দিত, তা হ'লে ডাক্তার বাবু একটু হেসে বল্‌তেন, "ওগো, এটা বড় দামী ঔষধ।" ব্যস্, আর কিছু বল্‌তেন না; 'আরও দেও' এ কথা তাঁর মুখে কখনও শুনিনি। আর, তখন সিসি বোতল ত এখনকার মত সুলভ ও সুপ্রাপ্য ছিল না যে, ডাক্তার বাবু প্রত্যেককে নূতন সিসিতে ঔষধ দেবেন। যাদের বাড়ী দুই একটা সিসি কি বোতল থাকৃত, তারা তাই বেশ ক'রে ধুয়ে নিয়ে আস্‌ত; ডাক্তার বাবু তাতেই ঔষধ দিতেন। আর যাদের ঘরে সিসি বোতল নেই, তারা পাথরের বাটি নিয়ে আস্‌ত; ডাক্তার বাবু তাতেই ঔষধ দিতেন এবং ব'লে দিতেন, ছ-দাগের ঔষধ থাক্‌ল, রোজ তিন বার পরিমাণমত খেতে হবে।

যাঁরা অবস্থাপন্ন, তাঁদের বাড়ীতে রোগী দেখেও ডাক্তার বাবু কখনও দুই-টাকার বেশী ভিজিট নিয়েছেন, এ কথা আমরা কখনও শুনিনি, সাধারণতঃ এক-টাকাই তাঁর ভিজিট ছিল। আর এখন? কাজ নেই সে কথা ব'লে—সকলেই ভুক্তভোগী।

ডাক্তার বাবুর আর এক প্রণালীর চিকিৎসা আমরা দেখেছি, সে চিকিৎসার কথা মনে হ'লে এখনও আমাদের গা শিউরে উঠে। তাঁর বাসায় বড় বড় সাদা বোতলের মধ্যে অনেকগুলি বড় বড় জোঁক থাক্‌ত। কারও জ্বরের জন্যে খুব মাথার যন্ত্রণা হয়েছে, ডাক্তার বাবু বল্‌তেন কি—তার কপালের দুই পাশে দুইটা জোঁক লাগিয়ে দিতেন। জোঁকেরা সেই রোগীর রক্ত আকণ্ঠ পান কর্‌ত, যখন আর পান কর্‌বার শক্তি থাকৃত না, তখন আপনা হতেই খ'সে পড়্‌ত। রোগীর যন্ত্রণা এই রক্তশোষণে কম পড়্‌ত। এ চিকিৎসা না কি বিলাতেও প্রচলিত ছিল, পরে, ইংরাজী বইটই প'ড়ে জান্‌তে পেরেছিলাম যে সেকালে বিলাতে ডাক্তারদের নাম ছিল না-কি 'Leech' অর্থাৎ জোঁক। বোধ হয় জোঁক ব'সয়ে চিকিৎসা কর্‌তেন জন্যই সেকালে বিলাতী ডাক্তারদের এই নামকরণ হয়েছিল; 'ধর্‌লে আর শীঘ্র ছাড়েন না' ব'লে এ নাম ডাক্তারদের হয়নি, এ কথা বল্‌তেই হবে।

আমাদের এই ডাক্তার বাবুর আর একটা প্রধান গুণ ছিল পথ্যের ব্যবস্থা। রোজ জ্বর হ'চ্ছে, এমন রোগী ঔষধ নেবার পর জিজ্ঞাসা কর্‌ল, "ডাক্তার বাবু কি খাব?"

ডাক্তার বাবু বল্‌লেন, "কি খাবে? উপোস দিলেই ভাল হয় আজ। তা, নিতান্ত যদি না থাক্‌তে পার, একটু সাগু কি খৈয়ের মণ্ড খেয়ো।"

রোগী বল্‌ল, "আমি যে সাগু কি খৈয়ের মণ্ড খেতে পারিনে, বমি আসে ডাক্তার বাবু?"

ডাক্তার বাবু বল্‌লেন, "ও, বমি আসে; তাইত। তা দেখ, দুটো অল্প ক'রে চিড়ে-ভাজা খেও।"

রোগী বল্‌ল, "চিড়েভাজা যে আমার পেটে যায় না ডাক্তার বাবু।"

ডাক্তার বাবু বল্‌লেন, "তাইত। পেটে যায় না; রুটী ত দেওয়া যায় না। কি খেতে তোমার ইচ্ছে কর্‌ছে বাপু।"

রোগী বল্‌ল, "দুটো নরম ভাত হ'লে খেতে পারি।"

ডাক্তার বাবু একটু ভেবে বল্‌লেন, "তা থাক্, অল্প ক'রে দুটো ভাতই খেয়ো, গাঁদালের ঝোল দিয়ে, বুঝ্‌লে।"

কোথায় উপবাস ব্যবস্থা, তার থেকে ভাত ও গাঁদালের ঝোল। রোগী খুব খুসী। এ রকম রোগীকেও কিন্তু ডাক্তার বাবুর চিকিৎসাধীনে নিরাময় হ'তে দেখেছি।

আমাদের এই ডাক্তার বাবু কিন্তু অস্ত্র চিকিৎসা কর্‌তেন না; বল্‌তেন, "আমি অস্ত্র হাতে কর্‌ত পার্‌ব না, আমার গুরুর নিষেধ।" হায়, হায়, এমন গুরু এখন আর নেই; থাক্‌লে অনেক রোগী অপমৃত্যুর হাত থেকে হয় ত রক্ষা পেতো। বল্‌তে হবে না যে, এ মন্তব্য আনাড়ি, হাতুড়ের সম্বন্ধেই প্রযোজ্য।

ডাক্তার বাবু অস্ত্র চিকিৎসা না কর্‌লেও আমাদের গ্রামে তার জন্য অন্য লোক ছিলেন। তাঁর নাম ভৈরব ডাক্তার। তিনি জাতিতে নরসুন্দর ছিলেন। সে-ব্যবসায় ত্যাগ ক'রে তিনি অস্ত্র-চিকিৎসক হয়েছিলেন। তিনি বল্‌তেন, "তিন-চার পুরুষ থেকে আমরা ক্ষৌরকারের কাজ ছেড়ে দিয়ে এই ডাক্তারী আরম্ভ করেছি। আমার প্রপিতামহ দেবীর-বরে এই বিদ্যা লাভ করেছিলেন। পুরুষানুক্রমে আমরা সেই বিদ্যা শিক্ষা করেছি।"

তাঁর অস্ত্রের মধ্যে ছিল নরুণ, আর ক্ষুর—তাঁদের সেই পৈত্রিক ব্যবসায়ের অস্ত্র। এই দুই অস্ত্রের সাহায্যে তিনি অনেক রোগী আরোগ্য কর্‌তেন। তাঁর দুই তিন রকম মলমও ছিল। অস্ত্র করার পর মলম লাগিয়ে দিতেন, ক্ষত শুকিয়ে গেলে সেই মলমের পটি আপনা হ'তেই প'ড়ে যেত; ড্রেস করার প্রয়োজন হতো না। জাতিতে নরসুন্দর হোলেও আমরা তাঁকে শ্রদ্ধা কর্‌তাম. তাঁর অবস্থাও ভাল ছিল। কিন্তু, শুভানুধ্যায়ীদের পরামর্শে তিনি শেষ-বয়সে তাঁর একমাত্র ছেলেকে ইংরাজী শিখিয়ে ক্যাম্বেল স্কুলে ডাক্তারী শিখ্‌তে পাঠিয়েছিলেন। তিনি মনে করেছিলেন, দেবীর বরে যে বিদ্যা, তা ত ঘরেই বাঁধা আছে। ছেলে ডাক্তারী পাশ ক'রে আসুক, তারপর এ বিদ্যাটাও শিখিয়ে দেবেন। কিন্তু, তাঁর আশা পূর্ণ হয় নি। ছেলে যখন কলিকাতায় পড়্‌ছিলেন, তখন একদিন অকস্মাৎ তিনি মারা গেলেন; তাঁর দেবীর বরে প্রাপ্ত বিদ্যা আর ছেলেকে দেওয়া হোলো না। তাঁর অস্ত্র-বিদ্যার নৈপুণ্য ছেলে যে পান নাই, তাতে আমরা তত ক্ষতি বোধ করিনি; কিন্তু তাঁর মলম কয়টি যে খুব ভালই ছিল।

এইখানেই এবারের মত ইতি। 'ইতি' বটে, কিন্তু আর এক চিকিৎসা-শাস্ত্রের কথা যে বলা হোলো না। সেকালে অর্থাৎ আমাদের বাল্যকালে তার প্রসার না হলেও আমরা যখন কিশোর, তখন তার নাম শুনেছি এবং আমিও সে চিকিৎসাধীন হয়েছিলাম, তার ভাল নাম হোমিওপেথী। এ নামটা সর্ব্বপ্রথম আমি আমার পরলোকগতা জ্যেষ্ঠা ভগিনীর মুখে শুনেছিলাম। তিনি অতি গম্ভীর স্বরে বল্‌তেন, "এ শাস্ত্রের নাম কি জানিস্—এর নাম 'হৈমবতী চিকিৎসা'।"
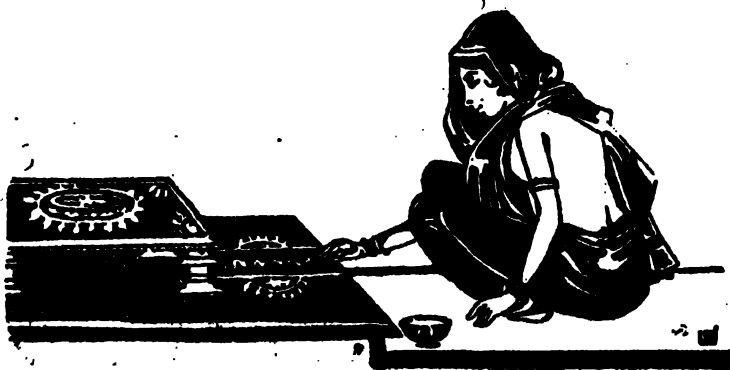
বীর বাঙালী তরুণ

এই বাঙালী তরুণ—শ্রীমান্ বিজয়কৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য রিপন কলেজের তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীর (B. Sc.) একটি ছাত্র। ইনি সম্প্রতি বালীগঞ্জ ষ্টেশনের সন্নিকটবর্ত্তী স্থানে তিনটি মুসলমান গুণ্ডার অতর্কিত আক্রমণ হইতে একটি হিন্দু তরুণীকে অসীম সাহসিকতার সহিত রক্ষা করিয়া তাঁহার মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন। এই রকমই ত চাই!—বাঙলার তরুণ অকুতোভয় হউক! দেশের ভগিনীর জননীর মর্য্যাদা-রক্ষাকারী এইরূপ বীর সন্তানই ত বঙ্গলক্ষ্মীর চির-আকাঙ্ক্ষিত।

বিজয়কৃষ্ণ দীর্ঘজীবী হউন!

পথ

শ্রী সুকুমার সরকার
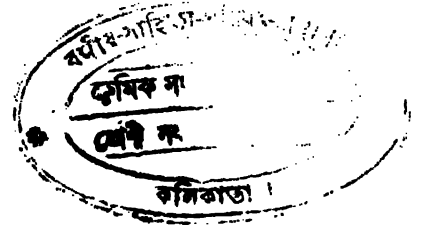
স্বপ্নের কুঁড়ি ফোটায়: শুধুই যে পথ-ধূলি
তারি সে পরাগ-রেণু এ অঙ্গে লয়েছি তুলি'।
হাসির হিরণ-কিরণ যে পথে চরণ ফেলে
তারি পাশে মোর আঁখি-শতদল দল যে মেলে।
যে পথ-কিনারে পড়ে মেনকার পায়ের রেখা
মুনি হ'য়ে আমি লিখিব সে পথে ধ্যানের লেখা।
যে পথে মেঘেরা এলানো অলকে জাগিয়া আছে
হিয়া হবে মোর তড়িৎ-আলো সে পথের কাছে।

ধীবর-দুলালী আজিও যে পথে গোপনে চলে,
যে পথে সমীর আঁচল তাহার কেবলি ছলে,
নৃপের গর্ব্ব ভুলিয়া সে পথে লুটায়ে রব'—
হৃদয় ছেঁচিয়া সে পায়ে রঙীন শোণিমা হব'।
লতারা যে পথে লুকায়ে রেখেছে পুরুর প্রিয়া
সে পথ ভিজাব আমার উতল অশ্রু দিয়া।
কণ্বতনয়া-হরিণী যে পথে খুঁজিছে নৃপে
সে বিরহ পথ-আঁধারে জ্বালাব এ আঁখি-দীপে।

রূপের স্বপনে পরাশর যেথা ভুলিয়া তপে
মানবীর পায়ে আপন পাগল পরাণ সঁপে,
কুয়াশা-ধূসর বিজনে মধুর মিলন মাগে—
সে পথে তটিনী-তরঙ্গ হব প্রেমানুরাগে !
রাঘব-পায়ের পরশে যে প থ পতিতা নারী
মৃত্যু-পাষাণ হইতে লভিল জীবন-বারি,
আমি সে পথের অণুতে অণুতে মিশিয়া রব'—
পরম পুণ্য-প্রবাহে পাপেরে মুছিয়া লব'।
না-বলা কথারে বুঝেও না বুঝি' যে পথ-তলে
চলে গেছে কচ দেবযানী-হিয়া চরণে দলে,'
সে পথ-কাঁটায় একটি বিষাদ-কুসুম হ'য়ে
বিরহ-সুরভি ছড়াব অসীম কালেরে ল'য়ে।

স্মরণচিহ্ন দিতে প্রিয়তমে অলঙ্কারে
পৃথ্বা-তনয়া যে পথে ছড়ালো রত্নহারে।
শ্যাম তৃণ হ'য়ে সে পথে সে হার লইব আমি—
হৃদয় আমার রাঘব-চোখের দরশকামী।
তৃতীয়ার চাঁদ রোহিণীর লাগি' যে পথ-'পরে
বিরহ-শয়নে একাকী বসিয়া গুমরি' মরে,
সান্ত্বনা হ'য়ে সে পথে আমার দৃষ্টিখানি
ব্যথিত চাঁদের নয়নে বুলাবে আশার বাণী।
শবেরে লইয়া যে পথে শিবের পাগল প্রীতি
নৃত্য-ছন্দে রচে শিবানীর সোনার স্মৃতি,
সমীরে মিশিয়া সে পথে আমিও ঘুরিব একা—
চক্রধারীর বাঁকা চোখ যদি দেয় গো দেখা !

পুরীতে দিনকয়েক

শ্রী ভুবনমোহন দাস এম্-এ

কেহ পুরী যান তীর্থ করিতে,কেহ যান বেড়াইতে, আবার কেহ যান রোগ সারাইতে। আমার রোগ সারিয়াছিল তবে শীঘ্র পূর্ব্বের অবস্থা ফিরিয়া পাইবার আশায় আমি এ বৎসর এপ্রিল মাসে পুরী গিয়াছিলাম। প্রায় ১৫ বৎসর পরে যাওয়াতে সহরের অনেক পরিবর্ত্তন দেখিলাম। সমুদ্রের ধারে ধারে রাস্তা; স্বর্গদ্বার এবং চক্রতীর্থ ছাড়িয়া বরাবর সমুদ্রের ধারে বাড়ী; ট্যাক্সীর অভাব নাই, যেখানে সেখানে ট্যাক্সী। হোটেলের অভাব নাই—সমুদ্রের ধারে ভাল বাড়ীগুলিই হোটেল। আমি স্বর্গদ্বারের শেষ সীমানায় সমুদ্রের খুব নিকটে ছিলাম বলিয়া সমুদ্রের তীরে ভ্রমণ করিতাম ও ঘরে বসিয়া সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গ দেখিতাম। মনে করিয়াছিলাম একবারে বনবাসের মত থাকিতে হইবে, কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে দক্ষিণেশ্বরের রামনারায়ণ দাদা, সরোজনলিনী নারীমঙ্গল সমিতির এবং সকলের বড় মা, স্বামী কৃপানন্দ সরস্বতী, স্বামী বিজ্ঞানানন্দ প্রভৃতি প্রতিবেশী পাইয়া বেশ সময় কাটাইতাম। প্রত্যূষে বিধবা-আশ্রমের মেয়েদের সমস্বরে স্তব-পাঠ শুনিয়া ঘুম ভাঙ্গিত, তারপর খাওয়া-দাওয়া করিয়া ও বেড়াইয়া কিরূপে যে সময় অতিবাহিত হইত তাহার হিসাব রাখিতাম না। বিশেষত: গৌরবাটসাহীতে যে সাধুমা'র আশ্রয়ে ছিলাম, তাঁহার মাতার ন্যায় স্নেহ ও যত্নে বিদেশে বসবাস করিতেছি বলিয়া মনে হইত না।

পুরাতনের মধ্যে পুরীর সেই জগদ্বিখ্যাত মন্দির ও সেই সীমাহীন পুরাতন সমুদ্র—উহারা যেন নিত্য নূতন। সমুদ্রের ধারে কেহ একলা বেড়াইলে সমুদ্র নিজের রাশি রাশি তরঙ্গ লইয়া তাহার সহিত এমন খেলা করিবে এবং এরূপ গাঢ়স্বরে কথা কহিবে যে, কোন দ্বিতীয় লোকের আবশ্যক বোধ হইবে না। অসুস্থ মনকে সে সুস্থ করে, অশান্ত মনকে সে সান্ত্বনা দেয়, যে নিরাশ হইয়া পড়ে সমুদ্র তাহাকে আশার বাণী শুনায়। দুপুর বেলায় যখন অন্যান্য স্থানে লোকে গরমে ছটফট্ করে, সমুদ্র সেখানকার লোককে তখন সুশীতল হাওয়ায় ঘুম পাড়ায়।

মন্দিরে গেলাম। ঠাকুরের নূতন কলেবর—কিন্তু সেই ঠুঁটো জগন্নাথ—মাথায় সেই পুরানো মাণিক। মন্দিরের চারিদিকে বিজলীর আলোক দেখিলাম—কেবল ঠাকুরের নিকট সেই পুরাতন অন্ধকার। উড়িষ্যাবাসী ক্রমশঃই সভ্য হইতেছে কিন্তু একবারে সভ্য হইলে জাত যাইবে ভাবিয়া ঠাকুরকে আলোকে রাখিতে চাহে না। মন্দিরের গায়ে চারিদিক অশ্লীল নগ্নমূর্ত্তি-পূর্ণ ছিল, উড়িষ্যাবাসী তিন দিক তাহা ভরাট করিয়াছে কিন্তু এখনও একদিকে এমন অশ্লীল মূর্ত্তি আছে যে তাহার দিকে তাকান যায় না। কবে ঠাকুর উড়িষ্যাবাসীকে সুমতি দিবেন যেদিন সমস্ত অশ্লীলতা ঢাকিয়া বিজলীর আলোকে তিনি সকলকে দর্শন দিবেন।

একদিন ভুবনেশ্বর মন্দির দেখিতে সাধ হইল। সকাল বেলা কৃপানন্দ স্বামীর সঙ্গে গিয়া তাঁহার আশ্রমে উঠিলাম। দুপুর বেলায় গরুর গাড়ী চড়িয়া গৌরীকুণ্ডতে স্নান ও ঠাকুর দর্শন করিয়া কোনরকমে আশ্রমে আসিয়া ভোগ খাইয়া শুইয়া পড়িলাম। ভোগ খাইতে খাইতে ১৫ বৎসর পূর্ব্বেকার উড়িষ্যাবাসী প্রস্তুত জগন্নাথের ভোগের কথা মনে পড়িল; তাহা আর প্রকাশ না করাই ভাল। বিকাল হইলে সেই গরুর গাড়ীতে ষ্টেশনে আসিয়া ট্রেন ধরিলাম। রাত্রে খাবার সময় পুরী আসিয়া উদর পূর্ণ করিয়া শুইয়া পড়িলাম।

বড়-মা'র সহিত অনেকদিনের পরিচয় থাকাতে আমার আশ্রম দেখার সৌভাগ্য হইয়াছিল। সেখানে প্রায় ৮।১০ জন অল্পবয়স্কা বিধবা আছেন এবং ৩।৪ জন শিক্ষয়িত্রী আছেন। বড়-মা শিক্ষয়িত্রীদের লইয়া একটি মেয়েস্কুল চালাইতেছেন। পুরীতে তাহা একরকম নূতন। কলিকাতার মত মেয়েরা বাসে আসে যায়, লেখাপড়া শেখে ও খেলাধুলা

করে। উড়িষ্যাবাসী বাঙ্গালীর মেয়েদের শিক্ষা দেখিয়া একণে অনেক উড়িয়া ভদ্রলোক আপনাপন মেয়ে পাঠাইতেছেন। বিধবাশ্রমের মেয়েরাও ছোট ছোট মেয়েদের সঙ্গে লেখাপড়া শিখিতেছেন ও সকালে বিকালে শাকসব্জী বসান, জামার কাটছাঁট শেখা, আসন, গামছা ও গালিচা বোনা শিখিতেছেন। এত কাজ করিয়াও মেয়েরা বেশ খেলাধূলা করেন ও দলে দলে সযত্নে বেড়াইতে যান। নবীনচন্দ্রের সে বাঙ্গলাদেশের বিধবাদের মত তাঁহাদের মুখ ম্লান নহে; তাঁহারা যেন আপনাপন কাজে ও বেড়ানতে আনন্দে আছেন মনে হয়। তাঁহাদের যে দুঃখ নাই তাহা বলিতেছি না—দুঃখ না থাকিলে মানুষ বলিব কেন—কিন্তু দুঃখ তাঁহাদের মুখ ম্লান করিতে পারে না। বাস্তবিক যাঁহাদের সকল সুখ শেষ হইয়া নিঃসঙ্গ জীবন অবলম্বন, তাঁহাদের মুখে হাসি দেখিলে বড়-মা যে কতবড় কার্য্য করিতেছেন ও পুণ্য সঞ্চয় করিতেছেন তাহা সহজেই অনুভব হয়। বড়-মা তাঁহাদের সকলেরই আপন মায়ের মত এবং তাঁহাদের নিঃসঙ্গ জীবনের অভাব পূরণ করেন। যে কেহ তাঁহার আশ্রম দেখিতে আসেন, তিনিই আনন্দলাভ করেন এবং বড়-মা'কে ধন্যবাদ না দিয়া পারেন না। এ সকল কাজ সত্ত্বেও বড়-মা স্কুলের জন্য যেরূপ প্রাণপাত করিতেছেন তাহা দেখিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। একদিন স্কুলের বার্ষিক উৎসবের নিমন্ত্রণ আসিল। পুরীর রাজার নেতৃত্বাধীনে বাঙ্গালীদের একটি ক্লাবে এই সভা হয় এবং তাহাতে পুরীর প্রায় সকল গণ্যমান্য লোক উপস্থিত ছিলেন। সেখানে মেয়েরা এমন সুন্দর গান ও ড্রিল করিতে লাগিল যে মনে হইল আমি কলিকাতায় থাকিয়া মেয়েদের পারিতোষিক-বিতরণ উপলক্ষে উৎসব দেখিতেছি। সকল মেয়েই বেশ আনন্দ সহকারে আপনাপন কাজ শেষ করিল এবং মেডেল ও পারিতোষিক পাইল। পুরীর রাজা স্কুলের কার্য্যকলাপ দেখিয়া আনন্দ প্রকাশ করিলেন ও একটি নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা দিয়া সভা ভঙ্গ করেন। স্কুলের উৎসব যে সফলতা লাভ করিয়াছিল তাহা অনেকটা স্কুলের নূতন হেড্ মিষ্ট্রেসের গুণে। মিস্ হিমানী রায় দুই এক মাস আসিয়াই যে মেয়েদের এমন শিখাইয়াছেন তাহার জন্য তাঁহাকে বাহাদুরী দিতে হয়।

দেখিলাম অনেক—শিখিলাম অল্প; এব এইরূপ দেখিয়া শুনিয়া নিজেকে দিন কতক ছুটি দিয়া শরীরট বেশ সারাইয়া লইলাম। টিকিট করিয়া ছিলাম ১৫ দিনের সুতরাং ছুটি ফুরাইতেই কলিকাতায় আসিয়া আগে যে কাজে ছিলাম এখনও সেই কাজে নিযুক্ত হইলাম। আবার কবে ছুটি পাইব কে জানে?

পরে ও তারপরে

শ্রী সুধাংশুকুমার হালদার আই-সি-এস্

"তোমারে ভালবাসি"—কপোত কহে, মৃদু
চুমিয়া কপোতীর চঞ্চু 'পরে;
শুনিয়া কপোতীর শিহরে কলেবর,
নয়ন মুদে আসে পুলক-ভরে।
গাছের কালো ডাল কহিল, "রে বাচাল,
আছে ত তার পরে মৃত্যু, শোক!"
গোধূলি-আলো কয়, "নাহি গো নাহি ভয়,
তাহার পরে আছে অমর-লোক।"

নারী-প্রতিভা

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

স্বামী কৃপানন্দ সরস্বতী

চাঁদবিবি

এই জগদ্বিখ্যাতা বীরবালার অপর নাম চাঁদ সুলতানা। ইনি আহম্মদনগরাধিপতি হুসেন নিজাম শাহের কন্যা ও মূর্ত্তজা নিজাম শাহের ভগিনী। যে সমস্ত গুণ থাকিলে মানব জগৎপূজ্য হন, এই মহানুভবা বীর-রমণীর সেইসব গুণের অভাব ছিল না। অলৌকিক রূপে মুগ্ধ হইয়া বিজাপুরের অধীশ্বর ইঁহার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। ইনিও অল্পদিনের মধ্যে পতিভক্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া, অল্পবয়সে বৈধব্যের বিধান বিধির দান বলিয়া অবনতমস্তকে গ্রহণ করেন। (১৫৮০ খৃঃ)

চাঁদবিবি পতিহীনা হইয়া ব্যাকুল হইলেন না। পতির মানসম্ভ্রম বজায় রাখিবার জন্য, পূর্ণ উদ্যমে শিশু ভ্রাতুষ্পুত্র ইব্রাহিমকে সিংহাসনে বসাইয়া আপনি রাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন। ইব্রাহিমকে রাজত্বে বসাইয়া প্রায় ৯।১০ বৎসর মহাগোলযোগে কাটিল। বিজাপুর রাজ্যের সর্দ্দারগণ সুযোগ বুঝিয়া নানা কৌশল অবলম্বন পূর্ব্বক,সমূহ উৎপাতের সৃষ্টি করিতে লাগিলেন। প্রধান মন্ত্রীর জঘন্য ষড়যন্ত্র জানিতে পারিয়া চাঁদবিবি তাঁহার জীবন-নাশের আদেশ দেন। কিশ্‌বর খাঁ চাঁদবিবির আদেশ প্রতিপালন করিয়া, নিজে প্রধান হইয়া উঠিলেন। দুষ্ট কিশ্‌বর খাঁ মুস্তাফা নামক রাজ্যের এক প্রিয় বিশ্বস্ত কর্ম্মচারীকে বিষপ্রদানপূর্ব্বক হত্যা করিয়া চাঁদবিবিকে সাতরা দুর্গে বন্দিনী করিলেন। চাঁদবিবি নানা কৌশলে জনৈক সর্দ্দারের সাহায্যে সাতরা দুর্গ হইতে মুক্তিলাভ করেন। বিশ্বাসঘাতক কিশ্‌বর বিজাপুর ছাড়িয়া পলায়ন করিলে, পথে মুস্তাফার লোকের হস্তে নিহত হন।

চাঁদবিবি চতুর্দ্দিকে গৃহবিবাদাদি দারুণ সঙ্কট দেখিয়া ব্যতিব্যস্ত হইলেন। এই সময় গোলকুণ্ডার রাজা বিজাপুর আক্রমণ করায়, অবস্থা ভীষণতর সাংঘাতিক হইল। চাঁদবিবি এই দুর্দ্দিনে কর্ত্তব্যভ্রষ্ট না হইয়া, নানাপ্রকার বুদ্ধি-কৌশলে সর্দ্দারদের বাধ্য করিবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। চাঁদবিবির সূক্ষ্মদর্শিতা ও বিচক্ষণতার ফলে সকলে আবার একমত হইলেন। ইব্রাহিমের সহিত গোলকুণ্ডার রাজভগিনী তাজ সুলতানার বিবাহ হইল। ইহার পূর্ব্বেই চাঁদবিবির বুদ্ধিবলে আহম্মদনগর ও গোলকুণ্ডা সন্ধি করিয়াছিলেন। বাকী শত্রুগণ হতাশ হইয়া যার যার গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। (১৫৮৫ খৃঃ)

বিজাপুরে শান্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া চাঁদবিবি জন্মভূমি আহম্মদনগরে আসিলেন। এই সময় চাঁদবিবির অন্য এক ভ্রাতুষ্পুত্রের (মিরাণ হুসেনের) সহিত বিজাপুরের জনৈক রাজদুহিতার বিবাহ হয়। এই সময় চাঁদবিবির ভ্রাতার ধারণা হয় যে, পুত্র মিরাণ তাঁহাকে (মূর্ত্তজা) হত্যা করিবার চেষ্টা করিতেছে। মূর্ত্তজা নিজাম শাহ, পুত্র মিরাণকে হত্যা করিবার জন্য শয়নকক্ষে আগুন ধরাইয়া দেন। দৈবক্রমে মিরাণ রক্ষা পাইয়া দৌলাতবাদে পলাইয়া যান। পরে মিরাণ (১৫০৮ খৃঃ) মৃজা খাঁর সাহায্যে আহম্মদনগর আক্রমণ করিয়া পিতাকে এক গরম ঘরে পুরিয়া তাঁহার প্রাণ বিনাশ করেন। মিরাণ তখন মৃজা খাঁর প্রাণ বিনাশের চেষ্টা করেন; মৃজা জানিতে পারিয়া মিরাণের শিরশ্ছেদ করিয়া তোরণদ্বারে ঝুলাইয়া দেন। এই অমানুষিক কাণ্ডে নগরবাসীরা উত্তেজিত হইয়া, দুর্গদ্বারে আগুন ধরাইয়া দিয়া জামাল খাঁর সাহায্যে দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিয়া যে যাহাকে পাইল বিনাশ করিতে লাগিল। সপ্তম দিবসে মৃজা খাঁ নিহত হইলেন। এই সমস্ত নানা গোলযোগের সময়, চাঁদবিবি স্থির হইয়া সমস্ত অবস্থা নিরীক্ষণ করিতেছিলেন। কিন্তু আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। চাঁদবিবির একান্ত ইচ্ছা ছিল যে, তিনি ইব্রাহিম নিজামের দুগ্ধপোষ্য শিশু

বাহাদুরকে রাজা করিয়া, নিজে অভিভাবিকা হন। ইহাতে নানা শত্রুতা আচরণ করিয়া দুষ্ট আততায়ীরা বাহাদুরকে সরাইয়া কৌশলে চাঁদবিবিকে সসৈন্যে চাবন্দ দুর্গে পাঠাইয়া দেয়। মিঞা মঞ্জুই এই অশুভ বুদ্ধির মূল। রাজ-কুলোৎপন্ন নহে, এমন এক দশম বর্ষীয় বালককে সিংহাসনে বসাইয়া, বাহাদুরকে সরাইয়া দিলেন। ইহাতে মঞ্জুর উপর সকলেই চটিয়া গেল। মিঞা মঞ্জু এইবার নিজের অদূরদর্শিতার ফলে, নিজে বিশেষ অনুতপ্ত হন।

এইবার বুদ্ধিমতী চাঁদবিবি আহম্মদনগরের রক্ষয়িত্রী-রূপে কার্য্যভার গ্রহণে অগ্রসর হন। চাঁদবিবির মন্ত্রণার ফলে, মিঞা মঞ্জুর প্রধান কর্ম্মচারী আন্‌সার খাঁ ঘাতক-হস্তে নিহত ও পূর্ব্বোক্ত বাহাদুর রাজা বলিয়া ঘোষিত হন। নানাপ্রকার গৃহ-বিবাদাদির দ্বারা এই সময় যে অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছিল তাহা বর্ণনাতীত। বীরমহিলা চাঁদবিবি বুঝিয়াছিলেন যে, এই অবস্থায় রাজ্য রক্ষা করা কতদূর কষ্ট-সাধ্য। প্রধান প্রধান কার্য্যের ভার তিনি নিজ হাতে লইলেন। বিশ্বস্ত কর্ম্মচারীকে দুর্গরক্ষায় নিযুক্ত করিলেন। নেহঙ্গ খাঁ ও শাহআলীকে রাজ্যরক্ষার জন্য আহ্বান করিলেন। পথিমধ্যে মোগলের সহিত এক ভীষণ যুদ্ধ হইয়া গেল।

চাঁদবিবির বুর্হান নিজাম (দ্বিতীয়) নামে এক ভ্রাতা ছিলেন। হুসেন নিজামের জীবিতকালে তিনি পিতৃরাজ্য লাভ করিতে চেষ্টা করেন এবং পিতার ক্রোধে পড়িয়া দেশ ত্যাগ করেন ও আকবর বাদশাহের কৃপাপ্রার্থী হন। আকবর বাদশাহ বুর্হানকে উত্তরভারতে কিছু জায়গীর দিয়াছিলেন, তাহাতেই বুর্হানের চলিয়া যাইত। আহম্মদনগরে গোলযোগের কথা শুনিয়া, আকবর বুর্হানকে দক্ষিণা-পথে পাঠাইলেন। বুর্হান নানা সাহায্য পাইয়া আহম্মদনগর অধিকার করেন—এবং নিজে রাজা হন। বিজাপুরের রাজমন্ত্রী, ইতিপূর্ব্বে পলাইয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু যখন শুনিলেন বুর্হান রাজা হইয়াছেন, তখন তিনি আসিয়া জুটিলেন। নানা গুপ্ত ষড়যন্ত্র, গৃহশত্রুতা প্রভৃতির ফলে, মোগল সম্রাট্ আকবরের তত্রত্য সৈনিকদিগের সহিত চাঁদবিবির মনোমালিন্য ঘটিতে লাগিল। পূর্ব্বোক্ত নেহঙ্গ খাঁ, চাঁদবিবির আহ্বানে যখন তাঁহাকে সাহায্য করিতে আসিতেছিলেন, তখন পথিমধ্যে মোগল শিবির দেখিতে পাইয়া আক্রমণ করিলেন। খান্‌খানের অধীনস্থ অনেক সৈন্য নষ্ট হইল। এই ভাবে নেহঙ্গ সসৈন্য দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিলেন। বিজাপুররাজ পঁচিশ হাজার সৈন্য পাঠাইলেন; হায়দ্রাবাদ হইতে মেহেদিকুলী সুলতানের ছয় সহস্র গোল-কুণ্ডা অশ্বারোহী শাহ দুর্গে উপস্থিত হইল। মোগল সৈন্য-মধ্যে যুদ্ধসভা বসিল, স্থির হইল যে চাঁদবিবির সৈন্যেরা দুর্গরক্ষার উত্তম ব্যবস্থা করিবার মধ্যেই দুর্গ ধ্বংস করিতে হইবে। দুর্গে পাঁচটি গুপ্ত সুড়ঙ্গ কাটা হইল, যে দিকে মোগল সৈন্য থাকিবে, সেই দিক বাদে চারিদিকের সুড়ঙ্গ-মধ্যে বারুদ পুরিয়া, চূণ-সুরকি ও পাথর দিয়া ঐ সুড়ঙ্গ বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল। স্থির হইল তৎপরদিবস ২০শে ফেব্রুয়ারী, ১৫৯৬, সুড়ঙ্গে আগুন দেওয়া হইবে।

চাঁদবিবির অমানুষিক বীরত্ব

রাত্রিকালে, সিরাজী খাঁ নামক জনৈক বিশ্বস্ত ব্যক্তি এই গুপ্ত সংবাদ চাঁদবিবিকে জানাইলেন। চাঁদবিবি তৎক্ষণাৎ সদলবলে সুড়ঙ্গের অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। তিনি দিনমানে দুইটি সুড়ঙ্গ নষ্ট করিলেন। সর্ব্ববৃহৎ সুড়ঙ্গ হইতে যখন চাঁদবিবি মালমসল্লা বাহির করিয়া ফেলিতেছিলেন, সেই সময়ে মোগল সেনাধ্যক্ষের আদেশ হইল 'সুড়ঙ্গে অগ্নি প্রদান কর'। অগ্নি দিবামাত্র সুড়ঙ্গস্থ বারুদ দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। চাঁদবিবির অনেক লোক নষ্ট হইল। প্রাচীরের অনেকটা পড়িয়া গেল। অনেক প্রধান প্রধান যোদ্ধা দুর্গ ছাড়িয়া পলায়ন করিতে লাগিল। চাঁদ-বিবি দেখিলেন, আর নিস্তার নাই। তখন তিনি মুখে ঢাকা দিয়া, বর্ম্মচর্ম্ম-পরিবৃত হইয়া, মুক্ত তরবারি হস্তে, প্রাচীর রক্ষা করিবার জন্য বিপুল বেগে অগ্রসর হইলেন। কাপুরুষ যোদ্ধাগণ, বীর-মহিলার অসীম সাহস অবলোকন করিয়া, তাঁহার অনুবর্ত্তন করিল। ভগ্ন প্রাচীর হইতে মুষলধারে অগ্নিবৃষ্টি হইতে লাগিল, আগ্নেয় অস্ত্রের জলদগম্ভীর গর্জ্জনে দিঙমণ্ডল সমাচ্ছাদিত হইতে লাগিল। বহুশত মোগল বীর প্রাণত্যাগ করিল। দুর্গমধ্যে ও শত্রুশিবিরে আজ চাঁদবিবির যশোগান মুখরিত হইতে লাগিল। চাঁদ-বিবির বিশ্রাম নাই, তিনি দুর্গ-সংস্কারে মহাব্যস্ত। প্রভাত

হইতে না হইতে দুর্গের প্রাচীর অনেকটা প্রস্তুত হইয়া গেল।

মধ্যরাত্রে যুদ্ধ থামিবার পর চাঁদবিবি দেখিলেন, দুর্গে রসদ কমিয়া আসিয়াছে. তিনি শীঘ্র সৈন্যদিগকে আসিবার জন্য পত্র দিলেন! ঘটনাক্রমে সেই পত্র মোগল সৈন্যের হাতে পড়িল। পত্র পাঠ করিয়া ঐ পত্র নির্দ্দিষ্ট স্থানে পাঠাইয়া দেওয়া হইল ও একদল মোগল সৈন্য আনাইবার ব্যবস্থা হইল। মোগল শিবিরেও রসদের অভাব হইয়াছিল। পরন্তু অতিরিক্ত মোগল সৈন্য আসায়, রসদের অভাব আরও অনুভূত হইল। অনেক ভাবিয়া মোগল সেনাপতি চাঁদবিবিকে পত্র দিলেন, যে—যদি চাঁদবিবি বেরার প্রদেশ ছাড়িয়া দেন, তবে তিনি আহম্মদনগর পরিত্যাগ করিবেন। চাঁদবিবি অনেক ভাবিলেন। যদি বিরাট মোগল-শক্তির নিকট পরিণামে পরাস্ত হইতে হয়, তদপেক্ষা এই সম্মানজনক প্রস্তাব শ্রেয় ভাবিয়া সম্মতি দান করিলেন। তিনি বাহাদুর শাহের নামে সনন্দপত্রে সহি করিলেন। মোগল সৈন্য দৌলতাবাদে চলিয়া আসিল।

কিছুদিন অতীত হইতে না হইতেই, নেহঙ্গ খাঁ চাঁদবিবির সর্ব্বনাশের সূত্র খুঁজিতে লাগিলেন। তীক্ষবুদ্ধি চাঁদবিবি এই কৌশল বুঝিতে পারিলেন। তিনি বালক বাহাদুরকে দুর্গমধ্যে আনিয়া দুর্গদ্বার বন্ধ করিলেন। নেহঙ্গ খাঁ দুর্গে প্রবেশ করিতে চাহিলে, চাঁদবিবি বলিয়া পাঠাইলেন, যে—তিনি রাজধানীতে কার্য্য করিতে পারেন কিন্তু দুর্গমধ্যে তাঁহার প্রবেশ করিবার প্রয়োজন নাই। নেহঙ্গ চাঁদবিবির কিছু অনিষ্ট করিতে না পারিয়া, শেষে মোগলের অধীন বিদ্ রাজ্য অধিকার করিলেন।

আকবর বাদশা এই সংবাদ জানিলেন। তিনি সেনাপতি খান্‌খানকে বিদের শাসনকর্ত্তার সাহায্যের নিমিত্ত প্রেরণ করিলেন। নেহঙ্গ মোগলসৈন্যের সম্মুখীন হইলেন। জয়পুর কোট্‌লি গিরিসঙ্কটে, বিরাট মোগল বাহিনীর সহিত যুদ্ধে ফলোদয় হইবে না ভাবিয়া, তিনি আহম্মদনগরে চলিয়া আসিলেন। চাঁদবিবির সহিত আবার মিটমাট করিতে নেহঙ্গ চেষ্টা করিলেন। চাঁদবিবি বিশ্বাসঘাতককে আর বিশ্বাস করিলেন না। নেহঙ্গ জুনার রাজ্যে গা ঢাকা দিলেন।

আবার মোগল সৈন্য আহম্মদনগরে আসিয়া গুপ্ত সুড়ঙ্গ কাটিতে লাগিল। আবার ভীষণ যুদ্ধ বাধিল। চাঁদবিবি আবার করাল রণরঙ্গিণী মূর্ত্তি ধারণ করিয়া, মুক্ত-অসিহস্তে, সমরাঙ্গণে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এই সময় দুর্গমধ্যে বহু গুপ্তশত্রুর উৎপাত হইল। অল্পবুদ্ধি হামিদ খাঁ বলিয়া বেড়াইতে লাগিল, যে—চাঁদবিবি মোগল হস্তে আত্মসমর্পণ করিবেন। ইহাতে কতকগুলি মন্দবুদ্ধি সৈন্য হামিদ খাঁর সহিত গৃহে প্রবেশ করিয়া অতর্কিত ভাবে চাঁদবিবিকে হত্যা করিল। মোগল নির্ব্বিবাদে দুর্গ অধিকার করিল। বাহাদুরকে ও অপর বিশ্বস্ত সৈনিকগণকে বন্দী করিয়া আকবরের নিকট প্রেরণ করা হইল। এই বীর-বালার এইরূপ অকস্মাৎ গুপ্তঘাতকের হস্তে প্রাণবিয়োগের সংবাদে, চতুর্দ্দিকে হাহাকার পড়িল। বিজাপুররাজ ইব্রাহিম অতিমাত্রায় শোকসন্তপ্ত হইলেন। তিনি ব্রজ-মারাঠী মিশ্রিত নিম্নোক্ত পার্শী গাথায় চাঁদবিবির স্মৃতির তর্পণ করিলেন :—

"নন্দন-কাননে সুরবালাগণ করে যথা বাস।
মানব-প্রাসাদে রমণীরতন যথায় প্রকাশ॥
সৌন্দর্য্যে সদ্‌গুণে তাঁর সম কারো নাহিক উপমা,
বিজাপুর রাণী সেই প্রিয়তমা চাঁদ সুলতানা॥
"ভীষণ সমরে তেজোবীর্য্য তাঁর সদা উদ্‌ভাসিত।
সুখশান্তিকালে সরল বিমল সদাশান্ত চিত॥
ক্ষীণ প্রতি মায়া দীনহীন প্রতি অপার করুণা,
ছিল মহারাণী বিজাপুর-প্রিয়া চাঁদ সুলতানা॥
"স্বভাবে কোমলতা মধুর মাধুরী নাহিক তুলনা।
তাঁহার মহিমা বর্ণিতে না পারে মানব-রসনা॥
সুকুমার কোলে অতি যতনে পালিল যে জন।
রাজ্যের বিপ্লবে অনাথ বালকে করিল রক্ষণ॥
সেই মাতৃ-স্মৃতি হৃদয়-মন্দিরে করিতে পূজন,
আমি ইব্রাহিম তুচ্ছ কাব্যছত্র করিনু রচন॥"

চাঁদবিবির প্রতিকৃতি এখনও বিজাপুরে আছে। সৌন্দর্য্যে সে প্রতিকৃতির তুলনা নাই। গম্ভীর হাবভাব, স্থির মুখমণ্ডল, নীল নয়ন,—মাতৃত্বের পূর্ণবিকাশ। এখনও বিজাপুরের লোকেরা চাঁদবিবিকে ভক্তি করেন ও আহম্মদ-নগরের যুদ্ধের গল্প শুনিতে ভালবাসেন। বহু গ্রন্থে চাঁদবিবির জীবনী ও অপূর্ব্ব কীর্ত্তিকথা লিপিবদ্ধ আছে।

(ক্রমশঃ)

পারস্যের পত্র

শ্রী অমিয়চন্দ্র চক্রবর্ত্তী এম্‌-এ

শিরাজ
২০ এপ্রিল
খলিলাবাদ বাগান

১

শিরাজের খবর হয়তো Libertyতে পাঠানো cableএ পেয়েচ। বেশী খবর শীঘ্রই চিঠিতে জানাবো। বেশ সুন্দর সময় যাচ্চে। শিরাজে চিরবসন্ত—এমন স্বাস্থ্যকর জায়গা কমই আছে। কমলালেবুর ফুলের গন্ধে বাতাস ভ'রে রয়েচে—ডালিমের বাগানে পাখী ডাকচে। ফল-ফুলের জন্যে শিরাজ বিখ্যাত—আপেল, আঙুর, ষ্ট্রবেরি, চেরি, figs, খেজুর, pears, যা কিছু ফলের নাম করতে পারো সবই আছে। এখানে খরচও খুব কম। একশ টাকায় চার জনের পরিবার সুখে স্বচ্ছন্দে সুন্দর বাড়ি নিয়ে চাকর দাসী নিয়ে ভালো খেয়ে দেয়ে থাকতে পারে। জন দশেক ভারতবর্ষীয় এখানে আছে।

গুরুদেবকে ঠিক Emperorএর মতো ক'রে রাখচে। এতবড়ো সম্মান ওরা অন্য দেশের রাজা না এলে করে না। Persiaর শা প্রায়ই গুরুদেবকে telegram ক'রে শুভকামনা জানাচ্চেন। কী কাণ্ড, কী আয়োজন, reception তা ব'লে বোঝান যায় না। সমস্ত দেশটা জেগে উঠেচে। সব সময়ে military guard, parade, সব আমাদের জন্যে। সাদির বাগানে এবং হাফিজের সমাধিক্ষেত্রে গিয়ে কবি গভীর ভাবে বিচলিত হয়েচেন। সাদির সমাধি-বাগানে এমন সুন্দর শোভন অনুষ্ঠান এবং কবিসম্বর্দ্ধনা হয়েছিল কী বলব। গুরুদেবের জন্যে সমস্ত বাগানে দামী কার্পেট মুড়ে দিয়েছিল। স্বপ্নরাজ্যের মতো মায়াময় মনে হচ্ছিল। গুরুদেব এমন মর্ম্মস্পর্শী বক্তৃতা দিলেন—চিরদিনের মতো থেকে যাবে। তাঁর বাণী এখানকার দূরকালাশ্রিত সৌন্দর্য্যলীলার সঙ্গে মিলে গেল।

ইরানে এসে বাংলার কবি তাঁর বন্দনা জানালেন। ভারতবর্ষের সঙ্গে পারস্যের অন্তরের যোগ আবার নতুন যুগান্তরে এসে দেখা দিল।

এখন আমরা আছি সহরের প্রান্তে খলিলাবাদ বাগানে। Government Houseএর গোলমালে গুরুদেবের কষ্ট হচ্ছিল। এখানে গোলাপের বাগান, বুলবুল সবই আছে। সব সময়েই খাওয়া দাওয়া চলচে। এরা ঘরে ঘরে অনেকগুলি ছোট ছোট টেবিলে নানারকম ফল, মিষ্টি, খাবার সাজিয়ে রাখে। সব সময়েই বরফ বা লেবুর সরবৎ ছোট ছোট রূপোর গেলাসে ক'রে সবাইকে দিচ্চে। তা ছাড়া নিয়মিত dinner, lunch ইত্যাদি তো আছেই। বাদাম কিস্‌মিস খেজুর মিষ্টি ডুমুর ইত্যাদি এরা সব সময়েই একটু আধটু খাচ্ছেই। আমরা পেরেই উঠি না। তবু দেখতে বেশ লাগে।

পারস্য দেশটা সত্যি খুব চমৎকার। লোকেরা যেমন অতিথিবৎসল, জল-হাওয়াও তেমনি সুন্দর, মনোরম। খুব দ্রুত এরা এগিয়ে যাচ্চে। বর্ত্তমান শা ভারি বুদ্ধিমান ভালো লোক, ইনি পাঁচ বছরে দেশের চেহারা ফিরিয়ে দিয়েচেন। লোকেরা এঁকে সত্যি ভালবাসে। মেয়েদের বুর্খা যাবো-যাবো করচে, এই শা-র রাজত্বে শীঘ্রই উঠে যাবে। তেহেরানের মতো বড়ো এবং য়ুরোপীয় সহরে শুনচি এখনই প্রায় চ'লে গেছে। টেলিগ্রাফ, টেলিফোন, ভালো রাস্তা দেশে ছড়িয়ে যাচ্চে। সুব্যবস্থা, সুশাসনের চিহ্ন সর্ব্বত্র। শ্রীযুক্তা প্রতিমা দেবী মেয়েদের মহলে মিশে বাড়ির ভিতরকার ধরণধারণ নানা খবর সংগ্রহ করচেন।

বুল্‌গেরিয়ান্‌ সাহিত্য

শ্রী ধীরেন্দ্রলাল ধর

বুল্‌গেরিয়ান্‌ সাহিত্য আজও শৈশব-সীমা অতিক্রম কর্‌তে পারে নি। এর মূলে আছে এদেশের ইতিহাস। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্য্যন্ত বুল্‌গেরিয়া নামে কোন দেশের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত ছিল না। আঠারো-শো-আটাত্তর সালে 'রুমেনিয়া'র পূর্ব্বভাগটুকু পৃথক ক'রে এই দেশটির সৃষ্টি হয় বার্লিনের সন্ধিসর্ত্ত অনুসারে। সাড়ে চব্বিশ হাজার বর্গ মাইল নিয়ে এই দেশটি;—আর অধিবাসীরা হ'চ্ছে জার্ম্মেন, রাশ্যান, তুর্কী, গ্রীক্‌ আর ইহুদী। শুধু পার্ব্বত্য প্রদেশ বল্‌লেই এর সব পরিচয় দেওয়া হয় না, কৃষ্ণসাগরের উপকূলে এ দেশটি উর্ব্বরতার জন্যও প্রসিদ্ধ। পরাধীন জাতির প্রতিভাবিকাশ নানাভাবে ব্যাহত হয়। অষ্টবিংশ শতাব্দীর পূর্ব্বভাগ পর্য্যন্ত বুল্‌গেরিয়ারও হয়েছিল তাই—তুর্কীদের অধীনে, তুরস্ক রাজভাষা হওয়ায় দেশ-প্রচলিত ভাষার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি ছিল না কারুরই। যদিও চলিত-কথা বুলগেরিয়া ভাষাতেই বলা হোত, তাহ'লেও সাহিত্য বল্‌তে কিছুই ছিল না তখন।

আঠারো-শো-পঁয়ত্রিশ খৃষ্টাব্দে প্রথম বুল্‌গেরিয়ান্‌ ব্যাকরণ প্রকাশিত হয়।

বুল্‌গেরিয়ান্‌ ভাষাকে সাহিত্য ক'রে তোল্‌বার এই যে প্রচেষ্টা, এর মধ্যে ছিলেন নোপ্‌ হিট্‌ রিল্‌স্কি। সে যুগে এঁর ব্যক্তিত্ব বিশেষভাবেই উপলব্ধ হোত। ইনি ছিলেন একটি গির্জ্জার যাজক। কিন্তু ধর্ম্মানুরাগের চেয়ে স্বদেশানুরাগই এঁর জীবনের প্রথম ও প্রধান লক্ষ্য হয়। দেশীয় ভাষাকে ব্যাকরণ ও বিস্তৃতির মধ্যে দিয়ে সত্যকারের সংশোধিত জাতীয় ভাষা ক'রে গ'ড়ে তুল্‌তে ইনি বদ্ধপরিকর হন। এঁর সেই চেষ্টার ফলেই সর্ব্বপ্রথম বুল্‌গেরিয়ান্‌ ব্যাকরণের সৃষ্টি। এই ভাষাকে প্রচার কর্‌বার জন্য ইনি কয়েকটি স্কুলেরও প্রতিষ্ঠা করেন। এঁরই আদর্শে ভবিষ্যতে বুল্‌গেরিয়ান্‌ স্কুলগুলি গ'ড়ে উঠে এঁর স্বপ্নকে আজ সত্যে পরিণত কর্‌তে চলেছে। ইনি জন্মগ্রহণ না কর্‌লে বুল্‌গেরিয়ান্‌ সাহিত্য আজ বিশ্বসাহিত্য-রসিকদের কাছে অপরিচিতই র'য়ে যেত।

আঠারো-শো-একাশী খৃষ্টাব্দে অষ্টাশী বছর বয়সে ইনি দেহত্যাগ করেন।

রিল্‌স্কি লেখক ছিলেন না, কিন্তু এদেশীয় সাহিত্যের পৃষ্ঠায় এঁরই নাম সর্ব্বপ্রথম উল্লেখযোগ্য, কেন না ইনি না থাক্‌লে এদেশের সাহিত্য তো দূরের কথা, এদেশের ভাষারও অস্তিত্ব পর্য্যন্ত থাক্‌তো না।

রিল্‌স্কির প্রেরণায় তাঁরই সমসাময়িক যুগে একজন লেখক সুপ্রতিষ্ঠিত হন, তাঁর নাম জর্জ্জ রাকোস্কী। পঞ্চাশ বছর বয়সেই আঠারো শো-সাতষট্টি সালে ইনি ধরিত্রীর বুক থেকে বিদায় লন, না হ'লে এঁর শ্রেষ্ঠত্ব হয়তো একদিন অদূর ভবিষ্যতে বিশ্বসাহিত্যে প্রতিষ্ঠিত হোত। জাতীয় সাহিত্যের প্রতি ছিল এঁর অগাধ আগ্রহ, তাই এঁর মনোবৃত্তিরও ইনি পরিচালনা করেছিলেন এইখানেই। এঁর রচনা দেশবাসীকে সাহিত্যচর্চ্চা কর্‌তে প্রলোভিত করে—বুল্‌গেরিয়ান্‌ জাতির মনোবৃত্তি ইনিই সর্ব্বপ্রথম প্রকাশ করেন এঁর সৃষ্টির মধ্যে। বুল্‌গেরিয়ান্‌রা এঁর রচনার মধ্যে নিজেদের খুঁজে পেত, নিজের দেশকে চিন্‌তে ও জান্‌তে শিখ্‌তো এবং সবার উপরে পেত জাতীয় ভাব, যা সকল দেশের সকল মানবকেই মুগ্ধ না ক'রে পারে না।

এঁর সমসাময়িক ও পরবর্ত্তী হিসাবে আর দু'জনের নাম করা যেতে পারে—প্রথম হচ্ছেন ক্রষ্টো বোটেফ্‌, দ্বিতীয় পেট্‌কো স্লাভেইকফ্‌। এঁরা দু'জনেই এ সাহিত্যের অনন্যসাধারণ কবি। শুধু অনন্যসাধারণ বল্‌লেই হবে না, এ সাহিত্যের কাব্য বল্‌তে যা কিছু বোঝা যায়, তার ভাষা ও ধারা এঁদেরই সৃষ্টি। এঁরা নিজেরা ছিলেন কবি এবং বুল্‌গেরিয়ান্‌ সাহিত্যে আধুনিক কাব্যধারা এঁদেরই ঐকান্তিক যত্নে সৃষ্ট। তদানীন্তন লোকের উপরও এঁদের প্রভাব বড় কম ছিল না। এঁরা ছিলেন স্বভাব-কবি

সেইজন্যই এঁদের রচনা ছিল সরল, ভাষার আড়ম্বরে এঁদের চিন্তাস্রোত কখনও ব্যাহত হয় নি। পাঠকরা তাই এঁদের লেখা পড়্‌তে ভালবাস্‌তো খুবই।

এঁদের দু'জনের পরে প্রতিভাসম্পন্ন কবি মাত্র একজনই জন্মেছিলেন, তাঁর নাম আইভ্যান্ ভ্যাজোফ। আঠারো-শো-পঞ্চাশ খৃষ্টাব্দে এঁর জন্ম বুলগেরিয়ার এক নগণ্য পল্লীতে। পাণ্ডিত্য ও পর্য্যবেক্ষণশক্তি ছিল এঁর অভূতপূর্ব্ব, গদ্য ও পদ্য উভয় রচনায়ই ছিলেন ইনি সিদ্ধহস্ত। সব চেয়ে বড় কথা হ'চ্ছে এই যে কোথায় পূর্ণচ্ছেদ টান্‌লে প্রগল্‌ভতা প্রকাশ পাবে না এ সম্বন্ধে এঁর জ্ঞান ছিল প্রশংসনীয়। এই প্রগল্‌ভতা-সংযমের জন্যই বুলগেরিয়ান্ সাহিত্যে ইনি অমরত্ব লাভ কর্‌বেন। লেখকের প্রত্যেকটি চিন্তাই ভাষায় প্রকাশ পেলে যে সাহিত্য হ'য়ে ওঠে না, তাঁর চিন্তা ভাষা ও প্রকাশভঙ্গীর মধ্যে যে সংযম থাকা প্রয়োজন —এই কথাটি ইনিই সর্ব্বপ্রথম বুলগেরিয়ান্ সাহিত্যে প্রচার করেন। ইতিপূর্ব্বে এ ধারণা বুলগেরিয়ান্ সাহিত্যরসিকদের ছিল না।

এঁর পরেই এ যুগের দিমিত্র আইভানোভ্‌এর কথা। 'এলিন্ পেলিন্' এই ছদ্মনামেই ইনি সমধিক প্রসিদ্ধ। আঠারো-শো-আঠাত্তর সালে 'সোফিয়া' সহরের কাছাকাছি একটি গ্রামে ইনি জন্মগ্রহণ করেন সাধারণ এক গৃহস্থ পরিবারে। প্রথম জীবনে ইনি ছিলেন একটা স্কুলের মাষ্টার। স্বজাতিকে শিক্ষিত ক'রে তোল্‌বার এঁর একটা আন্তরিক আগ্রহ আছে। গ্রাম্য জীবনের যা ইনি দেখেছেন তাই লিপিবদ্ধ করেছেন—তাই হয়েছে এঁর গল্প। আর্সীর বুকে যেমন প্রতিবিম্ব দেখা যায়, এঁর রচনার মধ্যে তেমনি কৃষক-জীবন প্রতিবিম্বিত হ'য়ে উঠেছে অতি স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যে। ইনি সর্ব্বপ্রথম প্রচার করেছিলেন যে গল্প শুধু উপভোগ্য হ'লেই হবে না, তার মধ্যে স্বদেশকে চিন্‌বার মত বিষয়বস্তু থাকা চাই। আর বুলগেরিয়ার মত দেশে ধনী সহুরে বাবুর চেয়ে দরিদ্র কৃষকের সংখ্যাই অধিক—শতকরা আশী জনই হ'চ্ছে গ্রাম্য অধিবাসী। এই আশী জনকে চিন্‌তে পার্‌বার জন্যই কৃষক-জীবনকে তিনি চিত্রিত করেছেন। ইতিপূর্ব্বে কৃষক-জীবন নিয়ে আর কেউ গল্প লেখেন নি এ সাহিত্যে। দিমিত্র আইভানোভ্‌ই এ বিষয়ে অগ্রণী, এবং এই জন্যই ইনি এ যুগের শ্রেষ্ঠ লেখক। একজন সমালোচক বলেন—"He is the first man who lived among the peasants and in the repression of self he found the power to create."—এর মধ্যেই এঁর রচনার বিশেষত্ব ও পরিচয় আমরা পাই। কিন্তু অজস্র ভাবে ইনি লেখেন না—এঁর গল্প ও কবিতাগুলি নিয়ে আজ পর্য্যন্ত দু'খানি মাত্র বই প্রকাশিত হয়েছে। উনিশ-শো-চার সালে প্রথমখানি প্রকাশিত হবার পর ইনি 'সোফিয়া' যাদুঘরের অধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত হন, এখন পর্য্যন্ত এই পদেই ইনি অধিষ্ঠিত আছেন। এঁর বিশ্ববিখ্যাত গল্প হ'চ্ছে "কমিশনারের বড়দিন"—Commissioner's Christmas.

বুলগেরিয়ান্ সাহিত্য সম্বন্ধে বেশী কিছুই বলা হ'ল না—বল্‌বার মত কিছু নেইও। এমন কোন বৈশিষ্ট্য এ সাহিত্যে নেই যার জন্য বিশ্বের বুকে এ সাহিত্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য হ'তে পারে। তার প্রধান কারণ হ'চ্ছে আমাদের দেশের লেখকদের মতই এদেশের লেখকরাও বিশেষ উৎসাহ পান না অর্থানুকূল্য তো দূরের কথা। তবে দেশটি য়ুরোপের অন্তর্গত জন্যই কন্টিনেণ্টাল সাহিত্যে এর স্থানাভাব ঘটে না। তবে সব চেয়ে বড় কথা হ'চ্ছে এই যে এ সাহিত্যে একটা স্বাভাবিকতা ও স্বচ্ছন্দ গতি আছে যে দুটি বিশেষত্ব সব সাহিত্যেই থাকা দরকার। উপরন্তু এ যুগের ধারানুবর্ত্তী হ'য়ে দরিদ্র শ্রমিক মজুর ও কৃষকদের নায়ক ক'রে সৃষ্টি কর্‌বার আগ্রহ বুলগেরিয়ান্ লেখকদের আছে—যদিও তাঁরা রুষ সাহিত্যের দ্বারা প্রভাবান্বিত।

এই তো গেল এখনকার কথা। কে বল্‌তে পারে হয় তো অদূর ভবিষ্যতে এই সাহিত্যই সর্ব্বজন-সমাদৃত একটি শ্রেষ্ঠ সাহিত্যরূপে বিশ্বসাহিত্যক্ষেত্রে সমাদৃত হবে একদিন !

ডাক্তার কুমারী যামিনী সেন

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর)

শ্রীকামিনী রায় বি-এ

বিদেশে ভগিনী একাকিনী এই আকস্মিক শোক-সংবাদে অভিভূত হইয়া পড়িবেন এই আশঙ্কায় তিনি পত্রে না লিখিয়া, স্বয়ং বার্লিনে গিয়া মুখে তাঁহাকে খবরটি শুনাইলেন এবং সান্ত্বনা ও সহানুভূতি দিবার জন্য কাছে রহিলেন। সন্তান-বিয়োগে গর্ভধারিণী জননীর যে অসহ্য বেদনা, দৈহিক সম্পর্ক বিনাও এই চিরকুমারীর মাতৃত্ব-রসে ভরা নারীহৃদয় সেই বেদনায় একান্ত পীড়িত হইয়া পড়িল। পড়াশুনায় আর কিছুতেই মন দিতে পারিলেন না, সুতরাং দেশে ফিরিয়া আসাই সমীচীন মনে হইল। তখনকার মানসিক অবস্থা—শোকের প্রচণ্ড আঘাতে হৃদয়ের হাহাকার, ঈশ্বরের করুণা ও কল্যাণময়ত্বের প্রতি ক্ষণিক সন্দেহ, বিশ্বাস ও অবিশ্বাসের দ্বন্দ্ব এবং অবশেষে ঈশ্বর-চরণে আত্মসমর্পণ, এ সকলের পরিচয় তাঁহার গোপনে রক্ষিত স্মৃতিলিপি ও দুই একটি ইংরাজী রচনা হইতে সম্প্রতি পাওয়া গিয়াছে। দেশে ফিরিবার সময় দীর্ঘ সমুদ্রপথে নির্জ্জনে আপনার বেদনা, অনুযোগ, অভিযোগ সমুদয় পরম-জননীর চরণে লইয়া গিয়া, প্রাণে তাঁহার সান্ত্বনাবাণী শুনিয়া, ক্রমশঃ শান্তিলাভ করিয়াছিলেন। ইংরাজী রচনায় এই বাণীশ্রবণ স্বপ্নরূপে বর্ণিত হইয়াছে। বাঙ্গলা স্মৃতিলিপির কিয়দংশ ও ইংরাজী রচনার যথাযথ (literal) অনুবাদ নিম্নে দেওয়া গেল। কিঞ্চিৎ দীর্ঘ হইলেও ইহার ভিতর দিয়া তাঁহার চরিত্রের একটা দিক সুব্যক্ত হইয়াছে। শৈশবের ও বাল্যের স্নেহ-বুভুক্ষা যাহা কোনদিন কেহ তাঁহার মুখে শোনে নাই, এই শোকের আঘাতে ভগবানকে তাহা জানাইয়াছেন এবং নির্জ্জনে গোপনে লিপিমুখেও তাহা প্রকাশ পাইয়াছে।

"১লা আগষ্ট—

আজ এক সপ্তাহ হইল আমার ভুটুর মৃত্যুসংবাদ পাইয়াছি। পৃথিবী সর্ব্বদা যেমন চলে তেমনি চলিতেছে, কিন্তু আমার যেন এই চিরপরিচিত পৃথিবীকে অপরিচিত বলিয়া মনে হইতেছে। * * * * কতবার মনে হইতেছে—সবই কি স্বপ্ন নয়? আবার এক এক সময় নিজের মস্তিষ্কবিকৃতি হইল না-কি বলিয়াও ভয় হইয়াছে। সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন এই, বিদেশে অপরিচিত ব্যক্তিদের সঙ্গে, যেন-কিছুই-হয়-নাই এইরূপ ব্যবহার করা। যদি একলা এক ঘরে পড়িয়া থাকিতে পারিতাম, তাহা হইলে বোধহয় শরীর ও মনের উপর এতটা জোর করিতে হইত না। দুই দিন ত চোখের জল কিছুতেই একটু ক্ষণের জন্যও থামাইতে পারি নাই। কি কঠিন আঘাতই পরমেশ্বর দিলেন। কখনও স্বপ্নেও যাহা ভাবি নাই। কোথায় তাহাকে সুস্থ সবল দেখিবার আশায় বাড়ী যাইবার জন্য তাড়াতাড়ি করিতেছি, যেখানে যাহা দেখিতেছি, তাহার জন্য সংগ্রহ করিতেছি, কত জায়গার কত গল্প বলিব ভাবিতেছি—আর কোথায় সে চলিয়া গেল! যতী এই পৃথিবী ছাড়িয়া যাইবার পরে ভুটুকে যখন বাড়ী* আনিলাম, পিতা মহাশয় বলিলেন যে মেয়েটির ভাগ্য ভাল, এত অল্প বয়সে কেহ এত দূরের দেশ দেখে না। ভাগ্য ভালই, শুধু পৃথিবীর দেশই যে দেখিয়াছে তাহা নহে, স্বর্গরাজ্যে গিয়াও সেখানকার শোভা-সৌন্দর্য্য আমাদের পূর্ব্বেই উপভোগ করিতেছে। এখানেও তো কত জায়গায়ই গিয়াছে। কতবার নেপাল গিয়াছে, হাজারিবাগে গিয়াছে,

* কলিকাতার বাড়ী।

পুরীতে গিয়াছে, ঢাকায় গিয়াছে। আমার বড় ইচ্ছা ছিল যে তাহার শৈশবস্মৃতি যেন সুখের হয়, যাহা দর্শনীয় ও শিশুজীবনের উপভোগ্য সবই যেন তাহার জীবনে ঘটিয়া উঠে, বিধাতার কৃপায় তাহা সফল হইয়াছে।

* * * * *

সময়ে সময়ে শরীর যখন অবসন্ন বোধ হইয়াছে, ভবিষ্যতে কার্য্য করার সক্ষমতা সম্বন্ধে সন্দেহ আসিয়াছে, গত দেড় বৎসরের পরিশ্রম ও অর্থব্যয় বুঝি বৃথাই হয়, মনে হইয়া আক্ষেপ করিয়াছি, তখনই ভুটুর কথা মনে হইয়া সমস্ত আক্ষেপ থামিয়া গিয়াছে। নিজের শক্তিতে যদি না কুলায় ভুটু আছে, আমার সমস্ত সাধ্য ও শক্তি দিয়া তাহাকে সুশিক্ষা দিব, সে আমার অসমাপ্ত ও আকাঙ্ক্ষিত কাজ সব শেষ করিবে। যেদিন typhoid fever হইয়াছে খবর পাইলাম (তাহার পূর্ব্বেই সে নশ্বর দেহ ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছিল) তখনও কেন পরমেশ্বর আমার মনে presentiment আনিয়া দিলেন না? আমার মন বড়ই উৎকণ্ঠিত হইয়াছিল। ছেলেমানুষ, typhoid fever, তবে বুঝি অব্যাহতি নাই। সমস্ত রাত্রি ঘুমাইতে পারি নাই, চক্ষুর জলে বালিস সিক্ত হইতেছিল। ভোরের বেলায় পরমেশ্বরের দয়ার কথা মনে হইয়া সান্ত্বনার ভাব আসিল। যিনি এতদিন এত করুণা করিয়াছেন, যাঁহারই বিধানে কোথাকার অশিক্ষিত দরিদ্রসমাজের নিম্নশ্রেণীস্থ গৃহ হইতে এমন শিশু পাইলাম, কেমন করিয়া তাঁহার করুণায় অবিশ্বাস করিতেছি? তিনি কি আমার হৃদয় দেখিতেছেন না? তিনি কি আমাকে মাতা অপেক্ষাও বেশী স্নেহ করেন না? তিনি কখনই আমাকে এমন আঘাত দিবেন না। তিনি যে আমার নিকট হইতে তাহাকে লইয়া যাইতে পারেন, এই চিন্তার জন্য পর্য্যন্ত নিজকে অকৃতজ্ঞতা দোষে অপরাধী মনে করিয়া কতই অনুতাপ করিলাম।

* * * * *

ভুটুর প্রতি আমার স্নেহের আকর্ষণ দেখিয়া নিজেই বিস্মিত হইতাম। ছোট একটি শিশুর জন্য এতদূর চিন্তা! নিজের কথা না ভাবিয়া তাহারই ভবিষ্যৎ চিন্তা দেখিয়া আমি অনেক সময় পরমেশ্বরকে আমার হৃদয় এইরূপ প্রসারিত করিয়াছেন বলিয়া ধন্যবাদ দিয়াছি। তাঁহার হাত বিশেষভাবে নিজের জীবনে উপলব্ধি হইয়াছে মনে করিয়াছি। ইয়োরোপ খণ্ডে আসিয়া রমণীর কর্ত্তব্য সম্বন্ধে অনেকটা নূতন ধারণা হইয়াছে, স্বদেশে ফিরিয়া গিয়া সমাজ-সংস্করণ বিষয়ে সচেষ্ট হইব মনে করিয়াছি। ভুটুকে বিশেষভাবে শিক্ষা দিবার সংকল্প করিয়াছি। আমাকে দিয়া কোন কাজ না হইলেও তাহাকে দিয়া হইবে আশা করিয়াছি।"

হায় রে মাতৃস্নেহ! হায় রে নারী-হৃদয়ের চরম আকাঙ্ক্ষা—আমার সাধ্যাতীত সাধনায় আমার সন্তান সিদ্ধিলাভ করুক! সংসারের কোন্ জননী না চাহেন, সন্তান তাঁহার চেয়েও কৃতী হয়? কিন্তু এখানে জননী না হইয়াও পালয়িত্রীরূপে সেই আত্মবিলোপী স্নেহ দেখিয়া মনে হয়, নারীত্বের সহিত মাতৃস্নেহ একান্তই অবিচ্ছেদ্য।

P & O. S. N. Co

"২০শে আগষ্ট— S. S. China

আমার উপরে সমুদ্রের এক ঐন্দ্রজালিক প্রভাব।

জাহাজখানা জিব্রল্টারে আসিয়াছে। অধিকাংশ যাত্রী ষ্টীমলঞ্চে চড়িয়া বন্দর দেখিতে গিয়াছেন। চারিদিকে বিষম ব্যস্ততা আর নানা রকমের বিষম শব্দ। লোকেরা দ্রুতপদে চলিতেছে, ভারী লগেজ সব উত্তোলিত হইতেছে, মেইলব্যাগ রওনা হইতেছে।

জাহাজের যে দিকটা বন্দরের দিকে সেই দিকেই এই ভিড় ও গোলোযোগ, কিন্তু বিপরীত দিকে এসব নাই। ও দিকে প্রখর রৌদ্রতাপ, আর এদিকে সবই শীতল ও নিস্তব্ধ। আমি এক লস্করকে আমার ডেকচেয়ারটা এই দিকে আনিয়া দিতে বলিলাম। সেখানে বসিয়া আমি জলে ছোট ছোট ঢেউয়ের খেলা দেখিতে লাগিলাম। আমার পীড়িত ও উত্তেজিত স্নায়ুমণ্ডলী ধীরে ধীরে যেন স্নিগ্ধ ও শান্ত হইয়া আসিল। আজ এক মাস ধরিয়া আমার হৃদয় সন্তপ্ত, অশান্ত ও বিদ্রোহী। আমার ছোট্টটির* মৃত্যুসং-

* My little one কথার এই অনুবাদ করা গেল।

বাদ আমাকে ভীষণ আঘাত করিয়াছে। আমি তাহার কাছে কবে ফিরিয়া যাইব বলিয়া দিন গুণিতেছিলাম। আজ প্রায় সতের মাস হইল আমি ইণ্ডিয়া ছাড়িয়া আসিয়াছি, আর সেই অবধি এ পর্য্যন্ত পরীক্ষার জন্যই পড়ি, অথবা দেশ-বিদেশ দেখিয়াই বেড়াই, আমার মন ছিল তাহারই কাছে। ভবিষ্যতে কি প্রণালীতে তাহাকে শিক্ষা দিব, মনে মনে কত ভাবিয়া চিন্তিয়া স্থির করিতেছিলাম। আমি তাহার জন্য কত বই, কতরকম ছোট ছোট জিনিষ কিনিয়া রাখিয়াছি, যখন যেখানে গিয়াছি সেখানকার পিক্‌চার পোষ্টকার্ড সংগ্রহ করিয়াছি, যেন ফিরিয়া গিয়া সে সকল স্থানের বিস্তৃত বিবরণ তাহাকে দিতে পারি, সেই জন্য। বাড়ী ফিরিবার দিন যত নিকটতর হইতেছিল ততই সেদিন কত আদরে, কত আনন্দে অভ্যর্থিত হইব সেই দৃশ্য কল্পনা করিয়া মনকে সুখী করিতেছিলাম। আমি দেখিতেছিলাম আমার প্রিয়জনেরা একত্র হইয়া গাড়ীবারান্দার দিকে চাহিয়া সিঁড়ীগুলির উপরের রোয়াকে দাঁড়াইয়া আছেন আর আমার ছোট্টটি নাচিয়া বেড়াইতেছে। যেমন আমার গাড়ীখানা গাড়ীবারান্দায় ঢুকিল সে আনন্দে মা-মা বলিয়া চেঁচাইয়া উঠিল, নামিতে না নামিতে আমার কোলে ঝাঁপাইয়া পড়িল। অন্যেরা তাহাকে এই অধৈর্য্যের জন্য তিরস্কার করিতেছেন, শুনিলাম। বাড়ী ফিরিবার দিনের এই স্বপ্ন আমাকে কতই না আনন্দ দিয়াছে।

ভগবান আমাকে এই বিদেশে এমন নিরাপদে রাখিয়াছেন সেই জন্য আমার হৃদয় তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতায় পূর্ণ ছিল। তিনি আমার এত কল্যাণ করিয়াছেন, তাই আমিও সংকল্প করিয়াছিলাম যে, আমি প্রাণপণ শক্তিতে তাঁহার সেবা ও মানবজাতির সেবায় নিযুক্ত থাকিব। আমি সারাজীবন নিঃসঙ্গ, নিপীড়িত। কিন্তু এই ইয়োরোপ প্রবাসের সফলতার পর—তাঁহার এই এত করুণালাভের পর, আমি আর তো অভিযোগ করিতে পারি না। আর আমার নিঃসঙ্গতার দুঃখ থাকিবে না, আমার ছোট্টটি যে আছে, সে যে আমার জীবন মধুময় করিবে। আমি শিশুকালে চিরদিন একলা ছিলাম। আমার প্রকৃতিটা কেহ বুঝিত না, কেহ আমাকে আমার ভিতর হইতে টানিয়া বাহির করিতে পারিত না। একটুখানি মিষ্ট ব্যবহারের জন্য আমি কত লালায়িত ছিলাম, কিন্তু কেহ তাহা জানে নাই। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে আমি একটা চাপা স্বভাবের বালিকা গড়িয়া উঠিলাম। আমার ব্যবহার নিতান্ত শুষ্ক হইয়া উঠিল, লোকে আকৃষ্ট না হইয়া দূরে সরিয়া যাইত। আমার মানুষ-ভাই-বোনদের প্রতি বিরাগ বা বিদ্বেষবশতঃ এরূপ হইয়াছে, তাহা নহে; ইহার মূলে ছিল আমার অতিরিক্ত সংকোচ বা লাজুকতা এবং নিজের সম্বন্ধে হীনতাবোধ। সে যাহা হউক, এতকাল পরে আমি ভাবিতেছিলাম যে, অবশেষে আমিও সুখী হইতে যাইতেছি, আমি সম্পূর্ণ নূতন মানুষ হইতে চলিয়াছি।

এমন সময়ে অকস্মাৎ আমার ছোট্টটির মৃত্যুসংবাদ আসিল। সব যেন ছিন্ন চূর্ণ হইয়া গেল। কি যে হইয়াছে সম্যক্ উপলব্ধি করিতেও পারিলাম না। এও কি হয়, ভগবান্ আমার এইটুকু সুখে বাদ সাধিবেন? আমার তো নিজের বলিতে আর কিছুই নাই। অন্যেরা জীবনে কত সুখ সম্ভোগ করে। তাহাদের কত বন্ধুবান্ধব, কত ভালবাসা, কত টাকাকড়ি, হাজারো রকমের কত কিছু আছে। আমার কিছুই ছিল না। আমি খাটিয়াছি অন্যদের সুখী করিবার জন্য; যে অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছি তাহা অন্যদের সাহায্যের উদ্দেশ্যে। নিজের জন্য অতি অল্পই ব্যয় হইয়াছে। সর্ব্বদা সকল বিষয়ে নিজের প্রতি কার্পণ্যই করিয়াছি। আমার কোনকালে অশন, বসন ও অলঙ্কারের জন্য অর্থব্যয় করিবার প্রবৃত্তি ছিল না। অনেক সময়ে পুস্তক কিনিতে আকাঙ্ক্ষা হইয়াছে বটে, কিন্তু আমার সে আকাঙ্ক্ষাও আমি পূর্ণ হইতে দিই নাই। আমি ইয়োরোপে আসিবার জন্য যে বৃত্তি চাহিয়াছিলাম, তাহার কয়েকটি উদ্দেশ্য ছিল। প্রথমতঃ ভাল বেতনে বড় চাকরী পাইলে আমার ছোট্টটিকে খুব ভাল শিক্ষা দিতে পারিব, দ্বিতীয়তঃ নারীজাতির পদগৌরব বাড়াইতে পারিব। এতদ্ভিন্ন জ্ঞানলাভ ছিল অপর উদ্দেশ্য। ব্যক্তিগত ভাবে আমার নিজের জন্য কিছুরই আবশ্যক ছিল না। এখন দেখিতেছি আমার সকল উদ্যম, সকল পরিশ্রম নিষ্ফল হইল।

আমার প্রতি অদৃষ্টের অবিচারের কথাই বার বার মনে

হইতেছে। আমার প্রতি এতবড় নিষ্ঠুর আচরণের জন্য ভগবানকেও আমি দোষী করিতেছি। আমার শোকাচ্ছন্ন মন স্বভাবতঃই বিকল হইয়া পড়িয়াছে। ভগবানকেও বিচার করিবার স্পর্দ্ধা রাখি বলিয়া যেন একটা অস্বাভাবিক গর্ব্ব অনুভব করিতেছি। হায়রে ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র মানবত্বের অহঙ্কার!

লণ্ডনে প্রত্যেক মানুষ, প্রত্যেক জিনিষ আমাকে উত্যক্ত করিত। বেচারা সুধীর যথাসাধ্য আমাকে সুখী করিতে চেষ্টা করিয়াছে; আমি কিন্তু তাহার প্রতি প্রথম প্রথম বড়ই দুর্ব্যবহার করিয়াছি, কিন্তু তাহার মিষ্ট স্বভাব ও ধৈর্য্য আমাকে ক্রমে জয় করিয়াছে। আমি যতক্ষণ তাহার কাছে থাকিতাম মুখে প্রফুল্লতা দেখাইবার যথাসাধ্য চেষ্টা করিতাম, কিন্তু তখনও হৃদয়ের মধ্যে শোকের দংশন সমান ভাবেই পীড়া দিত।

সমুদ্র আমার মনের উপর আশ্চর্য্য মায়াজাল বিস্তার করিয়াছে। আমার হৃদয় যেন জুড়াইয়া দিতেছে। আমি যে কত ক্ষুদ্র, কত অকিঞ্চিৎকর, তাহা বুঝাইয়া দিতেছে; ওর স্নেহমধুর স্বরে আমাকে বলিতেছে—'ওরে অবুঝ, ভগবান্‌কে বিচার করিতে বিচারকের আসনে বসিয়াছ?' তাইতো! এই যে আমার ক্ষুদ্র জ্ঞান লইয়া এত অহঙ্কার, এ জ্ঞান কোথা হইতে পাইলাম? এ যে সেই মঙ্গলময় মহান্ পরমেশ্বরের অসীম জ্ঞানের ক্ষুদ্রতম কণিকা মাত্র। কি স্পর্দ্ধা আমার, আমি তাঁহার মঙ্গল ভাবের অতল রহস্য উদ্ভেদ করিতে চাই?

আজ সমুদ্র আমাকে ঘুমপাড়ানিয়া গান গাহিয়া স্বপ্নরাজ্যে পাঠাইয়াছিল। আমি স্বপ্নে দেখিলাম, যেন আমি আমাদের জীবনদাতা মহান্ পুরুষের সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছি। আমি ঠিক দৃষ্টি দ্বারা দেখি নাই, কিন্তু আমি তাঁহার উপস্থিতি অনুভব করিতেছিলাম, তাঁহার স্বর শ্রবণ করিতেছিলাম। আমি 'স্বর' ও 'শ্রবণ' এই দুই শব্দ ব্যবহার করিতেছি, কারণ ঠিক কি করিয়া মনের অনুভূতি বুঝাইব জানি না। মানুষের ভাষায় কেবল এইরূপেই তাহার প্রকাশ সম্ভব। সেই স্বর যেন বলিতেছিল—'বাছা, তুমি ক্লিষ্ট, তুমি অসুখী, তোমার হৃদয় সংশয় ও অজ্ঞানে আচ্ছন্ন। আমি যদিও তোমার হৃদয়খানি ভাল করিয়াই জানি, তবু আমি চাই, তুমি আমার কাছে তোমার মনের সকল কথা খুলিয়া বল।'—আমি বলিলাম, তুমি কেন সকলের সঙ্গে একরকম ব্যবহার কর না? এ সংসারে কেহই সম্পূর্ণ সুখী নহে সত্য, কিন্তু তথাপি প্রত্যেকেরই ব্যক্তিগত জীবনে কিছু না কিছু সুখ আছে, আমার ভাগ্যে তাহা ঘটে নাই। আর কাহারও একটু সুখ আছে বলিয়া আমি যে অসন্তুষ্ট তাহা নহে। মানুষ যে পরিমাণে দুঃখ ভোগ করে, তাহার তুলনায় তাহার সুখটুকু অতি সামান্য। আমার যদি সাধ্য থাকিত, আমি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া, এমন কি নিজের সুখ বিসর্জ্জন দিয়াও অন্যের সুখ বৃদ্ধি করিতাম। আমার অভিযোগ এই যে, যে দুঃখ না দিলেও চলে, সেই অনাবশ্যক দুঃখ তুমি দিয়া থাক। আমার সেই ছোট্ট শিশুটি, সে তো কাহারও সুখের পথে বাধা ছিল না; বরং সে ক্ষুদ্র জীবনটুকু এত সুখে ভরা, এমন আনন্দময় ছিল, যে, যে কেহ তাহার কাছে আসিয়াছে তাহারই উপরে আপনার আনন্দ-কিরণ বর্ষণ করিয়াছে। এমন একখানি জীবন আমার নিকট হইতে কেন কাড়িয়া লইলে? তুমি কি আমার হৃদয়ের শূন্যতা দেখিতেছ না? তুমি কি দেখিতেছ না, যে আমার যাহা কিছু শক্তি ছিল, আমার মধ্যে যাহা কিছু রাখিবার মত ছিল, তুমি তাহার সঙ্গে সঙ্গে সে সমস্তই লইয়া গিয়াছ? আমার মনে হয় আমার জীবনে আর কিছুই নাই। আমি একলা এই ভগ্ন হৃদয় লইয়া কিরূপে সংসারের সম্মুখীন হইব? তুমি চিরদিন আমার প্রতি কঠিন। যখন আমি শিশু ছিলাম, আমার মনে আছে, আমি আমার মাতার স্নেহ, মায়ের আদর-মাখা স্পর্শের জন্য কত ক্ষুধিত থাকিতাম, কিন্তু তাহা পাই নাই। যদি তুমি আমার স্নেহের ক্ষুধা না-ই মিটাইবে, তবে কেন এমন হৃদয় দিলে যাহা স্নেহের জন্য এত ব্যাকুল? কেন আমাকে স্নেহ-ভালবাসার অনুভূতি দিলে, অনুভূতিহীন অথবা উদাসীন করিলে না কেন? যদিও আমার হৃদয় প্রীতি ও সহানুভূতির জন্য ব্যাকুল ছিল, তবু আমি সেজন্য অভিযোগ করি নাই, নিজের অদৃষ্ট লইয়া সন্তুষ্ট থাকিতেই চেষ্টা করিয়াছি। তারপর এই শিশুটিকেই ভালবাসিতে, পরম স্নেহে লালন পালন করিতে দিলে কেন, যদি বেশী দিন ইহাকে আমার কাছে না-ই রাখিবে? আমি এতকাল সব

সহ্য করিতে পারিয়াছি কিন্তু এই শেষ পরীক্ষা আমার সাধ্যের অতীত।

সেই জ্যোতিঃপুরুষ বলিলেন—'শোন বৎসে, কোন শুভ সাধনা নিষ্ফল হয় না। তুমি সত্য বলিয়াছ, তোমাকে কোমলতা, স্নেহ ও সহানুভূতি দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু এ সকল মহত্তম মঙ্গলের জন্য নিয়োগ করিবে। তোমার সমস্ত ভালবাসা কি তুমি আমাকে দিতে পার না?' আমি বলিলাম—তুমি এত মহান্, বুদ্ধির এমন অগম্য, তুমি চিন্ময় সত্ত মাত্র, আমি তোমাকে আমার সমস্ত ভালবাসা দিয়া তৃপ্তি পাই না। আমি তো বিদেহী আত্মা নই; আমি একটা মানুষ মাত্র; আমি যাহাদের ভালবাসি তাহাদের সুখ ও কল্যাণের জন্য আমি আমার সমুদয় শক্তি নিয়োগ করিতে চাই। আমি এত ক্ষুদ্র, এত তুচ্ছ, তুমিও আমাকে তেমন করিয়া ভালবাসিতে পার না, যেমন একজন মানুষ আর একজন মানুষকে ভালবাসিতে পারে। তাহা ছাড়া, মানুষের মধ্যই এ পৃথিবীতে যত সাধু মহাত্মা আছেন, তাঁহাদের তুলনায় আমি কোন্ ছার; নিশ্চয়ই আমার চেয়ে তাঁহারাই তোমার প্রিয়তর। যে তুমি সকল জ্ঞান-বিজ্ঞানের আকর, সে তুমি কি আমার ছোট ছোট নিরাশার ব্যথা, আমার ব্যর্থ অনুশোচনা, দুঃখ দুর্ভাবনা শুনিবার জন্য একটুও আগ্রহযুক্ত হইবে? না না, তুমি যে আমার পক্ষে অতিশয় মহান্, তোমার ভালবাসা আমাকে তৃপ্তি দিতে পারে না। আমি এক অবস্তু সত্তা, একটি ভাব মাত্র লইয়া সুখী হইতে পারি না। আমি একটা মানুষের মত একজন চাই।

তখন সেই জ্যোতির্ময় সত্তা অতি করুণার্দ্র কণ্ঠে বলিলেন—'অবুঝ হইও না, আমার দিকে চাও, আমার কথা শোন। তুমি আমাকে সম্যক্ উপলব্ধি করিতে পার না, কারণ আমি সমগ্র, আর তুমি আমার অংশ মাত্র। কিন্তু বিশ্বাস কর, যে, আমি—এই আমি তোমাকে ভালবাসি। তোমার প্রতি আমার যে ভালবাসা তাহা মানুষের সকল ভালবাসার চেয়ে বড়। আমার ভালবাসা তোমার সবচেয়ে অসম্ভব স্বপ্নেরও অতীত। আমি তোমার স্রষ্টা, তোমার জীবনদাতা, তোমার প্রেম ভিক্ষা করিতেছি। ওরে আমার অবোধ সন্তান, তুই বলিতেছিস্ আমি তোকে তেমন করিয়া ভালবাসিতে জানি না, যেমন করিয়া মানুষ মানুষকে ভালবাসে? ভালবাসার ভাব কে মানুষদের দিয়াছে? সে যে আমি। কে ভালবাসা প্রকাশ করিতে শিখাইয়াছে?—সে যে আমি। কোন মানুষ আমার ভালবাসার গভীরতা ও প্রসার ইয়ত্তা করিতে পারে না। আমি তোমাকে আমার জন্য চাহিয়াছি। সেই উদ্দেশ্যেই তোমাকে সৃষ্টি করিয়াছি। আমিই তোমার হৃদয় কোমল, স্নেহময় ও পরদুঃখকাতর করিয়াছি। তুমি তোমার বাল্যে বেশী স্নেহ পাও নাই সত্য, কিন্তু স্নেহের অভাবে আমি তোমার হৃদয়টুকু অনুভূতিহীন ও উদাসীন হইতে দিই নাই। আমি তোমার ব্যথিত, পীড়িত হৃদয়খানি আমার দিকে আকর্ষণ করিয়াছি। তুমি স্মরণ করিয়া দেখ, তোমার মনে পড়ে কি না, যে যদিও তুমি তখন ক্ষুদ্র বালিকা ছিলে এবং যদিও বালবুদ্ধিতে আমাকে উপলব্ধি করা সম্ভব নয়, তথাপি তুমি অন্য সব শিশু হইতে একটু ভিন্ন রকমের ছিলে। তুমি আমার কাছে আসিয়া তোমার সমস্ত মনখানি খুলিয়া ধরিতে, আমার কাছে তোমার সব ছোটখাটো অভিযোগ ও নিরাশার ব্যথা লইয়া আসিতে। আর আর ছেলে মেয়েরা যেমন সান্ত্বনার জন্য মায়ের কাছে যায়, তেমনি করিয়া তুমি আমার কাছে আসিতে। কিন্তু শেষ দিকে তোমার মন কঠিন হইয়া যাইতেছিল, তাই আমি তোমার মনের স্বাস্থ্য ফিরাইয়া আনিবার জন্য এই শিশুটিকে উপায়রূপে নিয়োগ করিয়াছি। তুমি এমন শুষ্ক কঠিন ও মনচাপা হইয়া যাইতেছিলে যে, তোমার মন পৃথিবীর দুঃখক্লিষ্ট ভাইবোনদের জন্য ক্লেশ অনুভব করিলেও সহানুভূতি প্রকাশে তুমি অক্ষম ছিলে। সহানুভূতির নির্ম্মল প্রস্রবণ মৌনতার কঠিন আবরণে অবরুদ্ধ হইয়াছিল। যদি এই শিশুকে দিয়া সেই আবরণ অন্তরিত না করিতাম সে নির্ঝর একেবারেই শুষ্ক হইয়া যাইত।

'শিশুর মৃত্যুতে তুমি নিদারুণ শোক পাইয়াছ। কিন্তু আত্মা যে অমর। সে তো সত্যই মরে নাই, তাহার স্মৃতি নিরন্তর তোমার সঙ্গে থাকিবে। তাহার এখানকার জীবন সুখময় ছিল, তাহারই উদ্দেশে তুমি আর কোন শিশুকে সুখী করিতে চেষ্টা কর, তবেই

পৃথিবীর পক্ষে মৃত হইয়াও সে তোমার অন্তরে কল্যাণ-কর্ম্মের অনুপ্রাণনা হইয়া থাকিবে।

'আমি জানি তুমি এই শিশুর চরিত্র গঠন করিবার জন্য কত উপায় কল্পনা করিয়াছে। তোমার পরিমিত বুদ্ধিতে যতটা সম্ভব, তাহাকে তুমি নিখুঁত করিয়া গঠন করিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলে। তোমার ক্ষুদ্র কল্পনা ব্যর্থ হইল বলিয়া তোমার মন নিরাশায় ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। কিন্তু তুমি কি বোঝ না, যে, আমি তোমার চেয়ে তাহার ভাল অভিভাবক। আমি যে তোমার দায়িত্বভার ঘুচাইয়া তাহাকে আমার আশ্রয়ে গ্রহণ করিলাম সেজন্য আনন্দিত হও।

'তুমি তোমার সমস্ত জীবনের দিকে ভাল করিয়া দৃষ্টি-পাত কর, দেখ, আমি তোমাকে কত যত্নে রাখিয়াছি, তোমাকে প্রত্যেক পাপপ্রলোভনের আকর্ষণ হইতে রক্ষা করিয়াছি। তোমার ব্যক্তিগত জীবনে তুমি কোন সুখ পাও নাই বলিয়া অভিযোগ করিতেছ। তুমি বলিতেছ, এ পৃথিবীতে প্রত্যেক মানুষই কিছু না কিছু সুখ পায়; কিন্তু সুখ যে কি, সে বিষয়ে প্রত্যেক মানুষের ভিন্ন ধারণা। তোমায় যাহারা জানে, যাহারা তোমার বন্ধু, তাহারা প্রায় সকলেই বলিবে, তোমার জীবন অবিমিশ্র সুখের জীবন। যাহার যে বেদনা তাহা কেবল তাহার আপন হৃদয়ই জানে। তোমার ভিতরে সহানুভূতির জন্য যে ক্ষুধা ও তাহার অভাবে যে দুঃখ, তাহা অপরে কল্পনা করিতেও পারে না। তাহারা কল্পনা করিতে পারে না, এক একটি প্রিয়জনের বিচ্ছেদ তোমার প্রাণে কি শূন্যতা, কি কঠিন বেদনা রাখিয়া যাইতেছে। হৃদয় যখন নিরানন্দ তখনও মানুষকে হাসিমুখে বেড়াইতে হয়, দেখাইতে হয়, যেন কিছুই হয় নাই। আমি ভিন্ন মানুষের হৃদয়ের বেদনা আর কেহ দেখিতে পায় না। তাই, অন্যের সঙ্গে তুলনা করিয়া তোমার নিজেকে দুঃখী মনে করা একটা ভুল। আমি তোমাকে ভালবাসি, আমি তোমাকে চাই। তুমি কি আমাকে তোমার সমস্ত হৃদয়খানি দিবে না?'

সুমিষ্ট রাগিণীর মত সেই স্বর আমার মর্ম্মে মর্ম্মে প্রবেশ করিল, আমার হৃদয় বেগে স্পন্দিত হইতে লাগিল আমি কাঁপিতে লাগিলাম। তাহার পর সহসা এক অনির্ব্বচনীয় শান্তি ও অপূর্ব্ব বাৎসল্যরস আমাকে অভিষিক্ত করিল।

ঠিক এই সময়ে ষ্টীমলঞ্চ প্রত্যাগত যাত্রীদের লইয়া জাহাজের পার্শ্বে আসিয়া লাগিল। আগন্তুকদের সোল্লাস-ধ্বনি, ডাকাডাকি হাঁকাহাঁকিতে আমার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। চোখ খুলিয়া প্রথমতঃ আমি বুঝিতে পারিতেছিলাম না আমি কোথায় আছি। তাহার পর সকল কথা মনে হইল। কিন্তু অনুভব করিলাম আমার হৃদয় এক অপূর্ব্ব শান্তিতে পূর্ণ হইয়াছে।"

(ক্রমশঃ)
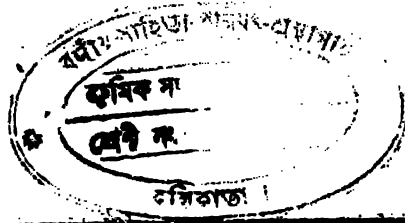
নেত্রকোণা

মহিলাদের সঙ্ঘবদ্ধভাবে সম্মেলন, স্বাস্থ্যের উন্নতি, শিক্ষার প্রসার, কুটীরশিল্পের বিস্তার, অসহায়া বিধবাদের সাহায্য, নীতি ও ধর্ম্মের আলোচনা, পরস্পর সহানুভূতি ও সেবা-শুশ্রূষাদি দ্বারা নারীসমাজের ও শিশুগণের কল্যাণ-সাধন, এইরূপ কয়েকটি প্রধান উদ্দেশ্য লইয়া বিগত ১৩৩৬ সনের ১৫ই বৈশাখ নেত্রকোণা নারীমঙ্গল সমিতির প্রতিষ্ঠা।

বর্ত্তমানে সমিতিতে পাঁচটি মাত্র তাঁত আছে এবং তাহাতেই পরস্পর সাহায্য গ্রহণে অনেকে তোয়ালে, গামছা, লণ্ঠনের সলিতা প্রভৃতি প্রস্তুত শিক্ষা করিয়াছেন ও করিতেছেন। তাঁত তৈয়ার করাইয়া শিক্ষা করা সকলের সম্ভবপর হইবে না বুঝিয়া সমিতির তাঁত দিয়া যথাসম্ভব সাহায্য করা যাইতেছে।

এই সমিতির কার্য্যনির্ব্বাহক সভার সভ্যা শ্রীযুক্তা সরোজিনী সেন-রায় এক অত্যাবশ্যক ও গুরুতর দায়িত্বপূর্ণ কাজে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া সাহায্য করিতেছেন। আশা করি অনতিগৌণে উহার প্রতি সকলের সমুচিত দৃষ্টি আকৃষ্ট হইবে। বস্তুতঃ নারীমঙ্গল ও শিশুমঙ্গলের উহা এক প্রধান সোপান। তিনি সহরের বিভিন্ন স্থানে আলোচ্য বর্ষে ৩৭ জন মহিলাকে তাঁহাদের প্রসবে সাহায্য করিয়া স্থানীয় মহিলাসমাজের মহদুপকার সাধন করিয়াছেন ও করিতেছেন। তাঁহার এই গুরুতর দায়িত্বপূর্ণ কাজের জন্য সমিতির পক্ষ হইতে অন্তরের সহিত তাঁহাকে আমাদের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

আমাদের সভানেত্রী শ্রীযুক্তা শ্যামাসুন্দরী দেবীও সহরের নানা স্থানে ঘুরিয়া মহিলাদের প্রসবকার্য্যে সাহায্য এবং অসুখে সেবা-শুশ্রূষায় যথাসাধ্য সহায়তা করিয়া স্থানীয় মহিলাসমাজে সকলের প্রীতিভাজন হইয়াছেন। তাঁহার এই উপকারের জন্য আমরা তাঁহাকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ দিতেছি।

এতদঞ্চলে বন্যা ও অজন্মার ফলে দারুণ দুর্ভিক্ষ দেখা দেওয়ায় গুরুতর অন্নবস্ত্র-সঙ্কট উপস্থিত হয়। এই দুর্ভিক্ষের উপশম কল্পে এই সমিতির স্থাপিত তহবিল হইতে প্রায় এক শত পুরাতন কাপড় ও কয়েক মণ চাউল দান করা হইয়াছে। মহকুমাব্যাপী অভাব সুদীর্ঘ কাল থাকায় আমরা এই দুর্ব্বৎসরে প্রয়োজনমত ও আশানুরূপ কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতে পারি নাই।

আমাদের সমিতির অন্যতমা সভ্যা নেত্রকোণার মোক্তার ৺গোপীনাথ বিশ্বাস মহাশয়ের সহধর্ম্মিণী শ্রীযুক্তা নিত্যময়ী বিশ্বাস মহাশয়া তাঁহার যাবতীয় স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি স্থানীয় ৺শ্রীশ্রীকালীমাতার সেবায় উৎসর্গ করিয়া নারী-সমাজের বিশেষতঃ আমাদের সমিতির যে গৌরববর্দ্ধন করিয়াছেন, তজ্জন্য সমিতির পক্ষ হইতে আমরা তাঁহাকে অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। আশা করি আমাদের নারীসমাজে এই দৃষ্টান্তের অনুকরণের অভাব হইবে না।

আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে বলিতে পারি যে মহিলাদের মধ্যে অবাধ মেলামেশা, সদালাপ, সদ্‌গ্রন্থ পাঠ, সদনুষ্ঠান ও

সৎকার্য্যে যোগদান, বিপদে সাহায্য, অসুখে সেবা ইত্যাদির ফলে প্রত্যেকে প্রত্যেকের সহিত যে ভক্তি, স্নেহ ও প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ হন, তাহা ভাবিলেও মন আনন্দে আপ্লুত হইয়া উঠে। বস্তুতঃ এই সমিতির মধ্য দিয়া মহিলাদের অবাধ মেলামেশা, সদালাপ,সদ্‌গ্রন্থ পাঠ ইত্যাদির ফলে মহিলাদের মধ্যে একটা একতা ও প্রীতির যে ভাব হইয়াছে তাহাতে একে অন্যের প্রতি বিপদে সাহায্য, অসুখে সেবা-শুশ্রূষা করা বা সহানুভূতি দেখান বাস্তবিকই কর্ত্তব্যের মধ্যে দাঁড়াইয়াছে। উহাতে মনের সংকীর্ণতা দূর হয়, প্রাণে দয়া ও স্নেহের ভাব আসে, একতার বাঁধন শক্ত হয়, শিক্ষার পথ প্রশস্ত হয়।

গত কয়েক মাস হইতে এই সমিতির একটি পুস্তকালয় স্থাপিত হইয়াছে। উহাতে ইতিহাস, জীবনচরিত, শিক্ষা, সমাজ, নীতি, ধর্ম্ম ইত্যাদি নানা বিষয়ের বই অনেকে দান করিয়াছেন। যাঁহারা এই পুস্তকালয়ে পুস্তক দান করিয়াছেন, অথবা যাঁহারা এই প্রতিষ্ঠান স্থাপনে যথাসাধ্য সহায়তা বা সাহানুভূতি দেখাইয়াছেন, তাঁহাদিগকে আমরা কৃতজ্ঞতার সহিত সর্ব্বান্তঃকরণে ধন্যবাদ দিতেছি।

বর্ত্তমানে সমিতির সভ্যাসংখ্যা ৯৬ জন। আলোচ্যবর্ষে সমিতির সাধারণ সভা ৮টি ও কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির ৩টি সর্ব্বসমেত ১১টি সভার অধিবেশন হইয়াছে। তাহাতে নারীমঙ্গল ও শিশুমঙ্গল সংক্রান্ত প্রবন্ধাদি পাঠ ও নানা বিষয়ের আলোচনা হইয়াছে।

আলোচ্য বর্ষে সহকারী সম্পাদিকা শ্রীযুক্তা বীণাপাণি দাসগুপ্তা ও কার্য্যকরী সমিতির সভ্যা শ্রীযুক্তা লাবণ্যপ্রভা দেবী সমিতির সভ্যাপদ ত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহাদের শ্রমশীলতা ও একনিষ্ঠতার তুলনা নাই।

সহকারী সম্পাদিকা শ্রীযুক্তা বীণাপাণি সেন গুপ্তা গত কয়বৎসর অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া সমিতিকে যে ভাবে সাহায্য করিয়াছেন তাহাতে তাঁহার কার্য্যভার ত্যাগে সমিতি নিতান্তই ক্ষতিগ্রস্ত।

দেশের এই অর্থসঙ্কটের জন্য গত শ্রাবণ মাস হইতে কার্য্যকরী সমিতির সভ্যাদের চাঁদা মাসিক ১৲ স্থলে ।০ আনা ও সাধারণ সভ্যাদের চাঁদা মাসিক ।০ আনা স্থলে ৵০ আনা করা হইয়াছে।

আলোচ্য বর্ষে মোট ১৮২৮৩ জমা এবং ১১৮৮৬ খরচ হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত ১৩৩৭ সনের তহবিল মধ্যে ২০৮৸৶ পাই সভানেত্রী শ্রীযুক্তা শ্যামাসুন্দরী দেবী মহাশয়ার নামে নেত্রকোণা লোন আফিসে অস্থায়ী ভাবে আমানত আছে।

অবশেষে যাঁহার সাহায্যে ও অক্লান্ত পরিশ্রমে এই সমিতি চলিয়া আসিতেছে এবং যিনি নানাপ্রকার বাধা-বিঘ্ন লোকনিন্দা উপেক্ষা করিয়াও এই দায়িত্বপূর্ণ গুরুভার কার্য্য বৃদ্ধ বয়সে চালাইয়া আসিতেছেন, আমাদের সেই মাতৃস্থানীয়া সভানেত্রী শ্রীযুক্তা শ্যামা-সুন্দরী দেবীকে সমিতির পক্ষ হইতে কৃতজ্ঞতার সহিত ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

শ্রী শৈলরাণী মজুমদার,
সম্পাদিকা

ইতিনা (যশোহর)

গত ২৬শে মার্চ্চ তারিখে আমাদের মহিলাসমিতির তৃতীয় বার্ষিক উৎসব সম্পন্ন হয়। ঐ সময়ে যশোহরের ডিঃ বোর্ডের সভাপতি মহাশয় বালিকাবিদ্যালয়ের পারিতোষিক বিতরণ করিয়া আমাদের উৎসাহিত করেন। স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে বক্তৃতাও তিনি করেন। এজন্য তাঁহাকে আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইতেছি।

গত ১লা এপ্রিল হইতে আমাদের বালিকাবিদ্যালয়টি সরকার কর্ত্তৃক মধ্য ইংরাজী বালিকাবিদ্যালয় রূপে গণ্য হইয়াছে। ভগবানের আশীর্ব্বাদে এতদিনে গ্রামের বালিকাদের শিক্ষার পথ প্রশস্ত হইল। এজন্য আমরা শ্রীযুক্তা মনীষা রায়ের নিকটে বিশেষ রূপে ঋণী। তিনি এখানে আসিয়া স্কুল ও মহিলাসমিতি দেখিয়া বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিয়াছেন এবং তাঁহারই যত্নে বিদ্যালয়টির এইরূপ উন্নতি সম্ভব হইল।

মহিলাসমিতির বসন্তোৎসব উৎসাহের সহিত সম্পন্ন হইয়াছে। মহিলাসমিতির সঙ্ঘবদ্ধ মহিলারা গ্রামের তথা সমগ্র দেশের মঙ্গল কামনা করিয়া ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলেন এবং পরস্পরে আশীর্ব্বাদ ও প্রীতি বিনিময় করিয়া তৃপ্তি লাভ করিয়াছিলেন।

নববর্ষে প্রতি গৃহ সুসজ্জিত করা হইয়াছিল এবং মাল্য-গন্ধ উপচারে গোমাতা ভগবতীর অর্চনা করা হইয়াছিল।

এখানে একটি সন্তরণ-প্রতিযোগিতা হয়, মহিলাসমিতি হইতে প্রতিযোগীদের শঙ্খ মাল্য উলুধ্বনি দ্বারা অভ্যর্থনা করা হইয়াছিল।

অল্পসময়ের মধ্যে ১৮ মাইল সন্তরণ করিয়া ১১ জন বালক বিশেষ কৃতিত্ব দেখাইয়াছে।

অর্থসমস্যা সমাধানের চেষ্টায় একটি শিল্প আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। মহিলারা নিয়মিত ভাবে সেখানে উপস্থিত হইয়া শিল্প শিক্ষা করিতেছেন। দর্জ্জীর কাজে সুদক্ষ একটি ছেলে ছাঁটকাট সেলাই শিক্ষা দিতেছে।

কালিয়া মহিলাসমিতির ভূতপূর্ব্ব শিল্প ও তাঁত শিক্ষয়িত্রী শ্রীমতী সরোজবাসিনী দেবী এখানে আসিয়াছেন। তিনি সম্পাদিকার বাড়ীতে থাকিয়া মহিলাদের তাঁত এবং শিল্প শিক্ষা দিতেছেন। শিল্পাশ্রম দুইটি বেশ ভাল ভাবে চলিতেছে।

বালিকা স্কুলগৃহ নির্ম্মাণের জন্য এখন অনেক অর্থের প্রয়োজন। এই অর্থসঙ্কটের দিন সেই অর্থ সংগ্রহ করাই আমাদের একতম উদ্দেশ্য হইয়াছে এবং ইহার জন্য নানাপ্রকার চেষ্টা চলিতেছে।

শ্রী কিরণশশী দেবী,
সম্পাদিকা

সাতঘরিয়া (টাটীবুনিয়া)

মহিলাসমিতির সাধারণ সভ্যাদের অধিবেশন সমিতির কোন সভ্যার নিমন্ত্রণে তাঁহার বাড়ীতে অথবা সেক্রেটারী মহাশয়ার বাড়ীতে হইয়া থাকে। বর্ত্তমানে সমিতির মেম্বর ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে। অন্যান্য নিকটবর্ত্তী গাঁয়ের মেয়েরা খুব আগ্রহের সহিত আমাদের সাধারণ সভায় যোগদান করিয়া থাকেন।

সাতঘরিয়া মহিলাসমিতির প্রত্যেক সভ্যার বাড়ীতে এক একটা ভাণ্ড রাখা হইয়াছে। সে সব ভাণ্ডে সভ্যারা প্রত্যহ তিন মুষ্টি করিয়া চাউল রাখিয়া থাকেন। সেই চাউলগুলি মাসের শেষে একসঙ্গে সংগ্রহ করিয়া মাসে ১৷৹ একমণ চাউল হইয়া থাকে। স্থানীয় জনৈক চাউল ব্যবসায়ীর নিকট চাউল সুবিধা দরে বিক্রয় করিবার বন্দোবস্ত আছে। ইহাতে মাসে ১৸৹ অথবা ২৲ টাকা হইয়া থাকে।

ইহা ভিন্ন সমিতির মেম্বরগণ প্রতিমাসে রুমাল, জামা ইত্যাদি বুনিয়া সমিতির সাধারণ অধিবেশনে সমিতিকে উপহার দেন। সাধারণ অধিবেশনেই অন্যান্য সভ্যাগণ উহা আগ্রহের সহিত কিনিয়া থাকেন।

সম্পাদিকা

কল্যাণী-সঙ্ঘ (চক্রধরপুর)

সমাজের ও জাতির কল্যাণ নারীজাতির মধ্যে। আমাদের কল্যাণী রমণীকুলের জীবন যতদিন বিধি-বিধানের সীমাহীন নিগড়ে আবদ্ধ থাকিয়া নিতান্ত দীনহীনের ন্যায় নিরানন্দতার গভীর অন্ধকারে নিমজ্জিত থাকিবে—ততদিন সামাজিক উন্নতি ও আর্থিক শ্রীবৃদ্ধির সকল চেষ্টাই বৃথা। তাঁহারা স্বাস্থ্যতত্ত্ব, শরীরপালন, কুটীর-শিল্প প্রভৃতি কল্যাণকর ও অর্থকর বিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। এইরূপ অবনত অবস্থা হইতে নারীজাতি সমুন্নত না হইলে আমাদের সমাজের কল্যাণ অসম্ভব। বাহিরের কোন শক্তিই তাঁহাদিগকে প্রকৃত কার্য্যে উদ্বুদ্ধ করিতে পারিবে না। সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে ও সমিতিবদ্ধ প্রণালীতে কার্য্য করিয়া নারীকে নিজেই সংসার ও সমাজে কল্যাণকর ও গৌরবময় অবস্থা ফিরাইয়া আনিতে হইবে। এই প্রয়োজন সফল করিতে গত ৯ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৩২ সালে কল্যাণীসঙ্ঘ স্থাপিত হইয়াছে।—

(ক) এই সঙ্ঘের প্রধানতম উদ্দেশ্য নারীর সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির চেষ্টা করা।

(খ) পরস্পরের সাহায্য ও আদান-প্রদানের দ্বারা হৃদ্যতা বৃদ্ধি এবং সঙ্ঘবদ্ধভাবে সেবাধর্ম্মের উৎকর্ষ করা।

(গ) পূজা-পার্ব্বণ, ব্রত-নিয়মের অনুষ্ঠান পুনঃপ্রচলনের দ্বারা ধর্ম্মনৈতিক উৎকর্ষ করা।

(ঘ) পারিবারিক কার্য্যাবলী, রন্ধনবিদ্যা, সূচিবিদ্যা ধাত্রীবিদ্যা, শিশুপালন প্রভৃতির শিক্ষা ও অনুশীলন দ্বারা গার্হস্থ্যধর্ম্ম এবং চারুশিল্পের উন্নতি করা।

(১) উপরোক্ত উদ্দেশ্য ও আদর্শকে ধার্য্য করিয়া জাতি-নির্ব্বিশেষে যে কোন মহিলা ন্যূনকল্পে ৵৹ এক আনা

হিসাবে মাসিক চাঁদা দিয়া এই সঙ্ঘের সভ্যা হইতে পারিবেন।

(২) একটি সভানেত্রী, একটি সম্পাদিকা ও সাত জন সভ্যা লইয়া সঙ্ঘ গঠিত হইবে। একটি কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির উপর এই সঙ্ঘের সর্ব্বপ্রকার পরিচালন-ভার ন্যস্ত রহিবে।

(৩) বার্ষিক সাধারণ সভায় কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি নির্ব্বাচিত হইবে এবং বর্ষশেষের পূর্ব্বে সভ্যাপদ শূন্য হইলে কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতিই মনোনয়ন দ্বারা তাহা পূর্ণ করিতে পারিবেন।

(৪) সর্ব্বপ্রকার কার্য্যভার ও কর্ত্তৃত্ব: কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির উপরই রহি।

শ্রী পঙ্কজিনী দে,
সম্পাদিকা

সরোজনলিনী নারীমঙ্গল সমিতি (বগুড়া)

প্রায় ৪ বৎসর হইল বগুড়ার তৎকালীন ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত এ, বি, দে মহাশয়ের পত্নী বগুড়া সহরে সরোজনলিনী নারীমঙ্গল সমিতি প্রতিষ্ঠা করেন। উক্ত সমিতির সভ্যা-সংখ্যা ৬০।৭০ ছিল। সভ্যাগণের সাধারণ শিক্ষা ও শিল্প শিক্ষার নিমিত্ত সমিতিতে একটি লাইব্রেরী ও সতরঞ্চ ও গামছা বয়নের তাঁত আছে। সভ্যাগণ উৎসাহ সহকারে শিল্পজাত নানাপ্রকার দ্রব্যাদি প্রস্তুতপ্রণালী শিক্ষা করিতেছিলেন। গত পূজার ছুটীর পূর্ব্বে শ্রীযুক্ত এ, বি, দে অবসর গ্রহণ করিলে শ্রীযুক্ত এস, এন, রায় ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট হইয়া আসেন। মিসেস্ রায় নূতন এক মহিলাসমিতি স্থাপন করেন। সরোজনলিনী নারীমঙ্গল সমিতির সেক্রেটারী মিস্ মণ্ডল নূতন সমিতির সেক্রেটারী হইয়াছেন। তিনি সরোজনলিনী সমিতির সভ্যাগণকে না জানাইয়া সরোজনলিনী সমিতির সঞ্চিত অর্থ নূতন সমিতিতে দান করিয়াছেন। সরোজনলিনী সমিতির সভ্যাগণ সেক্রেটারীর নিকট তাঁহাদের সমিতির সঞ্চিত অর্থ দাবী করিতেছেন কিন্তু সেক্রেটারী মহোদয়া এ পর্য্যন্ত উক্ত অর্থ প্রত্যর্পণ করেন নাই। জেলা জজ শ্রীযুক্ত কে, সি, চন্দের পত্নী মহোদয়ার নিকট উক্ত গোলযোগের বিষয় উল্লিখিত হইলে তিনি সেক্রেটারীকে সরোজনলিনী সমিতির অর্থ প্রত্যর্পণ করিতে উপদেশ দিয়াছেন। তথাপি সেক্রেটারী উক্ত অর্থ প্রত্যর্পণের ব্যবস্থা না করায় সরোজনলিনী সমিতির সভ্যাগণ বগুড়ার জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট উক্ত বিষয়ের মীমাংসা করার নিমিত্ত একখানি দরখাস্ত দিয়াছেন। শ্রীযুক্ত জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট মহোদয় উক্ত বিষয় মীমাংসা করিতে স্বীকার করিয়াছেন। আমরা আশা করি, জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট মহোদয় এ বিষয়ে সুবিচার করিবেন।

শ্রী সরযূবালা রায়,
সম্পাদিকা

চিত্র-পরিচয়

কালীয়-দমন

এই সংখ্যায় শ্রীযুক্ত গুরুসদয় দত্ত মহাশয় কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত একখানি প্রাচীন বাংলার "ক্রমপুষ্ট" পট হইতে "কালীয়-দমন" চিত্রখানি প্রকাশিত হইল। প্রাচীন কালের বাঙ্গালী পটুয়ারা দেবদেবীর লীলাচিত্র রচনায় কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছিল তাহার নিদর্শন আমরা এই 'কালীয়-দমন' ছবিখানিতে পাইতেছি। এমন সুন্দর বর্ণবিন্যাস (colour composition), এমন সুন্দর বর্ণের সাহসিক প্রয়োগ (bold touch) ভারতীর অন্য কোন চিত্রপদ্ধতিতে দেখা যায় না। সর্ব্বোপরি সর্পের শরীরসংস্থান ও শ্রীকৃষ্ণের গতিভঙ্গীর যেরূপ দান করা হইয়াছে, তাহাতে বাংলার নিজস্ব কলাপদ্ধতির শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন হইতেছে। আজ ইহা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে বাংলার প্রাচীন পটুয়ারা তাহাদের সুগভীর রসানুভূতির প্রকাশের ভঙ্গিমার দ্বারা, বাংলার জাতীয় সংস্কৃতিকে অবনত করে নাই, বরং বাংলাকে অন্যান্য প্রদেশের রসকলার আসরে একটি বিশেষ সম্মানজনক আসন দান করিয়াছে।

শ্রী সুধাংশুকুমার রায়

ক্ষীর ও নীর

শুকতারা—শ্রী সতীশচন্দ্র রায়। ৪৯ এ, মেছুয়া-বাজার ষ্ট্রীট্ হইতে প্রকাশিত। মূল্য—বারো আনা।

কবিতার বই। কবিতাগুলির সুরাত্মক স্বচ্ছাবশুচিশ্রী ইহার শুকতারা নাম সার্থক করিয়াছে। প্রকাশের সহজ ভঙ্গী অনেক ভাবগূঢ় রসানুভূতিকেও সরল ও হৃদ্য করিয়াছে। খণ্ডকবিতা রচনায় সতীশ বাবুর পটুতা অবশ্যই বাংলা কাব্য-সাহিত্যে অসমাদৃত হইবে না।

কয়েকটি পদসন্নিবেশে সামান্য ত্রুটি লক্ষিত হইল। যথা—

"এস মোর ফুলবনে তরুণী বাসন্তিকা!
আমি দিব গলে তোর মোহনিয়া মালিকা।"

শীর্ষপংক্তিতে একটি বর্ণ বিয়োগ বা নিম্নচরণে একটি বর্ণ যোগ করিলে এরূপ হইত না।

'বাসন্তী' নামক সুন্দর কবিতাটির প্রারম্ভেই এইরূপ ত্রুটি সত্যই মনকে পীড়িত করে।—

"......শুষ্ক শীতে এই ধরণীর বনে?
......বাহিরে এস, রহিল না ত মনে।"

এখানে 'এই ধরণীর বনে'র বর্ণবৃদ্ধি ছন্দের সূক্ষ্ম স্বর্ণতন্ত্রী ছিঁড়িয়া ফেলিয়াছে।

অন্যস্থলে, 'চন্দ্রকিরণ ঝরণা' 'জীবনেতে সান্ত্বনা' দিতে গিয়া অনুরূপ আহত হইয়াছে।

'প্রীতির আলো' কবিতাটিতে (হয় ত ছাপার ভুলে), "দুই কালো তীর, মাঝখানে চলে আলোর স্রোতস্বিনী"—ইহার পূরক পংক্তি হারাইয়া গিয়াছে।

ত্রুটি সামান্য। উল্লেখ করিলাম এই জন্য যে, সতীশ বাবু ছন্দশিল্পে অপটু নহেন; সামান্য ত্রুটিই বা থাকিবে কেন?

শেষের দিকের একাধিক অসম-ছন্দের 'কাহিনী' আমাদের ভালো লাগিল।

অত্যধিক রবীন্দ্র-প্রভাব সর্ব্বত্র পরিলক্ষিত হইলেও শুকতারার নিজস্ব প্রভা সুপরিস্ফুট এবং তাহা আমাদিগকে আনন্দিত করিয়াছে।

কলরব—শ্রী প্রবোধকুমার সান্যাল। প্রকাশক—গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্। মূল্য—এক টাকা।

অতি-আধুনিক কথাসাহিত্যে প্রবোধ বাবু সুপরিচিত ও শক্তিমান বলিয়া স্বীকৃত। বর্ত্তমান উপন্যাসেও তাঁহার শিল্পশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। প্লটের অভিনবত্ব প্রথমতঃ 'নূতন কিছু কর'র ফ্যাসান বলিয়া মনে হইয়াছিল; পরে দেখা গেল—আখ্যান-ব্যাখ্যানে এই নূতনত্বের প্রয়োজন ছিল। সহর-সমাজের একটি প্রধান অংশের চরিত্রচিত্রণ হিসাবে লেখকের পর্য্যবেক্ষণ কৃতিত্বপূর্ণ। বইখানি আমাদের ভালো লাগিয়াছে এবং অন্যান্যেরও ভালো লাগিবে, আশা করা যায়। অতি-আধুনিকত্বের আবিলতা ইহাতে নাই।

অমৃত—সম্পাদক শ্রী হরিদাস মজুমদার। বার্ষিক মূল্য—১।।০ টাকা; প্রতি সংখ্যা—৵১০ পয়সা। কার্য্যালয়—৬, মুরলীধর সেন লেন, কলিকাতা।

হরিদাস বাবু প্রতিষ্ঠিত 'অমৃত-সমাজের' কথা বঙ্গলক্ষ্মীর পাঠক-পাঠিকাগণের অবিদিত নাই। এই সমাজের উদ্দেশ্য—পার্থিব কর্ম্ম-জীবনের মধ্য দিয়া অমৃতত্ব লাভের সাধনা। এই মাসিক পত্রিকাখানি উক্ত সমাজের মুখপত্র-রূপে গত বৈশাখ হইতে (১৩৩৯) প্রকাশিত হইতেছে। "আমাদের কথা"য় সম্পাদক বলিয়াছেন,—"যাহাতে দুঃখ দূর হয়, মনের প্রসাদ লাভ হয়, স্ত্রী, পুত্র, সমাজ, দেশ ও জগতের কল্যাণ সাধিত হয়—এরূপ কর্ম্ম করা কর্ত্তব্য নয় কি? এই কল্যাণের পথ প্রদর্শন করা একটি পরম সেবার কার্য্য। এই সেবাধর্ম্মের পথে মানবমনকে পরিচালিত করিবার জন্য সেই সর্ব্বনিয়ন্তার ইচ্ছায়—অমৃতবাণী প্রচারে উৎসাহিত হইয়াছি।"

বিশিষ্ট বাণীসেবকগণ নিয়মিত ভাবে অমৃতবাণী প্রচার করিবেন। মুখ্যতঃ এই কয়েকজনের নাম সম্পাদক বিজ্ঞাপিত করিয়াছেন—"শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী, শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত বারীন্দ্রকুমার ঘোষ, শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, শ্রীযুক্ত প্রেমেন্দ্র মিত্র, শ্রীযুক্ত সরোজকুমার রায় চৌধুরী, শ্রীযুক্ত প্রবোধ সান্যাল, শ্রীযুক্ত অচিন্ত্যকুমার

সেন গুপ্ত, শ্রীযুক্ত কিরণকুমার রায়, শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র বাগ্‌চী, শ্রীযুক্ত সুবোধকুমার রায়, শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রপ্রসাদ বসু—" ইত্যাদি।

অনুষ্ঠাতার অমৃতপ্রচার ভগবদ্‌কৃপায় সার্থক হউক, ইহাই আমাদের প্রার্থনা!

মুকুল—শ্রী বাসন্তী চক্রবর্ত্তী বি-এ সম্পাদিত। বার্ষিক মূল্য—২৲; প্রতি সংখ্যা ৵০ আনা। প্রাপ্তিস্থান—২৯৪, দর্গা রোড, পার্ক সার্কাস, কলিকাতা।

ইহা বালক-বালিকাদের জন্য প্রকাশিত সচিত্র মাসিক পত্র। বৈশাখ সংখ্যা পড়িয়া দেখা গেল—মুকুল তাহার পূর্ব্ব গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে এবং ইহা শিশুমনের পরম উপভোগ্য হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী প্রভৃতি নিয়মিত ভাবে ইহাতে লিখিয়া থাকেন।

আমরা মুকুলের বহুল প্রচার কামনা করি।

—বঃ সঃ

ভারত লক্ষ্মী—শ্রী মতিলাল রায় প্রণীত। প্রকাশক—শ্রী কৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষ। প্রবর্ত্তক পাব্লিশিং হাউস, ৬১নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য—পাঁচসিকা।

গোঁড়ামিবর্জ্জিত রক্ষণশীলতা—যাহা স্বাদেশিকতা বা দেশাত্মবোধ, আত্মমর্য্যাদা বা অপরনির্ভরতা, অনমুকরণ-প্রিয়তা ও অ-দাস মনোবৃত্তির প্রতীক—এই ভাব "ভারত-লক্ষ্মী" নামক সুমুদ্রিত পুস্তকখানির সর্ব্বত্রই গ্রন্থকারের সবল লেখনীমুখে ফুটিয়া উঠিয়াছে। পুস্তকখানি তাঁহার অন্তরেরই আলোকচিত্র। বড় দরদ দিয়াই তিনি ইহা লিখিয়াছেন। আত্মস্বাতন্ত্র্য-রক্ষণাভিলাষী জাতির শক্তি-স্বরূপিণী প্রত্যেক নারী ও সেই শক্তির সংরক্ষক এবং সর্ব্ববিজয়িনী মহাশক্তির উপাসক প্রত্যেক পুরুষেরই এই গ্রন্থপ্রতিপাদ্য বিষয় ধ্যানের উপযুক্ত।

"দময়ন্তী-কথা"-রচয়িত্রী

সিঙ্গারের জন্মকথা

শ্রী প্রমোদগোবিন্দ মহলানবিশ বি, এস্‌-সি, ডিপ টেক্

পৃথিবীর গতিবেগ প্রমাণ করিয়াছিলেন প্রথমে আর্য্যভট্ট। তার ফলে, আর্য্যভট্টের অদৃষ্টে কোনরূপ লাঞ্ছনা-ভোগ ঘটিয়াছিল কি না সে কথা আমরা জানি না। বহু-কাল পরে প্রমাণিত সত্যকে বিস্মৃতির অতল হইতে উদ্ধার করিয়া মানবসমাজে পুনঃপ্রচারের চেষ্টা করিয়াছিলেন ইতালীর সুপ্রসিদ্ধ জ্যোতির্ব্বিদ এবং গণিতজ্ঞ মহাত্মা গ্যালিলেও। ইতালীর সুধী-সমাজ গ্যালিলেও'র এই প্রামাণিক সত্যকে স্বীকার করিতে পারেন নাই। ফলে, গ্যালিলেও'র অদৃষ্টে ঘটিয়াছিল অশেষ লাঞ্ছনা। সত্য প্রমাণসাপেক্ষই হো'ক, বা প্রত্যক্ষই হো'ক, মানুষ সহজে স্বীকার করিয়া লইতে চায় না—এমনি মানুষের মনের ধারা। মানবমনের এই চিরন্তন ধারার আজিও কোন ব্যতিক্রম হইয়াছে কি না সন্দেহ!

যাঁদের কল্পনায় সীবনযন্ত্র প্রথম মূর্ত্তিপরিগ্রহ করিয়া-ছিল এবং সীবনযন্ত্রের ক্রমবিকাশের ধারা অগ্রদূত, তাঁদের প্রত্যেকেই মানুষের হস্তে লাঞ্ছিত হইয়াছিলেন প্রভূত-পরিমাণে। পৃথিবীর গতিবেগ গোচরীভূত নয়, প্রমাণ-সাপেক্ষ সত্য। অজ্ঞানের ঘন তিমিরছায়ায় যখন দেশ সমাচ্ছন্ন, রক্ষণশীল মানবমন তখন অতবড় একটা যুগান্ত-কারী সত্যের বিরুদ্ধে রুখিয়া দাঁড়াইবে, ইহাতে আর আশ্চর্য্য কী! কিন্তু মাত্র দেড়শত বৎসর পূর্ব্বে, বর্ত্তমান 'সিঙ্গার' মেশিনের মত না হউক, ইহারই অনুরূপ একটা যন্ত্র লইয়া যখন সীবনযন্ত্রের একজন আবিষ্কর্ত্তা দরজিদের কাছে ইহার তৎপরতা প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, দরজিরা তখন ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার প্রাণনাশের চেষ্টা করিয়াছিল। একটা চাক্ষুষ সত্যকে মানিয়া লইতে মানুষের কতখানি কুণ্ঠা! ইহা কি দুঃখ এবং পরিতাপের বিষয় নয়?

আজ ঘরে ঘরে 'সিঙ্গার' মেশিনের প্রচলন হইয়াছে। বঙ্গলক্ষ্মীদের কাছে প্রতি অঙ্গ ইহার সুপরিচিত। প্রতি-দিনের সঙ্গী এই যন্ত্র। কিন্তু কি করিয়া, কাহার কল্পনায়

প্রথম ইহা জন্মলাভ করিল এবং কাহার কল্যাণহস্তের যাদুস্পর্শেই বা রূপপরিগ্রহ করিয়া ক্রমবিকাশের ফলে বর্ত্তমান আকার লাভ করিয়াছে, তাহা কি জানিবার বিষয় নয়? কঠোর নিপীড়ন এবং লাঞ্ছনা সহ্য করিয়া যাঁহারা আমাদের দান করিয়া গিয়াছেন বর্ত্তমানের এই অমূল্য যন্ত্র, তাঁহাদের কথা ভুলিয়া গেলে চলিবে কেন!

সূচিশিল্প মানবেতিহাসের সমসাময়িক। লোভের বশে ভগবানের আদেশ বিস্মরণ করিয়া আদিম মানবী 'ইভ' নিষিদ্ধ ফল ভক্ষণ করিলেন। তখন জন্ম নিল তাঁহার মনে প্রবল লজ্জা। সঙ্কোচ তাঁহাকে জয় করিল—লজ্জা-নিবারণের জন্য ব্যস্ত হইয়া বৃক্ষপত্র গাঁথিয়া সৃষ্টি করিলেন তাঁহার অঙ্গাবরক। সূচি-কর্ম্মের ইতিহাসেরও হইল সূত্রপাত। মানুষের প্রথম লজ্জাবরক-সীবনে আদিনারী কোন্ যন্ত্র ব্যবহার করিয়াছিলেন তার সন্ধান আমরা পাই না। তার পর কত হাজার বৎসর অতিক্রান্ত হইয়া গিয়াছে, কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সীবনযন্ত্রের জন্ম-ইতিহাসে গভীর ভাবে রেখাপাত কেহ করে নাই। সূচি-ব্যবসায়ীরাই ছিল তৎকালের সীবনযন্ত্র। কিন্তু যতই লঘু হউক না তাদের করাঙ্গুলি আর যত দ্রুতই হউক না তার গতি, সময়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া মানুষের প্রয়োজনকে নির্ব্বাক করিয়া রাখিতে তাহারা পারে নাই। শিল্পী-মনে জন্ম নিল তখন হইতেই এর একটা যান্ত্রিক রূপদানের চিন্তা।

১৭৫৫ খৃঃঅব্দে চার্লস ফ্রেডারিক ভিজেন্থল্ (Charles Frederick Weisenthal) নামে একজন জার্ম্মেন দর্জির কল্পনায় প্রথম জন্ম নিল সূচিকর্ম্মের আরো দ্রুত সম্পাদনের চিন্তা। তার চিন্তার ফল বাস্তবে পরিণত হইয়াছিল পঞ্চাশ বৎসর পরে জন্ ডান্কান্ (John Duncan) নামে গ্লাসগো'র একজন যন্ত্রবিদের হাতে। ডান্কানের হাতে রূপ পাইয়া যাহার জন্ম হইল তাহাকে সত্যিকারের সীবনযন্ত্র বলা যাইতে পারে না। ভিজেন্থল্ এবং ডান্কানের মধ্যবর্ত্তী সময়ে টমাস্ সেণ্ট (Thomas Saint) নামে লণ্ডনের একজন আস্বাব-নির্ম্মাতার মনে, স্বাধীন এবং নিরপেক্ষ ভাবে উন্নত প্রণালীতে সীবন-ব্যবস্থার চিন্তা জাগ্রত হয়। আস্বাব-নির্ম্মাতার মনে সীবন-ব্যবস্থার উন্নতি চিন্তা—আজিকার দিনে বিসদৃশ ঠেকে বটে! কিন্তু ভগবান কাহার হাত দিয়া কখন্ কোন্ কাজ সম্পাদন করাইয়া লন, তাহা বুঝিবার সাধ্য আমাদের কোথায়? ১৭৯০ খৃঃ অব্দে টমাস চামড়া সেলাই করিবার জন্য একটি যন্ত্র আবিষ্কার করিয়া তাহার স্বত্বাধিকার-সনন্দ গ্রহণ করেন। চামড়া-সম্পর্কিত অন্যান্য সনন্দের সঙ্গে ইহারও সনন্দ তিনি গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু পরে টমাস স্বয়ং ইহার দিকে আর দৃষ্টিপাত করিতে পারেন নাই। ফলে মানুষ ইহাকে ভুলিয়াই গিয়াছিল। এমন কি সনন্দ-কার্য্যালয়েও কেহ ইহার কোন খোঁজ রাখিত না। প্রায় ৮০ বৎসর পরে অভাবনীয় রূপে একদিন টমাসের এই সনন্দের কথা পুনরাবিষ্কৃত হয়। ১৭৯০ খৃঃ অব্দে টমাস চামড়া সেলাই করিবার জন্য যে যন্ত্র আবিষ্কার করিয়াছিলেন তাহার মূলনীতি এবং বর্ত্তমান যুগের প্রচলিত সীবনযন্ত্রাদির মূলনীতি প্রায় একই। টমাসের এই বিস্ময়কর আবিষ্কারের কথা এত দীর্ঘকাল সাধারণের অজ্ঞাত থাকায়, তাঁহার পরবর্ত্তীরা বস্তুতঃ ইহা হইতে কোন সাহায্যই পান নাই। স্ব স্ব চিন্তাধারায় একান্ত নিরপেক্ষভাবে সকলকেই অগ্রসর হইতে হইয়াছে। সীবনযন্ত্রের ক্রমবিকাশের ইতিহাসে এই তীর্য্যক্ গতি কতখানি ক্ষতির কারণ হইয়াছিল তাহার পরিমাণ করা আজ প্রায় দুঃসাধ্য।

টমাস সেণ্টের পরে ৮৩০ খৃঃ অব্দে ফরাসী দেশে প্রথম সীবনযন্ত্র আবিষ্কার করেন বার্থেল্মী থিমোনীয়ে (Barthelmy Thimonnier)। থিমোনীয়ে তাঁহার যন্ত্র ব্যবহার করিতেন দস্তানা সেলাই'র কাজে। দর্জিদের তুলনায় অল্প সময়ে বেশী কাজ করিতে পারেন দেখিয়া একজন অংশীদার সংগ্রহ করিয়া তিনি ব্যবসায় আরম্ভ করিলেন। ফ্রান্সের দর্জিরা থিমোনীয়ে'র এই শুভ প্রচেষ্টাকে বরণ করিয়া লইতে পারিল না। সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া তাহার বিরুদ্ধাচরণ করিতে আরম্ভ করিল। একদিন এক ক্রুদ্ধ জনতা থিমোনীয়ে'র প্রতিষ্ঠান আক্রমণ করিল। যন্ত্রপাতি লণ্ডভণ্ড করিয়াও তাহাদের তৃপ্তি হইল না—থিমোনীয়ে'কে দেশছাড়া করিয়া স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া তাহারা বাঁচিল। হতভাগ্য থিমোনীয়ে পলাইয়া আত্মরক্ষা করিল। প্যারি'র বাইরে দীর্ঘ তিন বৎসর কাজ নিজেকে

গোপন রাখিয়া ১৮৩৪ খৃঃঅব্দে সাহসে নির্ভর করিয়া আরো উন্নততর একটি সীবনযন্ত্র লইয়া থিমোনীয়ে স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। বেচারা থিমোনীয়ে! ভাগ্য তাহার রহিল অপরিবর্ত্তিত। এবারে পুরস্কার জুটিল—আরো কঠোর নিপীড়ন। গোপনে প্যারি' হইতে পলাইয়া ফ্রান্সের সহরে সহরে তাঁহার এই অদ্ভুত যন্ত্র দেখাইয়া মানুষের কৌতূহল এবং খেয়াল চরিতার্থ করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। এইরূপে কয়েক বৎসর পরে তিনি ম'গ্রিনী (Mogrini) নামে এক ধনবান ব্যক্তির দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইলেন। চুক্তিপত্র লিখিয়া আর একবার দুইজনে ব্যবসায় আরম্ভ করিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য থিমোনীয়ে'কে পরিত্যাগ করিল না। ১৮৪৮ খৃঃ অব্দে ফ্রান্সে বিপ্লব আরম্ভ হইল। থিমোনীয়ে এবং মগ্রিনী দুইজনেই ধ্বংসমুখে পতিত হইলেন। ১৮৫৭ খৃঃঅব্দে এক দরিদ্র-কুটীরে ভগ্নহৃদয় থিমোনীয়ে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। থিমোনীয়ে'র সাধনা এবং একাগ্রতার তুলনা আজ পাইব কোথায়!

থিমোনীয়ে'র প্রায় সমসাময়িক কালে, ১৮৩২ খৃঃ অব্দে নিউইয়র্কে ওয়াল্টার হান্ট নামে এক ব্যক্তি একটি সীবনযন্ত্র তৈয়ার করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়। কিন্তু হান্ট বা তাঁহার আবিষ্কৃত যন্ত্র সম্বন্ধে আর বিশেষ কোন সন্ধান পাওয়া যায় না। হান্টের পরে, আমেরিকায় যাঁহারা সীবনযন্ত্রের আবিষ্কারে খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন হাবে (Howe) তাঁহাদের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম। হাবে'ই সর্ব্বপ্রথম 'বখেয়া'-নীতির (lock stitch) সেলাই কলের আবিষ্কর্ত্তা বলিয়া পরিচিত। ভিয়েনার পলিটেক্‌নিকে ১৮১৪ সালে জোসেফ্ মাদ্যারস্‌বার্গ (Joseph Madersberg) নামে একজন দরজির আবিষ্কৃত 'বখেয়া'-নীতির সেলাই কলের অনুকৃতি পাওয়া যায় বটে, কিন্তু জোসেফ্ বা হান্ট কেহই তাঁহাদের যন্ত্রের কোনরূপ সনন্দ গ্রহণ বা তাহার বহুল প্রচারের চেষ্টা করেন নাই। ভাগ্যলক্ষ্মী হাবে'কেই আশ্রয় করিলেন। পরিপূর্ণ-খ্যাতি তাঁহার জন্য মুলতুবী রহিল। কিন্তু প্রভূত অর্থ বা অপরিসীম খ্যাতি তাঁহার ভাগ্যে একদিনেই জুটিল না। হাবে'র ইতিহাস ফ্রান্সের থিমোনীয়ে'রই অনুরূপ। হাবে'র জীবন ছিল বৈচিত্র্যবহুল। জীবনযুদ্ধে বার বার পরাজিত হইয়া অবশেষে তিনি ভাগ্যলক্ষ্মীকে জয় করিয়াছিলেন।

১৮১৯ সালে মেসাচুসাট্‌সের এক গণ্ডগ্রামে হাবে'র জন্ম হয়। কৈশোরাবসানে বোষ্টন সহরে যন্ত্রবিদ্‌রূপে জীবনযাত্রা সুরু করেন। তখন তাঁহার বয়স মাত্র কুড়ি। একদিন তাঁহার খেয়াল হইল একখণ্ড বস্ত্রের ভিতর দিয়া সূত্রনালী প্রবেশ করাইয়া অপর দিক হইতে আর একটি সূত্র দিয়া আবদ্ধ করিয়া সীবনকার্য্য সম্পাদন করিবেন। 'বখেয়া'র জন্ম হইল হাবের অদ্ভুত খেয়ালে। গবেষণা এবং পরীক্ষা চলিতে লাগিল। কিন্তু অর্থাভাবে কাজ বেশীদূর অগ্রসর হইতে পারিল না। সার্দ্ধ পাঁচ বৎসরকাল পরে ১৮৪৫ খৃঃ অব্দে বাল্যবন্ধু এবং সহপাঠী ফিসারের (Fisher) সাহায্যলব্ধ অর্থে হাবে তাঁহার প্রথম যন্ত্র তৈয়ার করিলেন। নিজের আবিষ্কারে আনন্দিত হইয়া হাবে তাঁহার যন্ত্রের বহুল প্রচারের চেষ্টায় আত্মনিয়োগ করিলেন। নবাবিষ্কৃত যন্ত্রের তৎপরতা দেখাইয়া সাধারণের সহানুভূতি এবং দৃষ্টি এদিকে আকর্ষণের জন্য তিনি বোষ্টন সহরের নামজাদা পাঁচ জন দরজিকে একদিন প্রকাশ্য প্রতিযোগিতায় আহ্বান করিয়া বসিলেন। যে স্বল্পকালে ইঁহারা পরিমিত একখণ্ড বস্ত্রকে দ্বিখণ্ডিত করিয়া পুনরায় সেলাই করিতে পারিতেন সেই সময়ের মধ্যে হাবে তাঁহার যন্ত্র সাহায্যে অনুরূপ পাঁচখণ্ড বস্ত্র সেলাই করিয়া দেখাইবেন, ইহাই হইল প্রতিযোগিতার বিষয়। প্রতিযোগিতা আরম্ভ হইল। যতক্ষণে তাঁহারা অর্দ্ধেক কার্য্য মাত্র সম্পন্ন করিলেন, ততক্ষণে হাবে তাঁহার পাঁচখণ্ড বস্ত্রই সেলাই করিয়া প্রতিযোগী এবং দর্শক সকলকে বিস্ময়াবিষ্ট করিয়া ফেলিলেন। কিন্তু বিজয়গৌরব এবং জয়োল্লাসের পরিবর্ত্তে মিলিল তিরস্কার এবং লাঞ্ছনা। পরাজয়ের অগৌরবে ক্ষুণ্ণ হইয়া দরজিরা তাঁহাকে আক্রমণ করিল। অতি কষ্টে তাঁহার যন্ত্র লইয়া ক্রুদ্ধ জনতার হাত হইতে হাবে মুক্তি পাইলেন। দরিদ্র হাবে থিমোনীয়ে'র মত দেশে দেশে, মেলায় প্রদর্শনীতে তাঁহার যন্ত্র দেখাইয়া কষ্টে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। আমেরিকায় ইহার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নিরুৎসাহ হইয়া ১৮৪৬ খৃঃ অব্দে যন্ত্রসহ তাঁহার ভাইকে ভাগ্যান্বেষণে ইংলণ্ডে প্রেরণ করিলেন। সৌভাগ্যক্রমে, লণ্ডনে উইলিয়াম টমাস (William Thomas) নামে একজন পোষাক-নির্ম্মাতার সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। উইলিয়ামের সহিত মাত্র দেড় শত পাউণ্ডে তাঁহার পেটেণ্ট বিক্রয়ের বন্দোবস্ত করিয়া হাবে'কে লণ্ডন চলিয়া আসিবার জন্য তিনি পত্র লিখিলেন। কিন্তু ক্রয়-বিক্রয়ের পূর্ব্বে এক চুক্তি হইল, উইলিয়ামের নির্দ্দেশমত যন্ত্রের কতকাংশ পরিবর্ত্তন করিয়া তাহা কার্য্যোপযোগী করিয়া দিতে হইবে। হাবে একনিষ্ঠ ভাবে ক্রমান্বয়ে দুই বৎসর কাল উইলিয়ামের নির্দ্দেশানুযায়ী পরিবর্ত্তনের কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিলেন। কিন্তু উইলিয়ামের মনোমত জিনিষ তৈয়ার করিয়া দিতে পারিলেন না। এভাবে অজস্র অর্থব্যয় করিয়া অবশেষে উইলিয়াম হাবের পেটেণ্ট ক্রয় করিবার বাসনা সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করিলেন। হাবে পুনরায় লক্ষ্মীছাড়া হইলেন। অনন্যোপায় হইয়া তাঁহার এই অমূল্য যন্ত্রটি বন্ধক রাখিয়া পাথেয় সংগ্রহ করিয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। কিন্তু তখন কে জানিত কত লক্ষ মুদ্রা ইহার মধ্যে লুক্কায়িত আছে।

ইতিমধ্যে ম্যাঞ্চেষ্টারে চার্লস্ মোরে (Charles Morey) নামে একব্যক্তি আর একটি যন্ত্র আবিষ্কার করেন। বেচারা মোরে'র কাহিনী বড়ই করুণ, মর্ম্মন্তুদ। উচ্চমূল্যে বিক্রয় করিতে পারিবেন আশা করিয়া তাঁহার যন্ত্র লইয়া মোরে যাত্রা করিলেন ফ্রান্স। উপযুক্ত মূল্য দিয়া তাঁহার যন্ত্র ক্রয় করিতে কেহ রাজী হইল না। ক্রমে মোরে ঋণগ্রস্ত হইয়া পড়িলেন। ঋণ-পরিশোধে অসমর্থ হইয়া 'মাজা' (Mazas) বন্দিশালায় কারারুদ্ধ হইলেন। তথায় অনিচ্ছায় এবং অজ্ঞানে কারাবাসের আইন লঙ্ঘন করিলেন। ফরাসী ভাষানভিজ্ঞ হতভাগ্য মোরে ফরাসী শান্ত্রীর আহ্বানের কোন উত্তরদানে অসমর্থ হওয়ায় গুলীর আঘাতে নিহত হন।

স্বদেশে ফিরিয়া হাবে দেখিলেন ইতিমধ্যে অনেকেই সীবনযন্ত্র নির্ম্মাণে ব্যাপৃত হইয়া পড়িয়াছেন। তাঁহার অনুপস্থিতির সুযোগ লইয়া অনেকে তাঁহারই পেটেণ্ট অনুযায়ী যন্ত্র নির্ম্মাণ করিতেছেন। বহু পরিশ্রমে, যথেষ্ট অর্থ সংগ্রহ করিয়া হাবে তাঁহার বন্ধকী যন্ত্র পুনরুদ্ধার করিয়া আনিলেন এবং যাঁহারা তাঁহার পেটেণ্ট অনুকরণে যন্ত্র নির্ম্মাণ করিতেছিলেন তাঁহাদের বিরুদ্ধে ক্ষতিপূরণ দাবী করিয়া মোকদ্দমা আনয়ন করিলেন। সুদীর্ঘকাল মোকদ্দমা চলিল, অর্থব্যয় হইল অজস্র। অবশেষে ভাগ্য তাঁহার প্রতি সুপ্রসন্ন হইল। হাবে'র স্বপক্ষে আদালতের ডিগ্রী হইল। তিনি সর্ব্বসমেত ক্ষতিপূরণ পাইলেন ২০ লক্ষ ডলার অর্থাৎ প্রায় ৬০ লক্ষ টাকা।

সীবনযন্ত্রের এই অদ্ভুত ইতিহাস পৃথিবীর নানা স্থানে বহু মনীষীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে যাহাকে লোকে একটা তামাসা মাত্র মনে করিয়া আনন্দ পাইত, তাহারই মধ্যে মুদ্রালক্ষ্মীর সন্ধান পাইয়া মানুষ তাহার উৎকর্ষ সাধনে ব্যস্ত হইয়া পড়িল। হাবে'র পরে সীবনযন্ত্রের অল্পবিস্তর উৎকর্ষ সাধন যাঁহারা করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে এলেন্ উইলসনের (Allen Wilson) নাম উল্লেখযোগ্য। কিন্তু পূর্ণাঙ্গতা দানের পরিপূর্ণ গৌরব মুলতুবী রহিল যাঁহার জন্য, তাঁহার নাম জগতের প্রতি ঘরে ঘরে আজ সুপরিচিত! আইজাক্ সিঙ্গার (Isaac Singer) ছিলেন নিউইয়র্কের একটা কারখানার একজন সামান্য মিস্ত্রী। কিন্তু বিধাতা যাঁহার কপালে রাজটীকা আঁকিয়া দেন, যেখানে-সেখানে তাঁহাকে মানাইবে কেন? দারিদ্র্য তাঁহাকে কতকাল নির্য্যাতিত করিবে?

একদিন নিউইয়র্কের কারখানায় মেরামতের জন্য একটি সীবনযন্ত্র সিঙ্গারের হাতে পড়িল। তাহার কলকৌশল পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে নিরীক্ষণ করিয়া আরো সহজ এবং উন্নততর যন্ত্র নির্ম্মাণের মতলব তাঁহার মনে স্থান পাইল। সিঙ্গারের রূপসজ্জা লইয়া জগতে যাহা আত্মপ্রকাশ করিল তাহাই বর্ত্তমানের সুপরিচিত সিঙ্গার সিউইং মেশিন (Singer Sewing Machine)। ১৮৫০ সালে যিনি একজন সামান্য মিস্ত্রী ছিলেন মাত্র, মৃত্যুকালে ১৮৭৫ সালে—মাত্র ২৫ বৎসর কাল সময়ের মধ্যে তিনি ৩০ লক্ষ ষ্টার্লিং মূল্যের সম্পত্তি রাখিয়া গিয়াছিলেন।

কত ক্ষুদ্র বস্তু, কিন্তু কত বিচিত্র ইহার ইতিহাস।

কেন্দ্রসমিতির কথা

বসিরহাট স্বাস্থ্য, শিল্প ও কৃষি-প্রদর্শনী

এবারেও বসিরহাটে স্বাস্থ্য, শিল্প ও কৃষি-প্রদর্শনী অন্যান্য বৎসরের ন্যায় অনুষ্ঠিত হইয়াছে। গত ১৭ই এপ্রিল হইতে ২১ শে এপ্রিল পর্য্যন্ত পাঁচ দিবস এই প্রদর্শনী খোলা ছিল। প্রতিদিন প্রাতে ৭টা হইতে ১০টা এবং অপরাহ্ণ ৩টা হইতে ৬টা পর্য্যন্ত বহু লোক এই প্রদর্শনী দেখিতে উপস্থিত হইত। এবার অতি অল্প সময়ের মধ্যে এই প্রদর্শনীর আয়োজন করিতে হইয়াছিল বলিয়া কৃষি ও শিল্প-বিষয়ক প্রদর্শিত দ্রব্যের সংখ্যা কম হইয়াছিল। কিন্তু শিক্ষা ও স্বাস্থ্য বিষয়ক বিভাগ অতি সুসজ্জিত হইয়াছিল এবং বহু লোক এই বিভাগে উপস্থিত হইত। ১৭ই এপ্রিল মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট মিষ্টার এস্, সি, মজুমদারের প্রস্তাবে রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র সেন ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের চেয়ারম্যান মহোদয় এই প্রদর্শনীর দ্বারোদ্ঘাটন করেন।

১৮ই এপ্রিল তারিখে ডাক্তার জে,এন,ঘোষাল, এ,কে, রায়, এম্, এম্, ভট্টাচার্য্য এবং পি, সি, বসুর তত্ত্বাবধানে একটি ধাত্রীবিদ্যা পরীক্ষার ব্যবস্থা হয়। বিভিন্ন গ্রাম হইতে স্থানীয় কেন্দ্রে শিক্ষাপ্রাপ্ত ১৪ জন দাই এই পরীক্ষায় উপস্থিত হন। তাঁহাদিগকে উৎসাহ দিবার জন্য পুরস্কার—নগদ টাকা এবং প্রশংসাপত্র ইত্যাদি বিতরণ করা হইয়াছিল।

১৯শে এপ্রিল তারিখ বিশেষ ভাবে মহিলাদিবস প্রতিপালিত হয়। অপরাহ্ণ ৩ ঘটিকা হইতে শিশুপ্রদর্শনী আরম্ভ হয়। প্রায় ১০০ শত শিশু প্রদর্শনীতে প্রদর্শিত হইয়াছিল। মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট মিষ্টার এস্, সি, মজুমদার মহাশয়ের স্ত্রী মিসেস্ সুধা মজুমদার অন্যান্য মহিলাদের সাহায্যে শিশুদের প্রাথমিক পরীক্ষা শেষ করেন। ১২ জন শিশু পরীক্ষার উপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হয়। ডাক্তার জে, এন, ঘোষাল, এ, কে, রায়, এবং এইচ, এম,

ভট্টাচার্য্য ধাত্রী মিসেস্ দের সাহায্যে কার্য্য পরিচালন করেন।

সন্ধ্যাকালে সরোজনলিনী দত্ত নারীমঙ্গল সমিতির প্রচারক শ্রীযুক্ত শৈলেশচন্দ্র সেন, বি-এ আলোকচিত্র সাহায্যে নারীমঙ্গল বিষয়ে বক্তৃতা দেন।

কুমারী শোভা বিশ্বাসের পরিচালনায় বালিকা স্বেচ্ছাসেবিকারা প্রদর্শনীর কাজে যথেষ্ট সাহায্য করেন। কার্য্যনির্ব্বাহক সভা এই প্রদর্শনীতে যাঁহারা সাহায্য করিয়াছেন তাঁহাদের নিকট বিশেষ কৃতজ্ঞ। মাননীয় মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট ও তাঁহার পত্নী শ্রীযুক্তা সুধা মজুমদার এই জনহিতকর কার্য্যে যে অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়াছেন তজ্জন্য কার্য্যনির্ব্বাহক সভা তাঁহাদের নিকট বিশেষ কৃতজ্ঞ ও ঋণী।

শ্রীযুক্ত শৈলেশচন্দ্র সেন

সরোজনলিনী নারীমঙ্গল সমিতির অন্যতম কর্ম্মী শ্রীযুক্ত শৈলেশচন্দ্র সেন বি-এ গত সাত বৎসর বিশেষ কৃতিত্বের সহিত সমিতির প্রচারকের কার্য্য করিয়া বর্ত্তমান মে মাস হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন। সম্প্রতি তিনি বঙ্গীয় স্বাস্থ্যবিভাগের সহকারী প্রচারকের কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছেন। সমিতি প্রতিষ্ঠার প্রায় প্রথম হইতে তিনি বঙ্গদেশের পল্লীতে পল্লীতে ঘুরিয়া মহিলাসমিতির বার্ত্তা প্রচার করিয়াছেন। সমিতির কার্য্য যে এইরূপ বহুব্যাপক এবং নারীসাধারণের গ্রহণীয় হইয়াছে তাহা অনেক পরিমাণে শৈলেশ বাবুর প্রচারকার্য্যের ফলে। আমাদের মফঃস্বল সমিতির মহিলাগণ তাঁহাকেই সমিতির প্রতিনিধি বলিয়া জানিতেন। এই কয় বৎসরে তিনি বহু মহিলসভায় বক্তৃতা করিয়াছেন এবং অনেক নূতন মহিলাসমিতি গঠন করিয়াছেন। তাঁহার পদত্যাগের জন্য সমিতির অনেক ক্ষতি হইল। আমরা প্রার্থনা করি তাঁহার ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হউক।

---

* গত বৈশাখ সংখ্যায় মুদ্রিত 'শ্রীগৌরাঙ্গের সংকীর্ত্তন' নামক রঙীন চিত্রটি ভুলক্রমে '৪০০ শত বৎসরের পুরাতন'—লিখিত হইয়াছিল। উহার প্রাচীনতা ১০০ শত বৎসরের অধিক নহে। *

Printed by A. C. Sirkar at the Classic Press. 9-3 Ramanath Majumdar Street Calcutta.
and published by him, at 45 Beniatola Lane, Calcutta.

বাংলার মেয়ের আল্পনা

শিল্পী—শ্রীসুধাংশুকুমার রায়

[চিত্রাধিকারী শ্রীযুক্ত গুরুসদয় দত্ত আই-সি-এস মহাশয়ের সৌজন্যে]

Printed by C. H. Arán & Co.

বঙ্গলক্ষ্মী

"বাঁচ্‌লে সবাই তবেই বাঁচি,—
সবার ভালো তাই ত' যাচি।"

৭ম বর্ষ] আষাঢ়, ১৩৩৯ [৮-ম সংখ্যা

কবি-সুভাষিত

আচার্য্য শ্রী বিজয়চন্দ্র মজুমদার বি-এল্

স্মরণীয় বড় কবিদের নানা লক্ষণের মধ্যে এই একটি লক্ষণের কথা ইউরোপীয় বড় পণ্ডিতেরা আলোচন করিয়াছেন, যে তাঁহাদের রচনায় এমন অনেক উক্তি পাওয়া যায় যাহা লোকসাধারণে সর্ব্বদা মুখে মুখে দৃষ্টান্ত-বচনস্বরূপে ব্যবহার করে। এই সকল দৃষ্টান্ত-বাণী বা সুভাষিত যদি মনুষ্যত্ব-বিকাশের অনুকূল হয়, যদি সেই উক্তিগুলিতে জীবনের সাধু ব্যবহার ও কর্ত্তব্যনিষ্ঠা উপন্যস্ত হয় অথচ সেগুলি শুষ্ক কাটা-ছাটা উপদেশ না হইয়া হৃদ্য ও মনোহর হয় তবেই সেই উক্তিগুলি ধরিয়া সুভাষিতের কবিদিগকে বড় কবি বলা চলে। বাঙ্গলার যে সকল কবি এখন জীবিত নাই তাঁহাদের রচনায় এই রকমের উক্তি কত পাওয়া যায়, তাহা খুঁজিয়া দেখিবার মত। এইরূপ উক্তি আমার নিজের স্মরণে যত আছে তাহাই লিখিতেছি; কেবল স্মৃতি হইতে লিখিতেছি—বই দেখিয়া নয়।

আমাদের জীবিত কবিদের মধ্যে যিনি এযুগে সর্ব্বপ্রধান, সেই রবীন্দ্রনাথের কবিতাবলী হইতে এইরূপ সুভাষিত আলাদা সংগ্রহ করিলে ভাল হয়। আমাদের অনেক ঘরোয়া কথা ও প্রবাদ-বচন আছে যেগুলি হয়ত এক সময়ে আদৃত কবিদের বাণী ছিল বলিয়া সমানে সারাদেশে প্রচলিত আছে। আমি সে দৃষ্টান্তগুলি ধরি নাই; কেবল মৃত কবিদের বচনই সংগ্রহ করিতেছি। কবিদের এমন অনেক বাণী আছে যাহা সুক্তি হইলেও তাহাতে moral suggestions নাই, অর্থাৎ শীলধর্ম্মের দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে না। আমি সেগুলি অবশ্যই বাদ দিয়াছি। তবে ভারতচন্দ্রের মত কবিদের এমন অনেক উক্তি আছে যেগুলি অনেক ব্রীড়াব্যঞ্জক কথার সঙ্গে ব্যবহৃত হইলেও সে উক্তিগুলিকে স্থানচ্যুত করিয়া গ্রহণ করিলে স্মরণীয় সুভাষিত হয়। এরূপ দৃষ্টান্ত আমার উদাহরণে পাওয়া যাইবে।

আশ্চর্য্য এই যে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী খুব বড় কবি বলিয়া এদেশে আদৃত না হইলেও তাঁহার রচনায় হৃদ্য ও মনোহর সুভাষিত অধিক পাইয়াছি; কিন্তু অন্যদিকে

মাইকেল মধুসূদন বড় কবি হইলেও, তাঁহার রচনায় অনেক উপমা থাকিলেও এই শ্রেণীর উক্তি বড় পাওয়া যায় না। দৃষ্টান্তগুলিতে দেখিবেন যে উক্তিগুলি পূর্ণ পদ্যের ছত্রে অনেকস্থলে তোলা হয় নাই,—কেবল উক্তিগুলির অংশ-বিশেষ বা টুক্‌রা তোলা হইয়াছে। ইউরোপের জার্ম্মান ও ফরাসী প্রভৃতি দৃষ্টান্ত-বচনও বেশির ভাগ টুক্‌রায় সংগৃহীত হইয়াছে।

সংক্ষেপে দৃষ্টান্ত তুলিবার জন্য বর্ণমালাক্রমে প্রতিবর্ণে একটা বা দুইটার বেশি দৃষ্টান্ত তুলি নাই। আমি স্মৃতির উপর নির্ভর করিয়া লিখিয়াছি; আশা করি অন্য লেখকেরা এই সংগ্রহ বৃহত্তর করিবেন।

অলস শয্যায় মোহ-নিদ্রাগত, কে চায় কে চায়
থাকিতে নিয়ত? (শিবনাথ)

আশার সলিতা,—রাবণের চিতা। „

ইন্দ্রিয়ের দাস যেবা বার মাস, দেশের উদ্ধার,
তার কর্ম্ম নয়। „

উন্নত আকাশে খধূপ প্রকাশে; আপনার বেগে
সেকি সেথা যায়? „

একই ঠাঁই চলেছি ভাই, ভিন্ন পথে যদি। (দ্বিজেন্দ্রলাল)

একে ভস্ম আরে ছার, দোষগুণ কব কার! (ভারতচন্দ্র)

কতক্ষণ জলের তিলক থাকে ভালে;
কতক্ষণ রহে শিলা শূন্যেতে মারিলে। (কাশীরাম)

খাটিতে বাঁচিব খাটিয়া মরিব, এই বড় আশা
পূর্ণ কর তাই। (শিবনাথ)

গোলামের জাতি শিখেছে গোলামি, আর কি ভারত
সজীব আছে? (হেমচন্দ্র)

ঘুমায়ে মানুষ কে হয়েছে কোথা? (শিবনাথ)

চরিত্রের শোভা চাই দেখিবারে;
ভারতসন্তান তবে বলি তারে। „

জলেতে থাকিয়া মীন মরে পিপাসায়। (নিধু)

তাতল সৈকতে বারিবিন্দু সম সুতমিত
রমণী সমাজ। (চণ্ডীদাস)

দীপ কি উজ্জ্বল রূপ শোভা ধরে,
ঘোর অমানিশা না ঘেরিলে তারে। (শিবনাথ)

দিনেকের স্বাধীনতা, স্বর্গসুখ তায় হে। (রঙ্গলাল)

ধর্ম্ম যেথা সেদিকে থাক্, ঈশ্বরকে মাথায় রাখ্;
স্বজন দেশ ডুবিয়া যাক্, আবার তোরা মানুষ হ'।
(দ্বিজেন্দ্রলাল)

না'চর পুতুল, হয় কি মানুষ, তুল্‌লে উঁচু করে?
(হেমচন্দ্র)

নিদাঘ জ্বালায় তনু জ্বলে যায়, কি করে বরিষা কালে!
(ভারতচন্দ্র)

পরের পরে কেন এ রোষ, নিজেরই যদি শত্রু হোস্?
(দ্বিজেন্দ্রলাল)

পড়িলে ভেড়ার শৃঙ্গে ভাঙ্গে হীরার ধার।
(ভারতচন্দ্র)

বড়র পীরিতি বালির বাঁধ।

ভাবিতে উচিত ছিল প্রতিজ্ঞা যখন।

মন্ত্রের সাধন কিবা শরীর পাতন। „

যার কর্ম্ম তারে সাজে অন্য লোকে লাঠি বাজে। „

যার খরতর শরে জরজর তাহারই কল্যাণ অন্তরের
ধ্যান। (শিবনাথ)

রক্তবিন্দু যত পড়িল এবার শতপুত্র হবে বীর অবতার। „

লাখ লাখ যুগ হিয়া হিয়া রাখনু তবু হিয়া জুড়ন না
ভেল। (চণ্ডীদাস)

বায়ু উল্কাপাত বজ্রশিখা ধরে স্বকার্য্য সাধনে প্রবৃত্ত হও।
(হেমচন্দ্র)

শিরে কৈলে সর্পাঘাত, কোথা বাঁধবি তাগা? (চণ্ডীদাস)

সাধে কি বাবা বলি, গুঁতোর চোটে বাবা বলায়।
(দ্বিজেন্দ্রলাল)

স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায়। (রঙ্গলাল)

হেসে নাও দুদিন বৈ ত নয়। (দ্বিজেন্দ্রলাল)

ক্ষণপ্রভা প্রভাদানে বাড়ায় মাত্র আঁধারে পথিকে
ধাঁধিতে। (মাইকেল)

বাংলার মেয়েদের আল্‌পনা ও প্রাচীর-চিত্র

শ্রী গুরুসদয় দত্ত আই-সি-এস্

আমাদের বর্ত্তমান শিক্ষায়, সমাজে ও সভ্যতায় যে অনেকগুলি বিশেষ গলদ আছে, তাহা সর্ব্ববাদি-সম্মত। কৃত্রিমতা, প্রাণহীনতা, নীরসতা, ও নির্ম্মল আনন্দের অভাব যে এই সকল গলদগুলির অন্যতম, ইহাও নিঃসন্দেহ।

শিশুর চরিত্রে ও প্রকৃতিতে যে স্বাভাবিক, সজীব প্রাণবান্, সরল ও নির্ম্মল আনন্দের ভাব পরিলক্ষিত হয়, ইহাই যে মানবজীবনের আদর্শ স্থল, তাহাতে সন্দেহ নাই। ইংরাজ-কবি ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ (Wordsworth) তাই তাঁহার গীতিকবিতায় গাহিয়াছেন :—

"My heart leaps up when I behold
A rainbow in the sky :
So it was when my life began,
So is it now I am a man,
So be it when I shall grow old—
Or let me die!
The child is father of the man :
And I could wish my days to be
Bound each to each by natural piety."

অর্থাৎ :—"নেচে উঠে প্রাণ মোর, নেহারি যখন
ইন্দ্রধনু আকাশের পটে :
জীবনের প্রভাত-উষায় ছিল মন এই ভাবে গড়া,
আজিও তেমনি আছে মধ্যাহ্ন-লগনে,—
থাকে যেন সায়াহ্নেও এমনি অটুট্—
নয় তো এখনি প্রাণ হ'য়ে যাক্ শেষ!
মানুষের প্রকৃতির মূল
শিশুর স্বভাব মাঝে থাকে বিনিহিত :—
কামনা আমার তাই মনে—
জীবনের দিনগুলি যেন
একে অপরের সনে হ'য়ে থাকে গাঁথা
প্রকৃতির স্বভাব-সরলতার ডোরে।"

এই শিশুসুলভ সহজ স্বতঃস্ফূর্ত্ত আনন্দের অনুভূতি ও অভিব্যক্তিই ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনের উৎকর্ষের একটি বিশিষ্ট মাপকাঠি। অথচ আমাদের শিক্ষাপ্রণালীর, ধর্ম্মের, সামাজিক রীতি নীতির ও সভ্যতার আদর্শ এমনি অস্বাভাবিক হইয়া পড়িয়াছে যে বর্ত্তমান যুগে প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ এই শিশুসুলভ সহজ আনন্দের অনুভূতি ও অভিব্যক্তিকে অপরিপক্কতার, অনুন্নততার ও অশিক্ষিততার লক্ষণ বলিয়া অবজ্ঞার ও ঘৃণার চক্ষে দেখিয়া থাকে। অতি-বস্তু-তন্ত্রতার, অতি-যান্ত্রিকতার ও অতি-বাণিজ্য-তন্ত্রতার এই যুগে, কেবল ভারতবর্ষে ও বাংলা দেশে নয়, প্রায় সকল দেশেই মানুষের ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনের সঙ্গে আত্মার সহজ সরল শিশুসুলভ এই আনন্দ-ভাবের বিচ্ছেদ বিশেষভাবে লক্ষিত হয়; কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্যবশতঃ এই বিচ্ছেদের মাত্রা, অন্যান্য দেশের অপেক্ষা ভারতবর্ষে, ও বিশেষ করিয়া বাংলা দেশে, আজকাল বেশীদূর গড়াইয়াছে। আর তার ফলে আমাদের সামাজিক ও জাতীয় জীবন দিনের পর দিন অধিকতর কৃত্রিমতা, আড়ষ্টতা, প্রাণহীনতা, নীরসতা ও নিরানন্দতায় পরিপূর্ণ হইয়া পড়িতেছে।

ইহার মূলে যে শিক্ষার, ধর্ম্মের ও সামাজিক রীতি-নীতির বিকৃতি, তাহা নিঃসন্দেহভাবে বলা যাইতে পারে। আমাদের বর্ত্তমান শিক্ষাপ্রণালীকে, ধর্ম্মপ্রণালীকে ও সামাজিক রীতিনীতিকে কৃত্রিমতার ও নীরসতার কবল হইতে মুক্ত করিয়া যদি আমরা জাতীয় জীবনকে আবার সরস, সরল, প্রাণবান্ ও আনন্দময় করিয়া তুলিতে না পারি, তবে প্রাণশক্তির উৎসের এই নিরুদ্ধতার ফলে জাতি যে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে তাহা সুনিশ্চিত।

বর্ত্তমান কালের সহুরে সভ্যতা ও উচ্চশিক্ষার আদর্শের সঙ্গে যে জাতীয় ও ব্যক্তিগত জীবনের আদর্শ-বিকৃতির ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, তাহার প্রমাণ পদে পদে পাওয়া যায়। দেশের উচ্চশিক্ষার মধ্যে যে একটা নীরসতা ও কেবলমাত্র

বৈজ্ঞানিকতার মননবৃত্তি-মূলক (intellectual) পারদর্শিতার উপর অতিনির্ভরতা ও তাহার ফলে জীবনের কল্পনারাজ্যের ও ভাবরাজ্যের সঙ্কীর্ণতা আসিয়া পড়িয়াছে, তাহা আমরা প্রতিপদে দেখিতে পাইতেছি। আমাদের দেশের আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ও উচ্চ প্রতিষ্ঠানের মার্কামারা ছাপধারীরা যে রসহীন, আনন্দহীন ও অস্বাভাবিক একটা কিম্ভূতকিমাকার যন্ত্রবৎ পদার্থে পরিণত হইয়া পড়েন, ইহা কি দেশী, কি বিদেশী, সকলেই লক্ষ্য করিয়াছেন, এবং কি করিয়া বর্ত্তমান শিক্ষার এই গলদ নিরাকরণ করা যায় তাহা লইয়া অনেক কল্পনা, জল্পনা, তর্কবিতর্ক ও আলোচনা কলিকাতা ইউনিভার্সিটি-কমিশন বসিবার বহুদিন পূর্ব্ব হইতেই চলিয়া আসিতেছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ তাহার ফলে এখনও এমন কোন প্রণালীর উদ্ভাবন করা হয় নাই যাহাতে এই গলদের উৎপাটন হইতে পারে।

ইহার কারণ এই যে, মানুষের শিক্ষাপ্রণালী যদি বিশ্বপ্রকৃতির ও সৃষ্টির সহজ সরল স্বতঃস্ফূর্ত্ত মুক্তভাব এবং বিশ্বের মূলীভূত আনন্দরসের প্লাবন হইতে বিচ্যুত হইয়া কৃত্রিম, অস্বাভাবিক, নীরস ও আনন্দহীন হইয়া পড়ে, এবং তাহার জীবন যদি বিশ্বের বিরাট ও সহজ সরল ছন্দের উপলব্ধি হইতে ও সেই ছন্দের সঙ্গে সমন্বয় হইতে বিচ্যুত হয়, তাহা হইলে কেবলমাত্র মননবৃত্তি-মূলক (intellectual) বৈজ্ঞানিক উৎকর্ষ অথবা যান্ত্রিক সভ্যতামূলক বস্তুবাহুল্যের চূড়ান্ত পরাকাষ্ঠা তাহার জীবনকে প্রাণবান্‌, সজীব ও আনন্দময় করিয়া তুলিতে পারে না।

ভারতের ও বাংলার প্রাচীন সংকৃষ্টিতে যেমন একদিকে যান্ত্রিক সভ্যতামূলক বস্তুবাহুল্যের উপর নির্ভরের মাত্রা কম ছিল, তেমনি অপরদিকে জীবনকে বিশ্বপ্রকৃতির সহজ ও স্বতঃস্ফূর্ত্ত আনন্দরসে অভিসিঞ্চিত করিবার এবং বিশ্বপ্রকৃতির সহজ ও বিরাট ছন্দের সঙ্গে সমন্বয়মণ্ডিত করিবার ব্যাপক ব্যবস্থা ছিল। তাহার ফলে কবি Wordsworth যে জীবনব্যাপী শিশুসুলভ ও সহজ আনন্দময় ভাবের কামনা করিয়াছিলেন, তাহা প্রাচীন ভারতের ও প্রাচীন বাংলার সংকৃষ্টিতে উচ্চশিক্ষার ও ধর্ম্মের একটি অপরিহার্য্য অঙ্গস্বরূপ ছিল। কেবলমাত্র পরব্রহ্মের অথবা বিশ্বপ্রকৃতির অন্তর্নিহিত আনন্দ-রসের উপলব্ধির দ্বারাই এই শিশুসুলভ, সহজ ও সরল আনন্দময় ভাবের জীবনব্যাপী অধিকার লাভ করা যাইতে পারে। তাহার অভাব হইলে মানুষের জীবন মননবৃত্তির ও বিজ্ঞানের বহুমুখী উৎকর্ষের পরাকাষ্ঠা সত্ত্বেও নীরস ও নিরানন্দময় হইয়া পড়িবে, ইহা অনিবার্য্য। তাই ঋষিগণ উপনিষদে বলিয়াছেন:—"রসো বৈ সঃ। রসং হ্যেবায়ং লব্ধানন্দীভবতি।" (পরব্রহ্ম রসস্বরূপ। মানুষ সেই রসের অনুভূতি লাভ করিয়াই আনন্দ লাভ করে।) সুতরাং আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, মানুষের ব্যক্তিগত, সামাজিক অথবা জাতীয় জীবনে যদি শিক্ষা অথবা ধর্ম্মের বিকৃতির ফলে রসানুভূতির ও রসাভিব্যক্তির শক্তি ও প্রবৃত্তির হ্রাস অথবা লোপ হয়, এবং বিশ্বপ্রকৃতির আনন্দময় ছন্দের সঙ্গে জীবনের সমন্বয়ের যদি অভাব হয়, তাহা হইলে মানুষের জীবন বস্তু-তান্ত্রিকতার ও যান্ত্রিক সভ্যতার শত পরাকাষ্ঠা সত্ত্বেও নিরানন্দ,নীরস ও ছন্নছাড়া হইয়া পড়িবে। এবং আমাদের দেশে বর্ত্তমান কালে আধুনিক সহুরে শিক্ষার ফলে ইহাই হইয়াছে।

কিন্তু ইহা আমাদের একটি পরম সৌভাগ্যের বিষয় যে, ভারতের ও বাংলার প্রাচীন সংকৃষ্টিতে রসানুভূতির, রসগ্রাহিতার ও রসাভিব্যক্তির এবং বিশ্বপ্রকৃতির সহজ সরল আনন্দময় ছন্দের সহিত সমন্বয়ের যে ব্যাপক ব্যবস্থা জাতির ও ব্যক্তির জীবনে সাধিত করা হইয়াছিল, তাহা আমাদের সুদূর পল্লীর নিভৃত প্রদেশে যেখানে সহুরে শিক্ষার হাওয়া এখনও গিয়া পৌছিতে পারে নাই—আজ পর্য্যন্তও কোনপ্রকারে অল্পাধিকভাবে জাগিয়া থাকিতে সমর্থ হইয়াছে। জীবনের এই সহজ সরল স্বতঃস্ফূর্ত্ত আনন্দ-রসের ও আনন্দময় ছন্দের প্লাবনমূলক যে ভাগীরথী-ধারা এখনো বাংলার নিভৃত পল্লীর নিরক্ষর সরলপ্রাণ নরনারীর জীবনে বাঁচিয়া রহিয়াছে, তাহারই অভিসিঞ্চন দ্বারা আমাদের আধুনিক ও সহুরে শিক্ষার প্রাণহীন ক্ষেত্রকে পুনরায় সরস ও উর্ব্বর করিয়া তুলিতে হইবে।

কিন্তু ইহা করিতে হইলে পল্লীগ্রামের প্রতি আমাদের বর্ত্তমান যে মনোভাব, তাহার সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন করা সর্ব্বপ্রথমে প্রয়োজন। সহুরে শিক্ষার গর্ব্বে গর্ব্বিত হইয়া আমরা মনে করিয়া থাকি যে আমাদের পল্লীগ্রামগুলি

সম্পূর্ণ প্রাণহীন, তাহাদিগকে সংস্কার করা এবং পল্লীবাসীদিগকে শিক্ষা দেওয়াই আমাদের কর্ত্তব্য। পল্লীর জীবন হইতে শিখিবার যে আমাদের কিছু আছে তাহা আমরা স্বপ্নেও ভাবি না। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক বড় বড় ধুরন্ধরদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা উপলক্ষে আমি এই আভাষই পাইয়াছি যে, বাংলার পল্লীতে ম্যালেরিয়া, মশা, পচাপুকুর ও বনজঙ্গল ছাড়া আর কিছুই আছে বলিয়া তাঁহারা বিশ্বাস করেন না। ইউনিভার্সিটির মার্কামারা যুবক ও প্রৌঢ়দের একমাত্র কর্ত্তব্য,—সহরের আলোক নিয়া পল্লীতে ফেলা এবং পল্লীর সংস্কার করা,—এই তাঁহাদের বিশ্বাস। পল্লীর জীবনে যে এমন কিছু গৌরবময় মূল্যবান জিনিস থাকিতে পারে, যাহা হইতে বিশ্ববিদ্যালয়ের ধুরন্ধরগণও মূল্যবান শিক্ষা লাভ করিতে পারেন, ইহা তাঁহাদের কল্পনার অতীত, এবং এইরূপ কথা বলিলে তাঁহারা তাহা অবিশ্বাসের হাসিতে উড়াইয়া দেন।

বাংলার অজ্ঞাত পল্লীর গভীর অন্তস্তলে আধুনিক শিক্ষার কলস্‌বিহীন সরলপ্রাণ নিরক্ষর নরনারীর জীবনে বাংলার প্রাচীন সংকৃষ্টিমূলক বহুমূল্যবান সম্পদের যে এখনও অনেক কিছু অবশিষ্ট রহিয়াছে এবং এই সকল সম্পদের সহিত পরিচয় স্থাপন করিয়া এবং তাহাদিগকে জাতীয় জীবনে পুনরায় ঘনিষ্ঠভাবে প্রতিষ্ঠিত করিয়া যে জাতীয় জীবনকে পুনরায় বিশুদ্ধ, সরল, আনন্দময়, গৌরবময় ও শক্তিময় করিয়া আমরা তুলিতে পারিব, বঙ্গীয় পল্লীসম্পদ রক্ষা সমিতির সাহায্যে নানা দিক দিয়া ইহা প্রমাণ করিবার চেষ্টা আমি সম্প্রতি করিয়াছি এবং করিতেছি। কারণ, বাংলার জীবনের প্রকৃত সৌন্দর্য্য এবং প্রকৃত সম্পদ যে কোথায়, তাহার আভাষ আমি পাইয়াছি—বাংলার সহরে ও আধুনিক শিক্ষালয়ে নয়-বাংলার নিভৃত পল্লীর সরলপ্রাণ সেকেলে নরনারীর জীবনে। তাহারাই আমাদের দেশের প্রাচীন সংকৃষ্টির অনুযায়ী স্বতঃস্ফূর্ত্ত আনন্দরসের অনুভূতির ও অভিব্যক্তির দ্বারা এবং নির্ম্মল নৃত্যগীতের চর্চ্চার দ্বারা বিশ্বপ্রকৃতির ছন্দের সঙ্গে জীবনের সহজ সমন্বয়রক্ষার ধারা বহন করিয়া আসিতেছে। এই সহজ অনাবিল আনন্দময় ভাবের সঙ্গে যোগ স্থাপন এবং জীবনে ইহার পুনঃপ্রতিষ্ঠা আমরা করিতে পারিব—বাংলার পল্লীর সরল ও বিশুদ্ধ লোকসঙ্গীতের ও লোকনৃত্যের প্রতিষ্ঠা শিক্ষাক্ষেত্রে ও সমাজে পুনরায় ব্যাপকভাবে সম্পাদন করিয়া। আর কেবল লোকসঙ্গীত ও লোকনৃত্যের ভিতর দিয়া নয়,—বাংলার প্রাচীন সংকৃষ্টি-প্রসূত যাবতীয় রসকলার বিশুদ্ধ ধারাকে জাতীয় ও ব্যক্তিগত জীবনে পুনরায় ব্যাপকভাবে প্রতিষ্ঠিত করিয়া আমরা বাংলার জীবনকে আবার সরস, প্রাণবান্, আনন্দময় ও শক্তিময় করিয়া তুলিতে পারিব।

বাংলার পল্লীগ্রামে যে সকল প্রাণময় লোকসঙ্গীত ও লোকনৃত্যের বহুল প্রচলন এখনও আছে এবং যাহা আমাদের আধুনিক শিক্ষিত সম্প্রদায় এতদিন অবজ্ঞার চক্ষে দেখিয়া আসিয়াছিলেন, তাহা হইতে বিশ্বপ্রকৃতির রসানুভূতির এবং রসাভিব্যক্তির যে কি বিশিষ্ট সহায়তা হইতে পারে এবং শিক্ষাক্ষেত্রে তাহার কত বড় মূল্য, তাহা আমি অন্যত্র দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছি। বিশ্বপ্রকৃতির রসাত্মক ছন্দের সঙ্গে বিশুদ্ধ সঙ্গীত এবং বিশুদ্ধ নৃত্যের প্রচলন ও চর্চ্চা যেমন মানুষকে সাহায্য করিয়া থাকে, তেমনি চিত্রকলার বিশুদ্ধ ছন্দাত্মক ও আনন্দমূলক চর্চ্চাও ইহাতে সবিশেষ সাহায্য করে। আমাদের আধুনিক সহুরে শিক্ষার ক্ষেত্রে ইহার উপলব্ধির সম্পূর্ণ অভাব। কিন্তু বাংলার সুদূর নিভৃত পল্লীজীবনে ইহার নিবিড় ও গভীর উপলব্ধির জীবন্ত দৃষ্টান্তের ছড়াছড়ি এখনো রহিয়াছে। ছন্দাত্মক রসানুভূতির ও রসাভিব্যক্তির যে ব্যাপকতা এখনও বাংলার পল্লীতে পল্লীতে অবশিষ্ট রহিয়াছে তেমনটি অন্য কোন দেশে আছে বলিয়া আমি বিশ্বাস করি না। ছন্দাত্মক রসানুভূতির ও রসাভিব্যক্তির এই গভীর, ব্যাপক ও জীবন্ত ধারার একটি প্রমাণ আমরা বিশেষ ভাবে পাই—বাংলার পল্লীর সরলপ্রাণ নিরক্ষর ছোট বড় সেকেলে মহিলাদের জীবনে। আধুনিক শিক্ষার গর্ব্বিত ও কৃত্রিম কলস্ ইঁহারা এখনও পান নাই বলিয়াই এই ধারা ইঁহাদের মধ্যে এখনও বিশুষ্ক হইয়া যায় নাই।

বাংলার পল্লীগ্রামের মেয়েদের মধ্যে বিবাহ, ব্রত ইত্যাদি নানা অনুষ্ঠান উপলক্ষে আলিম্পনা অঙ্কন করিবার যে ব্যাপক প্রথা এখনও প্রচলিত আছে, ইহা আমাদের বর্ত্তমান শিক্ষিত সম্প্রদায়ের নরনারীরা হয়ত লক্ষ্যই করেন না,

অথবা লক্ষ্য করিলেও ইহাকে তাঁহারা অবজ্ঞার চক্ষে দেখিয়া থাকেন ও একটি কুসংস্কারপ্রসূত সেকেলে অনাবশ্যক বাহুল্যমূলক প্রথা বলিয়া বিবেচনা করিয়া থাকেন। ইহা যে কত বড় জাতীয় সম্পদ তাহা উপলব্ধি করিবার শক্তি আমরা হারাইয়া ফেলিয়াছি বলিয়াই আধুনিক সহুরে "আর্টিষ্ট" অর্থাৎ রসশিল্পীদের বিজাতীয় প্রথামূলক অঙ্কনশিল্প-চাতুর্য্য দেখিয়া আমরা মূর্চ্ছা যাই, কিন্তু বাংলার পল্লীর মেয়েদের স্বভাবজাত শিল্পনৈপুণ্য যে আধুনিক সহুরে শিল্পীদের আয়াসলব্ধ নৈপুণ্য হইতেও অনেক মূল্যবান একটি জাতীয় সম্পদ, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না।

চিত্র-রসকলার প্রথম এবং প্রধান উপাদান—লীলায়িত রেখার অঙ্কন। ইহাই চিত্র-রসকলার ভিত্তিস্থানীয়। বাংলার মেয়েদের আলিম্পন-শিল্প লীলায়িত রেখাঙ্কন-চাতুর্য্যের পরাকাষ্ঠার দৃষ্টান্তস্বরূপ। আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায় যে সুদূর অবজ্ঞাত পল্লীজীবনে অবশিষ্ট এই রসকলার শক্তি-সম্পদের ব্যাপক ধারাকে অবজ্ঞার চক্ষে দেখিয়া থাকেন, ইহা বাংলার আধুনিক শিক্ষাপ্রণালীর মূঢ়তার পরিচায়ক। যেদিন আমাদের জ্ঞানচক্ষু খুলিয়া যাইবে সেইদিন আমরা ইহার প্রকৃত সমাদর করিয়া আমাদের শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলিতে ইহার রীতিমত চর্চ্চার ব্যবস্থা করিয়া জাতির ও ব্যক্তির জীবনে পুনরায় ব্যাপকভাবে রসানুভূতির ও রসাভিব্যক্তির শক্তির পুনরুদ্দীপনের সহায়তা করিতে আরম্ভ করিব।

বাঙ্গালী জাতি যে রসকলা-ক্ষেত্রে পারদর্শিতায় পৃথিবীর মধ্যে একটি অসাধারণ প্রতিভাবিশিষ্ট জাতি, বাংলার মেয়েদের এই আলিম্পনা অঙ্কন করিবার বহুব্যাপক স্বভাবজাত শক্তি তাহার একটি প্রমাণ স্বরূপ। ইহাদের পারদর্শিতা যে কত অদ্ভুত তাহা না দেখিলে বিশ্বাস করা যায় না। কিছুদিন হইল আমি অপ্রত্যাশিত ভাবে একটি সুদূর পল্লীগ্রাম দেখিতে যাই। আমার গ্রামে পৌঁছিবার পর গ্রামের মেয়েরা খবর পাইলেন যে আমি আল্‌পনা দেখিতে ভালবাসি। যেই খবর পাওয়া অমনি ঘরে ঘরে আল্‌পনা আঁকিবার ধুম পড়িয়া গেল এবং আধ ঘণ্টার মধ্যে গ্রামের প্রত্যেক বাড়ী, বারান্দা, ভিটে, আঙ্গিনা ও দ্বারদেশ আলিম্পনার অনুপম লীলায়িত শুভ্র রেখাবলীতে ও রূপাবলীতে পরিপূর্ণ হইয়া গেল। দেখিয়া ত আমি অবাক। মেয়েদের আলিম্পনা আঁকিবার কি অবলীলাময় ও স্বভাবসিদ্ধ কৌশল! কোথাও ভুল-ত্রুটি নাই। একটি রেখা অঙ্কন করিয়া তাহাকে আবার মুছিয়া ফেলিয়া অন্য রেখা আঁকিবার প্রয়াস নাই। অভ্রান্ত প্রতিভার সহজ স্ফুরণের অটুট ছন্দে মেয়েদের অঙ্গুলিগুলি রেখা অঙ্কিত করিয়া যাইতেছে। সেই লীলায়িত রেখার কোথাও এতটুকু ভুল-ত্রুটি বা আড়ষ্ট ভাব নাই। যেন বিশ্বপ্রকৃতির গভীর প্রাণের আনন্দময় ছন্দ মূর্ত্তিমতী হইয়া আলিম্পনার রেখায় আপনার আত্মপ্রকাশ করিয়া দিতেছে। সেই ছন্দোবদ্ধ আলিম্পনা এত অনির্ব্বচনীয়সুন্দর ভাবে আত্মপ্রকাশ করিতে পারিত না, যদি এই সরলপ্রাণ নিরক্ষর মেয়েদের আত্মা বিশ্বপ্রকৃতির আনন্দময় ছন্দের ও রসের অনুভূতিতে ভরপুর না থাকিত। আমাদের সহুরে শিল্পীরা বহু চেষ্টা করিলেও যে লীলায়িত রেখাঙ্কনের এইরূপ অবলীলাময় কৌশল প্রদর্শন করিতে পারিবেন না, তাহা স্থিরনিশ্চয়। আধুনিক যে শিক্ষাপ্রণালী আনন্দ-ছন্দের ও আনন্দ রসের এই জাতিগত স্বতঃস্ফূর্ত্ত প্রতিভাকে দেশের নরনারীর জীবন হইতে নির্ব্বাসিত করিতেছে,—তাহার মূঢ়তার ইয়ত্তা করা দুঃসাধ্য। কিন্তু ইহা সত্য যে আমাদের আধুনিক শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলির নীরস ও ছন্নছাড়া শিক্ষাপ্রণালীর ফলে শিক্ষিতা মহিলাদের মধ্যে এই জাতিগত প্রতিভা দ্রুত বিলুপ্ত হইয়া যাইতেছে।

এইত গেল মাটিতে ও পিঁড়িতে আলিম্পনা-কলার কথা। ইহা কি পূর্ব্ববঙ্গে, কি পশ্চিমবঙ্গে, সুদূর পল্লীগ্রাম মাত্রেই এখনও প্রচুর ভাবে অবশিষ্ট আছে এবং ইহারই সাহায্যে এখনও বাঙ্গালী জাতির জীবনে রসকলা-চর্চ্চার ব্যাপকভাবে পুনর্বিস্তার করা যাইতে পারে বলিয়া আমি বিশ্বাস করি। ব্রত উপলক্ষে পূর্ব্ববঙ্গের অনেক জেলায় নানা রঙের চাউলের গুঁড়ো দিয়া যে বিচিত্র রঙ্গীন আলিম্পন-কলার প্রথা এখনও অবশিষ্ট আছে, ইহাও অতি সুন্দর ও মনোরম রসানুভূতির, রসাভিব্যক্তির এবং শিল্প-কুশলতার পরিচায়ক। কিন্তু ইহা ছাড়া পশ্চিমবঙ্গের পল্লী-গ্রামে মাটির প্রাচীরে তুলিকার সাহায্যে যে নানাবর্ণের পদ্ম

ও অন্যান্য প্রাচীর-চিত্র আঁকিবার প্রথা এখনও বর্ত্তমান আছে, তাহা বড়ই মনোমুগ্ধকর ও উঁচুদরের শিল্পকুশলতার, রসানুভূতির ও রসাভিব্যক্তির পরিচায়ক। এই প্রথা যে এখনও পশ্চিমবঙ্গের পল্লীগ্রামে প্রচলিত আছে তাহা আবিষ্কার করিবার সুযোগ বৎসরেক কাল পূর্ব্বে আমার কি করিয়া হইয়াছিল, তাহার সংক্ষিপ্ত কাহিনী এবং এই প্রাচীর-চিত্রাঙ্কন প্রণালীর সংক্ষিপ্ত বর্ণনাই এখন করিব।

(ক্রমশঃ)

মধু ও গুঞ্জন

কবিশেখর শ্রী কালিদাস রায় বি-এ

মালতী ফুটেছে একা,—
তখনো চম্পা চামেলি বকুল বাতাবির নেই দেখা।
ভ্রমর আসিল—সে ছাড়া তখনো খোঁজ রাখেনাক কেহ;
মালতী বলিল—"রে কালো ভ্রমর, ছুঁ'সনে আমার দেহ,
বহু পতঙ্গ আছে এই বনে রূপবান্, গুণবান্,
ভেবেছিস্ মূঢ়, তোরে করিব কি এই কৌমার দান?"

শুনি' গুঞ্জন-তান
যত বেলা বাড়ে মালতীর প্রাণ করে' উঠে আন্‌চান।
দুই-চারিবার ডাকিল ভৃঙ্গে দিয়া মৃদু হাতছানি;
দিলনাক সাড়া মধুপ—সেও ত নয় কম অভিমানী।
বাতাবির বনে যত চায় তত মালতীর ফাটে বুক,
আশে পাশে ঘুরি' শঠ মধুকর ভুঞ্জিছে কৌতুক।

ভ্রমর যাইল চলি,
হয়ত হাসিল,—কে বুঝিবে বল মুচ্‌কি হাসিলে অলি?
তারপর ক্রমে ফুটিল কাননে হাজার হাজার ফুল,—
বাতাবি বকুল-তরুগুলি হলো পতঙ্গে সমাকুল।
অলি প্রজাপতি চলে দ্রুতগতি পাশ দিয়া মালতীর,
কেহ চাহিল না মালতীর পানে—সকলেই গম্ভীর।

এক পূজারীরে দেখে
মালতী কহিল বড় অভিমানে তাহারে নিকটে ডেকে,
'নিয়ে যাও মোরে সাজিতে তুলিয়া শ্যামের পূজার তরে।'
পূজারী তাহারে তুলিয়া লইল পরম শ্রদ্ধাভরে।
দেউলে উঠিতে দৈববাণীটি শুনিল মালতী ধনী—
"পূজারি, সাজির মালতী ফুলটি ফেলে দাও এক্ষণি।

যাহার মাধুরীকণা
অলিগুঞ্জনে ফুটে নাই তাতে হয়নাক উপাসনা।"
ত্রস্ত হস্তে পূজারী আগুনে ফেলে দিল মালতীরে;—
বোঁটাটি তাহার ছিঁড়িয়া ফেলিল যত পিপীলিকা ঘিরে'।
হোক্ অভিমানী, তবু মালতীর ব্যথা বাজে কবি-মনে—
মালতীর মধু ফুটিল না পূজামন্ত্রে বা গুঞ্জনে!
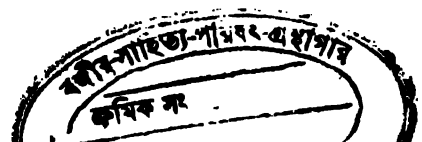
সে-কালের কথা

রায় শ্রী জলধর সেন বাহাদুর

হৈমবতী চিকিৎসা

পূর্ব্বে কবিরাজী ও এলোপ্যাথী চিকিৎসা সম্বন্ধে আমার সেকালের অভিজ্ঞতার কথা বলেছি ; এবার হোমিওপ্যাথী চিকিৎসা সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বল্‌ব।

এই চিকিৎসা-বিদ্যার নাম আমি প্রথম শুনেছিলাম আমার পরলোকগতা জ্যেষ্ঠা ভগিনীর কাছে,এ কথা আগেই বলেছি। তিনি এই চিকিৎসার নাম বলেছিলেন হৈমবতী চিকিৎসা! এই নূতন চিকিৎসা-শাস্ত্রের কথা যখন দিদি বলেন, তখন ঐ 'হৈমবতী' কথাটা নিয়ে যে আলোচনা হয়, সে কথা এই বৃদ্ধ বয়সেও আমার মনে আছে। দিদি যখন এই নামটি বলেন, তখন আমার পূজনীয়া পরলোকগতা মাতাঠাকুরাণী সেখানে উপস্থিত ছিলেন। সেকেলে মানুষ হ'লেও আমার মাতাঠাকুরাণী সেকালের মত ছিলেন না ; তিনি নিজের চেষ্টায় বাঙ্গালা লেখাপড়া বেশই শিখেছিলেন ; চৈতন্য-চরিতামৃত গ্রন্থখানি তিনি আগাগোড়া মুখস্থ বল্‌তে পার্‌তেন ; আর রামায়ণ মহাভারত ত পড়েই ছিলেন। দিদি বালিকা-বিদ্যালয়ের উচ্চশ্রেণী পর্য্যন্ত পড়া শেষ ক'রে, বিবাহ হওয়ায় পড়া ছেড়ে দিয়েছিলেন ; সুতরাং অমন সুন্দর 'হৈমবতী' নামটা নিয়ে যে তাঁরা আলোচনা কর্‌তেন, সেকাল হ'লেও তা যে সাহিত্যালোচনা, সে কথা আমি নিঃসন্দেহে বল্‌তে পারি। আমিও তখন নিতান্তই ছেলে-মানুষ ছিলাম না—আমি তখন ছাত্রবৃত্তি স্কুলের দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়ি, সাহিত্যাচার্য্য কাঙ্গাল হরিনাথের ছাত্র ; সুতরাং মা ও দিদির আলোচনার রসাস্বাদন কর্‌বার মত বয়স আমার তখন হয়েছিল ; তাই সে আলোচনা এতকাল পরেও আমার মনে আছে।

দিদির মুখে ঐ সুন্দর নামটি শুনে মা বল্‌লেন, "এ চিকিৎসা-শাস্ত্র কি আমাদের দেশের কোন ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত বের করেছেন ?"

দিদি হেসে বল্‌লেন, "মা যেন কি ? আমাদের বামুন-পণ্ডিতের সাধ্যিও নেই, ও-সব বা'র করা। আমি শুনেছি, বিলেতের কোন্ সাহেব না কি এই নূতন চিকিৎসা বের করেছেন।"

মা বল্‌লেন, "তোমার কথা ত মান্‌তে পারিনে ; হৈমবতী নামটা যে আমাদের দেশের নাম—মা-দুর্গার এক নাম। শোন নি, আমাদের আচার্য্যি মশাই যখন বৈশেখ মাসের গোড়ায় নূতন পঞ্জিকা শোনাতে আসেন, তখন প্রথমেই বলেন—

"হর প্রতি প্রিয়ভাষে কন হৈমবতী।"

এই হৈমবতী হচ্চেন দুর্গার এক নাম। এ নামটা আমাদের বাঙ্গালা নাম। তোমার সাহেব এ নাম জান্‌বেন কেমন ক'রে! আর যদি তিনি জান্‌তেই পারেন ধ'রে নেওয়া যায়, তা হ'লে তাঁর এই নূতন চিকিৎসার বিলাতী নাম না রেখে আমাদের ঠাকুর-দেবতার নাম রাখ্‌তে যাবেন কেন ?"

দিদি বল্‌লেন, "তা ত জানিনে মা! আমার ভাসুর হাইকোর্টের উকিল, তা ত শুনেছ। তিনি এই চিকিৎসা-বিদ্যা শিখেছেন। তিনিই ঐ নাম বলেছিলেন, আর তাঁর ঔষধের বাক্স সকলকে দেখিয়েছিলেন। আমি বৌ মানুষ; আড়াল থেকে নামটা শুনেছিলাম মাত্র। আর সে ঔষধ যে কেমন তা দেখ্‌তেও পেলাম না। তিনি যে সে বাক্স কত সাবধানে রাখেন, তা আর কি বল্‌ব। সেই ছোট বাক্সের চেহারাও আমি দেখ্‌তে পাইনি। তিনি বলে-ছিলেন, হাওয়া লাগ্‌লে ঔষধের গুণ থাকে না, তামাক কি সুগন্ধ জিনিসের একটু গন্ধ যদি কোন রকমে বাক্সের গায়ে লাগে, তা হ'লেই সর্ব্বনাশ—সব ঔষধ মাটী! আমরা শুনে ত ভয়েই সারা ; দেখ্‌বার আর সাহস হোলো না। এমন যে আমার শাশুড়ী, যাঁর দাপটে অতবড় জমিদারীর প্রজারা পর্য্যন্ত একটুকু হ'য়ে যায়, তিনি পর্য্যন্ত সে ঔষধ

দেখ্‌বার কথা বল্‌তে পার্‌লেন না, আমরা ত বৌ-মানুষ। কাজেই তোমার কথার উত্তর দিতে পার্‌লাম না মা! তবে, এটা ত ভাদ্র মাস, আশ্বিন মাসের গোড়াতেই ত তাঁরা কল্‌কাতা থেকে বাড়ী যাওয়ার সময় এই পথে এসে আমাকে নিয়ে যাবেন, তখন তাঁকেই জিজ্ঞাসা কোরো; তিনি সব কথা ব'লে দেবেন, চাই কি হৈমবতী ঔষধও তোমাদের ভাগ্যে দেখা হ'তে পারে।"

মা বল্‌লেন, "সে ত জিজ্ঞাসা করবই। কিন্তু, আমি ভাব্‌ছি, সাহেব হ'য়ে হৈমবতী নামটা পেলেন কোথায়, আর নিলেনই বা কেন? ও কথাই নয়; নিশ্চয়ই আমাদের কোন বাঙ্গালী পণ্ডিত এই চিকিৎসা-বিদ্যা বা'র করেছেন। যাঁরা চৈতন্য-চরিতামৃতের মত গ্রন্থ লিখ্‌তে পারেন, তাঁদের অসাধ্য কাজ কি আছে? অমন গ্রন্থ ভূভারতে আর কেউ লিখ্‌তে পারে?"

দিদি বল্‌লেন, "মা, তোমার চরিতামৃতকে আমি তুচ্ছ কর্‌ছিনে, কিন্তু কত দেশে কত বিদ্বান পণ্ডিত আছেন, তাঁরা হয় ত ওর চাইতেও ভাল গ্রন্থ লিখেছেন, আমরা তার খবর জানিনে।"

মা বল্‌লেন, "পণ্ডিত হয় ত অনেক আছেন, কিন্তু চরিতামৃত লিখ্‌তে হ'লে তাঁর কৃপা চাই, পণ্ডিত হ'লেই হয় না!" এই ব'লে মা 'তাঁর' উদ্দেশে ভক্তিভরে হাত যোড় ক'রে প্রণাম কর্‌লেন; আমরাও তাঁর দেখাদেখি প্রণাম কর্‌লাম। হৈমবতী সেই প্রণামের অংশ পেলেন কিনা জানিনে, কিন্তু সাহিত্যালোচনা ও হৈমবতীর ইতিহাস তখনকার মত চাপা প'ড়ে গেল।

আশ্বিন মাসের অপেক্ষায় আমরা থাক্‌লাম; সাক্ষাৎ হৈমবতী দেখ্‌বার আগ্রহ আমাদের ক্রমেই বাড়্‌তে লাগ্‌ল। কিন্তু, হৈমবতীর আগমন হোলো না। তাঁরা আস্‌তে পার্‌লেন না। তখন যশোহরে যেতে হ'লে ইষ্টার্ণ বেঙ্গল রেল-পথে চাকদহে নেমে গো-যানে যশোহর যেতে হোতো; বর্ষাকালে আমাদের গ্রাম থেকে নৌকাপথে অনেক ঘুরে যাওয়া যেত। যশোর-খুলনার রেল তখন হয় নাই, পূর্ব্ববঙ্গের রেলের সীমা তখন কুষ্টিয়া পর্য্যন্ত; ঢাকা ও পূর্ব্ববঙ্গের অন্যান্য স্থানে যেতে হ'লে কুষ্টিয়া থেকে নৌকায় যেতে হোত। যাত্রী বইবার ষ্টীমার বা ধূমকলের ব্যবস্থাও তখন হয় নাই। দিদির ভাসুর এবং আমার ভগিনীপতি চাকদহের পথেই বাড়ী গেলেন; দিদিকে নিতে এলেন তাঁর এক দেবর। সে বেচারী অন্য কোন সন্ধানই দিতে পার্‌ল না, তবে তার দাদা যে হৈমবতী চিকিৎসা জানেন, এ কথা সে বল্‌ল; এবং সে যে খুব ছোট ছোট সিসিতে পিঁপ্‌ড়ের ডিমের মত সাদা হৈমবতী দেখ্‌বার সৌভাগ্য লাভ করেছে, এ কথা বিশেষ গৌরবের সঙ্গেই আমাদের কাছে গল্প কর্‌ল। এই হোল হৈমবতী নাম-শ্রবণের প্রথম পালা। এর পর দ্বিতীয় পালা আছে এবং সেটা আমারই দুর্ভাগ্যের ইতিহাস।

আমার বয়স যখন দশ-এগারো বছর, সেই সময় আমাকে একটা অতি উৎকট, সুধু উৎকট কেন, উদ্ভট ব্যাধিতে আক্রমণ করেছিল। সামান্য বা অসামান্য জ্বর-জ্বালা হ'লে আমাদের ধন্বন্তরী ডাক্তার বাবু সিন্‌কোনা-বার্ক-সিদ্ধ জল এবং 'একোয়া পিউরা' অর্থাৎ খাঁটি কুয়ার জল মিশিয়ে ঔষধ দিলেই অনেক ক্ষেত্রে তা আরাম হ'য়ে যায়; ঘা-ফোড়া হ'লে নরসুন্দর ডাক্তার তাঁর পৈত্রিক অস্ত্র ক্ষুর দিয়ে কেটে এবং দেবীর বরে প্রাপ্ত মলম লাগিয়েই তা সারিয়ে দেন। সে ক্ষুর, আর সে মলমের কাছে কার্ব্বং-কল্‌কেও সে সময় মাথা নোয়াতে দেখেছি। কিন্তু, বলেছি ত, আমার সে ব্যাধি উৎকট ও উদ্ভট রকমের। গ্রীষ্মের সময় আমি বেশ থাক্‌তাম; কিন্তু, যেই শীত ঋতুর আগমন সূচনা হোতো, অমনি ধীরে ধীরে আমি অন্ধ হ'য়ে যেতাম। আবার, শীতের অবসান হোলেই আমার দৃষ্টি-শক্তি ফিরে আস্‌ত। আমি বছরের ছয় মাস অন্ধ হ'য়ে থাক্‌তাম। এই শোভাময় পৃথিবী আমার কাছে অন্ধকার হ'য়ে যেত; ছয় মাস পরে আবার আমি আলোকের মুখ দেখ্‌তে পেতাম, আত্মীয়-স্বজনের স্নেহময় সহাস্য বদন আমার দৃষ্টিগোচর হোতো। ছ-মাস আমার স্কুলের ছুটী, বাকী ছ-মাস পড়াশুনা; তাও অতি সন্তর্পণে; চোখের উপর বেশী অত্যাচার কর্‌তে নিষেধ ছিল। তার ফলে আমার বিদ্যা যা হয়েছে, তা দেখ্‌তেই পাচ্ছেন।

ব্যাপার হোতো কি জানেন, শীত আস্‌তে আরম্ভ কর্‌লেই আমার দুই চোখের মণির উপর ধীরে ধীরে একটা পর্দ্দা পড়্‌তে থাক্‌ত। সেই পর্দ্দা আমার চক্ষের মণি একেবারে ঢেকে ফেল্‌ত; আমার দৃষ্টিশক্তি লুপ্ত হ'য়ে

যেত। তার পর যেই গরম পড়্‌তে আরম্ভ হোতো, অমনি, যেমন ধীরে ধীরে এসেছিল, তেমনই ধীরে ধীরে আপন খুসীতে পর্দ্দা দুইখানি স'রে যেত; আমি তখন বেশ দেখ্‌তে পেতাম। আমাদের ডাক্তার কবিরাজ মহাশয়দের ভাণ্ডারে এ রোগের ঔষধ ছিল না; তবুও কবিরাজ মহাশয় মহা-কজ্জলী ঘৃত, কি অমনি বিপুল নামধারী অনেক ঔষধ দিতে ক্রুটী করেন নাই, এবং তাতে কোন ফলই হয় নাই। ডাক্তার বাবু এবং গ্রামের হিতৈষীবৃন্দ আমাকে কলিকাতায় নিয়ে গিয়ে ভাল চিকিৎসক দেখাবার পরামর্শ দিলেন। পরামর্শ ত অনেকেই দিতে পারেন, ব্যবস্থাও অনেক চিকিৎসক দিতে পারেন; কিন্তু, যে রোগী এ ব্যবস্থা অনুসারে কাজ কর্‌বার অবস্থা বা সঙ্গতি তার থাকা চাই ত। আমরা চিরদিনই দরিদ্র; কোন রকমে কায়-ক্লেশে আমাদের দিন চলে—তখনও যে অবস্থা ছিল, এখনও তাই। সুতরাং কলিকাতায় এনে চিকিৎসা করানো আমার জ্যেঠা-মহাশয়ের সাধ্যের অতীত ছিল—পিতৃদেব ত আমাকে তিন বছরের আর আমার ছোট ভাইকে ছয় মাসের রেখেই স্বর্গে চ'লে গিয়েছিলেন। জ্যেঠামহাশয় দুরদৃষ্টকে ধিক্কার দিয়ে এই পিতৃহীন অন্ধ বালককে কোলে ক'রে অশ্রু-বিসর্জ্জন কর্‌তেন।

আমার পিসিমার বড় ছেলে তখন কলিকাতায় এক মহাজনের গোমস্তাগিরি চাকরী কর্‌তেন। তিনি এই সময় একবার দেশে গেলে জ্যেঠামহাশয় তাঁকে ধ'রে বস্‌লেন আমাকে একবার কলিকাতায় নিয়ে গিয়ে ভাল ডাক্তার দিয়ে আমার চোখদুটো দেখাবার জন্য। জ্যেঠামহাশয় এবং বাড়ীর সকলের অনুরোধে তিনি আমাকে কলিকাতায় আন্‌তে সম্মত হলেন এবং তাঁর মনিব মহাজন বিনাব্যয়ে তাঁর আড়তে আমাকে মাস-দুই রাখ্‌বার আদেশ দিলেন। তখন আমার চোখের পর্দ্দা সার্‌তে আরম্ভ করেছে, আমি দেখ্‌তে সুরু করেছি।

তখনও আমাদের গ্রামের উপর দিয়ে রেলপথ যায় নাই। বাড়ী থেকে নৌকায় চ'ড়ে কুষ্টিয়া গিয়ে তবে রেলে চড়্‌তে হোত। আমরা একটা শুভদিনে বেরিয়ে কুষ্টিয়া থেকে রেলে চ'ড়ে কলিকাতা গেলাম। আমার রেলে চড়াও সেই প্রথম, কলিকাতা দেখাও সেই প্রথম। কিন্তু সেই প্রথম রেলে চড়ার বর্ণনা এবং যাট-বাষট্টি বৎসর পূর্ব্বের কলিকাতার বিবরণ যদি এখানে দিতে যাই, তা হ'লে হৈমবতীর কথা আর বলা হবে না; সুতরাং সে কথা ভবিষ্যতের জন্য মুলতবী রেখে হৈমবতীর কথাই বলি।

কলিকাতায় সে সময় চক্ষুরোগের একজন সুপ্রসিদ্ধ সাহেব চিকিৎসক ছিলেন; তেমন চিকিৎসক তখন আর কেহ ছিলেন না, এখনও কেহ তেমন হ'তে পারেন নাই। তাঁর নাম ডাক্তার ম্যাক্‌নামারা। তাঁকে দিয়েই আমার চক্ষু পরীক্ষা করানো স্থির হোলো। মেডিকেল কলেজে আমাকে সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন সে সময়ের প্রসিদ্ধ চিকিৎসক পরলোকগত ডাক্তার দুর্গাদাস কর মহাশয়—ডাক্তার আর, জি, করের পিতৃদেব. ডাক্তার দুর্গাদাস কর মহাশয় আমার দাদাকে খুব অনুগ্রহ কর্‌তেন। তাই তিনি আমাকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে যেতে সম্মত হয়েছিলেন। ডাক্তার করের সঙ্গে ম্যাক্‌নামারা সাহেবের বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল। সেই জন্য পর পর দুইদিন অনেকক্ষণ পরীক্ষা ক'রে ডাক্তার সাহেব বল্‌লেন, অস্ত্রোপচারও কর্‌তে হবে না, ঔষধ ব্যবহারও কর্‌তে হবে না। চোক নষ্ট হবে না। একটু বয়স বাড়্‌লেই এবং শরীর আরও সবল হোলেই পর্দ্দা আর আক্রমণ কর্‌তে পার্‌বে না।

সাহেবের কথাটা কিন্তু দাদার মনে ধর্‌ল না। তাই ত, এত কষ্ট ক'রে, এত অর্থব্যয় ক'রে ছেলেটাকে নিয়ে এলাম, আর ডাক্তার বল্‌লেন, ও কিছু নয়! বয়স হ'লেই সেরে যাবে। এখন কিছুকাল ছয় মাস অন্ধ হ'য়েই থাক্‌তে হবে।

দাদা তখন এর-ওর পরামর্শ নিতে লাগ্‌লেন। একজন বন্ধু বল্‌লেন, প্রধান এলোপ্যাথকে ত দেখানো হোলো। এক কাজ কর—এই যে হোমিওপ্যাথী নামে নূতন এক চিকিৎসার কথা শোনা যাচ্ছে, ডাক্তার সাল্‌জার যে মতে চিকিৎসা করেন, তাঁকে একবার দেখাও না, তিনি কি বলেন, শোনা যাক্।

এই কথা শুনে আমার যে কি আনন্দ হোলো, তা আর বল্‌বার নয়। রোগ ভাল হোক্ আর নাই হোক্, যে হৈমবতী চিকিৎসার অদ্ভুত কথা দিদির কাছে শুনেছিলাম, সেই হৈমবতী চিকিৎসককে দেখ্‌তে পাব, হয় ত সেই বাতাসে-উড়ে-যাওয়া ভয়ানক ঔষধও দেখ্‌তে পাব,

ব্যবহারও করতে পারব, এরই জন্য আমার আনন্দ। দাদাও এই চিকিৎসা করানোই স্থির করলেন।

এক দিকে চিৎপুর রোডের মোড়, আর এক দিকে বেন্টিঙ্ক ষ্ট্রীট, আর এক দিকে বহুবাজার ষ্ট্রীট, অপর দিকে লালবাজার ষ্ট্রীট, এই চৌমাথার বেন্টিঙ্ক ষ্ট্রীটের মোড়ে যেখানে এখন মস্ত একটা বাড়ী মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে, সেইখানে সেই সময় একটা একতলা বাড়ী ছিল। সেইটা ডাক্তার সাল্‌জারের হোমিওপ্যাথী ডাক্তারখানা ছিল। তিনি প্রতিদিন সেইখানে এসে প্রাতঃকালে রোগী দেখ্‌তেন। এখন যেমন অনেক ডাক্তারের বাড়ীতে গিয়ে রোগী দেখালেও আধা-দর্শনী দিতে হয়, তখন সে প্রথা ছিল না। ডাক্তারেরা বিনা দর্শনীতেই রোগী দেখ্‌তেন। ডাক্তার সাল্‌জার উপরি উপরি তিন দিন আমার চক্ষু পরীক্ষা করলেন; পরীক্ষার অপেক্ষা আমার কোষ্ঠী-ঠিকুজির খোঁজই বেশী নিলেন। তিন দিন কত কথাই যে জিজ্ঞাসা করলেন, তার হিসাব নিকাশ নেই। তিন দিন জবানবন্দীর পর, তাঁর বস্‌বার ঘরের পাশের ঘরে নিয়ে গিয়ে ছোট্ট একটা সিসি অতি সন্তর্পণে খুলে একটু সাদা কাগজের উপর সরিষার চার-ভাগের এক ভাগ পরিমাণ একটা বড়ি আমার মুখে ফেলে দিলেন। একটু মিষ্ট স্বাদও বোধ হোলো। তার পর আমাকে বাইরে নিয়ে এসে বললেন, আস্‌ছে পনর দিন আর ওষুদ খেতে হবে না। পনর দিন পরে এলে তখন পুনরায় পরীক্ষা ক'রে আবার ওষুদ খাওয়াতে হবে কি না, স্থির করবেন। তার পর ব'লে দিলেন, গন্ধদ্রব্য ব্যবহার একেবারে বন্ধ, পাণ সুপারি মসলা বিষবৎ পরিত্যাগ করতে হবে। আহার দুবেলা ভাত, আর ছোট মাছের ঝোল; তাতে তেল লঙ্কা কি মসলার সংস্পর্শও থাকবে না; জল দিয়ে মাছ সিদ্ধ ক'রে লবণ মেখে খেতে হবে; নিতান্ত যদি ইচ্ছে হয় তা হ'লে একটু হলুদের গুঁড়া মাছের সঙ্গে মিশাতে পারা যাবে। জলখাবার রুটি, গুড় কি কোন-রকম মিষ্টদ্রব্য আহার একেবারে নিষেধ।

শুনেই ত আমার চক্ষুস্থির! আর এতকাল পরে বলতে লজ্জা বোধ করছিনে যে, আহারের এই ব্যবস্থা শুনে আমি কেঁদে ফেলেছিলাম! বাবা, এই দিদির সেই হৈমবতী-চিকিৎসা!

বলব কি, তিন মাস এই কঠোর নিয়ম পালন করলাম। তিন মাসে বোধ হয় হৈমবতীর চারটা বড়ি খেয়েছিলাম। ফল কিছুই হোলো না। অবশেষে ডাক্তার ম্যাক্‌নামারার কথাতেই বিশ্বাস স্থাপন ক'রে সর্ব্বমঙ্গলা হৈমবতীর পায়ে নমস্কার ক'রে ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে গেলাম।

তেরো-চোদ্দ বছর বয়সের সময় আমার চোখের অসুখ কিন্তু একেবারে সেরে গিয়েছিল। সেটা ডাক্তার ম্যাক্‌নামারার ভবিষ্যদ্বাণী, কি ডাক্তার সাল্‌জারের হৈমবতীর ফল, অথবা একজন হাতুড়ে হিন্দুস্থানী-ব্রাহ্মণের অস্ত্রচিকিৎসার ফল, তা আমি বলতে পারব না। কিন্তু, তিন মাস শ্রীমতী হৈমবতী যে আমাকে একপ্রকার অনাহারে রেখেছিলেন, সে কথা আমি ভুলি নাই, কোন-দিনও ভুলব না।

একটা কথা না বললে হৈমবতীর উপর বিশেষ অবিচার করা হবে। এখন কিন্তু হৈমবতী আর অসূর্য্যম্পশ্যা ও অবগুণ্ঠনবতী নেই; এখন, অত কেন, মোটেই সেই আগের মত অত কঠোরতা নেই; হৈমবতী এখন পৃথিবীর চিকিৎসা-বিজ্ঞানে একটা বিশেষ স্থান অধিকার ক'রে বসেছেন; পৃথিবীর সর্ব্বত্র তাঁর আসন সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে; আমাদের এই বাঙ্গালা দেশের অনেক চিকিৎসক হৈমবতী মতে চিকিৎসা ক'রে অনেক কঠিন রোগ আরাম করছেন। আর সকলের চাইতে বড় কথা এই যে, আমাদের মত গরীব লোক একরকম বিনা-পয়সায় বললেই হয় হৈমবতী ঔষধ পান; দরিদ্র, রোগক্লিষ্ট লোকের পক্ষে হৈমবতী সত্য সত্যই সর্ব্বমঙ্গলা হৈমবতী।

গাঁয়ের ছবি

শ্রী সুনয়নী দেবী

(চিত্রণ)

এক

একটি ছোট মেয়ে, ছোট একটি পিতলের কলসী কাঁখে পুকুরে জল আনতে যাচ্ছে। সেই সবে ভোর হয়েছে—আকাশের একদিকে লাল হ'য়ে সূর্য্য উদয় হচ্ছেন। মেয়েটির মুখে সেই আলোর আভা এসে পড়েছে। দু' একটা পাখীর ডাক শোনা যাচ্ছে।

মেয়েটি একমনেই চলেছে। পায়ের মল চারগাছি ঝুনঝুন্ করে' বাজ্‌ছে। পরনে একখানি লাল পা'ড় কাপড়, শিউলি ফুলে ছোপান। হাতে দু'গাছি কাচের চুড়ি; কপালে ছোট্ট একটি খয়েরের টিপ কাটা; চুলগুলি টেনে খুব এঁটে-সেঁটে একটি 'বেনে' খোঁপা বাঁধা, তাতে একটি গাঁদা ফুল গোঁজা আছে। সে আপনার মনে কত কি বক্‌তে বক্‌তে যাচ্ছে।

এমন সময়ে একটি তের-চৌদ্দ বছরের ছেলে, একটি ছিপ হাতে করে' ছুট্‌তে ছুট্‌তে এসে বল্‌লে, "ওরে কমলা, এত ভোরে কোথায় যাচ্ছিস্ বল্ দেখি?" "আমি পিসিমার জন্তে পুজোর জল আন্‌তে যাচ্ছি, ভাই।" "তা যা, কিন্তু আর আমাদের সঙ্গে খেল্‌তে আসিস্‌নে কেন রে?" "দেখ্‌ছ না আমি এখন কত বড় হয়েছি। পিসিমা বারণ করেছেন ছুটোছুটি খেল্‌তে; কি করি বল' না, রমুদা?"

ছেলেটির নাম রমানাথ, সে বল্‌লে, "তাইতো রে, একদিনেই খুব বড় হয়েছিস্ যে!—আয় এই দিকে, দেখি, কত বড় হ'লি?"

কমলার বয়স এগার বছর। সে বল্‌লে, "না ভাই রমুদাদা, এখন আমাকে বাসি-কাপড়ে ছুঁও' না ভাই। পুজোর জল আন্‌তে যাচ্ছি, বাসি-কাপড়ে ছুঁলে এখনি নেয়ে মরতে হবে।"

"তবে আজ আমাদের সঙ্গে খেল্‌তে আস্‌বি বল্, না হ'লে এই দিলুম ছুঁয়ে—"

"কি করে' আসি বল' না ভাই? পিসিমা যদি টের পান, তাহ'লে আর রক্ষা রাখ্‌বেন না; মেরে হাড় গুঁড়ো করে' দেবেন।"

"তবে যা,—আর তোকে কখনো পেয়ারা পেড়ে দেব না।"

"না ভাই রমুদা, তুমি রাগ কোর' না, আজ পিসিমা যখন খেয়ে দেয়ে ঘুমোবেন—চুপি চুপি আমি আস্‌ব তখন।"

"আচ্ছা তাই আসিস্,—কুসুমকে ডেকে আনিস্ কিন্তু বুঝ্‌লি?" "আচ্ছা আন্‌ব। আর কে কে খেল্‌তে আস্‌বে?" "ফটিক, তিনু, বিশু, বিনি সবাই আস্‌বে। আজ খুব জোর লুকোচুরি খেলা হবে। আমাদের আমবাগানে খেলা হবে--সেইখানে যাস্।" "আচ্ছা যাব। এখন যাই, এইবার জল তুলি,—অনেক দেরি হ'য়ে গেছে। পিসিমা কত বক্‌বেন!" "আচ্ছা, জল তুলে নে। আমিও ওদিকে তিনুকে ডাক্‌তে যাব, চল্ একসঙ্গেই যাই।" "তবে তুমি একটু দাঁড়াও ভাই। আমি কলসীটা মেজে জল তুলে নিই।"

এই বলে' কমলা ঘাটে বসে' বেশ চক্‌চকে করে' কলসীটি মেজে জল ভরে' নিয়ে উপরে এসে বল্‌লে, "এইবার চল। অনেক দেরি হয়েছে।"

পথে যেতে যেতে কমলা বল্‌লে, "দেখ ভাই রমুদা, আজ আমার মেয়ের (পুতুল) বিয়ে হবে বিনোদিনীর ছেলের সঙ্গে; তোমরা খেতে যেও ভাই।" (বিনোদিনী রমানাথেরই বোন্।)

রমানাথ বল্‌লে, "তা যাব এখন—ফটিক, বিশু ওদেরও

নিয়ে যাব। কি খেতে দিবি বল্ দেখি ?" "এই মুড়ি মুড়্কি বাতাসা আন্‌ব। আর কোথায় কি পাব এখন ? আমার কি পয়সা আছে, যে ভাল ভাল খাবার কিন্‌ব। পিসিমা চারটে পয়সা দিয়েছেন, তাই দিয়ে ওই সব কিন্‌ব।" "আচ্ছা তাই কিনিস্; আর আমাদের গাছে অনেক পেয়ারা পেকেছে, গোটা কতক নিয়ে যাব—কি বলিস্?" "হ্যাঁ, সেই ভাল রমুদা, তাই নিয়ে যেও। তোমরা সবাই খেতে যেও কিন্তু, ভাই!" "যাব রে যাব, তোর মেয়ের বিয়েতে খাব না?" "আচ্ছা ভাই এইবার তুমি যাও, ওই আমাদের বাড়ী দেখা যাচ্ছে, তুমি আমার সঙ্গে আস্‌ছ দেখ্‌লেই পিসিমা বল্‌বেন যে এতক্ষণ তোমাদের সঙ্গেই খেলা কর্‌ছিলেম।"

"তবে এ'ন আমি যাই—" বলে' রমু চলে' গেল।

বাড়ীটি মাধব গাঙ্গুলীর। কমলা তাঁরি মেয়ে। গ্রামের নাম কুসুমপুর। রমানাথ এঁদের প্রতিবেশী হরনাথ রায়ের ছেলে। পিসিমা বাল্যবিধবা, ভায়ের সংসারে থাকেন। কমলাকে আস্‌তে দেখে বল্লেন, "হ্যাঁ লা, এতক্ষণ কোথায় ছিলি, বল্ দেখি? জলের জন্যে কখন থেকে বসে আছি, এখনো পূজো হ'ল না। খেলা পেলে মেয়ে সব ভুলে যান! রাখ্ ওইখানে জলের কলসী। যা, চারটি ফুল তুলে নিয়ে আয়।"

"আমি আর পারিনে বাপু! সকাল থেকে খাট্‌তে খাট্‌তে আমার প্রাণ গেল—"

"আঃ, গেল যা—এক কলসী জল এনেছেন, তাতেই একেবারে গলে' গেলেন! ও বৌ, তোমার মেয়ের রকম দেখে যাও!"

"যাই ঠাকুর ঝি, কি হয়েছে?"—বলে' কমলার মা ঘর থেকে বেরিয়ে এসে দেখ্‌লেন কমলা চোখে কাপড় চেপে কাঁদ্‌ছে।

"কিরে কমলা, কাঁদিস্ কেন? ঠাকুরঝি, কি হয়েছে—" "হবে আবার কি? কোন্ সকালে জল আন্‌তে গেছে, এত দেরী হলো কেন তাই জিজ্ঞেস করেছি, এই আর মেয়ে আছে কোথায়! আর বলেছি চারটি ফুল তুলে আন্, এই তো কথা। তাতেই একবারে কেঁদে ভাসাচ্ছেন! বাবা! বাবা! এমন বাপের-আছুরে মেয়েও দেখিনি কোথাও! যা—তোকে ফুল আন্‌তে হবে না। কাল থেকে তুই জল আন্‌তে যাস্‌নে, আমি নিজেই জল আন্‌ব এখন।"

এমন সময় মাধব বাবু এসে কমলাকে কাঁদ্‌তে দেখে বল্‌লেন, "কি রে বুড়ি, কি হয়েছে, কাঁদ্‌ছিস কেন?" "দেখ'না বাবা, পিসিমা খালি খালি আমায় বক্‌বেন। আমি কিছু কাজ করি নে?—বাবা, তুমিই বল' না।" "কাজ কর বই কি মা, তুমি যে আমার লক্ষ্মী মেয়ে! তা পিসিমার কথায় কি কাঁদ্‌তে হয় মা? যাও এখন,—কুসুম এসেছে, খেলা কর গে'।"

কুসুম এসেছে শুনে কমলা খুসী হ'য়ে চলে' গেল। পিসিমা পূজো কর্‌তে কর্‌তে বল্লেন, "ও বৌ, মাধবকে কিছু জল খেতে দাও।"

কমলার মা ঘোমটা দিয়ে একধারে দাঁড়িয়ে ছিলেন, পিসিমার কথা শুনে খাবার আন্‌তে চলে' গেলেন।

মাধব বাবু বল্লেন, "দিদি, তোমার পূজো হলো? তোমার সঙ্গে একটা কথা আছে—"

কথা আছে শুনে দিদি তাড়াতাড়ি পূজো সেরে উঠে এসে একখানা মাছুর পেতে দিয়ে ভাইকে বস্‌তে বল্লেন। মাধব বাবু গামছা দিয়ে পা মুছে' মাছুরে বসে', জল খাবার এলে খেতে লাগ্‌লেন, কমলার মা একটি চুমকি ঘটি করে' জল দিয়ে গেলেন। খাওয়া হ'লে, দিদি বল্লেন, "এইবার কি বল্‌ছিলি, বল্।" "বল্‌ছিলেম কি জান, দিদি! কমলার বিয়ের জন্যে তুমি তো ব্যস্ত হ'য়ে উঠেছ। কিন্তু ভাল ছেলে তেমন কোথাও তো দেখ্‌তে পাইনে। রমানাথ আমাদের জ্ঞাতি, তা না হ'লে ওর সঙ্গেই দিতেম।" "আমি বলি কি মাধব, একবার হারাধন ঘটককে ডেকে, ছেলে খুঁজ্‌তে বলে' দে। ওর হাতে অনেক ছেলে আছে।" "তাই দেখি।"

এমন সময় তিনকড়ির সঙ্গে হারাধনকে যেতে দেখে দিদি বল্লেন, "ওরে, ওই যে হারাধন যাচ্ছে, ওকে ডাক্ না?"

মাধব বাবু উঠে গিয়ে হারাধনকে ডেকে আন্‌লেন।

দিদি বল্লেন, "এই আমরা তোমারি নাম কর্‌ছিলেম হারাধন!" "কেন দিদি ঠাক্‌রুণ, সকাল বেলাতেই আমার

নাম কর্‌ছিলেন? কিছু দরকার আছে কি?" "হ্যাঁ ভাই, দরকার আছে বই কি। এই দেখ না, আমাদের কমলা বড় হ'য়ে উঠ্‌ছে, এইবার তার বিয়ে দিতে হবে তো? তাই বলি, তোমাকে একবার বলে' দেখি যদি ছেলে টেলে থাকে তো কমলার জন্যে দেখ্‌বে।" "ছেলের আবার অভাব কি দিদি ঠাকরুণ। কত পাশ করা, ফেল করা ছেলে আমার হাতে আছে, যে রকম চান এনে দিতে পারি। তার জন্যে ভাবনা নেই; কিন্তু শুধু মেয়েটি তো নেবে না তার সঙ্গে রেস্ত-রসদ চাই, সেইটেই ভাববার বিষয়।" মাধব বাবু বল্লেন, "ঠিক বলেছ হারাধন, ওইটেই হয়েছে ভাবনার কথা। দিদি মেয়ে মানুষ, বোঝেন না তো কিছু? মনে করেন ছেলে পেলেই বিয়ে হবে!"

এমন সময় তিনকড়ির দিদিমা 'তারা দিদি' এসে উপস্থিত হ'য়ে বল্লেন, "ওলো থাকো, তোদের কি কথা হ'চ্ছে লা?"

ইনি পাড়ার সকলেরি 'তারা দিদি'—সকল ঘরের খবর রাখেন। তিনকড়ি আর কুসুমের মা মারা গেলে ইনিই তাদের মানুষ করেছেন। মাধব বাবুর জমিতে ঘর বেঁধে আছেন।

পিসিমা বল্লেন, "কমলার বিয়ের কথা হ'চ্ছে, দিদি। মেয়েটা বড় হয়েছে, তাই হারাধনকে একটি ছেলের কথা বল্‌ছি।—ছেলে দেখ্‌তে হবে তো?" "তা তো দেখ্‌তে হবেই লো। এই আমাদের কুসুম, দেখ্‌না কমলাতে তাতে একবয়সী হবে, কিন্তু কমলার চেয়ে বড় দেখায়—।"

মাধব বাবু বল্লেন, "দিদি তো সব বাড়ীতেই যাও, কোথাও ছেলে টেলে আছে বল্‌তে পার?" "তা থাক্‌বে না কেন। এই কাল ও-পাড়ায় গিয়েছিলেম। জমিদার মশাই ছেলের জন্যে একটি মেয়ের কথা বল্‌ছিলেন। এই মাস খানেক আগে বৌটি মারা গেছে কিনা।"

পিসিমা বল্লেন, "তবে হারাধন, একবার তুমি শ্যামলাল বাবুকে বলে' দেখনা, যদি পছন্দ হয়? মেয়ে তো আমাদের কালো নয়।"

মাধব বাবু বল্লেন, "এ তোমার মিছে আশা করা, দিদি। শ্যামলাল বাবু কি গরীবের মেয়ের সঙ্গে ছেলের বিয়ে দেবেন?—না হারাধন, তাতে কাজ নেই। তুমি একটি গেরস্ত ঘরে, খাওয়া পরার কষ্ট না হয় এমনধারা ছেলে একটি দেখ, বুঝ্‌লে?"

দিদি বল্লেন, "তবে তুই যা ভাল বুঝিস্ তাই কর্, আমাকে কোন কথা বল্‌তে আসিস্ নে।" "এই দেখ হারাধন, দিদির রাগ হলো!"

হারাধন বল্লে, "তা বেশ তো, আমি একবার বলেই দেখি না তাঁদের কি মত হয়।" "তাই বলে' দেখ, কি বলেন।" "আচ্ছা আজ তা হ'লে উঠি, অনেক বেলা হয়েছে। কাল সকালে এসে জানিয়ে যাব।"—বলে,' হারাধন নমস্কার করে' উঠে গেল।

মাধব বাবু তারা দিদিকে বল্লেন, "দিদি আজ এইখানেই খেয়ে যাও না কেন?" "তা খেলেই হলো, তার জন্যে আর কি হয়েছে। তবে কুসুম আর তিনকড়ে কোথায় খাবে তাই ভাব্‌ছি।" "তাদের যে আজ এখানে কমলা খেতে বলেছে; কমলার পুতুলের বিয়ে কিনা, তাই।" "ভালই হয়েছে; তবে এইখানেই খেয়ে যাব এখন। তোদের আজ কি রান্না হ'চ্ছে লো?" "এই দিদি উচ্ছে দিয়ে খেসারির ডাল, আর আলু পটল ভাজা, একটা শুক্ত, নিরামিষ, অম্বল, ডাঁটা চচ্চড়ি। আর গোবিন্দ মাছ আন্‌তে গেছে, এলে ওদের মাছের ঝোল হবে। তোমার জন্যে আর কিছু কর্‌ব দিদি?" "না লো না, আবার কি কর্‌বি, এই তো যজ্ঞি-বাড়ীর রান্না হয়েছে। আবার কি খায় মানুষে? তবে একটু দুধ আমার জন্যে রাখিস্, আফিং খাই কি না, ওটি না হ'লে চলে না।—হ্যাঁ লা, বৌ কোথায়? তাকে যে দেখ্‌ছি না?" "এই, ঘাটে গেছে জল আন্‌তে। এলে দুধের কথা বলে' দেব এখন। রঘু আজ একটা কাঁঠাল দিয়ে গেছে। ঘন দুধ দিয়ে খেও এখন, দিদি।"

মাধব বাবু বল্লেন, "দিদি একটু তেল দাও, স্নান করে' আসি।"—তেল মেখে তিনি গেলেন স্নান কর্‌তে।

সন্ধ্যা বেলা কমলার মেয়ের (পুতুল) বিয়ে হ'য়ে গেল। তিনু, বিশু, কটকে, রমু সবাই এসে খেয়ে গেছে। রমানাথ একহাঁড়ি দই এনেছিল, চিড়ে মুড়্‌কি খাওয়া হ'ল।

দুই

আজ বিনোদিনীর ছেলের বৌ (পুতুল) আসবে, তাই ভোর বেলা উঠে ঘরের কোণে বরক'নের জন্তে সব গোছাচ্ছে, এমন সময় জ্যাঠাই মা স্নান করে' এসে উঠানে দাঁড়িয়ে বল্‌লেন, "ওলো ও' বিনি, বলি আজ কি কুট্‌নো কোটা হবে না, নাকি? ঝুড়ি ধরে' আনাজগুলো দিয়ে গেলুম, মনে কর্‌লুম কুটে রাখ্‌বে। ওমা, মেয়ে এখনো ঘরেই বসে' আছেন!"

বিনি ঘর থেকে একখানা বঁটি হাতে করে' তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এসে বল্‌লে, "কি কুট্‌ব জ্যাঠাই মা, তুমি কিছু বলে' গেলে না, তাই আমি চুপ করে' বসে আছি। কি কি বল, কুটে দিই।" "সব আমি বলে' দেব তবে তুমি কর্‌বে? কেন, জান'না রোজ কি হয়? নে এখন এই মোচাটা কোট্; আমি পূজো সেরে এসে রান্না চড়াই।"—বলে' জ্যাঠাই মা ঘরে চলে' গেলেন।

পূজো সেরে রান্নাঘরে গিয়ে ডালের হাঁড়িটা উনানে চাপিয়ে, হাঁড়িতে খানিকটা জল ঢেলে দিয়ে জ্যেঠাই মা বিনিকে ডেকে বল্‌লেন, "ওলো, মোচাগুলো দিয়ে যা না, আঁচ ব'য়ে যাচ্ছে, চাপিয়ে দিই।"

বিনি একটা কাঁসিতে করে' মোচাগুলো নিয়ে রান্নাঘরে দিয়ে এলো। এমন সময় রমানাথ এসে বল্লে, "জ্যাঠাই মা, কোথায় তুমি?" "এই যে আমি রান্নাঘরে, কি হয়েছে রে? ডাক্‌ছিস্ কেন?"—বলে' হাত ধুয়ে বেরিয়ে এলেন।

"জানো জ্যেঠাই মা, আমি এইবার কল্‌কাতায় পড়্‌তে যাব, বাবা বলেছেন।" "ও, তাই সাত-তাড়াতাড়ি আমাকে বল্‌তে এসেছ? কেন রে, এখানে কি নেকাপড়া হয় না নাকি, তাই ঠাকুরপো তোকে কলকাতায় পাঠাচ্ছে? কলকাতায় গিয়ে ছেলে জজ হবে, না? আসুক্ বাড়ীতে, এমন শোনাব।" "রাগ কর্‌ছ কেন জ্যেঠাই মা, এখানে কি কলেজ আছে যে পড়্‌ব।" "তা যা না যেখানে খুসী, আমাকে বল্‌তে এলি কেন? এই সেদিন ভূতো একখানা বই এনে বিনিকে কত ইংরাজি পড়ে' শোনালে—বল্ না লো পোড়ারমুখী, শোনায় নি? মেয়ের যেন বাক্যি হরে' গেছে!"

রমানাথ হো-হো করে' হেসে উঠে বল্‌লে, "ও জ্যেঠাই মা, তুমি ভূতোর এ-বি-সি শুনেই মনে কর্‌লে, খুব ইংরাজী লেখাপড়া জানে? হা হা হা! জ্যেঠাই মা, তুমি কি যে বল তার ঠিক্ নেই!"

এমন সময় ফটিক এসে বল্‌লে, "কি রমুদা সকাল বেলা অত হাস্‌ছ কেন ভাই?"

"ওরে ফটিক শোন্ শোন্, জ্যেঠাই মা কি বল্‌ছেন! ভূতো নাকি খুব ইংরাজি পড়্‌তে পারে—" বলে' হা হা হা করে' রমানাথ আবার হেসে উঠ্‌ল।

"সর্, সর্, সকাল বেলা অত হাসি আমার ভাল লাগে না! তোর সঙ্গে বকে' বকে,' আমার কোন কাজই হলো না। আমি ঠাকুরপোকে বলে' কালই কাশী যাব। দেখি, তোদের সংসার কি করে' চলে—" বলে', গজ্ গজ্ কর্‌তে কর্‌তে রান্নাঘরে গিয়ে দুম্ করে' ভাতের হাঁড়ীটা উনানে বসিয়ে দিলেন।

বিনি ভয়ে ভয়ে গিয়ে বল্‌লে, "বড় মা, আর কিছু কাজ আছে কি?" "আর তোমাকে কাজ কর্‌তে হবে না— দূর হ'য়ে যা আমার সাম্‌নে থেকে। অত বড় মেয়ে যদি একটা কাজ পারে। আজ বাদ কাল শ্বশুর-বাড়ী যাবে, তখন খোঁটা খেতে খেতে যাবে আমার প্রাণ!"

ফটিক বল্‌লে, "জ্যেঠাই মা, বিনির যে আজ ছেলের বৌ (পুতুল) আসবে। আমরা আন্‌তে যাচ্ছি। চল রমুদা, এইবার যাই।"

এমন সময় হরনাথ বাবু এসে বল্‌লেন, "বৌদি কই? একটা কথা আছে। বিনি,—তোর জ্যেঠাই মা কোথায় রে?" "এই যে বাবা, রান্নাঘরে—আমি বল্‌ছি। তুমি এইখানে বোস। কিন্তু বাবা, জ্যেঠাই মা বড় রেগে আছেন, দাদা কলকাতায় যাবে শুনে'—" "তাই না কি রে? তবে এখন আর কিছু বলে' কাজ নেই—আমি মাধবের ওখান থেকে ঘুরে আসি।"

বিনি বল্‌লে, "বাবা, আজ আমার ছেলের বৌ (পুতুল) আসবে। বাতাসা কিন্‌ব, আমাকে চারটে পয়সা দাও না।"

"আচ্ছা এই নে"—বলে' চারটে পয়সা দিলেন। তার পর চাদর নিয়ে বেরিয়ে গেলেন।

তিন

তার পর জ্যেঠাই মা'র ঘোর অমত থাকাতেও রমানাথকে কলকাতায় যেতে হলো। এক বছর হ'য়ে গেছে রমানাথ কলকাতায় এসেছে। ভবানীপুরে একটা মেসে, দোতালার একটা ঘর নিয়ে আছে। দশ-বারটি ছেলে মেসে থাকে। সকলেই স্বভাবগুণে রমানাথকে ভালবাসে। হাইকোর্টের উকীল বেহারী বাবুর ছেলে বিনোদ, রমানাথের সঙ্গেই এক ঘরে থাকে। ঘরটি ছোট হলেও বেশ আলো-হাওয়া আসে। এক দিকে একখানি তক্তপোষ পাতা আছে, একটি তোষক আর দুটি বালিস। চাদর দিয়ে বিছানাটি ঢাকা দেওয়া। এক ধারে আলনায় দুটি সার্ট, দুখানা ধুতি, উড়ানী, দুখানা গামছা ঝুলছে। এক কোণে একটা কুঁজো, মুখে একটি কাঁসার গেলাস ঢাকা। দরজায় একটা ছিটের পর্দা দেওয়া। মাঝে একটা টেবিল, তার দুদিকে দুখানা চৌকিতে রমানাথ আর বিনোদ বসে' গল্প কর্‌তে কর্‌তে চা খাচ্ছে।

মেসের ঝি একটা রেকাবি করে' দুটি রসগোল্লা আর দু'খিলি পাণ দিয়ে গেল। বিনোদ চায়ের পেয়ালাতে চুমুক দিয়ে বল্লে, "ওরে রমু, আজ বামুন বেটা এমন চা করেছে খেয়ে দেখ্,—কেবল গরম জল, আর চিনি। কাল থেকে আমি নিজেই কর্‌ব চা। বামুনটার সঙ্গে আর পারা যায় না।" "তা কোর' এখন, দাদা। কিন্তু এই চার-পাঁচ দিন ছুটিটা কি করে' কাটান যায় বল দেখি ভাই?" "তুই তো বল্‌ছিলি দেশে যাবি, তা চল্ না—তোর সঙ্গে আমিও যাই তোদের দেশটা দেখে আসি গে'।" "তা হ'লে সত্যি কিন্তু খুব ভাল হয় ভাই,—তাই চল। তুমি গেলে বাবা, জ্যেঠাই মা খুবই খুসী হবেন! আজ শনিবার, আজ চারটের ট্রেনেই যাই চল, সন্ধ্যে বেলা আমাদের গ্রামে পৌঁছব।" "তাই চল, খাওয়া দাওয়ার পর বাড়ীতে মাকে বলে' আসি। পাড়া-গাঁয় কখনো যাইনি, অনেক দিন থেকে দেখ্‌বার ইচ্ছে আছে।" "আমাদের গ্রাম দেখ্‌লে তোমার আর এখানে ফিরে আস্‌তে মন হবে না। এখানে কি আছে ভাই?—কেবল লোকের ভীড়, কলের ভোঁ ভোঁ, ট্রেনের ঘড় ঘড়ানি। সেখানে কেমন খোলা মাঠ! জায়গায় জায়গায় গাছের ঝোপের ভিতর দিয়ে কুঁড়ে-ঘরগুলি দেখা যাচ্ছে। সরু-মোটা রাস্তাটি এঁকে বেঁকে চলে' গেছে—গ্রামের মেয়েরা ঘোমটা দিয়ে পুকুরে জল আন্‌তে সকাল-সন্ধ্যায় যাচ্ছে। সন্ধ্যা বেলা আর সকালে কত রকম পাখী ডাকে, তার ঠিক নেই। এখানে তো কাকের ডাক ছাড়া আর কোন পাখীর ডাক শুন্‌তে পাই না। সারাদিন ছেলেরা ছুটোছুটি করে' খেলে বেড়াচ্ছে। সন্ধ্যে হ'লে গাছগুলি জোনাকী পোকায় আলো করেই দেয়। সে যে কি শোভা, না দেখ্‌লে বুঝ্‌তে পার্‌বে না, ভাই।"

বিনোদ বল্লে, "তোর বর্ণনা শুনে সেই গানটা মনে পড়ে গেল—'সারাদিন পাখী ডাকা, ছায়ায় ঢাকা তোমার পল্লী-বাটে'। গানটি একজন বিখ্যাত কবির রচনা।" "সেদিন কতকগুলি ছেলে রাস্তা দিয়ে এই গানটা গেয়ে যাচ্ছিল বটে। গানটি আমার খুব ভাল লেগেছিল, বিনোদ দা। আমাদের গ্রামের বর্ণনাটি ঠিক মিলে গেছে!"

এমন সময় মেসের ঝি এসে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে বল্‌লে, "বাবুরা কি আজ চ্যান কর্‌বেক নি? কলের জল গেলেক্ আমি জল তুল্‌তি পার্‌বক নি বাপু। আর-বাবুদের সব খাওয়া হ'য়ে গেলক্। ঠাকুর বক্‌তেছেক।"

"ঝি তুমি যাও, আমরা এখনি যাচ্ছি। চল্ রমু, স্নান করে' খেয়ে নিয়ে কথা হবে এখন।" বলে' তারা নীচেয় নেমে গেল।

চার

বিনোদ দুপুর বেলা বাড়ী গেল। পটলডাঙ্গায় বেহারী মুখুয্যের বাড়ী। এঁর দুই ছেলে, ব্রজলাল আর বিনোদলাল। একটি মেয়ে—নাম সুরমা। ব্রজলালের বিয়ে হয়েছে, বৌ এখানেই আছে, নাম উমা। বাড়ীটি বেশ বড়; লোকজনে ভরা। বিনোদের মা আছেন। এক পিসি আছেন। বিয়ের পর থেকেই বাপের বাড়ীতেই আছেন, স্বামীর কোন খোঁজ খবর নেই। বিনোদ বাড়ী গিয়ে দেখ্‌লে পিসিমা ঘরে পা ছড়িয়ে বসে' পান-দোক্তা মুখে দিচ্ছেন, হারাণী ঝি হাত-মুখ নেড়ে সাম্‌নে বসে' গল্প কর্‌ছে। বিনোদকে দেখে, "ওমা দাদাবাবু যে" বলে' মাথায় কাপড়

দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

বিনোদ বল্লে, "পিসিমা, মা কোথায়? ঘরে দেখ্‌তে পেলুম না।" "তোর মা যে তোর মাসীর ওখানে গেছেন। তুই এমন সময় বাড়ী এলি যে? আজ ছুটি আছে নাকি?" "না পিসিমা, আজ শনিবার—তাই সকাল সকাল কলেজ বন্ধ হয়েছে। বৌদিদি কি মায়ের সঙ্গে গেছেন?" "না রে, বৌমা আছে, তুই যা না সেখানে। এখনি চলে' যাস্‌নে যেন।"

"না পিসিমা, মায়ের সঙ্গে দেখা করে' যাব যে।" বলে' বিনোদ বৌদি'র ঘরে গিয়ে দেখ্‌লে, উমা তখন পান সাজ্‌তে বসেছে। উমার ঘরটি বেশ সাজান। মেজেটি সাদা কালো মার্‌বেল পাথরের। একদিকে একখানা জোড়া-খাট, তার পাশে একখানি কৌচ, মাঝে একটা পাথরের গোল টেবিল, তার উপর একটা ফুল দানী কতকগুলি টাট্‌কা গোলাপফুল দিয়ে সাজান। একদিকের দেয়ালে একটা ড্রেসিং টেবিল. তার উপর সিঁদুর-কৌটা, চিরুণি, প্রভৃতি ছোটখাট এটা-ওটা সাজান রয়েছে। দেয়াল পেন্টিং করা। খান কতক অয়েল পেন্টিং, দেবদেবীর ছবি খাটান। খাটের সামনে একখানা কারপেট পাতা।

উমা একখানা আসন পেতে বসে' পাণ সাজ্‌ছিল, বিনোদকে দেখে মাথার কাপড় একটু টেনে দিয়ে বল্‌লে, "এই যে ঠাকুরপো! কখন এলে ভাই?"

"এই আস্‌ছি বৌদি," বলে' মেজেতে বসে পড়্‌ল।

"ও কি ভাই ঠাকুরপো, মাটিতে বস্‌লে কেন? এই আসনটা পেতে বস' না ভাই, কাপড়ে ধূলো লাগ্‌বে যে!" "না বৌদি, আমি বেশ বসেছি—তুমি ব্যস্ত হ'য়ে উঠো না, তোমার ঘরে একটুও ধূলো নেই।" "আমার ঘরে ধূলো হবার যো কি! আমি যে ভাই নিজের হাতে সব ঝাড়ি, দাসী-চাকরের কাজ আমার পছন্দ হয় না ভাই।" "সে যাক্ বৌদি, এখন তোমার সঙ্গে একটা কথা আছে—" "কি কথা ভাই? কোথাও সুন্দর মেয়ে টেয়ে দেখেছ না কি? মাকে বল্‌তে হবে বুঝি?" "এই দেখ বৌদি, আমার কথাটা না শুনেই নিজের মনে যা-তা একটা ঠিক করে' নিলে? মেয়েদের মাথায় কেবল বিয়ে বিয়ে ঘুর্‌ছে! আমি এখন বিয়ে কর্‌ছি না, সে ভাবনা তোমার কর্‌তে হবে না।" "তুমি বিয়ে কর্‌ব না বল্‌লেই তো হবে না ভাই। এই আজই ত' মা তোমার জন্যে মেয়ে দেখ্‌তে মাসী-মা'র ওখানে গেছেন। মাসী-মা'র ভাসুরঝি নাকি খুব সুন্দর!" "আমি এখন কিছুতেই বিয়ে কর্‌ছিনে, কিন্তু।"

এমন সময় সিঁড়িতে মলের শব্দ শুনে উমা বল্‌লে, "ওই সুরমা আস্‌ছে, কি রকম মেয়ে দেখ্‌লে—শোনা যাবে এখন। সুরমা, "ভাই বৌদি" বলে', ঘরে ঢুকে বিনোদকে দেখে একটু অবাক্ হ'য়ে গিয়ে, তারপর "এই যে ছোড়্‌দা এসেছ? আজ আমরা তোমার ক'নে দেখ্‌তে গিয়েছিলুম যে—" বলে' খিল্ খিল্ করে' হেসে উঠ্‌ল।

বিনোদ বল্‌লে, "ক'নে দেখ্‌তে গিয়েছিলেন, এদিকে মাষ্টার এসে ফিরে গেল, তার খোঁজ আছে? হাস্‌তে লজ্জা কর্‌ছে না? পড়াশোনা নেই, কেবল জ্যেঠামি শিখ্‌ছে! যা—পড়া কর্‌গে'।"

সুরমা বকুনি খেয়ে চোখ মুছ্‌তে মুছ্‌তে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

এমন সময় হারাণী এসে বল্‌লে, "দাদাবাবু, মা তোমাকে ডাক্‌ছেন।"

বিনোদ বল্‌লে, "বৌদি দুটো পাণ দাও দেখি, খাই। মেসের ঝি'র হাতের পাণ খেয়ে খেয়ে মুখ হেজে গেছে!"

উমার তখন পাণ সাজা হ'য়ে গেছে, একটু গোলাপ-জল ছিটিয়ে দিয়ে বিনোদকে দুটি পাণ দিলে। বিনোদ দুটো পাণ মুখে পুরে' বল্‌লে, "আরও গোটা কতক পাণ আমাকে যাবার সময় দিও বৌদি, নিয়ে যাব।" "আচ্ছা দেব এখন।" "বেশ। আমি মায়ের ঘরে যাচ্ছি, তুমি ঠিক করে' রেখ। আর কিছু চা-ও দিও, একটা সিগারেটের কৌটো করে'। আমি আজ রমানাথের দেশে বেড়াতে যাচ্ছি, চা সঙ্গে নিয়ে যাব।" বলে' উঠে গেল।

মায়ের ঘরে গিয়ে দেখ্‌লে, তিনি তখন একটি তাকিয়ায় হেলান দিয়ে কাত হ'য়ে শুয়ে আছেন, হারাণী পায়ে হাত বুলাচ্ছে। উঠে বসে' বল্‌লেন, "আয় এইখানে বোস্, ওকি রে, ওখানে বস্‌ছিস্ কেন? বিছানায় বোস্।"

বিনোদ বিছানায় উঠে বস্‌ল। মা বল্‌লেন, "আজ তো শনিবার, এখানে থাক্ না কেন? কাল তখন খেয়ে

মেয়ে সন্ধ্যাবেলা যাস্।" "না মা, আমি যে আজ রমানাথের সঙ্গে তার দেশে বেড়াতে যাচ্ছি, তাই তোমাকে বল্‌তে এসেছি।" "সে আবার কোথা রে?" "কুসুমপুর গ্রামে ওদের দেশ। পাড়াগাঁয়ে কখনো যাই নি, দেখ্‌তে ইচ্ছে হয়েছে, মা। তুমি কিন্তু অমত কর্‌তে পার্‌বে না, তা বলে' রাখ্‌ছি।"

"এই দ্যাখ, পাগল ছেলে—পাড়াগাঁয়ে যাবি কিরে? নারে না গিয়ে কাজ নেই।" "কেন মা, পাড়াগাঁ শুনে অত ভয় পাচ্ছ? তোমার বাপের বাড়ীও তো পড়াগাঁয়ে? সেখানে যাব বল্লে তুমি যেতে দেবে কিনা বল?"

"তা সেখানে কি কখনো গেছিস্ রে? দাদা কতবার তোদের নিয়ে যেতে বলেছেন,—তোরাই ত যেতে চাস্‌নি। বলিস্ সেখানে গেলে ম্যালেরিয়া হবে।" 'না মা, আর বল্‌ব না, এইবার ফিরে এসে তোমাকে মামার বাড়ী নিয়ে যাব। আজ আমায় অনুমতি দাও মা—চারটার ট্রেনে আমরা যাব। এখন দুটো বেজে গেছে।"

"আচ্ছা একটু দেরী কর্।"—তার পর হারাণীকে বল্লেন, "ওরে বৌমার কাছ থেকে বিনোদের জন্তে খাবার নিয়ে আয় দেখি।"

হারাণী খাবার আন্‌তে গেল। মা তখন বিনোদকে বল্লেন, "যাবি যা, কিন্তু পুকুরের জল খাস্‌নি যেন।" "না মা, সে ভাবনা নেই—আমরা জল নিয়েই যাব।"

উমা একখানি রেকাবি করে' বিনোদের খাবার নিয়ে এল, হারাণী গেলাসে করে' জল দিলে। তারপর জল খেয়ে মাকে প্রণাম করে' বিনোদ বল্লে, "চল বৌদি, এইবার পাণ দেবে, আর চারটি চা দিও।" বলে' উমার সঙ্গে চলে গেল।

পাঁচ

রমানাথ আর বিনোদ যখন গ্রামে পৌঁছল তখন সন্ধ্যা হ'য়ে গেছে।—শিবমন্দিরে আরতির শাঁখ-ঘণ্টা বাজ্‌ছে। চাঁদের আলোয় গ্রামটি একখানি ছবির মত দেখাচ্ছে। বিনোদ বল্লে, "সত্যি রে রমু, তোদের গ্রামটি ঠিক যেন একখানি ছবির মত দেখাচ্ছে। অবনী বাবু যদি এখানে আস্‌তেন তাহ'লে নিশ্চয় তোদের গ্রামের একখানি ছবি এঁকে নিতেন।"

রমানাথ বল্লে, "ভাই, তুমি হেঁটে যেতে পার্‌বে কি? না একটা গরুর গাড়ীর চেষ্টা দেখ্‌ব?" "না রে, গাড়ীর দরকার নেই, চাঁদের আলো আছে—হেঁটেই যাব এখন।"

"তবে চলো," বলে' রমানাথ সুট্‌কেস্‌টা হাতে করে' নিলে। তারা যখন বাড়ী পৌঁছল, জ্যেঠাইমা তখন তুলসী-তলায় প্রদীপ দেখিয়ে প্রণাম কর্‌ছিলেন। রমানাথকে দেখে বল্লেন, "কিরে, তুই যে হটাৎ না বলে' এলি? তোর সঙ্গে ছেলেটি কে রে?"

"আমার বন্ধু বিনোদ-দা, জ্যেঠাইমা। চার-পাঁচ দিন ছুটিতে এখানে বেড়াতে এসেছে—" বলে' তারা দুজনে প্রণাম কর্‌লে।

জ্যেঠাইমা আশীর্ব্বাদ করে' বল্লেন, "তা এসেছে বেশ হয়েছে বাবা, বড় সুখী হলেম। কিন্তু তোমার হয় তো কত কষ্ট হবে, তাই ভাব্‌ছি।"

"না জ্যেঠাইমা, আমার কোন কষ্ট হবে না—আপনি কিছু ভাব্‌বেন না।" "ওরে রমু, বিনোদকে ঘরে বসা না, দাঁড়িয়ে রইলি যে?"

রমানাথ বিনোদকে নিয়ে গেল।

"ওলো বিনি, এদিকে আয় না, বাড়ীতে লোক এলো, মেয়ের যদি কোন খোঁজ-খবর আছে!" "দাদার সঙ্গে কে এসেছে জ্যেঠাইমা?"

"আহা এতক্ষণে হুঁস হলো, 'কে এসেছে জ্যেঠাইমা,' বল্‌তে এলেন। ওই জন্তেই তো দেখ্‌তে পারিনে। যা, ঘরে যে-খাবার আছে দুজনের মত গুছিয়ে আয়। একটা কাজও যদি তোর দ্বারা হয়।" বলে,' তিনি রান্নাঘরে গেলেন। সেখানে কালীর-মা ঝি উনানে আঁচ দিচ্ছিল, তাকে বল্লেন, "ও কালীর মা, একবার এই হ'য়ে মুদির দোকানে যা তো বাছা, এক-পো ময়দা আর আধ-পো ঘী নিয়ে আয় দেখি। বিনোদকে খানকতক লুচি ভেজে দেব।"

"আমি এখন এই আঁধারে একলা যেতে পার্‌বক না বাপু।" "আচ্ছা না পারিস্ বিনিকে নিয়ে যা। এই তো পুকুর-পারে দোকান। যা যা আর দেরী করিস্‌নে।"

এমন সময় হরনাথ বাবু এসে বৌদিকে ডেকে বল্লেন, "বৌদি, রমুর সঙ্গে বিনোদ এসেছে, তাকে ভাল করে'

খাওয়াতে হবে তো—। যাই দেখি যদি ভাল সন্দেশ পাই নিয়ে আস্‌ব এখন। আর কিছু আন্‌তে হবে কি?" "ঘী ময়দা আন্‌তে কালীর মাকে পাঠিয়েছি ঠাকুরপো, আর কিছু দরকার নেই। ও-বেলার সেই বড় মাছটার খানকতক আছে, তারি ঝোল আর ঝাল কর্‌ব এখন। সন্দেশ আর আন্‌তে হবে না তোমাকে। আজ কমলার পাকা দেখা হলো কি না, তাই মাধব খাবার পাঠিয়েছে। বেশ ভাল রসগোল্লা আছে; তাতেই হবে।"

"আচ্ছা আমি একটু ঘুরে এখনি আস্‌ছি", বলে,' হরনাথ চলে গেলেন।

ন'টার সময় খাওয়া দাওয়া সেরে, রমানাথ আর বিনোদ এক ঘরে শুয়ে পড়্‌ল। সকালে উঠে মুখ-হাত ধুয়ে, বিনোদ বল্লে, "রমু, এইবার একটু চায়ের জোগাড় কর্‌তে হবে তো?" "আচ্ছা আমি বিনিকে গরম জল আন্‌তে বল্‌ছি ভাই। তুমি ততক্ষণ বের করে' রাখো—" তারপর বিনিকে ডেকে রমু গরম জল আন্‌তে বল্‌লে।

বিনি একটা ঘটি করে' গরম জল,দুধ, চিনি দিয়ে গেল। রমানাথ ঘটির জলে চারটি চা দিয়ে একটি এনামেলের বাটি মুখে ঢাকা দিলে। বিনি একটা ধামি করে' গরম মুড়ি, আর জ্যেঠাই মা ডালের বড়া ভেজেছিলেন তাই একটা বাটি করে' দিয়ে গেল। বাসি লুচি ছিল তার খানকতক, আর বেগুন ভেজেও এনে দিলে। রমানাথ চা'টা ধোয়া রুমাল দিয়ে বাটিতে ছেঁকে দুধ-চিনি দিয়ে বিনোদের দিকে এগিয়ে দিলে। বিনোদ চায়ের বাটিতে চুমক দিয়ে বল্‌লে, "ওরে রমু, চা খুব ভাল হয়েছে, খেয়ে দেখ্‌। হাতের গুণে ঘটিতেও চা ভাল হয় দেখ্‌ছি।" তার পর মুড়ি, ফুলুরি, লুচি, বেগুনভাজা খেয়ে বিনোদ বল্‌লে, "ওরে, সকালেই যা খাওয়া হলো ভাতের দফা রফা, এখন চল্‌ একটু বেড়িয়ে আসি নইলে হজম হবে না।"

রমানাথ বল্‌লে, "চল ভাই তোমাকে মাধব কাকার ওখানে নিয়ে যাই।" এই বলে' তারা চাদর আর ছাতা নিয়ে বেরিয়ে পড়্‌ল। পথে তিনকড়ি আর ফটিক এসে জুটল, তখন চার জনে গল্প কর্‌তে কর্‌তে মাধব বাবুর বাড়ী উপস্থিত হলো। হরনাথ বাবু আগেই সেখানে এসেছিলেন। বিনোদরা যেতে, বল্লেন, "এই যে বিনোদ এসেছে? মাধব, এটি রমুর বন্ধু বিনোদ।"

মাধব বাবু বল্লেন, "বোস' এইখানে, বড় খুসী হলেম তুমি এসেছ।"

বিনোদ আর রমানাথ প্রণাম করে' মাদুরের একদিকে বস্‌ল। মাধব বাবু বল্লেন, "সেখানে কেমন ছিলি রে রমু?" "ভালই ছিলুম কাকা!" "কিন্তু অত রোগা হ'লি কেন রে? উড়ে বামুনের রান্না খেতে পারিস্‌নে নয়?" "রান্নার কথা আর মনে করিয়ে দিও না কাকা, তাহ'লে এখনি কান্না বেরিয়ে যাবে।... পিসিমার সঙ্গে দেখা করে' আসি, কাকা।"

মাধব বাবু বল্লেন, "তা বিনোদকেও নিয়ে যা না ভিতরে।" "তবে এসো ভাই," বলে' বিনোদকে নিয়ে রমানাথ উঠে গেল।

তারা দেখ্‌লে পিসিমা তখন গোবিন্দর কাছে বাজারের হিসাব নিয়ে ভারি গোলমাল বাধিয়ে দিয়েছেন! পিসিমা বল্‌ছেন, "যা পয়সা দিয়েছি তার চেয়ে বেশি কেন খরচ হলো?" গোবিন্দ বল্‌ছে, "অত জিনিষ আন্‌তে ফরমাস কর্‌লে খরচ হবে না তো, অম্‌নি আস্‌বে নাকি? আমি কাল থেকে বাজার কর্‌তে পার্‌ব না।" "না পারিস্‌ দূর হ'য়ে যা। তারাদিদি বাজার করে' দেবে এখন।" এমন সময় রমানাথকে দেখে চুপ কর্‌লেন। গোবিন্দ, "এই যে দাদা বাবু এসেছেন," বলে' উঠে প্রণাম করে' পায়ের ধুলা নিলে।

"কি রে কেমন আছিস?" "আর দাদা বাবু এমনি আছি একরকম।"

কমলার মা ঘরে ছিলেন, বেরিয়ে এসে বিনোদকে দেখে মাথার কাপড় টেনে দিয়ে একপাশে দাঁড়ালেন। রমানাথ আর বিনোদ পিসিমা, খুড়ীমা দুজনকে প্রণাম কর্‌লে। পিসিমা বল্লেন, "এটি কে রে রমু?" "সেই যে পিসিমা, সেবার এসে তোমার কাছে যার কথা গল্প করেছিলেম, সেই আমার বন্ধু।" তারপর খুড়ীমার দিকে চেয়ে বল্লে, "কমলা কোথায়, খুড়ীমা?"

তিনি বল্লেন, "সে রান্নাঘরে, চাল ধুচ্ছে। ওরে

কমলা, তোর রমু দাদা এসেছে, এদিকে আয় না।" তারপর একখানি মাছুর দাওয়াতে পেতে দিতে গেলেন।

রমানাথ তাঁর হাত থেকে মাছুরখানি নিয়ে বল্লে, "ওকি খুড়ীমা, তুমি মাছুর পেতে দেবে—আমরা বস্‌ব ?" বলে' মাছুরখানি পেতে বিনোদকে নিয়ে বসে পড়্‌ল।

পিসিমা বল্লেন, "বিনোদ, ক'দিন এখানে থাক্‌বে ? যে ক'দিন এখানে থাক্‌বে একবার করে' এসো। গরিব বলে' ঘৃণা কোর' না বাবা।" "সেকি পিসিমা,—খুড়ী পিসিকে কি কেউ ঘৃণা করে ? আপনি আমাকে পর মনে কর্‌ছেন তাই ওকথা বল্‌ছেন।" রমু বল্লে, "পিসিমা, কমলার বিয়ে কবে ?"

এমন সময় কমলা ঘর থেকে বেরিয়ে এলো। পিসিমা বল্লেন, "যা না, রমুকে আর বিনোদকে প্রণাম কর্‌। বিনোদ ঘরের ছেলে—ওকে এত লজ্জা কি ?"

কমলা দুজনকে প্রণাম করে' ঘরে চলে গেল। পিসিমা বলে' দিলেন, "ওরে, দুজনের জন্যে একটু মিষ্টি নিয়ে আয়, আর পাণ দিয়ে যা।"

"বিনোদ বল্লে, "রক্ষা কর পিসিমা,আর এখন কিছু খেতে পার্‌ব না। জ্যেঠাইমা চায়ের সঙ্গে অনেক খাইয়েছেন। খালি পাণ দিন।"

কমলা একটা ডিবে করে' পাণ দিয়ে গেল। কমলা এখন আর সেই ছোট্ট কমলা নেই, বেশ বড় হয়েছে। রং অনেক ফর্‌সা হয়েছে। বিনোদ কমলাকে দেখে মোহিত হয়েছিল। পাড়াগাঁয়ে যে এরকম সুন্দরী থাক্‌তে পারে, সে ধারণা তার ছিল না। কমলা বাপের কাছে বাঙলা লেখাপড়া শিখেছিল। মহাভারত পড়ে' পিসিমাকে রোজ শোনাতে হয়। ছোটখাট গল্পের বইও সে অনেক পড়েছে। কমলা পাণ দিয়ে ঘরের দরজার পাশ থেকে বিনোদকে দেখছিল, মাকে আস্‌তে দেখে সেখান থেকে সরে' দাঁড়াল। মা বল্লেন, "ওরে, যা দেখি চট্‌ করে' এক কলসী জল এনে দে, রান্নাঘরে জল নেই।" "আমি এখন ওখান দিয়ে জল আন্‌তে যেতে পার্‌ব না মা ! ওখানে বিনোদ বাবু বসে আছেন যে ? তুমি গোবিন্দকে বল, মা-লক্ষ্মীটি।"

রমানাথ বল্লে, "আজ আমরা উঠি পিসিমা, বিনোদকে একবার সব পাড়াটা দেখিয়ে আনি।" "আচ্ছা, তবে ওবেলা একবার দু'জনে আসিস্‌। তখন কমলার বিয়ের সব কথা হবে বুঝ্‌লি রে ?" "আচ্ছা আস্‌ব" বলে' তারা উঠে গেল।

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

আলো ও ছায়া

শ্রী প্রিয়ম্বদা দেবী বি-এ

কল্পনা পলায়ে যায়, স্বপ্ন ভরে বেদনায়,
স্মৃতি সেও অন্ধকারে হ'য়ে আসে ক্ষীণ ;
দিন তাই দীর্ঘ লাগে, দিবাকর-অনুরাগে,
ঘর যে করিতে চাই আলোকে নিলীন।

ডাক্তার কুমারী যামিনী সেন

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর)

শ্রী কামিনী রায় বি-এ

১৯১২ সনের সেপ্টেম্বর মাসে দেশে ফিরিয়া কিছুদিন কলিকাতা থাকিয়া হাজারিবাগে আমার কাছে আসিলেন। এখানে মহিলা শিল্প-সমিতির সম্পাদিকার বিশেষ আগ্রহে তিনি স্থানীয় মহিলাগণের নিকট তাঁহার ইয়োরোপ যাত্রার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেন। জাহাজে ইংরাজ নারীদের সায়াহ্ন পরিচ্ছদ (evening dress) ও নৃত্যাদি তাঁহার ভাললাগে নাই, সুরুচিসঙ্গতও মনে হয় নাই। ভারতীয় মহিলাদের মধ্যে যে অত্যধিক ইংরাজানুকরণ-স্পৃহা দেখা দিয়াছে, প্রসঙ্গক্রমে তাহারও সমালোচনা করিয়াছিলেন। আমার অনুরোধে তিনি তাঁহার পথের ও প্রবাসের একটি ধারাবাহিক বিবরণ লিখিতে স্বীকৃত হন, এবং অল্প কিছু লিখিয়াছিলেন। হয় তো বেশীও লিখিয়া থাকিবেন, কিন্তু তাঁহার কাগজপত্র সম্প্রতি যাহা পাইয়াছি তাহা অল্প এবং অসম্পূর্ণ। একটি খৃষ্টান মহিলার যে বিবরণ দিয়াছেন স্থানান্তরে তাহা উদ্ধৃত করিবার ইচ্ছা রহিল।

নবেম্বর মাসের শেষার্দ্ধে আমি তাঁহাকে ও আমার পুত্রগণকে লইয়া সুবর্ণরেখা প্রপাত বা হুড়্ ফলস্ দেখিতে গিয়াছিলাম। এই যাত্রাটি আমার স্মৃতিতে গভীর রেখা-পাত করিয়া গিয়াছে। বহুকাল পূর্ব্বে, ১৮৯০ সনের বড়-দিনের ছুটীতে যখন নর্ম্মদা-প্রপাত দেখিতে যাই, তখন যামিনীকে সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলাম। ১৯০৯ সনে স্বাস্থ্য-শোধনের জন্ম উভয়ে একত্র পুরীধামে ছিলাম। তথা হইতে একসঙ্গে ভুবনেশ্বর, উদয়গিরি, খণ্ডগিরি এবং রম্ভা হইতে চিল্কা হ্রদ দেখিতে গিয়াছিলাম। প্রাচীন তীর্থস্থান, প্রকৃতির মহান্ ও সুন্দর দৃশ্য এবং মানবের গৌরবময় শিল্প-সৃষ্টি প্রিয়জনের সহিত একসঙ্গে দেখিবার আনন্দ যে কি, তাহা জানিয়াছি। এবার মনে উৎসাহ থাকিলেও আমার দেহে পূর্ব্বের বল ছিল না; প্রপাত দেখিয়া যামিনীও তেমন বিস্ময় ও আনন্দ-প্রকাশ করেন নাই, যেমন তেইশ বৎসর পূর্ব্বে নর্ম্মদা প্রপাত দেখিয়া করিয়াছিলেন। ইহার এক কারণ, ইতিমধ্যে নেপালের পথে তিনি অনেক ভীষণ ও সুন্দর প্রপাত দেখিয়াছেন। সে যাহা হউক, ছেলেদের এই দর্শনীয় প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখাইতে পারিলাম এবং যামিনীকেও সঙ্গে পাইলাম ইহাতে বিশেষ আনন্দ অনুভব করিলাম। কিন্তু এই আনন্দ সহসা আতঙ্ক ও বিষাদে পরিণত হইল। হুড়্ হইতে ফিরিয়া আসিয়াই আমার পুত্র অশোক পীড়িত হইল। যামিনী অতি অল্পক্ষণ দেখিয়াই রোগ Appendictis বলিয়া নির্ণয় করিলেন এবং ওখানকার Civil Surgeon Major Stevensকে ডাকিতে বলিলেন। তিনিও যামিনীর সহিত একমত হইলেন। উভয়েই বলিলেন, এবারকার মত ব্যথা ভাল হইয়া গেলেই অবিলম্বে অস্ত্রপ্রয়োগ আবশ্যক। যামিনী আরও বলিলেন —দ্বিতীয়বারের আক্রমণের জন্য অপেক্ষা করিবেন না, দ্বিতীয়-বারে এ রোগের আক্রমণ বিপদজনক হয়। যামিনী এবার ইহাকে সুস্থ দেখিবার পরই কলিকাতা গেলেন, মেজর ষ্টিভেন্সও ওখান হইতে গয়া বদলী হইলেন। আমি বড়-দিনের ছুটীতে ছেলেদের লইয়া কলিকাতা আসিলাম এবং অস্ত্র করিবার জন্য কোন প্রবীণ বাঙ্গালী সার্জ্জনকে ডাকিয়া অশোককে পরীক্ষা করাইলাম। তিনি বলিলেন—আমি এপেণ্ডিসাইটিসের কোন চিহ্নই পাইতেছি না; কেন এত-বড় একটা অপারেশনের ঝুঁকি লইতেছেন?—যামিনী আমাকে একবার কথাপ্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন—"Rotunda Hospitalএ থাকিতে একবার একটি রোগিণী এই রোগ আছে কিনা পরীক্ষা করাইতে আসে। অধ্যাপক আমাকে বলিলেন—ইহাকে পরীক্ষা করুন।—আমি পরীক্ষা করিয়া

বলিলাম—হাতে তো কিছু ঠেকিতেছে না। তিনি বলিলেন,—আচ্ছা Chloroform দেওয়াইয়া দেখুন দেখি?—Chloroform করাইবার পর দেহ যখন শিথিল হইয়া পড়িল, তখন পেট টিপিয়া Appendix পাইলাম।"—এই কথা মনে থাকাতে আমি ডাক্তারকে বলিলাম—"যামিনী তো বলেছেন, কোন কোন সময়ে হাতে ধরা না পড়্‌লেও, Chloroform দেবার পর Appendictis হয়েছে কি না ধরা পড়ে।" প্রবীণ ডাক্তারটি বলিলেন—"আমি ওর প্রত্যেক স্নায়ু হাতে অনুভব কর্‌ছি (I can feel his every nerve); এখন তো কিছু নাই। যদি আবার হয় আমি এসে অস্ত্র কর্‌ব।"—বয়সে ও অভিজ্ঞতায় জ্যেষ্ঠ (Senior) বলিয়া যামিনী তাঁহার মুখের উপর কিছু বলিলেন না। আমারও দ্বিরুক্তি করিবার পথ রহিল না। কিন্তু চারি মাস পরেই অশোক অসহ্য বেদনায় আক্রান্ত হইল। যামিনীকে সংবাদ দেওয়া হইলে পূর্ব্বোক্ত প্রবীণ সার্জ্জনকে সঙ্গে লইয়া তিনি হাজারিবাগে আসিলেন বটে কিন্তু অস্ত্রপ্রয়োগের পর দেখা গেল বড় বিলম্ব হইয়া গিয়াছে (It was too late); ইতিমধ্যে ভিতর এমন পাকিয়া গিয়াছে, আর কিছু করিবার সাহস হইল না। কর্ত্তিত অংশ সেলাই পর্য্যন্ত করা হইল না, কোনরকমে ব্যাণ্ডেজ করিয়া রাখা হইল। অস্ত্রপ্রয়োগের পর দুই রাত এক দিন অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করিয়া বালক প্রাণত্যাগ করিল।

যাঁহারা নিয়তি বা বিধিলিপি বিশ্বাস করেন, তাঁহারা বলিবেন, যাহা হইবার ছিল হইয়াছে। কিন্তু যথাকালে অস্ত্রপ্রয়োগ হইলে হয়তো এ শোক-ঘটনা ঘটিত না, এই চিন্তা আমার মন হইতে আমি একেবারে দূর করিতে পারি নাই। এ বিষয়ে আরও একটি পুরুষ ডাক্তার দায়ী ছিলেন। তিনি হাজারিবাগের তদানীন্তন সিবিল সার্জ্জন। প্রথম দিনে তাঁহাকে ডাকা হয়, কিন্তু সেদিন তিনি ও আসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন সহরের বাহিরে কোন 'কেসে' গিয়াছিলেন। সারা রাত্রি বালকের অবর্ণনীয় যন্ত্রণা দেখিয়া, অগত্যা ডাবলিন মিশনের মহিলা ডাক্তার কুমারী জেলেট এম. ডি'কে ডাকিলাম। তিনি বলিলেন—অবিলম্বে অপারেশন আবশ্যক। তিনি সেখানে থাকিতে থাকিতেই সিবিল সার্জ্জন আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং রোগী দেখিয়া বলিলেন—"না, তত খারাপ নয়; দেখা যাক্ আজ কেমন থাকে; বোধ হয় অপারেশন দরকার হবে না।" ডাক্তার জেলেট তাঁহার নিজের 'কেস্' নয় বলিয়া, ডাক্তারদের রীতি (etiquette) অনুসারে চুপ করিয়া চলিয়া গেলেন। আমরা প্রথম দিনই কলিকাতায় রোগের সংবাদ দিয়া সার্জ্জন ঠিক করিয়া যামিনীকে প্রস্তুত থাকিতে টেলিগ্রাম করিয়াছিলাম, এদিন জানাইলাম, সিবিল সার্জ্জন মনে করেন operation অনাবশ্যক। একজন Sub-assistant Surgeonকে সর্ব্বক্ষণ কাছে রাখা হইল, অবস্থা বু'ঝয়া Civil Surgeonকে খবর দিবার জন্য। সন্ধ্যার পর অবস্থা আরও খারাপ হইল, Civil Surgeon খবর পাইয়াও আসিলেন না, পূর্ব্বমত ঔষধ দিতে বলিয়া পাঠাইলেন—সেদিন নাকি ক্লাবে নাচ ছিল। পরদিন প্রত্যূষে, সুদক্ষ অস্ত্রচিকিৎসককে লইয়া অবিলম্বে রওনা হইবার জন্য যামিনীকে তার করা হইল। ওখানকার শ্বেতাঙ্গ সিবিল সার্জ্জনটি অস্ত্রব্যবহারে সুদক্ষ ছিলেন না, তাঁহার বাঙ্গালী এসিষ্টাণ্টটি তখনও ফেরেন নাই, সেই জন্যই অপারেশন অনাবশ্যক বলিয়াছিলেন। তিনি আপনার অযোগ্যতা স্বীকার করিলে একদিন আগেই কলিকাতা হইতে ডাক্তার আনা যাইত, অথবা তিনি ডাক্তার কুমারী জেলেটকে সহকারিণী রূপেও পাইতে পারিতেন। অনেকেই পুরুষ ডাক্তার হইতে নারী ডাক্তারদের হীন মনে করেন। কিন্তু আমি হাজারিবাগের দুইটি নারী চিকিৎসক Miss Omeara M.D. এবং Miss Eva Jellet M.D. (ইনি প্রসিদ্ধ চিকিৎসক ও গ্রন্থকার Dr. Jelletএর নিকট-সম্পর্কিতা) এবং আমার ভগিনী যামিনীকে অনেক পুরুষ ডাক্তার হইতে চিকিৎসায় এবং কর্ত্তব্যনিষ্ঠায় শ্রেষ্ঠতর বলিয়া প্রমাণ পাইয়াছি। ইঁহাদের দায়িত্বজ্ঞান ও করুণা ইঁহাদিগকে রোগীর সম্বন্ধে কখনও উদাসীন হইতে দেয় নাই। অবান্তর কথা হইলেও নারী আমি, এই নারী চিকিৎসকত্রয়ের প্রতি শ্রদ্ধাপ্রকাশের এই সুযোগ গ্রহণ করিলাম।

যামিনী অশোকের শয্যাপার্শ্বে থাকিয়া শেষ পর্য্যন্ত তাহার পরিচর্য্যা করিয়াছিলেন। শ্রাদ্ধবাসরে যে 'অশোকস্মৃতি' পঠিত হয় তাহা তাঁহারি রচনা।

কিছুকাল স্বাধীনভাবে 'প্রাক্টিস' করিবার পর যামিনী Women's Indian Medical Service-এ চাকরী পাইয়া কলিকাতা Dufferin Hospital-এ অস্থায়ীভাবে কাজ করিতে লাগিলেন।

সমান যোগ্যতা সত্ত্বেও, এমন কি অধিকতর যোগ্যতা থাকিলেও, ইংরাজ বা ইয়ুরেশীয়ানদের সমান পদ, সমান সুখ-সুবিধা ও সম্মান ভারতীয়দের ভাগ্যে সচরাচর ঘটে না। অন্যদিকে দোষ-ত্রুটি ও অযোগ্যতা শ্বেতবর্ণের গুণে অনেক সময়েই মার্জ্জনা লাভ করে। তাই যখন ১৯১৪ সনের জুন মাসে কোন বিশেষ অপ্রীতিকর কারণে আগরার নারী হাসপাতালের তিনটি ইংরাজ নারী ডাক্তারকে বদলী করা নিতান্ত আবশ্যক হইল, শাস্তির ব্যপদেশে তাঁহাদের কেহবা সিমলা পাহাড়ে কেহবা অন্যত্র প্রেরিত হইলেন। আর সেই নিদারুণ গ্রীষ্মে যামিনীকে আগরা গিয়া তাঁহাদের স্থান পূর্ণ করিতে হইল। কিছুকাল একলাই তাঁহাকে তিনজনের কাজ সামলাইতে হইতেছিল। কিন্তু মাস ছয় পরে যখন পূর্ব্বের গোলমাল মিটিয়া গেল, ডিসেম্বর মাসের দুঃসহ শীতে যামিনী সিমলায় প্রেরিত হইলেন; পূর্ব্বোক্ত ইংরাজ কন্যারা আগরা ফিরিয়া বড়-দিনের উৎসব করিলেন।

আগরা বাসকালে দরিদ্র রোগিণীরা শতমুখে তাঁহার গুণ গাহিয়াছে এবং তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়াছে। সহযোগিনী ইংরাজ মহিলা থাকিলেও সকলে 'শাড়ীওয়ালী ডাংদারিন সাহেবকে' চাহিত! কারণ, যতই ঘৃণাকর রোগ ও কষ্টকর চিকিৎসা হউক, এই শাড়ী-পরিহিতা তাহাদের স্বদেশিনী 'ডাংদারিন'কাহাকেও ঘৃণা করিতেন না, তুচ্ছ করিতেন না, বরং রোগ যত অধিক কষ্টকর হইত দয়ায় তাঁহার হৃদয় তত অধিক আর্দ্র হইত। রাত্রে দূরে যাইতে হইলে, আগেই, কত টাকা দিবে বলিয়া দামদস্তর করা তাঁহার অভ্যাস ছিল না। উপযুক্ত ফী দিতে অক্ষম জানিলে অনেকের কাছে তিনি টাকা লইতেন না, অল্প কিছু দিলে ফিরাইয়া দিতেন, কিছু লইতে কাতরে অনুরোধ করিলে, হাসপাতালের কোন আবশ্যকীয় আসবাব ক্রয়ের জন্য তাহা লইয়া হাসপাতালের নামে জমা করিতেন। এইরূপে একটি ভাল অপারেশন টেবিল ক্রয় করা হয়।

সিমলায় আসিয়া দেখিলেন রিপন হাসপাতালের নিকট তাঁহার বাসের জন্য কোন ব্যবস্থা নাই, অথচ হাসপাতালের নিকটেই তাঁহার থাকা আবশ্যক। ঐ হাসপাতালের নীচের তালায় দুইটি কামরা বহুকাল হইতে অব্যবহৃত অবস্থায় পড়িয়াছিল. তিনি সেই দুইটাকে পরিষ্কার করিয়া নিজের বাসোপযোগী করিয়া লইলেন। প্রায় নয় মাস কাল এইভাবে কাটিবার পর, কেন ঠিক বলা যায় না, তিনি Inspector General of Hospitals এবং Civil Surgeon-এর বিষদৃষ্টিতে পড়িলেন। তাঁহার নামে এক মিথ্যা অভিযোগ উপস্থিত করা হইল, যে, তিনি বিনা অনুমতিতে হাসপাতালের অংশ বিশেষ অযথা অধিকার করিয়া হাসপাতালের ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন ও কার্য্যের ক্ষতি করিয়াছেন। ইহার উত্তরে তিনি জানাইলেন যে তাঁহার পূর্ব্ব বর্ত্তিনীর আমল হইতে হাসপাতালের ঐ অংশ অব্যবহৃত পড়িয়াছিল। সেখানে কোন কাজ হইত না বলিয়া তিনি উহা নিজের ব্যবহারে লাগাইয়াছেন। তাঁহাকে ঐ প্রকোষ্ঠ দুটি ছাড়িয়া দিতে হইলে অন্যত্র বাড়ী ভাড়া করিয়া থাকিতে হইবে। তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তিনীকে বাড়ী ভাড়া বাবত অতিরিক্ত ১০০৲ টাকা দেওয়া হইত, অতএব তাঁহাকেও অন্যত্র থাকিবার জন্য ১০০৲ টাক মঞ্জুর করা হউক, যদি তাহা না হয়, তাঁহাকে অন্যত্র বদলী করা হউক। বস্তুতঃ তিনি যে রকম হীন আবাসে আছেন তাহা Women's Indian Medical Service-এর কোন মহিলার যোগ্য নহে।—বাড়ীভাড়া বাবত ১০০৲ টাকা মঞ্জুর হইল না। তাঁহার বদলীর ব্যবস্থা করা যাইবে এই আশ্বাস দেওয়া হইল। হাসপাতালের জন্য একজন মেট্রনের নিয়োগেরও আবশ্যক তাহা যামিনী জানাইয়াছিলেন, সেজন্য মেট্রন ১০০৲ টাকা বেতনে নিযুক্ত হইল।

আসল কথা বোধ হয় এই, যে, একজন বাঙ্গালী নারী সিমলার মত বহু রাজপুরুষের বাসস্থানে, নারী হাসপাতালের অধ্যক্ষতা করেন, ইংরাজ মহলের উচ্চপদস্থ ও প্রভাব শালী কোন কোন ব্যক্তির তাহা মনঃপূত হয় নাই। যামিনীর মধ্যে বড়মানুষ খুঁজিয়া মেলা-মেশা ও প্রিয় হইবার চেষ্টা একেবারেই ছিল না; হাসপাতালের সুব্যবস্থা ও রোগীর চিকিৎসা ও তত্ত্বাবধানই তাঁহার একমাত্র কর্ত্তব্য

জানিতেন। একবার নাকি পাঞ্জাবের ছোটলাট-পত্নী লেডী ওডোয়ার হাসপাতাল পরিদর্শন করিতে আসিয়া বিশেষ সন্তোষ প্রকাশ করিবার পর, যামিনী হাসপাতালের কোন কোন অভাব জ্ঞাপন করেন ও সে সকলের সুব্যবস্থা প্রার্থনা করেন। সিমলার সিবিল সার্জ্জন মহাশয় ইহাতে বিশেষ ক্রুদ্ধ হন। তিনি মনে করিলেন তাঁহাকেই প্রথমে জানান উচিত ছিল। তাঁহাকে অতিক্রম করিয়া, এ যেন তাঁহার কার্য্যদক্ষতার বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হইল। এদিকে পাঞ্জাবী ও বাঙ্গালী মহলে যামিনীর প্রতিপত্তি ও লোকপ্রিয়তাও তাঁহার বিশেষ ভাল লাগে নাই।

যাহা হউক, যামিনী অগত্যা অন্যত্র বাড়ীভাড়া করিয়া হাসপাতালের উন্নতিসাধনে মনোযোগী হইলেন। চিকিৎসার্থীর সংখ্যার বৃদ্ধি বশতঃ ক্রমে হাসপাতালের জন্য একটা নূতন ব্লক তৈয়ার হইল।

ডাক্তারের বাসস্থানও নূতন হইল; কিন্তু সব রকমের যখন সুবিধা ও সুব্যবস্থা হইল,যখন সহরবাসীরা তাঁহার সুখ্যাতিতে মুখর, তখন শীতপ্রধান সিমলা শৈল হইতে তাঁহাকে সিন্ধুপ্রদেশের গ্রীষ্মপ্রধান শিকারপুর নামক স্থানে বদলী করা হইল এবং একজন ইংরাজ মহিলা তাঁহার স্থানে আনীত হইলেন। হাসপাতালের উন্নতি ও পরিবর্দ্ধনের প্রশংসাটা এই নবাগতাকে দিবার সুবিধা হইতেছিল, কিন্তু সমারোহ পূর্ব্বক নূতন ব্লক খুলিবার দিনে বড়লাট-পত্নীর ও সর্ব্বসাধারণের সমক্ষে তিনি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিলেন যে, এই হাসপাতালের উন্নতিকল্পে যাহা কিছু হইয়াছে তাহার জন্য পূর্ব্ববর্ত্তিনীই ধন্যবাদের পাত্রী। বড়লাট-পত্নী (Lady Chelmsford) চুপি চুপি কোন সম্ভ্রান্ত ভারতীয়াকে বলিতেছিলেন,—এতবড় হাসপাতালের পরিচালনের যোগ্যতা কিন্তু ভারতীয়াতে সম্ভব নহে। নবাগতা ডাক্তার মহিলা ও উক্ত সম্ভ্রান্ত ভারতমহিলা উভয়ের সহিতই আমার পরে আলাপ হইয়াছে, তাই এই সব সংবাদ পাইয়াছি। এই সময়ে আমি সিমলায় বাস করিতেছিলাম।

একবার যামিনীকে করাচি পাঠাইবার কথাও উঠিয়াছিল বটে, কিন্তু সেখানে ডাক্তারের বাহিরের পশার খুব বেশী, সুতরাং ইংরাজ রমণীরই সেস্থান প্রাপ্য। দিল্লীতে নারীদের জন্য যে মেডিকেল কলেজ খোলা হইল কলিকাতা ডাফরিণ হসপিটালের ভূতপূর্ব্ব নেত্রী তাহার অধ্যক্ষ হইয়া আসিলেন; শিক্ষাদাত্রী (Lecturer) রূপেও যামিনীর সেখানে স্থান হইল না।

শিকারপুরের ভীষণ গরম যখন অসহ্য হইল এবং শরীরে অনেক ফোড়া হইয়া কষ্ট পাইতে লাগিলেন, তখন একবার ছুটী লইলেন এবং সেণ্ট্রাল কমিটিতে লিখিয়া পাঠাইলেন যে, তাঁহাকে আর ছয় মাসের মধ্যে বদলী না করিলে তিনি চাকরী ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইবেন। তখন তাঁহাকে গয়া পাঠাইবার প্রস্তাব হইল। ইতিপূর্ব্বে গয়ার লেডী ডাক্তার ছুটীর জন্য আবেদন করিয়াছিলেন। কিন্তু ডাক্তার সেন তাঁহার স্থানে আসিতেছেন শুনিয়া তিনি তাড়াতাড়ি ছুটীর আবেদন প্রত্যাহার করিলেন। এই বঙ্গনারীর চিকিৎসানৈপুণ্য, অভিজ্ঞতা ও জনপ্রিয়তার কথা অনেকেই শুনিয়াছিলেন।

অতঃপর তিনি বেহার প্রদেশে বেতিয়ার হাসপাতালে প্রেরিত হইলেন। এখানে তিনি আরামেই ছিলেন, কিন্তু এখানে কাজ বেশী না থাকাতে কিছু চঞ্চল হইয়া উঠিলেন।

পূর্ব্বেই বলাহইয়াছে যে যামিনী নিয়মিতরূপে তাঁহার দৈনিক চিন্তা বা কার্য্যাবলী লিপিবদ্ধ করিতেন না। এ বিষয়ে তাঁহার অবসরও বড় একটা মিলিত না। কিন্তু দেখিতেছি, শিকারপুর থাকিতে অনেক দিস্তা কাগজের একখানি প্রকাণ্ড খাতা করিয়া তাহাতে দৈনিক মন্তব্য লিখিবার উদ্যোগ করিয়াছিলেন। খাতাখানির প্রথম পৃষ্ঠায় সর্ব্বোপরি লিখিত—**কেহ খুলিবেন না।** তাহার নীচে নিজের নাম এবং তাহারও নিম্নে Teach me to live শীর্ষক একটি ইংরাজী কবিতা উদ্ধৃত।

Teach me to live! 'T is far easier to die,
Gently and Silently pass away
On earth's long might, to close the heavy eye
And waken in the glorious realms of day,

Teach me the harder lesson—how to live,
To serve Thee in the darkest paths of life,

Arm me for conflict new, fresh vigour give
And make more than conqueror in the strife.

Teach me to live, Thy purpose to fulfil,
Bright for Thy glory let my taper shine,
Each day renew, remould this stubborn will,
Closer round Thee my heart's affections twine,

Teach me to live and find my life in Thee
Looking from earth and earthly thing away,
Let me not falter, but untiringly
Press on and gain new strength and power
each day.

এই কবিতাটির মধ্যে তাঁহার অন্তরের নিভৃততম প্রার্থনার প্রতিধ্বনি ছিল, সেই জন্যই ইহাকে খাতার উপরে স্থান দিয়াছিলেন।

শিকারপুরে দুই দিন এবং বৎসরকাল পরে বেতিয়ায় মাত্র একদিন ইহাতে লিখিয়াছেন। কি উদ্দেশ্যে লিখিতে আরম্ভ করেন তাহাও জানাইয়াছেন। ইহার ভিতর দিয়া তাঁহার অন্তরের আর একটু ঘনিষ্ঠতর পরিচয় পাওয়া যাইবে। তিনি ভগবানের চরণে আত্মনিবেদন করিয়া তাঁহার অভিপ্রেত কর্ম্ম করিবার জন্য কেমন উন্মুখ হইয়া থাকিতেন, স্বদেশের অশিক্ষিতা রোগপীড়িতা নারীদের জন্য তাঁহার কত মমতা, কত দরদ ছিল, তাহাদের জন্য খাটিয়া কত আনন্দ পাইতেন, তাহাদের জন্য স্থানবিশেষে আরব্ধ কর্ম্মের পূর্ণফল দেখিবার সুযোগ না পাইয়া কিরূপ মর্ম্মাহত হইয়াছিলেন, সে সকলের আভাস ইহার ভিতরে আছে, তাই ইহা সমগ্র উদ্ধৃত করিতেছি। ইহা সাহিত্য হিসাবে দেখিবার নয়, সে ভাবে লেখাও হয় নাই। ইহা অপরের দৃষ্টিপথে পড়িবে তাহা তিনি ক্ষণেকের জন্যও মনে করেন নাই। তাই গোপনীয় না হইলেও ইহা উদ্ধৃত করিতে আমার মন এবং হস্ত একটু সঙ্কুচিত হইতেছে। কিন্তু তাঁহাকে পরিচিত করিবার জন্যই এই অপূর্ণ বিবরণ লিখিতে আরম্ভ করিয়াছি, যদি এতৎসম্পর্কে আমার অপরাধ ঘটে একান্ত অন্তরে তাঁহার ক্ষমা ভিক্ষা করি।

শিকারপুর থাকাই কর্ত্তব্য, কি না থাকা, এই সমস্যার সমাধান করিবার জন্যই তিনি স্থির করিয়াছিলেন প্রতিদিন থাকার স্বপক্ষে ও বিপক্ষে যত যুক্তি মনে উদয় হইবে সমস্ত লিপিবদ্ধ করিয়া অবশেষে গুণিয়া দেখিবেন কোন্ পক্ষে যুক্তি অধিকতর হইল এবং সেই অধিকতর যুক্তির অনুযায়ী কাজ করিবেন।

যামিনীর যে লেখাটি উদ্ধৃত হইতেছে তাহাতে হাসপাতালের উন্নতির উল্লেখ আছে। যামিনী ১৯১৬ সনের মে মাসে শিকারপুর বদলী হন। ঐ বৎসর জুলাই মাসে সেন্ট্রাল কমিটীর সেক্রেটারী শিকারপুরের কলেক্টর ও স্থানীয় কমিটীর প্রেসিডেণ্টকে যে চিঠি লিখিয়াছিলেন তাহার অনুবাদ নিম্নে দেওয়া গেল :

"সিমলা, ১০ই জুলাই, ১৯১৬

সেন্ট্রাল কমিটী শুনিয়া অতীব সুখী হইয়াছেন যে ডাক্তার সেনের তত্ত্বাবধানে চিকিৎসার্থীর সংখ্যা এত অধিক বাড়িয়া গিয়াছে যে স্থানীয় কমিটী বর্ত্তমান হাসপাতালকে পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত করিবার অথবা সম্পূর্ণ নূতন একটি হাসপাতাল নির্ম্মাণ করিবার প্রস্তাব উপস্থিত করিয়াছেন। আপনাদের কমিটী যখন ডাক্তার সেনের কার্য্যে এত সন্তুষ্ট তখন হয়তো তাঁহাকে বলিয়া কহিয়া ওখানে থাকিয়া যাইতে সম্মত করিতে পারিবেন। আপনারা তাঁহাকে রাখিতে চাহিলে সেন্ট্রাল কমিটী কোন আপত্তি করিবেন না।

যামিনীর স্মৃতিলিপি হইতে উদ্ধৃত :

৬ই ফেব্রুয়ারী, ১৯১৭। শিকারপুর।

এবার বাড়ী হইতে ফিরিয়া আসিবার সময় ঠিক করিয়া আসিয়াছিলাম যে মার্চ্চ মাসে কাজ ছাড়িয়া দিব। কাজ ছাড়িবার ইচ্ছা এত বলবতী ছিল যে আমার প্রয়োজনীয় অনেক instrument ও কাপড় ইত্যাদিও বাড়ীতে ফেলিয়া আসি। বাড়ী হইতে ফিরিয়া আসিবার পরে কাজকর্ম্ম এত ভাল চলিতে লাগিল এবং গ্রীষ্মও না থাকাতে একটু একটু করিয়া এ জায়গা ছাড়িবার ইচ্ছা আমার চলিয়া যাইতে লাগিল। এখানকার হাসপাতাল অনেকদিন হইল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে কিন্তু এই নয় মাসে যত কাজ হইয়াছে এত কাজ কখনও হয় নাই। হাসপাতাল আশ্চর্য্য রকম popular হইয়াছে। গত মাসে paying patientদের নিকট হইতে ৯৩৲ টাকা পাওয়া গিয়াছে। দিন ২৲ টাকা ভাড়া দিয়াও ভদ্রলোকের বাড়ীর

স্ত্রীলোকেরা ঘর ভাড়া লইতেছে। ১৯১৫ সালে indoor patientদের সংখ্যা ছিল ২১৩, ১৯১৬ সালে ৪৭৮। সর্ব্বাপেক্ষা আশ্চর্য্য উন্নতি হইয়াছে maternity case সম্বন্ধে। ৫৩ জন রোগী ১৯১৫ সালে এখানে প্রসব হইতে আসে, কিন্তু ১৯১৬ সালে ৯৬ জন।

এখানে প্রসবের পর অধিকাংশ স্ত্রীলোকই septic হয়। মৃত্যু-সংখ্যাও খুব বেশী। আমি এই অল্পদিনের মধ্যেই ইহাদিগকে মৃত্যুর কারণ বুঝাইতে সক্ষম হইয়াছি। শিকারপুরের রমণীদের জন্য এই নয় মাস আমি যেমন খাটিয়াছি তাহার পুরস্কার স্বরূপ তাহাদের বিশ্বাসভাজনও হইয়াছি। আরও কিছুদিন থাকিলে হয়তো ইহাদের আরও কিছু উপকার করিতে পারিব, এই বিশ্বাসে আমার থাকা প্রার্থনীয় একথা কখন কখন মনে হয়। এখানে থাকার দিক হইতে আরও এক কথা বলা যায়।—যেখানেই যাই না কেন, ইংরাজ থাকিবেই, এবং যেখানে ইংরাজ সেইখানেই অবিচার ও অন্যায় influence। শিকারপুরে ইংরাজ নাই সেটা একটা খুব বড় সুবিধা। এই তো গেল এখানে থাকার পক্ষে। সিমলার কথা মনে হইলেই bitterness আসে। থাকার বিপক্ষেও অনেক কথা বলা যায়—

(১) বাঙ্গলা দেশ হইতে এ জায়গা এত দূরে।

(২) ভাষা না জানাতে, যতটা কাজ করা উচিত (অর্থাৎ সভা ইত্যাদি করিয়া) তাহা হইয়া উঠে না। তর্জ্জমা ইত্যাদি করাইতে অনেকটা সময় বৃথা নষ্ট হয়। হয়তো অন্য জায়গায় ইহা অপেক্ষা বেশী কাজ হইত।

(৩) হাসপাতালটাকে আমি এত popular করিয়া দিয়াছি যে, আমি চলিয়া যাইবার পরেও লোকে হাসপাতালে আসিবে। সুতরাং আমার কাজ বিফল হইবে না।

(৪) হাসপাতাল ছোট থাকার দরুণ, আমি যাহা করিয়াছি ইহার চেয়ে বেশী কাজ আর আপাততঃ করিতে পারিব না। নূতন হাসপাতাল তৈয়ার হইতে অন্ততঃ এক বৎসর দেড় বৎসর লাগিবে।

(৫) গ্রীষ্মের সময়কার অসহ্য গ্রীষ্মে আমার শরীর টিকিবে কি না?

(৬) চাকর-বাকরের কষ্ট অসহনীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

আমি নিজের মন গত পাঁচ মাসে তো ঠিক করিতে পারিলাম না, কিন্তু এই এক মাসের মধ্যে ঠিক করাই চাই, সেই জন্য মনে মনে সংকল্প করিয়াছি যে এই এক মাস প্রতিদিনের ঘটনা লিপিবদ্ধ করিয়া দিনের শেষে সেদিনকার মত এ স্থানে থাকা অথবা পরিত্যাগ করা ইহার মধ্যে যাহা উচিত মনে হইবে সেটা লিখিয়া রাখিব এবং পরে কতটা থাকার পক্ষে ও কতটা বিপক্ষে তাহা গণনা দ্বারা যাহার সংখ্যা বেশী হইবে সেই অনুসারেই কাজ করিব। যে সকল কারণ উল্লেখ করিয়াছি তাহা ছাড়া আরও দুইটি কারণ আমাকে influenee করিতেছে। একটা, মৌলবী সাহেবের অনুরোধ, লক্ষ্ণৌ গিয়া তাঁহার স্কুলের সাহায্য করা, দ্বিতীয়, ডাক্তার বসুর lecture যে আমি জীবনের যতটা উচিত ততটা সদ্ব্যবহার করিতেছি না। তিনি লিখিয়াছেন :—

You can do a lot of good if you want. You always keep yourself in the background. But India wants workers, specially women. If ladies like yourself come forward, we shall soon have things different from what it is at present. If you do not mind, I may tell you that you have no right to waste the gifts that have been given to you. Every one's gifts are public property to be utilised for the good of the public and the needy.

আমি তো জীবনের সদ্ব্যবহারই করিতে চাই, কিন্তু কি করিলে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ব্যবহার হইবে সেইটাই বুঝিতে পারিতেছি না।

আমিও চাই—To feel myself directed pardoned and sustained by the Supreme Power, to feel myself in the right road, at the point where God would have me be in order with himself and the universe. This faith gives

strength and calm. I have not got it. All that is, seems to me arbitrary and fortuitous. It may as well be as not be. Nothing in my own circumstances seems to be providential. All appears to me left to my own responsibility and it is this thought that disgusts me with the government of my own life.

Amiel's Journal.

কোন্ পথ পরমেশ্বরের অভিপ্রেত পথ তাহাই ঠিক করিতে পারিতেছি না।

প্রভো, তোমার অঙ্গুলি নির্দ্দেশে আমাকে পথ দেখাইয়া দাও। প্রতিদিনই পথের উদ্দেশে তোমার কাছে কাতর প্রার্থনা করিতেছি, আমার প্রার্থনা পূর্ণ কর।

আজ শিকারপুর ছাড়িবার দিকেই মনটা বেশী ঝুঁকিতেছে।

৭ই ফেব্রুয়ারী। কাল রাত্রে এই খাতাতে মনের ভাব লিপিবদ্ধ করিতে প্রায় সাড়ে দশটা বাজিয়া যায়। আমি ৯৷৷-টায় লিখিতে বসি।

ঘুম ভাল হয় নাই; ঘুমের ভিতরেও বোধহয় এখানে থাকা উচিত কি উচিত নয়, এই কথা মনের মধ্যে তোলপাড় করিয়াছে, কেন না, সকালে ঘুম ভাঙ্গিবা মাত্রই মনে হইল যেন শিকারপুর ছাড়িবার সব বন্দোবস্ত হইয়া গিয়াছে। এই-রূপ মন লইয়াই হাসপাতালে যাই। হাসপাতাল হইতে একটার পর ফিরি। ২ টার সময় Mr. Moyseyর চিঠি পাইলাম। তাহাতে হাসপাতালের জন্য তিনি চেষ্টিত আছেন শুনিয়া একটু ভাল লাগিল। শিকারপুরের স্ত্রীলোকদের জন্য দুঃখ হয়। আমি জানি যে আমি এখান হইতে চলিয়া গেলে কেহই আমার মত ইহাদের জন্য feel করিবে না। আমার স্বভাব একটু অনন্যসাধারণ, অন্য লোকেরা নানারকমে জীবন enjoy করে, আমার কিন্তু কাজের কথা ছাড়া আর কিছুতেই প্রবৃত্তি নাই। সেই-জন্যই আমি সফলকাম হই।

আজ সকালে সিমলার কথা খুব মনে হইতেছিল। এক বৎসর চারিমাস ক্রমাগত কেমন করিয়া হাসপাতালের উন্নতি করিব এই চিন্তা এই চেষ্টা ছাড়া আর কিছু করি নাই, ফলে হাসপাতালকেও popular করিলাম। কিন্তু তাহার ফল কি হইল ?

পরবর্ত্তী প্রায় এক বৎসর পরের লেখা—

১৫ই ফেব্রুয়ারী, ১৯১৮, বেতিয়া।

একটি বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। আমায় আর বদলী সম্বন্ধে কিছুই করিতে হয় নাই! ২৮শে ফেব্রুয়ারী Dr. Balfour শিকারপুরে আসেন। তিনি আপনা হইতেই বেতিয়া বদলী হইবার সংবাদ দিলেন। এখানে বদলী হওয়াটা পরমেশ্বরেরই অভিপ্রেত ছিল। পথে মৌলবী সাহেবের মৃত্যুসংবাদ পাইলাম। আসিবার অর্থাৎ শিকার-পুর ছাড়িবার পূর্ব্বরাত্রে তাঁহার নিকট হইতে টেলিগ্রাম পাইয়াছিলাম। তাঁহাকে টেলিগ্রাম করিয়া রওনা হইতে বলিয়াছিলেন। লাহোরেই তাঁহার মৃত্যুসংবাদ পাইলাম। ১৯১৯ সালের ফেব্রুয়ারীতে কাজ ছাড়িয়া দিয়া তাঁহার স্কুলের কাজে লাগিব এই কথা ছিল। কিন্তু তিনি তো ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন, এখন যাঁহাদের হাতে স্কুল আছে তাঁহারা কিছু না বলিলে আমি কি করিব ? কাহার উপর স্কুলের ভার তাহাও জানি না। সেখানে যাওয়া কি পরমেশ্বরের অভিপ্রেত নহে ? এক বৎসর এখনও বাকী আছে, দেখি কি হয়। U. P. তে বদলী হইবারও তো চেষ্টা করিয়াছি, কিছুই তো হইল না।

এখানে তো তেমন কিছু কাজ করিতে পারিতেছি না। বৃথাই সময় নষ্ট হইতেছে।

Those also serve who stand and wait. আমি ও কি হুকুমের জন্য অপেক্ষা করিতেছি ? এখানে তেমন কিছু কাজ যে হইবে তাহাও মনে হয় না।

বেতিয়াতে বাসস্থানের, আরামের এবং বিশ্রামের সর্ব্ব-প্রকার সুব্যবস্থা ছিল। যাহা সাধারণের বিশেষ বাঞ্ছনীয় তাহাই একটা অশান্তির কারণ হইয়া উঠিল।

উদ্ধৃতাংশে 'মৌলবী সাহেবের' উল্লেখ আছে। ইনি ছিলেন একজন নারীহিতৈষী সম্ভ্রান্ত মুসলমান। ইঁহার পুরা নাম সৈয়দ কেরামত হোসেন। যখন ভগিনী প্রেমকুসুম বি-এ পরীক্ষা পাশ করিয়া এলাহাবাদে Cross Thwaite Girls' Schoolএর প্রধান শিক্ষয়িত্রীর পদ গ্রহণ করেন, এই প্রবীন মৌলবী সাহেব তখন ঐ স্কুলের সম্পাদক ছিলেন। এবং বোধ হয় সেইখানেই একবার নেপাল যাইবার পথে যামিনীর সহিত তাঁহার প্রথম আলাপ-পরিচয় হয়। ইনি পূর্ব্বে ব্যারিষ্টার ছিলেন পরে হাইকোর্টের জজ হন।

একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ ডাক্তারকে মৌলবী সাহেব তাঁহার নারীবিদ্যালয়ের সাহায্যের জন্য Women's Indian Medical Serviceএর চাকরী ছাড়িয়া আসিতে আহ্বান করিয়াছিলেন এবং আহূত ব্যক্তিও যাইতে প্রস্তুত ছিলেন, স্মৃতি-লিপিতে ইহা পাঠ করিয়া প্রথমতঃ আমার একটু বিস্ময় উপস্থিত হইয়াছিল। কিন্তু একটু চিন্তা করিয়া এই রহস্য উদ্ভেদ করিতে পারিলাম। স্বদেশের নারীজাতির কল্যাণার্থ নিবেদিত এই জীবন চিরদিনই জীবন-দেবতার অঙ্গুলি-সঙ্কেতের প্রতীক্ষায় থাকিত। কোন্ পথে, কি ভাবে তাহার শিক্ষা, শক্তি ও সামর্থ্য সার্থক হইবে সে সকল নির্ণয়ের ভার এবারেও তাহার অবিচারপীড়িত ক্ষুব্ধ ব্যথিত চিত্ত নিজের উপর রাখিতে চাহে নাই। বিশেষতঃ নারী-বিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধান ও অধ্যাপনাদির সহিত চিকিৎসা কার্য্যের স্বভাবতঃ কোন বিরোধ নাই, কেবল অর্থাগমের সম্ভাবনাই ছিল কম।

(ক্রমশঃ)

সন্ধ্যামালতী

শ্রী রাধাচরণ চক্রবর্ত্তী

পূরবী বায় লাগ্‌ল দোলা
ভোরের বেলা,—
শিউলী-বনে অম্‌নি সুরু
ভোরের খেলা।
শিশির-ধোয়া বোঁটার গায়ে
ফুট্‌ল কলি ডাইনে-বাঁয়ে,
ফুট্‌ল না সে—দেখ্‌ল নাক'
ভোরের মেলা!
শিউলী-বনে সাঙ্গ হ'ল
ভোরের খেলা।

দুপুর বেলা বস্‌ল সভা
কুঞ্জবনে,
শতেক মধুপ আস্‌ল ছুটে'
গুঞ্জরণে।
সভা ত' নয়—শোভার নগর।
অপ্‌রাজিতা, জবা, টগর
রাশি রাশি উঠ্‌ল হাসি'
মুঞ্জরণে!
দুপুর বেলায় ফুট্‌ল না সে
কুঞ্জবনে।

বিকেল বেলা নিমীল-রোদের
রঙীন ছায়ায়
গোধূলিকা গাহন করে
গহীন মায়ায়!
রঙের লিখায় আকাশ ঘিরা—
দোপাটি আর করবীরা
দলে দলে জুড়্‌ল সবাই
রঙ-রাগিণী;
ফুট্‌ল না সে—মেল্‌ল না চোখ
অভাগিনী।

সন্ধ্যারাণী তিমির বেণী
খুল্‌ছে যখন,
বনে বনে শিথিল কুসুম
ঢুল্‌ছে তখন।
ভাঙল না ঘুম হায় রে ওর আর!—
সময় তখন ঘুমিয়ে পড়ার,
শিহরিলাম,—সহসা মোর
বন্‌-বিরলে
ফুটিল সে মৌন সাঁঝের
গগন-তলে।

নয়ন আমার অশ্রুজলে
ব্যথায় ছাপে,—
বর্ণ অমন অন্ধকারে
বৃথায় যাবে?
এমন মৃদু গন্ধে কি রে
ফুল্‌-পিয়াসী চাইবে ফিরে'?
কে এসে এই গোপন মধু
অসময়ের
বুঝ্‌তে চাবে, খুঁজ্‌তে যাবে
ফুল্‌-হৃদয়ের?

"ভুল হৃদয়ের,"—কয় সে চুপি
আমার কানে,
"ভাব্‌না অমূল। মোর আরতি
ভূমার পানে:—
রূপ্‌-লালসার চাইনি বিলাস,
মধুপ-মাতন নয় অভিলাষ;
অন্ধকারের দূর অভিসার
আমার ধ্যানে···
রসময়ের প্রকাশ হবে
আমার প্রাণে!"

রাশিয়ায় নারী-জাগরণ

শ্রী শ্রীশচন্দ্র গোস্বামী বি-এল্

প্রাচ্য দেশসমূহের সর্ব্বত্রই নারীর স্বাতন্ত্র্য স্বীকার করিতে পুরুষেরা অনিচ্ছুক—"ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যমর্হতি" এই বুলি ভারতে, তুরস্কে ও রাশিয়াতে সর্ব্বত্রই এখনও শুনিতে পাওয়া যায়। রাশিয়াতে ও তুরস্কে দেশের শাসক সম্প্রদায় আইন ও জনমতের সাহায্যে নারীকে অতি অল্পকালের মধ্যেই প্রভূত পরিমাণে মুক্ত করিয়াছেন; কিন্তু "ভারত কেবল ঘুমায়ে রয়।"

পাঁচ-সনা প্রস্তাব (five-year plan) রাশিয়ার জীবনযাত্রা-পদ্ধতির আমূল পরিবর্ত্তন সাধন করিয়াছে। কৃষি ও শিল্পে গত তিন বৎসর প্রস্তাবানুযায়ী কাজের ফলেই উৎপন্ন দ্রব্যের পরিমাণ ১০ গুণেরও অধিক বাড়িয়াছে। পূর্ব্বে নারীরা কৃষিক্ষেত্রে সকাল হইতে সন্ধ্যা হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করিতেন কিন্তু তাহাতে আশানুরূপ ফসল হইত না। পাঁচ-সনা প্রস্তাবের ফলে নারীরা বৈজ্ঞানিক শিক্ষা-লাভের সুযোগ পাইতেছেন।

রাশিয়াতে পূর্ব্বে আমাদের দেশেরই মত খণ্ড খণ্ড জমিতে চাষ হইত, এখন জমির একত্রীকরণের (collective farming) ফলে চাষের সুবিধা হইয়াছে। Turkmenia, Mery ও Bairam Ali প্রদেশে মেয়েরা কলের লাঙ্গল চালাইতেছেন। ইহাতে মেয়েদের কার্য্যকারিতা ও আর্থিক সঙ্গতি বৃদ্ধি পাইয়াছে,—পুরুষেরা আর তাহাদিগকে পূর্ব্বের ন্যায় ভারস্বরূপ মনে করেন না। "At first the peasants treated them with mistrust and disdain, but sometime after having seen them with their own eyes that these women knew their work they have been filled with genuine respect for them."

আমাদের দেশেও যেদিন নারীরা বৈজ্ঞানিক জ্ঞান লাভ করিবেন, পুরুষের অপেক্ষা দৈহিক বলে কম বলীয়ান হইলেও তাঁহারা কৃষিক্ষেত্রে সেদিন প্রতিযোগিতা করিতে পারিবেন।

প্রাচ্যের সর্ব্বত্রই গৃহশিল্পে নারী পুরুষের সহায়তা করেন। আমাদের এই বাঙ্গালা দেশেও অধিকাংশ গৃহ-শিল্পে যথা বস্ত্রবয়ন, শাঁখা তৈরী করণ অথবা বাসনের নির্ম্মাণ কার্য্যে মেয়েরা অল্প-বিস্তর পুরুষের সাহায্য করেন। রাশিয়াতে মেয়েরা ফেল্ট টুপী (felt cloaks), কার্পেট ও বস্ত্রবয়ন বহুদিবস যাবৎ করিয়া আসিতেছেন। রাশিয়ার নারীদের নির্ম্মিত Pendin ও Tekin কার্পেটের কারুকার্য্য অতিশয় সূক্ষ্ম ও সুন্দর। Soviet সরকার এই স্বাভাবিক কর্ম্মপটুতা শিক্ষার সাহায্যে আরো বর্দ্ধিত করিয়াছেন। মেয়েরা স্কুলে ও ফ্যাক্টরীতে হাতে কলমে গৃহশিল্প শিক্ষা করিবার সুযোগ এখন পাইয়া থাকেন। Soviet Year Book হইতে নিম্নোদ্ধৃত সংখ্যাগুলি এই কথার প্রমাণ দিবে। "According to the approximate calculation, there are now over 3500 women working in factories in Middle Asia, 2000 in Azerbaidjan, 1000 in Kazakstan, 3200 in Tartar Republic and so forth."

বাঙ্গালা দেশে মেয়েদের গৃহশিল্প শিক্ষার সুযোগ "সরোজ-নলিনী স্মৃতি-সমিতি" অথবা "নারীশিক্ষা সমিতি" ভিন্ন অন্য কোথাও আছে কিনা আমার জানা নাই। সরকারী শিল্প বিভাগের অধীনে শ্রীরামপুর বয়ন বিদ্যালয়ে মেয়েদের বয়ন শিক্ষার ব্যবস্থা হইয়াছে শুনিয়াছি। এ বিষয়ে সরকার ও জনসাধারণের বিশেষ চেষ্টা আবশ্যক।

রাশিয়াতে নারীদিগের হস্তপ্রস্তুত দ্রব্যসমূহের বাজারে যাহাতে কাটতি হয় সেজন্য সমবায়-প্রণালীতে পরিচালিত দোকানও খোলা হইয়াছে। কেবল Turkmenia ও Azerbaidjanএই ১৭০০০ ও ৬০০০ নারী, সমবায়-সমিতির সভ্যা হইয়াছেন। বাঙ্গালায় দুই একটি মাত্র নারী-সমবায়

দোকান টালা ও কলিকাতায় আছে। কৃষি ও শিল্পের সাহায্যে নারীর কার্য্যকারিতা ও আয় বাড়িয়া যাওয়াতে আর নারীকে তাচ্ছিল্য করিতে পুরুষ সাহসী হয় না। কবে বাঙ্গালায় মেয়েরা মিথ্যা মর্য্যাদার অভিমান ত্যাগ করিবেন ?

আর্থিক স্বচ্ছলতা লাভ করিবার সঙ্গে সঙ্গেই রাষ্ট্রীয় অধিকার লাভের জন্য নারীসমাজের আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হইয়াছে। পূর্ব্বে দেশের শাসনকার্য্যে মেয়েদের কোন কর্ত্তৃত্বই ছিল না। বর্ত্তমানে বহু নারী গ্রাম্য পঞ্চায়েতের প্রধান কর্ম্মকর্ত্রী হইয়াছেন। Village Soviets বা গ্রাম্য পঞ্চায়েৎ গ্রামের যাবতীয় কর্ত্তৃত্ব পরিচালনা করেন। বর্ত্তমানে Bashkiriaতে ১:৪ জন, Uzbekistanএ ৩১৯ জন, Kazakstanএ ২১৩ জন, Tartar Republicএ ৮৪ জন এবং Daghestanএ ২০ জন মহিলা পঞ্চায়েৎকর্ত্রী (Presidents) আছেন এবং সমস্ত দেশে ১৫৮০ মহিলা এই দায়িত্বপূর্ণ কার্য্য যোগ্যতার সহিত পরিচালনা করিতেছেন। শুধু গ্রামে নহে, কেন্দ্রীয় শাসন-পরিষদেও একটি নারী সহঃসভানেত্রীর পদ অলঙ্কৃত করিতেছেন। Kazakstanএ একটি মহিলা Supreme Court of Justice—হাইকোর্টের বিচারপতি হইয়াছেন। এইরূপ আরো শত শত উদাহরণ উদ্ধৃত করা যাইতে পারে। গত নির্ব্বাচন ব্যাপারে নারীদের উৎসাহ পুরুষকেও অতিক্রম করিয়াছে—"In the last election campaigns the participation of women in the Soviets' election even surpassed the activity of the male part of the population".

রাশিয়ায় সমাজিক পাপের অন্ত ছিল না। পর্দ্দা, বাল্য-বিবাহ, বহুবিবাহের ফলে লক্ষ লক্ষ নারীর জীবন দিনের পর দিন পিষ্ট হইতেছিল। ভূতের মত কালো বোরখা পরিয়া মেয়েরা রাস্তাঘাটে বেড়াইতেন, কোন কোন প্রদেশে পর্দ্দার অত্যাচার বড় বেশী ছিল। "In Bokhara, the former sacred city of Moslem scolasticism, where still 6 years ago, it was impossible to see one woman with her face unveiled." বোখারা প্রদেশে কোন নারীই পর্দ্দার বাহিরে আসিতেন না।

গৃহপালিত জন্তুর ন্যায় বিবাহের বাজারে মেয়েরা বেশী মূল্যে বিক্রীত হইতেন। পূর্ব্ব-প্রদেশগুলিতে চাষের জন্য মজুর বেশী দরকার, কাজেই গৃহস্বামী বহু বিবাহ করিয়া একাধিক নারীর সাহায্যে চাষবাস চালাইতেন। বালিকাদের ৮ হইতে ১২ বৎসর বয়সের মধ্যেই বিবাহ হইয়া যাইত। "The parents tried so sell their daughters earlier and more profitably. Girls were married to middle-aged or even to old men owing to the temptation of a big *Kalym*". এইরূপে বাল্যবিবাহ, অসমবয়স্ক নরনারীর বিবাহ ও সাহচর্য্যে মাতৃমৃত্যু ও শিশুমৃত্যুর অন্ত ছিল না এবং উপদংশ প্রভৃতি কুৎসিৎ ব্যাধিও নারীকে ভোগ করিতে হইত।

Soviet শাসনকর্ত্তাগণ প্রথমেই অবরোধপ্রথার মূলে কুঠারাঘাত করিলেন—মোল্লা ও প্রাচীনপন্থী পুরোহিতের দল হাঁ হাঁ করিয়া উঠিলেন। নূতন আইন করিয়া বাল্য-বিবাহ, বহুবিবাহ ও কন্যাবিক্রয় প্রথা রহিত করা হইল। গত ৪।৫ বৎসর ঐ আইন-ভঙ্গকারীদিগকে কঠোর দণ্ড-বিধান করা হইল। প্রথম দিনকতক প্রাচীনপন্থীরা গোল করিলেন পরে সব শান্ত হইল। "জাতি গেল," "ধর্ম্ম গেল", "সতীত্ব গেল" রব দুই দিনেই স্তব্ধ হইয়া গেল। "In all the bazars and mosques, the mullas and the kulaks shouted at the top of their voices about the "immorality and the godlessness of the Bolsheviks", about the Soviet Govt. destroying the family propagating debauch and so forth".

কত স্বামীর দণ্ড হইল, বহু নারীবিক্রেতার কারাবাস হইল,পাদরী ও পুরোহিত দণ্ডিত হইল,আর সেই নির্য্যাতনের মধ্য দিয়া প্রচার ও আইনের সাহায্যে নরনারীর সমান অধিকার স্থাপিত হইল—নারীও যে আলো ও বাতাসের এবং স্বাধীন জীবনের উপযুক্ত অধিকারী এই মহাসত্য প্রতিষ্ঠিত হইল। কি করিয়া রাশিয়ার নারী অতি অল্পকালের

মধ্যে এই বিপুল যোগ্যতা লাভ করিলেন তাহার মূল রাশিয়ার জনশিক্ষা-পদ্ধতির মধ্যে অনুসন্ধান করিতে হইবে। কেবল স্কুল কলেজ প্রতিষ্ঠার দ্বারা রাশিয়ার নিরক্ষরতা দূরীভূত হয় নাই। এজন্য দেশময় মহিলাসমিতি বা ক্লাব স্থাপিত হইয়াছে। এই সকল ক্লাবে আলোকচিত্র সাহায্যে অথবা বক্তৃতার মধ্য দিয়া সহজ ও সরল উপায়ে কৃষি, শিল্প, স্বাস্থ্য ও নীতি বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হয়। এইখানে সঙ্গীত-শিক্ষার ব্যবস্থাও আছে এবং শিশুরাও যাহাতে মায়ের নিকটে যত্নে থাকিতে পারে তাহার জন্য শিশুরক্ষণাগার (Creches for children) এই সকল ক্লাবের নিকটে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। প্রায় ৬৫০০০ হাজার নারী এই সকল clubs and cornersএ সহর ও মফঃস্বলে উপযুক্ত শিক্ষা পাইয়া দেশের ও দশের কাজের যোগ্য হইয়া উঠিতেছেন।

Nomads বা সর্ব্বদা ভ্রাম্যমান্ পর্ব্বতে পর্ব্বতে সঞ্চরণশীল নরনারীর জন্য লাল তাঁবু ও প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করিয়া শিক্ষা সহজ ও সুলভ করা হইয়াছে। পর্ব্বতপার্শ্বে যখন কসাক (Cossacks) নরনারীরা মেষপাল সহ বিশ্রাম করে তখন ভ্রাম্যমান্ প্রদর্শনী তাহাদের সম্মুখে খোলা হয়। এই প্রদর্শনী মোটর লরী ও গোযানে বহন করা হয়। লাল তাঁবু বা Red yourtaতে পাঠাগার ও চিকিৎসালয় আছে। একজন শিক্ষক, একজন আইনজ্ঞ ও একজন ধাত্রী এবং চিকিৎসক ঐ সকল তাঁবুতে মোতায়েন থাকিয়া পার্ব্বত্য জাতিদিগকে শিক্ষা দেন, চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন এবং প্রয়োজন হইলে বিচারক মামলা-মোকদ্দমাও নিষ্পত্তি করিয়া দেন। Mr. E. Steinberg বলেন, "Most interesting in this respect are the socalled Red yourtas and kibitkas (nomad carts). and travelling cultural institutions which are working in remote villages. The Red yourta with a librarian, an instructor and a midwife is moving from village to village, from nomad camp to nomad camp. Here women are taught to read and write and newspapers are read to them. Very often a special judge is attached to such Red yourta, who considers the complaints of women and the cases of different social crimes. The midwife helps childbirths and at different gynocological illness."

এইরূপ আনন্দের মধ্য দিয়া রাশিয়ার জনশিক্ষা বিস্তার করা হইতেছে এবং উহার ফলে এই নারী-জাগরণ সম্ভব হইয়াছে। বাঙ্গালা দেশে ভ্রাম্যমান্ প্রদর্শনী স্থাপনের জন্য ডাঃ ডি, এন্, মৈত্র মহাশয় বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন। আগামী শীতকালে এই প্রদর্শনী খোলা হইবার কথা। গ্রামে গ্রামে আলোকচিত্র, বক্তৃতা, সঙ্গীত ও শিল্পপ্রদর্শনী মোটর লরীতে বহন করা হইবে এই প্রস্তাব করা হইয়াছে।

এই প্রবন্ধলেখক সরকারী কার্য্যকালে একবার নদীয়া জেলা বোর্ডের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত এইরূপ একটি ভ্রাম্যমান্ গোযান সাহায্যে বাহিত প্রদর্শনীর স্বাস্থ্য বিভাগের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী হিসাবে থাকিয়া দেখিয়াছেন যে ইহাতে পল্লীতে লোকশিক্ষা সহজ ও সুন্দররূপে হয়।

সরোজনলিনী মহিলাসমিতিগুলিকে আরো ব্যাপক ভাবে লোকশিক্ষার ভার লইতে হইবে। নিন্দুক ও সমালোচকেরা এখন যতই কেন অপ্রীতিকর আলোচনা করুন না কেন একদিন সকলকেই ইহার সার্থকতা স্বীকার করিতে হইবে। রাশিয়াতেও বিস্তর বাধাবিপত্তির মধ্য দিয়া এই আন্দোলন সফল হইয়াছে। দীর্ঘকাল ধৈর্য্য-সহকারে একদল সেবাপরায়ণা নারীকে এই লোকশিক্ষার মহাব্রত গ্রহণ করিতে হইবে। রুশিয়াতে "...years of persistent work, of supreme heroism and enormous strain were necessary on the part of active women workers to achieve such results."

বাংলার মহিলাকর্ম্মীরা এই মহাসত্য ভুলিবেন না—চালাকি দ্বারা মহৎ কার্য্য হয় না—শ্রম ও ত্যাগ চাই।

বার্গ্‌সঁ-দর্শনে আর্য্য-চিন্তার দেখাসাক্ষাৎ

শ্রী অতুলানন্দ চক্রবর্ত্তী

চোখে যা দর্শন করা যায় দার্শনিক জ্ঞান প্রায়ই তা' নয়। দৃশ্যমানের অন্তরালে বস্তুর রহস্য থাকে। তার সেই আসল রূপ দর্শন মানুষের পক্ষে কতদূর সম্ভব? চোখে-দেখা মায়া-রূপের ওপারে যাওয়া যায় কি?—এই প্রশ্ন অধ্যাত্মজ্ঞানের সন্ধানীদের চিত্ত ব্যাকুল ক'রে এসেচে। ভারতবর্ষ তাঁর বিশিষ্ট চিন্তার প্রতিভা অনুযায়ী এর জবাব দিয়েচেন। এ দেশের সকল দর্শনই আধ্যাত্মিক চৈতন্য দ্বারা প্রাকৃতিক ভ্রান্তিবিলোপের সাধনা করেচেন। বৈশেষিক দর্শন বলেন, তত্ত্বজ্ঞান হ'তেই পরম শ্রেয় লাভ হয়। সাংখ্যও বলেন, তত্ত্বজ্ঞান থেকেই মুক্তি; সাংখ্যের তত্ত্বকৌমুদী জ্ঞান অর্থে বুঝেচেন, প্রকৃতি ও পুরুষের পার্থক্য বিষয়ে বিবেক; যোগদর্শনের সাধনপাদেও 'বিবেকখ্যাতি'র কথাই বলা হয়েচে। ন্যায়দর্শনের কথাও বাৎসায়ন ভাষ্যে ঐ একই ভাবে বিবৃত করা হয়েচে, তত্ত্বজ্ঞান দিয়েই মিথ্যা-জ্ঞান নাশ করবে। বেদান্তদর্শন অতি পরিষ্কার বলেচেন, 'বিদুষ ঐকান্তিকী কৈবল্য সিদ্ধিঃ'—তত্ত্বজ্ঞানীদের একান্তভাবে 'কেবল'-এর অর্থাৎ absolute-এর সিদ্ধি অর্থাৎ realisation হয়। এই আর্য্য-দর্শনের প্রভাব Pythagoras, Socrates, Plato প্রভৃতি সকলের উপরেই প্রচুর পরিমাণে ছিল। Lasssen প্রমুখ সমলোচকগণ স্বীকার করেন, Neo-Platonism দলের উপর সাংখ্যের বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল। গ্রীক্, খৃষ্টান্ মরমী (Christian Mystics—Eckhart, Tauler প্রভৃতি), জার্ম্মান—সব দর্শনই কম-বেশী বেদান্তের মুক্তচিন্তার সুরভিত নির্ম্মল বায়ু সেবন করেচেন।

তবুও যে-যার প্রতিভা ও স্বাধীন চিন্তা অনুসারেই সৃষ্টি ও প্রাণের অন্তর্নিহিত সত্য অনুসন্ধান করেচেন। পশ্চিম পৃথিবী নিজস্ব চিন্তার বলে এর মীমাংসায় এগিয়েচেন। বিখ্যাত জার্ম্মান দার্শনিক Kant, স্বরূপ (thing-in-itself) দর্শনের প্রয়োজন খুব বেশীই অনুভব করেচেন। দৈহিক ও মানসিক ইন্দ্রিয়ের মনগড়া রূপ ছাড়া সত্যের সাদা চেহারা জানতে পাওয়া যায় কি না সেই খোঁজে হয়রান হ'য়ে জার্ম্মান ঋষি কাতর কণ্ঠে বলেচেন—পেলাম না, সত্যের দেখা পাওয়া যাবেও না। কিন্তু দেশ (space), কাল (time) ও ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ (perception) ছাড়া নিরপেক্ষ (absolute) জ্ঞান যদি না-ই হ'লো তবে তাকে ত' ঠিক জ্ঞান বলা যায় না। Kant-এর পরবর্ত্তী খ্যাতনামা দার্শনিকগণ এই গলদ সংশোধনের বা অভাব পূরণের উদ্দেশ্যে মূল সত্য আবিষ্কারের চেষ্টা করেচেন। সেই নিরবলম্ব (absolute) সৎ (Truth), Flechte-এর মতে 'অহম্' (Ego); Hegel-এর মতে সঙ্গত বিচারবুদ্ধি; Schopenhauer-এর মতে নিজ্ঞ্জান ইচ্ছাশক্তি (unconscious will)। এই ইচ্ছাশক্তির অন্য এক রূপের উপাসক Neitzche. কিন্তু এ সবেও বিষয় সরল হ'লো না। খুব দুরূহ কথা অদ্ভুত সোজাসুজি বলেচেন, ফরাসী চিন্তাবীর Henri Bergson.

আরি বার্গ্‌সঁ যেন ইউরোপীয় তত্ত্বজ্ঞানের পার্থসারথি! তাঁর প্রথম গ্রন্থ, Time and Free-Will—সময় ও স্বাধীন ইচ্ছা। এই গ্রন্থেই অভিনব বার্গ্‌সঁ-দর্শন অতি স্বচ্ছ ভাষায় ও প্রাঞ্জল ব্যাখ্যাকৌশলে ব্যক্ত হয়েচে। তাঁর এই বিশিষ্ট চিন্তাপ্রণালীর সব চেয়ে সুপরিচিত গ্রন্থ Creative Evolution—সৃষ্টিসাধক বিবর্ত্তন। তিনি বলচেন:—জড়ও নয়, মনও নয়, নব নব সৃষ্টির উচ্ছ্বসিত আবেগে সদাগতিশীল বিশ্বপ্রাণই (*Elan Vital*) কেবল মাত্র সৎ। উপনিষদ্‌ও বহুভাবে প্রাণের মহিমা ঘোষণা করেচেন। ছান্দোগ্য বলচেন, 'প্রাণো বাব জ্যেষ্ঠশ্চ শ্রেষ্ঠশ্চ'—প্রাণ সকলের বড়, এই জেনে উপাসনা করবে। বৃহদারণ্যক বলচেন, 'উক্থং প্রাণো হীদং সর্ব্বং উত্থাপয়তি'—এই প্রাণ সমস্ত জগৎ উত্থাপন করেন অত প্রাণকেই উপাসনা করবে। বার্গ্‌সঁ আরো বলচেন, সত্যি জ্ঞান বলতে এই প্রাণের অনু-

ভূতিই (Intuition)। উপনিষদ্‌ও একেই বলেচেন, 'পর-বিদ্যা' ও যা' জানলে সবই জানা হয়। তবে উপনিষদে প্রাণ (Life Principle), আত্মা (Human Soul) অথবা ব্রহ্ম (Universal Soul) অপেক্ষা একস্তর নীচের তত্ত্ব হিসাবে উল্লিখিত হ'লেও অনেকাংশে ভাবার্থে সমশ্রেণী বলেও গ্রাহ্য হ'য়ে থাকে। আত্মা বা ব্রহ্মের সঙ্গে বার্গ্‌সঁ-কথিত প্রাণের অনেক সমগুণ আছে—যথা, স্বাধীনতা (freedom), চৈতন্য (consciousness), শৃঙ্খলা (order), ইত্যাদি; তবুও সূক্ষ্ম বিচারে, বেদান্তের 'ব্রহ্ম' আর বার্গ্‌সঁ-র 'বিশ্বপ্রাণ' যে কত দূর পৃথক্ সে আলোচনা বারান্তরে করা যাবে। সংক্ষেপে এই বলা যায়, কোন্ দুর্জ্ঞেয় স্থান থেকে বেরিয়ে, ক্ষণে ক্ষণে আত্মীয়তার চকিত-দৃষ্টি-বিনিময়ে চল্‌তে চল্‌তে ক্রমে যেন একজন এগিয়েছেন উত্তরাপথে মহামৌন হিমবানের নিবিড় অরণ্যে,—অন্যজন দক্ষিণাপথে ঊর্ম্মিমুখরিত মহাসমুদ্রের চঞ্চল উপকূলে।

প্রাণের সত্যতার দুটো দিক্—অগ্রসরের দিক্ আর বিরোধের দিক্। আগে হ'তে কোনো বন্দোবস্তে নয়, কিন্তু অগ্রসর হ'তে হ'তে প্রাণ যেমন যেমন বাধা পায় সেই ভাবে তাকে এড়াবার বুদ্ধিবৃত্তি (intellect) জাগ্‌তে থাকে। প্রত্যেক সাময়িক বাধার খণ্ড খণ্ড হিসাব-নিকাশ ক'রে প্রাণের এগোবার রাস্তা তৈয়ার করাতেই বুদ্ধির উদ্ভব। প্রাণের আদিম প্রেরণাই সকল কর্ম্ম-চেষ্টার উৎস আর এই কর্ম্মযোগের কৌশল—গীতা যাকে 'যোগঃ কর্ম্মসু কৌশলম্' বলেচেন—আবিষ্কারেই বুদ্ধির আবির্ভাব। অনেকটা বুদ্ধিবৃত্তির মতই আরেকটি প্রবণতা (tendency) আছে যা' বুদ্ধির পাশাপাশি থাকলেও একে অন্যের অন্তরায়। এ হ'ল, সহজ প্রবৃত্তি (instinct) যা' বুদ্ধির চেয়ে অনেক সহজে, যেহেতু বিশ্লেষণাদির অপেক্ষা না ক'রে, প্রাণের বাধা অতিক্রম করে। এই বাধা-বোধের মূর্ত্তিকেই জড় (matter) বলা হয়। প্রাণের বাধা হিসেবেই জড়ের অস্তিত্ব ঘট্‌তে থাকে। সেও ঐ খণ্ড সাময়িক অস্তিত্ব। জড় প্রাণের সংস্রবেই সৎ হয় নতুবা জড়ের স্বাধীন সত্তা নেই। হিন্দু দর্শনে এমন বিশদ ভাবে জড়ের জন্মকাহিনী বিচার হয়নি। প্রাণের পরিচয়ে বার্গ্‌সঁ বল্‌চেন :—'সমগ্রভাবে এই প্রাণ, তার আত্মপ্রকাশের প্রথম প্রেরণার মুহূর্ত্ত থেকে, যেন একটি তরঙ্গ মাথা তুলে' আসচে আর জড়ের পতন-প্রয়াসী বিপরীত গতিবেগে বাধা পাচ্চে। এই চঞ্চল জলরাশির বিভিন্ন উচ্চতার অধিকাংশের উপরিভাগ জুড়ে' জড়ের সংঘাতে স্রোতের বেগ একটা আবর্ত্তে পরিণত হ'চ্চে। একটি মাত্র বিন্দুতে, বিঘ্ন যা-কিছু ভেঙে দিয়ে, জঞ্জাল যা-কিছু ব'য়ে নিয়ে, এই স্রোত রাস্তা যা'র ক'রে ছুটেচে—বাধার ভার এই স্রোতের উপর চেপে থাকবে কিন্তু তার গতিরোধ করতে পারবে না। এই বিন্দুতে রয়েচে মানুষ।' মানুষ এই সর্ব্বগত অনাদি অনন্ত প্রাণের একাংশের প্রকাশ—ব্রহ্মসূত্রে যেমন আত্মাকে ব্রহ্মের 'আভাস এব চ' বলা হয়েচে। এই একত্বের বাণী উপনিষদের 'তত্ত্বমসি' বাক্য মনে করিয়ে দেয় বার্গ্‌সঁ আরো বলেচেন, বিশ্বপ্রাণের (Universal Life) অনন্ত প্রেরণা-প্রসূত ব'লে ব্যক্তিগত প্রাণের (Human Soul) লীলা কোনোকালে ফুরোবার নয়। মাণ্ডুক্য-কারিকা বলেচেন, ব্রহ্ম আর জীবে যদি কোনো ভেদ হ'তো তা' হ'লে—'মর্ত্ত্যতাম্ অমৃতো ব্রজেৎ'—যিনি অমৃত তিনি মর্ত্ত্য হ'তেন যে!

প্রাণ নিয়ত চলেচে আর সৃষ্টি ক'রে চলেচে। প্রাণের গতি-ভঙ্গিমায় মুগ্ধ হ'য়ে উপনিষদের ঋষি বলেচেন, 'কেনেষ প্রাণঃ প্রথমং প্রৈতি যুক্তঃ'—কে এই প্রাণে প্রথম গতি সঞ্চার করলেন? তবু উপনিষদের প্রাণে আর বার্গ্‌সঁর প্রাণে বেশ একটি গুরুতর পার্থক্য রয়েচে, বরং ব্রহ্মের সঙ্গে তার চেয়ে অনেক বেশী মিল আছে। বার্গ্‌সঁ বলেন, এই যে অনন্ত চলা, এই চলা-ই প্রাণ। নিরন্তর চলিষ্ণুতাই প্রাণরূপী একমাত্র সৎ। গতি, পরিবর্ত্তন ও সৃষ্টি—এই ব্যাপারই সৎ নতুবা এমন নয় যে, কোনো বস্তু আছে যা' চলে বা বদ্‌লায় ইত্যাদি। তিনি আরো বলেন, প্রাণের এই গতি এমন এক সমগ্রতা যাব ভাগ নেই যা কাল্পনিক ভাগ করলে অঙ্ক লাভ হ'লেও তার রসবোধ হয় না। প্রাণের অবিভাজ্য অবিরাম গতি (indivisible incessant movement) বার্গ্‌সঁ একটি সুন্দর যুগোপযোগী উপমায় বুঝিয়েচেন। চলচ্চিত্রের ছবিগুলি বন্ বন্ ক'রে ঘুরতে থাকে তাই জীবন্ত লীলা দেখা যায়, কোথাও বিচ্ছেদ হ'লে সমগ্রতাও গেল, ও সেই সঙ্গে তার সত্যিকার রসও গেল, যদিচ কাজের বেলায় খণ্ড খণ্ড ছবিই তুলতে হবে। অসীম

বিশ্বের সর্ব্বত্রই সকল অভিব্যক্তির মধ্যেই মহিমময় প্রাণের কী যে বিপুল স্পন্দন চলেচে তার অপূর্ব্ব রহস্য রবীন্দ্র-কাব্যে অতি চমৎকার রূপে প্রকাশ পেয়েচে :—

"মনে হ'ল এ পাখার বাণী
দিল আনি'
শুধু পলকের তরে
পুলকিত নিশ্চলের অন্তরে অন্তরে
বেগের আবেগ।
পর্ব্বত চাহিল হ'তে বৈশাখের নিরুদ্দেশ মেঘ;
তরুশ্রেণী চাহে, পাখা মেলি',
মাটির বন্ধন ফেলি'
ওই শব্দ-রেখা ধ'রে চকিতে হইতে দিশাহারা,
আকাশের খুঁজিতে কিনারা!
*   *   *   *
শুনিতেছি আমি এই নিঃশব্দের তলে
শূন্যে জলে স্থলে
অমনি পাখার শব্দ উদ্দাম চঞ্চল।
তৃণদল
মাটির আকাশ 'পরে ঝাপটিছে ডানা,
মাটির আঁধার নীচে, কে জানে ঠিকানা—
মেলিতেছে অঙ্কুরের পাখা
লক্ষ লক্ষ বীজের বলাকা।
দেখিতেছি আমি আজি
এই গিরিরাজি,
এই বন, চলিয়াছে উন্মুক্ত ডানায়
দ্বীপ হ'তে দ্বীপান্তরে, অজানা হইতে অজানায়।
শুনিলাম মানবের কত বাণী দলে দলে
অলক্ষিত পথে উড়ে চলে
অস্পষ্ট অতীত হ'তে অস্ফুট সুদূর যুগান্তরে।"

বিশ্ব একেবারে পূর্ণ ও পরিণত হ'য়ে সৃষ্ট হয় নি। কেবলই নতুন ক'রে হওয়ার আর বিরাম নেই—যে সৃষ্টির প্রেরণাতে এর সুরু সে প্রেরণার কোন শেষ নেই। এই অশেষ কর্ম-প্রবর্ত্তনায় সদাপরিবর্ত্তনের মধ্যে সে বদলায় না কথনো, তার আনন্দকে বিচিত্র রূপে ও বিচিত্র ভঙ্গিমায় ব্যক্ত করে। এই অবিরাম সৃষ্টিই (Creative Evoluion) প্রাণের ধর্ম্ম আর অবিরাম অভিব্যক্তির অন্তঃপ্রবিষ্ট প্রাণকে সমগ্র এক রূপে জানাই চৈতন্যের (Consciousness) ধর্ম্ম। এই নতুন নতুন হওয়া (becoming),আর এর সবটুকুই যে এক ও বর্ত্তমান সে তথ্য জানা (knowing), মূলতঃ ভিন্ন প্রেরণা নয়। বার্গ্‌সঁ-ব্যাখ্যাত এই 'হওয়া' ও 'জানা' উভয়ের অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ বেদান্তের ভাষায়—'ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি', যিনি ব্রহ্ম জানেন তিনি ব্রহ্মই হন; আবার, 'ব্রহ্ম সন্ ব্রহ্ম অবৈতি', ব্রহ্ম হ'য়েই তবে ব্রহ্ম জানেন।

সত্যিকারের জানা ব্যাপার, প্রাণে পরিপূর্ণ মর্ম্মগ্রহণ বুদ্ধির কর্ম্ম নয়। প্রাণের সহধর্ম্মী ও সহযাত্রী চেতনা (Intuition) দিয়েই অখণ্ড প্রাণের পরিচয় পাওয়া যায়। অক্লান্ত নব নব সৃষ্টি করচে এই প্রাণ আর নিয়ত এই সৃষ্টির রস অনুভব করচে চেতনা। উপনিষদ্‌ও বলেচেন, 'এষোঽণুরাত্মা চেতসা বেদিতব্যো'। সৃজনের পথ দিয়ে বেঁচে চলাই প্রাণ আর এই ভাবে বাঁচার সঙ্গে সঙ্গে পূর্ণ প্রাণের সাক্ষাৎ উপলব্ধিই চেতনা। পঞ্চদশীর আত্মা সম্বন্ধে মন্তব্য এই বিষয়ে সর্ব্বাংশে প্রয়োগ করা যায়—অবেদ্য (unknowable) হ'লেও অপরোক্ষ (directly realiseable) যেহেতু ইনি স্বপ্রকাশ (self-revealing)। অপরোক্ষ চেতনা বহির্মুখী নয়। বাইরের যে বস্তুপুঞ্জের উপর দিয়ে প্রাণ অবিরাম নব নব জন্মের 'সিনেমা' চালিয়ে যাচ্চে সেই বস্তুপুঞ্জকে প্রাণের বিরোধী না মনে ক'রে তার প্রকাশের সহায়করূপে জানাই চেতনার কাজ। বুদ্ধির কাজ বহির্মুখী। ঘটনা ও বস্তুপুঞ্জকে বাইরের অস্তিত্ব হিসাবে সন্দেহ ক'রে চলাই বুদ্ধির স্বভাব। প্রাণের এক সমগ্র গতিকে অসংখ্য খণ্ড গতির সমষ্টি কল্পনা ক'রে বুদ্ধি বস্তুপুঞ্জের পরস্পরের মধ্যে সম্বন্ধ ও প্রাণের সঙ্গে সম্বন্ধ যথা প্রয়োজন বিশ্লেষণ করে। কাউকে ছাড়া, কাউকে অপরের সঙ্গে মেলান, কাউকে অধীনে আনা ইত্যাদি আপেক্ষিক ও খণ্ডিত ব্যবস্থায় একদিকে যেমন বস্তুর বাধা ভেঙে' প্রাণের সৃজনলীলার ব্যবহারিক প্রয়োজন সাধিত হয় অপরদিকে প্রাণকে নিরপেক্ষ ও সমগ্ররূপে ধারণায় বাধা হয়। বুদ্ধি চেতনারই শক্তি কিন্তু তার ব্যাপক দৃষ্টিকে সাময়িক চাহিদা অনুযায়ী সংহত ক'রে বিশেষ বিশেষ ঘটনার উপর প্রয়োগ। একই শক্তির শিল্পী ও কবিপ্রকৃতি হ'চ্ছে চেতনা, আর বৈজ্ঞানিক ও

সমালোচক হ'চ্চে বুদ্ধি। বেদান্তও অতি সুন্দর ভাবে এই উভয় সার্থকতার কথা বলেচেন—'অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা বিদ্যয়াঽমৃতমশ্নুতে'—অবিদ্যা (science intellect) দ্বারা মৃত্যু অর্থাৎ প্রাণের বাধা উত্তীর্ণ হ'য়ে বিদ্যা (metaphysic, consciousness) দ্বারা অমৃতত্ব অর্থাৎ প্রাণের চিরস্থায়ী রস আস্বাদন হয়।

প্রাণই একমাত্র 'সৎ'; 'অসৎ' ব'লে কিছু হয়ই না। সেটি কল্পনার ভ্রম, অস্তির অভাব কল্পনা মাত্র। না-থাকাটা আছে এমন নয়, থাকাটা যেন নেই এই ভাব। নাস্তির সোজাসুজি ধারণা সম্ভবই নয়। বেদান্তসূত্রও বলেন, 'ভাবে চোপলব্ধেঃ'—যা' আছে তারই উপলব্ধি হয়; 'ন ভাবোঽনুপলব্ধেঃ'—যা' নেই তার উপলব্ধিও নেই। প্রাণের ধর্ম্ম সৃজন ও যা' কিছু আছে সে এই প্রাণ। আবার বেদান্তের ধ্বনি শুনতে পাওয়া যায়, 'তথান্য প্রতিষেধাৎ', সেই এক ছাড়া আর কিছু নেই। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুপুঞ্জ যা'কে অসৎ বলা হ'ল সেগুলি মায়া (appearance) হ'য়েও আমাদের লৌকিক জ্ঞানে এত অমোঘ মনে হয় কি ক'রে? আর, চেতনালব্ধ সদ্বস্তটি আসল সত্য হ'য়েও অনুভব প্রায় হয় না-ই বা কেন? দুটি মৌলিক ও সুলভ ভ্রম এর কারণ। প্রথম, চলাই সৎ ও চলার নানা ভঙ্গী রূপ নিয়ে দেখা দেয় একথা ভুলে' আমরা ভাবি বস্তুই সৎ ও তা'ই চলাফেরা করচে। কিন্তু এ ভুলের পরম লাভ এই যে বস্তুকে সত্য মনে করাতেই সে প্রাণকে সৃজনের ক্রিয়াশীলতায় উত্তেজিত করে। দ্বিতীয়, মনে করি একটা অসৎ সত্যিই (real unreality) আছে। যা' এখনো পাইনি,তাই সৃষ্টি করবো, সকল কাজেই এই আকাঙ্ক্ষা, ফলে যা এখনো দেখিনি তা' না-থাকারই অস্তিত্ব মনে করি। Einstein-এর আপেক্ষিক বাদ (Relativity Theory) ব্যাখ্যায় বিজ্ঞানবিশারদ Eddington বলেচেন বস্তুর অন্তরে আমাদের মানসিক ব্যাপার স্তরে স্তরে সাজান রয়েচে। বৈদিক ঋষিও এমনি একটি নিগূঢ় যোগের খবর জানতেন বলেই গায়ত্রী মন্ত্রে ধী-শক্তি দ্বারা "ভূঃ-ভুবঃ-স্বঃ'-র মধ্যে আত্মাকে ব্যাপ্ত দেখতে উপদেশ করেছিলেন। দার্শনিক-প্রবর Hegel সৎ ও অসৎকে একই বলেচেন। রহস্যপূর্ণ আত্মীয়তায় যোগ সত্বেও মন ও ভৌতিক পদার্থ পরস্পরবিরোধী এই ধারণায় Descartes-প্রচারিত যে দর্শনের সূত্রপাত, বার্গসঁর নব্য দর্শন তার আপোষ মীমাংসা করা অপ্রাসঙ্গিক মনে ক'রে গূঢ় বিচারে এমন এক নিরপেক্ষ সত্যে নিয়ে গেছেন যেখানে উক্ত বিরোধের আর সম্ভাবনা মাত্র উদয় হয় না। যোগ-বাসিষ্ঠের ভাষায় বার্গসঁর মত এই বলা যায়—যে, সৎ তা'ও নন, আবার অসৎ তা'ও নন, তাঁতে সকল দ্বৈতের একান্ত অবসান।

আরেক প্রশ্ন—এই জড় অচল-অপ্রাণ হয়েও এবং প্রাণের বিরুদ্ধাচরণ ক'রেও প্রাণের অস্তিত্বের পক্ষে নেহাৎ আবশ্যক কি ক'রে? অচলতা (appearance) বেদান্তের ভাষায় মায়া। দুটো ট্রেন সমানবেগে যখন একই দিকে যায় তখন মনে হয় না চলচে, বিপরীত দিকে চললে মনে হয় দুটোই দ্বিগুণবেগে চলচে। প্রাণ একটি সুবিশাল গতি। যখন পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়ে কোনো সৃষ্টির সার্থকতার দিকে ছুটচে তখন মনে হয় অন্য গতি-গুলি যেন তাদের কল্পিত নিশ্চলতার দ্বারা এই গতিকে অবরোধ করচে। এই ভাবে প্রাণের বিরুদ্ধ সব গতিই জড় ব'লে মনে হয়। যেটি মনে হয় দেশের (space) আয়তন মধ্যে নিরেট বস্তু, বাস্তবিক সেটি সময়ের (time) মধ্যে অজস্র অবস্থান্তরের সমষ্টি (systom of events —Relativity)। অতি সূক্ষ্ম একঝলক আলো রূপে যা দেখা দিচ্চে তা ব্যোমের (aether) কোটি কোটি স্পন্দনপ্রবাহের সমষ্টি। সুতরাং বার্গসঁ মতে 'সময়' দারুণ সত্য, কিন্তু সে সত্য পরিবর্ত্তনশীল সময় নয়। প্রাণ ও বিশ্বচৈতন্যের মতই সময় এক বিশাল অবিভাজ্য সদা-বর্ত্তমান অস্তিত্ব যার মধ্যে সৃজনের অনন্ত পরিবর্ত্তন ঘটচে। প্রাণের অফুরন্ত পরিবর্ত্তনে ভূত ভবিষ্যৎ কিছু নেই। অতীত বর্ত্তমানের সেই অংশ যা আছে অথচ তাতে প্রাণের সেই আকর্ষণ এখন আর নেই; ভবিষ্যৎ বর্ত্তমানের সেই অংশ যেটি প্রাণে এখনই আছে অথচ এপর্য্যন্তও প্রকাশের উত্তেজনায় আসেনি। যেমন একটি সুর নানা স্বরগ্রামের মধ্যে দিয়ে গেলেও একটি অখণ্ড পরিপূর্ণ অনুভূতি এবং কতক স্বরগ্রামের বিগত লীলা ও কতকের অনাগত লীলা সবটুকুই তার সমগ্র বর্ত্তমানতার মধ্যে নিত্য-

বিরাজিত, তেমনি প্রাণের গতি এক সমগ্রতা যার ভাগ নেই ও ভাগ কর্‌লে স্বরূপ জানা যায় না। বৃহদারণ্যক ব্রহ্ম সম্বন্ধে এই ধরণের (অথচ আবার অন্য ধরণেরও) পূর্ণতা ঘোষণা করেছেন—'ওঁ পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে'—হ্যাঁ, ঐ ব্রহ্ম পূর্ণ, এই ব্রহ্ম পূর্ণ, একের মধ্যে আর একে পূর্ণরূপে প্রকাশিত হচ্চেন। চিরবর্ত্তমান অনন্ত সময়ের মধ্যে অফুরন্ত সৃজনের আবেগই একমাত্র সত্যস্বরূপ বিশ্বপ্রাণ---'একমেবাদ্বিতীয়ম্'। এই নটরাজের সৃষ্টির আবর্ত্তে লক্ষ লক্ষ 'ব্যক্তি-প্রাণের' আবির্ভাব। তারাও এই সৃজনের আত্মপ্রকাশে অস্থির। আর, এই ব্যক্তিত্ব (personality) বিকাশের অদম্য আকিঞ্চনের উৎসে রয়েচে প্রাণের আত্মকর্তৃত্ব (free will) যেটি না থাক্‌লে আত্ম-ব্যঞ্জনার চেষ্টা প্রবঞ্চনা মাত্র হ'ত। বুদ্ধি দ্বারা পারিপার্শ্বিকের উপর পার্থিব (material) প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা ক'রে ক্রমবিকাশ-বাদ (evolution theory) কথিত জীবনসংগ্রামে জয়ী হওয়ার চেষ্টা স্বাধীন ইচ্ছার আসল খেলা নয়। প্রাণের সৃজনকার্য্যের মধ্যে ব্যক্তিত্ব প্রকাশ কর্‌তে পারাই আত্ম-কর্তৃত্ব; আর, এই পারমার্থিক (spiritual) ব্যাপারে সমগ্র প্রাণের পরিচয় লাভ হয়, অথবা, বেদান্তের ভাষায় 'স্বেন রূপেনাভিনিস্পদ্যতে'—স্বরূপের বোধ হয়। বুদ্ধির বিচ্ছিন্ন ক্রিয়া নিরোধ ক'রে, প্রজ্ঞার (consciousness) সাহায্যে সমগ্র প্রাণের উপর দৃষ্টি স্থাপিত ক'রে স্বাধীন ইচ্ছাশক্তির প্রাণবন্ত প্রতিনিধিরূপে নিজেকে জানা যায়, অথবা, যোগদর্শনের ভাষায় 'তদা দ্রষ্টুঃ স্বরূপেঽবস্থানং'—তখন নিজের স্বরূপে অবস্থান সাধিত হয়। এ খুব কদাচিৎ সাধিত হয়। তাই অগণিত জনসাধারণের ভাগ্যে প্রাণের নিজস্ব স্বাধীনতার রসাস্বাদন একরকম অজ্ঞাতই থেকে যায়। আধ্যাত্মিক জ্ঞান, ভগবান্ বা অমরত্ব কিছু দিক্ আর না দিক্, প্রাণের মহিমা জাগিয়ে জুজুর ভয় সরিয়ে দেয়। বার্গ্‌সঁ-কথিত আত্মকর্তৃত্ব বাদের মর্ম্ম এই যে, যখন কেউ প্রাণরহস্যবিদ্ হন তখন তিনি প্রাণের মূল প্রেরণার জয়োল্লাসে নিজেকে কর্ম্মে ও চিন্তায় অন্ধ নিয়তির বন্ধন থেকে মুক্ত জানেন, তখন তিনি—'আপ্নোতি স্বারাজ্যম্ আপ্নোতি মনসস্পতিং'—স্বরাট্ হন, স্বীয় মনের অধিপতি হন। দুর্লভ হ'লেও, এই স্বাধীনতাই মানুষের বিশেষত্ব। Creative Evolution গ্রন্থে তিনি বল্‌চেন:—'এই স্বাধীনতাই একান্ত ভাবে মানুষের রূপ নিয়ে জন্ম লাভ করেচে। মানুষ ছাড়া সৃষ্টিরাজ্যের আর কোথাও চিৎ-শক্তির এমন বিকাশ হয় নি। একমাত্র মানুষের মধ্যেই এর গতি বেগে প্রবহমান। প্রাণের সকল শক্তি-চর্চ্চায় মানুষের দৃষ্টি থাকে না; কেবল আত্ম-উপলব্ধির দুরন্ত আবেগে নিরুদ্দেশ ভাবে কোথাও শেষ না মেনে সে চলে'ই চলেচে। ক্রমবিকাশের অন্য সকল ধারায় প্রাণধর্ম্মের পরিচায়ক অন্যান্য প্রবণতাগুলি ক্রিয়াশীল। তাদের কতকগুলি মানুষ অবশ্যই রেখেচে যেহেতু বিভিন্ন প্রবণতায় সকলেই প্রকৃতিগত ঐক্যবশতঃ পরস্পরের অন্তঃপ্রবিষ্ট। তবুও, সেগুলির অতি অল্প অংশই মানুষ অনুশীলন করে। যেন এক অনির্দ্দেশ্য দুর্বোধ্য জীব, যাকে আমরা মানুষ বা অতিমানুষ বল্‌তে পারি ও তাই বল্‌বোও, নিজেকে উপলব্ধি কর্‌বার সাধনা কর্‌ছিলেন এবং সাধনপথে স্বীয় বিশালতার কতক অংশ ত্যাগ ক'রেই তবে সুস্পষ্ট ব্যক্তিত্বের সীমারেখায় সংহত বিশিষ্টরূপে বিকশিত হ'তে পেরেচেন।'

অগ্নিশিখা

শ্রী কাত্যায়নী দেবী

(১০)

অরবিন্দ জ্বরে অজ্ঞান, পরেশ ক'দিন ধরেই তার কাছে আছে, রঘুসিং রাতদিন সেবায় ব্যস্ত। যা-কিছু পথ্য পরেশের বাড়ী থেকে আসে, ডাক্তার এসে দেখেন। জ্বরের ধরণ ও প্রলাপ দেখে টাইফয়েড বলেই স্থির হয়েছে। পরেশ একা ক্লান্ত হ'য়ে পড়েছে; পাড়ার ছেলেরা দুই চার জন করে' এসে তাকে সাহায্য করে। জ্বর ১০৪।৫ পর্য্যন্ত ওঠে, ১০০ করে' নামে। বিকারের লক্ষণ কখনও কখনও দেখা দেয়। যদি ভাল সেবা শুশ্রূষা না হয় তবে যে শেষ পর্য্যন্ত কি হবে তা কে বল্‌তে পারে।

অরবিন্দ আজ চার পাঁচ দিন হ'ল এসেছে; সেই যে এসে শুয়েছে আর ওঠ বার শক্তি নেই। রঘুসিং কেঁদে বল্লে, "দাদা বাবু, আমার কপালে এই শাস্তি ছিল তাই আমি বেঁচে আছি—" পরেশ সান্ত্বনার সুরে বলে, "কেঁদ না রঘু, আমরা যা করার করি, কিন্তু ভগবান যা কর্‌বেন তার উপর হাত কি?—" বৃদ্ধ চোখ মুছে দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে।

শরতের মাথাভাঙা রৌদ্র খাঁ খাঁ কর্‌ছে। কিন্তু চারদিকের শ্যামলতা রৌদ্রের প্রখরতাকে যেন সহনীয় করে' তুলে; তাই শরতের রৌদ্র—আলো এত সুন্দর। বাংলার ঘরে ঘরে শরতের সঙ্গে সঙ্গে জ্বরও দেখা দিয়েছে। এর পর কে কা'কে জল দেবে তার ঠিক থাক্‌বে না। পরেশ আজ ক'দিন ক্রমাগত রাত জেগে ক্লান্ত হ'য়ে পড়েছে। সারাদিন সে একা এই প্রবল রোগী নিয়ে বসে' থাকে—আজও আছে। সামনে ধূসর রাস্তা ধূ ধূ কর্‌ছে,কচিৎ দু' একটি পথিক বা দু' একখানা গাড়ী চল্‌ছে। নিষ্ফল চেষ্টার ব্যথা নিয়ে পরেশ অরবিন্দর মাথায় বরফের ব্যাগ দিচ্ছে। অদূরে ছইএ ঢাকা একখানা গাড়ী আস্‌ছে না? পরেশ দেখ্‌ল গাড়ীখানা গ্রামের মধ্যে না ঢুকে এই বাড়ীরই রাস্তা ধর্‌ল। সে ভাব্‌ল এ রাস্তায় কে আসে, এ রাস্তা তো এই পর্য্যন্তই শেষ। উৎকণ্ঠিত হ'য়ে পরেশ রাস্তার দিকে তাকিয়ে রইল।

গাড়ী আস্তে আস্তে এসে তাকে বিস্ময়ে হতবুদ্ধি করে' দিয়ে গেটের মধ্যে ঢুক্‌ল। বিষ্ণু আগেই নেমেছিল, সে বেশ সহজভাবে রোয়াকের ধারে গাড়ী লাগাতে বল্লে। গাড়ীর পরদা সরিয়ে সহজ গলায় বল্লে, "নাম্‌ রে গোপাল নাম্‌, দিদি তোমরা নেমে পড়—" পরেশ অবাক চোখে তাকিয়ে আছে দেখে বিষ্ণু বল্লে, "এতদিন ভায়ার কোন খোঁজই মেলে নি, দিদিকে আনি কি করে', শেষে টেলিগ্রাফ পেয়ে আর দেরী কল্লাম না। অরবিন্দ বাবু কেমন আছেন এখন—"

অলকা গাড়ী থেকে নাম্‌তেই উৎফুল্ল মুখে পরেশ বল্লে, "বউদি এসেছেন? আঃ বাঁচ্‌লাম! আসুন আসুন, দাদার বড় অসুখ,—আমি একা হায়রান হ'য়ে যাচ্ছি; আপনি এসেছেন, এঁরা এসেছেন, আর ভয় নেই—"

অলকা কোনমতে বারান্দায় এসে দাঁড়াল। মঙ্গলা বল্লে, "চল ঠাকুরঝি, আগে ঠাকুর জামাইকে দেখে আসি—"

পরেশ দু' চারটা সামান্য জিনিষ যা ছিল নামিয়ে নিল। বৃদ্ধ রঘুসিং বালকের মত কাঁদ্‌ছিল।—"মা লক্ষ্মী আমার, তুই গিয়ে এমন সোনার পুরী শ্মশান হয়েছে! এখন মা তুই সব ঠিক কর্‌ মা আবার—"

অলকা তখন এত কাঁপ্‌ছে যে মঙ্গলা গিয়ে তাকে ধর্‌ল, বুঝি বা সে পড়ে' যাবে। এতদিন পরে তারই ঘরে এসে সে দাঁড়িয়েছে—এ কি শ্মশানমূর্ত্তি গৃহের! স্বামীর অসুখ, নিজের জীবনের অতীত, সব মিলে' তাকে বিহ্বল করে' তুলেছে। পরেশ রঘুসিংকে ধমক দিয়ে বল্লে, "কি কর রঘু, ওঁদের ঘরে নিয়ে যাও, পথ থেকে আস্‌ছেন। যান বৌদি হাত-পা ধুয়ে ঘরে আসুন—"

মঙ্গলা নিজেকে শক্ত করে' নিল—সে তো এই জন্যই

সঙ্গে এসেছে ; অলকা যে এতদিনের পর এমনি ভেঙে পড়্‌বে সে তো জানা কথাই। মঙ্গলা তাকে টেনে নিয়ে উপরে চল্ল। অলকার আঁচল ধ'রে গোপাল বল্লে, "মা, বড় খিদে পেয়েছে—"

সন্তানের ক্ষুধার কথায় অলকার লুপ্ত চেতনা ফিরে এল। সে তাড়াতাড়ি রঘুসিংকে বল্লে, "রঘুয়া, ঘরে তো কিছুই হয় না দেখ্‌ছি ; গোপালের জন্ত খাবারের যোগাড় কর, বাজার করে' আন।"

রঘুসিং দু' চার জন মজুর ধরে' এনে ভিতর-বাড়ীর কাজে লাগিয়ে দিয়ে বাজারে গেল জিনিষ আন্‌তে। রঘুসিংএর ছেলের বউ দাঁড়িয়ে ছিল আদেশের অপেক্ষায়, অলকা বল্লে, "যাও বউ, দিদিমণিকে স্নানের ঘরে জল দাও।" আলমারী খুলে দু'খানা ধোয়া সাড়ী বা'র করে' তার হাতে দিয়ে মঙ্গলাকে বল্লে, "যাও মঙ্গলা বউএর সঙ্গে ; এখনি আমি আস্‌ছি।"

চারদিকে সাড়া পড়ে' গেল। অলকা তার পরিত্যক্ত ঘরের দিকে তাকিয়ে স্তব্ধ হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইল...সেই ঘর যেমন সাজিয়ে রেখেছিল প্রায় তেমনই আছে পড়ে'—বস্ত্র, শয্যা, আলমারী, টেবিল, চেয়ার যেন তারই মুখের পানে চেয়ে আছে!

অলকাকে চম্‌কে দিয়ে পরেশ ঘরে এসে ডাক্‌ল, "বৌদি—"

অলকা বল্লে, "কি বল্‌ছ ঠাকুরপো?"

একটু দ্বিধা করে' পরেশ আস্তে আস্তে বল্‌লে, "বৌদি, আপনি অতীতকে ভুলে যান, সামনে যে কাজ পড়ে' আছে তাই তুলে নিন। আপনি ভেঙে পড়্‌লে দাদাকে ফিরিয়ে আনা শক্ত হবে। চলুন তাঁকে দেখে আস্‌বেন! রঘু বাহির থেকে এসে এসব ঠিক করে' দেবে।"

অলকা শঙ্কাজড়িত কণ্ঠে বল্‌লে, "ডাক্তার কি বলেছে ভাই—"

"টাইফয়েড হয়েছে তাতে সন্দেহ নেই, তবে খুব অল্পেই ধরা পড়েছে। সেই ঘটনার পরে রাত্রে বাসায় যখন এলেন সে কি পাগলের মত চেহারা! সারা রাত গ্রাম তোলপাড় করে' খোঁজা হয়েছে...ক'দিন আশপাশের গ্রাম, পুকুর, থানা কিছুই বাদ যায়নি খোঁজা...শেষটা আমার রেখে গেলেন এই শূন্য পুরী পাহারা দিতে...দেশে দেশে ঘুরে দুর্ভিক্ষের সেবা করে' শেষে এই রোগ বাধিয়ে নিয়ে এখানে এলেন এই পাঁচদিন হ'ল। আপনার কোন খোঁজই না পেয়ে আমরা এত নিরাশ হয়েছিলাম যে ভবিষ্যতে যে কি হবে তা মোটেই ভাব্‌তে পার্‌ছিলাম না।...এখন আপনার পুণ্যের জোরে আপনি সব ফিরিয়ে আনুন এই একমাত্র প্রার্থনা, বৌদি—"

পরেশ দেখ্‌ল অজস্র অশ্রুধারে অলকার মুখ ভেসে যাচ্ছে। তার ব্যথাকাতর মুখখানি পরেশকে বড়ই আঘাত দিল, বল্‌লে, "বৌদি, এখন হয়ত তোমায় অনেক আঘাত সইতে হবে·· বিষ্ণু বাবুর কাছে কিছু কিছু শুন্‌লাম। কিন্তু তুমি যেমন ছিলে ঠিক তেমনি থাক্‌বে, কোনমতে নিজে সংকুচিত হবে না। আমি তোমার চেয়ে ছোট, তবু এই গ্রামেরই মানুষ, আমি জানি, যে যত দুর্ব্বল হয় তাকে সকলে টুঁটী চেপে ধরে বেশী করে' ; কাজেই নিজে একটুও কিছু ছাড়্‌বে না—। চল এখন দাদাকে দেখে আস্‌বে।"

পরেশের সঙ্গে নীচের ঘরে গিয়ে অলকা দেখ্‌লে কঙ্কালসার দেহে অচৈতন্য অরবিন্দ শুয়ে আছে. তার মাথার উপর বরফের ব্যাগ দিয়ে একটি ছেলে বসে' আছে। আরো দু'চারটি পাড়ার ছেলে অন্যান্য কাজ কর্‌ছে। স্তম্ভিত অলকা স্বামীর দিকে একবার তাকিয়ে আর যেন তাকাতে পার্‌ল না। পরেশকে বল্লে, "চল ঠাকুরপো, উপরের ঘরটা আগে ঠিক করি, সেখানে তুলে নিয়ে যেতে হবে। এ ঘরটা বাইরের ঘর, আমি সব সময় আস্‌তে পার্‌ব না, আর আলো-বাতাসও বেশী খেলে না, বইয়ে জিনিষে ভরা।

"হ্যাঁ ঐ রঘুসিং আস্‌ছে বাজার নিয়ে ; ওরাই এধারের সব ঠিক কর্‌বে। তুমি চল দাদার ঘর ঠিক করে' দেবে।"

মঙ্গলাকে ডেকে আহারের ব্যবস্থার ভার দিয়ে, অলকা উপরের ঘরটির ব্যবস্থা কর্‌তে চলে' গেল।

সুগৃহিণী মঙ্গলা বউএর (রঘুয়ার ছেলের বউ) সাহায্যে রান্নাঘরটি গুছিয়ে নিয়ে লুচি আর মোহনভোগ তৈরী করে' সকলকে খেতে দিল।

সকলের খাওয়া হ'লে অলকার খোঁজে গিয়ে দেখে, অলকা কোমরে কাপড় জড়িয়ে সত্যধোয়া ঘরখানিকে মুছে পুঁছে শুক্‌নো কর্‌ছে, জান্‌লা দিয়ে অস্তমান সূর্য্যের রক্তিম আভা পরিশ্রান্ত অলকার মুখে পড়ে' তাকে অপরূপ দেখাচ্ছে। মঙ্গলা কিছুক্ষণ সেই মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে ডাক্‌ল, "দিদি—"

ম্লান মুখে অলকা একটু হাসি এনে বল্‌লে, 'দিদি—"

"বল্‌তে সাহস হয় না, কিছু খাবে না তুমি? এই যে সারাদিন উপোসী আছ দিদি, ঐতো দেহ, কি করে' সেবা কর্‌বে—?"

"এই তো হ'ল বোন্! গা হাত ধুয়ে আসি, ঘরটা শুকোলে ওঁকে উপরে আনার ব্যবস্থা করে' তারপর—"

"না আগে এস। এই তো বৌ রয়েছে, ঝিও এসেছে, তুমি এস স্নান কর্‌বে; আমার বুঝি ক্ষিদে পায় না?"

"সত্যি তো তুই খাসনি মঙ্গলি!—চল্, তুই বড় দুষ্ট।"

মঙ্গলা তাকে টান্‌তে টান্‌তে নিয়ে চল্ল।

পরেশ, বিষ্ণু ও আরো চার পাঁচ জন ছেলেতে অতি সাবধানে অরবিন্দকে উপরের ঘরে নিয়ে গিয়ে বড় পালঙ্কে শুইয়ে দিল। সন্ধ্যার পর ডাক্তার এসে ঘরের পরিবর্ত্তন ও সুসজ্জিত পরিচ্ছন্নতা দেখে খুসী হ'য়ে বল্‌লেন, "হ্যাঁ এবার ঠিক হয়েছে, রোগীর উপযুক্ত ঘর হয়েছে। এখন এই রকম যদি সেবা-যত্ন হয় তবে আর ভাবনা কিছু নেই—"

দ্বিতীয় সপ্তাহে খুব বিপদের ভয়; কোন্ দিকে গতি নেবে যে ব্যাধি তা এই সপ্তাহ না গেলে কেউ ঠিক করে' বল্‌তে পার্‌ছে না। বিষ্ণু দু'দিন থেকে পরেশকে বল্‌লে, "ভাই, আমার তো থাকার যো নেই আমি আজ চল্লাম, আপিসে যোগ দিয়ে আবার ছুটী নিয়ে আস্‌ব। যদি কলকাতা থেকে সেই ডাক্তারকে আন্‌তে পারি আন্‌ব —তিনি দিদির অসুখের সময় যা করেছেন তা বলার নয়, তাঁকে বাঁচিয়ে তুলেছেন তিনিই।"

পরেশ আগ্রহ সহকারে বল্‌লে, "তাই ভাল, আপনি ডাক্তার নিয়ে আসুন। দিদিমণি তো রইলেনই, আপনি দেরী কর্‌বেন না।"

অলকার কাছে বিদায় নিয়ে মঙ্গলাকে ডেকে বিষ্ণু বল্‌লে, "আমি আজই যাই, আপিস কামাই হ'লে গোলমাল হবে। তুমি সাবধানে সব দেখাশুনা ক'রো, তোমার উপরই সব রইল—"

"তুমি দেরী ক'রো না তাহ'লে, আমার কেমন যেন ভয়-ভয় করে—যত শীঘ্র পার এস।"

সেবা! সেবা! রাত-দিন কেবল সেবাই চল্‌ছে—ঘুম নেই, বিশ্রাম নেই, সময়মত আহার নেই। সেই যে অলকা এসে বসেছে তাকে রোগীর কাছ থেকে একতিল কেউ সরাতে পারে না। কোনমতে দিনের দুটি আহার সে করে, না হ'লে মঙ্গলা খেতে চায় না; তা ছাড়া সংসারের সব ভার মঙ্গলার হাতে। গোপাল সারাদিন পরেশের বাড়ী থাকে, মাঝে মাঝে ঘরে এসে দেখে ধ্যানরতা মা, অচেতন পিতা, তাকিয়ে দেখে ম্লান মুখে বা'র হ'য়ে যায়।

প্রলাপের ঘোরে অরবিন্দ কখন বকে, কখন পরেশকে ডেকে বলে, "পরেশ, সব রইল আমি চল্লাম, তুই দেখিস্—" কখন ডাকে, "অলকা অলকা, শোন, তুমি কই?"—হতজ্ঞান স্বামীর বুকে মাথা লুটিয়ে অলকা কেঁদে বলে, "এই যে আমি, চোখ মেলে কি দেখ্‌বে না?"

ঔষধ-পথ্য সেবা-যত্নের গুণে, এবং সর্ব্বোপরি অলকার কপালগুণে অরবিন্দর অসুখ ভালোর দিক নিল। কলকাতার ডাক্তার দু'দিন এসে দেখে গেছেন, তাঁর মতে ঔষধ-পথ্য চল্‌ছে, বিষ্ণুও মাঝে মাঝে আসে যায়।

দ্বিতীয় সপ্তাহ কেটে যেতেই অরবিন্দর জ্ঞান হ'ল। জ্ঞান হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অলকা তার সামনে থেকে সরে' গেল। প্রথম দেখার আবেগ তার সইবে কিনা এ ভয় সকলেরই আছে। আরো দু'চার দিন গেল, জ্বর ছেড়ে গেছে, অন্যান্য উপসর্গও কমে গেছে, আর বিশেষ ভয় নেই।

অরবিন্দ ক্ষীণ স্বরে বল্‌লে, "পরেশ, তাদের কি কোন খবর এল? আমার যেন কেবলি মনে হয়, আমি তাকে দেখেছি, সে যেন সারাক্ষণ আমার কাছেই ছিল—"

পরেশ বল্‌লে, "তা বৌদি এলে তোমার এখন খুব ভাল লাগে—অরু দাদা?"

"সত্যি পরেশ, মনে হয় এ ঘর যেন তারই হাতে গোছান, পথ্য যে খাই সে যেন সেই করে' দেয় বলে' মনে হয়—বল্ না সত্যি সে কি এসেছে?"

মহা সমস্যায় পড়ে' পরেশ বল্লে, "বউদি' খবর দিয়েছেন যে তিনি শীঘ্র আস্‌বেন। সেই টেলিগ্রাফের উত্তরে ভদ্রলোকটি জানিয়েছেন যে তুমি বল্লেই বউদি'কে নিয়ে আস্‌বেন।"

"আমি বল্লে মানে?—সে কি কথা! বাড়ী কি তাঁর নয়? পরেশ, কেন তুই সেই চিঠি পেয়েই তাকে আন্‌লি না? দে, দে টেলি করে' দে—'এখনি নিয়ে আসুন'। গোপাল আছে তো, তার কথা কিছু লেখেনি?"

"হ্যাঁ সব ভাল আছে, তুমি ব্যস্ত হ'য়ো না,-আমি লিখে দিচ্ছি—সবাই আস্‌বে।"

বারান্দার পাশে রেলিংএ ভর দিয়ে অলকা দাঁড়িয়ে সব কথা শুনছে আর দুই চোখের জল ঝরে' পড়্‌ছে; মঙ্গলা এসে তার মাথাটা বুকের উপর চেপে নিয়ে বল্লে, "দিদি, তুই কাঁদ্‌ছিস কেন? তোর মেঘ তো কেটে এল দিদি—"

অলকা বল্লে, "এত আশা যদি সব বৃথা যায়! আশাও যে কর্‌তে পারি না—"

"বালাই! ভগবান করুন, এত দুঃখের পর তোমার সকল দুঃখের অবসান হোক্‌।"

বিষ্ণু অরবিন্দর ঘরে যেতেই পরেশ বল্লে, "এই যে বিষ্ণু বাবু এসেছেন, এঁর সঙ্গে তোমার পরিচয় করিয়ে দিই। ইনিই বৌদি'র ভাই, এঁর কাছে বৌদি'রা আছেন, এঁরই কাছে সব খবর পাবে।"

অরবিন্দ বিষ্ণুর স্বাস্থ্যপূর্ণ সুগঠিত চেহারা ও প্রসন্ন মুখের দিকে তাকিয়ে বল্লে, "আপনিই আমায় টেলি করেছিলেন?—তাদের নিয়ে এলেন না কেন।"

বিষ্ণু বুঝ্‌ল অলকাদের এখানে আস্‌বার কথা এখনও বলা হয়নি, বল্‌লে, "হ্যাঁ আন্‌ব বলেই আপনাকে দেখ্‌তে এলাম; আপনি এখন কিছু সুস্থ হয়েছেন, কালই তাদের আনা যেতে পারে ··আপনার মত হলেই—"

"বলেন কি...আমার মত! হা ভগবান! সেকি মশাই তবে···বলুন না সে কোথায় ছিল···কোন ভয় নেই..."

বিষ্ণু বল্লে, "না, কোন পাপ, কোন দোষ ঐ নিষ্কলঙ্ক প্রতিমায় লাগ্‌তে পারে না! ভাগ্যবান আপনি, তাই দিদি সয়তানের ফাঁদ কেটে পালিয়ে এসে আমার কাছে ছিলেন। আপনার খোঁজ পাইনি, তাই তাঁকে এত দিন আন্‌তে পারিনি। আমার স্ত্রী, গোপাল ও দিদিকে নিয়ে আস্‌ব।"

পরেশ বল্লে, "শুন্‌লে তো দাদা, এখন আর ভেব'না, তুমি যদি বেশী অস্থির হও, তবে বৌদি'র আসা হবে না।"

"নারে পাগল, তোরা আমায় ভোলাবি! সে যে এখানেই আছে, তা আমি অনুভব কর্‌তে পার্‌ছি। এই যে সুপ দিলি এ তারই হাতের তৈরী—"

পরেশ হেসে বল্লে, "তুমি কিছুই ভোল'নি দেখ্‌ছি। দেখি, বৌদি'কে কোথাও খুঁজে পাই কিনা।—"

গোপাল ঘরে এসে পরেশের গা ঘেঁসে দাঁড়িয়ে বল্লে, "মামাবাবু, বাবা কেমন আছেন?—"

"আমার গোপাল!—আয় আয়—একটু দেখি,—"

পিতার আহ্বানে পুলকিত হ'য়ে গোপাল কাছে গিয়ে বাবার হাতের উপর মাথা রাখ্‌ল। পুত্রের স্পর্শে অরবিন্দর চোখে জল এল। শুধু একবার ডাক্‌ল—"গোপাল!" ছেলে উত্তর দিল, "হুঁ—" অনেকক্ষণ নীরব থাকার পরে অরবিন্দ বল্লে, "যাও তো গোপাল, তোমার মাকে বল'ত একটু জল দিতে।" জল নিয়ে অলকা অত্যন্ত স্বাভাবিক ভাবে কাছে এসে দাঁড়িয়ে বল্লে, "জল এনেছি—খাবে?"

অবাক অরবিন্দ অপলক চোখে শুধু তার দিকে তাকিয়ে আছে দেখে অলকা একটু ভীত হ'য়ে কাছে বসে' গায় মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বল্লে, "হা কর, আস্তে আস্তে জল দিই।" চমক ভেঙে অরবিন্দ মৃদু হেসে বল্লে, "দাও অলক, প্রাণ ভরে' জল খাই, কতদিন যে তৃষ্ণায় এ বুকটা শুকিয়ে আছে, বল'ত?"

আস্তে আস্তে জল খেয়ে অরবিন্দ অলকার হাতখানি টেনে নিয়ে বল্লে, "এত দেরী কর্‌লে আস্‌তে! কেন,—ভয় কর্‌ছিল? ভয় কি!—আমায় কি চেন' না? তুমি যে কাছে এসেও দূরে ছিলে, এইটুকুই ব্যথা দিচ্ছে, কেন আস'নি।"

"কাছেই ত ছিলাম; তুমি ভাল আছ দেখে এই ক'দিনই যা' একটু দূরে ছিলাম।"

"একটু ভাল করে' কাছে এসে বস।"

স্বামীর মাথা কোলে নিয়ে অলকা সযত্নে চুলের গোড়ায়

গোড়ায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বল্লে, "অনেকক্ষণ কথা বলেছ, একটু বিশ্রাম কর।"

"আমার সত্যি বড় আরাম লাগ্‌ছে,একটু বিশ্রাম করি। তুমি চলে' যেও না আর লুকিয়েও থেকো না—"

"তুমি ঘুমাও; আমি আর লুকিয়ে রইব না।"

দুই হাত অলকার কোলের উপর দিয়ে শিশুর মত নির্ভয় নির্ভরতায় অরবিন্দ ঘুমিয়ে পড়্‌ল।

সন্ধ্যার শাঁখ দিকে দিকে বেজে উঠল। মঙ্গলা সন্ধ্যাদীপ হাতে ঘরে ঘরে প্রদীপ দেখিয়ে অলকার ঘরে এসে অলকাকে ব'সে' থাকতে দেখে প্রদীপ রেখে অলকাকে প্রণাম করে' মৃদু স্বরে বল্লে, "দিদি, আশীর্ব্বাদ কর।"

অলকা মৃদু হেসে বল্লে, "মঙ্গলি, সন্ধ্যার পথ্যটা রামের হাতে দিয়ে পাঠিয়ে দাও, উনি এখনি উঠে খাবেন। আর তুমি ভাই, গোপালকে একটু পরেই খাইয়ে দাও, না হ'লে ঘুমিয়ে পড়্‌বে।"

মঙ্গলা বল্লে, "হ্যাঁ দেব, এই তো গোপাল তার মামার সঙ্গে বাইরে গেল, এতক্ষণ যে গল্প তার—"

মৃদু কথার আওয়াজে অরবিন্দ জেগে মঙ্গলাকে দেখে বল্লে, "উনি কে—"

"এই তো আমার বউদিদি—যদিও বউদি' বলি না। ভগবান দুঃখের আগুনে ফেলে এই সোনার খনির সন্ধান দিয়েছেন। এঁর নাম মঙ্গলা, সত্যিই ইনি মঙ্গলময়ী।"

"থাম, থাম" বলে' মঙ্গলা অলকার দিকে তাকিয়ে মৃদু তিরস্কার কর্‌ল। অরবিন্দকে নমস্কার করে' বল্লে, "কেমন আছেন ঠাকুর জামাই, এখন অনেকটা ভাল নয়?" মৃদু হাসি মঙ্গলার চপলতাকে কিন্তু চাপা দিতে পার্‌ল না।

অরবিন্দও হেসে বল্‌লে, "হ্যাঁ নিশ্চয়। এমন অমৃত পেলে কেমন লাগে তা ঐ শ্যালক মশাইকে জিজ্ঞাসা কর্‌বেন।"

"যা পালা, আর দুষ্টুমি কর্‌তে হবে না—অলকা মঙ্গলাকে একটু ঠেলা দিল।

'হ্যা, এই যে যাই গো—" মঙ্গলা চলে গেল।

(ক্রমশঃ)

বর্ষা

শ্রী করুণাশঙ্কর বিশ্বাস

মনে হয়—
আজি এইখানে বরষার সাথে
মোর যেন হবে পরিচয়।
খেয়া-ঘাটে নেয়ে বন্ধ করিল পারাপার,
কালো মেঘে পুন ছাইয়া আসিল চারিধার,
কূল ভেঙে ছোটে আষাঢ়ের নদী পাক খেয়ে,—
উন্মাদ-বেগে—নির্দ্দয়।
আজি এইখানে বরষা ঘনায়—
তার সাথে হবে পরিচয়!

এই বেশ,—
সমুখে চলিতে হঠাৎ এ বাধা,
দুর্য্যোগ-দিন—বেলা শেষ।
যাত্রীরা সব ফিরে গেছে ঘরে তাড়াতাড়ি,
বাদল নামিবে রাত্রির মত—ঘটা ভারি!
ভিজিবে বাহিরে নীরব শান্ত ঘুম-ঘোরে
দাঁড়ায়ে দাঁড়ায়ে কত দেশ।
সমুখে চলিতে এ বাধা মধুর,
দুর্য্যোগ-দিন—বেলা-শেষ।

বাড়ে জল ;
ধান-ক্ষেত দিয়ে স্রোত ছুটিয়াছে—
মাছ সেথা করে থল-থল।
থপ্ থপ্ করে' শেয়াল চলেছে আল্-পথে,
মেছো-বাঘা আসে চুপি চুপি কোন্ বন্‌পথে,
নালার কাছের বড় ঘাসগুলি কচি কচি
দেখিতে দেখিতে হ'ল তল।
ধান-ক্ষেত দিয়ে বন্যা চলিছে
মাছ সেথা করে থল-থল!

নহে হীন ;
একখানি শুধু মুদির দোকান—
সুখেই উহার কাটে দিন।
এই স্থানটিতে নিরালায় বসে' বেচা-কেনা,
কত চাষী-ভাই, মেয়েদের সাথে ওর চেনা ;
পাটকাঠি দিয়ে বেড়া বাঁধিয়াছে—তার 'পরে
খান ছ'সাতেক দে'ছে টিন।
একখানি ছোট মুদির দোকান,
এইখানে ওর কাটে দিন!

কলা-ঝাড়
ঐ দেখা যায় কোন্ ও গ্রামের ?—
দক্ষিণ দেশ, নদী-পার।
সুপারি গাছের ঘন সারিগুলি পটে আঁকা,—
স্বপ্নপুরীর কত রহস্য আছে ঢাকা,
ঘোলাটে হইয়া নেমেছে বৃষ্টি হোথা দিয়া—
সোঁ সোঁ শব্দটা শুনি তার।
ঐ দেখা যায় কোন্ মায়াময়
দক্ষিণ দেশ—নদী-পার।

নাচে প্রাণ,—
তেপান্তরের মাঠে আজ রাতে
কুঁড়ে ঘরে আমি পেনু স্থান।
ভাসিছে বিশ্ব—অবিরল ধারা ঝম' ঝম',
সমুখে আমার নিবিড় আঁধার কালী-সম,
প্রদীপের আলো কাঁপে থাকি থাকি—ক্ষীণ শিখা,—
আমি বর্ষার গাহি গান।
তেপান্তরের মাঠে আজ রাতে
কুঁড়ে ঘরটিতে পেনু স্থান।

জেগে নাই—
মধুর শান্তি,—শীতল স্পর্শ,—
তার পরসাদ পায় সবাই।
আমি মনে মনে নৌকা খুলিনু আঁধিয়ারে,
ঘাটগুলি এর দেখে যাব দুই পারে পারে,
আমার সাথে যে কথা হবে আজ—কত কথা,
উতলা হইয়া ছুটি তাই।
মধুর শান্তি,—শীতল স্পর্শ,—
ঘুমে অচেতন আর সবাই!

সর্ব্বনেশে মাছি

শ্রী রমেশচন্দ্র রায় এল্‌-এম্‌-এস্‌

মাছি কি কি রোগ-বিস্তৃতি ঘটায়।— মাছিটি দেখিতে অতি ছোট, নিরীহ প্রাণী! তাহার উপরে, আবার, মশার মত মাছি কামড়ায় না, বা মৌমাছির মত হুল ফুটায় না! বরং, গায়ের যেখানে বসে, সে যায়গায় শুড়শুড়ি লাগে! এমন মাছি যে নিরীহ না হইয়া, আমাদের সর্ব্বনাশকারী হইতে পারে, তাহা বোধ হয় কেহ ভাবিতেও পারেন না! কিন্তু, স্থির জানিবেন,—মাছির মত মানুষের শত্রু খুব কমই আছে! কারণ, ওলাউঠা, আমাশয়, টাইফয়েড্ জ্বর, চক্ষুরোগ, বসন্ত, কুষ্ঠ, Anthrax, কৃমি (এবং আফ্রিকার sleeping sickness ও দক্ষিণ আমেরিকার tropical sore) প্রভৃতি মারাত্মক ব্যারামগুলি মাছির সাহায্যেই ছড়াইয়া পড়ে!

মাছি অনেক জাতের আছে।—(১) ঘরোয়া-মাছি বা house fly (musca domestica), যাহারা সারাদিনই আমাদের বাড়ীর এখানে ওখানে ঘুরিয়া বেড়ায়। (২) নীলমাছি (blue bottle,or meat, or blow fly)। ইহাদের ঘ্রাণশক্তি খুবই প্রখর; অনেক দূর হইতে খাদ্যের গন্ধ পাইয়া, অল্পক্ষণের মধ্যেই ইহারা তথায় উপস্থিত হয়। পাড়াগাঁয়ের পায়খানায়, এবং বিশেষ করিয়া আম-কাঁঠালের সময়ে, ইহাদিগকে দেখিতে পাওয়া যায় (৩) মাংসীয়া মাছি।—ইহারা গরু-বাছুরের ক্ষতে ও নাকের মধ্যে ডিম পাড়ে। (৪) চিমড়া-মাছি (fleas)।—ইহারা বিড়াল কুকুর, ইন্দুর প্রভৃতির গায়ে বসিয়া, তাহাদেরই রক্ত পান করে। (৫) তেলিনী মাছি (beetle)।—স্পেনদেশীয় তেলিনী মাছির (cantharides) দেহরস গায়ে লাগিলে ফোস্কা পড়ে। (৬) গোদা-মাছি, বোধ হয় গার্হস্থ্য মাছির রাজ সংস্করণ, কাযেই বিরল। ইহাদের গঠন ও বর্ণ ঘরোয়া মাছিরই মত। (৭) খুদে-মাছি (fannia canicularis) আমেরিকায় পাওয়া যায়। [মৌমাছি, মাছি বর্গের মধ্যে গণ্য নহে।]

মাছিরা গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালের জীব—শীতকালে ইহাদিগকে খুব কমই দেখিতে পাওয়া যায়। বোধ হয়, গ্রীষ্ম ও বর্ষার সময়েই ইহারা ডিম পাড়ে।

জন্ম-কথা—যেখানে টাট্‌কা ও ভিজা ময়লা, সেখানেই মাছিরা থাকে; যেমন, তরকারী বা ফলের খোসা, পচা মাছ বা মাংস, গোবর, ভিজা আবর্জ্জনার স্তূপ, গোয়াল ঘর, আস্তাবল,—এই সব যায়গাতেই মাছির বেশী উৎপাত। মানুষের বাড়ীতে ও তাহার কাছে-কাছেই

সর্ব্বনেশে মাছি
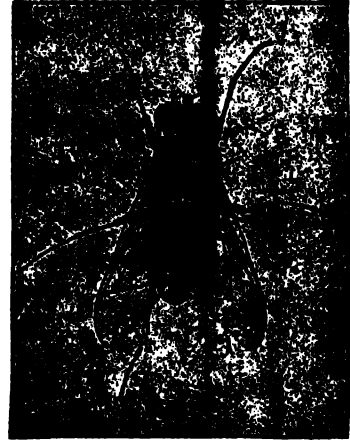
মাছিরা বাস করে। আঁস্তাকুড়, জঞ্জাল, গোবর, মানুষের, পক্ষীর, শূকরের ও ঘোড়ার বিষ্ঠা, পচা মাংস বা খারাপ-ঘা, পচা শাকসব্জী—এই সকল যায়গাতেই মাছিরা ডিম পাড়ে।

(ক) প্রত্যেক স্ত্রী-মাছি, এক একবারে, আশী হইতে দেড় শত মুক্তার-মত-সাদা ধব্‌ধবে, স্বচ্ছ, নরম, ডিম পাড়ে। আবর্জ্জনা কোথাও পড়িয়া থাকিলে, আপনা-আপনিই তাহা হইতে ঈষৎ উত্তাপ উৎপন্ন হয়। সেই অল্প-তাপই মাছির ডিম ফোটাইবার পক্ষে যথেষ্ট।

(খ) পাড়িবার আট হইতে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে, ডিম

ফুটিয়া, ছোট-ছোট, সুতার মত সরু, সাদা, তুলতুলে নরম, "কীড়া" বা শূক-কীট (larva) বাহির হয়। ইহাদিগকে সুতুলে গুবরে পোকা বলে। ঋতু, বায়ুর আর্দ্রতা ও পচনশীল বস্তুর উত্তাপের তারতম্য বশতঃই, ডিম ফুটিবার সময়ের তারতম্য লক্ষিত হয়। এই কীড়াগুলি রাক্ষুসে ক্ষুধা লইয়া জন্মায়—বিশ্বগ্রাস করিলেও তাহাদের তৃপ্তি হয় না। বিষ্ঠায় অজীর্ণ বহু খাদ্যকণা থাকে ;—আর, সেই খাইয়াই, কীড়াগুলি বড় হয় ;—তাহাদের মা ডিম প্রসব করিয়াই তাহাদিগের সঙ্গে চির জন্মের মত সম্বন্ধ ঘুচাইয়া উড়িয়া যায়। এই কীড়া-অবস্থাতে তাহারা ৩।৪ বার খোলস বদলায়। আট হইতে চৌদ্দ দিন এই কীড়া-অবস্থা ও অনবরত খাওয়া চলে ; মতান্তরে, ৪।৫ দিন।

(গ) এত খাওয়ার ও খোলস বদলের ফলে, তাহাদের দেহের পূর্ণ-পরিণতি ঘটে, দেহের আবরণ কঠিন হয়, এবং গাত্রবর্ণ ঘোলাটে হইয়া উঠে। তখন তাহারা নিরিবিলি যায়গা খোঁজে—এমন কি, মাটির নীচেও যায়। ইহার পরে, প্রজাপতির ন্যায়, গুটি (cocoon) প্রস্তুত করিয়া, মাটির নীচে বা পাথরের ফাঁকে, চার পাঁচ দিন ইহারা থাকে। এই অবস্থাকে শূক-কীটাবস্থা (pupa বা পুত্তলি অবস্থা) বলে।

(ঘ) এই অবস্থার শেষ ভাগে, দেহচর্ম্ম ভেদ করিয়া পূর্ণাবয়ব-মাছি বাহির হয়। তখনো তাহার দেহ নরম থাকে ও পাখা খোলে না। কিয়ৎক্ষণ হাওয়া লাগিলে, সবই ঠিক হয়। পূর্ণাবয়ব-মাছি জন্মিবার ৪।৫ দিন পরেই, ডিম প্রসবে সমর্থ হয়। অনেক কীট একবার ডিম পাড়িয়াই মরিয়া যায় ; কিন্তু, মাছি সারা গ্রীষ্মের মধ্যে, পাঁচ-ছয় বার ডিম পাড়িতে পারে। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে, একটা গ্রীষ্ম ঋতুতে, একটি মাত্র স্ত্রী মাছির পুত্র পৌত্রাদির সংখ্যা দাঁড়ায়—১৮,০০০,০০০,০০০ (এক হাজার আট শত কোটি)! আর ইহারা, প্রত্যেকটিই, এক-একটি মারাত্মক রোগের বাহন! জন্মস্থানের এক মাইল (কেহ, কেহ ৫।৬ মাইল) পরিধির মধ্যে মাছিরা অনায়াসে যাতায়াত করে।—তাহা হইলেই, লোকের বাসস্থানের কত দূরে ময়লা ফেলাইবার বা পুঁতিবার ব্যবস্থা করিতে হয়, তাহা বেশ বুঝা যাইতেছে।

তিনটি উপায়ে মাছিরা রোগ-বিস্তৃতি ঘটায় ; যথা :—

(১) মাছিদের পায়ে অসংখ্য শূঁয়া আছে [ছবি ২] কাযেই, যদি কলেরা-রোগীর বমন, ক্ষয়কাশ-রোগীর গয়ার বা কুষ্ঠ-রোগীর ক্ষতে বসিয়া, সেই মাছি কোনও খাবারে বসে, তবে, সেই খাবারে, মাছির

মাছির পা খুব বড় করিয়া দেখান

পায়ের শূঁয়া হইতে খসিয়া অসংখ্য ঐ ঐ রোগজীবাণু পড়ে। পরে, সেই খাবার যে যে ব্যবহার করে, তাহার তাহার ঐ ঐ রোগ ধরিবার কথা।

(২) মাছিরা দিনে ২০।৩০ বার মলত্যাগ করে। মাছিরা যে তরল খাবার তাহাদের শুঁড় দিয়া শোষিয়া খায়, সেই খাবারে যে যে রোগবীজাণু থাকে, সে রোগজীবাণুরা মাছির পেটের মধ্যে গিয়া মরিয়া যায় না—আট দিন পর্য্যন্ত তাহারা তথায় সতেজ থাকে। এক একটি মাছির পেটে দশলক্ষ জ্যান্ত রোগ-জীবাণু পাওয়া গিয়াছে। কাযেই মাছির মলের সঙ্গে জ্যান্ত রোগ-জীবাণুগুলি বাহির হয়। আর মাছির এমনই বদভ্যাস যে, যে খাবার খাইতে থাকে, তাহারই উপরে মলত্যাগ করিয়া যায়। মাছির মল অতীব ক্ষুদ্র কালো বিন্দুর মত দেখায়। সেটি লক্ষ্য না করিয়া, মাছির মলদুষ্ট খাবার খাইলেও রোগগ্রস্ত হইতে হয়।

(৩) মাছি যখন কোনও কঠিন খাবারে বসে, তখন সেই কঠিন খাদ্যটিকে নরম করিবার জন্য, তাহার উপরে এক ফোঁটা লালা বমন করে [ছবি ৩]। মাছি যে যে

নোংরা খাদ্যে বসিয়াছিল, লালার সঙ্গে সেই সেই নোংরা খাদ্যও উক্ত কঠিন দ্রব্যে লাগিয়া যায়। কাযেই, সেই কঠিন খাদ্যটি খাইলে, অজ্ঞাতে মাছির লালা-স্থিত বহু রোগ-জীবাণুও ভক্ষণ করা হয়। কাযেই পীড়া জন্মায়।

মাছির নৈসর্গিক শত্রু কে?—শতপদী, বিছা, টিকটিকি, ব্যাং, মাকড়সা, পাখী,* বোলতা, Robber fly, মোরগ,* পিঁপড়া*। আমেরিকায় House fly fungus (Empusa) seen in Aug. to Oct., enters the breathing organs of and kills flies (মড়ক ঘটায়)। [* চিহ্নিত গুলি ধাড়ী মাছি খায় না, মাছির ডিম বা বাচ্ছা খায়।]

মাছি নিবারণের উপায়—"মশা মারিতে কামান পাতা!"
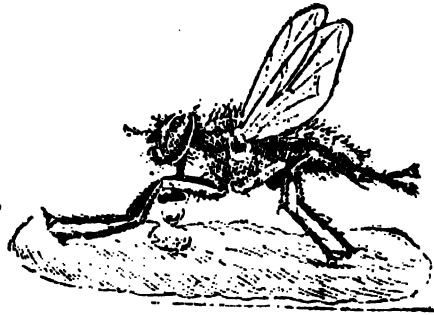
খাবারের উপরে মাছি লালা বমন করিতেছে

(১) আবর্জ্জনা ঢাকিয়া রাখিয়া, দিনান্তে পোড়াইবে; বা, গভীর গর্ত্ত করিয়া, পুঁতিবে। ক্ষণিক আবর্জ্জনা রক্ষণের ও স্থানান্তরিত করিবার জন্ম যে যে পাত্র ব্যবহৃত হইবে, তাহা ঢাকিয়া রাখিতে হইবে। এবং মধ্যে মধ্যে তাহাদের গায়ে আলকাতরা মাখাইবে বা ফিনাইল দিয়া ধুইবে। Dustbinগুলি ঢাকনীযুক্ত হওয়া চাই; এবং প্রত্যেকবার ময়লা ফেলিবার পরে, তাহার ঢাকনী চাপা দেওয়া চাই। মাঝে মাঝে, ডাষ্টবিনে সোহাগা বা ব্লীচিং পাউডার ছড়ান উচিত। এদেশে, গৃহস্থ যখন তখন যেমন-তেমন ময়লা রাস্তায় ছুড়িয়া ফেলেন; এবং সরকারী dustbin, ময়লা-ফেলা গাড়ী ও মেথরের বালতির অধিকাংশ স্থলেই কোনও ঢাক্‌নী থাকেই না! [গৃহস্থরা,—বাড়ীর ময়লাগুলির উপরে উনানের ছাই ছড়াইয়া, পরে কাগজে মুড়িয়া, যদি রাস্তার নির্দ্দিষ্ট স্থানে ফেলেন বা পুঁতিয়া বা পোড়াইয়া ফেলেন, ত খুবই ভাল হয়। ডাষ্টবিনে সরকারের ত্রুটি পাইলেই জানাইবেন।]

(ক) কলিকাতায়—dustbinগুলির প্রায়ই ঢাক্‌নী থাকে না। যদিও থাকে, তাহা হইলে, কোনও গৃহস্থবাড়ীর লোক যদি একবার তাহা খোলে, তবে জাতি যাইবার ভয়ে, অপর কেহই তাহা বন্ধ করেন না। বন্ধ করা দূরের কথা—দূর হইতে ডাষ্টবিনে ময়লা ছুড়িয়া ফেলেন—পাছে জাতি যায়! তাহার ফলে, চারিদিকে ময়লা ছিটাইয়া পড়ে। মিউনিসিপ্যালিটিও এক-একস্থানে এমন মাপে-ছোট বা কমসংখ্যায় dustbin বসান, যে ময়লা উপছাইয়া পড়া ছাড়া সেখানে উপায় থাকে না!!!

(খ) ময়লা-ফেলার ঘোড়ার, গোরুর ও রেলের গাড়ি, ও-ময়লা বোঝাই করিবার platfomগুলি যেমন সর্ব্বদাই অনাবৃত তেমনি নোংরার আড্ডা। ঐ গাড়ীগুলি ধোয়া বা ঝাড়া হয় না এবং ধাঙ্গড়রা অবাধে ময়লার গাড়ী হইতে platfomএ ন্যাকড়া প্রভৃতি বাছে, শুকায় ও জড় করিয়া রাখে। রেল গাড়ির উপরে ত্রিপল (tarpaulin) যোগান দিলেও উপিয়া যায়!!!

(২) খাদ্যদ্রব্য ও পানীয়—কখনো এক সেকেণ্ডের জন্য অনাবৃত রাখিবেন না। যে খাদ্যদ্রব্যগুলি ধোয়া যায় না (যেমন মিষ্টান্ন, মিছরি, চিনি, গুড়, মুড়ি, বাতাসা, খৈ ইত্যাদি) সেগুলি পরিষ্কার কাচের বা জাল দেওয়া আলমারির মধ্যে রাখিতে হয়। এই খাদ্যগুলি ক্রয়-কালীন দেখিতে হইবে যে, পরিষ্কার অবস্থায় তাহারা প্রস্তুত ও রক্ষিত হয় কিনা; তাহা না হইলে, ঐ গুলি পরিত্যাজ্য—বিশেষ করিয়া ব্যারামের প্রকোপ সময়ে।

(৩) অপরিষ্কার বা ক্ষতযুক্ত শিশুদিগকে খোলা যায়গায় শোয়াইবেন না; কারণ, তাহাদের কাণে, নাকে ও ক্ষতে মাছিরা ডিম পাড়ে। ঘায়ের পোকাই মাছির কীড়া!

(৪) মাছি নির্ম্মূল করিবার জন্য—

(ক) মাছি জন্মাইতে পারে—এমন এতটুকু আবর্জ্জনা বাড়ীর ভিতরে বা বাহিরে রাখিবেন না।

(খ) যদি কোথাও আবর্জ্জনা থাকে—তবে তাহা পোড়াইবেন, বা তদুপরি সোহাগা ছড়াইবেন। সোহাগা

দ্বারা মাছির ডিম ও কীড়া নষ্ট হয়। (1 lb. borax to 16 cft. গোবর)

(গ) জাল-দেওয়া হাতার সাহায্যে মাছি মারিবেন—কখনো হাতে করিয়া নহে।

(ঘ) চিটাগুড় বা রঞ্জনচূর্ণ ও রেড়ীর তৈল মাখান কাগজ রাখিলে, তাহাতে মাছিরা আটকাইয়া যায়।

(ঙ) সমান ভাগ ফর্ম্মালীন+দুধ+চিনি মিশাইয়া, তাহাতে ব্লটিং কাগজ ভিজাইলে, তাহাতে মাছি জড়াইয়া যায়।

(চ) Pyrethrum (আকরকরা বচ) পুড়াইলে মাছিরা মরে।

(ছ) কলা, চিনি, গুড়, দুধ, সির্কা, বা মাখন চট্‌চটে কাগজে মাখাইলে, মাছি তাহাতে আটকাইয়া যায়।

(জ) Pot. cyanide Paris-green, Aniline dyes, Sol. arsenite, Pyridine—ইহারা সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে মাছি ধ্বংস করে। কিন্তু এগুলি তীব্র বিষ।

ফরাসী কথা-সাহিত্য

শ্রী ধীরেন্দ্রলাল ধর

গল্পই হ'চ্ছে ফরাসী সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ সম্পদ, গৌরবের সামগ্রী। ছোট গল্পের পরিচয় বিশ্বের বুকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ক'রে দেবার গৌরব ফরাসী সাহিত্যই সর্ব্বপ্রথম অর্জ্জন করে। কটিনেণ্টাল সাহিত্যে যখন ছোট গল্প ব'লে বিশেষ কিছুই ছিল না,—মধ্যযুগের ধর্ম্মপ্রবণদের নীতিকথা ও চারণ-কবিদের গাথাই যখন য়ুরোপের একমাত্র কথা-সাহিত্য ছিল, সে যুগে নিজ বৈশিষ্ট্য নিয়ে সর্ব্বপ্রথম দেখা দিয়েছিল ফরাসী সাহিত্যই।

সেটা হ'চ্ছে দ্বাদশ থেকে ষোড়শ শতাব্দীর কথা। সারা য়ুরোপে তখন সাহিত্য বল্‌তে "ফেব্‌লা" (নীতিকথা), 'লে' (গাথা) আর "এপিক্" কাব্যই বিশেষ প্রসিদ্ধ। সে যুগে চিঠিপত্র লেখা ও জ্ঞানগর্ভ আধ্যাত্মিক প্রবন্ধ রচনা ছাড়া গল্প বা রোম্যান্স যে গদ্যে লেখা যায় এ ধারণা য়ুরোপের শিক্ষিত জনসাধারণের ছিল না। সে যুগে কবিতারই মত অথচ কবিতা নয় এম্‌নি এক ভঙ্গীতে গল্প লেখা সর্ব্বপ্রথম সুরু কর্‌লো ফরাসী লেখকেরা। সে রচনাগুলিকে ঠিক কবিতা বলা যায় না, গদ্যও সেগুলি নয়। কিন্তু তারই মধ্য দিয়ে গল্পগুলি এম্‌নি ভাবে বলা হোত যে কবিতার চেয়ে সেগুলি পাঠকদের কাছে আরো প্রিয়তর হ'য়ে উঠ্‌লো। দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে চতুর্দ্দশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্য্যন্ত এই ধরণের লেখা উত্তরোত্তর ফ্রান্সে অধিকতর জনপ্রিয় হ'য়ে উঠ্‌লো। এই ধরণের গল্প বা গদ্যকাব্যের সর্ব্বপ্রথম স্রষ্টা হচ্ছেন প্রতিভাশালী লেখক "বার্ণিয়ার" (Bernier)। তিনি আজও অমর হ'য়ে আছেন ফরাসী সাহিত্যের সর্ব্বপ্রথম গল্পস্রষ্টা হিসাবে। এঁর Divided Horsecloth ফরাসী সাহিত্যের সর্ব্বপ্রথম সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গল্প। 'বার্ণিয়ারের' রচনায় প্রভাবান্বিত হ'য়ে সে যুগের খ্যাতনামা কবি "রুটেবাফ"ও (Rutebœuf) এই ধরণের গল্প-কবিতা লিখ্‌তে সুরু করেন। কিন্তু বার্ণিয়ারের মত গল্প লিখবার প্রতিভা তাঁর ছিল না তাই তাঁর গল্প জনপ্রিয় হ'য়ে উঠ্‌তে পারেনি,—কবি হিসাবেই ফরাসী সাহিত্যে তাঁর খ্যাতি হয়। তারপর আর বিশেষ উল্লেখযোগ্য কোনও নাম ফরাসী গল্প-কবিতার মধ্যে পাওয়া যায় না।

তারপর একেবারে চতুর্দ্দশ শতাব্দীর মধ্যভাগের কথা।

হঠাৎ গদ্য-কবিতার অস্তিত্ব ফরাসী সাহিত্য থেকে লুপ্ত হ'য়ে গেলো একেবারে আকস্মিক ভাবে। চারণ-কবিরাই ফরাসী সাহিত্যের প্রাণ ছিল; জমিদারগণের আনুকূল্যের অভাবে তাদের সংখ্যা এযুগে ক্রমে ক্রমে বিলুপ্ত হ'য়ে আসে, তারই ফলে গদ্য-কবিতার মধ্য দিয়ে যে সাহিত্য গ'ড়ে উঠ্-

ছিল তাও লুপ্ত হ'য়ে গ্যালো পূর্ণবিকাশ লাভ কর্‌বার আগেই।

এই সময় একদল নবাগত চারণ-কবির আবির্ভাব হোল। ইটালি ও সিসিলি থেকে এরা এল ফ্রান্সে অর্থোপার্জ্জনের চেষ্টায়। গান গাওয়ার চেয়ে বাদ্যকর হিসাবেই এরা প্রসিদ্ধি অর্জ্জন কর্‌লো। তা ব'লে গাথা এরা যে একেবারেই গাইতো না এমন নয়, তবে যে গাথা এরা গাইত তা একেবারেই গদ্য, কবিতার লেশটুকুও তার মধ্যে নেই। ফরাসী দেশে গদ্য গল্পের ঢং এরাই প্রথম প্রবর্ত্তন কর্‌ল নিজেদের গদ্য-গাথাগুলির মধ্য দিয়ে। এরা জনপ্রিয় হ'য়ে উঠ্‌তেই এদের প্রভাব তদানীন্তন ফরাসী সাহিত্যে বিশেষ-ভাবেই উপলব্ধ হ'তে লাগ্‌লো। তারই ফলে সেকালের বিখ্যাত লেখক "বোকাক্‌সিও" (Boccaccio) এই নতুন ধরণে গল্প লিখ্‌তে সুরু কর্‌লেন। তাঁর দলভুক্ত যে ক'জন লেখক ছিলেন তাঁরাও তাঁর প্রদর্শিত পন্থা অনুসরণ কর্‌লেন। ফলে ফরাসী সাহিত্যের একটি বিশেষ দিক সৃষ্ট হোল এবং তা বিকাশলাভের পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হোল বোকাক্‌সিওর দলবদ্ধ চেষ্টায়।

—এই ভাবেই সর্ব্বপ্রথম গদ্য কথা-সাহিত্যের সৃষ্টি।

তারপর আর একদলের ঘট্‌লো অভ্যুত্থান। এটি ষোড়শ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ কথাশিল্পী "রাবেলায়"-এর (Rabelais) দল। মার্গারেট দ্য ন্যাভার্ (Marguerite de Navarre), অন্তইন দ্য সেন্তার্ (Antoine de Centre), নোল্ দু ফেল্ (Noel du Fail), বোনাভেন্তার্ দ্য পেরিয়ার (Banaventure des Periers), বেরোল্ড্ দ্য ভারবিল্ (Beroalde de Verville) প্রভৃতি তদানীন্তন শ্রেষ্ঠ লেখকদের—এই দলভুক্তদের মধ্যে ফেলা যায়। আধুনিক লেখকদের মত সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টি এঁদের না থাক্‌লেও সংস্কার-বর্জ্জিত সৃষ্টি এঁদের ছিল। বড়ঘরের আর রাজরাজড়ার কাহিনী ছাড়াও মধ্যবিত্ত ও সাধারণ গৃহস্থ-সংসারের বিষয়বস্তু নিয়েও যে গল্প হয়—এই ভাব ফরাসী সাহিত্যে এঁরাই প্রথম প্রবর্ত্তনের চেষ্টা করেন। শুধু এই নয়, কতকগুলি দূষণীয় রীতিনীতিকে শোধিত কর্‌বার জন্য এঁরা তদানীন্তন সমাজকেও আক্রমণ কর্‌তে ছাড়েননি। আচারে-ব্যবহারে শিক্ষাদীক্ষায় এঁদের উন্নত আদর্শবাদ এঁরা প্রচার কর্‌তে চেষ্টা করেন সাহিত্যের মধ্য দিয়ে। আংশিক ভাবে সফলকামও হয়েছিলেন এঁরা এঁদের গল্পের অধিকতর জনপ্রিয়তায়।

তারপর সপ্তদশ শতাব্দীর সুরু।

এযুগে দু'জন শ্রেষ্ঠ গাল্পিক জন্মগ্রহণ করেন—এঁরা হচ্ছেন "লা ফন্টেন্" (La Fontaine) ও "চার্লস্ পেরাল্ট্" (Charles Parrault)। 'রূপকথা' বল্‌তে যা বোঝায় এঁরা দু'জন সেই ধরণের লেখায় ছিলেন সিদ্ধহস্ত। ইতি-পূর্ব্বে এ ধরণের গল্প ফরাসী সাহিত্যে ছিল না। এঁদের পরবর্ত্তী যুগে, এমন কি অতি-আধুনিক লেখকদের অল্পসংখ্যক ক'জন ছাড়া রূপকথা-সাহিত্যে এঁরা অতুলনীয়। কিন্তু এযুগে রূপকথা সাহিত্য বিশেষ জনপ্রিয় হ'য়ে উঠ্‌তে পারেনি, কেননা রূপকথার সঙ্গে নাটকীয় সাহিত্যের সংঘাত ঘট্‌লো এই যুগেই। নাটকীয় সাহিত্যের রোম্যান্টিক প্রেমের উদ্দীপনা, রাজরাজড়াদের পোষাক-পরিচ্ছদের আড়ম্বর—মধ্যবিত্তদের সুখদুঃখের কাহিনী থেকে দর্শকদের নাটকের দিকে আকৃষ্ট ক'রে তুল্‌লো। নাটকের জনপ্রিয়তা দেখে কয়েকজন প্রতিভাসম্পন্ন কথাশিল্পী রূপকথা লেখা ছেড়ে দিয়ে নাটকের প্রতিই ঝুঁকে পড়্‌লেন। তাঁদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন—"দ্য এল্‌ক্রিপ্" (D' Alcripe), "তল্লেমেন্ত" (Tallement), "ক্যামাস্" (Camus) ও "শোরেল" (Sorel)। নাটকীয় প্রতিকূলতার জন্যই সপ্তদশ শতাব্দীতে "ফন্টেন্" ও "পেরাল্ট" প্রবর্ত্তিত ছোট গল্পের ধারা বিশেষ-ভাবে বিকাশ লাভ ক'রে উঠ্‌তে পারেনি, এবং কখনো পার্‌তও না যদি না অষ্টাদশ শতাব্দীতে "ভল্টেয়ারের" (Voltaire) মত লেখক লেখনী ধারণ না কর্‌তেন।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে নীতিকথা ও আধ্যাত্মিকতার বাহুল্য প্রকাশ পেল ছোট গল্পের মধ্যে। ভল্টেয়ারই সেযুগে এই ধরণের লেখার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্রষ্টা ছিলেন। আর শুধু স্রষ্টা বল্‌লেই হবে না, এই ধরণের নীতিমূলক গল্প সুচিন্তিত ধীর ভাবধারার মধ্য দিয়ে প্রকাশ কর্‌তে তিনি ছিলেন অদ্বিতীয়,—অন্যান্য লেখকের উপরও তাঁর প্রভাব ছিল অনতিক্রমণীয়। "মার্মন্টেল"ও (Marmontel) যদিচ ভল্টেয়ারের প্রভাব থেকে নিজেকে মুক্ত ক'রে নিতে পারেননি তা হ'লেও

ভল্টেয়ার ও তাঁর প্রকাশভঙ্গীর মধ্যে অল্পবিস্তর পার্থক্য ছিল। ভল্টেয়ারের প্রকাশভঙ্গীতে ছিল ধীর ভাবধারার বিকাশ আর মার্মোণ্টেলের রচনার মধ্যে ছিল উচ্ছৃঙ্খল ভাববিহ্বলতা। তা হোক্, আসলে কিন্তু মার্মোণ্টেল ভল্টেয়ার-প্রবর্ত্তিত ধারাটিকেই ক্রমবিকাশের পথে প্রসারিত ক'রে দেন।

ভল্টেয়ারের ধারা কিন্তু স্থায়িত্ব লাভ করতে পার্‌লো না, জার্ম্মেন ও ইংরাজ সাহিত্যের প্রভাব এসে পড়্‌লো ফরাসী সাহিত্যের উপর। কোথা দিয়ে কি একটা যে পরিবর্ত্তন ঘ'টে গ্যালো, এম্‌নি আকস্মিক ভাবেই সেটা ঘট্‌লো যে তদানীন্তন লেখকেরা যখন সেটা অনুভব করতে পার্‌লেন তখন সে পরিবর্ত্তনের স্রোতে না ভেসে আর থাকা চলে না। দুটি লেখক এই পরিবর্ত্তন ঘটিয়েছিলেন, তাঁরা হচ্ছেন 'গেরার্ড দ্য নার্ভেল" (Gerard de Nerval) ও "আল্‌ফ্রড্‌ দ্য মাস্‌ট্" (Alfred de Musset)।

—এই পরিবর্ত্তন ঘটে উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে।

এই নতুন ধারার মূল কথা হ'চ্ছে গল্প শুধু গল্পই—তার মধ্যে নীতিকথা ও আধ্যাত্মিকতার প্রচার না করলেও তার সৌন্দর্য্যের বিশেষ হানি হয় না, পাঠককে একটুখানি আনন্দ যোগাতে সুখদুঃখের সাধারণ ছবি চিত্রিত ক'রেই গল্পের সার্থকতা। গল্পসাহিত্যের যে পারমার্থিক কিছু উদ্দেশ্য না থাক্‌লেও চলে, দেবত্বের সঙ্গে চরিত্রের পশুত্বও যে গল্পসাহিত্যের গৌরব বৃদ্ধি করা ছাড়া হানি করে না একটুও—এই মতবাদ সাফল্যের মর্য্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হয় ব্যাল্‌জাকের (Balzac) সাহিত্যে। ইনি যে ছাঁচে গল্পসাহিত্যের ধারাকে মূর্ত্তি দিলেন তা'ই এঁর পরবর্ত্তী লেখকদের লেখনীতে—"আনাতোল্ ফ্রাঁস্" (Anatole France), "দোদে" (Daudet) 'কপ্পি" (Coppee), মোপাসাঁ (Maupassant) প্রভৃতি গাল্পিক-শ্রেষ্ঠদের রচনা-গৌরবে সমৃদ্ধ হ'য়ে উঠে। এঁদের লেখনীর মুখে যে সকল গল্প রচিত হয়েছিল আজও তা বিশ্বসাহিত্যের বুকে ফ্রান্সের গৌরব বহন করে। এমন চমৎকার গল্প এত অধিকসংখ্যক অর্জ্জন করবার সৌভাগ্য অন্য কোন দেশের হয় নাই শুধু চমৎকার বল্‌লেই হয় না, ভাষা ও প্রকাশভঙ্গীর এম্‌নি একটা মিষ্টি ঢং আছে, যার সৌন্দর্য্যকে অতি-আধুনিক খ্যাতনামা গাল্পিকেরাও ছাড়িয়ে উঠ্‌তে পারেন নি,—তাঁরা তাঁদের এই বৈশিষ্ট্যগুলির জন্য আজও পাঠকদের কাছে নতুন! মোপাসাঁ, ব্যালজাক্ প্রভৃতি প্রবর্ত্তিত ধারার আজও বিশেষ পরিবর্ত্তন হয় নি ফরাসী সাহিত্যে। মহাযুদ্ধের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত এই ধারাই চিরাচরিত প্রথার মত পুষ্টিলাভ করছিল। তারপর একটা নব ভাবের আভাষ পাওয়া গেছে বটে কিন্তু সে সম্বন্ধে এ প্রবন্ধে কোন আলোচনা করবার সুযোগ হবে না।

এবার কয়েকজন বিখ্যাতনামা লেখকের পরিচয় দিতে চেষ্টা করবো।—

"বার্গিয়ার" সম্বন্ধে বিশেষ কিছু পরিচয় দেবার সুবিধা হোল না। এর নামটুকু শুধু জানা যায় কয়েকটি গল্পের নাচে এঁর নাম স্বাক্ষর দেখে। ত্রয়োদশ শতাব্দীর ফরাসী গল্প-সাহিত্যে ইনি যে অপ্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন সে সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হওয়া যায় তখনকার রচনার সঙ্গে এঁর গল্পের তুলনা করলেই। এঁর ষ্টাইল্ সরল ও স্বচ্ছ এবং অধিকাংশ গল্পের বিষয়বস্তু রাজপরিবার বা সভাসদ্‌গণের জীবনী হ'তে গৃহীত। এঁর বিখ্যাত গল্পের নাম আমরা পূর্ব্বেই করেছি।

*

তারপরই "রাবেলার"এর নাম উল্লেখযোগ্য। এঁর জন্মতারিখ ঠিক পাওয়া যায় না, চোদ্দ-শো-নব্বুই থেকে পনেরো-শোর মধ্যে ইনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন বলেই জানা যায় শুধু। এঁর পিতামাতা এঁকে ডাক্তার ক'রে তোল্‌বার জন্য ব্যাকুল হ'য়ে উঠেন, এবং এঁকে 'মণ্টপেলার' সহরে পাঠান ডাক্তারী শিক্ষার জন্য—তারপর পাঠান 'লিয়নে'। 'লিয়নে' ইনি ভবিষ্যতে ডাক্তারী প্র্যাক্‌টিস্ করতে সুরু করেন কিন্তু পসার বিশেষ ভাবে না জমায় অবসর-সময়ে সুরু করলেন লিখ্‌তে—যদিও জীবনের নানা বিপর্য্যয়ে ধারা-বাহিক ভাবে সাহিত্যচর্চ্চা করবার সুযোগ এঁর হয়নি। শেষজীবনে ইনি ধর্ম্মযাজক হন, কিন্তু সে কিছু দিনের জন্য মাত্র। পনেরো-শো-তিপ্পান্ন খৃষ্টাব্দে এর মৃত্যু হয়। এঁর রচনার মধ্যে পাণ্ডিত্যের আভাষ আছে, আর জীবনের উপর

সহানুভূতির চেয়ে উচ্ছ্বসিত প্রশংসাই আছে যথেষ্ট। ফরাসী কথা-সাহিত্যে ইনি একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার ক'রে আছেন।

*

অনুভূতি-সৃষ্টির দিক থেকে দেখ্‌তে গেলে ষোড়শ শতাব্দীতে "মার্গারেট্ দ্য স্তাভার্"এর লেখাই শ্রেষ্ঠ। ইনি 'স্তাভার'-রাজের দ্বিতীয়া স্ত্রী এবং পরাক্রান্ত ফরাসী নরপতি চতুর্থ হেন্‌রীর মাতামহী। শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে এঁর পাণ্ডিত্য তো ছিলই, তার চেয়েও বেশী ছিল এঁর রাজনৈতিক প্রতিভা। লেখিকা হিসাবেও ফরাসী সাহিত্যে এঁর বিশেষ জনপ্রিয়তা ছিল। কবিতা ও গল্প—দুইই ইনি লিখ্‌তেন বটে কিন্তু এঁর গল্পই বিশেষ জনপ্রিয়,কেন না আচার-ব্যবহার রীতিনীতি প্রভৃতিকে সংশোধিত কর্‌বার জন্য ইনি তদানীন্তন সমাজকে বিশেষ ভাবেই আক্রমণ করেছিলেন এঁর গল্পের মধ্যে। জীবনের উপর ছিল এঁর বিচক্ষণ অন্তর্দৃষ্টি আর প্রকৃতির উপর ছিল এঁর নিগূঢ় ভালোবাসা। আচার ব্যবহার শিক্ষা সম্বন্ধেও এঁর একখানি বই আছে, যেখানি ফরাসী জনসাধারণ আজও আগ্রহ সহকারে পড়ে।

*

চতুর্দ্দশ লুই-এর রাজত্বকালীন শ্রেষ্ঠ লেখকদের মধ্যে চার্লস্ পেরল্ট্ অন্যতম। শুধু লেখক হিসাবেই ইনি অগ্রণী ছিলেন না, পাণ্ডিত্যে ও সরকারী কাজকর্ম্মেও ইনি বিশেষ প্রতিভার পরিচয় দেন। এঁরই সময়ে প্রাচীনপন্থী ও নব্যপন্থী লেখকদের মধ্যে একটা বিরোধ বাধে। নব্যপন্থীদের পক্ষ নিয়েই ইনি এ বিসম্বাদে যোগ দেন এবং শেষ পর্য্যন্ত নব্যপন্থীর অন্যতম হিসাবে নিজেকে পরিচিত করেন। রূপকথা রচনায় ছিল এঁর অসামান্য অধিকার, এবং জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত রূপকথাই ইনি রচনা ক'রে গেছেন বিশেষ ভাবে। রূপ-কল্পনা ভরা এই ধরণীর বুক থেকে ইনি বিদায় নিয়েছেন সতেরো-শো-তিন খৃষ্টাব্দে পঁচাত্তর বছর বয়সে।

*

"জিন্ দ্য লা ফন্তেন"ও পেরল্টের সমসাময়িক যুগের লোক। স্যাটু থ্যেরীতে ষোল-শো-একুশ খৃষ্টাব্দে এঁর জন্ম। প্যারিসে ইনি শিক্ষা লাভ করেন, এবং বিশ্‌বিদ্যালয়ের ডিগ্রি নিয়ে ছাব্বিশ বছর বয়সে শাসন সংক্রান্ত কার্য্যে নিযুক্ত হন। কিন্তু কাজ করা এঁর পক্ষে সুবিধাজনক হোল না; অর্থশালী বন্ধুদের অর্থানুকূল্যে ইনি কাজকর্ম্ম ছেড়ে দিয়ে সুরু কর্‌লেন লিখ্‌তে। নীতিকথা ইনি লেখেন অনেক, তবে রোম্যাণ্টিক নাটকের জন্যই এঁর খ্যাতি হয় বেশী। শেষ জীবনে ইনি ফরাসী বিদ্যাপীঠের সভ্য নির্ব্বাচিত হন। জগতের বুক থেকে ইনি বিদায় নেন ষোল শো পঁচানব্বই সালে।

*

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন লেখক ছিলেন "ভল্টেয়ার"। ষোল-শো চুরানব্বই সালে প্যারী'তে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। সেখানকারই একটি স্কুলে এঁর পড়াশুনা সুরু হয়। কিশোর বয়স থেকেই ইনি কবিতা লেখেন। এঁর পিতা কিন্তু এসব পছন্দ কর্‌তেন না, তাঁর ইচ্ছা ছিল ভল্টেয়ার যেন আইনজীবী হন। কিন্তু ভল্টেয়ার ছাত্রাবস্থাতেই এম্‌নি সব লিখ্‌তে সুরু কর্‌লেন যার জন্য তাঁকে কারাবরণও কর্‌তে হোল কয়েকবার। শেষে দেশান্তরে পলায়ন করেন। ফ্রান্সের বাইরেই এঁর জীবনের অধিকাংশ দিন কেটে যায়। প্রায় অর্দ্ধশতাব্দী ধ'রে ইনি শুধু ফরাসী নয় য়ুরোপীয় সাহিত্যের উপর অনতিক্রমণীয় প্রভাব বিস্তার করেন। এঁর প্রতিভা ছিল বহুমুখী—নাটক, ইতিহাস, খণ্ডরচনা, ছোট গল্প ও বিদ্রূপাত্মক রচনা সব কিছুতেই ইনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত। এঁর বিদ্রূপাত্মক গল্প ও সুচিন্তিত প্রবন্ধের জন্যই ফরাসী-বিপ্লব বিশেষ ভাবে বিস্তৃতিলাভ করেছিল—এঁর রচনা পড়্‌লে 'বুর্জ্জোয়া'রা ক্রুদ্ধ না হ'য়ে পার্‌তো না। সতেরো-শো উনআশী খৃষ্টাব্দে পঁচাশী বছর বয়সে ইনি পরলোক গমন করেন।

*

খুব অল্প বয়সেই মার্মন্তেল জনসাধারণের কাছ থেকে খ্যাতিলাভ করেন—তখন ইনি বয়সে বালক মাত্র। কয়েকটি কবিতা-প্রতিযোগিতায় অত অল্প বয়সেই ইনি জয়লাভ করেন। তার ফলে ভল্টেয়ারের দৃষ্টি পড়ে এঁর উপর এবং ভল্টেয়ারেরই চেষ্টায় প্যারি'তে উচ্চ পদে ইনি নিযুক্ত হন এবং ফরাসী বিপ্লবের প্রারম্ভ পর্য্যন্ত সেই পদেই সুখে কালাতিপাত করেন। নাটক, কবিতা, রোম্যান্স, গল্প ও সাহিত্য-সমালোচনায় ছিল এঁর অসামান্য প্রতিভা। ধনীদের

অর্থানুকূল্যে অর্থচিন্তার হাত থেকে ইনি পরিত্রাণ পান এবং নিছক সাহিত্যচর্চ্চার দিকে মনোনিবেশ করবার এঁর সুবিধা হয়। সে যুগের করুণ বিয়োগান্ত গল্প-সৃষ্টিতেই ছিল এঁর খ্যাতি। এঁর প্রভাবে অষ্টাদশ শতাব্দীর অধিকাংশ লেখকেরা বিয়োগান্ত গল্প লিখতে সুরু করেন। সতেরো-শো-নিরনব্বই সাল পর্য্যন্ত ইনি জীবিত ছিলেন।

*

জীবনের বিভিন্ন দুঃখদারিদ্র্যের সঙ্গে ব্যালজাকের পরিচয় ছিল বাল্যকাল থেকেই। এঁকে জীবনধারণের চেষ্টায় এক কাজ থেকে অন্য কাজে ঘুরতে হয়—দুঃখ কষ্ট দারিদ্র্যের পেষণে ইনি জীবনটিকে বিশেষ করুণভাবেই উপলব্ধি করেন। শেষে ইনি প্যারি'তে পুস্তক প্রকাশকের দোকান করেন কিন্তু তাও টিকলো না। হাতে সঞ্চয় কিছু না থাকায় লেখাই তখন থেকে এঁর জীবনধারণের একমাত্র পন্থা হোল। ফলে ইনি বিশেষ যত্ন সহকারে গল্প লিখতে সুরু করলেন। ভবিষ্যৎ জীবনে শ্রেষ্ঠ গল্পলেখক হিসাবে জগতের বুকে এঁর খ্যাতি হয়। এঁর গল্পগুলির মধ্যে একটা নতুন ঢং ও ধারা ছিল, তার উপর ছিল সত্যিকারের ছোট গল্প বলতে যা বোঝায় সেই গুণগুলি।—এঁর উপর এঁর পূর্ব্ববর্ত্তী যুগের কোন লেখকের রচনার প্রভাব দেখা যায় না একটুও—এইটিই হ'চ্ছে এঁর রচনার অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

*

উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে "আলফঁস্ দোদে" শক্তিমান লেখক হিসাবে খ্যাতিলাভ করেন। এঁর রচনার বৈশিষ্ট্য হ'চ্ছে স্বাভাবিকতা,—কল্পনাকে ইনি কখনো অবাস্তবের পর্য্যায়ে তুলে গল্পের অমর্য্যাদা করেননি। আঠারো বছর বয়স থেকে ইনি লিখতে সুরু করেন এবং অন্যান্য খ্যাতনামা ফরাসী লেখকদের মত ইনি প্রথম যুগে কবিতাই লেখেন। তারপর লেখেন ছোটগল্প, শেষে উপন্যাস। অতি-করুণতার একটি ফল্গুধারা এঁর গল্পের অন্তর দিয়ে প্রবাহিত হয়;—পাঠক-চিত্তের উপর এই জন্যই এঁর গল্পের একটি অপ্রতিহত প্রভাব আছে। আঠারো-শো-চল্লিশ খৃষ্টাব্দ থেকে আঠারো-শো-সাতানব্বই খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ইনি জীবিত ছিলেন।

এমিল জোলা-ও ছিলেন একজন অনন্যসাধারণ লেখক। চমৎকার গল্প এবং কবিতা ইনি এত অধিক-সংখ্যক লিখেছেন যা অন্য কোনও ফরাসী লেখক লিখেছেন কিনা সন্দেহ। অবিশ্রামভাবে ইনি লিখতে পারতেন। 'দোদের' মত স্বাভাবিকতাই ছিল এঁর গল্পের প্রাণ—যা সাধারণতঃ ঘটে ও নিত্য যা ঘটছে তাই নিয়েই ইনি গল্প লিখতেন, কল্পনা সবসময়েই ছিল এর সংযত-রশ্মি। এঁর গল্পের অনুভূতি ছিল বিয়োগান্ত এবং ক্রম পরিণতি ছিল অনাড়ম্বর। অনেক সময় ইনি উপকথাও লিখতেন।

*

ফ্রাঙ্কো কপ্পি দারিদ্র্যের পেষণে যারা সর্ব্বহারা তাদেরই কাব্য লিখে গ্যাছেন। সর্ব্বহারাদের রিক্ততাকে ইনি যেন প্রাণ দিয়ে অনুভব করতেন, তাঁর কাব্যে তাই সেই ব্যথাবেদনা বিশেষভাবে ফুটে উঠেছে। কিন্তু কাব্যের চেয়েও এঁর ছোট গল্পের স্থান অনেক উচ্চে। এঁর জীবনে বিশেষ উল্লেখযোগ্য কিছু ঘটে নি।

*

গী দ্য মোপাসাঁ শত শত ছোট গল্প লিখেছেন। ইনি গল্প-সাহিত্যকে একটা নতুন ভাবে রূপ দেবার চেষ্টা করেছেন—যে রূপ বিংশ শতাব্দীর একটা বৈশিষ্ট্য। এঁর রচনার মধ্যে একটা অশ্লীলতার ইঙ্গিত পাওয়া কিন্তু গল্পের সৃষ্টিগৌরবের দিক থেকে সে ত্রুটি সামান্যই। এঁর রচনায় গল্পই এঁকে জগতে চিরস্মরণীয় ক'রে রাখবে। ইনি মাত্র তেতাল্লিশ বছর জীবিত ছিলেন; এঁর অকালমৃত্যু ফরাসী গল্পসাহিত্যের পক্ষে বিশেষ ক্ষতিকর হয়েছে।

*

আনাতোল ফ্রাঁস্‌এর জন্ম প্যারি'তে—আমরণ পর্য্যন্ত ইনি প্যারি'তেই ছিলেন। এঁর যথেষ্ট পাণ্ডিত্য-গৌরব ছিল। এঁর লেখার মধ্যেকার কথা হ'চ্ছে মানবজীবনের নৈতিক অবনতি যা ফ্রান্সের বুকে বিশেষ ভাবেই বিস্তৃতি লাভ করেছিল যুগবিবর্ত্তনের প্রভাবে। উনিশ-শো-একুশ সালে ইনি পৃথিবীর অন্যতম সাহিত্য-পুরস্কার "নোবেল প্রাইজ" পান। উনিশ শো-চব্বিশ সালে ইনি ধরিত্রীর বুক থেকে বিদায় লন।

এঁর পরবর্ত্তী লেখকদের পরিচয় দেওয়া এখানে সম্ভব হোল না, তা'ব'লে তাঁদের শক্তিকে আমরা অস্বীকার করছি না।

উদয়পুরে তিন দিন

শ্রী মৃণ্ময়ী রায়

মানবের ভাগ্যবিধাতা অবোধারূপে বস্তু-বিচার করেন! —তাই বালের অতি ক্ষীণ আশা যখন ফলপুষ্পে বিকশিত হ'য়ে ওঠে, অরূপের অপূর্ব্ব রূপ যখন চোখের সাম্‌নে অল্পে অল্পে ফুটে উঠ্‌তে থাকে, চিরসঞ্চিত আশা যখন সফল হবার উপক্রম হয়, তখনও চোখের জলে দৃষ্টিপথ রুদ্ধ হ'য়ে যায়—বেদনায় বক্ষ ভারাক্রান্ত হ'য়ে পড়ে।

যাব, আমার মনে হ'ল এই ঠিক যাত্রা। সেই গৌরবময় রাজপুতভূমি—অতীতস্মৃতি বক্ষে ধ'রে যা' শ্মশানভূমি হ'য়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে,—সেই জায়গাই ত আমার বেড়াবার উপযুক্ত স্থল।

মহাপঞ্চমীর স্নিগ্ধ সন্ধ্যায় দেবীর বোধন যখন শঙ্খরবে ঘরে ঘরে জেগে উঠ্‌ছে,—আমি তখন আমার পুত্র, দেবর ও
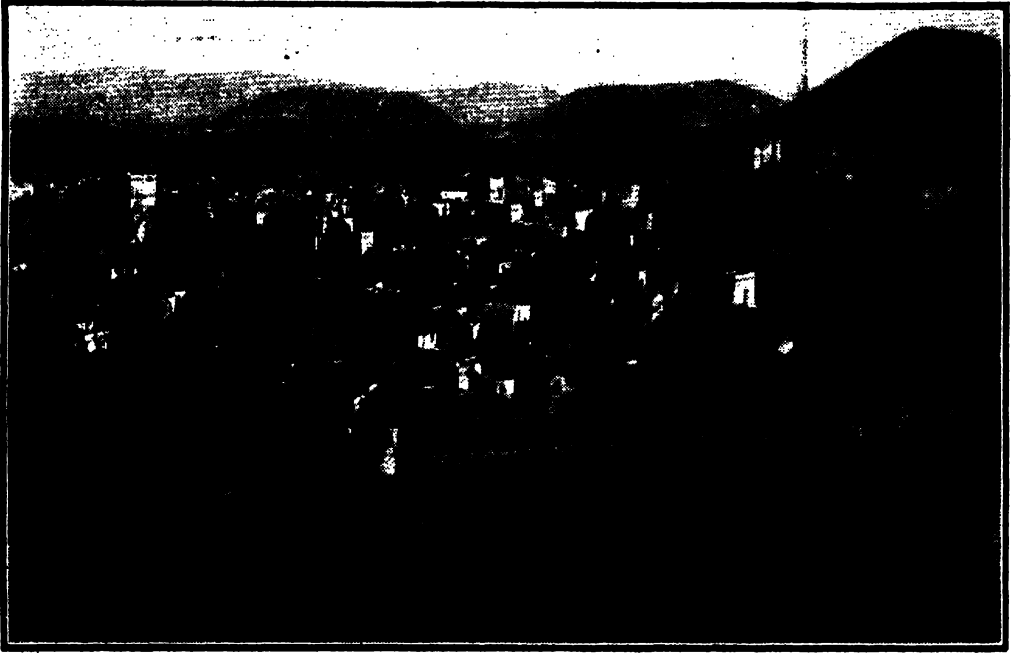
সাধারণ দৃশ্য—উদয়পুর

বেড়াবার সাধ মানুষের চিরদিনের,—কিন্তু এই সনাতন সাধ সময়-বিশেষে নেশার মত মানুষকে পেয়ে বসে। মৃত্যুর দূত যখন আমার ঘরের দ্বারে উপর্য্যুপরি হানা দিতে লাগ্‌ল —আর সেই আদেশ পালন কর্‌তে আমার প্রিয়তম প্রাণের ধনেরা একে একে অসীমের পথে যাত্রা কর্‌লেন, তখন ঘরে টেকা দায় হ'য়ে উঠ্‌ল,—ঘরের চাইতে বাইর আমাকে পাগল ক'রে তুল্‌ল। তাই শারদীয় পূজার ছুটী আস্‌বার পূর্ব্বেই আমার পুত্র যখন বল্লেন এবার আমরা রাজপুতানা ভ্রমণে

মাতৃদেবীকে নিয়ে সজল নয়নে হাওড়া ষ্টেশন থেকে "আগ্রা দিল্লী এক্সপ্রেসে" রাজপুতানার দিকে রওনা হ'লাম। আমার ও মাতৃদেবীর জন্যে একটি প্রথম শ্রেণীর কুপ রিজার্ভ করে-ছিলাম,—অ র আমার এক বন্ধুকন্যা ও পুত্র (তাঁরা কিষণগড়ে তাঁদের বাপের কাছে যাচ্ছিলেন). আমার দেবর ও পুত্র দ্বিতীয় শ্রেণীর একটা রিজার্ভ গাড়ীতে ছিলেন।

তারপর ক্রমান্বয়ে আগরা, জয়পুর ও আজমীর হ'য়ে আমার দেবর কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন কর্‌লেন; আর

আমি—আমার ভ্রাতা (তিনি আজমীরে আমাদের সঙ্গে এসে মিশেছিলেন), মাতৃদেবী, পুত্র ও একটি ভৃত্য নিয়ে চিতোরগড় দেখে উদয়পুরে রওনা হ'লুম।

বেলা ন'টায় উদয়পুরের প্রসিদ্ধ গিরিপথ দোবারী অতিক্রম কর্‌লুম। দোবারীর পর হঠাৎ গাড়ী গেল থেমে,—আর যাত্রীরা "আও, আও" ক'রে চীৎকার কর্‌তে সুরু কর্‌লেন! নিকটস্থ পাহাড় থেকে অগণ্য বানর ও সন্তানবক্ষে বানরীরা নেমে আস্‌ছিল—যাত্রীরা লাল আটার মোটা মোটা "পুরী" তাদের দিকে ছুড়ে দিতে লাগ্‌লেন। মিনিট পাঁচেক পরে পুনরায় ট্রেন চল্‌তে আরম্ভ করল। বেলা ১০॥ টা আন্দাজ আমরা উদয়পুর ষ্টেশনে পৌছলাম। আমার জ্যেষ্ঠভ্রাতা শ্রীযুক্ত প্রভাসচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় উদয়পুর রাজ্যের "দেওয়ান"। ষ্টেশনে তাঁর নিজস্ব মোটর গাড়ী নিয়ে আমার ভ্রাতুষ্পুত্র সুরেশ ও দাদার বাড়ীর সরকার দাঁড়িয়ে ছিলেন। এখানে সাধারণ যাত্রীদের যে সব অসুবিধা ভোগ কর্‌তে হয় সে-সবের কোন খবর বিশেষ দিতে পার্‌লাম না, কারণ আমি কোনই অসুবিধা বা জবা দিহির ভেতর পড়ি নি।

সহরের উঁচু নীচু রাজপথ দিয়ে মোটর ছুটল। প্রাচীন উদয়পুর চারদিকে প্রাচীরে ঘেরা,—তার পশ্চিমে পেশোলা হ্রদ, আর রাজপ্রাসাদের শ্রেণী। প্রাচীরের বাইরে পূর্ব্বদিকের সহরতলিতে পোষ্টাপিস্ ও উদয়পুর হোটেল, উত্তরদিকে রেসিডেন্সি। এইখানে দাদারও বাড়ীখানি সুরম্য ছবির মতো। উদয়পুর যে অপূর্ব্ব-সুন্দর,—দৃশ্য-শোভায় সুন্দরতম নগরী, সে সম্বন্ধে সম্ভবতঃ কোন মতভেদ নাই।

উদয়পুর সহরে শুনেছি "মিঠাপানি"র বড় কদর। কিন্তু দাদার বাড়ী জলের বড় স্বচ্ছলতা। উঁচু টিলার উপর বাড়ী,—চতুর্দ্দিকে বৈদ্যুতিক আলো সংযুক্ত করা। নীরব-স্তব্ধ চতুর্দ্দিক·· দূরে দূরে আরাবল্লী পর্ব্বতমালা যেন ধ্যান-মগ্ন ঋষির মতোই বসে' রয়েছে!

হ্রদ-প্রাসাদ—উদয়পুর

তাড়াতাড়ি আহারাদি সেরে আমরা নীলসলিলা পেশোলার তীরে উপস্থিত হ'লাম। পূর্ব্ব-তীর জুড়ে খুব একটা উঁচু জমির উপর প্রাসাদগুলি একেবারে জলের ধার ঘেঁসে গাঁথা হ'য়েছে। প্রাসাদের তোরণ 'বড়ী-পোল' উত্তর দিকে। পূর্ব্ব দিকে আর একটি তোরণ আছে। বড়ী-পোলের পর ঘোড়াশালা ইত্যাদি। সেখান থেকে "বড়ী-মহল" নামে প্রাচীন রাজপুরীতে গেলাম। প্রাসাদে

ঢুকবার পরই আমায় পুত্র এবং ভ্রাতুষ্পুত্রদের পদ বিনামা-শূন্য করতে ও মস্তকে একটি করে' উষ্ণীষ পরতে হয়েছিল ;—এই নাকি সেখানকার রীতি। প্রাসাদ দেখতে হ'লে পাস লাগে, তাও সব কিছু দেখতে দেয় না। তবে আমাদের কোন পাস লাগেনি, আর একান্ত অন্দর মহল ছাড়া আমরা সবকিছুই দেখতে পেলাম।

বিস্তীর্ণ রাজপ্রাসাদ কয়েকটি মহলে ভাগ করা। তাতে অপর্য্যাপ্ত ভাবে যতকিছু বিলাসিতার উপকরণ সংগ্রহ করা হয়েছে। উদয়পুর মহারাণার বর্ত্তমানের ব্যবহার্য্য একটি স্ফটিক পালঙ্ক দেখতে পেলাম।

এটির অন্দর-মহল পর্য্যন্ত দেখা গেল, কারণ মহারাণারা কেউ তখন সেখানে ছিলেন না।

তারপর 'ফতে সাগরের' পাশ দিয়ে গোলাপবাগ, উদয়পুরের চিড়িয়াখানা দেখে "খাসউকী" দেখতে গেলাম। পেশোলার পশ্চিম তীরে একটি ছোট অট্টালিকা পাহাড়ের উপর। দেখলাম সামনের পাহাড় থেকে পালে পালে শূকর নেমে আসছে,—অগণ্য, অসংখ্য। আর কিছুক্ষণ বাদে তাদের ভুট্টাদানা দেওয়া হ'তে লাগল,—সে এক বিরাট ব্যাপার! বন্যবরাহের বিকট গর্জ্জন—তার ঝুটোপুটিতে দিকমণ্ডল ধূম্রাকার হ'য়ে উঠল! শুনলাম ভূতপূর্ব্ব কোন

হ্রদ থেকে রাজপ্রাসাদের দৃশ্য—উদয়পুর

একটি মহল সম্পূর্ণরূপে কাঠের দেখা গেল। আর একটি মহলে ভূতপূর্ব্ব হ'তে আরম্ভ ক'রে বর্ত্তমান মহারাণা পর্য্যন্ত বড় বড় অয়েল-পেণ্টিং রয়েছে দেখলাম।

তারপর নৌকায় করে' পেশোলার মধ্যবর্ত্তী "জগ-মন্দির" প্রাসাদ দেখতে গেলাম। এই প্রাসাদে কিছুদিন সম্রাট সাজাহান যখন যুবরাজ খুরম ছিলেন তখন মেবার-রাজের অতিথি হ'য়ে বাস করেছিলেন। প্রাসাদের মধ্যস্থলে বিস্তীর্ণ উদ্যান। চতুর্দ্দিকে জল—মধ্যস্থলে এই মর্ম্মরগঠিত মন্দিরটি বেশ সুন্দর। এ প্রাসাদেও অনেক মহল আছে,—

মহারাণা এইটি করিয়েছেন। এই খাবার বিতরণের সময় তিনি নাকি এই প্রাসাদের উপর থেকে শীকার খেলতেন! এই অট্টালিকার ভিতরে একটা প্রকাণ্ড বন্যবরাহ বাঁধা রয়েছে। সন্ধ্যা হ'য়ে এসেছিল, আর সারাদিন ঘোরাঘুরিতে শরীর বড়ই ক্লান্ত লাগছিল কাজেই শূকর দর খাওয়ার শেষ দেখবার জন্য অপেক্ষা করতে পারলাম না,—ফেরবার পথে 'ফতেসাগর' হ্রদের চারদিকে একবার ঘুরে বাড়ী ফিরে এলাম। ভাইপো ভাইঝিদের কাছে অনেক—অনেক অনুযোগ!—দুদিনের জন্য এসে একদিন

নাকি একেবারেই গোটা ঘুরে বেড়ালাম, গল্প কর্‌লাম না মোটেই।

তাদের সন্তুষ্ট করে' যখন শুতে গেলাম তখন রাত ১.টা। অতি প্রত্যূষে ঘুম ভেঙে গেল। তাড়াতাড়ি খোলা-ছাদে এসে দাঁড়ালাম। কি অপূর্ব্ব মহান্ দৃশ্য চোখের সামনে ফুটে উঠ্‌ল, তা মানুষের ক্ষুদ্র ভাষায় বর্ণনা হয় না।—নিদ্রিত পুরী,—কোন মহান্ যাদুকরের মায়াদণ্ডের স্পর্শে সে যেন স্বপ্নের রাজ্য থেকে অল্পে অল্পে জেগে উঠ্‌তে লাগ্‌ল।

প্রত্যূষে তাড়াতাড়ি আহারাদি সেরে নিয়ে সেদিন বেলা ৯টার সময় বাড়ীর মোটরে দাদার দুটি মেয়ে, মা, পুত্র এবং আমি জয়সমুদ্রের দিকে রওনা হ'লাম। জয়সমুদ্র উদয়পুর হ'তে ৩২ মাইল দক্ষিণপূর্ব্বে; তার মধ্যে ১২।১৪ মাইল গভীর জঙ্গল,—মহারাণার "রিজার্ভ ফরেষ্ট"। প্রথম কয়েক মাইল কেবল সমতল ভূমি,—দুই পাশে মাঝে মাঝে ছোট ছোট গ্রাম,—আর অগণ্য খেজুর গাছ। কয়েকটি থানা ছাড়িয়ে পেলাম ধংলীমুড়ী, হলদুঘাটি—প্রভৃতি। হলদুঘাটি থানার নিকট এসে আমাদের চাপরাসি "দেওয়ান জী" অর্থাৎ দেওয়ানের গাড়ী বলে' উচ্চৈঃস্বরে হাঁক্‌ল,—তৎক্ষণাৎ লোক এসে রাস্তার শিকল টেনে খুলে দিল। হলদুঘাটি থানার পরই মহারাণার রিজার্ভ ফরেষ্ট। এই সুদীর্ঘ পথের যে দৃশ্য তা সুন্দর ও ভীষণের অপূর্ব্ব মিলন! একদিকে গভীর অরণ্য-সমাকুল অভ্রভেদী পর্ব্বতমালা, অন্যদিকে তেমনি অরণ্য-সমাকুল অতলস্পর্শ গভীর খাদ। এই পর্ব্বতমালার মধ্যে কিন্তু অতি সুন্দর বাঁধান রাস্তা। কখনও পর্ব্বতের মধ্য দিয়ে কখনও পাশ ঘুরে সে পথ চলেছে। যেতে যেতে মনে হয় এইবার বা পথ বন্ধ হ'য়ে গেল। পর মুহূর্ত্তেই দেখা যায়,—সুন্দর গিরিবর্ত্ম খোলা রয়েছে।—মনে হ'চ্ছিল আমরা যেন সৃষ্টির আদি-মানব,—কোন অপরিজ্ঞাত রহস্যের সন্ধানে নিরুদ্দেশ যাত্রা করেছি! পার্শ্বে সম্মুখে, পশ্চাতে, ঊর্দ্ধে পর্ব্বত ও বড় বড় বনস্পতির দল যেন সৃষ্টির আরম্ভ হ'তে আজ পর্য্যন্ত একই ভাবে মৌন বিস্ময়ে দাঁড়িয়ে আছে। ১৩ মাইলের পর পাহাড়ের মধ্যে দোবারীর মতো একটা তোরণ দেখা গেল,—তার অন্যদিকে কেওড়া গ্রাম, তারপর ২২ মাইলের পর উৎরাই শেষ হ'ল। এখানে একটি থানা আছে নাম কালোড্রা,—২৮ মাইলের পর যে গ্রাম তার নাম পিথাধরা,—তারপর জয়সমুদ্রের পথ ধরা হ'ল। পথের দুই পাশে এভিনিউ-এর মতো গাছ, ভারী সুন্দর!

হ্রদ-তট—উদয়পুর

জয়সমুদ্রের নিকটে এসে পৌঁছলাম। সৃষ্টি-কর্ত্তার হাতের মানব, কিন্তু তার অপূর্ব্ব নির্ম্মাণকৌশল

দেখে বিস্ময়ে স্তম্ভিত হ'তে হ'ল। হ্রদের বিস্তৃত উঁচু বাঁধ প্রায় হাজার ফিট লম্বা এবং দেড়শ' ফিট উঁচু, বামদিকে মোটর উঠ্‌বার বেশ প্রশস্ত ঢালু রাস্তা—ডবল স্পিড্ দিয়ে মোটর উঠাতে হ'ল। উপরে উঠে দেখ্‌লাম বেশ প্রশস্ত জায়গা আছে। মস্ত রাস্তা—নিকটের পর্ব্বতের উপরে জয়সিংহের শ্বেতবর্ণের প্রাসাদ। বামদিকে বিশ্রামাবাস,—ঠিক হ্রদের উপরে ঝুলে পড়েছে। বাঁধের দুই পাশে পাহাড়, আর সামনের দিকে মার্ব্বেল পাথরে বাঁধান সুদীর্ঘ সোপানশ্রেণী-সংবলিত সুদীর্ঘ ঘাট, এক পাহাড়ের কোল থেকে আর এক পাহাড় পর্য্যন্ত বিস্তৃত।

খাবার দাবার নিয়ে বিশ্রামাবাসে যাওয়া গেল। সেখানে ঠিক হ্রদের উপরই একখানি ঘরে ছেলেমেয়েদের নিয়ে বস্‌লাম। খানিক্ষণ হ্রদের দিকে চেয়ে দেখ্‌বার পর ছেলেদের খাইয়ে নিয়ে হ্রদের তীরে এলাম। তখন বেলাও এসেছিল পড়ে'। এইবার চোখের সামনে হ্রদের যে দৃশ্য ফুটে উঠ্‌ল, ভাষায় তা ব্যক্ত হয় না। এইসব পাহাড়ের নীচে বরাবরই জল সঞ্চিত থাক্‌ত। মহারাণা জয়সিংহ তার মুখে বাঁধ দিয়ে সেই বিশাল জলস্রোত রুদ্ধ করে' দিয়ে নিজের নাম অনুসারে তার নাম করেন—"জয়সমুদ্র"।

জয়সমুদ্র ত সমুদ্রই—বিশাল জলরাশি! হ্রদের বিরাট বক্ষে ক্ষুদ্র বৃহৎ অসংখ্য পর্ব্বত। এই পাহাড়গুলির অন্তরালে হ্রদের সীমারেখা দেখা যায় না, চতুর্দ্দিকে স্তরে স্তরে পর্ব্বতমালা সাজান। সমস্ত হ্রদটির দৈর্ঘ্য শুন্‌লাম ৯ মাইল এবং প্রস্থ ৫ মাইল। নৌকা করে' হ্রদের উপর ছেলে মেয়েদের নিয়ে বেড়াতে গেলাম। বাতাসে হ্রদের নীলাভ জল ঈষৎ কাঁপ ছিল। জল—শুধু জল! দূর দূরান্তে শ্যাম বৃক্ষলতাপূর্ণ পর্ব্বতশ্রেণী,—এ কোন্ শিল্পীর অপূর্ব্ব পরিকল্পনা,! প্রকৃতির এই লীলানিকেতনে মানুষের এই অপূর্ব্ব শিল্প—জয়সিংহের অপূর্ব্ব শিল্পী-মনের উদ্দেশে আমি সম্ভ্রমে মাথা নত কর্‌লাম।

খানিক্ষণ ঘুরে আবার এলাম তীরে। এইবার ছেলেমেয়েদের এবং ড্রাইভারের একান্ত অনুরোধে পর্ব্বতের উপরে মহারাণার প্রাসাদ দেখ্‌তে যেতে হ'ল। আমিও যত উঠ্‌ব না, ওরাও বলে, "এই বাঁকটুকু ঘুর্‌লেই প্রাসাদ, এসো পিসীমা!"—তাদের সঙ্গে বাধ্য হ'য়ে উঠ্‌তে হ'ল। উঠ্‌লাম অতি অনিচ্ছাতেই। উপরে উঠে যে দৃশ্য চোখে পড়্‌ল,তা না দেখ্‌লে হয় ত উদয়পুর দেখা সম্পূর্ণ হ'ত না। স্তরে স্তরে ক্ষেত্র,—শস্যশ্যামলা সুন্দরী মেবার-ভূমি!—অন্যদিকে হ্রদ, পর্ব্বতশ্রেণী,—সৃষ্টিকর্ত্তার লীলারহস্য দুই চোখ ভরে' দেখেও তৃপ্তি হচ্ছিল না। এইবার বাড়ী ফির্‌তে হবে,—সন্ধ্যা হ'লে পথে বাঘের ভয়, বাধ্য হ'য়ে নাম্‌তে হ'ল।

আবার সেই পথ, অস্তগমনোন্মুখ সূর্য্যের শেষ রশ্মি-আভায় সমস্ত রাস্তা উদ্ভাসিত। কোথাও বা একটি কোথাও বা পালে পালে হরিণ নেমে আস্‌ছে পাহাড়ের গা বেয়ে। মোটরের শৃঙ্গধ্বনি শুনে পথের মাঝে তাদের ভীত ত্রস্ত চোখের যা চাউনি!—তখনি আবার ছুটে পালাচ্ছে। এই সুগভীর পাতালপুরী থেকে ঊর্দ্ধে সমস্ত নক্ষত্রলোক পর্য্যন্ত সমস্ত বিশ্বচরাচর যেন স্তিমিত নেত্রে স্তব্ধ বিস্ময়ে আমাদের দিকে চেয়ে রইল।

সন্ধ্যার একটু পরেই বাড়ী ফিরে এলাম। আহারাদি করে' সমস্ত দিনের ক্লান্তি সত্ত্বেও রাত্রি প্রায় ১২টা পর্য্যন্ত মাসীমা ও ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে সারাদিনের গল্প করে' তবে বিশ্রাম কর্‌তে পেলাম।

আবার স্নিগ্ধ প্রভাত—আবার সেই তাড়াতাড়ি আহারাদি সেরে যাত্রা। আজ প্রথমেই আমরা মহারাণার গোলাপবাগ দেখ্‌তে গেলাম। সেখান হ'তে "চিড়িয়াখানা" —কয়েকটা নূতন বাঘ আনা হয়েছে, দেখ্‌লাম।

তারপর মহারাণারা যেখানে জলক্রীড়া কর্‌তেন সেখানটা দেখ্‌তে গেলাম। বিস্তৃত উদ্যানের মধ্যে অগণিত ফোয়ারা, এই ফোয়ারার জল পেশোলা হ্রদ যোগান্ দেয়। কল টিপে দিলেই চতুর্দ্দিকে অসংখ্য ফোয়ারা—উদ্যানের কৃত্রিম হাতি, পদ্ম প্রভৃতি হ'তে উচ্ছ্বসিত জলধারা নির্গত হ'য়ে যেন স্বপ্নময় পরীরাজ্য সৃষ্টি করে।

তারপর "একলিঙ্গজী"র পথে যাত্রা করা গেল, রেসিডেন্সির পাশ দিয়ে সহরের সীমানা ছাড়িয়ে।

প্রথম কিছু দূর সমতল রাস্তা। চার পাঁচ মাইলের পর এক গিরিশ্রেণী পথ রোধ করে' দাঁড়াল,—সেই পাহাড়ের গা বেয়ে পার্ব্বত্যপথ ঘুরে ঘুরে উপরে উঠেছে। তিন মাইলের পর যেখানে এই চড়াই শেষ হয়েছে সেখানে দুই পাহাড়ের মধ্যবর্ত্তী এক বন্ধ-পথ। বন্ধের মুখে একটি তোরণ।

তোরণের নাম "চীর উন্না কা দরওয়াজা"। চীর-উন্না'র পরই পর্ব্বতের এক নিভৃত অংশে একলিঙ্গজীর মন্দির। ইনি মেবারের রাণাদের কুলদেবতা। মেবারের প্রাচীন ইতিহাসের সঙ্গে এঁর যোগ আছে। তখন এখানকার নাম ছিল 'পরাশর মহাবন'। ক্ষুদ্র বালক বাপ্পা!—মনে পড়্‌তে লাগ্‌ল স্কুলে "শিল্পী-গুরু অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত 'রাজকাহিনী' একখানি পারিতোষিক পেয়ে কি আগ্রহের সঙ্গেই না মেবারের এই প্রাচীন কাহিনী পড়েছিলুম।

বাপ্পার শৈশবকালে ভীলেরা তাঁর রাজ্য কেড়ে নিলে তাঁর ব্রাহ্মণ পুরোহিত তাঁকে নিয়ে এই বনে পালিয়ে আসেন। এইখানে একদিন গরু চরাতে চরাতে বাপ্পা-রাও দেবতার দর্শন পান। কথিত আছে তাঁর একটি গরু রোজ গভীরতম জঙ্গলে পালিয়ে যেত, তার অনুসরণ করে' একদিন তিনি দেখ্‌লেন যে লতাগুল্মের মধ্যে গাভী স্থির হ'য়ে দাঁড়িয়ে আছে আর তার স্তন হ'তে আপনিই দুগ্ধধারা উৎসারিত হ'চ্ছে। তিনি লতাগুল্মের অন্তরাল হ'তে একলিঙ্গজীর উদ্ধার করেন। তারপর এক শৈব সন্ন্যাসীর কাছ হ'তে রাজটিকা আর 'একলিঙ্গকা দেওয়ান' উপাধি লাভ করেন।—তারপরই তাঁর ভাগ্য যায় ফিরে। তাই ইতিহাস-অনুসারে সমস্ত মেবার রাজ্যই একলিঙ্গের সম্পত্তি এবং মহারাণা তাঁর দেওয়ান।

কিন্তু রাজ্যেশ্বর উদাসীন সন্ন্যাসী—কয়েকটি মন্দির, কয়েকটি ধর্ম্মশালা, যাত্রীনিবাস এবং মহারাণার এক মহল, এই নিয়েই তাঁর গ্রাম।—তবে স্থানটি দেবাদিদেবের বাসের উপযুক্ত বটে। ঐশ্বর্য্যের সমারোহ নেই, কিন্তু বড় সুন্দর পবিত্রতায় পূর্ণ।

মন্দিরদ্বার দশটার পূর্ব্বে খোলে না, সামান্য একটু দেরী ছিল; ততক্ষণ উদ্যান, গ্রাম, একটি সুন্দর বাঁধান পুষ্করিণী ইত্যাদি দেখে সময় কাটান গেল।

মন্দিরটি নীচু,—মন্দিরগাত্রে নানারকম শ্বেত পাথরের কাজ। মন্দিরপথে অনেক ফুল বিক্রী হ'চ্ছে, কিনে কিছু নেওয়া গেল। মন্দিরের প্রাঙ্গণে শয়ান বিশাল শ্বেত-পাথরের বৃষমূর্ত্তি। একলিঙ্গজী কাল পাথরের—তাঁকে বেষ্টন করে' চারটি মুখ। তখন পূজা আরম্ভ হয়েছিল—স্তব, পূজা, ভারী ভাল লাগ্‌ল।—প্রণামী প্রভৃতি নিয়ে কোন হাঙ্গামা নাই।—মন্দিরের চত্বরে আরও অনেক দেবতার মূর্ত্তি দেখ্‌লাম।—তারপর বাড়ী ফিরে এলাম। একটু সহরের মধ্যে ঘুরে দু'চারটে উদয়পুরী টেবিলক্লথ, ঝাড়ন প্রভৃতি কিনে উদয়পুর জেল দেখ্‌তে গেলাম।—জেলে বেশ ভাল সতরঞ্চি, গাল্‌চে, প্রভৃতি বোনা হয়,—কয়েকখানা সতরঞ্চি, আসন প্রভৃতি কেনা গেল। সন্ধ্যাবেলা আর একবার ফতেসাগরের সূর্য্যাস্ত দেখ্‌তে গেলাম। দেখে যেন আর তৃপ্তি আস্‌ছিল না—।

পরদিন প্রত্যূষ হ'তেই বিজয়ার বাদ্য বেজে উঠ্‌ল। সময়াভাবে অনেক কিছু দেখা হ'ল না। তাড়াতাড়ি জিনিস-পত্র গোছান, আহার ইত্যাদি করে' ষ্টেশনে এলাম। প্রকৃতির লীলানিকেতনে প্রিয়জনের আদরে যে তিনটি দিন তিন মুহূর্ত্তের মতো কেটে গ্যাছে,—তারি মধুর স্মৃতি নিয়ে উদয়পুর ত্যাগ কর্‌লাম। চোখের জলে ভাল করে' দেখ্‌তে পাচ্ছিলুম না।—পাশের গাড়ীতে একটি বাঙ্গালী ছেলে ছিলেন,—পুত্রকে বাঙ্গালী দেখে তিনি আলাপ কর্‌লেন। মন্থরগতিতে ট্রেন দোবারী গিরিপথ অতিক্রম করে' চিতোর-গড়ের দিকে রওনা হ'ল। আবার 'বানাকা' নদী পার হ'য়ে (এই নদী চিতোর দুর্গকে বেষ্টন করে' আছে) চিতোর-গড় এসে পৌছলাম। আরও একটু আরাবল্লীর গিরিপথে ঘুর্‌বার সাধ ছিল,—বারান্তরে চেষ্টা কর্‌ব। এবার এই যে অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখ্‌লাম, তার জন্য বিশ্বস্রষ্টাকে বারংবার প্রণাম কর্‌তে কর্‌তে আজমীর ও আগ্রায় এক একদিন থেকে কলিকাতার দিকে রওনা হ'য়ে নির্দ্ধারিত সময়ে নির্ব্বিঘ্নে কলিকাতায় এলাম।—যাঁর কৃপায় এই সুদীর্ঘ যাত্রা শেষ করে' নির্ব্বিঘ্নে এবং সুস্থ শরীরে ফিরে এলাম, সেই অপূর্ব্ব-সুন্দরকে, সেই করুণাময়কে প্রণাম করি বারংবার।

সন্তান-পালন—শ্রী জ্ঞানেন্দ্রনারায়ণ বাগ্‌চী এল্‌-এম্‌ এস্‌। প্রাপ্তিস্থান—সরকার বিশ্বাস এণ্ড কোং, ২নং শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য—১৵০ আনা।

নারীর সর্ব্বোত্তম রূপবিকাশ হয় মাতৃমূর্ত্তিতে—মা হওয়া নারীর পক্ষে পরম আকাঙ্ক্ষণীয়। কিন্তু জননীর কর্ত্তব্য নিঃশেষ হয় না শুধুই সন্তানকে স্নেহচুম্বনদানে, স্তন্যপ্রদানে, কক্ষে আঁকড়াইয়া, বক্ষে জড়াইয়া, অথবা পরিচ্ছদে প্রসাধনে অতিভারাক্রান্ত করিয়া। কে না জানে, আত্যন্তিক মাতৃস্নেহ অনেক সময় সন্তানের দৈহিক পীড়ার এবং মানসিক অবনতিরও কারণ ঘটাইয়া থাকে। স্নেহ-রশ্মি সংযত করিয়া, বিচারিত খাদ্য-ব্যবস্থায় শিশুর দেহকে এক দিকে যেমন নির্ব্যাধি-স্বাস্থ্যে সবল ও পুষ্ট করিতে হইবে, অপর দিকে তেমনি বিজ্ঞানানুমোদিত শিশুমনস্তত্ত্বের আনুশীলনিক প্রয়োগের সহিত প্রাণের প্রীতিধারা মিশাইয়া মানুষ করিয়া তুলিতে হইবে তাহাকে।

এই অঙ্গাঙ্গী-আদর্শের প্রতি ঐকান্তিক লক্ষ্য রাখিয়াই গ্রন্থখানি রচিত হইয়াছে এবং ইহা চিকিৎসক-রচিত নিছক চিকিৎসা-বিধানের নীরসতাকে অতিক্রম করিয়া সাহিত্য-পর্য্যায়ে দাঁড়াইয়াছে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। আরও,—চিকিৎসাবিজ্ঞান-অনভিজ্ঞা সাধারণ-শিক্ষিতা জননীরাও ইহা দ্বারা সন্তানপালন-ব্রতে অনায়াসেই সিদ্ধকামা হইতে পারিবেন, কারণ ইহার বিষয়-বিবৃতি যেমন সরস তেমনি সরল।

বাংলা ভাষায় এইরূপ মূল্যবান গ্রন্থ বেশী আছে বলিয়া আমাদের জানা নাই। বঙ্গলক্ষ্মীরা এই গ্রন্থপাঠে সমান উপকৃত ও আনন্দিত হইবেন। গ্রন্থকারকে আমাদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

ভিক্ষার ঝুলি—প্রণেতা 'সেই ভিখারী'। প্রকাশক—বিশ্বকোষ কার্য্যালয়, ৯নং বিশ্বকোষ লেন, বাগবাজার, কলিকাতা।

ইহা সাধনবিষয়ক কতকগুলি সঙ্গীতের সমষ্টি। কাব্যের দিক দিয়া উপভোগের প্রয়াস করিলে প্রয়াসীকে ঠকিতে হইবে এবং অনেক স্থলে ইহাকে দুর্ব্বোধ্য হেঁয়ালী মাত্র বলিয়া মনে হইবে। কিন্তু সাধকের চক্ষে এই হেঁয়ালীগুলিই সাধনার সোপান নির্দ্দেশ করে।

বঃ সঃ

নিশিপদ্ম—শ্রী প্রবোধকুমার সান্যাল। প্রকাশক—গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, ২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্‌ ষ্ট্রীট্‌, কলিকাতা। মূল্য—দেড় টাকা।

যে আটটি গল্প লইয়া এই 'নিশিপদ্ম', আমার মনে হয়, প্রবোধ বাবুর সমস্ত রচনার মধ্যে সেগুলি বাছাই করা এবং ঐ দিক হইতে বইখানি আপনার বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিয়াছে। স্থান-বিভাগ করিলে গল্পগুলি যেরূপ দাঁড়ায়, নিম্নে আমি তাহার তালিকা দিলাম: ১। প্রসাধন, ২। গভীর, ৩। বাতাস দিল দোল, ৪। নিশিপদ্ম, ৫। ছন্দোপতন, ৬। মর্ম্মকামনা, ৭। নারায়ণ, ৮। কঙ্কাল।

'গভীর' ও 'বাতাস দিল দোল'—চমৎকার, কিন্তু

'প্রসাধন'কে আমি শ্রেষ্ঠ স্থান দিলাম এই জন্য, রচনা ও চরিত্রসৃষ্টির দিক হইতে ইহা একেবারে নিখুঁত! 'নিশি-পদ্মে' ছোট মাসীকে আমরা যত ভাল করিয়া চিনিলাম, এত আর কাহাকেও নয়। অস্পষ্টতা, কাব্যের উচ্ছ্বাস, এ গল্পটিতে কোথাও স্পর্শ করে নাই। "সে অশ্রু কেবল অপমানের এবং উপেক্ষারই নয়, বিগত যৌবনের করুণ ব্যর্থতারই নয়, কিম্বা যে কলঙ্ক-রটনার জঘন্য কৌশল একটু আগে তাঁর নির্ম্মম ভাবে মিথ্যা হ'য়ে গেছে তার জন্যও নয়,—আপনার শূন্য জীবনের সকল দৈন্যকে তিনি আজ স্পষ্ট দেখ্‌তে পেয়েছেন, এ অশ্রুতে তার বেদনাও হয় ত নিহিত ছিল!"—এতক্ষণ ধরিয়া ছোট মাসীর উপর আমাদের যে একটা ঘৃণা জাগিয়া উঠিয়াছিল, এই ক'টি কথায় তাহা সহানুভূতিতে রূপান্তরিত হইল। রাস্তার কলের লৌহদেহের উপর ভর দিয়া ছোট মাসী নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইয়া আছে, এ দৃশ্য মনকে অভিভূত করিয়া ফেলে।

'গভীর', 'বাতাস দিল দোল' কবিত্বের দিক হইতে আর একটুখানি সংযত হইলে, গল্প দু'টি একেবারে অনবদ্য হইত। কিন্তু ভাষা, বলিবার মধুর ভঙ্গীর গুণে এ সামান্য ত্রুটিটুকু যেন চোখে পড়িতে চায় না। বদ্‌রি ও মন্দা—সংসারের চিরদিনকার ব্যর্থতার প্রতিমূর্ত্তি! ইহাদের ফুটাইয়া তুলিতে লেখক যে শক্তির পরিচয় দিয়াছেন, তাহা বড় কম নয়। করুণ-রস পরিবেশণ করিতে প্রবোধ বাবু সিদ্ধহস্ত,—কিন্তু তারই সঙ্গে যদি সামান্য একটু অম্লমধুর হাস্যরস থাকে, তাহা হইলে করুণরস হইয়া উঠে সার্থক। এ দুটির মিশ্রণ আখ্যায়িকাকেও উপভোগ্যতর করে। 'গভীর' ও 'বাতাস দিল দোল'এ ইহার পরিচয় আছে—কিন্তু সব গল্পে নাই। এলোমেলো গভীর মধ্যে অন্যান্য গল্পগুলি প্রাণবন্ত নয়, তবু বলিব, প্রবোধ বাবু একজন নিপুণ শিল্পী—ইতিমধ্যেই সে বিশ্বাস আমাদের হইয়াছে।

ক.বি

চটকল—শ্রী নীহারকুমার পাল চৌধুরী। প্রাপ্তি স্থান—গুপ্ত ফ্রেণ্ডস্ এণ্ড কোং, ১১নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। পৃঃ ৭৫+৭। দাম এক টাকা।

তিন অঙ্ক নাটক। ধনিক ও শ্রমিকের প্রতিদ্বন্দ্বিতা এই নাটকের ভিত্তি। অন্যান্য দেশে এই সমস্যা যেরূপ জটিল হইয়াছে আমাদের দেশে তেমন না হইলেও হানা দিতে সুরু করিয়াছে। এই হিসাবে নাটকটির প্রয়োজন আছে। ইতিপূর্ব্বে নীহার বাবুর আর কোন নাটক বাজারে দেখি নাই, বোধ হয় ইহাই প্রথম প্রচেষ্টা। বই পড়িয়া বোঝা গেল, তিনি অনেক পড়িয়া শুনিয়া এবং হাত পাকাইয়া ক্ষেত্রে নামিয়াছেন। একটা জিনিষ বিশেষ করিয়া লক্ষ্য হইল, লেখক effectটুকু সহজেই ফুটাইয়া তুলিতে পারিয়াছেন, কোথাও অতিভাষণের আবশ্যক হয় নাই। বাংলার নাট্য-সাহিত্য অতিশয় দরিদ্র। নীহার বাবুর মত শক্তিমান লেখকের অভ্যুদয়ে আমরা আশান্বিত রহিলাম।

শ্রী মনোজ বসু

স্বপ্নশেষ—শ্রী বিশ্বপতি চৌধুরী। ১-সি লেক রোড, রসচক্র-সাহিত্য-সংসদ হইতে প্রকাশিত। দাম দেড় টাকা।

চারটি গল্প—প্রথম গল্পের নামে বইএর নামকরণ। দ্বিতীয় গল্প 'পথের বাঁকে' আমাদের অতি চমৎকার লাগিল। একটি পতিতা মেয়ের পঙ্কিল অন্তরে মাতৃত্ব জাগয়া ওঠার বিচিত্র কাহিনী। গল্পটি সত্যই রসোত্তীর্ণ হইয়াছে। বিশ্বপতি বাবুর সাহিত্যিক প্রতিষ্ঠা আছে, আলোচ্য পুস্তকে তাহা ক্ষুণ্ণ হইবে না।

কৃত্তিবাস

দীপা—শ্রী রাধাচরণ চক্রবর্ত্তী। প্রকাশক—শ্রীগুরু লাইব্রেরী, ২০৪ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য—পাঁচ সিকা।

যাঁরা বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ মাসিক-পত্রিকাগুলির কবিতা লক্ষ্য করে' থাকেন তাঁদের কাছে কবি শ্রীযুক্ত রাধাচরণ চক্রবর্ত্তীর পরিচয় দিতে যাওয়া অবান্তর হবে। দীর্ঘকাল ধরে' বীণাপাণির বীণার একটি কোমল-করুণ তারে করস্পর্শ করে' তিনি চিরমধুর একটি চিরন্তন রাগিণীকে জীবন্ত করে' তুলেছেন এবং একনিষ্ঠ সাধনার দ্বারা বাংলা-কাব্যসাহিত্যে তাঁর ব্যক্তি-জীবনের সত্যকার অনুভূতিকে উজ্জ্বল করে' দেখিয়েছেন।

সম্প্রতি তাঁর কয়েকটি চমৎকার প্রীতিকবিতাকে

গ্রথিত করে', কাব্যরসিক পাঠকদের তিনি এই গীতিকাব্য উপহার দিলেন।—রবীন্দ্রপরবর্ত্তী যুগের কবিদের কাব্যের সঙ্গে রাধাচরণ বাবুর কবিতার একটি বিশেষ ভেদ-রেখা সহজেই চোখে পড়ে। তাঁর কবিতাগুলি ছোট ছোট—হরিণীর মতোই লীলাশীলা এবং চকিত-চঞ্চলা,—একটির পর একটি যেন অপরূপের ছবি অঙ্কিত করে' চলে। সহজ, সরল এবং সংক্ষিপ্ত কবিতার সেই স্বল্প, স্বচ্ছ, মনোরম অবকাশে এমন আন্তরিকতা নিয়ে একটি সুস্থ এবং সত্যকার কবিমন জাগ্রত হ'য়ে ওঠে, যে, পাঠকের মনও ধীরে-ধীরে রসলোকের নিবিড় সান্নিধ্য লাভ করে।

রাধাচরণ বাবুর কবিতা যে গতানুগতিকতার বহু উর্দ্ধে বিরাজ করে, তা' তাঁর এই 'দীপা'ই প্রমাণ করছে। বর্ত্তমান বিংশ-শতাব্দীর মানুষের জীবনসংগ্রামের যে কঠোর রূপ,যে গভীর মর্ম্মন্তুদ হাহাকার বিদেশী কাব্য এবং আমাদের আধুনিক কাব্যকেও আশ্রয় করেছে,—রাধাচরণ বাবু সত্যকার কবি বলে'ই, নিজের অগোচরে, তাঁর কাব্যের অপরূপ চিত্রাবলির মধ্যেও একটি জীবনসংগ্রামে বিব্রত মানুষের করুণ নিশ্বাস রেখে গেছেন। তাঁর এই কাব্যে জটিল দার্শনিক-তত্ত্ব নেই, তথাকথিত জীবনবিধাতার বিরুদ্ধে একটা cynic ব্যঙ্গ নেই—জীবনের স্বচ্ছ সরল অনুভূতি একটি মৃদুকরুণ দীর্ঘশ্বাসের মধ্যে বেপমান।

'যায় যৌবন,—হায়, যৌবন—দিনের তপন অস্ত যায়!
শুভ্র কেশে শীর্ণ কে-সে ধরছে এসে হস্ত হায়,—
উঠ্‌ছে মনে ভয় জেগে॥'

এবং

'সাহিত্য-কারখানার শ্রমিক...'

—গীতিকবিতার এই সুরপ্রাণ ভাবোদ্বেলতা 'দীপা'র প্রথম থেকে শেষ পর্য্যন্ত পরিব্যাপ্ত হ'য়ে আছে। কিন্তু রাধাচরণ বাবুর সাধনা যে কম কঠিন নয়, তা' তাঁর পূর্ব্ববর্ত্তী কাব্য 'আলেয়া' পড়্‌লেই স্পষ্ট হ'য়ে উঠ্‌বে। 'আলেয়া'তে জীবন সম্বন্ধে গভীর ব্যঞ্জনা—ভাবের গাম্ভীর্য্যে এবং ভাষার উদার গঠনে একটি অখণ্ড রাগিণীর সৃষ্টি করেছে, এবং 'আলেয়া'র সেই কঠিন সাধনাকে অতিক্রম করে'ই তিনি 'দীপা'র এই সহজ সুরটিকে অধিগত করেছেন।

'দীপা'র কবিতাগুলি আগাগোড়া পড়্‌লে মনে হবে যেন একটি নীড়প্রত্যাশী সন্ধ্যার পাখী, সমস্ত দিনের প্রখর রৌদ্রের দাহনে পরিক্লান্ত হ'য়ে গোধূলির মুমূর্ষু আকাশে একটি ছায়াঘন নদীমেখলা গ্রামের দিকে দুটি কোমল, মন্থর ডানা প্রসারিত করে' দিয়েছে!...সেখানে কোন মাটির ঘরে, একটি কল্যাণী নারী-লক্ষ্মী স্পন্দিতবক্ষে দুটি ব্যথিত পরিম্লান প্রত্যাশী-চক্ষু পথের দিকে নিবদ্ধ করে' দাঁড়িয়ে আছেন—তাঁর অঞ্জলিপুটের কম্পিত দীপশিখা কুটীরাঙ্গণে কপোতপাণ্ডুর ছায়া বিস্তার করছে!

আধুনিক কাব্যের আর একটি প্রধান দিক্ তাঁর কাব্যে চমৎকার পরিস্ফুট হয়েছে—সে হ'চ্ছে সজীব নারীর প্রতি চিরন্তন পুরুষের উন্মুখ বাসনা, কিন্তু উচ্ছৃঙ্খল উন্মত্ততা নয়।

রাধাচরণ বাবুর লিপিকুশলতা চরম উৎকর্ষ লাভ করেছে তাঁর চিত্র রূপণে। কয়েকটি সংক্ষিপ্ত, ঋজু রেখায় তাঁর কাব্যপ্রতিমা যেন একেবারে শরীরিণী হ'য়ে উঠেছেন!

'কে নারী টিয়ার পালকের পাখা ঘুরিয়ে
ফিরিছে বিজন তটিনীর তীরে তীরে;
কে গিরি-শিখরে আকুল অলক উড়িয়ে
খেলিয়া বেড়ায় ল'য়ে মায়া-শিখীটিরে।'

অন্যত্র—'কাজল-দীঘির তটতলে শ্যাম লঘু শৈবাল-লেখা...

—এ-রকম অপরূপ, স্বচ্ছ ভঙ্গীতে প্রকৃতির ও নারীর আনন্দরূপ-কে অঙ্কিত করা যথার্থ কবিশক্তির পরিচায়ক।

ত্রিদিবের শিশু,—প্রদীপকুমার তাঁর পথশ্রম হরণ করে' অমর্ত্ত্যলোক থেকে অমৃত বহন করে' এনেছে; তাই তাঁর কাব্যে সমস্ত বেদনাকে আড়াল করে' দাঁড়িয়েছে একটি পরম সান্ত্বনা, যেখানে তাঁর কবিদৃষ্টি 'অপরূপ রহস্যতিমিরে' প্রবাল-দ্বীপের 'বারুণী রূপসী'র প্রসাদ লাভ করেছে।

Pre-Raphaelites যুগের কবিদের কবিতার সঙ্গে তাঁর একটি অপূর্ব্ব আত্মীয়তা আছে।—

Roden Noelএর

'They are waiting for the boat
There is nothing left to do :
What was near them grows remote
Happy silence falls like dew ;
Not the shadowy bark is come
And the weary may go home...'

অথবা Morries এর

'Pray but one prayer twit
thy closed lips,
Think but one thought of up in the
stars.'

রাধাচরণ বাবুর—

'দূরে দূরেই রইনু দুজন, ব্যথার নদী বইছে উজন,
তুমি আমি দাঁড়িয়ে—বিজন
আঁধার দু'টি তীরে।'

কিম্বা—

'দেখ',—অমারাতের তিমির-কোলে
লক্ষ কোটি তারা দোলে,
রাঙা শিশু জড়ায় বাহু
কালো মায়ের গলে!'

* * *

—'দীপা' বাংলা-রসসাহিত্যে নিঃসন্দেহ একখানি শ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থ। আশা করি, বাংলার রসিকসমাজে যথেষ্ট সমাদর হবে এর।

শ্রী সুবলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

জাতীয় প্রতিষ্ঠান

(বাৎসরিক স্মৃতিসভা)

স্বামী কৃপানন্দ সরস্বতী

আজ আমরা যাঁহার স্মৃতির তর্পণ করিতে উপস্থিত হইয়াছি, সেই স্বর্গীয়া বসন্তকুমারী দেবী তাঁহার সহধর্ম্মী জষ্টিস্ স্যর্ প্রতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'বিধবাশ্রম"রূপ অন্তিম বাসনা কার্য্যে পরিণত করিয়া উপযুক্ত সহধর্ম্মিণীর কার্য্য করিয়াছেন।

শুনিয়াছি স্বর্গীয়া বসন্তকুমারী দেবী বিধবাদের দুঃখে বিচলিত হইতেন। উন্নতচরিত্রা ও উদারস্বভাবা মহিলার মনে এই উৎকৃষ্ট বৃত্তির উদয় হওয়াই স্বাভাবিক।

আজ আর এ প্রশ্ন উঠিতেই পারে না যে বিধবাশ্রম বৈদিক কি অবৈদিক। প্রয়োজনের সত্য বৈদিক অনুশাসনেরও বাধ্য নহে। মহাভারতের আপদ্ধর্ম্ম পর্ব্বাধ্যায় দৃষ্টান্তস্থল। শিক্ষা মনুষ্যজীবনে অন্ন-পানের ন্যায় অত্যাবশ্যকীয়—শিক্ষাই স্পর্শমণি। উচ্চশিক্ষা বা সাধনা দ্বারাই মানুষ প্রকৃত জীবন অতিক্রম করিতে সমর্থ হয়।

বিধবাদিগকে শিক্ষার যথেষ্ট সুযোগ না দিয়া ব্রহ্মচারিণী বলিয়া আমরা যে শ্রদ্ধা করি তাহা যেন একটা বিদ্রূপ ও অভিশাপ। বহু অপরিণত-মনোবুদ্ধিবিশিষ্ট বালবিধবারই বৈধব্যব্রত স্বেচ্ছাকৃত নহে। ইহা অদূর ভবিষ্যতে ঘটিবে বলিয়াও তাঁহারা তখন কল্পনা করেন না, ইহা গ্রহণের জন্যও তাঁহারা তখন প্রস্তুত নহেন। পূর্ব্বদিনও যে বালিকা ভবিষ্যতের রঙ্গীন স্বপ্ন দেখিয়াছেন পরদিবস তাঁহার পক্ষে সমস্ত পার্থিব সুখ বিসর্জ্জন দিয়া সহধর্ম্মীর অশরীরী আত্মার সান্নিধ্যলাভের আকাঙ্ক্ষা ও কঠোর ব্রহ্মচর্য্যব্রত-ধারণ অনৈসর্গিক ও অবৈদিক। আর্য্যসমাজের প্রতিষ্ঠাতা মহর্ষি দয়ানন্দ সরস্বতী এই প্রথার বিষময় ফলের কথা ভূয়োভূয়ো ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন।

দেশের লোকেরা আইনের দ্বারা বিধবাদের একটা নির্দ্দিষ্ট অধিকার দিল বর্ত্তমান অবজ্ঞাত অবস্থার কতকটা সমাধান হইতে পারে।

কলম চালাইয়া, সভা-সমিতি করিয়া শুধু ভাষার দ্বারা বিধবাদের দুঃখের বর্ণনা করিলে বিধবাদের দুঃখ ঘুচিবে না। প্রত্যেক উপার্জ্জনক্ষম ব্যক্তি কিছু কিছু আর্থিক সাহায্য করিয়া যদি এক একটি বিধবাকে নিজের পায়ে দাঁড় করাইতে পারেন, তাহাতে কাজ বেশী দিবে। স্বর্গীয়া বসন্তকুমারী

দেবী বিধবাদের দুঃখ বর্ণনা করিয়া যদি একাধিক গ্রন্থ রচনা করিয়া যাইতেন তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী কাজ হইয়াছে এই আশ্রমটি প্রতিষ্ঠা করায়। বিধবাদের স্বাধিকারের যুক্তি ও মনের বার্ত্তা পুস্তিকাকারে প্রকাশ করিলেও অবশ্য অনেক উপকার হইবে। যে সব সমাজে বা গ্রামে বিবাহাদি মাঙ্গলিক কার্য্যে বিধবারা অবজ্ঞাত সেই সব স্থানে তাঁহাদের অনুপস্থিতির দ্বারা আত্মার সম্মান রক্ষা করা কর্ত্তব্য।

বিধবাদের স্বোপার্জ্জনের শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের প্রাকৃতিক অধিকারের সুযোগ দানও সমাজের কর্ত্তব্য। বালিকা বিধবাদের বসনভূষণাদির প্রতি অযথা নিগ্রহ না করিয়া, এবিষয়েও তাঁহাদিগকে মানবমনের অনুযায়ী সহজ শোভন অধিকার দেওয়া কর্ত্তব্য।

অধিকাংশ মানুষ ন্যায়সঙ্গত ভাবে যাহা করে তাহাই লিপিবদ্ধ হইলে শাস্ত্র বা আইন হয়। অতীত ও ভবিষ্যৎ অপেক্ষা বর্ত্তমানের মূল্য বেশী। অতীতের শাস্ত্র দিয়া বর্ত্তমানের সমাজকে সর্ব্বতোভাবে শাসন করার চিন্তা না করা ভাল। পুরাতন স্মৃতি নূতন স্মৃতিকে শাসন করিতে পারে না। দেশ, কাল ও পাত্রানুসারে স্মৃতির ও স্মার্ত্তের পরিবর্ত্তন করা আবশ্যক। বিপত্নীকের পত্নীগ্রহণ, বালিকা বিধবা বর্ত্তমানে পিতামাতাদির যম-নিয়মাভাব বিচার্য্য। পুত্র কন্যার বিবাহাদির অনুরোধে ও তথাকথিত সমাজ নিগ্রহের ভয়ে বালবিধবাদের যেরূপ নির্য্যাতন ঘটিয়া থাকে তাহা পাপপূর্ণ ও ভয়াবহ। দেশের এই সব দুর্য্যোগ ও দুরবস্থার মধ্যে স্বর্গীয়া বসন্তকুমারী দেবী এই বিধবাশ্রমটি প্রতিষ্ঠিত করিয়া জাতির ললাটে পুণ্য-প্রতিষ্ঠানের একটি উজ্জ্বল টিকা পরাইয়া দিয়াছেন। বার্দ্ধক্য বশতঃ অক্ষম হওয়ায় প্রতিষ্ঠানটি 'সরোজনলিনী দত্ত নারীমঙ্গল সমিতি'র হাতে দিয়া তিনি উত্তম কার্য্য করিয়াছেন। আশা করি এই সমিতি সামাজিক গ্লানি উপেক্ষা করিয়া বিধবাদিগকে স্বাধিকার দানে সমর্থ হইবেন। বিধবাশ্রমের সহিত একটি বালিকাবিদ্যালয় স্থাপিত হওয়ায় ইহার মধ্যে একটি নূতন আব্‌হাওয়ার সৃষ্টি হইয়াছে। ভবিষ্যতে কুমারীরা বিধবাদের দুঃখ বুঝিবেন ও মোচনে সচেষ্ট হইবেন। নিজেদের সেই অবস্থা ঘটিলে কি করা কর্ত্তব্য তাহাও বিচার করিতে পারিবেন। 'সরোজনলিনী দত্ত নারীমঙ্গল সমিতি'র মুখপাত্রী শ্রীযুক্তা হেমলতা ঠাকুর (বড়মা) যেরূপ সর্ব্বতোমুখী উন্নত-বুদ্ধিসম্পন্না ও তাঁহার যেরূপ অসাধারণ ব্যক্তিত্ব, তাহাতে আশা করি বিধবা ও কুমারীদিগের আত্মবিকাশের নানাবিধ পথ খুলিয়া দিয়া তিনি যুগ-মানবের কার্য্য করিবেন। স্বর্গীয় পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও স্যর্ আশুতোষ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি মনীষিগণ বিধবাদের জন্য যে সামাজিক নিগ্রহাদি সহ্য করিয়া মহানুভবতার পরিচয় দিয়াছেন, তজ্জন্য দুঃখিনী বিধবাদিগের অন্তরে তাঁহাদের পিতৃসিংহাসন চিরদিন প্রতিষ্ঠিত থাকিবে। যুগে যুগে যে সব মানব যুগোপযোগী বার্ত্তা বহন করেন, তাঁহারা তাপিতের ব্যথা ও আহতের অ-সান্ত্বনা দূর করিয়া জাতির অন্তরে একটা অমৃতের অমোঘ স্পর্শ রাখিয়া যান।

উপসংহারে দুঃখের সহিত বলি—হে বাংলা, তুমি আ-সমুদ্র ক্ষিতীশ্বরী বটে, কিন্তু তুমি বিধবাদিগকে দুঃখরাশি দিয়া যে অশান্তি ও ঘোর কালিমা অর্জ্জন করিয়াছ, তাহা ধৌত করিতে পারে এত জল তোমার সমুদ্রে নাই। ৺বসন্তকুমারী দেবীর নাম ধন্য হউক, কীর্ত্তি অক্ষয় হউক!

চাকৃধ মহিলাসমিতি
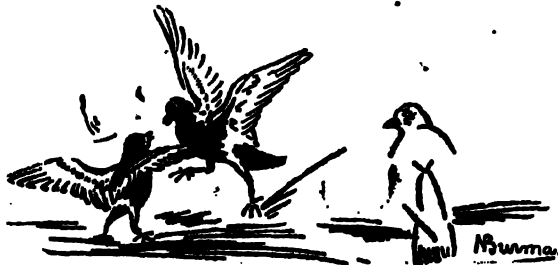
চাকৃধ ফরিদপুর জেলার অন্তঃপাতী একটি বড় গ্রাম। এই গ্রাম বহু ভদ্রপরিবারের বাসস্থান হইলেও বহুদিন যাবৎ গ্রামের মহিলাদিগের শিক্ষার কোনই বন্দোবস্ত এখানে ছিল না। গত চার বৎসর যাবৎ কর্ম্মী শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ দাশ মহাশয়ের আপ্রাণ চেষ্টায় এবং শিক্ষয়িত্রী শ্রীযুক্তা নির্ম্মলা-সুন্দরী বসু মহাশয়ার নিঃস্বার্থ সহযোগিতায় এখানে একটি বালিকাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। প্রায় ৪০টি বালিকা এখানে সাধারণভাবে শিক্ষালাভ করিতেছে। ইতিমধ্যে এই বালিকাবিদ্যালয় হইতে একটি ছাত্রী ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় প্রশংসার সহিত উত্তীর্ণ হইয়া বৃত্তিলাভ করিয়াছে। কিছুদিন যাবৎ এই বালিকাবিদ্যালয়ের ক্রমোন্নতি লক্ষ্য করিয়া জেলা বোর্ড অনুগ্রহপূর্ব্বক সামান্য সাহায্য করিতেছেন।

বর্ত্তমানে গ্রামের জনৈক শুভার্থী শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্র রায় মহাশয়ের উদ্যোগে এবং গ্রামবাসী মহিলাবৃন্দের সমবেত চেষ্টায় এই গ্রামে একটি মহিলাসমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়া "সরোজনলিনী নারীশিক্ষা সমিতি"র সহিত সংযুক্ত হইয়াছে। প্রায় ২০টি মহিলা এই সমিতির সভ্যা-শ্রেণীভুক্তা হইয়া গ্রামবাসী মহিলাদের নানাবিধ উন্নতিকল্পে যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে অঙ্গীকারাবদ্ধ হইয়াছেন।

শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত গুরুসদয় দত্ত মহাশয় ইহার "চাকৃধ মহিলাসমিতি" নামকরণ করিয়াছেন এবং তিনি এই সমিতির উদ্দেশে একটি মঙ্গলময় বাণী প্রেরণ করিয়া সমিতির অশেষ ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। এতদ্ব্যতীত তিনি স্বরচিত দুইখানা পুস্তক উপহার দিয়াও সমিতিকে যথেষ্ট সম্মানিত করিয়াছেন।

শ্রীযুক্তা তরঙ্গিণী রায় ও শ্রীযুক্তা নির্ম্মলাসুন্দরী বসু মহাশয়াদ্বয় এই সমিতির সম্পাদকতার কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছেন। ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি, এই সমিতি দিন দিন উন্নতির পথে অগ্রসর হইয়া পল্লীজননীর সুখ-সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করুক।

—যুক্ত সম্পাদিকা

লেক রোড মহিলাসমিতি

গত ১৯৩০ খৃষ্টাব্দের ২৬শে সেপ্টেম্বর মহিলাসমিতি স্থাপনের উদ্দেশে ১৪ নং লেক রোডস্থ বাটীতে ছায়াচিত্র সহযোগে বক্তৃতা হয়। সেই হইতে "লেক পল্লী মহিলা-সমিতি" স্থাপিত হয়।

লেক রোড অঞ্চলে মাতৃমঙ্গল ও শিশুমঙ্গল স্থাপনের উদ্দেশে মহিলাসমিতি গঠিত হয়।

আমাদের সভ্যাসংখ্যা মোট ১৯ জন, তন্মধ্যে ৩ জন বিধবা। বিধবা সভ্যাদের নিকট হইতে চাঁদা নেওয়া হয় না।

সমিতির মহিলা সভ্যাগণ একে অন্যের বাড়ী যাতায়াত করেন এবং প্রয়োজন হইলে গৃহশিল্প শিক্ষার বিষয় একে অন্যের সাহায্য করেন।

লেক পল্লীর মহিলাদিগের ভিতর স্বাস্থ্য-বিষয় শিক্ষা দিবার নিমিত্ত মাঝে মাঝে কেন্দ্রসমিতির পক্ষ হইতে প্রচারকগণ আসিয়া ছায়াচিত্র সহযোগে বক্তৃতা দিয়া যাইয়া

থাকেন। ইহাতে লেক পল্লীর মহিলাদিগের উৎসাহ খুব আছে। প্রতিবারেই বহু মহিলা সভাতে উপস্থিত হন।

প্রতি বৃহস্পতিবার ১টা হইতে ৪টা পর্য্যন্ত ছাঁটকাট ও সেলাই শিক্ষা দেওয়া হয়। এই উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় সমিতি হইতে একজন শিক্ষয়িত্রী আসিয়া থাকেন। বর্ত্তমানে সেলাই শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। সকল সভ্যাই সেলাই ও ছাঁটকাট শিখেন। সভ্যাগণ সকলেই গৃহে ব্যবহারোপযোগী দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া থাকেন। সভ্যাগণ নিজেরাই সমিতির প্রস্তুত দ্রব্যাদি ক্রয় করিয়া লইয়া থাকেন।

জামা, সেমিজ, পাঞ্জাবী প্রভৃতি সেলাই শিক্ষা দেওয়া হয়। সমিতি হইতে কাপড় ও সূতা প্রয়োজন হইলে সরবরাহ করা হয়। সমিতির সভ্যারা হাঁটিয়াই যাতায়াত করেন। সমিতির উন্নতিকল্পে অনেকে সৎপরামর্শ দিয়া আমাদিগকে উপকৃত করেন। লেক অঞ্চলে সকলেরই সহানুভূতি আছে। অদ্যাবধি ইঁহারা আমাদিগকে সর্ব্ববিধ সাহায্য করিতেছেন :—

১। শ্রীযুক্ত জে, সি, বোস।

২। শ্রীযুক্ত প্রমোদ সেন।

৩। শ্রীযুক্তা প্রমীলা রায়। ইঁহার বাটীতে আমাদের সমিতির কার্য্য কয়েকমাস করিতে দিয়া ইনি বিশেষ উপকৃত করিয়াছিলেন।

৪। শ্রীযুক্তা স্নেহময়ী দাস ৫৲।

৫। " কমলা মিত্র ২৲।

৬। লালা হরিশচন্দ্র খাম ৫৲।

৭। বালিকরাম কিষণচাঁদ।

ইহা ব্যতীত সভ্যারাও এককালীন কিছু কিছু দিয়া সমিতিকে সাহায্য করিয়াছেন।

গত জানুয়ারী মাসে একবার রেড ক্রস সোসাইটীর লোক আসিয়া ছায়াচিত্র সহযোগে বক্তৃতা দিয়াছিলেন। উক্ত দিবস কেন্দ্রসমিতি হইতে শ্রীযুক্তা হেমলতা দেবী আসিয়াছিলেন এবং তিনি আমাদের উপদেশ দিয়াছিলেন ও বক্তৃতা করিয়া আমাদের বিশেষ প্রকারে উপকৃত করিয়াছিলেন।

শ্রী তারা রায়,
সম্পাদিকা

সিমলা—টুটীকাণ্ডি আর্য্যনারী সমিতি

বর্ত্তমানে সমিতির সভ্যাসংখ্যা ২০ জন এবং এই সমিতির শাখা "বালক-বালিকা সমিতি"তে ২০টি বালক-বালিকা আছে। তাহারা কুমারী রেণু রায় ও কুমারী মণিকা ধরের তত্ত্বাবধানে প্রতি শনিবার একত্রিত হইয়া গান, ভজন, সেলাই, বোনা এবং পত্রিকাদি পাঠ করে।

২৫৲ টাকার খদ্দর কিনিয়া, ৪০টি জামা প্রস্তুত করিয়া এবং কিছু পশমের মোজা ও টুপী বুনিয়া, এবং নগদ ১০৲ টাকা স্যার পি, সি, রায়ের কাছে দুঃস্থ ব্যক্তিদের সাহায্যের জন্য পাঠান হইয়াছে। তিনি উহা বঙ্গীয় সঙ্কট-ত্রাণ সমিতিতে দান করিয়াছেন।

গত বৎসরের ন্যায় এ বৎসরও এখানে একটি শিল্প-প্রদর্শনী হইয়াছিল। সভ্যাগণের প্রস্তুত এম্ব্রয়ডারী, ফ্রক, ব্লাউজ, টেবিলক্লথ, কুশন প্রভৃতি এবং কার্পেটের কাজ, সুতলীর আসন, পাড়ের গদি ও বিছানার ঢাকনী, এবং সন্দেশ, রসগোল্লা, নারিকেলের চিঁড়া প্রভৃতি প্রদর্শনীতে দেওয়া হইয়াছিল। অনেক জিনিষ বিক্রয় হইয়াছে। সভ্যাগণ নিম্নলিখিত ভাবে পুরস্কার পাইয়াছেন :—

১। শ্রীমতী নলিনীবালা সেন—এমব্রয়ডারীতে প্রথম পুরস্কার মেডেল ও একটি প্রশংসাপত্র।

২। শ্রীমতী সুহাসিনী দেবী 'ড্রনথড্' এ মেডেল।

৩। শ্রীমতী ননী দেবী—ছাট্‌কাটে মেডেল ও একটি প্রশংসাপত্র।

৪। শ্রীমতী অমলা সেন—এমব্রয়ডারীতে মেডেল ও দুইটি প্রশংসাপত্র।

৫। কুমারী বিদ্যা দেবী (পাঞ্জাবী) বয়স ১৫ বৎসর—কসিদার কাজে মেডেল ও সুতলীর আসনে প্রশংসাপত্র।

৬। শ্রীমতী সীতা দেবী (গুর্খা)—কার্পেটের কাজে মেডেল ও প্রসংসাপত্র।

৭। শ্রীমতী নীলিমা দাশগুপ্তা—ছাট্‌কাটে প্রথম ও দ্বিতীয় পুরস্কার ২টি মেডেল, এমব্রয়ডারীতে ২টি প্রশংসাপত্র।

৮। শ্রীমতী রাধারাণী দেবী—উলের কাজে প্রশংসাপত্র।

৯। শ্রীমতী ললিতা মজুমদার—এম্‌ব্রয়ডারীতে ২টি প্রশংসাপত্র।

১০। কুমারী রেণু রায় বয়স ১৫ বৎসর—ড্রয়িংএ প্রথম পুরস্কার মেডেল, ওয়াটার পেন্টিংএ মেডেল, এম্‌ব্রয়ডারীতে (বালিকা বিভাগে) মেডেল ও একটি প্রশংসাপত্র।

সরোজনলিনী শিল্পপ্রদর্শনী হইতে এ বৎসর আমরা সূচিশিল্পে প্রথম শ্রেণীর প্রশংসাপত্র পাইয়াছি। শ্রীমতী নলিনীবালা সেনের সূচিশিল্পে "প্রলোভন" নামক ছবিখানি ইণ্ডিয়ান রেডক্রস্ সোসাইটি কিনিয়া বিলাতে রেডক্রস্ নার্সিং হোমে পাঠাইয়াছেন।

পূর্ব্বের ন্যায় প্রতি সোমবারে এক একজন সভ্যার বাড়ীতে অধিবেশন হইয়াছে। বর্ষাকালেও সমিতির অধিবেশন বন্ধ থাকে নাই। যদিও গাড়ীর বন্দোবস্ত নাই, তথাপি সভ্যাগণ আনন্দ ও উৎসাহের সহিতই যোগদান করিয়াছেন।

শ্রী নলিনীবালা সেন,
সম্পাদিকা

স্মৃতি-অর্ঘ্য

শ্রী হেমলতা দেবী

বিফল জীবন সফল-করা স্মৃতির অর্ঘ্যদান,
তোমার অনুষ্ঠান সে মাতঃ তোমার অনুষ্ঠান।
মৌন যাদের মনের আশা
পায় না খুঁজে পথের ভাষা
মিল্‌ল তাদের পথের দিশা জাগ্‌ল নূতন প্রাণ॥
বাণীর দিব্য আসনখানি
বিছাল যার বক্ষে আনি
কন্যাকণ্ঠ তুল্‌ল যেথায় বিদ্যামুখর তান॥
শিল্প-আগার অন্ন মিলায়
মুক্ত বাতাস স্বাস্থ্য বিলায়
হৃদয়-দোলায় সাগর দুলায় আনন্দ-সন্ধান।
তোমার দেওয়া স্থান সে মাতঃ তোমার দেওয়া স্থান॥*

---

* ৺ বসন্তকুমারী দেবীর বাৎসরিক স্মৃতিসভার গীত।

নারী-প্রতিভা

স্বামী কৃপানন্দ সরস্বতী

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

শ্রীযুক্তা স্বর্ণকুমারী দেবী

ইনি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কন্যা। বাল্যে বাংলা ও সংস্কৃত, বিবাহের পর স্বামী জানকীনাথ ঘোষালের নিকট ইংরাজী ভাষা শিক্ষা করেন। মহিলাদের মধ্যে ইনিই প্রথম উপন্যাস "দীপনির্ব্বাণ" রচনা করেন। পরে হুগলীর ইমামবাড়ী, বিদ্রোহ, ছিন্নমুকুল, স্নেহলতা, কাহাকে, ফুলের মালা, বসন্ত-উৎসব, মিবাররাজ ইত্যাদি উপন্যাস, কবিতা-গ্রন্থ ও শিশুপাঠ্যাদি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ইনি ১৩০২ সন পর্য্যন্ত "ভারতী" নামক প্রসিদ্ধ মাসিকের সম্পাদিকা ছিলেন। প্রায় ১২ বৎসর "ভারতী"র দায়িত্বপূর্ণ কাজ করিয়া উহার ভার কন্যা শ্রীযুক্তা সরলা দেবী (চৌধুরাণী) বি-এ'র হাতে অর্পণ করেন। পুনরায় কন্যার নিকট হইতে উহার ভার গ্রহণ করেন। ইনি মহিলাদের সমাবেশ উদ্দেশ্যে "সখী-সমিতি" নামক একটি সমিতি স্থাপন করিয়াছিলেন। এবং মেয়েদের শিল্পকলার উৎসাহ মানসে মহিলা-শিল্পমেলা নামক একটি মেলার প্রতিষ্ঠা করেন। ইঁহার মধ্যে যেরূপ মনীষা ও নানাবিধ রমণীসুলভ গুণাবলী দৃষ্ট হয়, তাহা অন্যত্র বড়ই দুর্ল্লভ।

৺কুমারী তরু দত্ত

ইনি বিখ্যাত কবি। ১৩ বৎসর বয়সে মাতা, পিতা ও জ্যেষ্ঠা ভগ্নী অরু দত্তের সহিত বিদ্যাশিক্ষার্থ ইংলণ্ড গমন করেন। (১৮৬৯ খৃঃ) ইনি কলিকাতা রামবাগানের গোবিন্দচন্দ্র দত্তের কনিষ্ঠা কন্যা। পিতামাতার নিকট তরু ও অরু খৃষ্টধর্ম্ম শিক্ষা করেন। তখনকার দিনে খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করা উচ্চ-ইংরাজীশিক্ষিত এক শ্রেণীর লোকেরা বড় গৌরবজনক মনে করিতেন। তরু দত্ত অতি অল্প-বয়সে ইংরাজী ও ফরাসী ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের নিকটে যশস্বিনী হইয়াছিলেন। উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট ফরাসী কবিতা ইংরাজী ভাষায় অনুবাদ করিয়া বহি প্রস্তুত করিয়াছিলেন। বিলাত হইতে প্রত্যাগত হইয়া (১৮ বৎসর বয়সে) সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করেন। তাঁহার উৎকৃষ্ট কবিতাদি সাময়িক পত্রিকা প্রভৃতিতে প্রকাশিত হইত। দুঃখের বিষয় ২২ বৎসর বয়সে তিনি যক্ষারোগে প্রাণত্যাগ করেন। অরু—তরুর পূর্ব্বেই ঐ রোগে লোকান্তরিত হন। ইঁহারা উভয়েই কুমারী ছিলেন ও পিতা-মাতার পূর্ব্বে দেহত্যাগ করেন। ইংরাজী ও ফরাসী ভাষায় লিখিত "A sheaf gleaned from French Fields", "De journal de Midlle," "D. Auvers" রচনা করিয়া বিদ্বজ্জগতে অমর হইয়া রহিয়াছেন।

৺কর্ম্ম দেবী

চিতোরাধিপতি সমর সিংহের অন্যতমা অধিরাণী। সমর সিংহ দিল্লীশ্বর পৃথ্বীরাজের অনুগামী হইয়া রণশয্যা গ্রহণ করিলে—মহম্মদ ঘোরী কুতবুদ্দিনকে চিতোর অধিকার করিতে পাঠান (১১৯৩ খৃঃ)। কর্ম্ম দেবী পুরুষ-বেশে রাজপুত সেনাগণের অধিনায়িকা রূপে ভীষণ যুদ্ধে কুতবুদ্দিনকে পরাজিত করিয়া স্বীয় অধিকার বজায় রাখেন।

মহারাণী ঝিন্দনকুমারী

পাঞ্জাবকেশরী মহারাজ রণজিৎ সিংহের বিবাহিতা স্ত্রীগণের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান প্রিয়তমা মহিষী—মহারাজ দলিপ সিংহের জননী। "মহারাণী ঝিন্দনের চরিত্র অতি বিচিত্র। ইনি পুরুষোচিত অটলতা, সহিষ্ণুতা, নির্ভীকতা প্রভৃতি গুণাবলম্বিনী এবং অতিশয় তেজস্বিনী ছিলেন। প্রোৎসাহিনী শক্তি সঞ্চালনে সৈন্যগণের উৎসাহ বর্দ্ধন এবং অদ্ভুত মন স্থিতায় অনেকে ইঁহাকে ইংলণ্ডেশ্বরী এলিজাবেথের সমান

বলিয়া থাকেন। কিন্তু একমাত্র মহান্ দোষ এই বীর-ললনাকে সাম্রাজ্যদণ্ড পরিচালনের অনুপযুক্ত করিয়াছিল। ইনি স্বীয় চরিত্র নিষ্কলঙ্ক রাখিতে সমর্থ হয়েন নাই *।” সুখদুঃখের অপূর্ব্ব সমাবেশ ইঁহার জীবনকে অপূর্ব্ব বৈচিত্র্যময় করিয়াছে। যে ঝিন্দনকে রণজিৎ “প্রিয় পতির প্রিয়তমা” বলিতেন, সেই ঝিন্দন দুঃখের সর্ব্ববিধ অবস্থায় পতিত হইয়াছেন। বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের অভিযোগে ইনি নানাস্থানে নানাভাবে বন্দিনী-জীবন যাপন করেন। পুত্রমুখ দর্শন হইতে বঞ্চিত থাকা ইঁহার জীবনের অন্যতম প্রধান দুঃখ। অবশেষে চুণার দুর্গ হইতে ঝিন্দন কৌশলক্রমে পলাইয়া নেপাল রাজ্যে গমন করেন এবং অতিকষ্টে নেপালের দুর্গম পথ অতিক্রম করিয়া জংবাহাদুরের আশ্রয়প্রার্থিনী হন (১৮৪৯)। ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট এই কথা শুনিয়া ঝিন্দনের সমস্ত অবশিষ্ট সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করেন এবং মাসিক সহস্র টাকা বৃত্তি দিয়া নেপালেই বাসের আদেশ করেন। কিন্তু নেপালেও তাঁহার শান্তি হইল না। নেপালের কাছে, ঝিন্দন বার্ষিক ২০ হাজার টাকা পাইতেন, জংবাহাদুরের ইহা অসহ্য। এই সময় মহারাজ দলিপ ইংলণ্ড যাত্রা করেন। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে মহারাজ দলিপ স্বীয় রাজ্যের বন্দোবস্ত, শিকার ও মাতার একটা বন্দোবস্তের জন্য ভারতে আগমন করেন। মহারাজ দলিপ খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই সময় গবর্ণর জেনারেল মহারাণী ঝিন্দনকে নেপাল হইতে আসিবার অনুমতি দেন এবং ঝিন্দনের অস্থাবর সম্পত্তি যাহা বাজেয়াপ্ত করা হইয়াছিল তাহা ফেরৎ দেন। এই সময় পুত্রের সহিত মহারাণী ইংলণ্ড গমন করেন। ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে পাঞ্জাবের ভাগ্যলক্ষ্মী রণজিৎমহিষী ভাগ্যচক্রের সকল আবর্ত্তনের মধ্যে পতিত হইয়া অবশেষে ইংলণ্ডে ইহলীলা সম্বরণ করেন। তাঁহার মৃতদেহ বোম্বাইতে আনিয়া পুত্র মহারাজ দলিপ সিং সৎকার করিলেন এবং জননীর পবিত্র ভস্ম নর্ম্মদার জলে নিক্ষেপ করিলেন।

(ক্রমশঃ)

* শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব।

আগামী সংখ্যায় কথাসাহিত্যে অন্যতম স্থান গ্রহণ করিবেন উদীয়মান কথাশিল্পী—শ্রীযুক্ত জগদীশ গুপ্ত।

৺চন্দ্রমাধব ঘোষ

আমরা গভীর শোকসন্তপ্তচিত্তে জানাইতেছি যে আমাদের পরম বন্ধু, সমিতির অন্যতম প্রধান কর্ম্মী শ্রীযুক্ত চন্দ্রমাধব ঘোষ মহাশয় আর ইহলোকে নাই। মাত্র ৩৬ বৎসর বয়সে পিতামাতা, স্ত্রীপুত্র, আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধবগণকে অকূল শোকসাগরে নিমজ্জিত করিয়া নিদারুণ ম্যানিন্‌জাইটিস রোগে কালগ্রাসে পতিত হইয়াছেন। পিতামাতার একমাত্র পুত্র, বিপন্নের বন্ধু, আর্ত্তের সহায়, শ্রমিকগণের সহৃদয় নেতা, ছাত্রদের সখা, সরোজনলিনী নারীমঙ্গল সমিতির অকৃত্রিম বন্ধু, চন্দ্রমাধব যে ইহলোকে নাই তাহা বিশ্বাস করিতেই ইচ্ছা করে না। আমরা যেন মানসচক্ষে দেখিতেছি তাঁহার সেই সদাশান্ত সৌম্য মূর্ত্তি ধীর পদক্ষেপে সমিতির গৃহে প্রবেশ করিতেছে। হৃদয়ের সমস্ত অনুরাগ দিয়া তিনি সমিতিকে ভাল বাসিয়াছিলেন— সমিতির কর্ম্মীগণও তাই তাঁহাকে সম্পূর্ণ আপনার জন বলিয়া জানিত। তাঁহার সরল অকপট ব্যবহার, হৃদয়ের ঔদার্য্য আমাদের চিত্তকে মুগ্ধ করিয়াছিল। সমিতির প্রবীণ কর্ম্মীগণ তাঁহার সম্বন্ধে অনেক আশা পোষণ করিতেন। পিতামাতা স্নেহের পুত্তলীকে গঙ্গার জলে বিসর্জ্জন দিলেন, পতিগতপ্রাণা পত্নীর বুকে শেলাঘাত হইল, সুকুমার শিশু সন্তানগণ স্নেহময় জনকের ক্রোড়চ্যুত হইল, আমরা একজন মহৎহৃদয় কর্ম্মী ও নেতাকে হারাইলাম। বিধাতার কি উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল জানি না।

চন্দ্রমাধব বাবু ১৮৯৭ সালে তাঁহার মাতামহ রায়সাহেব জ্ঞানচন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ের কলিকাতার গৃহে জন্মগ্রহণ করেন। যাঁহার নামানুসারে নন্দকুমার চৌধুরী লেন হইয়াছে সেই নন্দকুমার বাবু জ্ঞানচন্দ্রের পিতা ছিলেন। জ্ঞানচন্দ্র বেঙ্গল সেক্রেটরিয়েটের পলিটিক্যাল ডিপার্টমেণ্টের রেজিষ্ট্রার ছিলেন। চন্দ্রমাধব বাবু মেট্রোপলিটান ইনষ্টিটিউসন হইতে ম্যাট্রিকুলেসন, শ্রীরামপুর কলেজ হইতে আই-এ ও বি-এ এবং রিপন কলেজ হইতে বি-এল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া মিঃ এন, সি, বসুর আফিসে কিছুদিন এটর্ণির কার্য্য শিক্ষা করেন। ১৯২৮ সালে মিঃ এন, সি, বসুর পৌত্রী শ্রীমতী লতিকা ঘোষের সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। চন্দ্রমাধব বাবুর পিতা রায় বাহাদুর দুর্গাপ্রসাদ ঘোষ কিছুদিন আলিপুরের জেলা ও সেসন জজের কার্য্য করিয়া ১৯২৯ সালে কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করেন। পরে ১৯৩০ সালে দুর্গাপ্রসাদ বাবু গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের মামলার স্পেশাল ট্রাইবুনালের কমিশনার নিযুক্ত হন। পুত্রের প্ররোচনায় পিতা এই কমিশনারের কার্য্য হইতে অবসর লইয়াছিলেন।

চন্দ্রমাধব বাবু একান্ত নীরবে প্রকৃত গঠনমূলক কার্য্য দ্বারা দেশমাতৃকার সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। কোনপ্রকার বাহ্য-আড়ম্বর প্রকাশ তাঁহার অত্যন্ত স্বভাববিরুদ্ধ ছিল। অতি সাধারণ খদ্দরের পোষাক তিনি অকৃত্রিম শ্রদ্ধার সহিত পরিধান করিতেন এবং বাড়ীর স্ত্রীপুরুষ প্রত্যেকের জন্য সেই ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। ১৯২৮ সালে চন্দ্রমাধব বাবু তাঁহার ভগ্নীপতি মিঃ কে, সি, রায় চৌধুরী এম, এল, সি মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত বিহার সিমেণ্ট এবং লাইম কোম্পানীর অংশীদার রূপে সর্ব্বপ্রথম ব্যবসায়ক্ষেত্রে প্রবেশ করেন। পরে ঘোষ-চৌধুরী কোম্পানী ও সিটি ফার্ণিসিং কোম্পানী নামক দুইটি যৌথ কারবার তাঁহার দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হইয়া যোগ্যতার সহিত পরিচালিত হইতেছিল। সাধুতা এবং সততায় ব্যবসায়-মহলে তিনি ক্রমেই প্রতিষ্ঠা লাভ করিতেছিলেন।

চন্দ্রমাধব বাবুর হৃদয় অতিশয় কোমল ছিল। দুঃখীর দুঃখ দেখিলে তাঁহার হৃদয় বিগলিত হইত। বাল্যকাল হইতে তাঁহার মনে পরোপকার করিবার প্রবৃত্তি জাগরিত হইয়াছিল। কলেজে অধ্যয়ন কালে পিতার প্রদত্ত খরচ হইতে দুইটি দরিদ্র ছাত্রের বেতন প্রদান করিতেন। পরে কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া বিবিধ জনহিতকর প্রতিষ্ঠান তাঁহার নিকট নিয়মিত অর্থসাহায্য প্রাপ্ত হইত। এই সকল প্রতিষ্ঠানে তিনি কেবলমাত্র নিজে অর্থসাহায্য করিয়া ক্ষান্ত

থাকিতেন না, উপরন্তু অর্থশালী ব্যক্তিগণের দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া অর্থসংগ্রহ করিয়া দিতেন।

১৯২৭ সাল হইতে চন্দ্রমাধব বাবু শ্রমিকগণের দুঃখ-দুর্দ্দশা নিবারণের—তাহাদের উন্নতির কার্য্যে আত্মনিয়োগ করেন। তিনি অনেক শ্রমজীবী সমিতি (লেবার ইউনিয়ন) কর্ত্তৃক অবৈতনিক লিগাল এড্‌ভাইসার নির্ব্বাচিত হন। মৃত্যুর পূর্ব্বে কয়েক বৎসর যাবৎ কলিকাতার কেরাণী সমিতি এবং ল্যান্সডাউন জুট মিল লেবার ইউনিয়ন তাঁহাকে সহঃ-সভাপতি নির্ব্বাচন করেন। নিখিল ভারত ট্রেড্‌ ইউনিয়ন কংগ্রেসের প্রাদেশিক সমিতির কার্য্যকরী সভার সদস্যরূপে ভারতে শ্রমিকদের অবস্থার উন্নতির জন্য তিনি যে সকল কার্য্য করেন তাহাতে শ্রমিকদের মধ্যে বিশেষ সুনাম হয়। পণ্ডিত জহরলাল নেহেরুর সভাপতিত্বে নাগপুর সহরে যে নিখিল ভারত ট্রেড্‌ ইউনিয়ন কংগ্রেসের অধিবেশন হইয়াছিল তাহাতে চন্দ্রমাধব বাবু বিশেষ যোগ্যতার সহিত কমিউনিষ্ট দলের বিরুদ্ধে প্রস্তাব উপস্থাপিত করেন।

মিঃ কে, সি, রায় চৌধুরীর অনুপ্রাণনায় সরোজনলিনী নারীমঙ্গল সমিতিতে যোগদান করিয়া তিনি ক্রমে ক্রমে সমিতির নানা বিভাগের কর্ত্তৃত্বভার গ্রহণ করেন। ১৯২৮ সালে কলিকাতার পোড়াবাজারে সমিতির সাহায্যের জন্য যে প্রকাণ্ড প্রদর্শনী ও উৎসবের অনুষ্ঠান হইয়াছিল তাহা প্রধানতঃ তাঁহার চেষ্টাতেই সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছিল। এই প্রদর্শনী হইতে সমিতির যথেষ্ট আয় হইয়াছিল এবং এই অর্থ হইতেই সমিতির স্থায়ী তহবিলের ভিত্তি স্থাপিত হয়।

তাঁহার বাসস্থান চন্দননগরের নানা প্রতিষ্ঠানের সহিত তিনি সংশ্লিষ্ট ছিলেন। চন্দননগর স্পোর্টিং ক্লাবের কোষাধ্যক্ষরূপে তিনি দুইটি বিরোধীদলের বহুদিনের মনোমালিন্য দূর করিয়া সামঞ্জস্য সাধন দ্বারা সকলের প্রশংসাভাজন হন। তাঁহার দ্বারা অনেক দুর্দ্দশাগ্রস্ত পরিবার সাহায্য পাইয়াছে এবং অনেক বেকার যুবকের জীবিকা-উপার্জ্জনের পথ প্রস্তুত হইয়াছে।

গত দুই বৎসর তাঁহার সিটি ফার্ণিসিং কোম্পানীতে অনেক মাল জমা হইয়া লোকসান হইতেছিল। মিঃ চৌধুরী তাঁহাকে এই কারবারটি বন্ধ করিতে বলেন। তাহাতে তিনি উত্তর দেন যে তাহা হইলে দরিদ্র কর্ম্মচারী এবং তাহাদের পরিবারবর্গের কি দশা হইবে। আজকালকার দিনে তাহাদিগকে উপবাস করিয়া মরিতে হইবে?

ইদানিং মধ্যে মধ্যে তাঁহার শরীর অসুস্থ হইতেছিল। অসুস্থতা সত্ত্বেও গত ১০ই জুন মিস্ সোমের সস্নেহ আহ্বান উপেক্ষা করিতে না পারিয়া কোন্নগরের বাগান-বাড়ীতে অনুষ্ঠিত পার্টিতে সরোজনলিনী নারীমঙ্গল সমিতির কর্ম্মীগণের সহিত তিনি সপরিবারে যোগদান করিয়াছিলেন। সরোজনলিনী সমিতির উৎসবে সেই তাঁর শেষ যোগদান করা।

৺চন্দ্রমাধব ঘোষ

মে মাসের মাঝামাঝি সময়ে একবার তাঁহার শরীর খুব অসুস্থ হইয়া পড়ে। আফিসে বসিয়া থাকিতে থাকিতে তিনি ঘাড়ের দিকে তীব্র বেদনা অনুভব করেন এবং এক-সপ্তাহ কাল শিরঃশূলে ভীষণ যন্ত্রণা পান। ৭ দিনের মধ্যে আরোগ্য লাভ করিয়া তিনি পুনরায় কাজে যোগ দেন। তথাপি মধ্যে মধ্যে তাঁহার মাথার মধ্যে বেদনা অনুভূত হইত। সেজন্য ডাক্তারের পরামর্শক্রমে কিছুদিন সম্পূর্ণ বিশ্রাম গ্রহণ করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। কিন্তু কয়েক দিন পরেই এই বেদনা অত্যন্ত তীব্র হইয়া তাঁহাকে সম্পূর্ণ সংজ্ঞা-

হীন করিয়া দেয়। কলিকাতা হইতে ডাঃ বিধান রায়, ডাঃ ইউনান্ তাঁহার চিকিৎসার জন্য চন্দননগর গমন করেন। চিকিৎসকগণের বহু চেষ্টা ও যত্ন সত্ত্বেও গত ২৩শে জুন রাত্রি আড়াইটার সময় সকলকে শোকসাগরে ভাসাইয়া তিনি ইহলোক ত্যাগ করেন। মৃত্যুসংবাদ প্রচারিত হইবা মাত্র চারিদিক হইতে বহুলোক তাঁহার প্রতি শেষসম্মান প্রদর্শনের জন্য তাঁহাদের বাড়ীতে উপস্থিত হন।

কলিকাতা হইতে রায় বাহাদুর অবিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্তা নীরজবাসিনী সোম তাঁহার মৃত্যুর একদিন পূর্ব্বে তাঁহাকে সম্পূর্ণ সংজ্ঞাহীন অবস্থায় দেখিয়া আসেন। মৃত্যুর দুইদিন পূর্ব্ব হইতে তাঁহার সাধ্বী পত্নী শ্রীমতী লতিক ঘোষ নতজানু হইয়া করজোড়ে তাঁহার আরোগ্যকামনায় একাগ্রভাবে ভগবানের নিকট প্রার্থনা জানাইয়াছিলেন। কিন্তু ভগবান তাঁহার প্রার্থনা পূর্ণ করেন নাই। মৃত্যুর পর তিনি মহাশোকের মধ্যে থাকিয়াও অবিচলিত ভাবে পরমেশ্বরের নিকট শান্তি প্রার্থনা করিতেছেন। চারিদিকে শোকের অশ্রু প্রবাহিত—কিন্তু সাধ্বী পত্নী চরম নিষ্ঠার সহিত ভগবানে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন।

গত ২৬শে রবিবার চন্দননগরের জনসাধারণ নৃত্যগোপাল স্মৃতিমন্দিরে তাঁহার উদ্দেশে একটি শোকসভার অধিবেশন করেন। চন্দননগরের শ্রীযুক্ত হরিহর শেঠ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সভার মধ্যে তিনি অশ্রু বিসর্জ্জন করেন। স্পোর্টিং ক্লাব হাউসে আর একটি শোকসভার অনুষ্ঠান হয়। তথায় চন্দ্রমাধব বাবুর উপযুক্তরূপ স্মৃতি রক্ষা করিবার বিষয়ে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়।

চন্দ্রমাধব বাবু পিতামাতার একমাত্র সন্তান ছিলেন। তাঁহার পিতামাতা এখনও বর্ত্তমান। তিনি দুইটি পুত্র ও একটি কন্যা রাখিয়া গিয়াছেন। বড় ছেলে অমলেন্দুর বয়স ৯ বৎসর। কন্যা সীতা ৩ বৎসরের। তাঁহার পত্নীও পিতামাতার একমাত্র কন্যা।

তাঁহার মৃত্যুসংবাদ কলিকাতা পৌঁছিবা মাত্র সরোজনলিনী নারীমঙ্গল সমিতির সমস্ত বিভাগ বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। সমিতির সব বড় কাজে চন্দ্রমাধব বাবুর ডাক পড়িত। রায় বাহাদুর, মিস্ সোম, মিঃ দত্ত তাঁহাকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। কোন সভায় অথবা উৎসবে উপস্থিত না হইতে পারিলে রায় বাহাদুর উদ্বিগ্ন হইয়া তাঁহার কথা জিজ্ঞাসা করিতেন। সমিতি তাঁহার অভাবে অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। সমিতির পক্ষে তাঁহার স্থান পূর্ণ করা কঠিন হইবে।

এইমাত্র সংবাদ পাওয়া গেল—সাহিত্য-সম্রাজ্ঞী স্বর্ণকুমারী দেবী পরলোকগতা হইয়াছেন। ভগবান তাঁর পবিত্র আত্মার কল্যাণ করুন।

জাতির শক্তি ও আনন্দের উৎস

(কোন নব-মহিলাসমিতির প্রতিষ্ঠা-উত্তোগে)

শ্রী গুরুসদয় দত্ত আই-সি-এস্

জীবন্ত জাতির দুইটি অপরিহার্য্য লক্ষণ—শক্তি ও আনন্দ। জীবন্মৃত বাঙ্গালী জাতিকে আবার সঞ্জীবিত করিয়া তুলিতে হইলে তাহাকে শক্তিময় ও আনন্দময় করিয়া তুলিতে হইবে।

জাতির শক্তি ও আনন্দের উৎস—নারী। বাংলা দেশে আজ নারী শক্তিহীনা ও আনন্দহীনা বলিয়াই বাঙ্গালীর শক্তিহীনতা ও আনন্দহীনতা তাহাকে আজ বিশ্বমানবের হাস্যাস্পদ ও কৃপার পাত্র করিয়া তুলিয়াছে। তাই বাংলার মানুষকে আবার সঞ্জীবিত ও প্রভাবান্বিত করিতে হইলে বাংলার নারীকে করিতে হইবে শক্তির ও আনন্দের সাধনা।

জ্ঞানেই শক্তি এবং মুক্তিতেই আনন্দ। সুতরাং বাংলার নারীর আজ চাই জ্ঞানের সাধনা ও মুক্তির সাধনা। একমাত্র এই জ্ঞানের ও মুক্তির ভীতিহীন সাধনার ভিতর দিয়াই বাংলার নারী আপন ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের উৎকর্ষ সাধন করিয়া বাঙ্গালীকে আবার বিশ্বমানবের আসরে শ্রেষ্ঠ স্থান দান করিবে।

বাংলার নারীকে এই সাধনা করিতে হইবে সঙ্ঘবদ্ধতার ভিতর দিয়া,—কারণ জাতিগত সাধনার সিদ্ধির একমাত্র পন্থা সঙ্ঘবদ্ধতা। তাই আমার নিজের জীবনের শক্তি ও আনন্দের উৎসরূপিণী সরোজনলিনী দেবী কামনা করিয়াছিলেন—বাংলার জেলায় জেলায় ও গ্রামে গ্রামে অচিরে অসংখ্য মহিলাসমিতি গড়িয়া উঠুক।

আপনাদের গ্রামের কল্যাণী মহিলাগণ সরোজনলিনী দেবীর অন্তরের এই আকুল কামনার সফলতা প্রদান করিতে অগ্রসর হইতেছেন জানিয়া আমার প্রাণ হর্ষে উৎফুল্ল হইতেছে। ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি, তাঁহাদের প্রচেষ্টা সফল ও সার্থক হোক্।

কেন্দ্রসমিতির কথা

শোক-সভা

গত ১লা জ্যৈষ্ঠ (১৩৩৯) চক্রধরপুর কল্যাণী-সঙ্ঘের অন্যতম সভ্যা শ্যামসোহাগিনী বসু অগ্নিতে দগ্ধ হইয়া মারা যান। তাঁহার মৃত্যুতে মর্ম্মাহত হইয়া উক্ত সঙ্ঘের সভ্যারা মে মাসের শেষ সপ্তাহে একটি শোক-সভার অনুষ্ঠান করেন। কর্ম্মীর অভাবে কর্ম্ম-প্রতিষ্ঠান যে কত রকম ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না; বিশেষ যদি সেই কর্ম্মীর কর্ম্মে নিষ্ঠা থাকে, কর্ম্মে অগাধ শ্রদ্ধা থাকে, কর্ম্মই যদি তাঁহার জীবনের ব্রতস্বরূপ হইয়া দাঁড়ায়। কল্যাণী-সঙ্ঘের এই সভ্যার মৃত্যুতে সঙ্ঘ যেরূপ ক্ষতিগ্রস্ত হইলেন, আমাদের মনে হয় যে, নারীমঙ্গলকামী সমস্ত প্রতিষ্ঠানই তাহার বেদনা অনুভব করিবেন। আমরা সঙ্ঘের সভ্যাদের সহিত সমবেদন জ্ঞাপন করিতেছি।

উক্ত শোক-সভায় নিম্নলিখিতমত দুইটি প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে :—

১। কল্যাণী-সঙ্ঘের এই সভা সঙ্ঘের সভ্যা শ্রীমতী শ্যামসোহাগিনী বসুর অগ্নিতে দগ্ধ হইয়া মৃত্যু হওয়ায় গভীর শোক প্রকাশ করিতেছে ও তাঁহার মাতৃহারা সন্তানদের জন্য আন্তরিক বেদনা অনুভব করিতেছে।

২। কল্যাণী-সঙ্ঘের এই সভা চক্রধরপুর রেলওয়ে উপনিবেশে গত সাত বৎসরের নানারূপ আকস্মিক দুর্ঘটনায়

অল্পবয়স্কা নারীর মৃত্যুহার লক্ষ্য করিয়া অতিশয় উদ্বেগ প্রকাশ করিতেছেন এবং এই সকল শোচনীয় অকালমৃত্যুর আশু প্রতিবিধানের জন্য জনসাধারণ ও কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছেন।

ডোমার মহিলাসমিতি

গত ১১ই জুন শনিবার, রংপুর জেলার ডোমার গ্রামে স্থানীয় মহিলাদের উদ্যোগে একটি মহিলা-সভার অধিবেশন হয়। কেন্দ্রসমিতির প্রচারক শ্রীযুক্ত ননীগোপাল গোস্বামী এম্-এ, "নারী-জাগরণ" বিষয়ে অতি প্রাঞ্জল ভাষায় বক্তৃতা করেন। তৎপরদিন ১২ই রবিবার সন্ধ্যার সময় স্থানীয় থিয়েটার হলে গ্রামের সমগ্র মহিলা ও পুরুষদের মিলিত একটি সভা হয়। শ্রীযুক্ত গোস্বামী মহাশয় এদিন ম্যাজিক-লণ্ঠন সহযোগে "মহিলাসমিতির উদ্দেশ্য, প্রয়োজনীয়তা ও কার্য্যপদ্ধতি" সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। সভায় প্রায় ৫০০ শত মহিলা যোগদান করেন। বক্তৃতা অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। এ সম্বন্ধে উক্ত সমিতির সহ-সম্পাদিকা শ্রীমতী শৈবলিনী নিয়োগী লিখিয়াছেন যে, "* * তিনি চিত্তাকর্ষকভাবে নারীদের কর্ত্তব্য ও সমিতির উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সুললিত ভাষায় বক্তৃতা করেন। তাঁহার বক্তৃতার ফলে স্থানীয় ভদ্রলোক ও মহিলাদের মধ্যে বিশেষ সাড়া পড়িয়াছে। আশা করি, মধ্যে মধ্যে আপনাদের উপদেশ ও উৎসাহ পাইলে আমরা কার্য্যে আনন্দ ও উৎসাহ পাইব।"

এই সমিতিটি মাত্র কয়েকমাস গঠিত হইয়াছে ; ইহার মধ্যেই স্থানীয় যুবক ও মহিলাদের অসীম কর্ম্মশক্তি ও কর্ম্মে উদ্দীপনা লক্ষিত হইতেছে ; বিশেষভাবে সহ-সম্পাদিকা শ্রীমতী শৈবলিনী ও সভানেত্রী শ্রীমতী রাধারাণী দেবী এবং যুবকদের ঐকান্তিকতা ও নিষ্ঠা বিশেষ প্রশংসার্হ।

প্রবন্ধ-প্রতিযোগিতা

সরোজনলিনী দত্ত নারীমঙ্গল সমিতির অন্যতম সহযোগী সম্পাদক শ্রীযুক্ত চন্দ্রমাধব ঘোষ মহাশয়ের অকাল মৃত্যুতে তাঁহার স্মৃতি-উদ্দেশে তাঁহার ভগ্নীপতি মিঃ কে, সি, রায় চৌধুরী এম, এল, সি "হিন্দু নারীর আদর্শ" সম্বন্ধে উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ-লেখিকাকে ১০০৲ টাকা পুরস্কার দিবেন। এই প্রবন্ধ-প্রতিযোগিতার বিস্তৃত বিবরণ শীঘ্রই সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইবে।

Printed by A. C. Sirkar at the Classic Press. 9-3 Ramanath Majumdar Street Calcutta.
and published by him, at 45 Beniatola Lane, Calcutta.

"পঞ্চ বৈষ্ণব বা পঞ্চ তত্ত্ব"

(ঘরের দেয়ালের চালচিত্র)

শিল্পী—শ্রী প্রমোদিনী দেবী

Printed by C. H. Aran & Co.

"বাঁচ্‌লে সবাই তবেই বাঁচি,—
সবার ভালো তাই ত' যাচি।"

৭ম বর্ষ]　　　　শ্রাবণ, ১৩৩৯　　　　[৯ম সংখ্যা

চন্দনবালা

শ্রী পূরণচাঁদ নাহার এম-এ, বি-এল্

আমাদের পাঠক-পাঠিকাগণের মধ্যে অনেকেই সম্ভবতঃ ভগবান্ মহাবীরের নামের সহিত পরিচিত আছেন। ইনি জৈনদিগের তীর্থঙ্কর ছিলেন ও খৃষ্টপূর্ব্ব ৫২৭ বৎসরে নির্ব্বাণ লাভ করেন। ইঁহারই সময় অঙ্গদেশের রাজধানী চম্পা-নগরে দধিবাহন নামে এক রাজা রাজত্ব করিতেন। তাঁহার মহিষীর নাম ছিল ধারিণী। দধিবাহন অতিশয় প্রজাবৎসল ও স্থায়পরায়ণ রাজা ছিলেন। তাঁহার রাজ্যে প্রজারা সর্ব্বত্রই সুখে স্বচ্ছন্দে কালাতিপাত করিতেছিল। দধি-বাহনের বসুমতী নামে এক পরমাসুন্দরী কন্যা ছিল। বসুমতী বয়ঃপ্রাপ্তা হইলে তাহার পিতা-মাতা তাহার শিক্ষার উপযুক্ত ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। বসুমতী ক্রমে গণিত ও সঙ্গীতাদি বিদ্যার সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্মশিক্ষাও লাভ করিয়া-ছিল। এই সময়ে কৌশম্বীতে শতানিক নামে এক নৃপতি রাজত্ব করিতেন। একদিন দধিবাহন-রাজার নগরপ্রহরী-গণ হঠাৎ ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিতে ছুটিতে রাজার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল, "মহারাজ! রাজা শতানিক প্রবল সেনা লইয়া নগর আক্রমণ করিয়াছেন, এক্ষণে মহারাজের যেরূপ আজ্ঞা।" এই সংবাদ শ্রবণ মাত্র রাজা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতে আজ্ঞা দিলেন। যুদ্ধের নাকাড়া বাজিয়া উঠিল ও নগরের চারিদিক অসংখ্য সেনা ঘিরিয়া ফেলিল। কয়েক দিন ধরিয়া ঘোরতর যুদ্ধ চলিল। উভয় পক্ষের বহু সেনা হতাহত হইল। ক্রমে শত্রুসেনা প্রবল বেগে দুর্গ আক্রমণ করিল ও বহুক্ষণ যুদ্ধের পর দুর্গদ্বার ধ্বংস করিয়া নগরে প্রবেশ করিল। নগরের সর্ব্বত্রই হাহাকার পড়িয়া গেল। শত্রুসেনা ইতস্ততঃ লুটপাট আরম্ভ করিল। রাজা দধিবাহন কোনরূপে পলায়ন করিয়া প্রাণ রক্ষা করিলেন।

এই বিপদের সময় রাণী ধারিণী বসুমতীকে সঙ্গে লইয়া রাজপ্রাসাদ হইতে বহির্গত হইলেন এবং চতুর্দ্দিকে প্রাণসঙ্কট অবস্থা উপস্থিত দেখিবা অলক্ষ্যে নগর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। এই সময় শতানিক-রাজার কোন এক উষ্ট্র-সেনা-পতি তাঁহাদিগকে দেখিতে পাইয়া চিন্তা করিতে লাগিল, "অহো! ইহাদিগকে চম্পানগরীর কোন মাতা ও কন্যা বলিয়া

মনে হইতেছে ; ইহারা ব্যতীত এখান হইতে লইয়া যাইবার আর কি মূল্যবান ঐশ্বর্য্য থাকিতে পারে ?" এই ভাবিয়াই সে ঐ মাতা ও কন্যা উভয়কে বন্ধন করিয়া উষ্ট্রের উপর তুলিল এবং উষ্ট্রকে দ্রুতবেগে চালাইতে আরম্ভ করিল। অতঃপর ক্রমে ক্রমে অনেক নদ-নদী পাহাড়-পর্ব্বত উল্লঙ্ঘন করিয়া উষ্ট্র-সেনাপতি ধারিণী ও বসুমতীকে লইয়া একটি নিবিড় জঙ্গলে প্রবেশ করিল। তখন ধারিণী ঐ যোদ্ধাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তুমি আমাদিগকে কোথায় লইয়া যাইতেছ ?" তদুত্তরে সেনাপতি বলিল, "তুমি ভাবিতেছ কেন ? আমি তোমাদিগকে উত্তম আহার্য্য, বহুমূল্য বস্ত্র ও অলঙ্কার দিব— এবং তুমি আমার স্ত্রী হইয়া থাকিবে।" এই নিদারুণ বাক্য শ্রবণ করিয়া ধারিণীর মস্তকে যেন বজ্রাঘাত হইল। তিনি চিন্তা করিলেন,—"হায়! আমার এ কি দশা হইল! কোথায় আমার অকলঙ্ক কুল, শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম, আর আজ কিনা আমাকে এই পাপবাক্য শুনিতে হইল ?—এরূপ জীবন ধারণে ধিক্!" এই চিন্তা ধারিণীর হৃদয়ে এরূপ প্রবল আঘাত করিল যে তিনি সংজ্ঞাহীন হইয়া উষ্ট্রের উপর হইতে ভূমিতে পতিত হইলেন এবং ভূমিতে পতিত হইবা মাত্রই তাঁহার প্রাণবায়ু বহির্গত হইল। তৎক্ষণাৎ বসুমতী চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল,—"এই বিজন বনে আমাকে যমের হস্তে ফেলিয়া মা তুমি কোথায় চলিয়া গেলে! রাজ্য ত গিয়াছেই,—এই দুঃখময় জীবনে কেবলমাত্র তোমারই ভরসা ছিল, আজ তাহাও হারাইলাম!" এইরূপ বিলাপ করিতে করিতে রাজকন্যা বসুমতী মূর্চ্ছিতা হইল। এই সমস্ত ব্যাপার চোখের উপর ঘটিতে দেখিয়াও উষ্ট্র-সেনাপতি কোনরূপ বিচলিত না হইয়া ভাবিল,—"ইহাদিগকে এরূপ বাক্য বলা উচিত হয় নাই ; যাহা হউক, এই কন্যাকে এখন আর কিছু বলিব না নতুবা এও মাতার ন্যায় প্রাণ বিসর্জ্জন দিবে।" এই ভাবিয়া সে বসুমতীর সেবা-শুশ্রূষা করিতে লাগিল। ক্রমে বসুমতীর মূর্চ্ছাভঙ্গ হইল। তৎপর সেনাপতি তাহাকে সান্ত্বনা দিতে দিতে কহিতে লাগিল, "কন্যা! তুমি ধৈর্য্য ধর। যাহা হইবার হইয়াছে, বৃথা শোক করিয়া কোন ফল হইবে না। তুমি শান্তিতে থাক, তোমার কোন অনিষ্ট হইবে না।" এইরূপ প্রবোধ দিতে দিতে তাহারা কৌশম্বী নগরে আসিয়া উপস্থিত হইল।

ঐ সময়ে কৌশম্বী একটি জনাকীর্ণ নগর ছিল। দেশ-বিদেশের বণিকগণ আপনাপন শিল্পজাত দ্রব্য লইয়া ঐ নগরের বাজারে ক্রয়-বিক্রয় করিতে আসিত। সে সময়ে দাস-ব্যবসায় প্রচলিত ছিল। সেনাপতি মনে করিল,—"এই কন্যাটি অতি সুন্দরী, ইহাকে বিক্রয় করিলে অনেক অর্থাগম হইবে।" এইরূপ স্থির করিয়া সেনাপতি অনতিবিলম্বে বাজারে উপস্থিত হইল। সুন্দরী কন্যাকে দেখিয়া চতুষ্পার্শ্বে বহু লোকের সমাগম হইল। সে সময় বসুমতীর হৃদয়ে যে কিরূপ দুঃখের উদয় হইল তাহা বর্ণনাতীত! সে অধোবদনে দণ্ডায়মানা থাকিয়া মনে মনে ঈশ্বরের নিকট কাতর প্রার্থনা জানাইতে লাগিল,—"হে জগদ্বন্ধু জগদীশ্বর! তুমি ভিন্ন আমাকে এই বিপদ হইতে আর কে উদ্ধার করিবে ?" সে উচ্ছ্বসিত হইয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিল। সৌভাগ্যক্রমে ধনাবহ নামক জনৈক শ্রেষ্ঠী সেই সময়ে সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কন্যাটিকে দেখিয়া তাঁহার হৃদয় দয়ার্দ্র হইল, তিনি মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন,—"এই বালিকা নিশ্চয়ই কোন ভদ্রঘরের কন্যা হইবে। কোন বিপত্তিতে পড়িয়া এই পিশাচের হস্তগত হইয়াছে। কোন অসৎ লোকে ইহাকে ক্রয় করিলে নিশ্চয়ই ইহার চিরজীবন দুঃখে কষ্টে অতিবাহিত হইবে। আমিই কেন ইহাকে ক্রয় করিয়া কন্যার ন্যায় পালন করি না ?" এই ভাবিয়া যথেষ্ট মূল্য দিয়া তিনি বসুমতীকে ক্রয় করিলেন।

শ্রেষ্ঠী ধনাবহ বসুমতীকে ক্রয় করিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,"ভগিনি! তুমি কার কন্যা ?" ইহা শুনিয়া বসুমতী বিশেষ শোকাতুরা হইল। তাহার নেত্রপটে তাহার পিতা-মাতা যেন দৃষ্টিগোচর হইল। কোথায় সেই অঙ্গের রাজধানী চম্পা,—আর সেই চম্পার রাজকন্যা বসুমতী আজ কিনা কৌশম্বীর রাজপথে দাসীরূপে বিক্রীতা। সে শ্রেষ্ঠীকে কোন উত্তর দিতে পারিল না। ধনাবহ ভাবিলেন,—"কন্যাটি সম্ভবতঃ কোন সম্ভ্রান্ত বংশের, সেই কারণ আত্মপরিচয় দিতে কুণ্ঠিত হইতেছে। বেচারী আমার প্রশ্নে অতিশয়

দুঃখিত হইয়াছে।" সুতরাং তিনি এ বিষয়ে আর বসুমতীকে কোন প্রশ্ন করিলেন না।

বাটী আসিয়া শ্রেষ্ঠী তাঁহার স্ত্রী মূলাকে বলিলেন, "প্রিয়ে! এটি আমাদের কন্যা, ইহাকে যত্নপূর্ব্বক পালন কর।" মূলা তাহাকে নিজ কন্যার ন্যায় পালন করিতে লাগিল। বসুমতীও তথায় নিজের গৃহের মত সকলের সহিত বাক্যালাপ ও শিষ্ট ব্যবহার করিতে লাগিল। তাহার প্রিয় বচনে শ্রেষ্ঠীগৃহের সকলেই অত্যন্ত আনন্দিত হইল। ধনাবহও তাহার সুমিষ্ট কথায় সন্তোষ লাভ করিতেন এবং বলিতেন যে কন্যাটির বচনে তিনি চন্দনের ন্যায় শান্তি পাইতেছেন।—তজ্জন্য তাহাকে 'চন্দনবালা' বলিয়া ডাকিতেন। চন্দনবালা ক্রমশঃ যৌবনে পদার্পণ করিল ও সঙ্গে সঙ্গে তার দৈহিক সৌন্দর্য্য শতগুণ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। শ্রেষ্ঠী-স্ত্রী মূলা ইহা দেখিয়া ভাবিতে লাগিল,—"আমার স্বামী ইহাকে কন্যা বলিয়া পালন করিতেছেন কিন্তু কোন সময়ে যদি চন্দন-বালার রূপে মুগ্ধ হইয়া তাহাকে বিবাহ করেন তাহা হইলে আমার আর দুঃখের সীমা থাকিবে না।"

ইত্যবকাশে একদিন গ্রীষ্মকালে প্রচণ্ড রৌদ্রে আকুলিত হইয়া শ্রেষ্ঠী গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। হাত-পা ধুইবার জন্য দাস-দাসীকে ডাকাডাকি করিলেন; ঘটনাক্রমে সে-সময় কেহ উপস্থিত না হওয়ায় তিনি ইতস্ততঃ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। চন্দনবালা অনতিদূরে দাঁড়াইয়া ছিল। সে শ্রেষ্ঠীর মনোগত ভাব বুঝিতে পারিয়া স্বয়ং জল আনিয়া শ্রেষ্ঠীর পা ধুইয়া দিতে লাগিল। হঠাৎ তাহার মস্তকের কবরী খুলিয়া যাওয়ায় সমস্ত কেশপাশ ভূমিতে লুটাইয়া পড়িল। শ্রেষ্ঠী নিজহস্তে ভূমি হইতে তাহা তুলিয়া যত্নের সহিত চন্দনবালার মস্তকে বাঁধিয়া দিলেন। মূলা এই দৃশ্য আড়াল হইতে দেখিতেছিল; তাহার হৃদয়ের আশঙ্কা একেবারে বদ্ধমূল হইয়া গেল। সে আর কোন উচ্চবাচ্য না করিয়া স্বামীকে ভোজন করাইল। শ্রেষ্ঠী কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিয়া বাড়ী হইতে বহির্গত হইলেন। পরক্ষণেই মূলা আপনার কার্য্য আরম্ভ করিল। সে প্রথমে নরসুন্দর ডাকাইয়া চন্দনবালার মস্তক মুণ্ডন করাইল, পরে তাহার পদদ্বয় শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া একটি কোণের কুঠ-রিতে লইয়া গিয়া খুব প্রহার করিল, তারপর কুঠরির দরজা বন্ধ করিয়া দিয়া নিজ পিত্রালয়ে চলিয়া গেল। যাইবার পূর্ব্বে বাড়ীর সমস্ত দাস-দাসীকে ডাকিয়া নিষেধ করিয়া গেল যেন কেহ এইসকল বিষয় শ্রেষ্ঠীকে ঘুণাক্ষরে না জানায়।

সন্ধ্যার সময় ধনাবহ গৃহে ফিরিয়া চন্দনবালাকে দেখিতে না পাইয়া দাস-দাসীগণকে তাহার বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন; কিন্তু কেহই কোন উত্তর না দেওয়ায় ভাবিলেন, বোধহয় বাড়ীতেই কোথাও খেলাধুলা করিতেছে। পর-দিবসও ঐরূপ তাহাকে দেখিতে না পাইয়া খোঁজ করিলে পূর্ব্ববৎ সকলেই নীরব রহিল।

তৃতীয় দিবস চন্দনবালার বিষয় স্মরণ হওয়ায় শ্রেষ্ঠী দাস-দাসীগণের উপর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন এবং বলিলেন, "যদি সত্বর তোমরা আমার প্রশ্নের উত্তর না দাও, তাহা হইলে এইক্ষণেই তোমাদিগকে সমুচিত দণ্ড দিব।" ইহা শুনিয়া বাড়ীর একটি বৃদ্ধা দাসী শ্রেষ্ঠীকে আনুপূর্ব্বিক সমস্ত ব্যাপার জানাইল এবং সেই কুঠরিটি দেখাইয়া দিল। এই সমস্ত ব্যাপার জানিয়া ধনাবহের বিশেষ দুঃখ হইল। তিনি অবিলম্বে কুঠরির দ্বার খুলিয়া ভিতরে ঢুকিয়া দেখিতে পাইলেন - চন্দনবালা শৃঙ্খলাবদ্ধ অবস্থায় পড়িয়া আছে। তাহার মস্তক মুণ্ডিত,মুখে অবিরাম ভগবানের নাম উচ্চারিত ও নেত্রে অবিরল অশ্রুধারা প্রবাহিত ও তাহার সমস্ত শরীর অবসন্ন। চন্দনবালার এবম্বিধ অবস্থা দেখিয়া শ্রেষ্ঠীর চক্ষে জল আসিল। তিনি কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "প্রিয় কন্যা, আর দুঃখ করিও না, বাহিরে এস। তোমার এ দশা আর দেখিতে পারিতেছি না! তিন দিন হইতে উপবাসী আছ। হায়, সে দুষ্টা স্ত্রী কোথায়?" বলিতে বলিতে শ্রেষ্ঠী শীঘ্র রন্ধনশালার দিকে আহার্য্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যে চলিয়া গেলেন। দুর্ভাগ্যক্রমে সেখানে কিছুই পাওয়া গেল না, কেবল এক কোণে একটি সূপে কলাইয়ের দা'ল-ভাজা পড়িয়া ছিল, তিনি তাহাই লইয়া চন্দনবালাকে দিলেন ও তাহার পায়ের শিকল কাটিবার জন্য স্বয়ং কর্ম্ম-কারকে ডাকিতে ছুটিলেন। চন্দনবালা ধীরে ধীরে কুঠরির দরজার নিকট আসিয়া বসিয়া পড়িল এবং ভাবিতে লাগিল,—"হায়! মনুষ্যজীবনের কত পরিবর্ত্তন! কোথায়

আমি রাজকন্যা,—কোথায় আমার রাজপ্রাসাদ,—আর আজ আমার এই দুর্দ্দশা! তিন দিন উপবাসের পর আজ কলাইসিদ্ধ আহার জুটিল। কিন্তু আমি কোন অতিথিকে ইহা না দিয়া মুখে দিব না।”

আজ পাঁচ মাস পঁচিশ দিন হইতে চলিল কৌশম্বীতে এক মহাযোগী ভিক্ষার্থ ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছেন। পুরবাসিগণ তাঁহাকে ভিক্ষা দিতে আগ্রহ প্রকাশ করিতেছে কিন্তু তিনি কিছুই গ্রহণ করিতেছেন না,—ইহার কারণ কি? নিশ্চয়ই তাঁহার কোন গূঢ় অভিপ্রায় আছে, সেই কারণ তিনি ভিক্ষা লইতে পরাঙ্মুখ। নগরের সমস্ত লোক ভাবিতেছে এই যোগীরাজ পারণ করিলেই মঙ্গল। তিনি ভিক্ষার্থ বহির্গত হইয়া যে-স্থানে চন্দনবালা দরজার নিকট বসিয়া ভাবিতেছিল সেইখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ঐ অবস্থায় ক্ষণমাত্র তাহার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া ভিক্ষা না লইয়াই তিনি ফিরিতেছেন দেখিয়া চন্দনবালার হৃদয়ে দুঃখের অবধি রহিল না, তাহার নেত্রে অশ্রুস্রোত বহিতে লাগিল, সে বলিল,—“হে কৃপানাথ! আমি কি এতই অভাগা যে এ-সময় দর্শন দিয়াও আমার হস্ত হইতে একমুষ্টি ভিক্ষা পর্য্যন্ত গ্রহণ করিলেন না।” যোগীরাজের অভিপ্রায় সিদ্ধ হইল, তিনি ফিরিয়া হস্ত-প্রসারণপূর্ব্বক ভিক্ষা গ্রহণ করিলেন। ভিক্ষা-গ্রহণকারী এই যোগীরাজ মহাপ্রভু ভগবান্ মহাবীর। যোগীরাজ চন্দনবালার হাত হইতে ভিক্ষা গ্রহণ করা মাত্র চন্দনবালার হাত-পায়ের শৃঙ্খল মুক্ত হইল। মস্তকে পূর্ব্বের ন্যায় কেশপাশ দেখা দিল। সমস্ত প্রকৃতি যেন আনন্দে মাতিয়া উঠিল! ধনাবহ কর্ম্মকারকে সঙ্গে লইয়া ফিরিলেন। চন্দনবালাকে পূর্ব্ববৎ দেখিয়া তাঁহার হর্ষের সীমা রহিল না। চন্দনবালা পিতৃতুল্য শ্রেষ্ঠীর চরণে প্রণাম করিল। ইতিমধ্যে মূলাও বাটী ফিরিল। সে দেখিয়া হতবুদ্ধি হইল। চন্দনবালা তাহাকেও প্রণাম করিয়া বলিল, “মা! আমি আপনার দ্বারা বিশেষ উপকৃত হইয়াছি, আপনারই কৃপায় ত্রিলোকনাথ প্রভু মহাবীর আমার হস্তে পারণ গ্রহণ করিয়াছেন।—ইহা আপনারই অসীম দয়ার কথা!” নগরবাসিগণ এই বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া দলে দলে তথায় আসিতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে রাজা ও রাণী পর্য্যন্ত শ্রেষ্ঠী-ভবনে উপস্থিত হইয়া চন্দনবালাকে ধন্যবাদ দিতে লাগিলেন এমন সময়ে জনতার মধ্য হইতে হঠাৎ একটি সৈনিক পুরুষ অগ্রসর হইয়া চন্দনবালার চরণে প্রণিপাত করিয়া কাঁদিতে লাগিল। পুরবাসিগণ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, “তুমি এই আনন্দের দিনে এরূপভাবে কাঁদিতেছ কেন?” সে উত্তর করিল, “ভাইগণ! ইনি আমাদের রাজকুমারী বসুমতী, চম্পা-নৃপতি দধিবাহন ও রাজমহিষী ধারিণীর কন্যা। কোথায় ইনি অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারিণী ছিলেন আর কোথায় আজ এই দাসীর দশা প্রাপ্ত হইয়াছেন। আমি ইঁহাদেরই আশ্রিত ভৃত্য, যে সময়ে শতানিক-নৃপতি চম্পানগরী আক্রমণ করেন সেই সময় আমি বন্দী হইয়া এখানে আনীত হই। এখানে আমার অপেক্ষাও রাজকুমারীর দৈন্যাবস্থা দেখিয়া আমার বিশেষ কষ্ট হইতেছে।” রাজা-রাণীও এই বৃত্তান্ত শ্রবণ করিলেন। রাণী মৃগাবতী বলিলেন, “ধারিণী আমার ভগ্নী, তাঁহার কন্যা আমারই কন্যাতুল্যা। হে পুত্রী, আমার সঙ্গে চল।” এই বলিয়া রাণী চন্দনবালাকে রাজপ্রাসাদে লইয়া গেলেন। রাজপ্রাসাদে মৃগাবতী চন্দনবালাকে গর্ভজাতা কন্যার ন্যায় যত্নের সহিত রাখিলেন,—কিন্তু সংসারের প্রতি চন্দনবালার বীতরাগ জন্মিল। সে সর্ব্বদাই ভাবিত,—“রাজপ্রাসাদের সুখ ক্ষণিক প্রলোভন মাত্র, তাহাতে কিরূপে শান্তি হইতে পারে? একমাত্র জিনদেবের পবিত্র মূর্ত্তি দর্শনে শান্তি পাওয়া যাইতে পারে। ভগবান্ জিনেশ্বর-দেব সর্ব্বআসক্তিশূন্য। তাঁহার স্মরণ মাত্র দুঃখসাগরেও শান্তি দেখা দেয়। সেই দুঃখতাপহারী নামের ধ্যানই আমার একমাত্র অবলম্বন।” চন্দনবালা দিবারাত্র রাজমহলে থাকিয়াও জিনদেবের ধ্যানে মগ্ন থাকিত। বহুমূল্য বস্ত্রাভরণ, সাজসজ্জা চর্ব্য-চোষ্য-লেহ্য-পেয়াদি কিছুতেই তাহার আসক্তি ছিল না, সে সর্ব্বদাই পুরুষোত্তম তীর্থঙ্করের স্তব ও গুণগান করিত। এইরূপে চন্দনবালা অতি পবিত্র জীবন যাপন করিতে লাগিল। এই সময়ে ভগবান্ মহাবীরও পূর্ণ জ্ঞান প্রাপ্ত

হইলেন। পূর্ণত্ব লাভের পর ভগবান্ মহাবীর পবিত্র জিনধর্ম সম্বন্ধে উপদেশ দিয়া দেশ-বিদেশে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। তখন অনেকেই তাঁহার কথিত সত্যধর্মের সারবত্তা উপলব্ধি করিয়া তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিতে লাগিল। অনেক স্ত্রী-পুরুষ সংসারের অসারতা বুঝিয়া তাঁহার নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিল। শ্রাবিকাগণের মধ্যে চন্দনবালাই তাঁহার প্রথমা শিষ্যা হইলেন এবং পরবর্তী কালে তীর্থদেব মহাবীরের ছত্রিশ হাজার সাধ্বীর মধ্যে প্রধানা বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিলেন। ক্রমে ক্রমে মহাসতী চন্দনবালা নানারূপ যোগ ও তপস্যায় রত থাকিয়া জিনধর্ম সুচারুরূপে পালন করিতে লাগিলেন এবং অবশেষে আয়ুষ্কাল পূর্ণ হইলে নির্ব্বাণ লাভ করিলেন। চন্দনবালার ব্রহ্মচর্য্য, তপস্যা ও ত্যাগ ধন্য। প্রত্যেক বঙ্গলক্ষ্মী তাঁহার জীবনমার্গ অনুসরণ করিয়া আত্মার কল্যাণ সাধন করুন,—ইহাই প্রার্থনা।

'মেঘৈর্মে্দুরম্বরম্—'

শ্রী সুবলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
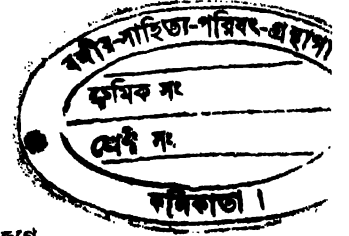
হে পৃথিবী, দেখো আঁখি মেলি,'
ঘনায়েছে কাজল-কুহেলি!
মেঘেরা ডানার ভরে
নেমেছে নীলাম্বরে,—
থরথর কাঁপিছে চামেলি!

হে ধরণী, খোল, খোল দ্বার—
দেখো কাঁদে আদিম আঁধার!
বন-বায়ু-গর্জ্জনে
দুরন্ত জাগে মনে!—
ডমরুতে জাগে মল্লার!

বসুমতী, কি ভাবিছ মনে,
কালিন্দী-কল-ক্রন্দনে?
ঘিরিয়া কদম্-রেণু
ধ্বনিছে পুরানো বেণু!—
ভুজঙ্গ কাঁপে কেয়া-বনে!

শোনো, শোনো—বাদল-নূপুর!
আঁধারে ভরিছে বেণু-সুর।
তমাল-বাণীর দোলে,
তমিস্রা-কলরোলে
তৃণদলে ফোটে অঙ্কুর!

বসুন্ধরা গো, ওঠো জেগে
বজ্র বাজায়ে ঘন মেঘে!
ওষধি-গন্ধ বাহি'
চন্দনে অবগাহি'
ছুটে চলো যৌবন-বেগে।

ওগো মূক, মৃত্তিকাময়ী',
পূর্ণা তটিনী কাঁদে ঐ!
শেহলা, স্রোতের টানে
সেই গান কহে কানে:
'কেমনে এমন ব্যথা সই'?'

ধূমল জটার মোহ-ফাঁদ
পেতেছে সে চির-উন্মাদ!
অগুরু-ধূপের ধূম!—
ঘুমায় গভীর ঘুম
মহুয়া-মদির বাঁকা চাঁদ!

আদিম কালের বিরহিণী,
শুনিছ না বাঁশীর রাগিণী?
নওল-কিশোর আসে!
সুখ-ঘন-নিশ্বাসে,
কেঁপে ওঠে গৌর-কামিনী!

অতনু-মোহন বর-দেহে,
বিজরী জড়িত যেন 'মেহে'—
ময়ূর-পাখায় জ্বালা
যূথির প্রদীপ-মালা!
রোমাঞ্চ জাগে ফুল-গেহে!

অঞ্জনে টানা দুটি ভুরু—
অঙ্গ শিহরে দুরু-দুরু!
মানসের মন্দিরে
নূপুরের ধ্বনি ফিরে—
গগনে গভীর গুরু-গুরু!

ওগো রাধা, হে মোর পৃথিবী,
সম্বরি' বাঁধো তব নীবি।
সুন্দর বারবার
ধরে রূপ-সম্ভার,—
এখনো ফিরায়ে তা'রে দিবি?

হে মেদিনী, ঢাকিয়ো না মুখ!—
—কাঁপে তারি চীন-অংশুক!
প্রখর দাহন-শেষে
হৃদয়-হরণ বেশে
এল সে অধীর,—উন্মুখ।

চেয়ে দেখো', হে অভিমানিনী,
নীপবনে নেমেছে যামিনী!
উচ্ছল যমুনায়
যৌবন শিহরায়—
আঁধিয়ারে শিহরে দামিনী!

কহে কবি: 'হে মোর কিশোর,
পন্থ দেখায়ে চলো ও'র।
অম্বর ভরে মেঘে,
বর্ষণ ছোটে বেগে—
ফুল-রেণু ঝরিছে অঝোর!'

বৌদ্ধধর্ম

কুমারী ছায়া দেবী

আনুমানিক খ্রীষ্টপূর্ব্ব ৬২৩ অব্দে শাক্যরাজ্যের রাজধানী কপিলবাস্তু নগরে সিদ্ধার্থ জন্মগ্রহণ করেন। এই নগরটি রোহিণী নদীর তীরে অবস্থিত ছিল। ইহা বারাণসী ধাম হইতে শতাধিক মাইল উত্তরে এবং অযোধ্যা হইতে পঁচিশ মাইল উত্তরপূর্ব্বে স্থিত একটি জনপদ। কবে এবং কি কারণে এই নগরী বিনষ্ট হইয়াছিল তাহার সঠিক্ ইতিহাস আজও অজ্ঞাত। এই প্রাচীন নগরটি যে স্থানে বিদ্যমান ছিল উক্ত স্থান এখন ভুইলাগ্রাম নামে পরিচিত। কথিত আছে কপিল মুনির সাধনক্ষেত্র ছিল বলিয়া নগরটির নাম 'কপিল-বাস্তু' হইয়াছিল। শাক্যবংশীয়েরা ক্ষত্রিয় ছিল। তাহাদের উৎপত্তি সম্বন্ধে নানা মুনির নানা মত আছে।

একই সময় ভারতবর্ষে দুই জন স্বনামধন্য মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করেন; এবং প্রায় একই সময়ে ধর্ম্মপ্রচার করিয়া দেহত্যাগ করেন। এই দুই জন মহাপুরুষ হইলেন গৌতম-বুদ্ধ ও বর্দ্ধমান-মহাবীর। বর্ত্তমান মজঃফরপুর জেলার অন্তর্গত প্রাচীন বৈশালী নগরের উপকণ্ঠে কুণ্ডগ্রামে খ্রীঃ পূঃ ৫৪০ অব্দে বর্দ্ধমান-মহাবীর জন্মগ্রহণ করেন। ভারতবর্ষীয় ধর্ম্মজগতের চিন্তারাজ্যে এই দুই জন মহাপুরুষের যথেষ্ট প্রভাব আজও বর্ত্তমান আছে এবং ইঁহাদের শিষ্য-সংখ্যাও যথেষ্ট। দুই জনের ধর্ম্মমত অনেক বিষয়ে এক হইলেও প্রভেদও যথেষ্ট পরিলক্ষিত হয়।

বৈদিক যুগ হইতে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ পর্য্যন্ত আর্য্যসভ্যতার গতি ও বিস্তৃতি একভাবে চলিয়াছিল। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে

কাশ্মীর ব্যতীত অন্যান্য বহু রাজ্য যোগদান করিয়াছিল। এই যুদ্ধে ভারতের বাহির হইতে সৈন্যসামন্ত আসিয়াছিল এবং ভারতস্থিত নিম্নজাতিরাও যোগদান করিয়াছিল। মহাভারতে ইহার সবিস্তার বর্ণনা আছে। এই যুদ্ধের ফলে ভারতে অন্ন-বিস্তর বিপর্য্যয় ঘটিয়াছিল। মনস্তাত্ত্বিক হিসাবে এই যুদ্ধের পরিণাম দর্শন করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, এই যুদ্ধের ফলে ভারতে নারী-সংখ্যা যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইয়াছিল। বাহির হইতে যাহারা যুদ্ধ করিতে আসিয়াছিল তাহাদের মধ্যে কিছু লোক ভারতে চিরকালের মত বসবাস করে। যাহারা ফিরিল তাহারা ভারতের ভিতরের ধনদৌলত স্বচক্ষে দর্শন করিয়া গেল এবং স্বদেশে ভারতের রত্নসম্ভারের কথা বর্ণনা করিল। সঙ্করবর্ণের উৎপত্তি,—কিছুকাল অরাজকতা ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যস্থাপনা,—অতিরিক্ত লোকক্ষয় জন্য হিংসার প্রতি ঘৃণা ও কিছুকালের জন্য ক্ষাত্রশক্তি লোপ;—কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পর হইতে বুদ্ধদেবের আগমনের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ভারতের ইতিহাসে চিন্তাশক্তির আর কোন নূতন প্রকাশ নাই।

বুদ্ধদেব যে সময় জন্মগ্রহণ করেন তখন উত্তর ভারতবর্ষ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজত্বে বিভক্ত ছিল। দুই শ্রেণীর রাজত্ব তৎসময়ে দেখিতে পাওয়া যায়। এক শ্রেণীর রাজত্ব হইল যথায় রাজা স্বয়ং সমস্ত রাজকর্ম্ম সম্পাদন করিতেন অর্থাৎ যেখানে রাজা স্বয়ং Judicial and executive function পরিচালনা করিতেন।—উত্তর-কোশল (অযোধ্যা), মগধ (দক্ষিণ-বিহার), বৎস (এলাহাবাদ) এবং অবন্তী (মালব) প্রভৃতি এই প্রকৃতির বড় বড় রাজ্য ছিল। আর এক রকম ছোট ছোট রাজত্ব ছিল যথায় সাধারণতন্ত্র শাসনপ্রণালী প্রচলিত ছিল।—লিচ্ছবী (মজঃফরপুর জেলা), মল্ল এবং শাক্যগণ (নেপাল তেরাই, বস্তি জেলার উত্তর) প্রভৃতি এই শ্রেণীর রাজ্য।

জগতে বৌদ্ধধর্ম্ম যত লোক মানে এত লোক আর কোন ধর্ম্ম মানে না। বর্ত্তমানে ১২,০০,০০০ কোটি লোক বৌদ্ধমতাবলম্বী; ইহা ছাড়া বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতি গভীর সহানুভূতি বহু পণ্ডিত ব্যক্তি প্রকাশ করেন। বৌদ্ধধর্ম্মের কোন ধারাবাহিক সঠিক্ ইতিহাস নাই। বৌদ্ধরা নিজে তাহাদের কোন ইতিহাস লিখিয়া যায় নাই। ভারতবর্ষের উপর মুসলমানরা যে এতদিন ধরিয়া রাজত্ব করিয়া গেল তাহারাও বৌদ্ধধর্ম্মের বিশেষ কিছু জানিত না। প্রথমতঃ তাহারা হিন্দুদের সহিত বৌদ্ধদের তফাৎ বুঝিতে পারিত না এবং দ্বিতীয়তঃ তাহাদের নিকট দুইই কাফের। হিন্দুরা বৌদ্ধদের ভালচক্ষে দেখিত না এবং সেজন্য কোন সহানুভূতিপূর্ণ বিবরণ রাখিয়া যায় নাই। কোন কোন পাশ্চাত্য পণ্ডিত কিছু কিছু লিখিবার চেষ্টা করিয়াছেন কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। বর্ত্তমানে যে পুনরায় বৌদ্ধধর্ম্ম আলোচিত হইতেছে তাহার মূলে একটি হাঙ্গেরিয়ান যুবক—আলেক্‌জাণ্ডার সোমোস্‌ডি কোরোজি। পাঠ্যাবস্থায় তাঁহার ধারণা হইয়াছিল যে মানবের আদিম নিবাস হইল মধ্য-এসিয়া। সেই আদিম নিবাস অন্বেষণ করিবার জন্য তিনি পদব্রজে ভ্রমণ আরম্ভ করেন এবং বহুদেশ ভ্রমণের পর তিনি সিমলায় উপস্থিত হন। ভ্রমণকালে তিনি বহুস্থানে বৌদ্ধধর্ম্মের সন্ধান পান এবং অনেক পুঁথিও যোগাড় করেন। তাঁহার ভ্রমণবৃত্তান্তও পাঠ করিবার বস্তু। ভারতবর্ষেই তাঁহার দেহত্যাগ হয়।

কিন্তু একদিন বৌদ্ধধর্ম্মের বিরাট বিস্তৃতিলাভ ঘটিয়াছিল। এখনকার মত তখন দেশভ্রমণ সহজ ছিল না; পদব্রজই প্রধানতঃ অনন্তপন্থা ছিল। ভারতবর্ষের আশ্-পাশের দেশ প্রায়ই সব বৌদ্ধ হইয়া গিয়াছিল। ভুটান, সিকিম, রামপুরবুসায়রের লোক সবই বৌদ্ধ। নেপালের লোক অর্দ্ধেকের বেশী বৌদ্ধ। তুর্কীস্থান ও পারস্য এককালে বৌদ্ধধর্ম্মের আকর ছিল। আফগানিস্তান ও বেলুচিস্তান বৌদ্ধমতাবলম্বী ছিল। তিব্বতের সব লোক বৌদ্ধ। জাপান, কোরিয়া, মাঞ্চুরিয়া, মঙ্গোলিয়া, বর্ম্মা, সায়াম, আনাম ও সিংহলদ্বীপের অধিকাংশ বৌদ্ধ। একদিন ইজিপ্ট হইতে মেক্সিকো পর্য্যন্ত বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব ছিল। আজও ভারতবর্ষের ভিতর বৌদ্ধধর্ম্মের রীতি-নীতি, আচার-ব্যবহার ওতপ্রোত ভাবে জড়িত আছে। বুদ্ধদেবের তিরোভাবের পর যে সমস্ত নব্য ধর্ম্মসম্প্রদায় উত্থিত হইয়াছে তাহাদের ভিতরও বৌদ্ধভাব প্রচ্ছন্নভাবে অনেক-কিছু আছে। ভারতবর্ষের ইতিহাসে বৌদ্ধযুগের প্রভাব অতি-বিস্তৃত।

এহেন প্রভাবশালী ধর্ম্মের উৎপত্তি হইল কোথা হইতে? কোন্ ঘাত-প্রতিঘাতে আর্য্যভূমিতে এ বিপ্লবী ধর্ম্মের সৃষ্টি

হইল? বৌদ্ধধর্ম্ম আর্য্যভূমিতে বিপ্লবীধর্ম্ম—বৌদ্ধধর্ম্মের সহিত আর্য্যধর্ম্মের মস্ত বিরোধ। বৌদ্ধধর্ম্ম হইল গণশ্রেণীর ধর্ম্ম—সর্ব্বনরনারীর ধর্ম্ম। বৌদ্ধধর্ম্মে জাতিবিভাগ নাই,—নরনারীর বিচার নাই,— ব্রাহ্মণ-শূদ্রের কলহের স্থান নাই,—জাত্যাভিমান নাই। আছে—মাত্র, সর্ব্বজীবের কল্যাণের পথ।

ব্যক্তিগত অনুভূতির উপর ধর্ম্মরাজ্য সংস্থাপিত। বৈদিকধর্ম্ম হইল জন-কয়েক ব্যক্তির অনুভূতি মাত্র। বৌদ্ধধর্ম্মেরও মূল হইল বুদ্ধদেবের অনুভূতি মাত্র। এখন দেখা যাক্ বৌদ্ধধর্ম্মের উৎপত্তি সম্বন্ধে পণ্ডিতমণ্ডলীর কি মত। বৌদ্ধধর্ম্ম যে আর্য্যধর্ম্মের শাখা ইহাই সাধারণের ধারণা। যদি বৌদ্ধধর্ম্ম আর্য্যধর্ম্মের শাখা হয় তাহা হইলে নিশ্চয় পরস্পরের অঙ্গাঙ্গী যোগ থাকিবে; কিন্তু এ স্থলে সে যোগ কোথায়? বৌদ্ধধর্ম্মের আদি কি, এ বিষয় বহু মুনির বহু মত। এ বিষয় লইয়া বহুকাল হইতে বাদবিসম্বাদ চলিয়া আসিতেছে; এখনও কিছুই ঠিক হয় নাই। কেহ কেহ বলেন, "পশুহত্যা-নিবারণ জন্য বুদ্ধদেবের অহিংসাধর্ম্মের উদ্রেক হয়।" বৌদ্ধধর্ম্মের নীতি যে অহিংসা সে বিষয় নিঃসন্দেহ। বুদ্ধদেব যখন জন্মগ্রহণ করেন তখন যজ্ঞে যথেষ্ট পশুবধ প্রচলিত ছিল। কিন্তু পশুবধের জন্য যে বুদ্ধদেবের প্রাণ কাঁদিয়া উঠিয়াছিল এ কথা তো কোন বৌদ্ধশাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায় না। পশুবধ দেখিয়া যে তাঁহার ধর্ম্মের উদ্রেক হয়, এ কথা তো বুদ্ধদেবের কোন জীবনচরিতে পাই না। ধারণার মূলে তবে কি কোন সত্য নাই? গিরিশচন্দ্র ঘোষের 'বুদ্ধদেব-চরিতে' এই সাধারণ ধারণা দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু ইতিহাস ও জীবনী ইহার কোন সাক্ষ্য দেয় না। যজ্ঞে পশুবধ প্রচলিত থাকিলেও অহিংসা যে পরমধর্ম্ম সে কথা তখনকার লোকেরা অনেকেই জানিত। যাঁহারা সন্ন্যাসাশ্রমে বাস করিতেন তাঁহারা এই মত পোষণ করিতেন। তাহার পর জৈনরা বুদ্ধদেবের বহুপূর্ব্ব হইতে অহিংসাধর্ম্ম পালন করিয়া আসিতেছেন। অতএব এ মত সমীচীন বলিয়া মনে হয় না।

কেহ কেহ বলেন, "বুদ্ধদেব উপনিষদ্-ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন। উপনিষদে যে অদ্বৈতবাদ চলিয়া আসিতেছিল তিনি সেই [illegible] প্রচার করেন।" সেজন্য কেহ কেহ তাঁহাকে প্রচ্ছন্ন-অদ্বৈতবাদী বলিয়া থাকেন। এ কথার মূলে নজীর কোথায়? উপনিষদের অদ্বৈতবাদ যে বুদ্ধদেবের সময় প্রচলিত ছিল তাহারই বা প্রমাণ কোথায়? 'ব্রাহ্মণ'-গুলি যজ্ঞ করিবার জন্য লেখা হয়। প্রাচীন উপনিষদ্গুলি যজ্ঞেই ব্যবহার হইত। যাজ্ঞিকেরা এখনও উহা যজ্ঞের অংশ বলিয়াই ব্যবহার করেন। উপনিষদ্-কথা সর্ব্বশাস্ত্রেই প্রয়োগ হইত। উপনিষদ্ বলিয়া একটি বিশেষ দর্শনশাস্ত্রের মত তখন প্রচলিত ছিল কিনা সন্দেহ। কেহ কেহ বলেন, "বৌদ্ধধর্ম্ম সাংখ্য-মতের পরিণাম।" সাংখ্য-মত যে বুদ্ধদেবের বহুপূর্ব্ব হইতে চলিয়া আসিতেছিল সে বিষয় নিঃসন্দেহ। উভয় ধর্ম্মই যে ত্রিতাপনাশের জন্য উৎপন্ন হইয়াছিল সে বিষয়ও সত্য। সাংখ্যগণ আত্মার স্বীকার করেন কিন্তু বুদ্ধদেব আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। অশ্বঘোষ কিন্তু একরকম বলিয়া গিয়াছেন সাংখ্যযোগ হইতে বৌদ্ধধর্ম্মের উৎপত্তি। এক দলের মত—ব্রাহ্মণদের অত্যাচারের ফলে বৌদ্ধধর্ম্মের বিকাশ। ব্রাহ্মণদের উপর তাঁহার দ্বেষই ধর্ম্মপ্রচারের কারণ। ইহা হইতেই পারে না। দ্বেষভাব হইতে এতবড় বিরাট ধর্ম্মের উৎপত্তি হইতে পারে না। কেহ কেহ বলেন, "বুদ্ধদেব শক-ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন।" ইহাও গ্রাহ্য হয় না; কারণ শকেরা তো শুঙ্গ রাজাদের সময় খৃঃ পূঃ দ্বিতীয় শতকে ভারতবর্ষে আসে। এইরূপ বহু মত আছে। বুদ্ধদেব আর্য্য কি না তাহাতেও কাহারও কাহারও সন্দেহ আছে। আমি কেবল সাধারণের জন্য কয়েকটি মত মাত্র এ স্থলে বিবৃত করিলাম।

বৌদ্ধধর্ম্ম যে আর্য্যধর্ম্ম হইতে উৎপন্ন হইয়াছে এ মত গ্রহণ করিবার আরও কয়েকটি অন্তরায় আছে। আর্য্যধর্ম্ম হইল আশ্রমী ধর্ম্ম। আর্য্য বলিয়া পরিচয় দিতে হইলে চারিটি আশ্রম মানিয়া চলিতে হইবে; বেদবাক্য আপ্তবাক্য বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। বেদবিরোধী ধর্ম্ম অনার্য্য-ধর্ম্ম। যে বেদের বিপক্ষে, ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের বিপক্ষে, যাগ-যজ্ঞের বিপক্ষে বিদ্রোহ ঘোষণা করিবে সে আর্য্যধর্ম্মের লোক নহে। বেদের সত্যই হইল আর্য্যধর্ম্মের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রামাণ্য। বুদ্ধদেব কিন্তু বেদের প্রমাণ্য স্বীকার করেন নাই, —ব্রাহ্মণের আধিপত্য স্বীকার করেন নাই। বৈদিক ক্রিয়া-কাণ্ডের বিরুদ্ধে উন্নতমস্তকে দাঁড়াইয়াছিলেন তিনি।

আর্য্যধর্ম্মে কেহ একেবারে সন্ন্যাসী হইতে পারিবে না। সন্ন্যাসী হইতে হইলে প্রথমে তাহাকে তিনটি আশ্রমে শিক্ষালাভ করিতে হইবে। কিন্তু বুদ্ধদেব এ বিধি স্বীকার করেন নাই। তাঁহার মত ছিল যে, যখনি বৈরাগ্যের উদয় হইবে তখনি ভিক্ষু হইবে। এ মত বেদবিরুদ্ধ মত।

আচার-ব্যবহারের দিক্ হইতে আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, বৌদ্ধদের আর্য্যবিরোধী বেশভূষা। আর্য্যরা মাথায় পাগড়ী ও পায়ে জুতা ব্যবহার করিতেন। বৌদ্ধরা কিন্তু খালি-মাথায় থাকিতেন ও জুতা ব্যবহার করিতেন না। আর্য্যধর্ম্মে সোমরস-পান একটা ধর্ম্ম। বৈদিক যজ্ঞে নরনারী সুরাপান করিতেন এবং তজ্জন্য সময় সময় কেলেঙ্কারি হওয়াও আশ্চর্য্য ছিল না। সুরাপানের বা সোমরস পানের যতই আধ্যাত্মিক বা রূপক ব্যাখ্যা হউক্ না কেন মোটকথা ইহা পান করিলে নেশা হইত। নেশা করা বা মদ খাওয়া বৌদ্ধধর্ম্মে একেবারে নিষেধ। আর্য্যধর্ম্মে শিখা রাখা অবশ্য-কর্ত্তব্য। ব্রাহ্মণের শিখাচ্ছেদের ন্যায় অবমাননা আর নাই। কিন্তু বৌদ্ধধর্ম্মে সকলেরি শিখাচ্ছেদন করিতে হইবে। আর্য্যধর্ম্ম স্থিতিশীল ধর্ম্ম। আর্য্যধর্ম্ম অন্যান্য দেশে ধর্ম্মপ্রচারার্থে লোক প্রেরণ করেন নাই। আর্য্যধর্ম্ম হইল non-missionary ধর্ম্ম। বৌদ্ধধর্ম্ম হইল গতিশীল ধর্ম্ম—missionary ধর্ম্ম। নিজধর্ম্ম প্রচারার্থে ইঁহারা ভারতের বাহিরে ভ্রমণ করিয়াছিলেন। আর্য্যধর্ম্মের মেরুদণ্ড হইল বেদের জন কয়েক ঋষি। বৌদ্ধধর্ম্মের মেরুদণ্ড হইল বুদ্ধের ব্যক্তিগত চরিত্র ও অনুভূতি (Realisation)। এইরূপ আর্য্যধর্ম্মে ও বৌদ্ধধর্ম্মে অনেক বিরোধ দৃষ্ট হয়।

পারিপার্শ্বিক অবস্থার উপর সমাজ ও মানবজীবন অনেকটা নির্ভর করে। মানব যখন জন্মগ্রহণ করে তখন তাহার দেহ ও মনে কতকগুলি নিজস্ব সত্তা বা বৃত্তি থাকে। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে দেশ, কালেরও কতকগুলি প্রভাব পড়ে। শিক্ষা ও কৃষ্টির (culture) দ্বারা সু-প্রবৃত্তিগুলির স্ফুরণ এবং কু-প্রবৃত্তিগুলির সংশোধন হয়। যত বড়ই চিন্তাশীল ব্যক্তি হউন ইহার প্রভাব কেহই অতিক্রম করিতে পারিবেন না। সেজন্য উচ্চশ্রেণীর সাহিত্যিক, কবি ও চিত্রকরের সৃষ্টি হইতে তৎসাময়িক পারিপার্শ্বিক অবস্থা অনেকটা জানিতে পারা যায়।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি বুদ্ধদেব যে-সময় জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন তখন ভারতবর্ষে খণ্ড খণ্ড রাজ্য ছিল এবং প্রত্যেক রাজত্বের স্বতন্ত্র নিয়ম-কানুন ছিল; ক্ষাত্রশক্তি এক রকম নির্জ্জীব ছিল; বিশেষতঃ ভারতের ইতিহাসে গণশ্রেণী কখন কোন রাজনৈতিক আন্দোলনে বা যুদ্ধে যোগদান করে নাই। রাজায় রাজায় লড়াই হইত; এবং লড়াইয়ের জন্য প্রত্যেকের স্বতন্ত্র সৈন্য ছিল। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পর মানবপ্রকৃতির অহিংসাবাদ গ্রহণ করা সমীচীন বলিয়া মনে হয়। বৌদ্ধ ও জৈনদের গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায় যে, শাক্যমুনি শেষ বুদ্ধ এবং মহাবীর শেষ তীর্থঙ্কর। ইঁহাদের পূর্ব্বে ২৩ জন করিয়া বুদ্ধ ও তীর্থঙ্কর উক্ত ধর্ম্ম প্রচার করিয়া গিয়াছেন। ইহার বিপক্ষে কেহ কেহ বলেন যে, ইঁহাদের ধর্ম্মের প্রাচীনত্ব প্রমাণ করিবার জন্য এই মিথ্যা আয়োজন। মোটকথা শাক্যসিংহ যখন জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন তখন উত্তর-ভারতের বাতাসে অহিংসাবাদ-মূলক ধর্ম্মই বিরাজ করিতেছিল; কোথায় এবং কিভাবে বিরাজ করিতেছিল, বলা বড়ই শক্ত।

সেই সময় কতকগুলি সম্প্রদায় ছিল যাহারা বৈদিক ক্রিয়াকর্ম্মের বিপক্ষে দণ্ডায়মান হইয়াছিল। বুদ্ধদেব বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ডের বিরুদ্ধে প্রথম দাঁড়ান নাই; তাঁহার পূর্ব্ব হইতেই নিগ্রন্থ, আজীবক প্রভৃতি সম্প্রদায়গুলি ইহার বিপক্ষে মত প্রচার করিতেছিল। কতকগুলি সম্প্রদায় যে বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ডের বিপক্ষে মত প্রচার করিতেছিল সে বিষয় আমরা দেখিতে পাই।

বুদ্ধদেবের সময় সাংখ্যমত প্রবল ছিল। সাংখ্যমত যে আর্য্যমত—এ বিষয়েও মতভেদ আছে। কিন্তু বুদ্ধদেব যে সাংখ্যমতের উপর উপর গভীর শ্রদ্ধাসম্পন্ন ছিলেন সে বিষয় নিঃসন্দেহ। এইরূপ নানা মত আছে। মোট কথা বৌদ্ধধর্ম্মের উৎপত্তি সম্বন্ধে কেহই বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে আলোচনা করেন নাই এবং কেহই মীমাংসা করিতে পারেন নাই।

আর্য্যধর্ম্ম principle বা নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত; বৌদ্ধধর্ম্ম personality বা ব্যক্তিত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত। আর্য্য-

ধর্ম্মের যে কোন ঋষির মত বাদ দিলে আর্য্যধর্ম্মের কোন অনিষ্ট হয় না; বৌদ্ধধর্ম্মে বুদ্ধকে বাদ দিলে কিছুই থাকে না। বুদ্ধদেব হইলেন বিরাট-প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তি। এত-বড় personality ধর্ম্মজগতে আর দেখিতে পাওয়া যায় না। বুদ্ধদেবের আগমনের পর হইতে principle ও personalityর বিবাদ আরম্ভ হয়; এবং তৎফলে আর্য্য-ধর্ম্মের ভিতর personality বা অবতারবাদ আশ্রয় পায়।

বুদ্ধদেব রাজপুত্র ছিলেন। রাজধর্ম্ম প্রতিপালনের জন্য তাঁহার কতকগুলি সহজাত বৃত্তি ছিল। যে বৃত্তিগুলি তিনি রাজধর্ম্মে চালিত করিতে পারেন নাই সেইগুলি সন্ন্যাস-আশ্রমে পরিচালিত করিয়াছিলেন। বৌদ্ধধর্ম্ম প্রথম সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম ছিল। বুদ্ধদেব বড় কড়া-মেজাজের লোক ছিলেন—সন্ন্যাস-আশ্রমের শৈথিল্য তিনি পছন্দ করিতেন না। কথিত আছে, বুদ্ধদেবের দেহত্যাগের পর তাঁহার অনেক শিষ্য আনন্দে উৎফুল্ল হইয়াছিল, কারণ সন্ন্যাস-আশ্রমের কড়া নিয়মের হাত হইতে তাহারা নিস্তার পাইল। আর্য্যধর্ম্মের সন্ন্যাস-আশ্রম ও বৌদ্ধধর্ম্মের সন্ন্যাস-আশ্রম স্বতন্ত্র বস্তু। আর্য্যধর্ম্মের সন্ন্যাস-আশ্রমে জাতি বলবতী হয়। কেমন করিয়া হয় পরে তাহা দেখাইব।

প্রথম প্রথম বৌদ্ধধর্ম্ম সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম ছিল। তাঁহারা পরিব্রাজক ছিলেন। সামান্য আহারে তুষ্ট হইয়া মানবের কল্যাণের নিমিত্ত ধর্ম্মপ্রচার করিয়া বেড়াইতেন। যখন ধনী ব্যক্তির সহিত সাধকদের সদ্ভাব হইল তখন ধর্ম্মের ভিতর জাঁকজমক আসিল। সাধারণকে আকৃষ্ট করিতে হইলে জাঁকজমকের প্রয়োজন। ইহা হইল unavoidable evils in our religious life। ইহার হস্ত হইতে কেহ নিস্তার পাইবে না। গৃহস্থ সাধক নষ্ট করে; গৃহস্থের উপর সাধক-জীবন নির্ভর করে। সকলে বুদ্ধদেব, রামকৃষ্ণ, যীশু, বিবেকানন্দ হয় না। উহাদের থাক্ স্বতন্ত্র। উহাদের কার্য্যকলাপ অনুকরণ করা মানে নিজেকে নির্জ্জীব করা। সেজন্য কালক্রমে সাধক-জীবনে শৈথিল্য আসে। তখন ধর্ম্মের প্রাণবস্তু নষ্ট হইয়া যায়; খোসাই ধর্ম্মের নামে চলে। গৃহস্থ সংযমী হইলে সাধু-সন্ন্যাসী নষ্ট হইতে পারে না।

বুদ্ধদেবের জীবনী "হাঁ"র (Positive) উপর প্রতিষ্ঠিত কিন্তু বৌদ্ধনীতির ভিত্তি "না"র (Negative) উপর। বুদ্ধদেবের জীবনী আর্য্যসভ্যতায় অবতারবাদ আনিয়া দিয়াছে। জাতকে বুদ্ধদেবের জীবনী আছে। জাতক সংখ্যায় যতই হোক্ মূল-সংখ্যা ৩০।৩৫ টির বেশী হইবে না; কারণ একটি আদর্শ বা principle সাধারণের মধ্যে প্রচার করিতে যদি ৫০টি গল্প সৃষ্টি করা হয় তাহা হইলে আদর্শ হিসাবে ১টি গল্পই বলিব। সেই বিচারে ৩০।৩৫টির বেশী জাতকে নূতনত্ব দেখিতে পাওয়া যায় না। জাতক সৃষ্টির মূলে তিনটি উদ্দেশ্য ছিল: ১। পুনর্জন্মবাদ প্রতিষ্ঠা করা; ২। বুদ্ধদেবের জীবনের positive ভাবটি প্রকাশ করা; ৩। অশিক্ষিত জনসাধারণকে সহজ সরল ভাষায় গল্পের ছলে বৌদ্ধধর্ম্মের নীতি প্রচার করা। ভক্তরা প্রভুর মহিমা বর্ণনা করিবার জন্য অনেক-কিছু অসত্যাশ্রিত অলৌকিক প্রয়াস করিয়া থাকে। সেজন্য কালক্রমে জাতকের কলেবর দীর্ঘ হইয়া পড়িল এবং তৎসঙ্গে যতকিছু সত্যমিথ্যা আশ্রয় পাইল। স্বামী বিবেকানন্দ দুঃখ করিয়া বলিতেন, "ভক্তিবান্ হবার চেষ্টা করিস্ বাবা! ভক্ত হবার চেষ্টা করিস্ নি।" জাতকের ভিতর হইতে সমসাময়িক কিছু কিছু দেশের অন্যান্য খবরও পাওয়া যায়।

প্রত্যেক সাধকের দুই শ্রেণীর শিষ্য থাকে—জ্ঞানমার্গী ও ভক্তিপন্থী। ভক্তিবান্ শিষ্যরা প্রভুর আদর্শ লইয়াই নিজের জীবন চালিত করে। নিজেরা মুক্ত হইলেই তাহারা জীবন সার্থক মনে করে। প্রভুর কথার একটিও নড়চড় তাহারা করিতে চাহে না। জ্ঞানমার্গীরা ইহাদের উল্টো। তাহারা প্রয়োজন হইলে প্রভুর কথা খণ্ডন করিতে দ্বিধা বোধ করে না; এবং স্বয়ং মুক্ত হইয়াও সন্তুষ্ট হয় না। তৎসাথে অন্যান্য লোকও যাহাতে মুক্ত হইতে পারে তাহার চেষ্টা করে। কালক্রমে প্রভুর আদর্শ বিকৃত হইয়া যায়। সাধারণ ব্যক্তি যাহার নিকট হইতে উপদেশ পায় তাঁহাকেই শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করে। ইহাই স্বাভাবিক। এই পদ্ধতিতে বৌদ্ধধর্ম্মে হীনযান, মহাযান ও সহজযানের উৎপত্তি হইয়াছে।

"নির্ব্বাণ" লইয়া নানা মত আছে। আমাদের স্বভাবের মস্ত একটা দোষ যে বাক্যের দ্বারা বা ভাষার দ্বারা আমরা সব বস্তু বুঝিতে চাই। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ তাহা হইবার জো নাই। আমরা ভুলিয়া যাই যে উচ্চ বস্তু বা ভাব ভাষার দ্বারা

প্রকাশ করা যায় না। আজ পর্য্যন্ত কেহ পারে নাই। উচ্চ ভাবের সামান্য আভাস সাধকের দেহের, চোখ-মুখের আকৃতির দ্বারা প্রকাশ পায়। নির্ব্বাণ লাভ করা যায়; নির্ব্বাণের অবস্থা বোঝান যায় না। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস একটি উপমাদ্বারা এই অবস্থাটি চমৎকার বুঝাইয়াছেন। তিনি বলিতেন, "কি রকম অবস্থা হয় জানিস্? যেমন নুনের পুতুলের সমুদ্র মাপা। নুনের পুতুল মনে কল্লে সে সমুদ্র মাপ্‌বে; যেম্‌নি সমুদ্রে নাম্‌লে ওম্‌নি গ'লে গেল। এও সেই অবস্থা হয়।" ভাষার দ্বারা ভাব বুঝিবার চেষ্টা করা বিড়ম্বনা মাত্র। ভাবের দ্বারা ভাব বুঝিবার চেষ্টা করা উচিত; তাহাতে কৃতকার্য্যতা লাভ হয়। মানুষের বিবাদ হয় ভাষা লইয়া; ভাবের দ্বারা ভাব বুঝিবার চেষ্টা করাই মঙ্গলপ্রদ।

সংক্ষেপে আমি বৌদ্ধধর্ম্মের প্রকৃতি বর্ণনা করিলাম। বৌদ্ধধর্ম্ম ভারতবর্ষে অনেক-কিছু ভাল করিয়া দিয়া গিয়াছে। কিন্তু বৌদ্ধধর্ম্ম ভারতবর্ষের মধ্যে যে ক্ষতি করিয়া দিয়া গিয়াছে তাহার খবর কয়জন রাখেন? অনেকে বলেন ব্রাহ্মণ জাতির অত্যাচারের ফলে দুর্দ্দশা, কিন্তু নগনক্ষপনকরা যা ক্ষতি করিয়া দিয়া গিয়াছে তাহার তুলনায় ব্রাহ্মণজাত কিছুই ক্ষতি করে নাই। ব্রাহ্মণজাতি নিরীহ হিন্দু সৃষ্টি করে নাই—এ সৃষ্টি করিয়াছে বৌদ্ধধর্ম্ম। পাঁঠা-কাটা দেখিলে কাঁদিয়া উঠে এ বৌদ্ধধর্ম্মের ভাব—আর্য্য-জাতির ভাব নয়। ধর্ম্মের ভিতর যত সব বুজ্‌রুকির আম্‌দানি বৌদ্ধধর্ম্ম করিয়া গিয়াছে। ধর্ম্মের নামে নারীর সহিত গুপ্তরহস্য বৌদ্ধধর্ম্মেরই সৃষ্টি। বৌদ্ধধর্ম্ম শুধু যে নিজে অধঃপাতে গিয়াছিল তাহা নয় সঙ্গে সঙ্গে জাতির মেরুদণ্ড ভাঙিয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছিল। সন্ন্যাসীর দল জাতির মঙ্গল করিতে পারে না। আর্য্যসভ্যতায় চিন্তাশীল ব্যক্তিরা গৃহী ছিলেন এবং আজও আছেন। বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর আদর্শ জাতীয় মুক্তির অন্তরায়। গৃহীই জাতির সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গল করিতে পারেন।

নিদয়া

শ্রী জগদীশচন্দ্র গুপ্ত

"সতীলক্ষ্মী" উপনাম দিয়া শান্তনু চারি আনা মূল্যের লটারির টিকিট একখানি নিল।

"সতীলক্ষ্মী" কথাটা মনে পড়াও কিন্তু খুব আশ্চর্য্যের বিষয়—উপনাম কি দেওয়া যাইতে পারে ভাবিতে যাইয়া দশ বিশটা শব্দ নয়, চিন্তার প্রথম মুহূর্ত্তেই 'সতী' আর 'লক্ষ্মী' দুটি শব্দ আপনি সংযুক্ত হইয়া বিনা চেষ্টায় পৌঁছিয়া গেল—অথচ ঐ দুটি শব্দ ইতিপূর্ব্বে ছিল বলিয়া শান্তনুর স্মরণ হয় না।

শান্তনুর মনে হইল, ইহা অতি শুভ লক্ষণ—হাজার হাজার ভালমন্দ গুণে-দোষে মাঝামাঝি ইষ্টানিষ্টসূচক শব্দ ভূভারতে থাকিতে ঐ শব্দদুটি পরস্পর সম্বদ্ধ হইয়া মনে পড়িয়া গেল কেন! নিশ্চয়ই ইহার পশ্চাতে রহস্যাবৃত অদৃষ্টের গূঢ় অভিসন্ধি আছে!...ভাবিতে গায়ে যেন কাঁটা দিয়া ওঠে। ...'সতীলক্ষ্মী' যুগ্ম শব্দটির অর্থ নয়, তার পবিত্রতা আর বিনম্র শালীনতা সে বহুক্ষণ ধরিয়া সর্ব্বান্তঃকরণ দিয়া ধ্যান করিল। সতীর প্রতি জগতের তথা ভগবানের সশ্রদ্ধ আকর্ষণ এবং পক্ষপাতিত্ব চিরকালের; আর, লক্ষ্মী মানে ঐশ্বর্য্য ইহা ত' জানা কথা। সুতরাং সুলক্ষণযুক্ত এতদুভয়ের সম্মিলনে একটা অভাবনীয় ঘটনা ঘটিয়া যাইতেও পারে!

ঠিকের অঙ্কের ভুলটা বিরক্তির সহিত সংশোধন করিয়া শান্তনু মুখ তুলিয়া দেখিল, ও-টেবিলের অমরনাথ তাহার দিকে অন্যমনস্কভাবে তাকাইয়া আছে—

"সতীলক্ষ্মী"র মহিমা তখন শান্তনুর প্রাণে জাগ্রত ছিল—তাহার হিতকারিতা সম্বন্ধেও সংশয় ছিল না—হাসিয়া বলিল, ওহে, নাম্ দিয়া!

—কি ?

—অন্ততঃ পাঁচ হাজার···

উচ্চারণ করিতেই পাঁচ হাজার যেন অনিবার্য্য সত্য হইয়া উঠিল।

অমরনাথ জিজ্ঞাসা করিল,—নিলে না কি ?

নিলামই ত' !

—আমি হাঁকিয়ে দিয়েছি···সব 'বোগাস্'। গেল তোমার চার আনা সদ্য সদ্য···চারখানা চপ্ হ'ত দিব্বি গরম গরম !

উদরসর্ব্বস্ব অবিশ্বাসীর 'কু-ডাকে' বিরক্তি বোধ করিয়া শান্তনু আর কথা কহিল না।

কিন্তু সত্য কথা এই যে, টিকিট কিনাইবার প্রস্তাব আসিলে শান্তনুর নিজেরও মনে হইয়াছিল—সব 'বোগাস্'; পাঞ্জাবী ধূর্ত্তের প্রবঞ্চনা; কিন্তু এই সন্দেহ বেশীক্ষণ স্থায়ী হইতে পায় নাই··

মৃতের আত্মা যেমন সূর্য্যরশ্মিকে অবলম্বন করিয়া উর্দ্ধে অমৃতলোকে প্রস্থান করে, পৃথিবী রহে নিম্নে, তেম্‌নি একটি সূক্ষ্ম অথচ প্রচণ্ড কাণ্ড ঘটিয়া গিয়াছিল তার মনোজগতে—

বিজ্ঞাপনের ভাষার এমনি মোহিনী শক্তি যে, সুরু হইতে শেষ অবধি পড়িয়া গেলে প্রাণ উর্দ্ধগতি প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ আশারঞ্জিত সুরের ভিতর দিয়া চলিতে চলিতে মন সংসারের কাঠিন্য বিস্মৃত হইয়া কোথাকার একটি সুনিশ্চিত স্পর্শ লাভ করে, তারপর অন্য একটা জগতে উপনীত হইয়া তার নিজের উপর আর আধিপত্য থাকে না···

সুরুতে দুরু দুরু বুকে যেন অদৃষ্টকে উদ্‌ঘাটিত করিয়া দেখাইতে চায়—কি আছে সেখানে কে জানে! কিন্তু তাহাকে সুযোগ দিবে না কেন? সুযোগকে অবহেলা করিও না—কত সম্পদ তোমার দ্বারে আসিয়া তোমার দৃষ্টির অবহেলায় ফিরিয়া গিয়াছে তাহার সন্ধান রাখ কি? ···এই তুচ্ছতম অর্ঘ্য দিয়া দেখিতে দোষ কি দেবতা প্রসন্ন হয় কি না! ·

তারপর বিজ্ঞাপনের শেষের দিকে চরম উদ্দীপনা, দারিদ্র্যের প্রতি নির্ম্মম ধিক্কার, দারিদ্র্যের অনবধানতার প্রতি ততোধিক নির্ম্মম ধিক্কার···গৃহের ছবি, সুখের ছবি, টাকা, কত রাজ্যের জিনিষ তাহার ছবি···মনোহর আর উল্লাসকর তারা সবগুলি—

উহাতেই মনের তন্দ্রাবেশ, চিন্তার বিন্যাস ভাঙিয়া দিয়া কুবেরের ভাণ্ডারের ঝক্‌মক্ ছটা সম্মুখে আসিয়া পড়ে—লক্ষ্মীর উজ্জ্বল কৃপাদৃষ্টি প্রতি নিমেষে উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতর হইতে থাকে।

সাধারণ লোকের যেমন হয় শান্তনুরও তেম্‌নি—অতীতের সঙ্গে বন্ধন অতি সামান্য···মাঝে মাঝে দু' একটি ঘটনার কথা মনে পড়ে; যথা: ছেলেরা হাসে বলিয়া ইস্কুলের সেকেলে পণ্ডিত পড়াইতে চাহিত না; 'শিল্ড্ ফাইন্যালের' দিনে অজস্র বৃষ্টিপাত হইয়া 'গেম্' পণ্ড হইয়াছিল...অফিস-সংক্রান্ত কথা, গৃহ-সংক্রান্ত কথা—

তারা অতীতের কথাই, কিন্তু বন্ধনের ডোর নহে।

আশা আর আকাঙ্ক্ষার প্রফুল্লতা, উদ্বেগসহ উদ্যমের আর পৌরুষের আনন্দ যেখান হইতে দীপাধার হইতে আলোকের প্রবাহের মত নিঃসৃত হইয়া মানুষের গতিপথ আলোকিত করে আর প্রাণের গতিকে দৃপ্ত রাখে, শান্তনুর অতীতের সে-স্থানটি অন্ধকার, নিষ্প্রাণ।·· ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে লিপ্ততা থাকা তার পক্ষে সম্ভব নয়—ফুলের বীজ রোপণ করিলে তবেই ত' একদিন ফুল ফুটিবে! অতীতে সে সুযোগ তার আসে নাই···তার বর্ত্তমানের অবয়বে অতীতের আভা নাই, ভবিষ্যতের ছায়া পড়ে না; যাহা একদা ঘটিতে পারে তাহার অকৃত্রিম একটা রূপ দিয়া আশান্বিত হইয়া ওঠা তাহার অভ্যাসের বাহিরে; ভবিষ্যৎ ধীরে ধীরে উন্মোচিত হইয়া সহসা স্পষ্ট সত্য হইয়া উঠিবে, এই নিঃসন্দেহ ব্যাপার অনুভব করা ব্যতীত তাহাকে স্বগতে গঠিত করিয়া সম্মুখে আনয়ন করিবার সাধ্য কি সাধনা তাহার নাই—কাজেই ভবিষ্যতের দিকে তাহার লক্ষ্য নাই···

ভাবুক যারা, অতীতের মৌভাণ্ডার হইতে রসবস্তু আহরণ করিয়া নিরিবিলি সম্ভোগ করে, শান্তনু তাহাদেরও একজন নয়—

আজিকার দিনটা ভালয় ভালয় কাটিলেই মঙ্গল, আর কিছু চাহি না—এম্‌নি করিয়াই দিন চলিতেছিল; কিন্তু অতিশয় শুভসূচক 'সতীলক্ষ্মী' উপনাম দিয়া চারি আনা মূল্যের লটারির টিকিট একখানি ক্রয় করিতেই তার

অতীতে ভবিষ্যতে একটু রং লাগিল।...ভবিষ্যতের হাত হইতে স্খলিত হইয়া যে মুহূর্ত্তটি আসিয়াই পালাইত, ক্ষুন্নিবৃত্তির অস্থিরতায় সে যেন চোখে পড়িত না—কেবল অজ্ঞাত একটা ছাপ্‌ সে লইয়া যাইত, তাপের কি পুলকের—

আজ সে ফুটিয়া দেখা দিল—

শান্তনুর আরও মনে হইল, অতীতের টুক্‌রাগুলি জোড় লাগিয়াছে, কিন্তু তার সর্ব্বাঙ্গের সমগ্র আকৃতিটা ভয়াবহ—দীনের সুতীক্ষ্ণ নিশ্বাসে তাহা কণ্টকিত...

কিন্তু পরক্ষণেই হিল্লোলিত হইয়া তাহা নিস্তেজ হইয়া গেল...বর্ত্তমান আর ভবিষ্যতের সঙ্কীর্ণ সন্ধিস্থল অনায়াসে উত্তীর্ণ হইয়া সুদূরের একটা সুপ্রসার স্বচ্ছ স্থানে সে বিচরণ করিতে লাগিল।

শান্তনুর বয়স এই তেইশ—

তার একান্ত আপনার যারা আছে তাদের প্রতিপালক সে-ই—বিধবা মা, ছোট দুটি ভাই, আর একটি ভগিনী। বিবাহ সে করে নাই; ভগিনীর বিবাহ না দিয়া সে বিবাহ করিবে না, এই ছিল তার সঙ্কল্প—

কিন্তু লটারির টাকার সূত্রে সঙ্কল্পবিরুদ্ধ বিবাহের কল্পনাও সে করিতে লাগিল·· একটি অত্যন্ত দরিদ্র পিতার দায়োদ্ধার সে করিবে—পণ বলিয়া একটি পয়সা লইবে না; স্ত্রী তাহাতে তাহার অধিকতর বশীভূত হইবে। কন্যার পিতাকে 'পথে বসাইয়া' যে বর শুভ-বিবাহ করিতে আসে সে ত' ঘোরতর অশুভ ব্যক্তি, সে অলক্ষ্মীর দূত, সে ডাকাত। পিতৃকুলের এই অশুভদ ব্যক্তিকে কন্যারা না চিনিয়া রাখে এমন নয়, কিন্তু তাহারা করিবে কি?...শান্তনু একটি দীর্ঘনিশ্বাস মোচন করিল।

লটারির টিকিট ক্রয়ের কথা শান্তনু বাড়ীতে কিছু বলিল না—সামান্য ব্যাপার...আর, সবাইকে ব্যস্ত করিয়া লাভ কি!...না পাইলে সবাই হতাশ হইবে...পাইলে তখন না হয় সবাই মিলিয়া আনন্দ করা যাইবে—

প্রতিবেশীরা আবার পরশ্রীকাতর...মানুষ কিছু আশা করিলেই তাহারা কঠিন কণ্ঠে বিদ্রূপ করে—যে কথা কেহই বলে নাই তাহারই সমালোচনা ক'রয়া তাহারা নাচিতে থাকে···

কিন্তু টিকিটের নম্বরটা সে বিবিধ ছন্দে কণ্ঠস্থ করিয়া রাখিল: দু'হাজার দু'শো তেইশ, অর্থাৎ দুই দুই দুই তিন, অর্থাৎ বাইশ শো তেইশ।

লটারির এখনও দেরী আছে—এটা কেবল জুন মাস··· সেপ্টেম্বরের ১০ তারিখে খেলা হইবে—বিশ তারিখের মধ্যে 'খবরাখবর' জানা যাইবে।

যদি কিছুই না পাওয়া যায়! না-ই বা গেল—তাহাতে বুক ফাটিয়া চৌচির হইয়া যাইবে না—

মনে এই সৎসাহস জন্মিলেও হৃদ্‌পিণ্ডের একটু সঙ্কোচন ঘটিল···তন্ময়তম্ চিন্তায় একটু ব্যাঘাত জন্মিল·· চারিদিকে চাহিয়া দেখিয়া নিশ্বাস একটা পড়িল কি পড়িল না তাহা বুঝা গেল না···

মোটে ত' চার আনার টিকিট! কতদিকে কত পয়সা অনর্থক খরচ আর লোকসান হইতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই—সেদিনও মাতাঠাকুরাণী পয়সা ভ্রমে একটি অপরিষ্কার আধুলী ভিখারীকে দিয়া দিয়াছেন·· টাকার ভাঙানির সঙ্গে একটি বৃহদাকার সিকি আসিয়াছে যাহা কি-ধাতু দিয়া নির্ম্মিত তাহাই ঠাহর হয় না। তারাও ত' গেছে—এ সিকিটাও না হয় তেম্‌নি কোনো কাজে লাগিল না!··· চারখানা চপ্‌···গোগ্রাসে গিলিয়াই অমরনাথ মাটি হইতেছে।

কিন্তু যদি লাগিয়া যায়!

লটারির মজাই ঐ—গেলে যায় চার আনা, কিন্তু এলে আসে...

ভাবিতে গা শিহরিয়া ওঠে।

মাঝে জুনের কয়েকটা দিন, জুলাই পুরা, আগষ্টও তা-ই ···তারপর সেপ্টেম্বরের ন' তারিখ পর্য্যন্ত কালপ্রবাহ অতীতের সঙ্গে একাকার আর নিস্তরঙ্গ···দশই তারিখে কি হয় বলা যায় না—নিস্তরঙ্গ প্রবাহবক্ষে একটিমাত্র তরঙ্গের উর্দ্ধোৎক্ষেপণ·· এবং তারপরই নিরবচ্ছিন্ন নৃত্যশীলা প্রবাহিনীর বক্ষে জীবন-তরণী একান্ত সুখে ভাসিয়া চলিবে···

হঠাৎ তার মনে পড়ে পিতার শেষ পীড়ার কথাটা—

পয়সার অভাবে সে তাঁর যথোচিত চিকিৎসা করাইতে পারে নাই...অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার ব্যয়ের সম্মুখীন হইয়া সঙ্কটের অবধি ছিল না···

তারপর তার মনে হয়, এই পরম রমণীয় বিচিত্র জগতের প্রান্ত হইতে প্রান্ত পর্য্যন্ত ভোগের অশেষ উপকরণ জমজম্ করিতেছে—সুখপ্রিয় বিলাসী মানুষের উদ্দেশে ভগবান তাহা দু'হাতে করিয়া ছড়াইয়া দিয়াছেন; কিন্তু তাহা করতলগত করিবার সামর্থ্য তার আসে নাই—

কি ভাবে তাহা করা যাইতে পারে ইত্যবসরে তাহাও কিছু কিছু শান্তনু ভাবিয়া লইল।

যথাসময়ে টেলিগ্রাম এবং তৎপরে পুরস্কারপ্রাপ্ত ভাগ্যবানদের নামের তালিকা আসিবার কথা আছে।

বৎসর দুই পূর্ব্বে শান্তনু আর একবার লটারির টিকিট কিনিয়াছিল; কিন্তু কিচ্ছুটি পায় নাই। তখন এক ব্যক্তি মিথ্যা করিয়া অতর্কিতে বলিয়াছিল: "তুমি হাজার টাকা পাইয়াছ।" শুনিয়া সে নিজে চমকিয়া আর তাহাতে সেই ব্যক্তি হাসিয়া উঠিয়াছিল—কিন্তু প্রাপ্য ছিল তাহাতে একটি হারমোনিয়াম, এক জোড়া খঞ্জনী, এক জোড়া বাঁয়া তবলা—অর্থাৎ গতায়ু থিয়েটার পার্টির সম্পত্তি।

চমকটার বিরুদ্ধে এবার সতর্ক থাকিতে হইবে।

কালপ্রবাহে সেই উত্তাল ঢেউটা উঠিবার বিলম্ব আছে··· কিন্তু মুহূর্ত্তগুলি যেন চেতনার সূচ্যগ্রে আরোহণ করিয়া আলোকবেষ্টনীর মাঝে দেখা দিয়া খসিয়া খসিয়া পড়িতে লাগিল···

এম্‌নি করিয়া বিবিধ সুরসমৃদ্ধির ভিতর দিয়া জুন গেল, জুলাই গেল, আগষ্ট গেল···

একদিন হঠাৎ মুখ ফস্‌কাইয়া শান্তনু মাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল,—আমরা বড় দুঃখী-গরীব, নয়, মা?

রাত্রে আহারের পর শয্যায় পৌঁছিয়া, অতি দীন শয্যার দিকে চাহিয়া শয্যার আশ্রয়ে দিনের কথা ভুলিবার পূর্ব্বে সমস্ত দিনের দারিদ্র্য তার মনে পড়িয়া গিয়াছিল—মনে হইয়াছিল, তাহারা যেন অতিসঙ্কীর্ণ কর্কশ একটা বিবরের মধ্য দিয়া পথ করিয়া চলিয়াছে—গায়ে চিরস্থায়ী চিহ্নগুলি অঙ্কিত হইতেছে···

মা সে প্রশ্নের জবাব দেন নাই—

দৈনন্দিন জীবনের প্রতি শান্তনুর এই বীতরাগ নয়, রুচিপরিবর্ত্তন আজ দেখা দিয়াছে—বাঁশীর তানের আকর্ষণে মন উজান বহিয়া উভয় তটে যে শ্রী বিকশিত দেখিয়াছে, মানুষের উচিত অদৃষ্টের সঙ্গে লড়াই করিয়া সেখানে যাইয়া বাস করা।

দেখিতে দেখিতে ৯ই সেপ্টেম্বর আসিয়া পড়িল। ···অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত শান্তনুর চোখে ঘুম আসিল না—

বহুদূর-দেশে সেই পাঞ্জাবের রাজধানীতে রাজ্যসম্পদ পুঞ্জীভূত হইয়াছে···কোন্ ভাগ্যবানের পূর্ব্বজন্মের তপস্যা ছিল, বর পাওয়া ছিল..তাহাকে সৈন্যসামন্ত লইয়া যুদ্ধোদ্যম করিতে হইবে না, আদালতে যাইয়া যুগযুগান্তরের জন্য মাম্‌লা রুজু করিতে হইবে না, এমন কি তর্ক তুলিতেও হইবে না - মন্দিরস্থ ক্ষুদ্র শিলাখণ্ডে বিশ্বনাথের আবির্ভাবের মত ক্ষুদ্র একখানি কাগজের মারফত্ বৈকুণ্ঠবাসিনী লক্ষ্মী অচলা হইয়া গৃহে উঠিবেন···

খুব আশ্চর্য্য, কিন্তু!

টেলিগ্রাফ পিওন আসিয়া হয়তো জিজ্ঞাসা করিবে: শান্তনু চৌধুরী কিস্‌কা নাম?

অমরনাথ হয়তো দেখাইয়া দিবে—ঐ যে, উস্‌কা নাম।

"তার হ্যায়।"—বলিয়া পিওন লেফাপা তার হাতে দিবে...খুলিয়া দেখা যাইবে···

শান্তনু এখানে ধড়ফড়্ করিয়া বিছানার উপর উঠিয়া বসিল···হঠাৎ বাহিরের দিকে চাহিয়া দেখিল, লক্ষ্মীর ললাট যেন আকাশে অর্দ্ধেন্দুরূপে উদিত হইয়াছে—তাহারই দিকে ফিরান—কাঁপিতে কাঁপিতে সে শুইয়া পড়িল।

আজ ১০ই সেপ্টেম্বর—

কয়েকবার দুর্গানাম জপ করিয়া শান্তনু শয্যাত্যাগ করিল...মাকে ডাকিয়া তাঁর পদধূলি লইল—

দিনের যাত্রায় ইহা শুভ।

মা জিজ্ঞাসা করিলেন,—ও কি রে?

শান্তনু কথা কহিল না।

বেলা বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে তার বুকের দুরু দুরু স্পন্দন যেন দেহের প্রত্যেক কোষে সঞ্চারিত হইয়া গেল···স্নায়ুজাল উৎপীড়িত হইয়া আহারে তার রুচি রহিল না—

আশা তেমন অটল নহে···কিসের সম্ভাবনায় এই অসহ্য উদ্বেগ সে-ধারণাও যেন সর্ব্বান্তঃকরণে ব্যাপ্ত একটা কুহেলিকার মাঝে সময় সময় অস্পষ্ট হইয়া উঠিতে লাগিল।···

শান্তনু দশটার পর অফিসে আসিল—টেলিগ্রাফ অফিস্‌ও ঐ সময়েই খোলে···

তাহার নাম উচ্চারণ করিয়া তাহাকে কেউ অনুসন্ধান করিতেছে, শব্দমাত্রেই এই ভ্রম জন্মিয়া শান্তনুর চকিত দৃষ্টি দুয়ারে দুয়ারে ছুটাছুটি করিতে লাগিল···যে কেহ কাছে আসে, পাশ দিয়া যায়, যার ছায়া সম্মুখে পড়ে, তাহাকেই বার্ত্তাবহ মনে করিয়া তার অস্থিরতার অন্ত রহিল না···

এমনি করিয়া পাঁচটা বাজিয়া গেল, কিন্তু টেলিগ্রাফ আসিল না। "যাক্ গে" বলিয়া নিস্পৃহ থাকিতে যাইয়াও তার কণ্ঠ শুকাইয়া উঠিল···পথ-চাওয়া থামিল না।

দু'দিন গেছে।

শান্তনু আশা ত্যাগ করিয়াছে—আশা অকস্মাৎ তাহাকে যত ঊর্দ্ধে ঠেলিয়া তুলিয়াছিল, বরাং ভাল যে, ভাঙিয়া পড়িবার সময় তাহাকে সে তত নিম্নে নামাইয়া লয় নাই, অর্থাৎ আঘাতটা সে স্বাভাবিকতার সহিত গ্রহণ করিয়াছে।

ব্যাপারটা যে পাঞ্জাবী জুয়াচোরের জুয়াচুরি সে বিষয়ে তাহার এখন আর সন্দেহ নাই···সিকিটার জন্ম মাঝে মাঝে মন কেমন করে...

অমরনাথ বলে,—হ'ল ত'! তখনই বলেছিলাম··· চারখানা চপ হ'ত দিব্যি!

উদরসর্ব্বস্ব কথায় শান্তনু এখন অকপটে হাস্য করে।

কি ঘটিয়াছিল তাহা শান্তনুর মনেই নাই—

এমন সময় তাহা মনে করাইয়া দিয়া বুক্‌পোষ্টে প্রাইজপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণের নাম-ধামের তালিকা হঠাৎ একদিন আসিয়া পড়িল। মোড়ক খুলিতে শান্তনুর হাত ঈষৎ কাঁপিতে লাগিল—নির্ব্বাপিত আশার ভস্মস্তূপের ভিতর যেন স্ফুলিঙ্গ দেখা দিল—কিন্তু নিমেষের জন্য।

একবার উল্টাইয়া পাল্টাইয়া দেখা গেল, দীর্ঘায়তন হরিদ্রাবর্ণের কাগজখানার দু'পিঠ্ নামে ঠাসা···

তারপরই যে খবর শান্তনুর চোখে পড়িল তাহারই উপর তার চক্ষুদুটি নির্নিমেষ হইয়া রহিল...এ খবর জীবনে একবার আসে—

প্রথম প্রাইজ বিশ্ হাজার পাইয়াছে কলম্বোর একটি লোক—টিকিট-নম্বর ২২২২।

বিস্মৃত আশার কথা হঠাৎ আলোড়িত হইয়া যে এত দ্রুত এত শক্তিশালী হইয়া ফিরিতে পারে তাহা ধারণায় আসে না···নম্বরটির দিকে নিষ্পলক চক্ষে চাহিয়া থাকিতে থাকিতে শান্তনু পাণ্ডুর হইয়া উঠিল··

তার নম্বর ২২২৩, ইহার ২২২২।

শান্তনুর অন্তরাত্মা হায় হায় করিতে লাগিল···

ভাগ্যলক্ষ্মীর এ কি নিষ্ঠুরতা—এ কি নিদারুণ দৈব!... তাহার নাম কোথাও নাই, কিন্তু তাহারই ঠিক পূর্ব্ববর্ত্তী নম্বরের উপরেই লক্ষ্মী তাঁহার স্বর্ণমুষ্টি অজস্রধারায় নিক্ষেপ করিয়াছেন!··· দুটির মধ্যে ব্যবধান কতটুকু! দশ নয় বিশ নয়···কালের হিসাবে একনিমেষ নয়, স্থানের হিসাবে একচুল নয়!··· পাওয়া না পাওয়ার সীমানার শেষতম প্রান্তে আসিয়া, যে ব্যবধানের অস্তিত্ব নাই বলিলেই চলে তাহারই সম্মুখে, লক্ষ্মীর সচল হস্ত থামিয়া গেছে!...এই ক্ষুদ্রতম ব্যবধানটুকু উত্তীর্ণ হইতে ত' কোন বিঘ্নই ছিল না···অঙ্গুলির একটু হেলনেই ত' তিনি পার হইয়া যাইতে পারিতেন!··· কেন তাহা ঘটে নাই তাহার কারণ নাই—

শান্তনুর প্রাণপুত্তলী প্রাণান্তকর আক্ষেপে মুচড়াইয়া উঠিতে লাগিল,...তার মনে হইতে লাগিল, আর বাঁচিয়া থাকা বিড়ম্বনা—ভাগ্য একেবারে বিমুখ।

লোকে দেখে, শান্তনু কৃশ হইয়া যাইতেছে।

ছুটি

শ্রী প্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

লাগ্‌ল না মন কাব্যে কি আর ?
বস্‌ল না মন এস্‌রাজে ?
কোন্ আক্কেলে চল্‌লি আজ্‌ই ?
আজ কে সবে তেস্‌রা যে !
এক হপ্তা ছুটির বাকী ;
ঐ যে পেলি 'নোটিস্,' তা কি
কেবল ভুলে' রাখ্‌বি বলে'
না পড়ে' তোর তোরঙ্গে ?
অমন 'নোটিস্' নাই বেরুতো—
কাজ কি ছিল ও-রঙ্গে ?

মুখে হাসি ?—নাই চোখে জল ?
ছুটিস্ কেন রাস্তাতে ?
ভয় করে ভাই ! সাম্‌লে চল্ আজ,
একে বোশেখ মাস তা'তে !
চেষ্টা করে' মুখটারে আর
একটু মিছে করিস্‌নে ভার,
থাক্‌না ও-ভাণ লোক দেখানো ;
দেখ্—কি কোথায় ভুল্‌লি রে !
ক'বার হ'ল বিছ্‌না বাঁধা,—
ক'বার সেটা খুল্‌লি রে ?

শেষ করেছিস্ বিদায় নেওয়া
প্রণাম এবং নমস্কার ?
দু'মাস বলে' চল্‌লি এখন
হয় দেরী দেখ্ ক'মাস কা'র।
শালের চারাও চল্‌ল দেখি,
পথের শেষে পৌঁছবে কি ?
পুঁট্‌লিতে ও কি ভরেছিস্ ?
কুড়িয়ে রাখা আম্‌লকী ?
সঙ্গীরা যে বেরিয়ে গেল,—
দোরে মোটর থাম্‌ল কি ?

এতদিন কি দুঃখ ছিলি ?
সেথা কি সুখ ধরবে না ?
স্মৃতির ব্যথায় একটিবারও
মন কি কেমন ক'র্‌বে না ?
বস্‌তে শুতে কোনও ক্ষণে,
পড়্‌বে না কি কারেও মনে ?
কালো মাটি বল্‌বে না কি
কোথায় মাটি লাল ছিল ?
এরা তোরে ক'মাস ধরে'
বৃথাই স্নেহ ঢাল্‌ছিল ?

বৃথাই তোরে শালবীথিকা
ফুল দিল কি ফাল্গুনে ?
না, না, থাক্ আজ ও-সব কথা,
নে ভুলে নে মাল গুনে'।
পঁচিশ মিনিট সময় মোটে,
দেখ্ যদি ট্রেন ভাগ্যে জোটে ;
লট্‌বহরের বোঝাই নিয়ে
রাত না কাটে রাস্তাতে !
ঘড়িকে ঠিক বিশ্বাসও নেই,—
খারাপ আছে 'বাদ্' তা'তে।

পাথেয়
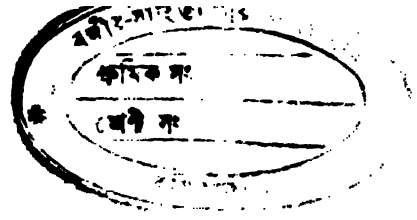
শ্রী উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

১

অশোকের পুরা নাম অশোকনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। কলিকাতার সিমলা অঞ্চলে একটি পরিচ্ছন্ন গৃহ ভাড়া করিয়া সে ওকালতী পড়ে। তাহার পিতা অজয়নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বাজিৎপুর পরগণার চার আনার মালিক। অপর বারো আনা মামলা-মকর্দ্দমায় এবং উত্তরাধিকার অস্ত্রের আঘাতে খণ্ড খণ্ড হইয়া প্রায় লয় পাইয়াছে। দৈবক্রমে অজয়নাথের চার আনা উপর্য্যুপরি কয় পুরুষ অবিভক্ত চলিয়া আসায় বাৎসরিক তহশিল এখনো বাইশ হাজার টাকার নীচে নামে নাই। অশোকনাথও তাহার পিতার একমাত্র পুত্র,—সুতরাং পরবর্ত্তী পুরুষেও চার আনার চার আনাই থাকিবার সম্ভাবনা আছে। সম্ভাবনা এই জন্য বলিলাম যে ভাগ-বাটরাই সম্পত্তির একমাত্র শত্রু নয়।

যৌবনকালে অজয়নাথের পত্নী-বিয়োগ হয়। তখন অশোকের বয়স মাত্র চার বৎসর এবং দুই কন্যার বয়স সাত এবং পাঁচ। পত্নীর মৃত্যুর পর অজয়নাথের দূরসম্পর্কীয় আত্মীয়-আত্মীয়াগণ এবং বয়োজ্যেষ্ঠ শুভানুধ্যায়ীরা পুনরায় বিবাহ করিয়া লক্ষ্মীহীন গৃহে লক্ষ্মী প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য অজয়নাথকে কিছুদিন উপরোধ-অনুরোধ করিয়াছিল। অজয়নাথ সে সদুপদেশের প্রতি কিঞ্চিদপি আস্থা না দেখাইয়া একান্ত আগ্রহের সহিত মাতৃহীন পুত্র-কন্যাদের লালন-পালন ও শিক্ষার প্রতি মনোনিবেশ করে। অগত্যা মিতভাষী গম্ভীরপ্রকৃতি অজয়নাথকে বারম্বার অনুরোধ-উপরোধের দ্বারা উত্যক্ত করিতে সাহস না পাইয়া শুভানুধ্যায়ীর দল হাল ছাড়িয়া দেয়। সে আজ বিশ বাইশ বৎসরের কথা।

গ্রামের নিকটতম হাইস্কুল হইতে অশোক প্রবেশিকা পাশ করিলে অজয়নাথ তাহাকে লইয়া কলিকাতায় বাড়ি ভাড়া করিয়া তিন বৎসর বাস করে। মহলে সেট্‌লমেণ্টের কার্য্য আরম্ভ হইয়া গিয়াছিল। একজন অবিশ্বাসী আমলার যোগসাজসে সাড়ে সাত পাইয়ের ধূর্ত্ত স্বত্বাধিকারী কিছু কিছু সুবিধা করিয়া লইতেছিল সংবাদ পাইয়া অজয়নাথ অশোকের দেখাশুনার ভার একজন প্রবীণ গোমস্তার উপর দিয়া ব্যস্ত হইয়া দেশে ফিরিয়া যায়। তখন অশোক প্রেসিডেন্সী কলেজে বি-এ পড়িতেছে। তাহার পর, আরও তিন বৎসর উক্ত গোমস্তার তত্ত্বাবধানে কলিকাতায় থাকিয়া অঙ্কশাস্ত্রে এম-এ পাশ করিয়া সে কলিকাতার বাসা তুলিয়া দিয়া দেশে গিয়া বাস করিতে আরম্ভ করে। অজয়নাথের ইচ্ছা ছিল অশোক আইন পাশ করিয়া কলিকাতা হাইকোর্টে ওকালতী ব্যবসা অবলম্বন করে। অশোকের কিন্তু সে-দিকে একেবারেই প্রবৃত্তি ছিল না, উপরোক্ত অঙ্কশাস্ত্রের প্রতি এতই অসঙ্গত আসক্তি ছিল যে, সাধারণ নিয়ম অনুযায়ী এম-এ পাশ করিবার পর তাহার নিকট চিরবিদায় না লইয়া সে সর্ব্বদাই কলিকাতা এবং লণ্ডন হইতে অঙ্কশাস্ত্রের বিষয়ে নূতন নূতন কঠিন কঠিন পুস্তক আনাইয়া তাহাদের মধ্যে নিজেকে নিমজ্জিত করিয়া রাখিত। গণিতশাস্ত্রের পরাবিদ্যার প্রতি পুত্রের এই অত্যুগ্র আকর্ষণ দেখিয়া অজয়নাথ সন্তুষ্ট হইল না; সে বুঝিল যে বিষয়-সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণের জন্য শুভঙ্করীর সাধারণ বিদ্যাই শুভকর, তাহার পক্ষে ইহা মশা মারিতে কামান দাগার মত শুধু নিষ্প্রয়োজনই হইবে না, ক্ষতিজনকও হয়ত হইবে। সুতরাং ইহা হইতে পুত্রের মনকে বিচ্ছিন্ন করিবার উদ্দেশ্যে সে অশোকের নিকট দুইটি প্রস্তাব উপস্থিত করিল,—প্রথম, বিষয়-সম্পত্তি বুঝিয়া-সুজিয়া লওয়া, এবং দ্বিতীয়, বিবাহ করা। কারণ দেখাইল,—প্রধানত যে-দুইটি বিষয়ের উপর মানুষের সুখদুঃখ নির্ভর করে, পিতার পরিণত বয়সের বুদ্ধি বিবেচনার সহায়তায় সেই ঐশ্বর্য্য-লক্ষ্মীকে আয়ত্ত করিতে এবং গৃহলক্ষ্মীকে লাভ করিতে বিলম্ব করা উচিত নয়, যে-হেতু মানুষের অনিশ্চিত আয়ু

পঞ্চাশের কাছাকাছি হইতে অতি-মাত্রায় অনিশ্চিত।

দ্বিতীয় প্রস্তাবটির বিষয়-বস্তুর মধ্যে এমন একটু জটিলতা ছিল যে, কেবল মাত্র পিতার পরিণত বয়সের বুদ্ধি-বিবেচনাই তাহার সমস্যা মোচন করিতে সমর্থ নয়; সুতরাং সেটি হইতে পরিত্রাণ লাভের প্রত্যাশায় পিতার প্রথম প্রস্তাবটিকে উপেক্ষা করা অশোক সমীচীন মনে করিল না, সে ঐকান্তিক মনোযোগের সহিত বিষয়-সম্পত্তি দেখিতে লাগিল। অতি অল্পকালের মধ্যেই জমা-ওয়াশীল, রোকড়, খতিয়ান, সেহা প্রভৃতির মর্ম্ম সে বুঝিয়া লইল; সুযোগমত নায়েব ও গোমস্তাকে সঙ্গে লইয়া সমস্ত মহল পরিদর্শন করিয়া আসিল; খাস জমীর উৎপন্ন ফসল, মজুদ মাল ও বিক্রয়বাটা মোকাবিলা করিল এবং বিচারের সহিত বদান্যতা যুক্ত করিয়া প্রজাদের জমি জমা সংক্রান্ত অভিযোগ-অনুযোগের উপরোধ-অনুরোধের নিষ্পত্তি আরম্ভ করিল।

অজয়নাথ দেখিল পুত্রের গণিতশাস্ত্রের পরাবিদ্যা একেবারে নিষ্ফল হয় নাই,—অশিথিল নিয়মাবলীর সাধনায় সুগঠিত বুদ্ধি বিষয়-বুদ্ধিকে ব্যাহত না করিয়া বিশদই করিয়াছে। তখন সে তাহার প্রথম প্রস্তাবটির বিষয়ে নিশ্চিন্ত হইয়া অধিকতর স্পষ্টতার সহিত পুনরায় দ্বিতীয় প্রস্তাবটি উত্থাপিত করিল;—একদিন অশোককে ডাকাইয়া বলিল, "মনে করচি এই আষাঢ় মাসেই তোমার বিয়ে দোবো। নিরঞ্জনপুরের জমিদার যাদব চক্রবর্ত্তী তোমার সঙ্গে তার মেয়ের বিয়ে দিতে উৎসুক। মেয়েটি অপছন্দ না হ'লে আমি সেখানে কথা দোবো স্থির করেছি।" শুনিয়া অশোক বিপদ গণিল। একটু চুপ করিয়া থাকিয়া মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে বলিল, "মনে করছিলাম, ওকালতীটা প'ড়ে ফেলি।" অজয়নাথ বলিল, "বেশ ত, বিয়ে ক'রেও ত' ওকালতী পড়তে পার।" উত্তরে অশোক কিছু না বলিয়া নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া রহিল। আরও দুই একটা কথা বলিয়াও অজয়নাথ অশোকের নিকট হইতে কোন উত্তর পাইল না। এই সুনিবিড় মৌনকে কিন্তু সম্মতির লক্ষণ বলিয়া তাহার মনে হইল না,—বলিল, "আচ্ছা, এখন যাও, পরে ভেবে দেখা যাবে।" পরে একজন মধ্যস্থের মারফৎ পিতা-পুত্রের যে কথাবার্ত্তা হইল, তাহার ফলে অজয়নাথ কলিকাতায় একজন কর্ম্মচারী পাঠাইয়া সিমলা অঞ্চলে একটি বাসা স্থির করিল এবং পরে একটি শুভদিন দেখিয়া অশোককে আইন পড়িবার জন্য তথায় পাঠাইয়া দিল। এবার সঙ্গে গেল দেউড়ির একজন পাচক ব্রাহ্মণ এবং পুরাতন বিশ্বস্ত ভৃত্য বিনোদ। বিবাহ করিবার বিষয়ে পুত্রের আপত্তিতে মনে মনে একটু ক্ষুব্ধ হইলেও ওকালতী পড়াটা হইবে বলিয়া অজয়নাথ মোটের উপর সন্তুষ্টই হইয়াছিল—বিশেষতঃ যাদব চক্রবর্ত্তী বলিয়া পাঠানোয় যে অশোকনাথের আইন পরীক্ষা পাশ করা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে তাহার কোনো আপত্তি হইবে না।

প্রথমবার কলিকাতা যাপনের সময় অশোকের বাসা-বাড়ি ছিল শক্তিদের বাড়ির ঠিক পাশেই। উভয় গৃহের গৃহস্বামীর মধ্যে কোনো পরিচয়ই ছিল না। হঠাৎ একদিন দুই বাড়ির চাকরদের মধ্যে সামান্য একটা কারণে বচসা হইতে হইতে মারামারি এবং রক্তপাত হইয়া যায়। ব্যাপারটার এইখানেই সমাপ্তি না হইয়া অশোকের তত্ত্বাবধারক যদু গোমস্তার কৃপায় এক নম্বর ফৌজদারী পর্য্যন্ত দায়ের হয়। সে-সব কথার বিস্তারিত উল্লেখের কোনও প্রয়োজন নাই কিন্তু এই বিরোধের সূত্র অবলম্বন করিয়াই অচিরে দুইটি গৃহ সুনিবিড় সৌহার্দ্দ্যে আবদ্ধ হয় এবং সে সৌহার্দ্দ্য যে একদিন সুমধুর আত্মীয়তায় পরিণত হইবে, এইরূপ একটা অকথিত কথা উভয় পক্ষেরই মনে মনে ক্রমশ স্পষ্ট হইয়া উঠিতে থাকে। তাই বছর দুই পরে হরিপদর মৃত্যুর পর কলিকাতা ত্যাগ করিবার সময়ে অশোকের হাত ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে গিরিবালা যখন বলিয়াছিল, "বাবা অশোক, অভাগিনী শক্তিকে ভুলো না—তাকে তোমার পায়ে স্থান দিয়ো। তা নইলে সে ম'রে যাবে।" তখন অশোক সাময়িক উত্তেজনায় প্রতিশ্রুতিই দিয়াছিল। সে ঘটনার পর চার বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। প্রথমে উভয় পক্ষের মধ্যে নিয়মিত চিঠিপত্র চলিত, কাল-ক্ষয়ের সহিত ক্রমশঃ তাহা অনেক কমিয়া আসিয়াছে এবং অশোকের মনের মধ্যে তাহার প্রতিশ্রুতি উপস্থিত এইরূপ

আকার ধারণ করিয়াছে,—শক্তিকে বিবাহ করিবার জন্ত ঐকান্তিক চেষ্টা করিব—কিন্তু একান্ত যদি তাহা না হইয়া উঠে তাহা হইলে তাহার বিবাহের পূর্ব্বে কখনই নিজে বিবাহ করিব না।

অজয়নাথ যখন যাদব চক্রবর্ত্তীর কন্যার সহিত তাহার বিবাহের কথা পাড়িয়াছিল তখন অশোকের ইচ্ছা হইয়াছিল শক্তিদের কথা খুলিয়া বলে—কিন্তু সাহসে কুলায় নাই। ভয় প্রধানতঃ এই-ই হইয়াছিল যে, সে প্রসঙ্গ তুলিলেই হয়ত' চিরকালের জন্ত তাহার সমাপ্তি ঘটিবে। সে একটা শুভ অবসরের অপেক্ষায় ছিল—কিন্তু সে অবসর যে কোন ঘটনার মধ্য দিয়া কি মূর্ত্তিতে কবে উপস্থিত হইবে তাহার কোনো ধারণাই ছিল না।

সে-দিন ছিল শনিবার। বৈকালে অশোক মাঠে খেলা দেখিতে গিয়াছিল। মাঠ হইতে যখন ফিরিল তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছে। হাত-মুখ ধুইয়া টেবিলের সম্মুখে বসিয়া সে ডাকিল, "বিনোদ!"

"দাদাবাবু?"

""চা দিয়ে যা।"

অশোক আসিবামাত্র বিনোদ চায়ের জল চড়াইয়া দিয়াছিল, অনতিবিলম্বে চা ও খাবার লইয়া উপস্থিত হইল। টেবিলের উপর হাতের পাত্রগুলো রাখিয়া একটা বইয়ের নীচে হইতে একখানা খাম বাহির করিয়া অশোকের হাতে দিয়া বলিল, "একটা চিঠি আছে দাদাবাবু।"

হাতের লেখা দেখিয়াই অশোক বুঝিতে পারিল শক্তির চিঠি। বলিল, "কখন এলো?"

বিনোদ বলিল, "আপনি বেরিয়ে যাবার আধ ঘণ্টাটাক্ পরে। কোথাকার চিঠি দাদাবাবু? বাড়ির?"

"না, অন্ত লোকের।"

বিনোদ চলিয়া যাইতে যাইতে নিজমনেই বলিতে লাগিল, "বাড়ির চিঠি ত' সবে কাল এসেচে—এর মধ্যে আবার আসবে কেন? আমার জিজ্ঞেস করাই ভুল।"

চিঠি খুলিয়া পড়িয়া অশোকের মন প্রথমটা সমবেদনায় বিচলিত হইয়া উঠিল—তাহার পরই দ্রুতগতিতে একটা বিরক্তি আসিয়া তাহার স্থান অধিকার করিল। এ কি উৎপীড়ন! এ কি অত্যাচার! এই জল বৃষ্টি কাদা—তাহার মধ্য দিয়া মানুষের অগম্য সেই স্থানে যাইতে হইবে? এত বড় দায়িত্ব সে কোথায় লইয়াছিল যে, এত কঠিন কর্ত্তব্য করিতেই হইবে! সহসা মনে পড়িয়া গেল সে-দিনের কথা যে দিন গিরিবালাকে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিল যে শক্তিকে বিবাহ করিবে। কিন্তু সে-কি একান্তই নিজের ইচ্ছায়? অমন করিয়া হাত ধরিয়া কাঁদিয়া যে কথা আদায় করা যায় তার মূল্য কতটুকু? কান্নাকাটি না করিয়া ছোরা-ছুরি দেখাইয়াও ত' ও-কথা আদায় করা যাইতে পারিত। তবে?—

আর একবার চিঠিখানা পড়িয়া অশোক চিঠিখানা টেবিলের উপর স্থাপন করিল। চিঠি পড়িলে কিন্তু যাইতে ইচ্ছা করে! সামান্ত কথা, সরল ভাষা, কিন্তু এমনি তাহার আকর্ষণ!

দুই হাতে দুই কপাল টিপিয়া ধরিয়া ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া অশোক চিঠিখানার দিকে চাহিয়া রহিল।

পেয়ালার মধ্যে চা ধীরে ধীরে ঠাণ্ডা হইয়া গেল।

(ক্রমশঃ)
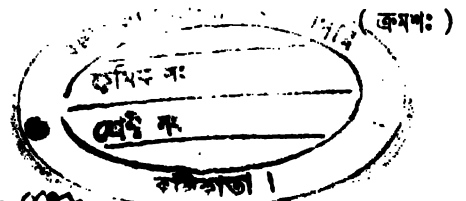
ভারত ও স্ূফী-মতবাদ

মুহম্মদ এনামুল হক এম.এ.

[প্রমাণ-পঞ্জী :—

১। 'আ'ইন্ ই-'অক্‌বরী, তৃতীয় খণ্ড, ইংরেজী অনুবাদ, H. S. Jarrett.

২। তারীখ্-ই-ফিরিশ্‌তহ্, দ্বাদশ অধ্যায়, মূল ফারসী।

৩। তয্‌কিরহ্-ই-ঔলিয়া'-ই-হিন্দ্, মূল উর্দু।

৪। ভারতীয় মধ্যযুগে সাধনার ধারা—অধ্যাপক ক্ষিতিমোহন সেন।

৫। 'ইর্‌শাদ্-ই-খালিকীয়হ্—মুহম্মদ্ 'অব্‌দু-ল্-করীম্, (বাঙ্গালা)।

৬। দীবান্ ই-খব্‌াজহ্ মু'ঈনু-দ্-দীন্ চিশ্‌তী।

৭। মথ্‌নবী-ই-বূ-'অলী কলন্দর্।

৮। The Preaching of Islam—T. W. Arnold

৯। Indian Islam—Dr. T. Titus.

১০। The Mystics of Islam—R. A. Nicholson.

১১। Muhammad and Islam—Ignaz Goldziher.

১২। History of Indian Literature—Weber.

১৩। Outline of the Religious Literature of India.

১৪। Kabir's Poem—Tagore-Introduction.

১৫। Encyclopædia of Islam—Article "India."

১৬। Encyclopædia of Religion and Ethics—Vol. XI.]

অনুমানিক খ্রীষ্টীয় একাদশ শতাব্দী হইতে ভারতবর্ষে স্ূফী-প্রভাব পড়িতে আরম্ভ করে। এই সময় হইতে ভারতের নানাস্থানে, ভ্রাম্যমান মুসলমান সাধকগণ আগমন করিতে থাকেন। তবে তাঁহাদের সংখ্যা এত অল্প যে, অঙ্গুলিপৃষ্ঠে গণনা করা যায়। ভারতের সর্ব্বপ্রথম স্ূফী কে, তাহা নির্দ্দিষ্ট করিয়া বলা নিতান্ত কঠিন। এ যাবৎ এ বিষয়ে তেমন কোন উল্লেখযোগ্য গবেষণা চলে নাই। সাধারণ ভাবে সন্ধান করিতে গিয়া, এ যাবৎ আমরা যে-কয়েকজন স্ূফীর নাম পাইয়াছি, তাঁহারা কেহই একাদশ শতাব্দীর পূর্ব্বে ভারতে আসিয়াছিলেন বলিয়া প্রমাণ পাই নাই। তাঁহাদের মধ্যে নিম্নলিখিত কয়েকজনের নাম করা যায় :

(অ) শাহ্ সুল্‌তান্ রূমী :—ইনি ১০৫৩ খ্রীষ্টাব্দে তদীয় গুরু সয়্যদ্ শাহ্ সুর্‌খ্ খুল্ অন্‌তীয়হ্ সহ বঙ্গদেশে আগমন করিয়াছিলেন। ময়মনসিংহ জেলার (আঃ দ্বিল') নেত্রকোণা সবডিভিশনের অন্তর্গত মদনপুরে এই সাধকের কবর (আঃ কব্‌র্) ও দরগাহ্ বিদ্যমান আছে। (১)

(আ) সয়্যদ্ নথর্ শাহ্ :—দাক্ষিণাত্যে যাঁহারা সর্ব্বপ্রথম স্ূফী-মতবাদ লইয়া প্রবেশ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে সম্ভবতঃ ইনিই অগ্রণী ও সর্ব্বপ্রাচীন ব্যক্তি। মাদ্রাজের ত্রিচিনপল্লীতে এখনও তাঁহার সমাধিটি তীর্থক্ষেত্রে পরিণত হইয়া রহিয়াছে। ১০৩৯ খ্রীষ্টাব্দে দাক্ষিণাত্যের বিখ্যাত সাধক দেহত্যাগ করেন। (২)

(ই) মথ্‌দূম্ সয়্যদ্ 'অলী 'উলুব্‌বী 'অল হুজ্‌বীরী ওরফে (আঃ 'উর্‌ফ্) দাতা গন্‌জ্ বথ্‌শ্ :—লাহোরে

---

(১) Bengal District Gazetteers—Mymensing (1917)—F.A. Sachse.

(২) i. Madras District Gazetteers—Trichinopoly (1907). P. 338. P. 152.

ii. The Preaching of Islam—P. 267.

তাঁহার দরগাহের দরজার শিলালিপি হইতে জানা যায়, ইনি ১০৭২ খ্রীষ্টাব্দে (৪৬৫ হিঃ) ইহধাম ত্যাগ করেন। অনেকে বলিয়া থাকেন, তিনিই ভারতবর্ষে সর্ব্বপ্রথম সুফী-মতবাদ আমদানী করিয়াছিলেন (১)। এই কথার সত্যতা যে নিতান্তই অল্প, তাহা বলা বাহুল্য। এই দরবীশের "কশ্ফুল্-মহব্জূব্" গ্রন্থ সুফী-মতবাদের একটি প্রাচীন ও প্রামাণিক পুস্তক।

সে যাহা হউক, আরও প্রায় এক শতাব্দী পর, অর্থাৎ দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগ হইতে, ভারতবর্ষে নিয়মিতভাবে সুফীদের প্রভাব পড়িতে থাকে। এই সময় হইতে ভারতের প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ স্থানে বিখ্যাত বিখ্যাত সাধক ও সুফীদের কেন্দ্র গড়িয়া উঠে। সুফী সম্প্রদায়ের পর সুফী-সম্প্রদায় ভারতে আগমন করিতে থাকেন এবং তাঁহাদের শিষ্য-প্রশিষ্যেরা ভারতের নানাস্থান ও জনপদে ছড়াইয়া পড়িতে থাকেন। অচিরকাল মধ্যেই আসমুদ্রহিমাচল ভারতের সর্ব্বত্রই, সুফী প্রভাবের অবারিত স্রোত খরগতিতে প্রবাহিত হইয়া যায়। এই সময়ে যে-সকল সম্প্রদায় ভারতে আসেন তাঁহাদের মধ্যে চিশ্তীয়হ্ ও সুহ্রব্র্দীয়হ্ সম্প্রদায়ই প্রধান। আজমীর বা অজমেরের (সং অজয়মেরু) ভারতবিখ্যাত সাধক খব্জহ মু'ঈনু-দ্-দীন্ চিশ্তী সাহেবই ভারতবর্ষে চিশ্তীয়হ্ সম্প্রদায়ের অগ্রদূত। ১১৪২ খ্রীষ্টাব্দে সন্জিরস্তান্ বা সীস্তান্ (আফ্ঘনিস্তানের দক্ষিণাঞ্চলের একটি জিলা) নামক স্থানে তাঁহার জন্ম হয়; সিদ্ধত্বলাভের পর, ১১৯৩ খ্রীষ্টাব্দে (২) একান্ন বৎসর বয়সে তিনি দিল্লী হইয়া অজমেরে গমন করেন ও তথায় স্থায়ীভাবে বাস করিতে থাকেন। তখন অজমেরাধিপতি পৃথ্বীরাজের সহিত তাঁহার বিবাদ উপস্থিত হয়। কথিত আছে, এই বিবাদের ফলে, চিশ্তী সাহেব ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন যে, অচিরেই রাজা পৃথ্বীরাজের পতন অবশ্যম্ভাবী। অনেকদিন হইতে রাজা পৃথ্বীরাজের সহিত সুল্তান্ মুহম্মদ্ ঘূরীর (১১৮৯-১২০৫) বিবাদ ও যুদ্ধ চলিতেছিল। সুল্তান্ কয়েকবার অজমেরাধিপতির নিকট পরাজিত হইয়া, স্বদেশ-প্রত্যাবর্ত্তন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। চিশ্তী সাহেবের অজমের আগমনের পর, ১১৯১ খ্রীষ্টাব্দের শেষভাগে, সুল্তান্ মুহম্মদ ঘূরীর হস্তে রাজা পৃথ্বীরাজ ইতিহাস-প্রসিদ্ধ তিরৌরীর সমরক্ষেত্রে পরাজিত, বন্দী ও নিহত হইলেন। সাধক প্রকৃতই ভবিষ্যদ্বাণী করিয়া থাকিলে, তাঁহার ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হইয়াছিল। তাঁহার ভারত-আগমনে হিন্দু স্বাধীনতা ভারত হইতে বিদায় গ্রহণ করিল, আর সঙ্গে সঙ্গে মুসলমান অধিকারের বীজ স্থায়ীভাবে ভারতের বুকে প্রতিষ্ঠিত হইল। ভারতের রাষ্ট্রনৈতিক ইতিহাসে তিরৌরীর সমরক্ষেত্র যদি প্রসিদ্ধিলাভ করে, চিশ্তী সাহেবের ভারত-আগমনও ততোধিক প্রসিদ্ধ ব্যাপার। চিশ্তী সাহেবের ভবিষ্যদ্বাণী পরিপূরণার্থে, অথবা দৈবদোষে ঘটনাক্রমে—যেরূপেই হউক চিশ্তী সাহেবের আগমনের পরই যখন তিরৌরীতে পৃথ্বীরাজের পতন হয়, তখন বাধ্য হইয়া স্বীকার করিতে হয়, চিশ্তী সাহেব ভারতে হিন্দু-স্বাধীনতা-অবসানের ও নবীন রাজশক্তির সহিত নূতন এক ভাবধারা-প্রবর্ত্তনের অগ্রদূত। সে যাহা হউক, চিশ্তী সাহেব, ১২৩৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই মার্চ্চ অজমেরেই দেহত্যাগ করেন।

চিশ্তীয়হ্ সম্প্রদায়ের সঙ্গে সঙ্গে, ভারতে সুহ্রব্র্দীয়হ্ সম্প্রদায় প্রবেশ করেন। শয়্খ্ বহা'উ-দ্-দীন্ ধকরিয়া মুল্তানীই এই সম্প্রদায়ের ভারতীয় আদিগুরু। ১১৬৯ খ্রীষ্টাব্দে মুল্তানে তাঁহার জন্ম হয়, এবং তথায় ১২৬৬ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই নবেম্বর পরলোকপ্রাপ্তি ঘটে। অত্যল্পকালের মধ্যে তাঁহার অনেক শিষ্য প্রশিষ্য ভারতের নানাস্থানে ছড়াইয়া পড়িলেন। ইঁহাদেরই প্রচেষ্টায়, চিশ্তীয়হ্ সম্প্রদায়ের পাশাপাশি, সুহ্রব্র্দীয়হ্ সম্প্রদায়ও ভারতে প্রতিষ্ঠালাভ করিল।

চিশ্তীয়হ্ ও সুহ্রব্র্দীয়হ্ সম্প্রদায়ের আগমনের

১। ভারতীয় মধ্যযুগে সাধনার ধারা—পৃষ্ঠা ৭।

২। চিশ্তী সাহেবের অজমের গমনের তারিখ সম্বন্ধে কোন কোন স্থানে মতভেদ দৃষ্ট হয়। 'অ'ইন-ই-'অকবরীতে, ১১৯৩ খ্রীঃ (৫৮৯ হিঃ); ফিরিশ্তহ্য়, ১১৬৫ খ্রীঃ (৫৬১ হিঃ); তধ্কিরহ্-ই-ঔলিয়া'-ই-হিন্দে, ১১৬৫ খ্রীঃ (হিঃ ৫৬১); এতদ্ব্যতীত এ বাবৎ তাঁহার যতগুলি উর্দু জীবনী দেখিয়াছি, প্রত্যেকটিতে ১১৬৫ খৃঃ। কিন্তু আমরা শেষোক্ত তারিখটি গ্রহণ করিতে পারি নাই, কারণ, চিশ্তী সাহেবের অজমের গমনের কিছুদিন পরেই, তিরৌরীর সমরক্ষেত্রে পৃথ্বীরাজের পতন (১১৯০ খৃঃ) একটি প্রসিদ্ধ ঘটনা ও ইতিহাসবিশ্রুত ব্যাপার। তাই আমরা প্রথম তারিখটি গ্রহণ করিলাম।—লেখক।

পর কয়েক শতাব্দী পর্য্যন্ত, ভারতে আর কোন নূতন সূফী-সম্প্রদায় আগমন করিয়াছিল কি না, সে বিষয় আমরা এ পর্য্যন্ত সঠিক ভাবে জানিতে পারি নাই। সম্ভবতঃ ত্রয়োদশ হইতে পঞ্চদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত ভারতে আর কোন নূতন সূফী-সম্প্রদায় অগমন করেন নাই। এই দুই শতাব্দীর মধ্যে উপরোক্ত সম্প্রদায় দুইটি ভারতের সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়িয়াছিল এবং জনসাধারণ কর্ত্তৃক বিশেষভাবে সমাদরলাভ করিয়া, ভারতের বুকে সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়া উঠে।

ঠিক এই সময়েই ভারতে অন্য একটি সূফী-সম্প্রদায়, কতিপয় নূতন বৈশিষ্ট্য লইয়া প্রবেশ করিয়াছিল, ইহাই কাদিরীয়হ্ সম্প্রদায়। বগ্‌দাদের অন্তর্গত জীলান্ বা গীলান্ নামক স্থানের অধিবাসী মহাপণ্ডিত, সুবক্তা ও জগদ্বিখ্যাত সাধক সয়্যিদ্ 'অব্‌দুল্ কাদির্ সাহেবই (জন্ম—১০৭৮ খ্রীঃ, মার্চ্চ; মৃত্যু—১১৬৬ খ্রীঃ, ফেব্রু) এই নূতন সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। কিন্তু তিনি জীবনে কখনও ভারতে আসেন নাই। তদ্বংশীয় সয়্যিদ্ মুহম্মদ্ ঘৌথ্ গীলানী সাহেব ১৪৮২ খৃষ্টাব্দে ভারতে আসেন ও এই মতের বহুল প্রচার করেন। তিনি ভারতে আসিয়া উত্তর-রাজপুতানার উছ নগরে স্থায়ীভাবে বাস করিতেছিলেন, এবং এখানেই ৩৫ বৎসর পর অর্থাৎ ১৫১৭ খৃষ্টাব্দে তিনি ইহলোক ত্যাগ করেন।

পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে, ভারতে আর একটি সূফী-সম্প্রদায় প্রবেশ করে—তাহা নক্‌শবন্দীয়হ্-সম্প্রদায়। তুর্কীস্থানের অধিবাসী খব্বাজহ্ বহা'উ দ্-দীন্ নক্‌শবন্দ্ (মৃঃ ১৩৮৯ খ্রীঃ) এই সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। খব্বাজহ মুহম্মদ্ বাকী বিল্লাহ এই সম্প্রদায়ের ভারতীয় আদি গুরু। তিনি তুর্কীস্থান হইতে এই সম্প্রদায়ের মতবাদ ভারতে আনায়ন করেন। ১৬০৩ খ্রীষ্টাব্দে দিল্লীতে তাঁহার মৃত্যু হয়।

ভারতে সূফী-প্রভাবের মূল ঐতিহাসিক সূত্র এইরূপ। এই সূত্র হইতে, দাক্ষিণাত্যের সয়্যিদ্ নথর্ শাহ্ (মৃঃ ১০৩৯ খ্রীঃ), বঙ্গের শাহ্ সুল্‌ত্বান্ রূমী (আগমন ১০৫৩ খ্রীঃ) ও লাহোরের দাতা গন্‌জ্ বখ্‌শ্ (মৃঃ ১০৭২ খ্রীঃ) প্রভৃতি একাদশ শতাব্দীর সাধকগণকে বাদ দিলে ঐতিহাসিক সূত্র ছিন্ন হয় বটে, কিন্তু ভারতে সূফী-প্রভাব বুঝিবার পক্ষে বিশেষ কোন বিঘ্ন উপস্থিত হয় না। বসন্তের অগ্রদূত কোকিলের ন্যায়, তাঁহারা সূফী-মতবাদের আনন্দময়ী আগমনী গান করিবার জন্যই ভারতে আসিয়াছিলেন; ভারতের বিভিন্ন বিশিষ্ট স্থানে, তাঁহাদের সেই মধুময়ী কাকলী-লহরী কিছুকাল গুঞ্জন করিয়া বেড়াইয়া ফিরিলেও ব্যাপকত্ব ও স্থায়িত্বের দিক হইতে, তাহা অকালমৃত্যু বরণ করিয়া লইতে বাধ্য হইয়াছিল। তাঁহাদের বাসন্তী-আগমনী-গানে ভারতের উপবনে ফুল ফুটে নাই, শাখায় শাখায় মলয় দুলে নাই, কুঞ্জে কুঞ্জে মঞ্জরী জাগে নাই। তাঁহারা অসময়ে আসিয়া মনের আনন্দে কেবল গান গাহিয়াই গেলেন,—ভারত তাহা শুনিল না, বা ভারতের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার মত অতবড় শক্তি তাঁহাদের ছিল না। তাঁহাদের প্রাথমিক চেষ্টা ব্যর্থ হইলেও, একথা অস্বীকার করা যায় না যে, তাঁহারা ভারতকে সজাগ ও সচকিত করিয়া দিয়া, অনুবর্ত্তীদিগের জন্য ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়া রাখিয়া গিয়াছিলেন। তাঁহারা যে বীজ বপন করিয়া গেলেন, উত্তরকালে সেই বীজ হইতে ফলবান তরু উদ্ভূত হইয়াছিল এবং তাঁহাদের বংশধরেরা তাহার সুস্বাদু ফল আস্বাদন করিয়া আপনাদিগকে, এমন কি, তদ্দারা দশজনকেও পরিতুষ্ট করিয়াছিলেন।

সে যাহা হউক, যাঁহাদের শুভাগমনে ভারতীয় সাধনা-গঙ্গার কূলে কূলে বান ডাকিল, মরা-গাঙ্গের বুকে বুকে জোয়ার ছুটিল, তাঁহারা হইলেন খব্বাজহ্ মু-'ঈনু-দ্‌দীন্ চিশ্‌তী ও বহা'উ-দ্-দীন্ ধকরিয়া মুলতানী। প্রকৃত প্রস্তাবে বলিতে গেলে, এই দুই সম্প্রদায়ভুক্ত ভারতীয় সাধকদের যুগ যুগ ধরিয়া অবিরত প্রচার, অনাবিল সাধনা, অমানুষিক তপস্যা ও দেবোপম আত্মোৎসর্গের দ্বারাই, ভারতে সূফী-মতবাদ, তথা মুসলমানধর্ম্ম প্রতিষ্ঠালাভ করিতে সমর্থ হয়। দিগ্বিজয়ী তুর্কীদের ক্ষাত্রশক্তি ও অস্ত্রের দ্বারা যাহা সম্ভবপর হয় নাই, এই নিঃস্ব ও পার্থিব সহায়হীন সাধকগণের দ্বারা তাহা সম্ভবপর হইয়াছিল,—ভারত ইস্‌লামকে সানন্দে গ্রহণ করিয়া আপনার করিয়া লইতে পারিয়াছিল। ষোড়শ শতাব্দীতে যখন ভারতের প্রাণে প্রাণে কেবল চিশ্‌তীয়হ্ ও সুহ্‌রবর্দীয়হ্ সম্প্রদায়-

ত্রের সাধনার কথা ও মর্ম্মের বাণী মধুর ভাবে লীলায়িত ও প্রতিমুহূর্ত্তে সঞ্চারিত হইতেছিল, তখন কাদিরীয়হ্-সম্প্রদায় ভারতে প্রবেশ করিল। তখন ভারতের নিজস্ব সাধনার সহিত মিলিত হইয়া উপরোক্ত সম্প্রদায় দুইটি এদেশে যে ভাবে আত্মপ্রতিষ্ঠালাভ করিয়া ফেলিয়াছিল, তাহাকে সজোরে সরাইয়া দিয়া বা সমূলে উৎপাটিত করিয়া তৃতীয় সম্প্রাদায়টি নিজের জন্য প্রশস্ত স্থান করিয়া লইতে পারিল না। বিশেষতঃ প্রথমোক্ত দুই সম্প্রদায়ের সাধনা-সূত্রের মধ্যে ঐক্যের ভাগ যত বেশী, তৃতীয় সম্প্রায়ের সাধনার সহিত প্রথমোক্ত সাধনা দুইটির অনৈক্য ততোধিক। এই ক্ষেত্রে তৃতীয় সম্প্রদায়ের সাধনার ভাগ্যে যাহা ঘটা স্বাভাবিক তাহাই ঘটিল—অল্পদিনের মধ্যে ভারতে তাহার স্থান হইল না। নক্শবন্দীয়হ্ সম্প্রদায় সম্বন্ধেও ঠিক এই কথা। অধুনা ভারতে, কাদিরীয়হ্ ও নক্শবন্দীয়হ্ সম্প্রদায়ের লোক নিতান্ত অল্প নহে,—কিন্তু এ প্রভাব সময় হিসাবে অনেক পরের।

চিশ্তীয়হ্ ও সুহ্রবর্দীয়হ্ সম্প্রদায়দ্বয়ের সাধনা, ভারতে আগমন করার পূর্ব্ব হইতেই, অনেকখানি ভারতীয় ভাবাপন্ন হইয়া পড়িয়াছিল; ভারতে আগমনের পর, এ দেশীয় সাধনার সহিত তাহাদের সাক্ষাৎ যোগসূত্রের সৃষ্টি হইল—ভারতের প্রাণের সহিত আরব ও পারস্যের প্রাণের ত্রিবেণী-সঙ্গম ঘটিয়া গেল! ভারতবিখ্যাত সাধক কবীর (১৩৯৮ ১৪৪৮খ্রী:) উক্ত প্রাণত্রয়ের পুণ্যতীর্থ প্রয়াগক্ষেত্রে পরিণত হইলেন। তাঁহার মধ্যে ভারতীয় যোগসাধনা ও স্বূফীদের "অম্ব্বুক" বা ব্রহ্মবাদ সম্মিলিত হইল। স্বূফীরা সাক্ষাৎভাবে তাঁহার ভিতর দিয়া ভারতীয়দের, আর ভারতীয়েরাও স্বূফীদের প্রাণের সন্ধান লাভ করিলেন। এই জন্যই, ভারতীয় সাধক ও স্বূফীদের ইতিহাসে কবীর চিরদিন একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া থাকিবেন। কবীরকে সাধারণতঃ রামানন্দের শিষ্য বলিয়া সকলে অবগত আছেন; কিন্তু তিনি প্রধানতঃ চিশ্তীয়হ্ সম্প্রদায়ভুক্ত সাধক ছিলেন (১)। একদিকে রামানন্দ যেমন তাঁহার গুরু ছিলেন, তেমনই শয়্খ্ তকী সুহ্রবর্দীও তাঁহার "মুরশিদ্" (গুরু) ছিলেন। তিনি রামানন্দের নিকট হইতে ভারতীয় সাধন-ধারার সহিত হিন্দির ভিতর দিয়া যেমন পরিচয়লাভ করেন, শয়্খ্ তকীর নিকট হইতেও তেমনই দীক্ষা গ্রহণ করিয়া স্বূফী-মর্ম্মবাদের বিষয় অবগত হন। ইহার পর, শয়্খ্ তকা চিশ্তীর নিকট হইতে "খির্কহ্-ই-খিলাফত্" বা অধ্যাত্মিক উত্তরাধিকারীর নিদর্শন প্রাপ্ত হইয়া, স্বয়ং নূতন মণ্ডলীর প্রতিষ্ঠা করেন। ভারতীয় ভাষায় অর্থাৎ হিন্দিতে তিনিই সর্ব্বপ্রথম স্বূফী-মতানুকূল আধ্যাত্মিক বিষয় প্রচার করিয়াছিলেন। তাঁহার মধ্যে যে ত্রিবেণীর সঙ্গম হইল, তাহাতে হিন্দু মুসলমান নির্ব্বিশেষে ভারতবাসী আসিয়া অবগাহন করিতে লাগিল। হিন্দু-মুসলমান মিলনের দিক হইতে দেখিতে গেলে, কবীর বাস্তবিকই উভয় সম্প্রদায়ের পুণ্যতীর্থ! ভারতের এই মিলন-ক্ষেত্রে এ যাবৎ যাঁহারা আত্মোৎসর্গ করিয়া, পূজার মন্দিরে প্রবেশ করিয়াছেন, কবীর তাঁহাদের সকলেরই আধ্যাত্মিক পূর্ব্বপুরুষ। ভারতের সর্ব্বত্র একদিন কবীরের প্রভাব অনুভূত হইয়াছিল। কিন্তু কবীরের জীবনের স্বপ্ন ভারতের তীর্থক্ষেত্রে মহামানবতার স্বপ্ন,—হতভাগ্য ভারত এখনও তাহা স্বীয় জীবনে সফল করিতে পারে নাই। ভারতীয় ভক্তিবাদের নব সংস্করণে কবীরের উদাস ও উদার ভাব কতখানি ক্রিয়া করিয়াছিল, তাহার জাজ্বল্যমান সাক্ষী ভারতের চিন্তা-জগতের ইতিহাস। মধ্যযুগের ভারতীয় সাধকেরা বলিয়া থাকেন—

"ভক্তি দ্রাবিড়ি উপজী, লায়ে রামানন্দ।
প্রগট কিয়ো কবীরণে সপ্তদ্বীপ নৌখণ্ডে॥" (২)

অর্থাৎ দ্রাবিড় দেশে (দাক্ষিণাত্যে) ভক্তির জন্ম হইল, রামানন্দ তাহাকে এদেশে আনিলেন। কবীর তাহাকে সপ্তদ্বীপ ও নবখণ্ড পৃথিবীতে প্রকাশ করিলেন। কবীরের দিগন্ত-বিস্তারী ভাবস্রোত, ভারতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তকে বিপ্লাবিত করিয়া দিয়াছিল; বাঙ্গলাদেশ তাহার প্রভাব এড়াইতে পারিয়াছিল কি? ষোড়শ

১। তথ্কিরহ্-ই-ঔলিয়া'-ই-হিন্দ—দ্বিতীয়ভাগ; পৃষ্ঠা ৮২-৮৩।
A History of Persian Language and Literature. Pt. I. Md. Abdul Ghoni. pp. 121-127.

২। মধ্যযুগে ভারতীয় সাধনার ধারা।

শতাব্দীর চৈতন্যদেবের (১৪৮৪-১৫৩৩)ধর্ম্মমতের মধ্যে, কবীরের মতবাদের কোন প্রতিধ্বনি কি নাই ?

ভারতে কতগুলি স্ূফী-সম্প্রদায়ের প্রভাব পড়িয়াছিল, তাহা নিশ্চিতরূপে বলা যায় না। এদেশে স্ূফী-প্রভাব অনুভূত হইবার পূর্ব্বে হইতে অর্থাৎ খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর পূর্ব্ব হইতে, ভারতের বাহিরের স্ূফীদের মধ্যে অসংখ্য সম্প্রদায় দেখা দিয়াছিল। এরূপ হওয়া কিছুই আশ্চর্য্যের বিষয় নহে; কেননা স্ূফী-আন্দোলন ব্যক্তিগত আন্দোলন। প্রত্যেক প্রধান প্রধান স্ূফী স্বীয় বিশিষ্ট পদ্ধতির অনুসরণ করিয়া সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেন; তৎপর তাহা লোকসমক্ষে প্রকাশ ও প্রচার করেন। সুতরাং প্রত্যেক স্ূফীর সাধনায় ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যের ছাপ অনুযায়ী কিছু-না-কিছু বৈশিষ্ট্য থাকিবেই। যে প্রসিদ্ধ স্ূফীকে কেন্দ্র করিয়া যে মণ্ডলী গঠিত হইয়াছিল, প্রতিষ্ঠাতার নাম বহন করিয়াই তাহা পরিচিত হইয়াছে। এইরূপ অনেক স্ফী-মণ্ডলী বা সম্প্রদায়ের প্রভাব ভারতে পড়িয়াছিল বলিয়া জানা যায়। ভারতীয় স্ূফী-মতবাদের পুস্তক-পুস্তিকায়, আমরা অনেক স্ূফী-সম্প্রদায়ের নাম দেখিতে পাই। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই, কখন্ কাহার দ্বারা এই সম্প্রদায়গুলির মতবাদ ভারতে আমদানী করা হইয়াছিল, এবং কখন্ কিরূপভাবে সেগুলি ভারতবাসীদের দ্বারা গৃহীত হইয়াছিল, তাহার কোন বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায় না। তবে এ কথা সত্য যে, ইহাদের প্রভাব হইতে ভারত মুক্ত ছিল না। আমাদের মনে হয়, সে প্রভাব ধীরে ধীরে কতিপয় বিশিষ্ট ও উঠন্ত সম্প্রদায়ের নীচে চাপা পড়িয়া গিয়া কালক্রমে অস্তিত্ব হারাইয়া ফেলিতে বাধ্য হয়। ভারতবর্ষে যতগুলি বিদেশীয় স্ূফী-সম্প্রদায়ের প্রভাব পড়িয়াছিল বলিয়া জানা যায়, তন্মধ্যে চতুর্দ্দশটির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রত্যেক ভারতীয় স্ূফী-মতবাদের পুস্তক পুস্তিকায় এই চতুর্দ্দশ সম্প্রদায়ের নাম সাধারণ। তদুপরি কোন কোন পুস্তকে আরও অনেকগুলি সম্প্রদায়ের নামও দেখিতে পাওয়া যায়। সকল পুস্তকে সাধারণতঃ এই চতুর্দ্দশ সম্প্রদায় খৱ্া্ন্-ৱ্াদহ্ "বা মণ্ডলী" নামে পরিচিত। অতঃপর আমরা এই চতুর্দ্দশ সম্প্রদায়কে "চতুর্দ্দশ মণ্ডলী" নামে অভিহিত করিব। 'অ'ইন-ই- 'অকবরীতে প্রদত্ত ভারতীয় স্ূফীদের এই চতুর্দ্দশ মণ্ডলী ও তাহাদের প্রতিষ্ঠাতার নাম এইরূপ—

১। হবীবী—খৱ্াজহ্ হবীব্ 'অজ্মী [হসন্ বস্ৰ্রীর (মৃঃ ৭২৮ খ্রীঃ) সমসাময়িক]

২। যয়্দী—শয়্খ্ 'অব্দু-ল্-ৱ্াহিদ্-বিন্ যয়্দ্ (মৃঃ ৭৪৩ খ্রীঃ)।

৩। 'অদ্হমী—খৱ্াজহ্ 'ইব্রাহীম্-বিন্-'অদ্হম্ বল্খী (মৃত্যু ৭৭৭ খ্রীঃ)।

৪। 'অয়্য়াদী—খৱ্াজহ্ ফুদয়্ল্-বিন্-'অয়্য়াদ্ (মৃঃ ৮০৩ খ্রীঃ)।

৫। কর্খী—ম'রূফ্ কর্খী (মৃঃ ৮১৫ খৃঃ)।

৬। সক্তী—হসন্ সরী সক্তী (মৃঃ ৮৬৭ খৃঃ)।

৭। তয়্ফূরী - বায়িযীদ্ বিস্তামী তয়্ফুর্ শামী (মৃঃ ৮৭৪ খৃঃ)।

৮। হুবয়্রী—খৱ্াজহ্ হুবয়্রতু-ল্-বস্ৰ্রী (মৃঃ ৯০০ খৃঃ)।

৯। জুনয়্দী—জুনয়্দ বগ্দাদী (মৃঃ ৯১০ খৃঃ)।

১০। চিশ্তী -'অবূ 'ইস্হাক্ চিশ্তী (মৃঃ ৯৬৫ খৃঃ)।

১১। গায়্রুণী—'অবূ 'ইস্হাক্ গায়্রুণী (মৃঃ ১০৩৪ খৃঃ)।

১২। সুহ্রৱ্রদী – শয়্খ্ দিয়া'উ-দ্-দীন 'অবূ নজীব্ সুহ্রৱ্র্দী মৃঃ ১১৬৭ খৃঃ)।

১৩। ফির্দৌসী—শয়্খ্ নজ্মু-দ্-দীন্ কুব্রা ফির্দৌসী (মৃঃ ১২২১ খৃঃ)।

১৪। তূসী—'অলা'উ-দ্-দীন্ তূসী (নজ্মু-দ্-দীন্ কুব্রার সমসাময়িক)।

ভারতীয় স্ূফীরা এই চতুর্দ্দশ মণ্ডলী সম্বন্ধে বলিয়া থাকেন যে, হদ্ৰ্রত্ মুহম্মদ্ তদীয় জামাতা হদ্ৰ্রত্ 'অলীকে "ইল্ম্-ই-ম'রফত্" বা মর্ম্মমুখ জ্ঞান দান করেন; 'অলী সেই জ্ঞান, হসন্, হুসয়্ন, খৱ্াজহ্ কমীল্ ও হসন্ বস্ৰ্রী এই চারি ব্যক্তিকে দান করেন। এই অনুগ্রহলব্ধ ব্যক্তিচতুষ্টয়ের মধ্যে, হসন্ বস্ৰ্রীই স্ূফীদের মূল উৎস। হসন্ বস্ৰ্রীর দুইজন প্রধান শিষ্য ছিলেন:—একজনের নাম খৱ্াজহ্ হবীব

'অজ্মী এবং অপর ব্যক্তির নাম 'অব্দু ল্-ব্াহিদ্-বিন্-য়র্দ্। উপরোক্ত চতুর্দ্দশ মণ্ডলীর মধ্যে নিম্নলিখিত নয়টি মণ্ডলী, হবীব্ 'অজমীকেই তাঁহাদের পরমার্থ জ্ঞানের মূল উৎস বলিয়া মানিয়া থাকেন। এই মণ্ডলীগুলির নাম,—(১) হবীবী, (২) ত্বয়্ফূরী, (৩ কর্খী, (৪) সক্ত্বী, (৫) জুনয়্দী, (৬) গার্রুণী (৭) ত্বূসী, (৮) ফিরুদূসী, (৯) সুহ্রব্র্দী। অবশিষ্ট পঞ্চমণ্ডলী 'অব্দু ল্-ব্াহিদ্-বিন-য়য়্দ্কেই কেন্দ্র করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছিল।

এই "চতুর্দ্দশ মণ্ডলীর" তালিকায় একটি বিষয় লক্ষ্য করা আবশ্যক। উপরে আমরা যে সকল সম্প্রদায়ের কথা উল্লেখ করিয়াছি, ইহাতে তাহার সকলগুলির নির্দ্দেশ নাই। এই তালিকা যে নিতান্ত অসম্পূর্ণ তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। "চতুর্দ্দশ মণ্ডলীর" অস্তিত্ব সম্বন্ধে সবচেয়ে বিশ্বাস-যোগ্য ও প্রাচীন ঐতিহাসিক প্রমাণ 'অ'ইন-ই-'অক্বরী। ইহা ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে রচিত হইয়াছিল। তাহা হইলে, ষোড়শ শতাব্দী পর্য্যন্ত কি "চতুর্দ্দশ মণ্ডলী"র মধ্যেই ভারতীয় স্বূফী-সম্প্রদায়ের পূর্ণ তালিকা পাওয়া গেল? না, তাহা কখনও নহে। 'অ'ইনে কেবল প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ স্বূফী মণ্ডলীগুলির নাম দেওয়া হইয়াছিল। 'অ'ইন রচিত হইবার প্রায় শতাব্দীকাল পূর্ব্বে কাদিরীয়হ্ সম্প্রদায় ভারতে প্রবেশ (১৪৪২ খৃঃ) করে। তথাপি, এই ইতিহাসে তাহা পরিত্যক্ত হইয়াছে। ইহাতে নক্শবন্দীয়হ্ সম্প্রদায়েরও উল্লেখ নাই। শত্ত্বারী (১) নামক আর এক সম্প্রদায়ের কথা আমরা জানি, 'অ'ইন রচিত হইবার অনেক পূর্ব্বে তাহা ভারতে প্রবেশ করিয়াছিল। 'অক্বরের পিতা হুমায়ূন, এই শত্ত্বারী সম্প্রদায়ের প্রসিদ্ধ সাধক মুহম্মদ ঘৌথ্-এর একজন বিশিষ্ট শিষ্য ছিলেন। ১৫৬২ খৃষ্টাব্দে এই সাধকের মৃত্যু হইলে গোয়ালিয়রে সম্রাট 'অক্বর তাঁহার এক সুরম্য সমাধি নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছিলেন। এই প্রসিদ্ধ শত্ত্বারী সম্প্রদায়ের ভারত-আগমনের বিষয়, 'অ'ইন ই-'অক্বরীতে উল্লেখ নাই। এখন বেশ দেখা যাইতেছে 'অ'ইনের প্রদত্ত "চতুর্দ্দশ মণ্ডলী"র তালিকা এবং স্বূফীদের বর্ণিত তালিকাও সম্পূর্ণ নহে। ভারতে কত সম্প্রদায়ের স্বূফী যে আসিয়াছিলেন, তাহার সঠিক সংখ্যা নির্ণয় করা অসম্ভব। দ্বাদশ শতাব্দী হইতেই ভারতে নিয়মিত ভাবে স্বূফী-প্রভাব অনুভূত হইতে থাকে। অবস্থা যেরূপ দেখা যাইতেছে, তাহাতে মনে হয়, দ্বাদশ শতাব্দীর পর হইতেই, সমুদ্রতরঙ্গবৎ একটির পর একটি করিয়া, এই স্বূফী-মণ্ডলীগুলি ভারতে প্রবেশ করিতেছিল।

ষোড়শ শতাব্দীর অন্যূন দুই শতাব্দী পূর্ব্বে ভারতে আরও একটি প্রসিদ্ধ স্বূফী-সম্প্রদায় প্রবেশ করিয়াছিল; তাহা "মদারী"সম্প্রদায়। বদী'উ-দ্-দীন্ শাহ্ ই মদার্ নামক জনৈক চতুর্দ্দশ শতাব্দীর সাধক, এই সাধনা ভারতে প্রচার করেন। এতদিন এই সাধকের অস্তিত্ব সম্বন্ধে ঘোরতর সন্দেহ ছিল। সম্প্রতি "মিরাত্-ই মদারী" বা শাহ্-ই-মদারের জীবনী নামক একটি ফারসী হস্তলিখিত পুস্তক দেখিয়া আমাদের সমস্ত ভ্রম নিরাকৃত হইয়াছে (১)। এই পুস্তক (২) হইতে নিম্নে কয়েকটি কথা অতি সংক্ষেপে সঙ্কলন করিয়া দিলাম:—

বদী'উ-দ্দীন্ শাহ্ ই মদার্, শাম্ বা সিরিয়াদেশে, বনী 'ইস্রা'ঈল্ বংশে, 'অব্ ইস্হ্বাক শামীর ঔরসে জন্ম-গ্রহণ করেন (হস্তলিপি, পৃঃ ৮)। ১৩১৫ খৃষ্টাব্দে (৭১৫ হিঃ) সিরিয়ায় তাঁহার জন্ম হয় (পৃঃ ১৪১) ও সুল্ত্বান্ ইব্রাহীম্ শাহ্ শর্কীর রাজত্বকালে, হিন্দুস্থানে ১৪৩৬ খৃষ্টাব্দে (৮৪০ হিঃ) তিনি দেহত্যাগ করেন (পৃঃ ১৪১)। তিনি ভারতের নানাস্থান ভ্রমণ করিয়াছিলেন; তন্মধ্যে গুজরাট, অজমের, কনোজ, কাল্পী, লক্ষ্ণৌ, কনতুর, জৌনপুর প্রভৃতি স্থান উল্লেখযোগ্য। কানপুর হইতে ৪০ মাইল দূরবর্ত্তী মাকনপুরে এই দর্ব্বীশের সমাধি বিদ্যমান।

একদিন শাহ্-ই-মদারের প্রবর্ত্তিত মণ্ডলী ভারতের নানা-

১। (i) Encyclopædia of Islam—Article "Shattari."

(ii) Encyclopædia of Religion and Ethics—Article "Saints."

(iii) Indian Islam. P. 121.

১। Vide, Catalogue Raisonne of the Buhar Library (Calcutta) Vol. I., Persian Manuscript No. 88., P. 63.

২। এই পুস্তকটি ১৬০০ খ্রীষ্টাব্দে রচিত হইয়াছিল।

স্থানে যে সমাদর লাভ করিয়াছিল, তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ, অদ্যাপি এই সম্প্রদায়ভুক্ত সাধকের ভারতব্যাপী প্রভাব। উত্তর-ভারতীয় মদারী-মণ্ডলীভুক্ত সাধকেরা প্রতিবৎসর মাকনপুরে সমবেত হয়। বঙ্গদেশও এই মণ্ডলীর প্রভাব হইতে মুক্ত ছিল না। ফরীদপুর জিলার মদারীপুরে এই দরবীশের একটি কৃত্রিম সমাধি রহিয়াছে; স্থানীয় প্রবাদ,—শাহ্‌-ই মদারের নামানুসারেই মদারীপুরের নামকরণ করা হইয়াছে। ফরীদপুরের "বহর্‌হ্বাবী" সম্প্রদায়ের অত্যাচারে, মদার-পীরের এই দরগাহ্‌টি, এখন আর পূর্ব্বের মত উন্নত অবস্থায় নাই। চট্টগ্রামের নানাস্থানের সহিতও মদার-পীরের স্মৃতি জড়িত রহিয়াছে: চট্টগ্রাম জিলার (আঃখিল') মদারসা গ্রাম ও শহরের নিকটবর্ত্তী মদারবাড়ী মদার-পীরের স্মৃতি বহন করিয়া আসিতেছে। উত্তরবঙ্গের দিনাজপুর জিলায় হেমতাবাদ থানার অন্তর্গত বালিয়াদীঘি গ্রামে, এখনও মদারী সম্প্রদায়ভুক্ত সাধকদের জাগ্রত আড্ডা রহিয়াছে। মদারী সম্প্রদায়ভুক্ত সাধক শাহ্‌ সুল্‌ত্বান্‌ হ্বসন্‌ মূরীয়হ্‌ বর্‌হ্নিহ্‌, সুল্‌ত্বান্‌ শাহ্‌ শুজা'র (১৬৩৯-১৬৬০) রাজত্বকালে, সনদ লাভ করেন। এই সনদের তারিখ ১৬৫৮ খৃষ্টাব্দ (৩)। বঙ্গের নানাস্থানে এখনও প্রতিবৎসর "মাদারের বাঁশ" উৎসবের দ্বারা মুসলমান জনসাধারণ দরবীশের স্মৃতি স্মরণ করিয়া থাকে।

এই পর্য্যন্ত পাঠককে আমরা অনেকগুলি ভারতীয় স্বূফী-সম্প্রদায়ের সংবাদ দান করিয়াছি, এবং ইহাও জানাইয়াছি যে, তাহার সমস্তগুলির সমান প্রভাব ভারতে কখনও ছিল না। কালক্রমে ভারতে মাত্র তিনটি সম্প্রদায়ই প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিল,—তাহারা চিশ্‌তীয়হ্‌, সুহর-ব্‌র্দীয়হ্‌ ও কাদিরীয়হ্‌। ভারতে নক্‌শবন্দীয়হ্‌ সম্প্রদায়ের প্রভাবও আধুনিক; সুতরাং তাহার কথা উল্লেখ করিলাম না। এই তিন সম্প্রদায়ের উঠন্ত প্রভাবের নীচে, ধীরে ধীরে ভারতীয় অপর সম্প্রদায়গুলি অস্তিত্ব পর্য্যন্ত হারাইয়া ফেলিয়াছিল। চিশ্‌তীয়হ্‌ ও সুহরব্‌র্দীয়হ্‌ সম্প্রদায় প্রায় একসঙ্গেই ভারতে প্রবেশ করে এবং অচির-কাল মধ্যেই ভারতের বুকে সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়া পড়ে। কাদিরীয়হ্‌ সম্প্রদায়ের ভাগ্যে তাহা ঘটে নাই। পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে (১৪৮২ খৃঃ) ইহা ভারতে প্রবেশ করিলেও সপ্তদশ শতাব্দীতেই ইহার প্রতিষ্ঠা সুদৃঢ় ও ব্যাপক হয়। নক্‌শবন্দীয়হ্‌ সম্প্রদায়ও এই সময়েই ভারতে ছড়াইয়া পড়ে। কিরূপে এই ব্যাপার সংঘটিত হয় তাহা পরে আরও একটু বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করিব।

বিদেশীয় স্বূফদের মধ্যে যেমন কালক্রমে অসংখ্য সম্প্রদায় দেখা দিয়াছিল এবং তাহার কতকগুলি ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়াছিল, ভারতীয় স্বূফীদিগের মধ্যেও অচিরেই অসংখ্য সম্প্রদায় দেখা দিয়াছিল এবং তাহারা ভারতের নানাস্থানে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। তধ্‌কিরহ্‌-ই-ঔলিয়া'-ই-হিন্দ্‌ পুস্তকের মতে (প্রথম ভাগ, পৃষ্ঠা ২ হইতে ৫ দ্রষ্টব্য) চিশ্‌তীয়হ্‌ সম্প্রদায় হইতে চতুর্দ্দশ, জুনয়দীয়হ্‌ হইতে তিন, সুহরবর্দীয়হ্‌ হইতে সপ্তদশ, ত্বূসীয়হ্‌ হইতে একবিংশতি ইত্যাদি—প্রত্যেক সম্প্রদায় হইতে অসংখ্য শাখা বাহির হয়। তাহার তালিকা দিয়া প্রবন্ধ ভারাক্রান্ত করিয়া কাজ নাই। আমাদের এইটুকু জানিলে যথেষ্ট হইবে যে, ভারতীয় স্বূফদের মধ্যে কালক্রমে অসংখ্য শাখা দেখা দিয়াছিল। আবার এই শাখাগুলির প্রত্যেকটিতে যে কিছু-না-কিছু বৈশিষ্ট্য ছিল, তাহা নিতান্তই সত্য। ভারতীয় চরিত্রের বৈশিষ্ট্য হইল তত্ত্বানুসন্ধিৎসা। এইহেতু ভারতীয়গণ কর্ত্তৃক নূতন ধর্ম্ম গৃহীত হইলেও, তাহাতে তাহাদের মনের ছাপ না পড়িয়া যায় নাই। আমাদের মনে হয়, তাই ভারতীয় স্বূফী-মতবাদে এত মত ও সম্প্রদায় দেখা দিয়াছিল। শাখামণ্ডলীগুলি সাধারণতঃ মূলমণ্ডলীগুলির প্রাধান্য ও অধীনতা স্বীকার করিলেও, মূলতঃ তাহা হইতে ধীরে ধীরে দূরে সরিয়া পড়িতেছিল।

ইতঃপূর্ব্বে আমরা দেখিয়াছি, প্রকৃতপক্ষে খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীই, ভারতে স্বূফী-প্রভাব বিস্তৃতির কাল। এই সময়েই স্বূফী-প্রভাব ভারতবর্ষে স্থায়ীভাবে স্থানলাভ করিয়াছিল। এই সময়ে স্বূফী-মতবাদের মূলধারা, পারস্য, সমরকন্দ, বুখারা প্রভৃতি দেশে কোন্‌ গতি ও পথ গ্রহণ করিয়া চলিয়াছিল, তাহাও এস্থলে ভাবিবার বিষয়। এই দেশগুলিতে প্রচলিত

৩। Journal of the Asiatic Society of Bengal, Vol. LXII., Pt. III. No. 1. 1903. Pp. 61-65.

স্বূফী মতবাদ তখন বিশ্বব্রহ্মবাদে (Pantheism) ভরপূর হইয়া উঠিয়াছে। স্বূফী-মতবাদের যে ধারা ভারতে আসিয়া পৌঁছিয়াছিল, তাহা খাস আরব হইতে আসে নাই,—উপরোক্ত দেশগুলি হইতেই আসিয়াছিল। সুতরাং একথা সহজেই সঠিকভাবে অনুমান করা যাইতে পারে, ভারতের বহির্দেশস্থ বিশ্বব্রহ্মবাদকে সঙ্গে লইয়াই, স্বূফীরা এদেশে প্রবেশ করিয়াছিলেন। এস্থলে বলিয়া রাখা ভাল, কেহ যেন মনে না করেন,—খৃষ্টীয় একাদশ ও দ্বাদশ শতাব্দীতে পারস্য ও আরবে একেশ্বরবাদী স্বূফী ছিলেন না; থাকিলেও থাকিতে পারেন, কিন্তু তাঁহারা বা তাঁহাদের শিষ্য প্রশিষ্যেরা ভারতে আসিয়াছিলেন বলিয়া প্রমাণ পাওয়া যায় না। এ কথাও সত্য যে, ভারতীয় সমস্ত মণ্ডলীর বিস্তৃত মতবাদ জানিবার সৌভাগ্য, উপাদানাভাবে এ পর্য্যন্ত আমাদের অদৃষ্টে ঘটিয়া উঠে নাই। সমস্ত মণ্ডলীর মতবাদ জানিবার সৌভাগ্য আমাদের না হইলেও, যতগুলি মণ্ডলীর বিষয় অবগত হইয়াছি, প্রত্যেকটিতেই বিশ্বব্রহ্মবাদের স্পষ্ট ছাপ দেখিতে পাই। মোটের উপর, ভারতে যতগুলি স্বূফী-সম্প্রদায় প্রবেশ করিয়াছিল, বিদেশীয় বিশ্বব্রহ্মবাদকে সঙ্গে লইয়াই প্রবেশ করিয়াছিল, বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। ভারত প্রাচীনকাল হইতেও বেদান্তের দেশ, চিরদিনই মর্ম্মবাদী দার্শনিকের লীলাক্ষেত্র, এবং চিরদিনই নিগূঢ় অধ্যাত্মবাদের জন্মস্থান। আবার চিরদিনই পারস্য, সমরকন্দ ও বুখারা প্রভৃতি দেশের মর্ম্ম ভারতের মর্ম্মের সহিত একই সূত্রে গ্রথিত। কাজে কাজেই, ঐ সকল দেশ হইতে বিশ্বব্রহ্মবাদের বাণী ও মর্ম্মবাদের গূঢ় রহস্য লইয়া স্বূফীরা যখন ভারতে প্রবেশ করিলেন, প্রথমতঃ বিদেশীয় ও "তুর্ক" ধর্ম্ম ও দর্শন বিধায়, ভারত তাহাকে গ্রহণ করিতে একটু দ্বিধা ও সঙ্কোচ বোধ করিলেও, কিছু দিনের মধ্যে, ভারত যখন তাহার সম্যক পরিচয় লাভ করিল, তখন তাহাকে দুইহাত বাড়াইয়া বুকে টানিয়া লইল। অচিরেই, ভারতবর্ষ, এই পারস্য সমরকন্দের নব মর্ম্মবাদের (Mysticism) মধ্যে, প্রাচীনকালের কোন বিস্মৃত আত্মীয়জনের মনোরম মূর্ত্তির সাক্ষাৎলাভ করিল; আর এই নব মর্ম্মবাদও ভারতের প্রাণে প্রাণে একটি প্রাচীন যোগসূত্রের আবিষ্কার করিয়া ফেলিল। তাই অতি সহজেই, ইহা ভারতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত ছড়াইয়া পড়িল। মাত্র একটি শতাব্দী অতীত না হইতেই, ইহা সমগ্র ভারতের প্রাণে একটি নূতন হাট ও নবীন আসর জমাইয়া তুলিল। মুসলমানদের ক্ষাত্রশক্তি যতশীঘ্র ভারতকে গ্রাস করিতে পারে নাই, তাহার এক-তৃতীয়াংশ সময়ের মধ্যেই, এই স্বূফী-মতবাদ ভারতের হৃদয় জয় করিয়া লইতে সমর্থ হইয়াছিল। এই ভারত-হৃদয়-বিজয় ব্যাপারে আলেক্সান্দর হইলেন কবীর (১৩৯৮-১৪৪৮)। ভারতীয় সাধনার সহিত স্বূফী "তস্বব্‌বুফের" বা ব্রহ্মবাদের মিলন ঘটিল, উভয়বিধ সাধনার মৈত্রী সংস্থাপিত হইল। এতদিন এই দুই সাধনা ভাবের আদান-প্রদান করিতে করিতে ধীরে ধীরে পরস্পর নিকটবর্ত্তী হইতেছিল,—পরিশেষে কবীরের মধ্যে উভয়ের মিলন ঘটিল। এই জন্যই বলিতে হয়, যদি মুসলমানদের মধ্যে প্রকৃতই কেহ ভারত-বিজয় করিয়া থাকেন,—তিনি কবীর;—আকবর কি ঔরঙ্গযীব নহেন। এই জন্যই, কবীরের অন্তর্দ্ধানের পরেও, ভারতের পূর্ব্ব হইতে পশ্চিম, উত্তর হইতে দক্ষিণ সর্ব্বত্রই তাঁহার মতের প্রতিধ্বনি জাগিয়া উঠিয়াছিল।

এইরূপভাবে ভারতীয় সাধনা ও স্বূফী তস্বব্‌বুফের মিলন ঘটায়, ফল হইল কি? ফল ভাল হইল, কি মন্দ হইল, সে বিচার পাঠকদের স্বীয় স্বীয় অভিরুচির উপরই নির্ভর করে। সাধারণতঃ দুই ব্যক্তির মিলন ঘটিলে, যে অবস্থা হয়, এক্ষেত্রেও তাহাই হইল:—স্বূফী তস্বব্‌বুফ্ তাহার মৌলিক বিশুদ্ধতা হইতে কতকটা সরিয়া দাঁড়াইয়া, আর ভারতীয় সাধনা কতকটা অগ্রসর হইয়া মিলনের পথ প্রশস্ত করিয়া দিল। ফলে উভয় সাধনার রক্ষণশীল দিক ক্রমেই শিথিল হইয়া পড়িল। এই শিথিলতার সুযোগ গ্রহণ করিয়াই, ভারতীয় স্বূফীরা অসংখ্য শাখামণ্ডলীর প্রতিষ্ঠা করিয়া ফেলিলেন। ফলে ভারতের নানা স্থানে অসংখ্য মত দাঁড়াইয়া গেল,—ভারতের স্বূফী-জগৎ নিত্য-নূতন মতের উদ্ভবে ধীরে ধীরে ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিল। এখন স্বূফী-মতবাদের মৌলিক বিশুদ্ধতার কতকাংশ লোপ পাইল; আর ভারতীয় সাধনার বৈশিষ্ট্যও কতকাংশ হ্রাস পাইল। ফল কথা, ভারতের চিন্তা-জগৎ মিশ্রণ-দোষে বা মিশ্রণ-গুণে ভরপূর হইয়া গেল।

ভারতে অচিরেই এই ভাব-মিশ্রণের বিরুদ্ধে একটি প্রতিক্রিয়া দেখা দিল। সূফীদের মধ্যে এই প্রতিক্রিয়ার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রবর্ত্তক হইলেন, শয়্খ্ 'অহ্‌মদ্ সরহিন্দী (১৫৬৩-১৬২৪ খৃঃ)। তিনি "মুজদ্দদ্-ই-'অলফ্-ই-থানী" অর্থাৎ হিজরী "দ্বিতীয় হাজারের সংস্কারক" নামে পরিচিত। তিনি প্রধানতঃ নক্‌শ্‌বন্দীয়হ্ সম্প্রদায়ভুক্ত সাধক এবং একজন মহাজ্ঞানী ও সুলেখক ব্যক্তি ছিলেন। ষোড়শ শতাব্দীর ভারতবর্ষে তাঁহার মত মহাপণ্ডিত ছিল না বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তিনি সকল সম্প্রদায়ের সূফী ও ভারতবাসী মুসলমানদের সংস্কারসাধনে মনোযোগ দিলেন। হিন্দুগণও তাঁহার প্রচারের হাত হইতে নিষ্কৃতিলাভ করে নাই। তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ ও গভীর পাণ্ডিত্যপূর্ণ "মকতুবাত" (লিপিমালা) গ্রন্থ পাঠ করিলে, একদিকে যেমন তাঁহার সংস্কার-প্রচেষ্টা দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়, তেমনই অন্যদিকে তাঁহার "তসব্বুফ্" (ব্রহ্মবাদ) জ্ঞানের অতল গভীরতা দেখিয়া অবাক হইতে হয়। এই "মকতুবাত" গ্রন্থের মধ্যেই তিনি কখনও ভ্রান্ত সূফীকে সৎপথে পরিচালিত করিতেছেন, আবার কখনও হিন্দুকে ইস্‌লামের শিক্ষা ও সৌন্দর্য্য সুন্দররূপে সহজভাবে বুঝাইয়া দিতেছেন। তাঁহার এইরূপ সংস্কারমূলক প্রচারের ফলে, চতুর্দ্দিকে সাড়া পড়িয়া গেল।—শী'অহ সম্প্রদায় তাঁহার শত্রু হইয়া দাঁড়াইল। এই সময় স্বয়ং সম্রাট জহাঁগীরও বিচলিত হইয়া পড়িলেন এবং তাঁহাকে বন্দী করিলেন। কিন্তু কিছুকাল পরে সম্রাট নিজের ভুল বুঝিতে পারিয়া তাঁহাকে কারাগার হইতে মুক্তিদান করিলেন এবং যুবরাজ খুররমকে (শাহ্‌জাহান) তাঁহার হাতে দীক্ষাদান করাইলেন। কারাগার হইতে মুক্তিলাভ করিয়া শয়্খ্ 'অহ্‌মদ্ দ্বিগুণ উৎসাহ ও জোরে সংস্কারকার্য্য চালাইয়াছিলেন। অচিরকাল মধ্যে তাঁহার সংস্কারের ঢেউ ভারতের সর্ব্বত্র অনুভূত হয় এবং তাঁহার নিকট হাজার হাজার লোক দীক্ষাগ্রহণ করে। তিনি যে সংস্কারের ভিত্তি পত্তন করিলেন, পরবর্ত্তীকালে সম্রাট ঔরঙ্গযীব তাহাকে আরও ব্যাপক ও আরও কঠোর করিয়া তুলিয়াছিলেন। সূফীদিগকে সংস্কার করিতে যাইয়া সম্রাট ঔরঙ্গযীব, ১৬৫৯ খৃষ্টাব্দে সর্‌মদ্ নামক প্রসিদ্ধ সাধককেও হত্যা করিয়াছিলেন। মুজদ্দদ্-ই-'অলফ্-ই-থানীর মসী অনেক ক্ষেত্রে ঔরঙ্গযীবের মধ্যে অসিতে পরিণত হইয়াছিল। এইরূপ সংস্কারের ফলে ভারতে কাদিরীয়হ্ ও নক্‌শ্‌বন্দীয়হ্ সম্প্রদায় সুদৃঢ় ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইল। জানিয়া রাখা আবশ্যক, কাদিরীয়হ্ সম্প্রদায় ভারতীয় মুসলমানদের নিকট অনেকখানি সংস্কারপন্থী বলিয়া গৃহীত হইয়াছে—ইস্‌লামবিরুদ্ধ ভাব ও চিন্তা যেন এই সম্প্রদায়ে বড় বেশী নাই। আর নক্‌শ্‌বন্দীয়হ্ সম্প্রদায়, মুজদ্দদ্-ই-'অলফ্-ই-থানীর নিজের সম্প্রদায়। সুতরাং এই সংস্কারের যুগে ইঁহাদের বেশ আদর হইল। এই সময় হইতেই সংস্কৃত নক্‌শ্‌বন্দীয়হ সম্প্রদায়, "মুজদ্দদীয়হ্" নামে পরিচিত হইতে লাগিল। ঔরঙ্গযীবের মৃত্যুর পর, ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে যে আমূল পরিবর্ত্তন দেখা দিয়াছিল, তাহার ফলে ধীরে ধীরে ভারত হইতে সংস্কারের চেষ্টা দূরীভূত হইল। রাজনৈতিক পরিবর্ত্তনের সহিত মুসলমানদিগের ধর্ম্ম, সমাজ ও শিক্ষা প্রভৃতি যাবতীয় অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটিল—ভারতীয় সূফী-মতবাদের ধারাও ভিন্নপথে পরিচালিত হইল। সে সকল বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনা এস্থলে বাহুল্য।

(ক্রমশঃ)

ভিক্তর হুগো

শ্রী ধীরেন্দ্রলাল ধর বি-এ

প্রতিভার জন্ম ঘটে মধ্যবিত্ত গৃহস্থ-ঘরেই। নিছক অর্থের প্রাচুর্য্যই জীবনকে প্রদীপ্ত ক'রে তোলে না; বিত্তের ভিত্তি যেখানে পরিশ্রমের উপর প্রতিষ্ঠিত, দুঃখ ও দারিদ্র্যের পথে জীবনধারা গতিশীল যেখানে,—সেখানেই মানুষের মধ্যে ব্যক্তিত্ব ও পুরুষকারের স্পর্দ্ধা বিকাশ লাভ করে।

ভিক্তর হুগোও জন্মেছিলেন মধ্যবিত্ত গৃহস্থের ঘরে।

শীর্ণ, ক্ষীণকায় শিশু। যে কোন মুহূর্ত্তে জীবনের দীপ নিভে যাবার সম্ভাবনা।—সে শিশুর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আত্মীয়-পরিজনের ভয় ও ভাবনার বিরাম নেই।

সেদিন আঠারো শো-দুই সালের ছাব্বিশে ফেব্রুয়ারী। সন্ধ্যার অন্ধকার ধরিত্রীর বুকের উপর ধীরে ধীরে ঘনিয়ে আস্‌ছে। "ব্যাসিন্‌কোনের" পাহাড়ের মাথায় মাথায় ছড়িয়ে পড়েছে অস্তিম-সূর্য্যের রক্তিম রশ্মি। স্পেনের বুকে তখন পরাধীনতার কলঙ্ক কুয়াসার আবছায়ায় আপনাকে আবৃত কর্‌তে ব্যস্ত। কেল্লার মধ্যে স্পোর্টসে মত্ত সৈনিকদের আনন্দ-কলরব এবার থেমে এল বুঝি। এম্নি মুহূর্ত্তে একটি শিশু জন্মগ্রহণ করলো—শীর্ণ, ক্ষীণ, মৃত্যু-সম্ভাবিত।

পিতা জেনারেল হুগো ছিলেন রণকুশলী যোদ্ধা-শ্রেষ্ঠ নেপোলিয়নের অন্যতম সহযোগী। অনন্যসাধারণ ছিল তাঁর সাহস,—বাহুবলে তিনি বহু খণ্ড-যুদ্ধে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিলেন। স্পেনের ব্যাসিন্‌কোন প্রদেশের কেল্লার কর্ত্তৃত্ব ছিল তখন তাঁর উপর। সেই সময় প্রবাসী সেনাপতির দুর্গগৃহে ভবিষ্যতের সম্ভাবনা নিয়ে হুগোর জন্ম।

সেনাপতির পুত্র,—দুর্গের মধ্যে জন্ম,—কিন্তু জীবনের পূর্ণ বিকাশ ঘট্‌ল সাহিত্যের শ্রেষ্ঠত্বে।

সর্ব্বশুদ্ধ তিনটি ভাই: ভিক্তরই কনিষ্ঠ।

আবেল্ হুগো বড়

য়্যুজিন্ মধ্যম।

স্পেনের বুকে জন্মগ্রহণ করলেও স্পেনের আব্‌হাওয়ার সঙ্গে ইনি পরিচিত হ'তে পারেন নি। জেনারেল হুগো সপরিবারে বদলী হ'য়ে আসেন 'এল্‌বা' দ্বীপে—শিশু ভিক্তরের বয়স তখন সবেমাত্র দেড়মাস। কিন্তু 'এল্‌বা'কেও শিশু ভালো ক'রে চিন্‌লো না; তিনবছরের মধ্যেই এঁর পিতাকে এল্‌বা থেকে 'কর্সিকা' দ্বীপে আস্‌তে হোল। বিজেতা সাম্রাজ্যের তিনি ছিলেন সেনাপতি—বিজিত দেশের বুকে সৈন্য-শৃঙ্খলা অব্যাহত রাখ্‌বার জন্য যখন যেখানে তাঁর উপস্থিতির প্রয়োজন ঘট্‌তো জেনারেল হুগো সেখানেই চ'লে আস্‌তেন—তবে একা নহে, সপরিবারেই।

—প্রথমে ইটালি;

—তারপর প্যারীতে;

—শেষে আবার স্পেনে।

দিগ্বিজয়ী নেপোলিয়নের সৈন্যাধ্যক্ষের জীবনে ভবঘুরেমির যে ছায়া পড়্‌বে—এ একটুও বিস্ময়াবহ নয়।

—ম্যাড্রিদ্ সহর।

সম্মিলিত প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন, স্পেনের রাজধানী। তারি মাঝে তদানীন্তন আদর্শে গঠিত অভিজাত সন্তানদের জন্য নামকরা শিক্ষাগার—'কলেজ অফ্ নেব্লস্'। আভিজাত্যের গর্ব্ব ও স্পর্দ্ধার মধ্য দিয়ে শিক্ষিত হ'য়ে উঠ্‌বার এতবড় আদর্শ-বিদ্যালয় ম্যাড্রিদ্ সহরের বুকে সে-যুগে ছিল না। সৎশিক্ষার মধ্য দিয়ে পাণ্ডিত্য জন্মাক্ বা না-জন্মাক্, আচার-ব্যবহারের ত্রুটি শিক্ষকদের কাছে ছিল অমার্জ্জনীয়। এই শিক্ষাগারেই ভিক্তরের প্রথম পড়াশুনা সুরু হোল।

কিন্তু এখানকার পড়াশুনা বেশীদূর এগুলো না।

নেপোলিয়নের বিরাট সাম্রাজ্য তখন পরাধীনতার স্বর্ণ-শৃঙ্খল ছিন্ন করতে উৎসুক,—ফ্রান্সের বুকে একটি অনা-

গতের ভাবী আশঙ্কা জমাট বাঁধ্‌ছে। চারিদিকের বিচ্ছিন্ন সেনা ও সেনাপতিদের সম্মিলিত কর্‌বার জন্য ফরাসীরাজ তখন উৎসুক ; তারই ফলে জেনারেল হুগোকেও চ'লে আস্‌তে হ'ল ফ্রান্সে।

প্যারীতে এসে পিতৃপুরুষের ভিটা দখল ক'রে বস্‌লেন তিনি।

বাড়ীটির নাম 'লা ফ্যিলাটিন্‌স্‌'—ছবির মত। সামনেই গৃহসংলগ্ন উদ্যান,—ফুলের সৌরভ, পাতার মর্ম্মর ভেসে আসে—কিশোর কবির মনে স্বপনপুরীর স্বপ্ন জাগে, নির্জ্জন নিঃসঙ্গ মুহূর্ত্তে সে যেন কি শুন্‌তে পায়, পত্রের মর্ম্মরে আর পুষ্পের সৌন্দর্য্যে সে যেন কি খুঁজে পেতে চায়—

এদিকে পিতার বন্ধুর কাছে লাটীন পড়া চল্‌তে থাকে।

'জেনারেল লাহোরী' ছিলেন সে যুগের একজন অন্যতম বিদ্রোহী। বিভিন্ন ষড়যন্ত্রের মধ্যে লিপ্ত থাকায় আত্ম-গোপন কর্‌বার তাঁর একান্ত প্রয়োজন হ'য়ে পড়ে। জেনারেল হুগো ছিলেন তাঁর বাল্যসহপাঠী, ভূতপূর্ব্ব সহকর্ম্মী, বন্ধু—একাধারে সব। তাই তাঁরি গৃহে 'জেনারেল লাহোরী' আত্মগোপন কর্‌লেন। বিভিন্ন ভাষায় লাহোরীর পাণ্ডিত্য ছিল অনন্যসাধারণ, তার উপর ছিল তাঁর বিপ্লবী চিন্তাধারা। তাঁর কাছে শিক্ষালাভের ফলে ভিক্টর সাধারণ ছেলেদের চেয়ে ভিন্ন প্রকৃতির হ'য়ে গ'ড়ে উঠ্‌তে লাগ্‌লো—অবিনীত বৈপ্লবিক চিন্তাধারা তখন তাঁর মনে ধীরে ধীরে অঙ্কুরিত হ'য়ে উঠ্‌ছে।

রাজনীতি নিয়ে পিতা থাকৃতেন ব্যস্ত।—আর মায়ের মত ছিল উদার। তাই যখন কলেজের কর্ত্তৃপক্ষ তাঁর এই-সব উচ্ছৃঙ্খল মতবাদের জন্য মায়ের কাছে অভি-যোগ জানাতেন তখন মায়ের স্নিগ্ধ স্নেহ হাসির মুখে সে-সব কথা কোথায় যেন হারিয়ে যেত। মায়ের স্নেহজাত এই শাসন-অক্ষমতার জন্যই হুগোর শিক্ষা পদ্ধতি-অনুযায়ী সুন্দর হ'য়ে ওঠে নি। লাটীন, স্পেনিশ, গ্রীক প্রভৃতি বারোটি ভাষা ইনি শিখেছিলেন ; গণিত, রসায়ন, দর্শন প্রভৃতিও ইনি যথেষ্ট অধ্যয়ন করেন ; কিন্তু এ সম্বন্ধে ধারা-বাহিক ভাবে আলোচনা ক'রে তিনি পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিতে পারেন নি—রচনার ক্রম-বিকাশের মুখে যেখানে তিনি সে-চেষ্টা করেছেন সেখানটাই সমালোচকের দৃষ্টিতে হ'য়ে পড়েছে শৃঙ্খলাশ্রয়ী উচ্ছ্বাস শুধু। শৈশবে একটু বিধিনিষেধের মধ্যে থাক্‌লে, একটু শাসনপীড়নের ভীতি থাক্‌লে, ভবিষ্যতে তিনি যে আরো অনেক-কিছুই ক'রে যেতে পার্‌তেন এ কথা আজ নিঃসন্দেহে বলা চলে।

বয়স তখন সবে বারো—

পাখীর গান শুনে', প্রজাপতির পিছনে ছুটে', ফুলের রূপ দেখে জীবনের দিনগুলো কেটে যাচ্ছে বাল্যের কলোচ্ছ্বাসের মধ্য দিয়ে। কিন্তু জীবনের এ ধারা হঠাৎ ছিন্ন হোল নেপোলিয়নের রাজ্যচ্যুতির সঙ্গে সঙ্গে।

প্রজাতন্ত্রের উদ্ভব—

বিখণ্ড, রাজসেনাপতি জেনারেল হুগোরও ঘট্‌লো পদচ্যুতি—সৈন্য হস্তান্তরিত হ'য়ে গ্যালো।—সেনাপতির পরিচ্ছদ পর্‌লো এই রাষ্ট্রবিপ্লবের চরম পৃষ্ঠপোষকেরা। শুধু জেনারেল হুগো কেন, সারা ফ্রান্সের বুকেই একটা বিপ্লব ঘ'টে গ্যালো।

ভিক্টরের জীবনেও ঘট্‌লো পরিবর্ত্তন—

পিতা জেনারেল হুগো সেনাপতির পদ থেকে অপসারিত হবার পর ভিক্টরের লেখাপড়ার দিকে দৃষ্টি দিলেন। ভিক্টর আর য়্যুজিন দুই ছেলেকে ভর্ত্তি ক'রে দিলেন লুই-লা-গ্রাঁদ কলেজে।

বোর্ডিংয়ের জীবন।

বাঁধা ধরা নিয়ম-কানুনের মধ্যে থাক্‌তে ভিক্টরের মনে বিদ্রোহ জাগে। বন্দীর মত তার জীবনটা হ'য়ে ওঠে অধৈর্য্য।

তবু থাকৃতে হয়।

শেষে সে মনের গতি ফিরিয়ে দিলে অন্যদিকে। জীবনটার মধ্যে একটু বৈচিত্র্য আন্‌বার জন্যে সে নিজেদের মধ্যে একটা থিয়েটারের দল গ'ড়ে তুল্‌লো।

এবং পদ্যলেখাও সুরু হোল।

প্রথম দিকে সুরু হোল বড় বড় বিদেশী কবিদের কবি-তার অনুবাদ, তারপর নিজস্ব সৃষ্টি—খণ্ডকবিতা, গাথা, নীতিকবিতা, শোককবিতা, গান—সব-কিছুই।

চোদ্দ বছর বয়সের মধ্যেই এই কিশোর কবি সবক'টি

সাময়িক পত্রের মধ্য দিয়ে পাঠকমহলে বিশেষ ভাবেই পরিচিত হ'য়ে উঠ্‌লেন। কিন্তু তখন শুধু নিজ সৃষ্টিবৈশিষ্ট্যে কবি হিসাবে পরিচিতই হ'য়েই উঠ্‌ছিলেন—খ্যাতি হয়নি। সেই খ্যাতিলাভ হ'ল একদিন আকস্মিক ভাবে।

—বছর খানেক পরের কথা।—

'একাডেমী' থেকে একটি কবিতা-প্রতিযোগিতা হ'ল। ছোট কবিতার শ্রেষ্ঠত্ব নিয়ে কবিদের মধ্যে চাঞ্চল্য প'ড়ে গ্যালো। নিজস্ব কল্পনাবৈশিষ্ট্যে তদানীন্তন সকলেই লিখ্‌তে সুরু কর্‌লেন অসীম উৎসাহে। কিন্তু যে পুরস্কারের সম্মান নিয়ে তরুণ যুবক প্রৌঢ়' কবিদের উৎকণ্ঠা আর প্রতিদ্বন্দ্বিতার শেষ ছিল না, সেই পুরস্কারই লাভ কর্‌লো একটি কিশোর কবি—সে ভিক্তর হুগো।

খ্যাতির হোল এই প্রথম সূত্রপাত।

কিন্তু শুধু কি ওই একটি পুরস্কার?—বছর ঘুর্‌তে হোল না, পরস্পর দুটো কবিতা-প্রতিযোগিতায়ই ভিক্তর প্রথম হ্‌লেন। কিশোর কবির নাম ছড়িয়ে পড়্‌লো চারিদিকে।

খ্যাতির মোহ ভিক্তরকে সম্মোহিত কর্‌লো। সাহিত্য-সেবাকেই তিনি জীবনের আদর্শ ক'রে তুল্‌লেন। ষোল বছর বয়সে স্কুলের পাঠ্য শেষ ক'রে যখন বেরোলেন, তখন কোথায় উচ্চশিক্ষার জন্য কলেজে ভর্ত্তি হবেন, তা নয় একখানি পত্রিকা বা'র কর্‌লেন—Le Conservateur Litteraire নামে।

দু'ভাই ছিলেন এই কাগজখানির প্রবর্ত্তক—আবেল ও ভিক্তর। নিজ নিজ সামর্থ্যের উপর ছিল দুজনেরই অসীম স্পর্দ্ধা,—তাই তরুণ-বয়সেই পত্রিকা-সম্পাদনার দুঃসাহস তাঁদের হয়েছিল।

অল্পদিনের মধ্যেই পত্রিকা জ'মে উঠ্‌ল।

সে-যুগের খ্যাতনামা তরুণেরা এই মাসিকে লিখ্‌তেন—এমিল্ বেস্‌চ্যাম্প, আলেক্‌জাণ্ডার সুমেৎ, আল্‌ফ্রেদ্ দ্য ভিগ্‌নি, লামার্টিন—প্রভৃতি। শীঘ্রই তরুণদের মুখপত্র হ'য়ে উঠ্‌লো এই কাগজখানি।

কিন্তু কাগজখানি শেষ পর্য্যন্ত টিক্‌লো না।

তবু এই কাগজখানির সম্পাদকীয় প্রবন্ধগুলি থেকে ভিক্তরের মতবৈশিষ্ট্য বিশেষ ভাবেই চোখে পড়ে। পত্রিকা-খানির সম্পাদক হিসাবে সম্পাদকীয় প্রবন্ধগুলি ভিক্তর নিজেই লিখ্‌তেন, সেগুলি থেকে তাঁর তখনকার মতবৈশিষ্ট্য ধরা পড়ে।

বিপ্লবের রক্তপিচ্ছিল পথের উপর দিয়ে এগিয়ে এসে ফিরে যাবার দুঃস্বপ্ন দেশবাসীর তন্দ্রাকে তখন বিষিয়ে তুলেছিল, ফলে রক্ষণশীল আন্দোলন ধুঁইয়ে উঠেছিল দেশের বুকে। তারপর যেদিন বন্দী নেপোলিয়ন বিজয়ী ফরাসী-সেনার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে দ্বীপান্তরের জাহাজে উঠ্‌লেন তখন রক্ষণশীলদের চীৎকার উঠ্‌লো-পুরানো রাজবংশই আবার রাজা হোক্, বিপ্লবের রক্তপিচ্ছিল পথে চল্‌বার দুঃসাহস আর আমাদের নেই। তদানীন্তন বিখ্যাত প্রভাবশালী লেখক স্যাটুব্রাঁদ্‌ও এই আদর্শের ছিলেন অন্যতম উৎসাহী। স্যাটুব্রাঁদের প্রভাবে অনুপ্রেরিত হ'য়ে ভিক্তরও হ'য়ে উঠ্‌লেন রক্ষণশীল—তাঁর তদানীন্তন 'সম্পাদকীয়'তে রাজনীতির সেই দিকটাই বিশেষ ভাবে চোখে পড়ে।

পত্রিকাখানি বন্ধ হ'য়ে যাবার কিছুদিন পরে ভিক্তরের একখানি কবিতার বই প্রকাশিত হোল। পুস্তিকাকারে এই তাঁর প্রথম কাব্যসংগ্রহ: নাম—Odes et Poesies Diverses.

উনিশ-শো-বাইশ সালে বইখানি বেরোয়। সে বই-য়ের সবক'টি কবিতাকে দুট পর্য্যায়ে ফেলা চল্‌তে পারে—কতকগুলি কবিতা ঐতিহাসিক ঘটনাকে ভিত্তি ক'রে রচিত, অপরগুলি হ'চ্ছে গাথা ধরণের কবিতা। কবিতাগুলি প্রথম যুগের; কাজেই বিশেষ তেমন কিছু প্রত্যাশা করা চলে না সেগুলির মধ্যে। অতিরিক্ত শব্দবাহুল্যের আড়ম্বরে, কবিতাগুলির বৈশিষ্ট্য থাক্‌লেও, মানবচরিত্রের উপর তেমন রেখাপাত কর্‌বার মত ছিল না সেগুলি। কবি শুধু নিজের আকাঙ্ক্ষা নিজের অনুভূতিগুলোই প্রকাশ করেছেন এই কবিতাগুলির মধ্যে এবং কবির স্বকীয়তা বিশেষ ভাবেই প্রকাশ পায় এর বর্ণনার শ্রেষ্ঠতায়। অনেকে বলেন এই কবিতাগুলিতে বিখ্যাত লেখক স্যাটু-ব্রাঁদের প্রভাব বিশেষভাবেই পরিলক্ষিত হয়।—অভিনব

ছন্দের মধ্য দিয়ে একখানি ছবি ফুটিয়ে তোল্‌বার শক্তি স্যাটুব্রাঁদের বৈশিষ্ট্য ছিল তদানীন্তন যুগে।

একটি ঝড় ব'য়ে গ্যালো—

উনিশ বছর বয়সে কবির মাতৃবিয়োগ ঘট্‌লো। মায়ের স্নেহাধিক্যের সুযোগ নিয়ে কবি হিউগো কবি হ'য়ে উঠেছিলেন, তাঁর কবিখ্যাতির উপরে তাঁর মা'ই ছিলেন একান্ত স্নেহশীল। সেই মায়ের মৃত্যু কবির জীবনধারা ভিন্নমুখী ক'রে দিল--জীবনের যাত্রাপথে প্রথম আঘাত পেয়ে কবি মুহ্যমান হ'য়ে পড়লেন।

মায়ের মৃত্যুর অন্যতম কারণ ছিল মনোকষ্ট, যা তাঁর জীবনের মধ্যপথেই পূর্ণচ্ছেদ টেনে দ্যায়—

পিতা ও মাতার মধ্যে গ'ড়ে উঠেছিল ব্যবধানের বিস্তৃতি। জেনারেল হুগো এক তরুণীর প্রেমে পড়েছিলেন, মা তা জান্‌তে পারেন এবং সেই জান্‌তে পারাই সংসারের মধ্যে অশান্তির সৃষ্টি কর্‌লো—স্বামী পৃথক হ'য়ে গেলেন, মাসিক একটা মাসহারার মত ব্যবস্থা ক'রে। কিন্তু পিতৃহৃদয় সন্তানের জন্য স্নেহাকুল থাকে,তাই ছেলেদের তিনি একেবারে ত্যাগ কর্‌তে পারেন নি—হয়তো এটি একটি চক্ষুলজ্জার ব্যাপারও হ'তে পারে। মনোকষ্টে মা শীর্ণ হ'য়ে পড়্‌লেন—শেষে স্বামী তাঁকে ডাইভোর্স ক'রে তরুণী প্রিয়াটির পাণি-পীড়ন কর্‌ছেন শুনে' তিনি হঠাৎ দুঃখক্লিষ্ট ধরণীর বুক থেকে বিদায় নিলেন।

কিশোর কবির দৃষ্টিতে কিন্তু সব-কিছুই ধরা পড়্‌লো—পিতাকে তিনি ক্ষমা কর্‌তে পার্‌লেন না।

পুত্রের এই বিসদৃশ ব্যবহার পিতার চোখে পড়্‌তে দেরী হোল না। ফলে, পিতা-পুত্রের মধ্যে যে মনোমালিন্যের সৃষ্টি হোল একদিন তা অতি সামান্য কারণেই আত্মপ্রকাশ কর্‌লো: পিতা বল্‌লেন—এম্‌নি ধারা পড়াশুনা বন্ধ ক'রে গল্প কবিতা লেখা চল্‌বে না, কলেজে ভর্ত্তি হ'য়ে পড়াশুনা সুরু ক'রে দাও—

লেখক হবার নেশা, নতুন কিছু সৃষ্টির আকাঙ্ক্ষা তখন তাঁর মাথার মধ্যে ব্যাধির মত সংক্রামিত হ'য়ে উঠেছে, তার উপর আবাল্যের অনভ্যাসে কলেজের বিধি-নিষেধের মাঝে ধরা দেওয়া তাঁর কাছে হ'য়ে উঠেছিল অসম্ভব, কাজেই ভিক্তর জানালেন পড়াশুনা আর তাঁর দ্বারা হবে না—

ক্রুদ্ধ পিতা রুক্ষ কণ্ঠে বল্‌লেন—তোমার মত বেকার পুত্রের ব্যয়ভার বহন করা তাহ'লে আমার কাছে অসম্ভব।

—বেশ!

সেই থেকেই ভিক্তরের পিতৃদত্ত বৃত্তি বন্ধ হ'য়ে গ্যালো—প্রাচুর্য্যের আকাশ দারিদ্র্যের মেঘে ঢেকে ফেল্‌লো। অবস্থার বিপর্য্যয়ে ভিক্তরের কষ্টের আর সীমা রইলো না, অভাব-অনাটন তাঁর নিশ্বাসকে বিষিয়ে তুল্‌লো।

কিন্তু শেষে প্রচেষ্টা ও আত্মবিশ্বাসই জয়ী হোল। তাঁর কবিতার বইখানি এতবেশী জনপ্রিয় হ'য়ে উঠ্‌লো যে তার লাভাংশ থেকে তাঁর অবস্থা অপেক্ষাকৃত স্বচ্ছল হ'য়ে উঠ্‌লো। শেষে তাঁর কবিপ্রতিভা দেশের গণ্যমান্য রাজ-কর্ম্মচারীদের উপর এম্‌নি ভাবে প্রভাব বিস্তার কর্‌লো, যার ফলে প্রতিভাশালী তরুণ কবির দুঃখপ্রপীড়িত জীবনের কথা ফরাসীরাজের কানেও উঠ্‌লো। স্বাধীন দেশ,—দেশীয় প্রতিভা পূর্ণ বিকাশ লাভ কর্‌বার সুযোগ পায়, জগৎসমক্ষে জাতীয় সাহিত্যের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন কর্‌বার উৎসাহে। রাজকোষ থেকে দু'হাজার ফ্রাঁ বৃত্তি দেবার আদেশ হোল।—ভিক্তরের অবস্থায় বিপর্য্যয় ঘটেছিল যেমন আকস্মিক ভাবে তার উত্থানও হলো তেমনি অতর্কিতে।

ক্রোধের ছদ্মবেশে যে পুত্রস্নেহ এতদিন আত্মপ্রকাশ করেনি, তরুণীর রূপজ মোহ কিন্তু তাকে বিলুপ্ত ক'রে দিতে পারেনি জেনারেলের হৃদয় থেকে। তাই পুত্রের কবি-খ্যাতি হবার পর পিতা আবার তাঁর উপর স্নেহের ধারা বহিয়ে দিলেন, নিজের ভুল বুঝ্‌তে পেরে। পিতাপুত্রের মাঝে ব্যবধানের প্রাচীর ভেঙে গ্যালো মিলনের ঘনিষ্ঠতায়।

তারপর ভিক্তর বিবাহ কর্‌লেন।

'আদেলি কোচার' ছিল তাঁর আবাল্যের সাথী—একসাথে খেলা-ধূলা, একসাথে খাওয়া-দাওয়া তাঁদের উভয়ের শৈশবকে একান্ত ঘনিষ্ঠতম ক'রে তুলেছিল। বাল্যের সহচরী শেষে যৌবনের সঙ্গিনী হ'য়ে উঠ্‌লো—দুজনকে দুজনে একান্ত আপনার ক'রে পাবার ঔৎসুক্যে বাগ্‌দান কর্‌লেন। ভিক্তরের অভাব-অনাটন ও

চরম অর্থকষ্টের সময়ও বাগ্‌দত্তা আদেলি তাঁকে ভুলে যাননি। আঠারো-শো-বাইশ খৃষ্টাব্দের ১২ই অক্টোবর তাঁদের বাগ্‌দান সার্থক হোল পরিণয়ের মন্ত্রপূত বন্ধনে।

তরুণ কবির জীবনের যাত্রাপথ হ'য়ে উঠ্‌লো পূর্ব্বের চেয়েও স্বচ্ছন্দ সুগম—পিতার স্নেহে ও পত্নীর প্রেমে আপ্লুত হ'য়ে।

—একটি বছরে জীবনের মধ্যে কত বিবর্ত্তনই না ঘ'টে গ্যাল।

এইবার সুরু হোল গদ্য লেখা—কবিতা লেখাও চল্‌তে লাগ্‌লো তারই ফাঁকে ফাঁকে। গদ্য লেখায় হাত পাকাবার জন্য প্রথমেই সুরু করেছিলেন সমালোচনা লিখ্‌তে, নিজের কাগজের "সম্পাদকীয়"টাও লিখ্‌তেন নিজেই। এখন সে-সব সুযোগ নেই দেখে সুরু কর্‌লেন—উপন্যাস।—দুখানি চমৎকার রোমান্স Han d' Island ও Bug-Jargal, দুখানিই ধারাবাহিক ভাবে 'লা মিউজ ফ্রঁকেই' মাসিকে পর্য্যায়ক্রমে আঠারো-শো-তেইশ ও ছাব্বিশ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছিল। প্রথম উপন্যাসখনি বাজারে বেরুবামাত্রই বেশ একটু চাঞ্চল্য প'ড়ে গ্যালো পাঠকমহলে। সমালোচকেরাও লেখকের শক্তির প্রশংসা কর্‌লেন। কিন্তু বইখানির অন্তর্নিহিত সুর কারুরই ভালো লাগ্‌লো না এবং পরে বিরুদ্ধ-সমালোচনার বিষে আকাশ বিষিয়ে উঠ্‌লো যেন। ঔপন্যাসিক হিসাবে ভিক্টর সুপরিচিত হলেন কিন্তু প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন কর্‌তে পার্‌লেন না প্রথমতঃ।

চার্লস নদ্যার ছিলেন তদানীন্তন শ্রেষ্ঠ সমালোচক। হঠাৎ একদিন একেবারে অপ্রত্যাশিত সমালোচনা তিনি ছাপিয়ে ফেল্‌লেন তখনকার একখানি শ্রেষ্ঠ মাসিকে ভিক্টরের সুখ্যাতি ক'রে। পাঠকমহলে একটা চাঞ্চল্যের আভাস জাগ্‌লো। নদ্যারের সমালোচনা প'ড়ে সাহিত্যিক বৈঠকেও বেশ একটু সাড়া প'ড়ে গ্যালো।

প্রথম উপন্যাস থেকে ভিক্টর এতটা আশা করেন নি। নদ্যারকে একদিন ইনি নিমন্ত্রণ কর্‌লেন আলাপ-পরিচয় কর্‌বার জন্য। তাঁকে ধন্যবাদ জানালেন সমালোচনার এই সুখ্যাতির জন্য।

এই নিমন্ত্রণ থেকেই ঘনিষ্ঠতার সূত্রপাত।

তখনকার তরুণ লেখক ও চিত্রকরদের ছোট একটি দল রোজই জ'মে উঠ্‌তো নদ্যারের লাইব্রেরী-গৃহে। সাহিত্য সম্বন্ধে নানাবিধ আলোচনাও চল্‌তো সমবেত তরুণদের মতামতের কষ্টিপাথরে দাগ কেটে। এই দলটির প্রতিষ্ঠা ছিল সে যুগে যথেষ্ট। নদ্যারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার ফলে ভিক্টরও এই দলটির মধ্যে একজন হ'য়ে পড়্‌লেন। সেখানে নিজস্ব মতবাদ প্রচারের চেয়ে, আলোচনার গতি ও মতামতের স্থৈর্য্য দেখে তিনি নিজের মতবাদ গঠন কর্‌তেন।—ভবিষ্যতে এই লাইব্রেরীটির গ্রন্থাগারিক হয়েছিলেন তিনিই।

বেশীদিন পরের কথা নয়।

অষ্ট্রিয়ান দূত আস্‌ছিলেন ফ্রান্সে। কয়েকজন বড় বড় সেনাপতিকে ও রাজকর্ম্মচারীকে তাঁকে সসম্মানে স্বাগতম্ জানিয়ে নিয়ে আস্‌বার কথা জানানো হয়েছে। এই সব সেনাপতি ও রাজকর্ম্মচারীরা নেপোলিয়নের অধীনে বিশেষ কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন, তারই ফলে নেপোলিয়ন তাঁদের সম্মানজনক উপাধিতে ভূষিত করেন। কিন্তু অষ্ট্রিয়ান দূতকে অভ্যর্থনা কর্‌বার দিন তাঁদের নামের শেষে সে সব উপাধির উল্লেখ করা হয় নি, তাতে নাকি নেপোলিয়নের হস্তে পরাজিত অষ্ট্রিয়ার অপমান হবে;—এই নিয়ে তখন খুব আন্দোলন চল্‌লো ক'দিন ধ'রে। সেই উত্তেজনার প্রেরণায় ভিক্টর একটি জাতীয় সঙ্গীত প্রকাশ কর্‌লেন। এই কবিতাটির মধ্যে প্রাণের স্পন্দন ধ্বনিত ক'রে তোলেন তিনি:

আবার দিন ফিরে আস্‌বে—
নেপোলিয়ন আজ নাই কিন্তু ফরাসী বেঁচে আছে!
দুর্ব্বলতার সুযোগে যারা আজ দম্ভ দেখাচ্ছে
প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য প্রস্তুত হ'তে হবে তাদেরই—

—এমি ধারা ওজস্বিনী কবিতার মধ্য দিয়ে ফ্রান্সের নরনারীর মধ্যে তিনি একটা উচ্ছ্বাসের সৃষ্টি করেন। যদিও সে উচ্ছ্বাস আন্দোলনে প্রকাশ পায়নি, তাহ'লেও ভিক্টরের কাব্যপ্রতিভা বিশেষ জনপরিচিতি লাভ কর্‌লো সাময়িক এই উত্তেজনার মধ্য দিয়ে বহু লোকের কাছেই।

হঠাৎ একদিন বিখ্যাত অভিনেতা 'তল্‌মে'র সঙ্গে পরিচয় হ'য়ে গ্যালো।

একদিন তল্‌মে জিজ্ঞেস কর্‌লেন—খুব ভালো 'ট্র্যাজেডী' লিখ্‌তে পার্‌বেন, একেবারে নতুন ধরণের ?

ভিক্তর ভেবে চিন্তে কোন একটা উত্তর দেবার আগেই, আবার বল্‌লেন—আমার বিশ্বাস আপনি পার্‌বেন, তাই আপনাকেই বল্‌ছি। অভিনয় জগতে একটা নতুন ধারা নিয়ে আস্‌বার ইচ্ছে হয়—

ক'দিন ধ'রে ওই সম্বন্ধেই আলাপ-আলোচনা চল্‌লো। শেষে ভিক্তর লিখ্‌তে সুরু কর্‌লেন 'ক্রমোয়েল্' নাটকখানি। কিন্তু নাটকখানি শেষ হবার আগেই তল্‌মের ঘট্‌লো মৃত্যু—নাটকখানি অভিনীত হবার কোন আশাই আর রইল না। তা না থাক্, তবু ইনি নাটকখানি শেষ কর্‌লেন, আঠারো-শো সাতাশ সালের ডিসেম্বরে নাটকখানি প্রকাশিত হোল।

এই নাটকখানি সম্বন্ধে কোন কথা বল্‌তে গেলেই তখনকার ফরাসী সাহিত্য সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বল্‌তে হয় :—

Romanticismএর আন্দোলন তখন ফরাসী সাহিত্যিকদের ভাবধারাকে প্রভাবান্বিত কর্‌বার চেষ্টা পাচ্ছে। রোমান্টিসিজ্‌ম্ বল্‌তে প্রচলিত ভাবধারার বিরুদ্ধবাদ বোঝায় সাধারণতঃ—সাহিত্যের মধ্যে একটা বিপ্লবপ্রচেষ্টা। বিপ্লব যেমন রাজনীতি এবং সমাজনীতির প্রচলিত ধারাকে বিবর্ত্তিত কর্‌বার চেষ্টা পায়, রোমান্টিসিজ্‌মও তেমনি প্রচলিত সাহিত্য-অনুভূতির মধ্যে একটা পরিবর্ত্তন তরঙ্গায়িত ক'রে তোলে। প্রচলিত সাহিত্যধারা, যার মধ্যে ছিল একটা আভিজাত্য-ভাব, নীতির বিধিনিষেধ যার অনুভূতিকে সীমাবদ্ধ করেছে, তার প্রতিবাদই ছিল রোমান্টিসিজ্‌মের প্রাণ। কবিচিত্তের অনুভূতিকে নিয়ম-কানুনের গণ্ডীর মধ্যে রূপ দিতে গেলে তার মধ্যে প্রাণের সাড়া পাওয়া যায় না, আর শুধু সাহিত্যই হয় সত্যানুভূতির প্রকাশ হয় না। যে সাহিত্যে সত্যানুভূতির স্থান নেই শুধু সংযমের বাঁধনই আছে,—তা সত্যিকারের সাহিত্য নয় ; রোমান্টিসিজ্‌মের এই প্রধান কথা। নীচে ফরাসী-সাহিত্য-ইতিহাস থেকে রোমান্টিসিজ্‌মের গোড়ার কথাটা তুলে দিলুম :

"Romanticism meant the substitution of sincerity and the genuine expression of real and fresh emotion for the stereotyped platitudes and conventional rhetoric of the decadent Classic School...a new age demands a new literature to express its spirit and to satisfy its needs." *

এইবার 'ক্রমোয়েল্' নাটকের কথায় ফিরে যাই। এই নাটকখানিতে ইনি চিরাচরিত কোন নিয়মকানুন মানেন নি—সেইজন্য এই বইখানি তদানীন্তন রোমান্টিসিজ্‌মের প্রথম ও পরম বিকাশ হিসাবে উদাহরণস্বরূপ হ'য়ে উঠ্‌লো। সকল তরুণ নব্যপন্থী সমালোচকেরা স্বীকার কর্‌লেন ক্রমোয়েলই হ'চ্ছে রোমান্টিসিজ্‌মের সর্ব্বাঙ্গীন প্রথম নিদর্শন। তারই ফলে নব্যপন্থীদের মধ্যে ভিক্তরের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকৃত হ'য়ে গ্যালো। ক্রমে ভিক্তরকে কেন্দ্র ক'রে তরুণ সাহিত্যিকদের একটি নব্যপন্থী দল গ'ড়ে উঠ্‌লো।

এই দলটি Cenacle of 1829 নামেই প্রসিদ্ধ। ভিক্তরই ছিলেন এই সমিতির প্রধান—তাঁর গৃহই ছিল সমিতির প্রধান অধিবেশন-গৃহ।

সমিতির চেয়ে দল বল্‌লেই ভালো হয়।—

এই দলে ছিলেন আলফ্রেদ্ দ্য ভিগ্‌নি, সেরিসি, ডুমা, মাস্সেট, গটেয় প্রভৃতি খ্যাতনামা লেখকেরা, যাঁরা ভবিষ্যতে বিশেষ ভাবেই নাম করেন। এই তরুণ-দলের মধ্যে বিখ্যাত সমালোচক সাঁতেব্যভ্‌ও ছিলেন। ক্রমোয়েল প'ড়ে এঁরা সকলেই ভিক্তরের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করেছিলেন অল্পবিস্তর পরিমাণে। কিন্তু—

কিছুদিন পরে এঁদের মনে দ্বিধা জাগ্‌লো ভিক্তরের প্রতিভা সম্বন্ধে—ভিক্তরের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার কর্‌তে। ঠিক সেই সময়েই এঁর Odes et Ballades নামক কাব্যগ্রন্থখানি বাজারে বেরুলো। যাঁরা এঁর প্রতিভায়

* A Short History of French Literature. P. 179.

এতদিন ছিলেন সন্দিহান তাঁরা নির্ব্বাক হ'য়ে গেলেন বিস্মিত প্রশংসার মধ্যে।

তারপরেই বেরুলো আরেকখানি অপূর্ব্ব কবিতার বই Les Orientales. বইখানি এমনি অপূর্ব্ব হয়েছিল, পাঠক ও সুধীজনদের এম্নিভাবে আকৃষ্ট করেছিল, যে কয়েক সপ্তাহের মধ্যে বইখানির তিনটি সংস্করণ ফুরিয়ে গ্যালো। এই বইখানির ভূমিকায় ভিক্তর ব'লেছিলেন—'শুধু ছন্দ ও নীতির মধ্যেই কাব্যের যাঁরা সীমা নির্দেশ কর্‌তে চান, তাঁদের মধ্যে আমি নই। কবিতা প্রাণের প্রেরণা, যা ভালো লাগে তাই সংযত ভাবে ভাষায় প্রকাশ করার নামই কাব্য —এর বস্তুনির্ব্বাচন বিধিনিষেধের উপরই নির্ভর করে না, করে কবিচিত্তের অনুভূতির উপর।—শুধু ছাপমারা সৌন্দর্য্যের মধ্যেই কবিতা আছে এ কথা যাঁরা মনে করেন তাঁরাও ভুল করেন; একখানি ইট-বা'র-করা বাড়ি, বস্তীর সরু অপ্রশস্ত একটা গলি, রুগ্নদের দীর্ঘশ্বাস ভরা হাসপাতাল, সৈন্যদের কুচকাওয়াজ—সবেরই মধ্যে কবিতা আছে। জীবনের সবকিছুই কাব্য, যে তা অনুভব কর্‌তে পারে সে-ই কবি।'

নিজের এই কথার সত্যতা তিনি দেখিয়েছিলেন, নিজের পরবর্ত্তী প্রতিটি কবিতায়। তাঁর এই অভিনবত্বের জন্যই তিনি পাঠকদের প্রিয় হ'য়ে উঠ্‌তে পেরেছিলেন অত শীঘ্র। তাঁর 'পাশা' তাঁর 'সুলতান'রা পাঠকদের দৃষ্টির সামনে ভেসে উঠ্‌তো ছবির পর্দ্দায় যেমন ভেসে ওঠে আলোছায়ার খেলা! প্রতীচ্যের চেয়ে প্রাচ্যের 'পাশা' ও 'সুলতান'দের সম্বন্ধে কবিতা লেখারই আগ্রহ ছিল তখন এঁর অত্যন্ত। তার উপর এ সব কবিতায় তিনি বাস্তবের ছায়াও গ্রহণ কর্‌তেন না—এ-জন্যই তার অভিনবত্ব হোত অপরূপ।

নাটক লিখে অভিনয় না হ'লে আর কার ভালো লাগে?—ভিক্তরেরও খ্যাতি হোল বটে কিন্তু তৃপ্তি হোল না। ভিক্তর তাই অভিনয়ের চেষ্টা কর্‌তে লাগ্‌লেন, একখানি নূতন নাটক লিখে।

নাটকখানির নাম Marion Delorme।

কিন্তু এবারও বাধা পড়্‌লো—নাটকখানি অভিনীত হোল না। এমন কতকগুলি রাজনৈতিক ও বৈপ্লবিক ভাব প্রচ্ছন্ন ছিল সেই নাটকখানির কথাবস্তুর মধ্যে যে, কর্ত্তৃপক্ষ থেকে নাটকখানির প্রকাশ্য অভিনয় বন্ধ হ'য়ে গ্যালো।

শক্তিশালী তরুণ নাট্যকারটির ক্ষোভ বৃদ্ধি হোল ভেবে ফরাসীরাজ দশম চার্লস্ ভিক্তরকে সন্তুষ্ট রাখ্‌বার জন্য আরো দু'হাজার ফ্রাঁ বৃত্তি বাড়িয়ে দিলেন। কিন্তু ভিক্তর তখন অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ হ'য়ে পড়েছিলেন,—অর্থের চেয়ে আদর্শের সার্থকতাই তখন তাঁর কাছে হ'য়ে পড়্‌লো বড়, তিনি দু'হাজার ফ্রাঁ বৃত্তি নিতে অস্বীকার জানালেন।

তারপর ইনি পূর্ণোদ্যমে লিখ্‌তে সুরু কর্‌লেন আর একখানি নতুন নাটক—Hernahi।

'থিয়েটার ফ্রাঁকে'তে নাটকখানি অভিনীত হোল।—

প্রথম রজনী—

নব্যপন্থীয় শ্রেষ্ঠ তরুণ লেখকের নাটক দেখ্‌বার জন্য ভীড়ের শেষ নেই—প্রাচীন ও নব্যপন্থীদের অভাবিত সমাবেশ। প্রতি দৃশ্যের সমাপ্তিতে প্রশংসা ও নিন্দার ঝড় ওঠে। ক্রমেই প্রাচীন ও নবীনপন্থী সমালোচকদের মধ্যে তর্কের চরম বিকাশ,—চীৎকারের পর মুষ্টিযুদ্ধেরও সম্ভাবনা ঘনিয়ে আসে। শেষে দর্শকদের মধ্যে শান্তি ফিরিয়ে আন্‌বার জন্য নাটকখানির শেষাংশটুকু অভিনীত হবার পূর্ব্বেই যবনিকা ফেল্‌তে হয়।

দ্বিতীয় রাত্রির অবস্থাও এমনি।

পরপর ক'টি দিন এম্নি ধারাই চল্‌লো।

শেষে রঙ্গমঞ্চে মুখোমুখি হওয়ার চেয়ে পত্রিকার মারফৎ হওয়াই সুবিধাজনক মনে ক'রে, আর তাতে কোন পক্ষেরই আহত হ'বার সম্ভাবনা নেই দেখে, পত্রিকার সমালোচনাতেই যুদ্ধ চল্‌লো।

শেষ পর্য্যন্ত কিন্তু প্রাচীন-পন্থীদেরই চুপ কর্‌তে হোল, নব্যপন্থীদের জয়ের সূচনা ক'রে। ভিক্তরই হলেন সে জয়ের শ্রেষ্ঠ অধিনায়ক—কেননা এঁর নাটকখানিতে রোমান্টিসিজ্‌মের ধারা ছিল আগাগোড়াই।

নব্যপন্থীদের মতবাদের পাকা ভিত্তি হোল এতদিনে।

ক'মাস পরের কথা।—

ফ্রান্সের বুকের উপর দিয়ে আর একটা রাজনৈতিক বিপ্লব ব'য়ে গ্যালো—দশম চার্লসের ঘট্‌লো সিংহাসনচ্যুতি, লুই-ফিলিপ্‌ সিংহাসনে বস্‌লেন।

এই বিপ্লবের ছায়া ফুটে উঠ্‌লো ভিক্টরের বিখ্যাত উপন্যাস Notre-Dame de Parisএ। পাঠকেরা শুধু চমৎকৃত হোল না, বিস্মিত হোল এর অভিনবত্বে।

তারপর থেকে তিনি আবার সুরু কর্‌লেন নাটক লিখ্‌তে—ভবিষ্যতে বারো বছর ধ'রে এই নাটকই ইনি লিখেছিলেন শুধু।

নীচে নাটকগুলির একটা তালিকা দিচ্ছি --

আঠারো-শো-বত্রিশ সালে লেখেন Le Roi S'amuse ; আঠারো-শো-তেত্রিশ সালে লেখেন Lucrece Borgia, আর Marie Tudor ; 'পঁয়ত্রিশ সালে লেখেন Angelo ; 'আটত্রিশ সালে Ruy Blas এবং 'তেতাল্লিশে Les Burgraves.

তারপর এঁর অশ্রান্ত লেখনী থেকে আবার তিনখানি কবিতার বই প্রসূত হোল - আটারো-শো-পঁয়ত্রিশে Les Chants du Crepuscule, আঠারো শো-সাঁইত্রিশে Les Voix Interieures এবং আঠারো-শো চল্লিশে Les Rayons et les Ombres. শেষের বইখানি সে যুগের প্রত্যেক চিন্তাশীল সুধী পাঠকের কাছে ভিক্টরের নামটি শ্রদ্ধেয়তর ক'রে তুল্‌লো। ফরাসী বিদ্যাপীঠের সদস্য ক'রে নেওয়া হোল ভিক্টরকে। চল্লিশ বছর বয়সেই ভিক্টর ফরাসী দেশের শ্রেষ্ঠ লেখক হিসাবে স্বনামধন্য হ'য়ে পড়্‌লেন। এত অল্প বয়সে এতটা সম্মান আর কোন ফরাসী লেখক পেয়েছেন ব'লে তো মনে হয় না।

জীবনধারাটা এতদিন শান্তিপূর্ণ ছিল—

যদিও একটা প্রচ্ছন্ন দুঃখবোধ ছিল তার মধ্যে।

ছোটভাই য়্যুজিন—সাহিত্যক্ষেত্রে তাঁর নিকটতম সহযোগী, হঠাৎ উন্মত্ত হ'য়ে যান আঠারো-শো-বাইশ সালে। কোন কিছুতেই যখন কিছু হোল না, উন্মত্ত ভাইটির সংস্পর্শে আসা যখন ক্রমেই ভয়াবহ হ'য়ে উঠ্‌লো, তখন উপযুক্ত চিকিৎসার অধীনে রাখ্‌বার জন্য ভিক্টর তাঁকে উন্মত্তদের হাসপাতালে পাঠিয়ে দিতে বাধ্য হলেন। তা হোক্‌, তবু তো ভাইটি বেঁচে ছিল!

তার পনেরো বছর পরে সাঁইত্রিশ খৃষ্টাব্দে ভাইটি মারা গ্যালো—ভিক্টর শোকে মুহ্যমান হ'য়ে পড়্‌লেন।

কিন্তু আবছায়া—অন্ধকারেরই পূর্ব্বদূত। ভ্রাতৃশোকের বেগ প্রশমিত হ'তে না হতেই, নাট্যকার হিসাবে এঁর পতন ঘট্‌লো। এঁর প্রতিভার পতন নয়, নাট্যরসিক জনরুচির উপেক্ষা—যার ফলে এঁর শেষ নাটক Les Burgraves নাট্যগৃহকে দর্শকবহুল ক'রে তুল্‌তে পার্‌লো না। ফলে ইনি নাটক লেখা বন্ধ ক'রে দিলেন,—উপরন্তু কোন থিয়েটারের কর্ত্তৃপক্ষও আর তাঁর কাছ থেকে নাটক পাবার তাগিদ্‌ও কর্‌লেন না। প্রতিভাশালী নাট্যকার মনের দুঃখে নাটক লেখাই ছেড়ে দিলেন।

নাট্যক্ষেত্রের এই বিফলতা এঁর মনের উপর কোন রেখাপাত করেনি, কর্‌তে পারেনি তার কারণ এঁর জ্যেষ্ঠা কন্যার বিবাহ উপলক্ষে ইনি তখন বিশেষ ভাবেই মনোযোগ দিয়েছিলেন—জ্যেষ্ঠা কন্যাকে ইনি বিশেষ ভাবেই ভালোবাস্‌তেন, তার জীবনের সুখ-সুবিধার উপর ভিক্টরের এত আগ্রহ ছিল যে স্বপ্রতিভার উপেক্ষাও ইনি বিস্মৃত হলেন অনায়াসেই।

কিন্তু সেদিক থেকেও আঘাত এল :

বিবাহের বছর ঘুর্‌লো না, কন্যা জামাতা সিন নদীর উপর নৌকা-বিহার কর্‌ছিলেন, কোন এক অসতর্ক মুহূর্ত্তে নৌকা গ্যালো ডুবে—উভয়ের জীবনের পরিসমাপ্তি ঘট্‌লো নদীর গর্ভেই। ভিক্টর প্রথমে কোন খবরই পেলেন না। তিনি তখন পিরেনিজ্‌ অঞ্চলে বেড়াতে গিয়েছিলেন, কখন কোথায় থাকেন তার কোন স্থিরতা ছিল না। কাজেই তাঁকে তখন খবর দেওয়া সম্ভব হোল না। ক'দিন পরে যখন তিনি ফির্‌লেন,—বজ্রাহত হ'য়ে গেলেন একমাত্র প্রিয় কন্যার মৃত্যুতে।

জীবন-ধারাও ঘুরে গ্যালো ভিন্ন মুখে।

রাজনীতিক্ষেত্রে ইনি প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন কর্‌বার জন্য ঝুঁকে পড়্‌লেন। লুই ফিলিপের সঙ্গে এঁর ছিল পূর্ব্বপরিচয়, রাজনীতিক্ষেত্রে যোগ দেবার পর থেকে সে ঘনিষ্ঠতা বন্ধুত্বে নিবিড় হ'য়ে উঠ্‌লো। ফলে, আঠারো-শো-পঁয়তাল্লিশ খৃষ্টাব্দে লুই ফিলিপ এঁকে "ভিস্‌কাউন্ট্" উপাধি দ্যান।

আবার আট্‌চল্লিশ খৃষ্টাব্দের বিদ্রোহেতেও ইনি যোগ দিয়েছিলেন লুই ফিলিপের বিপক্ষে! প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হবার পর ইনি প্যারীস্যানদের পক্ষ থেকে প্রজাতন্ত্রের অন্যতম ডেপুটি নির্ব্বাচিত হয়েছিলেন। যিনি একসময়ে লুই ফিলিপের সকল মতেরই পোষণ ক'রে ভিস্‌কাউন্ট উপাধি পান, তিনিই আবার প্রজাতন্ত্রের ডেপুটি নির্ব্বাচিত হলেন —এইখানেই রাজনীতিক্ষেত্রে তাঁর মতবিবর্ত্তন চোখে পড়ে। আসলে তিনি খুব বড় রাজনীতিবিদ্ বা বিচক্ষণ রাজনীতিক ছিলেন না, তিনি ছিলেন কবি—তাই তাঁর সব মতবাদই গ'ড়ে উঠ্‌তো খুসীর খেয়ালমত,—ভাবের আতিশয্যে। সেইজন্যই ইনি প্রথমে প্রজাতন্ত্রের লুই বোনাপার্টকে বিশেষ ভাবেই সাহায্য করেন রাজনীতিক্ষেত্রে, আবার কিছুদিন পরে সেই তন্ত্রেরই উচ্ছেদ কর্‌বার জন্য গুপ্ত ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হ'য়ে পড়েন! কিন্তু গুপ্তচরদের কৃতিত্বে এঁর বাইরের আবরণ খ'সে পড়্‌লো, আত্মরক্ষার জন্য ইনি পালিয়ে যেতে বাধ্য হলেন। কিন্তু রাজ্যের সীমানার মধ্যে ধরা পড়্‌বার বিশেষ আশঙ্কা থাকায় এঁকে কুলি মিস্ত্রির ছদ্মবেশে আত্মগোপন কর্‌তে হোল। তারপর একদিন সুযোগমত এসে হাজির হলেন ব্রুসেল্‌সে।

এইবার তাঁর লেখক-জীবনের দ্বিতীয় পর্য্যায় সুরু হোল।

রাজনীতি ছেড়ে দিয়ে ইনি আবার সুরু কর্‌লেন কবিতা লিখ্‌তে। এঁর কবিতার জনপ্রিয়তা এমন রাজনৈতিক আন্দোলনের যুগেও বিশেষ প্রবলভাবেই দেখা গ্যালো। এই সময়কার কবিতার মধ্যে প্রকৃতি-প্রিয়তার বিশেষ প্রাবল্য দেখা যায়। ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের (Wordsworth) মত ব্যক্তিগত অনুভূতির মধ্য দিয়ে প্রকৃতির সজীবতা ও সারল্যের ইনি অত্যন্ত পক্ষপাতী হ'য়ে পড়েন এই সময়ে। নিজের জীবনের দুঃ-কষ্ট এঁর তদানীন্তন কবিতাগুলির মধ্যে বিশেষভাবেই ফুটে উঠেছে। যেমন এঁর সন্দিগ্ধচিত্ততা প্রকাশ পেয়েছে এই সময়কার কবিতাগুলির মধ্যে, আধ্যাত্মবাদের অস্থিরতাও বিশেষ ভাবেই ধরা পড়ে তার সঙ্গে।

ব্রুসেল্‌সে বেশীদিন থাকা চল্‌লো না।

তখন ইনি Nepoleon le Petit লিখে ফরাসীরাজকে তীব্র ভাবে আক্রমণ করেছিলেন, নেপোলিয়নের সকল দোষ-ত্রুটির নির্ব্বিচারে সমালোচনা ক'রে।—পলাতক কবির চিত্তে এতদিন যে ঈর্ষ্যা জমা হয়েছিল তারই বিস্ফোরণ!

বেল্‌জিয়ামের সঙ্গে ফরাসী রাষ্ট্রের সন্ধিসর্ত্ত ছিল, কাজেই ফরাসী রাষ্ট্রের আক্রমণকারীকে বেল্‌জিক্ শাসকেরা নির্ব্বিবাদে রাজ্যমধ্যে থাকতে দিতে পার্‌লেন না। শেষে ভিক্তরকে চ'লে আস্‌তে হোল "জার্সি" সহরে।

অর্থের অনাটন তখন এতই বেশী যে প্যারীর বাড়িতে যে সব জিনিষপত্র ছিল বিক্রী ক'রে টাকাকড়ি সমেত পরিবারবর্গকে জার্সিতে আস্‌তে লিখে দিলেন।

টাকাকড়ি সমেত পরিবারবর্গ এল—জীবনের স্বচ্ছন্দতা আগের চেয়ে সরল হ'য়ে উঠ্‌লো।

সেই সময় থেকে ভিক্তরের একমাত্র চিন্তা হোল ফরাসী প্রজাদের দৃষ্টিতে নেপোলিয়নকে হীন ক'রে দেওয়া। সেই জন্যই, নেপোলিয়ন সিংহাসন আরোহণের সময় কোন্ এক কিশোর প্রতিদ্বন্দ্বীকে গোপনে হত্যা করেন না-কি, সেই কাহিনী অবলম্বন ক'রে ইনি একটি কবিতা লিখ্‌লেন। রাজ্যলোভী নেপোলিয়নের নির্ম্মমতা সেই কবিতাটির মধ্যে চমৎকার ফুটে উঠেছিল। যত বড় সাম্রাজ্যবাদী হোক্ না কেন, কবিতাটি পড়্‌বার সময় নেপোলিয়নের উপর ঘৃণা জাগবেই।

আঠারো-শো-পঞ্চান্ন খৃষ্টাব্দের কথা।—

রাণী ভিক্টোরিয়ার সঙ্গে সন্ধি হ'য়ে গ্যালো

নেপোলিয়নের। সেই সন্ধি অনুসারে ব্রিটিশ রাজপক্ষ থেকে ভিক্তরের উপর জার্সি ছেড়ে চ'লে যাবার আদেশ জারী করা হোল।

বৃটিশ রাজ্য ছেড়ে যাবার আদেশ হয়নি। তাই কবি জার্সি ছেড়ে ঘরবাড়ি জিনিষপত্র সব তুলে আন্‌লেন গ্যর্ণসি দ্বীপে। তারপর যখন সে দ্বীপ ছেড়ে যাবার জন্য কোন আদেশ আর এল না, তখন তিনি সেখানে একখানি বাড়ি কিন্‌লেন। এই বাড়িতেই তাঁর প্রবাসী দিনগুলি বেশ কেটে যাচ্ছিল শান্তিপূর্ণ ভাবে। এখানে উঠে আসার পর থেকে তিনি আর রাজনৈতিক হাঙ্গামা নিয়ে গোলমাল করেন নি মোটেই, এখান থেকে বিতাড়িত হ'য়ে যাবার ভয়ে।

ভিক্তর ব'সে ব'সে লিখে যেতেন—সামনের জানালা দিয়ে সুদূরপ্রসারী নীলসমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গচাঞ্চল্য চোখে পড়্‌তো। কবিচিত্তের কল্পনা উঠ্‌তো উচ্ছল হ'য়ে। আবার সময় সময় মাঝরাত পর্য্যন্ত কবি চুপ ক'রে ব'সে থাক্‌তেন সমুদ্রবেলার উপর।

জীবনের এই একঘেয়েমি কবির জীবনকে ম্লান ক'রে দিতে পারেনি।

মাঝে একবার তিনি নিমন্ত্রিত হ'য়ে আসেন "লার্ডসেনে-তে", সেখানকার Peace Congressএ সভাপতিত্ব কর্‌বার জন্য।

এই সময় আঠারো শো-বাষট্টি সালে কয়েকখানি কবিতার বইয়ের সঙ্গে এঁর বিখ্যাত উপন্যাস "লা মিজা-য়েব্‌ল্" বাইর হয়—একই দিনে বারোটি বিভিন্ন ভাষায় এই বইখানি প্রকাশিত হয়। অভাব-অনাটন আর দুঃখ-দারিদ্র্যের মধ্যে মানুষের কতটা অবনতি ঘটে তাই ফুটে উঠেছে 'জিন ভল্‌জিনের' চরিত্রের মধ্য দিয়ে। একখানি উপন্যাস লেখার ধরণ ও ভঙ্গী কত সুন্দর ও হৃদয়গ্রাহী হ'য়ে উঠ্‌তে পারে তারই চরমত্ব ফুটে উঠেছে এই বইখানিতে। এত বড় সৃষ্টি তদানীন্তন ফরাসী সাহিত্য কেন, এখনকার বিশ্বসাহিত্যেও খুব কমই আছে।

এর দু'বছর পরেই সেক্ষপীয়র সম্বন্ধে এঁর বিস্তৃত সমালোচনা প্রকাশ হোল।

তারপর কবি নিজের আত্মকাহিনী লেখেন পনেরো বছর ধ'রে। দু'ভাগে এই আত্মকাহিনী ভাগ করা—প্রথমার্দ্ধ এঁর কন্যার মৃত্যু পর্য্যন্ত, দ্বিতীয়ার্দ্ধ তারপর থেকে। এই আত্মকাহিনীতে ইনি জীবনের কোন কথাই গোপন কর্‌তে চাননি—এইটুকু এঁর আত্মজীবনীর বৈশিষ্ট্য।

আঠারো-শো-উনষাট সালের ষোলই আগষ্ট ফরাসী গবর্ণমেণ্ট নির্ব্বাসিতদের দেশে আস্‌বার অধিকার দিয়ে এক ঘোষণা করেন। সেই ঘোষণাপত্র পেয়ে অনেক নির্ব্বাসিত ফরাসী প্রজা দেশে ফি'রে এল—কিন্তু ভিক্তর ফির্‌লেন না। তিনি সেই ঘোষণাপত্রের একটি পাল্টা ব্যঙ্গোক্তর ছেপে তার জবাব দেন—যে মাতৃভূমির শাসকেরা তাঁর বাড়িঘর তৈজসপত্র বিক্রী ক'রে তাঁকে দেশ-ছাড়া করেছে, তাদেরই একটা খেয়ালী ঘোষণাপত্রের ভরসায় আবার দেশে ফিরে যাবার কোন প্রয়োজনই নেই তাঁর, আবার নতুন ঘোষণা ক'রে তাড়িয়ে দিতেই বা কতক্ষণ!

তারপর একদিন ফরাসী-প্রুসিয়া যুদ্ধ সুরু হ'য়ে গ্যালো। দেশের এই দুর্দ্দিনে স্বদেশপ্রেমিক হুগোর আর প্রবাসে ব'সে থাকা চল্‌লো না—কর্ত্তব্যও নয়।

ফ্রান্সে পৌঁছবার আগেই একটি স্বদেশী কবিতা লিখে পাঠিয়ে দান তিনি—জনসাধারণকে স্বদেশপ্রেমে উত্তেজিত ক'রে তোল্‌বার জন্য।

দোসরা সেপ্টেম্বর নেপলিয়ন পরাজয় স্বীকার করেন, চৌঠা প্যারীতে বিপ্লব হয়।

সেই বিপ্লবের মধ্য দিয়ে পাঁচই তারিখে ভিক্তর প্যারীতে প্রবেশ কর্‌লেন। সেদিন কবিকে নিয়ে "রু লাফায়েট্" রাজ-পথের উপর দিয়ে যে শোভাযাত্রা হয় তাতে সারা প্যারী যোগ দিয়েছিল। আল্‌ফঁস্ দোদে এই শোভাযাত্রা সম্বন্ধে বলেন—"Never, never can I forget the sight as the carriage passed along the Rue Lafayette, Victor Hugo standing up and being literally borne along by the multitude."

আবার রাজনীতির চর্চ্চা সুরু হোল।

জাতীয় মহাসভায় ইনি সদস্য নির্ব্বাচিত হলেন।

কিন্তু বেশীদিন সদস্য থাকা চল্‌লো না। ব্রুসেল্‌সে এঁর পুত্রের মৃত্যু ঘটায় সদস্য-পদ ত্যাগ ক'রে ইনি ব্রুসেল্‌সে চ'লে আস্‌তে বাধ্য হন। পুত্রের মৃত্যু সম্পর্কে কম্যুনিষ্টদের সঙ্গে বিশেষ ঘনিষ্ঠতা ঘটায় বেল্‌জিক্ কর্ত্তৃপক্ষ এঁকে বেল্‌জিয়াম ত্যাগ কর্‌বার আদেশ দ্যান।

প্যারীতে আবার ফির্‌লেন।

আবার জাতীয় মহাসভায় সদস্য হিসাবে নির্ব্বাচিত হবার চেষ্টা কর্‌লেন কিন্তু এবার হলেন পরাজিত। পুত্র-বিয়োগে মনেও শান্তি ছিল না, তার উপর পরাজয়ের ব্যথায় ইনি রাজনীতিক্ষেত্র থেকে চিরদিনের মতই অবসর গ্রহণ কর্‌লেন।

কবির রাজনীতিক জীবনের যবনিকা পড়্‌লো এখানেই—।

শান্তিপূর্ণ নিরুপদ্রপ জীবনযাত্রা।—

দিনের পর দিন ধ'রে অপূর্ব্ব চরিত্র সৃষ্টি ক'রে চল্‌লেন তিনি উপন্যাসের মধ্য দিয়ে—মানবজীবনের অমর স্বর্গ সৃষ্টি কর্‌বার আকাঙ্ক্ষায়।

কবিতা লেখাও চল্‌লো সমভাবেই।

বিখ্যাত ঐতিহাসিক উপন্যাস 'নাইন্‌টিথ্রী' এই সময়েরই লেখা। ফরাসী রাষ্ট্রবিপ্লবের মালমসলা নিয়ে এই উপন্যাসটির সৃষ্টি। এই উপন্যাসখানি পড়্‌লেই হুগোর অসামান্য সৃষ্টিপ্রতিভা চোখে পড়ে। কিন্তু ঐতিহাসিকের চেয়ে কবি হিসাবেই এঁর এই সৃষ্টির প্রাধান্য—ইনি কখনও ইতিহাসকে নিরপেক্ষ হিসাবে ধারণা কর্‌তে পারেননি। ক্ষমতাশালী স্পেন সম্রাট্ দ্বিতীয় ফিলিপের অপূর্ব্ব রণতরী "আর্মেডার" ইংরাজ-জয়ের প্রচেষ্টা যে ধ্বংসপরিণতি নিয়ে এসেছিল,—সে সম্বন্ধে যে দীর্ঘ কবিতাটি লেখেন ইনি তার মধ্যেও ইতিহাসের প্রতি এঁর অনাস্থা বিশেষ ভাবেই চোখে পড়ে।

এঁর সৃষ্টির সর্ব্বপ্রধান বৈশিষ্ট্য হ'চ্ছে উৎপীড়িতের প্রতি সমবেদনার ফল্গুপ্রবাহ। প্রত্যেকটি মানব ও পশুর মধ্যে পরমাত্মা বিরাজমান—সেই আত্মার অবমাননা ক'রে চলেছে অহরহ যত প্রতাপান্বিতের দল। সেই রিক্ত, পেষণক্লিষ্টদের প্রতি একটা করুণাধারা এঁর পরবর্ত্তী প্রতিটি রচনার মধ্যে প্রকাশমান।

পরবর্ত্তী যুগে ইনি লিখ্‌তে সুরু করেন গার্হস্থ্য জীবন অবলম্বন ক'রে। এঁর পূর্ব্ববর্ত্তী রচনাগুলির সঙ্গে এঁর পরবর্ত্তী রচনাগুলির কোনও মিল পাওয়া যায় না—দুটি ধারা একেবারে ভিন্ন।

নির্ব্বাসিত হুগো মাতৃভূমির বুকে ফিরে এসেও বিশেষ সুখী হ'তে পারেন নি। তাঁর জীবনের আকাশ ঘন কুজ্মটিকাচ্ছন্ন হ'য়ে ওঠে সাংসারিক ঘূর্ণ্যাবর্ত্তের মধ্যে।—

আঠারো-শো-আটষট্টি সালে এঁর পত্নীবিয়োগ হয়।

আর দুটি ছেলে—চার্ল্‌স্ ও ফ্রাঙ্কো ধরণীর স্নেহ মমতাকে ছিন্ন ক'রে বিদায় নেয় বছর তিনেক পরেই।

বছরের পর বছর যতই এগিয়ে চল্‌লো, এঁর নিকটতম বন্ধু ও আত্মীয়-পরিচিতেরা একে একে ধরিত্রীর বুক থেকে অপসারিত হ'তে লাগ্‌লেন। একটা সঙ্গহীন ভাব এঁর জীবনের যাত্রাপথকে ব্যথাময় ক'রে তুল্‌লো। তার মধ্যেও জীবনের সব কিছু ব্যথা-বেদনাকে উপেক্ষা ক'রে জীবনকে পরিপূর্ণ ভাবে উপভোগ ক'রে নেবার স্পর্দ্ধা এঁর ছিল—আমরণ এঁর স্বাস্থ্য ছিল অটুট। অমন বৃদ্ধকালেও অতি প্রত্যুষে ইনি শয্যাত্যাগ কর্‌তেন, প্রাতঃস্নানেই ইনি ছিলেন অভ্যস্ত। প্রত্যহ ঘণ্টা দু'তিন মুক্ত বায়ুতে না ভ্রমণ কর্‌লে ইনি অস্বস্তি বোধ কর্‌তেন। প্রতিদিন ঘণ্টাখানেক ক'রে পুরোদমে ব্যায়াম করাই ছিল এঁর নিত্যনৈমিত্তিক একটি প্রধান কাজ।

আঠারো-শো-আটাত্তর সালে ইনি প্রথম রোগাক্রান্ত হন দীর্ঘদিন অসুস্থতার পর তবে স্বাস্থ্য ফিরে পান। তখনকার শারীরিক অবস্থা দেখে বন্ধুবান্ধবেরা বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য বার বার অনুরোধ করেন—কিন্তু নানা কারণে তা সম্ভবপর হয়নি।

তারপর হোল এঁর জয়ন্তী-উৎসব।

সেটি আঠারো-শো একাশী সাল। অশীতি বার্ষিক জন্মতিথিতে প্যারীর বুকে যে উৎসবের আয়োজন হয়েছিল তাতে সমস্ত প্যারীসিয়ানরা নির্ব্বিবাদে যোগ দিয়েছিল—তা সে ধনীই হোক্ আর দরিদ্রই হোক্, শিক্ষিত-অশিক্ষিত সকলেই।

এর দু'বছর বাদে আর একটি জয়োৎসব হয়।

এর পরেই হঠাৎ এঁর শরীর পড়ে ভেঙে। প্রতিদিন বিকেলে কয়েক মাইল ভ্রমণ করা এঁর অভ্যাস ছিল—অজস্র বৃষ্টির দিনেও এই নিয়মের ব্যতিক্রম ঘট্‌তো না, শীতের তুষারপাত তো দূরের কথা। শীতকালে উপযুক্ত শীতবস্ত্রের কোন বালাই থাক্‌তো না, বর্ষাকালে বর্ষাতি না নিয়েই বেরিয়ে পড়্‌তেন। কিন্তু এ বয়সে অত অত্যাচার সহ্য হবে কেন!

আঠারো-শো পঁচাশী সালের মে মাস।

ভিক্টরের বেড়িয়ে ফির্‌বার সময় কেমন যেন একটু শীত-শীত কর্‌তে লাগ্‌লো। ক'দিন পরে সেই শীতের ভাবটা "নিউমোনিয়া"য় রূপান্তরিত হ'য়ে গ্যালো। এঁর বলিষ্ঠ পেশীবহুল দেহ রোগের সে আক্রমণকে বেশীদিন প্রতিহত ক'রে রাখ্‌তে পার্‌লো না—বাইশ তারিখে ইনি মৃত্যুর কোলে লুটিয়ে পড়্‌লেন—মৃত্যুর অন্ধকার প্রতিভাকে বিলুপ্ত ক'রে দিল।—দিল কি?

বিরাট সমারোহে এঁর শবসৎকার হ'য়ে গ্যালো শাসক-পক্ষ থেকে। পথে জনতার অন্ত ছিল না।

একটি প্রশস্ত রাজপথ এঁর নামে উৎসর্গ ক'রে দেওয়া হোল।

এঁর রচনার মধ্যে দাম্ভিকতার আভাষ পাওয়া যায়, কিন্তু সে দাম্ভিকতা কোথাও অতিরিক্ত মাত্রায় প্রকাশ পায়নি। রিক্ত, পেষণক্লিষ্ট জনসাধারণের প্রতি একটা করুণ সহানুভূতির ভাবই এঁর রচনার প্রধানতম বৈশিষ্ট্য। কিন্তু অনেক সময় এই দুর্ব্বলতাটুকুর জন্যই এঁর চরিত্রসৃষ্টি ব্যর্থ হ'য়ে গ্যাছে। অনুভূতির 'পরে রেখাপাত কর্‌লেও স্থানে স্থানে ভাষার আড়ম্বরে এঁর রচনা অতিরিক্ত দুষ্ট হ'য়ে পড়েছে। তা হোক্, এঁর অসামান্য সৃষ্টিশক্তির তুলনায় এ সব দোষত্রুটি একেবারেই নগণ্য। অপূর্ব্ব ভূয়োদর্শন, কল্পনার প্রসার, তীক্ষ্ণ দৃষ্টি, হৃদয়গ্রাহী বর্ণনাভঙ্গী, ভাষার উপর আশ্চর্য্য আধিপত্য—প্রভৃতি এঁর রচনার বৈশিষ্ট্যগুলি আজ এঁকে বিশ্বসাহিত্যে অমরত্ব দান করেছে।

এঁর আকৃতি ছিল এঁর রচনার মতই সৌষ্ঠবময়—প্রশস্ত কপাল, স্বপ্নাবেশমাখা আয়ত দুটি চোখ, উন্নত নাসা, দীর্ঘ বলিষ্ঠ পেশীবহুল আকৃতি—সুপুরুষ হ'তে গেলে যেটুকু দেহবৈশিষ্ট্যের দরকার, সবই এঁর ছিল। তাঁর ভাবুকত্বের পরিচয় পাওয়া যেত তাঁর চোখদুটির পানে তাকালেই। এ সব ছাড়া—

নম্রতা, বন্ধুপ্রীতি ও সরলতার জন্য তিনি সমসাময়িক অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তির বিশেষ প্রিয় ছিলেন।—ভালো লোক আর ভালো লেখক হ'তে গেলে যে যে গুণ থাকা দরকার তা সবই তাঁর ছিল।

আজ প্রায় সাতচল্লিশ বছর তিনি ধরণীর কোল থেকে বিদায় নিয়েছেন, কিন্তু তাঁর প্রতিভাপ্রসূত দান চিরদিন জাগ্রতভাবে জনমণ্ডলীর বুকে তাঁকে অমর ক'রে রাখ্‌বে। ভগবান্ তাঁর আত্মার কল্যাণ করুন—এই আমাদের আকাঙ্ক্ষা—।

অতি-সতর্ক সূর্য্য

শ্রী সুধাংশুকুমার হালদার আই-সি-এস্

"খর্জ্জুর নিলে মেরজাই ভরি', 'বোটা'র ভরিয়ে জল;
"ঠুকুস্ ঠুকুস্ চলন উটের, এ কি রেলগাড়ি কল?
"তিন তিন দল চ'লে গেল আগে,তোমাদের তাড়া নাই?
"হাত নেড়ে নেড়ে গপ্‌পো না হয় পরেতেই হ'ত ছাই!
"সূর্য্যি মামার তাওেনিক ঘুম, এই বেলা পাড়ি দেও।"
আধেক নয়ন মেলিয়া পূরবে সূর্য্য ডাকিল,—"কে-ও!'

তীর্থপথে—শ্রী হেমচন্দ্র বাগ্‌চী। প্রকাশক—শ্রীগুরু লাইব্রেরী, ২০৪ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য - এক টাকা।

এই যাযাবরী দেহবাদের উচ্ছৃঙ্খল ধূলোটের মধ্যে, তীর্থপথ যাত্রীর উদাত্ত আশাবরী শুনিয়া সত্যই প্রাণে প্রশান্তির আশ্বাস আসে।

'উত্তরবায়ু' আসিলে তাহাকে দ্বার খুলিয়া বরণ করিয়া লইতেই হইবে। যখন—

"ঝরা পাতা, ম্লান ফুলদল,
শুষ্ক ধূলি জমিছে কেবল…"

তখন নিষ্ঠুর উত্তরবায়ু আসিয়া দুয়ারে দুয়ারে করাঘাত হানিয়া ফিরে। তরুণ কবি এই উত্তরবায়ুকে দুয়ার খুলিয়া দিয়াছেন, কিন্তু ধূলোটে মাতেন নাই। তিনি সুতীব্র চেতনা লাভ করিয়াছেন, এবং দেখিয়াছেন—

"…টুটে' যায় গ্লানি,
টুটে মোহ।"

কল্পনা বিদেহ হইলেও দেহকে আশ্রয় করিয়াই তাহা বিকশিত হইয়া উঠে। অতি-আধুনিক দেহবাদের উপর কবি মহিমময় দেহ দেবতার প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন :—

"মোর দেহখানি
অনির্ব্বাণ হোমশিখা—ধীরে ধীরে পাসরিয়া গ্লানি
যুগের জড়িমা ভেদি' দিল মোরে আনি'
বিধাতৃমহিমাদীপ্ত জ্যোতির্ম্ময় জয়টিকাখানি।"

'গোপনচারী' কবিতাটির মধ্যে যেন ইহার মূল সুর খুঁজিয়া পাওয়া গেল। সে দিক্ দিয়া ইহাকে তীর্থপথের 'keynote'ও বলা যাইতে পারে।—

"গ্লানির মুহূর্ত্তে মোর সুরহারা জীবনের বীণ
মহা দৈন্যভরে
গাহে নাই পূর্ণ গান।…"

তাই—"আজি তব ধ্যানলোকে হে তপস্বী,
আসিয়াছি ফিরে'—
জীবন-সেতারখানি ধ্বনি' তুল' একান্ত গম্ভীরে!"

কবি "প্রাণনাশী গাম্ভীর্য্যেরে ভাঙি' ভাঙি'" চপল করিতে চাহিয়াছেন—যে গাম্ভীর্য্য মৃত্যুর গাম্ভীর্য্য, জড়তার গাম্ভীর্য্য। কিন্তু প্রাণের গভীরতার গাম্ভীর্য্য তিনি হারান নাই; আমরা তাই তাঁহার কবিতার আখ্যা দিলাম—উদাত্ত আশাবরী।

ইহাই নিয়ম—শ্রী আশীষ গুপ্ত। প্রকাশক—সরস্বতী লাইব্রেরী, ৯, রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য—এক টাকা।

বর্ত্তমান যুগে উচ্চ আদর্শকে আচ্ছন্ন করিয়া অন্ধ ক্ষমতার যে নির্ম্মমতা এবং আত্মবঞ্চনার যে অন্যায় সমর্থন, মানুষের ন্যায়নিষ্ঠার স্কন্ধে আরব্যরজনীর সেই দ্বীপবাসী নিষ্ঠুর বন্ধকের মত চাপিয়া বসিয়া তাহাকে নতমস্তক করিতে চাহিতেছে,—তরুণ কথাগ্রন্থক তাহাকে "ইহাই নিয়ম" আখ্যা দান করিয়াছেন।

তীব্র ব্যঙ্গজ্বালার সহিত প্রচ্ছন্ন-সহানুভূতির অশ্রুবাষ্প মিশিয়া ইহাকে বিদ্যুদ্বলয় জলদের রূপ দান করিয়াছে এবং বিষয়বস্তুর সহিত সমতা রক্ষা করিয়া ইহার ভাষা ও ভঙ্গীও মন্ত্রমুখর এবং গতিবান্ হইয়াছে।

"... মানুষের হৃদয়ের দুয়ার আজ বন্ধ।—সহস্র প্রকারের ফন্দী-ফিকির, অসংখ্য রকমের চালবাজীতে আজ মানুষের মস্তিষ্ক ভরিয়া আছে। আদব-কায়দা এবং বাহিরের জাঁকজমক অতিক্রম করিয়া কাহারও কাছে গিয়া পৌঁছানই এক বিরাট ব্যাপার—কিন্তু তাহার পরেও তাহার সাড়া মেলে না। বহু মিনতির শেষে যদি বা ঘরের দরজা পার হইয়া ঘরে ঢোকা যায়, তাহা হইলেও অন্তঃকরণের নিকটে গিয়া সভয়ে পিছাইয়া আসা ছাড়া গত্যন্তর নাই।"—গ্রন্থকার ইহাই মুখ্যতঃ বলিতে চাহিয়াছেন।

বাংলা সাহিত্যে আলোচ্য কথাগ্রন্থখানি একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিবে, সন্দেহ নাই।

আব্রাহাম লিঙ্কল্ন্—শ্রী বিনোদবিহারী চক্রবর্ত্তী। রামকৃষ্ণ পাবলিশিং হাউস, ১১নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। দাম—দেড় টাকা।

নবজগৎ আমেরিকার, উনবিংশ শতাব্দীর স্মরণীয় বীর-পুরুষ আব্রাহাম লিঙ্কল্নের মহৎ কর্ম্মজীবন এই গ্রন্থে সহজ ভাষায় লিখিত হইয়াছে—আত্মজীবনীর ভঙ্গীতে, অর্থাৎ লিঙ্কল্ন্‌কেই প্রথম-পুরুষ করিয়া। লিখনভঙ্গী প্রশংসনীয়। সত্যানুসরণ ও তথ্যসন্নিবেশের সহিত ইহার সাহিত্য-রসমিশ্রিত প্রকাশ প্রকৃতই মনোজ্ঞ ও মনোহর হইয়াছে—এবং কালোপযোগীও।

—বঃ সঃ—

পশ্চিম বাংলার মেয়েদের প্রাচীরচিত্র-শিল্প

শ্রী গুরুসদয় দত্ত আই-সি-এস্

বীরভূম ও মুর্শিদাবাদের সীমান্ত প্রদেশে রামনগর এবং সাহোড়া গ্রামে একদিন বেড়াতে গিয়েছিলাম। সাহোড়া গ্রামের বাইরে থেকেই দূরে একটি আধভাঙ্গা খড়ের চালওয়ালা কুটীর নজরে পড়্‌ল। আশে পাশে আরও অনেক বাড়ীই ছিল, তার মধ্যে এই জীর্ণ-চাল কুটীরটি যে আমার নজরে পড়্‌ল তার কারণ, কুটীরের মাটির দেয়ালে উজ্জ্বল নীল, হলদে সাদা ও সবুজ রঙ্গে আঁকা দুটি পদ্মফুল;—এই দুইটি পদ্ম রেখা ও রঙ্গের অসাধারণ সৌন্দর্য্যের সমাবেশের সম্পদে কুটীরটিকে এমনই একটি গৌরবময় রূপ দিয়েছিল যে কুটীরটিকে লক্ষ্য না করে' থাকা অসম্ভব ছিল। কুটীরের দরজার দুই পাশে খড়ের চালের অল্প নীচে এই দুইটি পদ্ম আঁকা ছিল। নজরে পড়েছিল আমার অনেক দূর থেকেই; কিন্তু সেই দূর থেকেই আমাকে এই পদ্মদুটির সৌন্দর্য্য যেন চুম্বক পাথরের মত আকর্ষণ করে' সেই কুটীরের দোরে নিয়ে গেল। খবর নিয়ে জান্‌লাম কুটীরটির মালিক একটি "ভল্ল" জাতীয় রমণী। ভল্লা জাতটা বাগ্দী জাতের মত সমাজের চক্ষে অতি নীচস্থানীয়। যদিও এই জাতির নাম হ'তেই অনুমান করা যায় যে এরা একসময় ভল্লধারী প্রচণ্ড যোদ্ধার জাত ছিল আর আজকালও এদের মত নির্ভীক ও শক্তিশালী জাত বাংলাদেশে কম আছে; কিন্তু বাংলার আধুনিক সমাজের চোখে এরা দীনহীন ও অনশনে পীড়িত।

যাক্ সে কথা। ভল্লা রমণীটি বিধবা, সে গ্রামের একটি ভদ্রলোকের বাড়ীতে দাসীবৃত্তি করে। ঘরে গিয়ে দেখ্‌লাম সে সমস্তদিন দাসীবৃত্তি করে' খেটে' আসার পর খেতে বসেছে। তার বাড়ীতে তার আপনার জন আর কেউ নেই। অতি কষ্টে সৃষ্টে সে জীবিকা নির্ব্বাহ করে। বাইরে আঁকা অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যময় পদ্মদুটি যে তার হাতের আঁকা,—অর্থাৎ এ দুটি আঁক্‌বার মত শিল্পকৌশল, সৌন্দর্য্যজ্ঞান ও সৌন্দর্য্যের অভিব্যক্তির প্রেরণা যে এই নীচজাতীয় দীন-

দুঃখী বিধবা রমণীর থাকতে পারে, তা সহজে কল্পনা করা যায় না ; কিন্তু তার কাছ থেকে জানা গেল যে পদ্মদুটি তারই আঁকা এবং প্রতি বৎসরই লক্ষ্মীপূজার সময় দুটি রঙীন পদ্ম কুটীরের দেয়ালে এঁকে সম্বৎসর কাল সে তার কুটীরকে সৌন্দর্য্যের আকর করে' রাখে।

জিজ্ঞাসা করে' জানলাম, যে খালি এই রমণীর নয়, এই সকল গ্রামের উচ্চ-নীচ সকল জাতীয় মেয়েরাই নিজে-দের বাড়ীর মাটির দেয়ালে নানাপ্রকার রঙীন পদ্ম ও অন্যান্য সৌন্দর্য্যময় পরিকল্পনা লক্ষ্মীপূজা উপলক্ষে প্রতি বৎসর এঁকে থাকেন। তাই সেদিন বাড়ী বাড়ী ঘুরে এই রেখা ও রঙের বিচিত্র রূপাবলী দেখতে লাগলাম।

অথচ উজ্জ্বল সমাবেশ। কি অনুপম ছন্দোবদ্ধ রেখা-বিন্যাস, কোথাও এতটুকু ভুল ত্রুটি নাই। অথচ প্রত্যেক চিত্রেই কেমন একটা অনির্ব্বচনীয় সরলতা ও মাধুর্য্য যেন মাখা রয়েছে।

আমি এটা স্পষ্ট বুঝলাম যে যা দেখছি এ শুধু চিত্র নয়, এই চিত্রগুলি গ্রামের যে সরলপ্রাণ মেয়েরা এঁকেছেন তাঁদের বিশুদ্ধ ও সহজ সরল মনের এক একটা প্রতিকৃতি। এই রাঢ় দেশেরই প্রাচীন কবি লোচনদাসের পদাবলীর একটি লাইন মনে পড়ে' গেল—

"লাবণ্য বাটিয়া কেবা চিত নিরমিল গো
অপরূপ রূপের বলনী !"
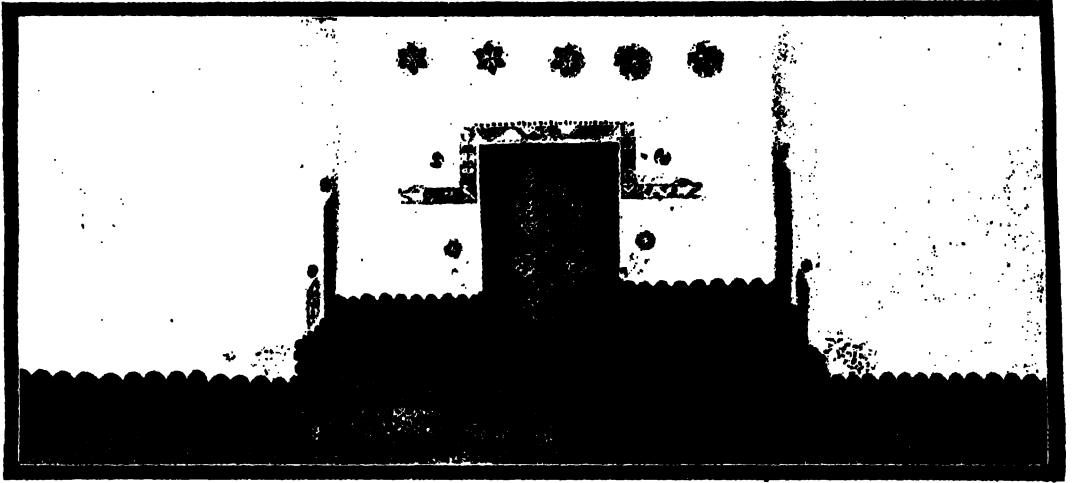
আলপনা—গৃহের অলঙ্কার

(শ্রী অপর্ণা দেবী অঙ্কিত)

যা দেখলাম তাতে অবাক্ হ'য়ে গেলাম। ম্যালেরিয়া ও দারিদ্র্যপীড়িত বাংলাদেশের এক অজ্ঞাত কোণে যে পল্লী-রমণীর স্বভাবজাত সৌন্দর্য্য-রস সৃষ্টির এত ছড়াছড়ি থাকতে পারে তা পূর্ব্বে কখনও কল্পনাও করি নি। গ্রামের রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে ডাইনে বাঁয়ে যেদিকে চাওয়া যায় সে-দিকেই প্রত্যেক বাড়ীর দেয়ালে অনুপম সৌন্দর্য্যময় রঙীন রূপাবলী নজরে পড়ে। কি সুরুচিময় বর্ণ-সমাবেশ, কি অপূর্ব্ব কৌশলময় রেখা-বিন্যাস! সবই গ্রামের মেয়েদের হাতের কাজ। সহরে শিল্পীদের মত রঙের বাহুল্যের ব্যবহার নাই, অতি অল্প কয়েকটি প্রাথমিক রঙের সহজ আড়ম্বরহীন সহজ সরল অথচ মাধুর্য্যময় লীলায়িত রেখা ও উজ্জ্বল বর্ণের সমাবেশময় এই যে অনুপম রূপাবলী —এগুলি যাদের মনের পরিকল্পনা ও যাদের হাতের তুলির সৃষ্টি, তাদের মন নিশ্চয়ই "লাবণ্য বাটিয়া" গড়া তাতে সন্দেহ নেই ; নইলে এরূপ অপরূপ সহজ ও সুন্দর রসে-ভরপুর রূপসৃষ্টি অসম্ভব হ'তো। বাংলার প্রাচীন সং-স্কৃতির ধ্বংসাবশিষ্ট এই যে অপরূপ একটি দৃষ্টান্ত দেখবার সৌভাগ্য আমার হ'ল, এতে জীবন ধন্য মনে করলাম।

দেয়ালে রঙীন প্রাচীরচিত্র আঁকার এই যে প্রথা, এটা মাটিতে ও পিঁড়িতে আলপনা আঁকার প্রথা হ'তে অনেকটা

পৃথক; কারণ আল্‌পনা সাধারণতঃ আঁকা হয় চালের পিঠুলি দিয়ে এবং মেয়েরা হাতের আঙ্গুল দিয়ে সেই পিঠুলি নানাপ্রকার নমুনায় এঁকে থাকেন, তাতে কোন তুলির দরকার হয় না। কিন্তু এই প্রাচীরচিত্র আঁকার প্রথা অন্যরূপ। এতে তুলি ব্যবহার কর্‌তে হয়, এবং এতে পরিকল্পনা বড়ই সুন্দর দেখায় এবং গ্রামটিকে যেন একটা নন্দনলোক অথবা একটা জীবন্ত অজন্তার মত করে' তোলে। এই সাহোড়া গ্রামটির ঘরে ঘরে প্রাচীরচিত্রের সৌন্দর্য্যে আমার বাস্তবিকই একে একটি জীবন্ত অজন্তা বলে' মনে হয়েছিল। প্রতি বৎসর লক্ষ্মী-

দুয়ারের মাথার আল্‌পনা
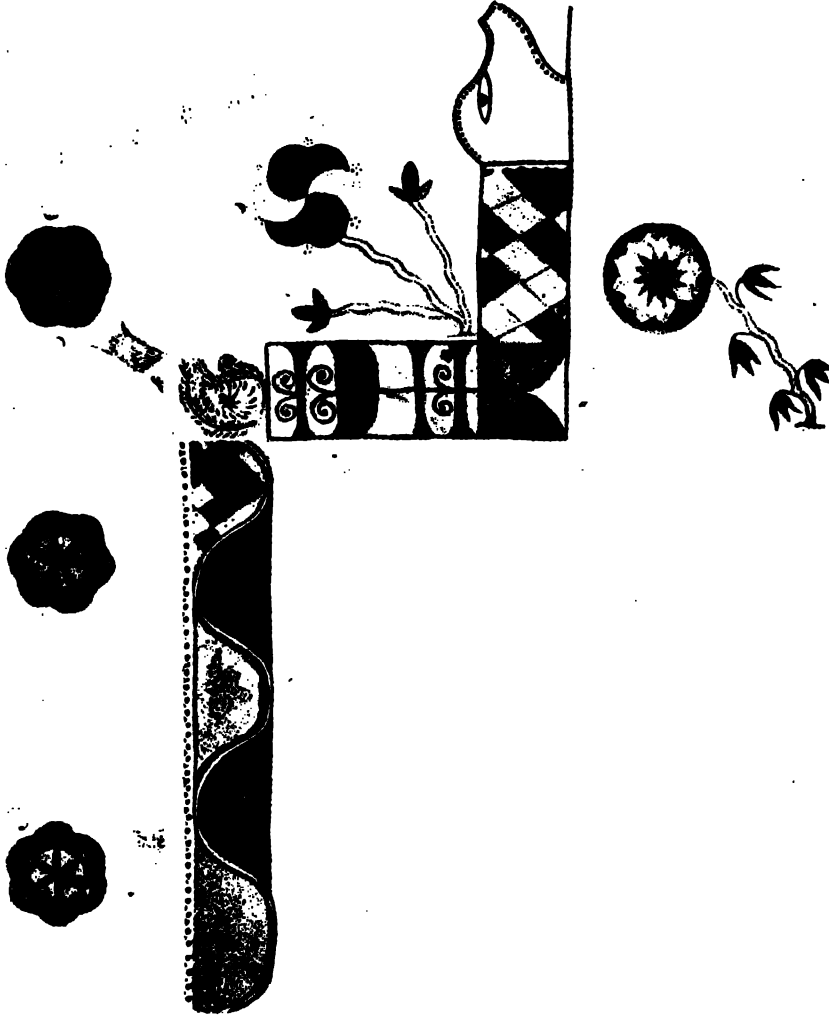
(শ্রী অপর্ণা দেবী অঙ্কিত)

কয়েকটি প্রাথমিক রঙের অর্থাৎ কাল, সাদা, সবুজ, লাল, নীল, হলুদ ইত্যাদির ব্যবহার হয়। ইংরাজীতে যাকে Tempera painting বলে, এই প্রথাটি ঠিক সেইরূপ অর্থাৎ রংগুলিকে জলে মিশিয়ে পাতলা করে' তুলি দিয়ে দেয়ালে লাগাতে হয়। মাটির দেয়ালে এইরূপ নানারঙের পূজার সময় মেয়েরা প্রত্যেক বাড়ীর দেয়ালে দেয়ালে নানাপ্রকার পদ্ম ও অন্যান্য চিত্র এঁকে বাড়ীগুলিকে সৌন্দর্য্যের আধার করে' রাখেন। গ্রামের পুরুষরা কিন্তু এগুলির দিকে বিশেষ নজর দেন না। পুরুষরা আধুনিক শিক্ষার একটুকু ছোঁয়াচ্ পেয়েছেন বলেই এই সকল প্রথাকে

মেয়েদের একটা কুসংস্কার-মূলক অভ্যাস মাত্র মনে করে' থাকেন। তাই আমি যখন ঘুরে ঘুরে প্রত্যেক বাড়ীতে গিয়ে আগ্রহের সহিত এগুলি দেখতে লাগলাম তখন এক দিকে পুরুষরা যেমন অবাক হ'য়ে গেলেন, তেমনি অপর দিকে মেয়েরাও আশ্চর্য্য হ'য়ে পড়লেন। পুরুষরা আমাকে একটা বাতিকগ্রস্ত লোক বলেই ধরে' নিলেন; আর মেয়েরা যে আশ্চর্য্য হ'য়ে গেলেন তার কারণ, এই সব চিত্রের যে বিশেষ কোন মূল্য আছে বলে' কেউ মনে করে সে ধারণা তাঁদের নিজেদেরই ছিল না। এরূপ ধারণা না থাকা সত্ত্বেও তাঁরা প্রতি বৎসর তাঁদের এই আনুষ্ঠানিক পদ্ধতি রক্ষণ করে' আসছেন। দেখলাম কেবল বাড়ীর বাইরের দেয়ালে নয় ধানের মরাইএর দেয়ালেও চিত্র আঁকা রয়েছে, আর ঘরের ভিতরে দেয়ালে বড় বড় এক একটি চমৎকার রঙ্গীন চালচিত্র আঁকা রয়েছে।

একটি ব্রাহ্মণের বাড়ী গিয়ে দেখলাম, তাঁর ২৪।২৫ বৎসর বয়স্কা বিবাহিতা মেয়ে অপর্ণা দেবী বাড়ীটাকে মেঝে থেকে ছাদ পর্য্যন্ত নানাপ্রকার রঙ্গীন পরিকল্পনার চিত্রে একটা অলকাপুরী করে' রেখেছেন। মাটির দেয়াল, কাঠের দোর, ধানের মরাই, কোনটাই বাদ যায় নি, ঢেউখেলান জলের পরিকল্পনা, পদ্মের ও লতাপাতার পরিকল্পনা, মকরের মুখের পরিকল্পনা ইত্যাদি নানাপ্রকার পরিকল্পনার মৌলিকতাময় চিত্রে সমস্ত বাড়ীটি ভরা। স্থাপত্যের সঙ্গে চিত্রের এই চূড়ান্ত সমাবেশ দেখে মুগ্ধ ও অবাক হ'লাম। ধানের মরাইএর দেয়ালে দেখলাম মেয়েরা সাধারণতঃ এঁকে থাকেন লক্ষ্মীর পেঁচার পরিকল্পনা। এর একটা ডবল মানে আছে। পেঁচা লক্ষ্মীর বাহন; তাই মরাইএর দেয়ালে পেঁচার পরিকল্পনা আঁকাতে লক্ষ্মীকে আহ্বান করা হয়। আবার পেঁচা যে লক্ষ্মীর বাহন তারও একটা বিশেষ অর্থ আছে। রাত্রে ধানের মরাইতে যে সব ইঁদুর ইত্যাদি জীবগণ উপদ্রব করতে আসে, পেঁচা তাদের শত্রু স্বরূপ তাদের ধ্বংস করে এবং মরাই রক্ষণ করে। সুতরাং পেঁচার যেমন লক্ষ্মীর বাহন হওয়াতে সার্থকতা আছে, তেমনি মরাইএর দেয়ালে পেঁচার পরিকল্পনা আঁকাতেও একটা বিশেষ সার্থকতা আছে। দেখলাম প্রত্যেক বাড়ীতেই মেয়েরা এটাকে একটা পরম্পরাগত প্রথার মত পালন করে' আসছেন।

লীলায়িত রেখা ও উজ্জ্বল বর্ণসমাবেশের অপূর্ব্ব বিন্যাসে সমস্ত বাড়ীটা যেন তকতক করছে এবং একটা অনির্ব্বচনীয় স্নেহ ও পবিত্রতার ভাবে মাখা হ'য়ে রয়েছে। অনেক দেশ ঘুরেছি, কিন্তু পল্লীর মেয়েদের আত্মার নির্ম্মলতার সহজ
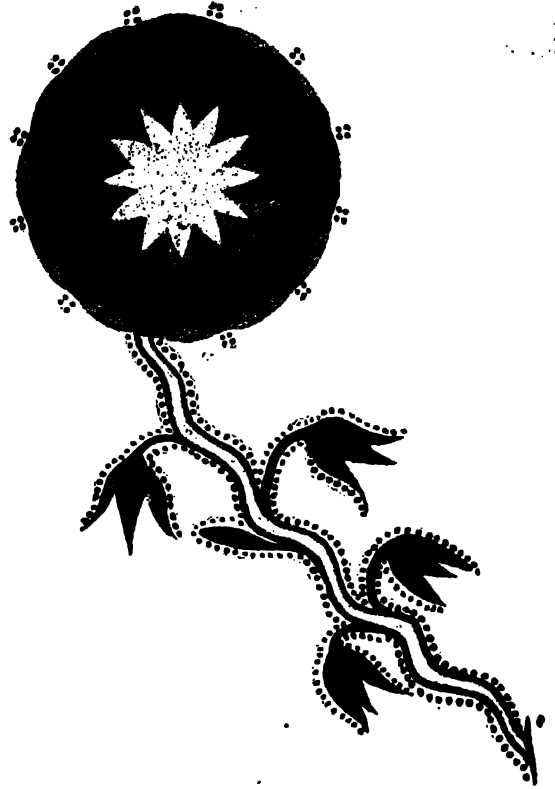
আল্পনা—শতদল-পদ্ম
(শ্রী অপর্ণা দেবী অঙ্কিত)

ভাবের এবং সৌন্দর্য্য-অনুভূতির ও সৌন্দর্য্য-অভিব্যক্তির এমন সুমধুর মূর্ত্তিমান দৃষ্টান্ত আর কোথাও দেখি নি।

আর একটি বাড়ীতে গেলাম। সেখানে ব্রজগোপী দেবী নাম্নী একটি ৩২ বৎসর বয়স্কা রমণী বাড়ীর বাইরের ও ভিতরের দেয়ালগুলি নানাপ্রকার সুন্দর প্রাচীরচিত্রে শোভিত করে' রেখেছেন। কদম গাছের ডালে দাঁড়িয়ে কৃষ্ণ বাঁশী বাজাচ্ছেন, গাছে কদম ফুল ফুটে রয়েছে। নীচের রাস্তা দিয়ে রাধা কলসী কাঁখে নিয়ে জল আনতে

যাচ্ছেন; এমন একটি সুন্দর সহজ পবিত্র ভাব ফুটিয়ে তুলেছেন যা বর্ণনার অতীত। ইনি ঘরের ভিতরকার দেয়ালে যে চালচিত্রটি এঁকে রেখেছেন সেটি শিল্পক্ষেত্রে একটি উচ্চস্থানের অধিকারী। (এই ছবিটির একটি রঙ্গীন প্রতিরূপ আগামী সংখ্যার বঙ্গলক্ষ্মীর প্রথম পৃষ্ঠায় দেওয়া হবে।) নীচে জলের পরিকল্পনা; দু' দিকে ছুটি মকরের মাথা। কেন্দ্রস্থলের নীচে একটি লীলায়িত পাপড়িওয়ালা পদ্মের মৌলিক পরিকল্পনা; তার উপরে একটি সিংহাসনে লক্ষ্মী ও নারায়ণের অতি সুন্দর পরিকল্পনা। দুই দিকে দুটি লক্ষ্মীর পেঁচা। এই পেঁচাগুলির চিত্র রস-সম্পদে ভরপুর। পেঁচাদুটির আশে পাশে ফুলফল-পূর্ণ বাগানের পরিকল্পনা এবং উপরে ও নীচে ধানের শীষের অতি সুন্দর মৌলিক পরিকল্পনা রয়েছে। ফুল লতাপাতার বিচিত্র পরিকল্পনার সমাবেশে এই চালচিত্রটি একটি অনির্ব্বচনীয় শোভা ধারণ করেছে। বাংলার পল্লীর লক্ষ্মী-স্বরূপিণী সরল ও নির্ম্মলপ্রাণ মেয়ে ছাড়া পৃথিবীর আর কোন দেশের মেয়েদের দ্বারা যে এ পরিকল্পনা সম্ভব হ'ত না, তা স্থির-নিশ্চয়।

রামনগর গ্রামের প্রমোদিনী দেবী নাম্নী একটি ৪২ বৎসরের বিধবা ব্রাহ্মণমহিলা তাঁর বাড়ীর ঘরের ভিতরে যে একটি চালচিত্র এঁকে রেখেছেন সেটি উপরোক্ত চালচিত্র হ'তে একটি বিভিন্ন প্রণালীর শিল্প। অতি অপরূপ রসে ও সৌন্দর্য্যে ভরপুর। (এই চালচিত্রটির একটি প্রতিরূপ এই সংখ্যার বঙ্গলক্ষ্মীর প্রথম পৃষ্ঠায় দেওয়া হ'ল।) এর নীচের দিকে মর্ত্ত্যলোকের পরিকল্পনা এবং উপরের দিকে স্বর্গলোকের পরিকল্পনা। মর্ত্ত্যলোকে চৈতন্য, নিত্যানন্দ ও তাঁদের তিন জন সহচর, বৈষ্ণব ধর্ম্মের এই পাঁচটি মহাপুরুষের অথবা "পঞ্চতত্ত্বের" চিত্র আঁকা হয়েছে। এঁরা প্রত্যেকেই দুই হাত তুলে' ভক্তিরসে গদগদ হ'য়ে কীর্ত্তন নৃত্য করছেন। প্রত্যেকের পায়ের নীচে এক একটা পদ্মের পরিকল্পনা রয়েছে। দুই পাশে দুইটি বৈষ্ণবের চিত্র। উপরে স্বর্গলোকের মাঝখানে বিষ্ণু, তাঁর দুই পার্শ্বে লক্ষ্মী ও সরস্বতী দুইটি পরিচারিকা চামর দিয়ে এঁদের ব্যজন করছেন। তাঁদের এক পাশে গণেশ ও শিব এবং অপর দিকে ব্রহ্মা ও নারদ। বিষ্ণুর নীচে তাঁর বাহন গরুড়, লক্ষ্মীর নীচে তাঁর বাহন পেঁচা এবং সরস্বতীর নীচে তাঁর বাহন হংস। একটা পবিত্রতাময় গাম্ভীর্য্য-রসে এই চিত্রটি ভরপুর। চালচিত্রের উপরে পদ্মের ও লতার দুইটি চমৎকার সারি রয়েছে—একটি হলদে ও একটি লাল। শিল্পচাতুর্য্যে এই দুটি চালচিত্র পেশাদার শিল্পীদের ঈর্ষার উদ্রেক করবে। কিন্তু এত অল্প চেষ্টায় এবং এত অবলীলাক্রমে এত সহজ সরল ও পবিত্র ভাব ফুটিয়ে তুলতে পারেন এবং তাকে এত মাধুর্য্যরসে মাখিয়ে দিতে পারেন এ রকম সাধ্য তাঁদের মধ্যে অনেকেরই যে নেই তা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে।

এক দিকে যেমন লীলায়িত রেখা আঁকবার চমৎকার কৌশল, অপর দিকে আবার মনোমুগ্ধকর বর্ণবিন্যাসের অপূর্ব্ব শক্তি, এই দুইটির সমাবেশে এই সকল প্রাচীরচিত্র-গুলি রসকলাক্ষেত্রে যে একটি অতি উচ্চ আসনের অধিকারী সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। সকলের চেয়ে আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে এই সকল মেয়েরা কারো কাছে চিত্রশিক্ষা লাভ করেন নি। তাঁরা শুধু মা, দিদিমা ও পাড়াপড়শী মেয়েদের কাছ থেকে পুরুষানুক্রমিক পরম্পরায় ধারা অভ্যাস করে' আসছেন। এক সময়ে পশ্চিম বাংলার ঘরে ঘরে এ রকম অনিন্দ্যসুন্দর রঙ্গীন প্রাচীরচিত্রের ছড়াছড়ি ছিল। যেখানে রেল লাইন গিয়েছে, যেখানে সহর হয়েছে, যেখানে হাই স্কুল হয়েছে ও ব্যবসার আড়ত হয়েছে, সেখানে এই প্রথা ধ্বংস হয়েছে। সেখানকার মেয়েরা পুরুষদের মতন বাবু বনে' আজকালকার সহুরে সৌখিন বিলাস-শিল্প ব্যবহার ও শিক্ষা অভ্যাস করছেন। কিন্তু বাঙ্গালী জাতির প্রাচীন সংস্কৃতি-মূলক এই যে পুরুষানুক্রমিক রসাভিব্যক্তির শক্তি এখনও দুই একটা গ্রামে অবশিষ্ট রয়েছে, তা এই সকল সহুরে ও অর্দ্ধসহুরে মেয়েরা হারিয়ে ফেলেছেন; এবং আমাদের এই মূঢ়তা যদি অবিলম্বে বিনাশ না হয়, তাহ'লে এখনও যা অল্প কিছু অবশিষ্ট আছে তাও দেশ থেকে সম্পূর্ণরূপে লুপ্ত হ'য়ে যাবে। পল্লীর নিরক্ষর মেয়েদের হাতের কাজগুলি যে আমাদের শিক্ষিত সমাজ অবজ্ঞার চক্ষে দেখে থাকেন, এ-ই আমাদের বর্ত্তমান শিক্ষার মূঢ়তার একটি প্রকৃষ্ট প্রমাণ। কারণ এই যে, সহজ রেখা ও বর্ণের সমাবেশময় রসব্যঞ্জনায় ভরপুর বিশুদ্ধ চিত্রশিল্পের এই যে ধারা বাংলার

গ্রামে নিরক্ষর মেয়েরা ও বিশ্বকর্ম্মার বংশধর বাংলার অবজ্ঞাত পটুয়াগণ যুগের পর যুগ চর্চ্চা করে' এখনও কিঞ্চিৎ রক্ষা করে' রাখ্‌তে সমর্থ হয়েছে, এ-ই চিত্র-রসকলায় বাঙ্গালীর মাতৃভাষাস্বরূপ; এবং বিদেশী শিল্প-কলার কথা দূরে থাক্, অজন্তা, রাজপুত ও মোগল শিল্পের গর্ব্বিত প্রণালী হ'তেও আমাদের প্রাচীন বাংলার এই সহজ সরল আধ্যাত্মিকতাময় ও রসব্যঞ্জনাময় চিত্রধারা যে আরও অধিক উচ্চাঙ্গের রসকলা সেটা অদূর ভবিষ্যতে আমাদের শিক্ষিত সমাজ একদিন বুঝ্‌তে পারবে। আমাদের দেশের সহরে শিল্পীরা এখনও বাইরের রংচংএর আড়ম্বরের চর্চ্চায় মত্ত। বাহ্যিক সৌন্দর্য্যময় রূপকল্পনার বিলাসিতার স্রোতে গা ঢেলে দিয়ে তাঁরা আধ্যাত্মিক রসব্যঞ্জনার সহজ সরল শক্তি ভুলে গিয়েছেন। পাশ্চাত্য জগতে যাঁরা আজকাল অগ্রণী চিত্রশিল্পী, তাঁরা এটা বুঝ্‌তে পেরেছেন যে বাহ্যিক রংচংএর ও রূপলাবণ্য-বাহুল্যের সমাবেশে চিত্রশিল্পের রসব্যঞ্জনা শক্তি বিনষ্ট হয়। তাঁরা আজ বাইরের চাক-চিক্য ছেড়ে দিয়ে যে ধারা ধর্‌তে চেষ্টা কর্‌ছেন, বাংলার মেয়েরা তাদের আল্‌পনা ও প্রাচীরচিত্রের এবং পল্লীগ্রামের দীন-দুঃখী পটুয়ারা তাদের জড়ানো পটে কৃষ্ণলীলা, রামলীলা ও গৌরাঙ্গলীলা ইত্যাদির চিত্রাবলীতে সেই অনাবিল চিত্রধারারই চর্চ্চা যুগের পর যুগ করে' আস্‌ছে। ভগবান্ করুন, আমাদের আধুনিক শিক্ষার মূঢ়তার ফলে এগুলি সম্পূর্ণ লোপ পাবার আগে যেন আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায় ও আমাদের সহরে শিল্পীগণ আমাদের এই জাতীয় চিত্রশিল্পের বহুমূল্য গুণ চিন্‌বার শক্তিলাভ করেন এবং এই ধারার বহুব্যাপক চর্চ্চা করে' আমরা যেন আবার বাংলাদেশকে রসানুভূতির ও রসাভিব্যক্তির শক্তিতে অনুপ্রাণিত করে' ঘরে ঘরে নর-নারীর চরিত্রকে নির্ম্মল সৌন্দর্য্যরসের সহজ অনুভূতিতে মার্জ্জিত, পবিত্র ও আনন্দময় করে' তুলতে পারি।

ডাক্তার কুমারী যামিনী সেন

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

শ্রী কামিনী রায় বি-এ
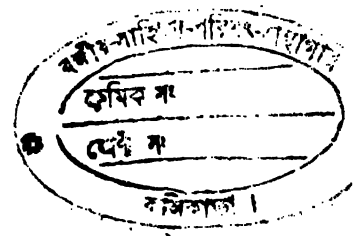
বেহার হইতে বেরার প্রদেশে আকোলায় তাঁহাকে প্রেরণ করা হইল। সেখানে নূতন হাসপাতাল নির্ম্মিত হইবে; তাহার যাহা কিছু ব্যবস্থা তিনিই নির্দ্দেশ করিতে পারিবেন বলিয়া তাঁহার উপরে সমুদয় পরিদর্শনের ভার পড়িয়াছিল। আকোলায় তিনি স্বাধীনভাবে স্বচ্ছন্দে কাজ করিতেছিলেন, স্থানীয় কমিটীর সকলে তাঁহার কার্য্যে প্রীত এবং তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধাযুক্ত ছিলেন। এইখানে কাজ করিবার পর আমার কন্যা বুলবুলের পীড়া যখন গুরুতর হইয়া উঠিল তখন তাহার প্রতি শেষ কর্ত্তব্য করিবার জন্য যামিনী ছয় মাসের ছুটী লইয়া কলিকাতা আসিলেন। আকোলায় তাঁহার স্থান পূর্ণ করিতে লোক পাওয়া কঠিন হইল। নানা কারণে স্থানটি ইংরাজ ডাক্তারের পক্ষে অবাঞ্ছনীয় ছিল। বিশেষ সেখানে বাহিরের প্রাক্‌টিস বেশী হইবার সম্ভাবনা ছিল না, আহার্য্যাদি ছিল দুর্ম্মূল্য। এই অবস্থায় ডাফরিণ সেণ্ট্রাল কমিটীর অনারারী সেক্রেটারী তাঁহাকে অবিলম্বে আকোলায় ফিরিয়া যাইতে লিখিলেন। যামিনী উত্তরে লিখিলে—"আমার বোনঝিটির জীবনের মাত্র কয়েকটি দিন বাকী, সে আমাকে কাছে চাহে, আমি এ সময়ে তাহাকে ছাড়িয়া যাইতে পারিব না।" ইহার উপরে উক্ত সেক্রেটারী মহাশয়া লিখিলেন—"আমাদের নিজের স্বার্থ দেখিলে চলিবে না। এই রকম ব্যবহারের জন্য Women's Medical Serviceএর নিন্দা হইতেছে।" যামিনী প্রত্যুত্তরে লিখিলেন—"তুমি আমার কাজের সম্বন্ধে কি জান, যে লিখিতেছ যে আমার কাজের দ্বারা W.M.S.-

এর নিন্দা হইতেছে? তোমার এ রকম উক্তি করিবার কোন কারণ নাই। সে যাহা হউক, আমার এই পত্রই তুমি আমার পদত্যাগ-পত্ররূপে গ্রহণ করিবে।"—৫৫০৲ টাকা বেতনের চাকরী—বৎসর বৎসর বৃদ্ধির কথা—একটা কথায় ছাড়িয়া দিলেন। আকোলার স্থানীয় কমিটী সংবাদ পাইয়া সেণ্ট্রাল কমিটীকে সত্বর লিখিয়া পাঠাইলেন, "ডাক্তার সেন যত দিন খুসী ছুটীতে থাকুন, আমরা তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিব। কিন্তু তিনি যেন আমাদের না ছাড়েন।" যামিনী পদত্যাগ করেন সেণ্ট্রাল কমিটীরও সে ইচ্ছা ছিল না, তবে তিনি যে এতটা তেজ প্রকাশ করেন তাহাও তাঁহাদের ভাল লাগে নাই। শ্বেতাঙ্গী সম্পাদিকার প্রতি তাঁহার চিঠিখানা কিছু অবিনীতভাবের পরিচয় দিয়াছে বলিয়া, তাঁহারা বলিলেন, ডাঃ সেন চিঠির জন্য ক্ষমা চাহিলেই তিনি থাকিয়া যাইতে পারেন। যামিনী বলিলেন, "ক্ষমা চাহিবার মত কাজ আমি করি নাই, সেক্রেটারীরই আমার কাছে ক্ষমা চাওয়া উচিত।" তাঁহার অতীত কার্য্যদক্ষতার জন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিয়া তাঁহার পদত্যাগ-পত্র গ্রহণ করা হইল।

স্নেহের ভাগিনেয়ীর প্রতি শেষ কর্ত্তব্য সম্পাদিত হইল, তিনি মুক্ত হইলেন।

বেতিয়ার এক হিন্দু মজুরণী হাসপাতালে আসিয়া কয়েক দিন পরে মারা যায়। তাহার দ্বাদশ বর্ষীয় এক পুত্র কোথায় যাইবে? যামিনী তাহাকে বালক ভৃত্য রূপে গৃহে স্থান দিয়াছিলেন। এক মুসলমানী ঐরূপ মরিয়া গেলে তাহার সপ্তম বর্ষীয় কন্যার পালন ও রক্ষণের জন্য ভারও লইয়াছিলেন। আকোলার হাসপাতালে ভূমিষ্ঠ দুইটি মাতৃপরিত্যক্ত শিশু কন্যাকে ১০।১২ দিন বয়স হইতে তিনি নিজের গৃহে রাখিয়া মিসেস গুপ্তের সাহায্যে পালন করিতেছিলেন। স্বজনগৃহে তাহাদের অনাদর হয়, বা কেহ তাহাদের দুর্ভার মনে করে, সেই জন্য এই বালক-বালিকা ও ৬ মাস বয়সের শিশুদ্বয় লইয়া পুরীতে চলিলেন। সেখানে ইতিপূর্ব্বেই 'বিশ্রামকুটীর' নামে একখানি বাড়ী নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন, এইগুলিকে লইয়া তিনি তথায় সংসার পাতিলেন।

তাঁহার শিশুবাৎসল্যের কথা বর্ণনা করিয়া শেষ করা যায় না। এক সময়ে আমি আমার স্বামীর পূর্ব্ব পক্ষের একটি পুত্রের পীড়ার মধ্যে নিজের আট নয় মাসের শিশুপুত্র অশোককে ভাল করিয়া দেখাশুনা করিতে পারিব না, এই আশঙ্কায়, যামিনীর কাছে রাখিয়াছিলাম, বলিয়াও ছিলাম—"এ ছেলে তোমারই হউক।" যামিনী তখন কলিকাতায় প্রাক্‌টিস্ করিতেছিলেন। বাহিরের কাজ সত্ত্বেও শিশুকে অপূর্ব্ব যত্নে নিজের কাছে রাখিয়া কিছুকাল লালন-পালন করিলেন। কিন্তু এ ব্যবস্থায় শিশুর পিতার অভিমত নাই জানিয়া যামিনীকে একদিন বলিলাম, বেশী মায়ায় জড়িত হইও না, পরের ছেলে, পরভৃৎ কোকিল-বাচ্চার মত। পাখা হইলেই নিজের দলে উড়িয়া আসিবে। এই কথায় তাঁহার কত ব্যথা লাগিয়াছিল, তাহা তাঁহার কলিকাতা ছাড়িয়া সোলাপুর চাকরী লইবার সময় জানিয়াছিলাম। যামিনী যেমন শিশুদের ভালবাসিতেন, শিশুরাও সেইরূপ তাঁহার প্রতি অনুরক্ত হইত। ভ্রাতা নিশীথচন্দ্রের প্রথম পুত্রটিও তিন বৎসর বয়সে তাহার মেজো পিসীমার সঙ্গে সিমলা চলিয়া গিয়াছিল, এবং স্নেহ-যত্নে পালিত হইতেছিল। কিন্তু তাহার মাতা সন্তানের অদর্শনে একান্ত অধীর হওয়াতে শিশুর অনিচ্ছাক্রমেই তাহাকে ফিরাইয়া আনিতে হইল। এই সকল ঘটনা হইতে যামিনীর মনে ধারণা হইয়াছিল যে, ভাই কি ভগিনীর সন্তান সম্পূর্ণ আপনার হয় না; যাহাকে দাবী করিবার কেহ নাই, এমন কোন শিশুকে আপনার করিয়া এবং আপনার মনের মত করিয়া গড়িতে হইবে। হায়! সে আশাও ব্যর্থ জানিয়া গিয়াছেন, তবু স্নেহের এবং চেষ্টার অভাব ছিল না। পালিত সন্তানগুলির সুখ ও সুশিক্ষার জন্য বহু অর্থ ব্যয় করিয়াছেন, সঙ্গে সঙ্গে নিজের জন্য ব্যয়সঙ্কোচ করিয়া অনেক কষ্ট স্বীকার করিয়াছেন। সম্প্রতি বলদেওদাস-মাতৃভবনের একটি মাতৃপরিত্যক্ত শিশু পুত্রকেও সন্তাননির্ব্বিশেষে পালন করিতেছিলেন। শেষ পীড়ার আরম্ভে, মিসেস গুপ্ত কলিকাতা থাকাতে, জ্বর লইয়া শিশুর পরিচর্য্যা করিয়াছেন। তাই এক এক সময়ে মনে হইয়াছে, অদৃষ্ট ইঁহাকে মাতা হইবার সুযোগ দেয় নাই বলিয়াই কি প্রকৃতি এই প্রতিশোধ লইতেছে? নিজেরা মাতা হইয়া যাহা করিতে পারি নাই, এই চিরকুমারী কিরূপে তাহা পারিতেছেন?

পিতামাতা, ভাইভগিনী এবং অপরাপর আত্মীয়-স্বজনের প্রতিও তো ভক্তি, প্রীতি ও কর্ত্তব্যনিষ্ঠার কোন ত্রুটি কোন দিন দেখি নাই। ভ্রাতা যতীন্দ্রমোহন রুগ্ন হইলে সপত্নীক তাঁহাকে ও মাতৃদেবীকে নেপালে নিজের কাছে লইয়া গিয়া কত সেবাই না করিয়াছিলেন! অন্যের জন্য যখন প্রাণপণ খাটিয়াছেন, তখন মনে মনে বলিয়াছেন, "ভগবান, আমি এত লোকের জন্য এত খাটিতেছি, আমার ভাইটিকে তুমি বাঁচাইবে না?"

ভ্রাতার মৃত্যুর চারিমাস পরে পিতৃবিয়োগ ঘটে। তাঁহার অবস্থা সঙ্কটজনক সংবাদ পাইয়াই নেপাল হইতে ছুটিয়া আসিয়াছিলেন। যথেষ্ট সেবার সুযোগ পাইলেন না বলিয়া চিরকাল মনে দুঃখ ছিল। ইহার সাত বৎসর পরে যখন মাতৃদেবীর আকস্মিক মৃত্যু ঘটে, যামিনী তখন সিমলায়। হঠাৎ সংবাদ পাইয়া অভিভূত হইবেন ভয়ে, তাঁহাকে টেলিগ্রামে মাতার পীড়ার অবস্থা বলা হয়, এবং কোন আত্মীয়াকে টেলিগ্রামে সত্য ঘটনা জানাইয়া অনুরোধ করা হয়, যেন তিনি নিজে গিয়া ইহা ক্রমশঃ প্রকাশ করেন। কিন্তু যামিনী টেলিগ্রাম পাইবামাত্র সিবিল সার্জ্জনকে চিঠি লিখিয়া বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ ষ্টেশনে গিয়া ট্রেণ ধরিলেন। সেটা কলিকাতা আসিবার ট্রেণ ছিল না। মাঝ-পথে নামিয়া অন্য গাড়ী ধরিয়া তিনি যে সময়ে কলিকাতা পৌঁছিলেন, সে সময়ে আসিয়া পড়িবেন, কেহ এমন কল্পনাও করেন নাই। তাঁহাকে যে ঘটনার কথা লেখা হইয়াছিল তাহাতে রোগীকে কখনো কখনো ৪৮ ঘণ্টা বাঁচিতে দেখা যায়। তাই প্রাণপণ করিয়া ১৮ ঘণ্টার মধ্যে আসিয়া পড়িলেন। কিন্তু আসিয়া মাকে দেখিতে পাইলেন না। সে দুঃখ চিরদিন তাঁহার ছিল। পরিবারের যে কোন ব্যক্তিরই হউক, রোগের সংবাদ পাইলে এক মুহূর্ত্ত স্থির থাকিতে পারিতেন না। বাহির হইতেও যে কোন রোগীর জন্য যখন ডাক আসিত, আহার, নিদ্রা, পথক্লেশ অগ্রাহ্য করিয়া তাহার কাছে ছুটিতেন।

Women's Medical Service ছাড়িবার পর চিকিৎসাবিদ্যায় আরও নূতন তথ্য ও দক্ষতা লাভ করিবার জন্য ১৯২১ সনে তিনি দ্বিতীয় বার বিলাত যাত্রা করেন। এইবার কেম্ব্রিজ হইতে Public Health সম্বন্ধে পরীক্ষা দিয়া ডিপ্লোমা লইয়া এবং লণ্ডন School of Tropical Medicine হইতে certificate লইয়া ১৯২৪সনের জানুয়ারী মাসের শেষ সপ্তাহে যখন দেশে ফিরিলেন, তখন Buldeo-das Maternity Homeএর বাড়ী নির্ম্মাণ সম্পূর্ণ হইয়া গিয়াছে, কিন্তু তাহার প্রতিষ্ঠা হয় নাই। ১৬ই ফেব্রুয়ারীতে গবর্ণর-পত্নী দ্বারা গৃহের দ্বারোদ্ঘাটন হইবে, কিন্তু কে যে তৎপূর্ব্বে তাহাতে ভিতরকার সকল ব্যবস্থা সম্পূর্ণ করিয়া তাহা দর্শনীয় করে, তাহা তখনও অনিশ্চিত। এই অবস্থায় কলিকাতা কর্পোরেশনের তদানীন্তন চেয়ারম্যান রায় বাহাদুর ডাক্তার হরিধন দত্ত যামিনীকে ডাকিয়া লইয়া গেলেন। রায় বাহাদুর মেডিকেল কলেজে যামিনীর সহপাঠী ছিলেন। তিনি বলিলেন, মিস সেনের গুণোচিত বেতন কর্পোরেশন দিতে পারিবে না, কিন্তু একটা প্রয়োজনীয় ও মঙ্গলকর প্রতিষ্ঠানের সূচনায় অর্থের দিকে না চাহিয়া, তিনি উহার ভিত্তি পত্তন করিয়া দিন। এই অনুরোধে তিনি অস্থায়ী ভাবে বলদেওদাস-প্রসূতি-নিকেতনের ভার গ্রহণ করিলেন। অতঃপর মাস দুই পরেই দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস মেয়র হইলেন এবং তাঁহার বিশেষ অনুরোধে তিনি স্থায়ী ভাবেই রহিয়া গেলেন। বেতন তাঁহার সর্ব্বথা উপযুক্ত না হইলেও পূর্ব্বাপেক্ষা বর্দ্ধিত হইল।

এই প্রতিষ্ঠা-টি তাঁহার হাতে গড়া জিনিষ। ইহার জন্য তিনি অমানুষিক পরিশ্রম করিয়াছেন। প্রসূতিদের চিকিৎসা ও শুশ্রূষা প্রধান কাজ হইলেও প্রতিষ্ঠানটি পরিচালনের দায়িত্ব সম্পূর্ণতঃ তাঁহার উপর ন্যস্ত ছিল। সে দায়িত্ব অতি সুন্দর ভাবে পালন করিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন ক্লাস করিয়া বাচনিক শিক্ষা ও সঙ্গে রাখিয়া হাতে কলমে শিক্ষা দিয়া, Nurse প্রস্তুত করাও তাঁহার আর এক কাজ ছিল। তিনি কয়েকটি সুনিপুণা সেবিকা গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। সেবিকার সংখ্যা কম, প্রসূতি ও প্রসবের সংখ্যা তদনুপাতে বহুগুণ অধিক হইলেও, তিনি নিজের অক্লান্ত পরিশ্রম ও পরিদর্শন-গুণে এই মাতৃভবনকে সুশৃঙ্খলা, স্বাস্থ্য ও আরামের স্থান করিয়া তুলিয়াছিলেন। দেখিতে দেখিতে ইহার প্রতিপত্তি এমন বিস্তৃত হইল, যে, বাঁকুড়া, বর্দ্ধমান, কৃষ্ণনগর প্রভৃতি স্থান হইতেও আশু-সন্তানবতীরা এখানে আসিতে আরম্ভ করিলেন। পূর্ব্বে মনে করা গিয়াছিল

যে কেবল নিম্নশ্রেণীর এবং দরিদ্র পরিবারের নারীরাই এখানে আসিবে, কিন্তু দেখা গেল ডাক্তারের চিকিৎসা-নৈপুণ্যের পরিচয় পাইয়া ভদ্র মধ্যবিত্ত ও ধনী পরিবারের মহিলারা কঠিন কঠিন "কেস্" লইয়াও অসঙ্কোচে এখানে আশ্রয় লইতেন। ইহাতে এক সময়ে যে আর একদিকে এই প্রসূতি-নিকেতনের বিরুদ্ধে একটা ক্ষোভের সৃষ্টি হয় নাই, তাহাও নহে। এত এত কঠিন abnormal case এখানে আসিবে এবং সহজে বিনামূল্যে চিকিৎসিত হইয়া যাইবে, এমন ধারণা বলদেওদাস-মাতৃভবনের প্রতিষ্ঠাতাদের ছিল না। যাঁহাদের বিশেষ চেষ্টায় ও ব্যক্তিগত প্রভাবে এই ভবনের জন্য অর্থ সংগৃহীত হইয়াছিল, তাঁহাদের প্রধানতম এক প্রাচীন চিকিৎসক মহোদয়কে বলিতে শোনা গিয়াছে—"যদি জানিতাম এই Maternity Home করিলে ডাক্তারদের রুজি মারা যাইবে তবে কি এমন কাজ করিতাম।" এখানে দরিদ্র নারীরা আসিবে, যাহাকে স্বাভাবিক কেস্ (normal case) বলে, তাহাই আসিবে; বেশী বেতনে খুব উচ্চশ্রেণীর চিকিৎসক থাকেন ও নিপুণ চিকিৎসা হয়, অনেকের কাছেই তাহা অনাবশ্যক মনে হইয়াছে। সে যাহা হউক, এখানে যে সকল ভদ্রমহিলা আসিয়াছেন তাঁহারা ডাক্তার মিস সেনের সদয় ব্যবহার, কোমল হাতের সেবা, অক্লান্ত পরিশ্রম ও অটল কর্ত্তব্যনিষ্ঠার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছেন।

আপনাকে বাঁচাইয়া কাজ করিয়া যাওয়া তাঁহার পক্ষে সম্ভব ছিল না। তাই আবার তাঁহার শরীর ভাঙ্গিয়া পড়িল। দুই একবার অল্প দিনের ছুটীতে উপকার হইতেছে না দেখিয়া, কর্ম্ম ত্যাগ করিবার সংকল্প করিয়া ১৯২৯ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে দীর্ঘ ছুটী লইলেন। তিনি কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিবার সংকল্প করিয়াছেন, এবং পুরীতে বাস করিতে আসিতেছেন, এই সংবাদ অবগত হইয়া পুরীর তদানীন্তন ম্যাজিষ্ট্রেট্ মিঃ সেনাপতি ও প্রবীণ কয়েকজন [illegible] পুরীর হাসপাতালের নারী বিভাগের ভার গ্রহণ করিবার জন্য সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ জানাইলেন। তাঁহারা মনে করিয়াছিলেন পুরীর হাসপাতালে তাঁহাকে কলিকাতার মত গুরুতর পরিশ্রম করিতে হইবে না। এই আশ্বাস পাইয়া তিনি পুরী হাসপাতালের নারী বিভাগের কার্য্যভার গ্রহণ করিলেন। কিছু দিনের মধ্যেই মিঃ সেনাপতি মহাশয় বদলী হইয়া গেলেন। তখন নারী হাসপাতাল সম্বন্ধে সহানুভূতিকারী কেহ রহিল না। ডাক্তারের বাসগৃহের চারিদিক অপরিচ্ছন্ন, একদিকে বাঁশবন। বায়ুর অভাব ও মশকের উৎপাতে রাত্রে তাঁহার নিদ্রা অসম্ভব হইল। তদ্ভিন্ন হাসপাতালের অবস্থা সম্বন্ধে উপরিতন ব্যক্তিদের ঔদাসীন্য ও নানাপ্রকার অব্যবস্থা দেখিয়া তিনি বড় দুঃখিত ও বিরক্ত হইয়া কাজ ছাড়িয়া দিলেন। যেন তেন প্রকারেণ কাজ সারা ও মাসান্তে বেতন গুণিয়া লওয়া তাঁহার প্রকৃতি-বিরুদ্ধ ছিল, প্রত্যেকটি রোগীর জন্য তিনি নিজেকে দায়ী মনে করিতেন। চিকিৎসকের কাজ একটি পবিত্র ব্রত বলিয়া তিনি অনুভব করিতেন। যাহা ভাল করিয়া করিতে পারিবেন না, নামরক্ষার জন্য তাহা করিতেন না; সেই জন্যই এ কাজে থাকিতে পারিলেন না। এ দিকে কলিকাতার "মেটারনিটি হোম" হইতে নানা বিশৃঙ্খলা ও রোগিণীদের কষ্টের সংবাদ তাঁহার কাছে আসিতে লাগিল। যাঁহারা তাঁহার অধীনে কাজ করিতেন, তাঁহাদের বিশেষ অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া আবার কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলেন ও পূর্ব্বভার পুনরায় গ্রহণ করিলেন। কিন্তু এই গুরুতর পরিশ্রম আর কিছুতেই সহ্য হইতেছিল না। তিনি ১৯২৯ সনের ডিসেম্বর মাসে কলিকাতার কার্য্য পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। আসন্ন বিচ্ছেদকাতর মেটারনিটি হোমের কর্ম্মিগণ তাঁহাকে যে বিদায় অভিনন্দন দিয়াছিলেন তাহার শেষ কয়েকটি কথা এই—"আপনার নিকট আমরা আর কোনও আশীর্ব্বাদ কামনা করি না,—শুধু এইটুকু, যেন আমরা আপনার ভাবে অনুপ্রাণিত হ'য়ে, আপনার পদাঙ্ক অনুসরণ ক'রে ধন্য হ'তে পারি।"

বিশ্রামের জন্য আবার পুরী আসিলেন। কিন্তু বিধাতা তাঁহার ভাগ্যে বিশ্রাম লেখেন নাই। আবার পুরীর হাসপাতালের জন্য আহ্বান আসিল। নূতন ম্যাজিষ্ট্রেট্ মিষ্টার থ্যাডেনির বিশেষ আগ্রহ ও অনুরোধে, নিজ ভবনে থাকিয়া দুই বেলা আসিয়া হাসপাতালের কাজ করিতে স্বীকৃত হইলেন। এবারও ইচ্ছামত হাসপাতালের উন্নতি করিতে না পারিয়া ক্ষুব্ধ ছিলেন এবং পরিশ্রমও যথেষ্ট

করিতে হইতেছিল। ইতিপূর্ব্বে পাণ্ডাদের পত্নীরা হাসপাতালে আসিতেন না; যামিনীর চিকিৎসার খ্যাতিতে এখন কোন কোন পাণ্ডা পত্নী ও সম্পর্কিত মহিলাদের হাসপাতালে পাঠাতে লাগিলেন। বাঙ্গালী ভদ্রঘরের মেয়েরাও আসিতে লাগিলেন। কিন্তু শরীর যখন একান্ত অপটু হইয়া পড়িল, তখন বহু অনুরোধ সত্ত্বেও গত অক্টোবর মাসে কাজ ছাড়িয়া দিলেন। তাহার পর হইতেই বিশ্রাম সত্ত্বেও আর আরাম লাভ হইল না। গত ১১ই ডিসেম্বর মাসে জ্বরাক্রান্ত হইয়াছেন জানিয়া তাঁহাকে কলিকাতা আনা হয়।

যিনি বহুলোকের রোগের উপশম করিয়াছেন, নিজ জীবনের শেষ কয়েক দিন অতি নীরবে দুঃসহ রোগযন্ত্রণা ভোগ করিয়া গত ৭ই মাঘ, ইংরাজি ১৯৩২ সনের ২ শে জানুয়ারী শোকার্ত্ত আত্মীয়স্বজন এবং সকল পরিচিতজনের অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ও প্রীতি লইয়া অমর-লোকে প্রস্থান করিলেন।

এ পর্য্যন্ত যত কথা বলিয়াছি তাহা দ্বারা তাঁহার পূর্ণাঙ্গ চিত্র আঁকিতে পারি নাই জানি। তাঁহার মহনীয় নারীত্বের সব দিক দেখান আমার পক্ষে সম্ভব নহে। তাঁহার কর্ম্মজীবনের অনেক কথা আমার অপরিজ্ঞাত।

রোগের সময় আত্মীয়-স্বজনের সেবা-শুশ্রূষা করিয়াছেন বলিলেই পারিবারিক জীবনের পূর্ণ পরিচয় দেওয়া হয় না। তিনি আরও কিছু করিয়াছেন। আমি, যামিনী ও প্রেমকুসুম তিনজনই অন্য ভাইবোনদের অগ্রজা। পিতামাতা পুত্রের সমান যত্নে কিংবা অধিকতর যত্নে আমাদের শিক্ষা দিয়াছেন, তাই আমাদেরও সংকল্প ছিল অন্য লোকের পুত্রেরা যাহা করে আমরা তাহা করিব। বৃদ্ধ পিতামাতাকে বিশ্রাম দিয়া কনিষ্ঠ ভাইবোনের শিক্ষার ভার আমরা বহন করিব। ঘটনাচক্রে আমি ও প্রেমকুসুম তাহা করিতে পারি নাই। যামিনীর দ্বারা এই কর্ত্তব্য পূর্ণ মাত্রায় সাধিত হইয়াছে। নেপালে যে প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছেন তাহার প্রায় সমস্তই পরিবারের কল্যাণে ব্যয় হইয়াছে। যখন যতীন্দ্রমোহন চৌরঙ্গীতে দোকান দিলেন এবং দ্বিতীয় ভ্রাতা বিলাতে গেলেন, তখন নিজের জন্য মাসে ২৫৲ টাকা মাত্র রাখিয়া সমুদয় অর্জ্জন বাড়ী পাঠাইতেন। দুই কনিষ্ঠা ভগিনীর বিবাহের ব্যয়ও তিনিই বহন করিয়াছেন। তৃতীয় ভ্রাতার বিলাতের শিক্ষার ব্যয়ও তিনিই দিয়াছেন।

ভ্রাতৃদ্বিতীয়া ও ভাইদের জন্মদিনে তাহাদের বস্ত্রাদি দিতেন, পরিবারের অন্য সকলের জন্মদিনেও উপহার দিতেন। সকলকে নিজের হাতে রন্ধন করিয়া খাওয়াইতে ভালবাসিতেন। তিনি ভাল রাঁধিতে ও জলখাবার প্রস্তুত করিতে পারিতেন। নেপাল ছাড়িবার পর, একবার কলিকাতার বাড়ীতে যখন পাচক ছিল না, বা অসুস্থ ছিল, একাদিক্রমে বহুদিন যামিনীকে বাড়ীর সকলের জন্য একতালার পূবের বারান্দায় বসিয়া রাঁধিতে দেখিয়াছি। সব ভাইবোন সেখানে বসিয়া তাঁহার সঙ্গে নানারকম গল্প জুড়িয়া দিত, বসিবার ঘর খালি থাকিত। যখন ম্যাটার্নিটি হোমে থাকিতেন, সেখানে কতবার সকলকে আহারে এবং চায়ে নিমন্ত্রণ করিতেন। পুরীতে ছুটী উপলক্ষে সকলকে আসিতে অনুরোধ করিতেন। আসিলে কত সুখী হইতেন, কত যত্নে সকলকে খাওয়াইতেন। কোন কোনও nurse-কেও তাহাদের স্বাস্থ্যশোধনের জন্য আনাইতেন। এই প্রসঙ্গে nurseদের প্রতি তাঁহার অকৃত্রিম স্নেহের একটা উদাহরণ মনে পড়িতেছে। একটি nurseএর Typhoid হয়। প্রসূতি ও শিশুদের কাছে তাঁহাকে যাইতেই হইত। সংক্রামক রোগের দ্বারা তাহাদের পাছে অনিষ্ট হয় সেই ভয়ে সকল সময়ে এই নার্সটির কাছে যাইতে পারিতেন না; তবু তাহার জন্য অনেক কিছু করিতেন, রাত জাগিতেন, চিকিৎসা ও শুশ্রূষার সুব্যবস্থা করিতেন। তাঁহার অনুরোধে বড় বড় ডাক্তার আসিয়া বালিকাকে দেখিয়া যাইতেন। কিন্তু এত করিয়াও তাহাকে বাঁচাইতে পারিলেন না। বালিকার অকালমৃত্যুতে যামিনী অত্যন্ত শোকার্ত্ত হইলেন। নিজের সম্পর্কিতের মত ব্রাহ্মমতে তাহার শ্রাদ্ধানুষ্ঠান করাইলেন। তাহার দুইখানি বড় ছবি করাইয়া একখানি হাসপাতালে দিলেন, একখানি নিজের কাছে রাখিলেন।

তাঁহার হৃদয়খানি ছিল একটি স্নেহকরুণার নির্ঝর। তাই হাসপাতালে কোন রোগী মরিলে বড় ব্যথা পাইতেন। রোগীদের যখন হাসপাতাল হইতে দামী ঔষধ মিলিত না, নিজের ব্যয়ে তাহা কিনিয়া দিতেন। শিশু-রোগীদের

কখনও ঔষধ কিনিয়া দিতেন, কখনো প্রফুল্ল রাখিবার জন্য খেলানা দিয়া আসিতেন।

বাল্য অতিক্রম করিবার পর হইতে তিনি নিজের বস্ত্রালঙ্কার সম্বন্ধে উদাসীন ছিলেন, কিন্তু অন্যথা সৌন্দর্য্যের উপাসক ছিলেন। ফুল-ফলের বাগান করিতে বহু অর্থ ব্যয় করিয়াছেন। তাঁহার পুরীর বাগানের বালুময় ভূমিতে সবুজের প্রাচুর্য্য ও পুষ্পসম্ভার দেখিয়া সকলে বিস্মিত হইতেন।

লোকে জানিতেন না যে তিনি অসবরকালে সাহিত্যের চর্চ্চা করিয়াছেন। এক সময় আমার অনুরোধে Olive Schriener লিখিত Dreams গ্রন্থখানি আদ্যোপান্ত অনুবাদ করিয়াছিলেন। ভক্তিভাজন শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের পীড়ার সময় নিজের অনুবাদ লইয়া তাঁহাকে পড়িয়া শুনাইতেন। দুঃখের বিষয় কোন মাসিকের সম্পাদিকার অনবধানতায় ঐ অনুবাদগুলি হারাইয়া গিয়াছে। 'বলদেওদাস প্রসূতি ভবনে' তিনি নার্সদের জন্য 'প্রসূতি-তত্ত্ব' নামে একখানি পুস্তক প্রকাশ করেন।

তাঁহার স্বদেশপ্রীতি এত বেশী ছিল যে উহা আমার কাছে একটু উগ্র বোধ হইত। কিন্তু এ সম্বন্ধে আমি তাঁহার সহিত তর্ক করিতাম না। যাহা সরল ও অকৃত্রিম তাহা শ্রদ্ধা করিতাম। Statesman কাগজ তাঁহার অস্পৃশ্য ছিল, কারণ সে কাগজ এদেশের নিন্দা প্রচার করে।

দেশজ শিল্পদ্রব্য গ্রহণ কেবল বস্ত্র সম্বন্ধেই নয় সব বিষয়েই চেষ্টা করিতেন। কলিকাতা আসিলেই নানা দোকান খুঁজিয়া হরেকরকম দেশী দ্রব্য কিনিয়া লইয়া যাইতেন।

এত স্বদেশ ও স্বজাতিপ্রেম, এত জ্ঞান, এত কর্ম্মশক্তি, কিন্তু এতটুকু অহঙ্কার তাহাতে দেখি নাই। এই সুন্দর মহৎ জীবনখানি বিধাতা আরও কিছুদিন কেন সংসারে রাখিলেন না বুঝিতে পারি না। সারাজীবন বড় বেশী খাটিয়াছেন বলিয়াই বুঝি বিশ্রামের ব্যবস্থা হইল।

ভগবানের বাণী

শ্রী শশাঙ্কশেখর চক্রবর্ত্তী

শুনেছিলাম শ্রবণ পাতি'
শান্ত সে এক স্বর,
সবুজ তৃণের হাসির ভাষা
সিক্ত মাটির 'পর।
বল্লে তারা—"আমরা সবাই
ভগবানের বাণী..."
আপ্‌না হ'তেই নত হ'ল
আমার মাথাখানি।

*

সত্যি তারা বল্লে কি যে
মনের-কানের পাশে,—
উন্মুখ প্রাণ রইল জাগি'
সেই ধ্বনিটির আশে।

আশে-পাশে চতুর্দ্দিকে
পাদপ-তৃণ-গিরি
পুলক-গানে দিল আমায়
সেই ধ্বনিটি ফিরি'।
পরাণ পুরে কাণায় কাণায়,
পূর্ণ জীবন মানি;
ছন্দে বলি—"সবাই মোরা
ভগবানের বাণী!" *

---

* James Stephens হইতে।

গাঁয়ের ছবি

(চিত্রণ)

শ্রী সুনয়নী দেবী

সাত

ক্রমে কমলার বিয়ের দিন এগিয়ে এলো। শ্যামলাল বাবু বরপণ হাজার টাকা, ঘড়ী আংটি চেয়ে বসেছেন। মাধব বাবু অনেক কষ্টে ৮০০ টাকার জোগাড় করেছেন আর কোথাও টাকা পাওয়া যায় নি। পিসিমার কিছু জমান টাকা ছিল; তিনি তাই দিয়ে বরের ঘড়ী আংটি কিনতে দিয়েছেন। কমলার মায়ের হার, মল আর বালা দেওয়া হবে। জ্যেঠাই-মা কমলাকে বড় ভালবাসেন, তিনি মাথার সোনার ফুল আর চিরুণী দেবেন ঠিক করেছেন। মাধব বাবু মনে করে-ছেন, এখন এই ৮০০ টাকা দিই পরে আর ২০০ যে করে' হয় দেব; শ্যামলাল বাবু ভদ্রলোক—বুঝিয়ে বল্লেই হবে। কিন্তু তিনি যে কি রকম কৃপণ তা জানলে, অতটা ভরসা করতেন না।

যা'ই হোক্ বিয়ের সব ঠিক হয়েছে। বুধবার বিনোদ কলকাতায় যেতে চেয়েছিল কিন্তু মাধব বাবু ছাড়েন নি, বিয়ে অবধি তাকে থাকতে হয়েছে। বুধবারে বিয়ে, সেই দিনই সকালে গায়ে-হলুদ। আজ মঙ্গলবার। বাজার-হাট সব করা হ'চ্ছে; সেকরা গহনাগুলি এনেছে, মাধব বাবু সেগুলির ওজন দেখে নিচ্ছেন; রমানাথ কলকাতা থেকে আংটি আর ঘড়ি কিনে এনেছে। কমলার জন্ম একখানি ফুল-দেওয়া লাল বালুচরের চেলী কেনা হয়েছে।

উঠানে সামিয়ানা খাটিয়ে বরযাত্রীদের বসবার জায়গা করা হয়েছে। এক দিকে রান্নার জন্ম চালা বাঁধা হ'চ্ছে; গরুর গাড়ী করে' কাঠ এসেছে, ফটিক দাঁড়িয়ে কাঠগুলি চালায় রাখাচ্ছে; গোবিন্দ নূতন কাপড় পরে' ঘুরে বেড়াচ্ছে আর যে আসছে তাকেই বলছে, 'দিদির বিয়েতে পেয়েছি।' রমানাথ পাড়ার ছেলেদের দিয়ে কলাপাতা কাটাচ্ছে, কাল লোক খাবে—পাতাগুলি ধুয়ে রাখতে হবে। তিনকড়ি মুটের মাথায় আলু, কুমড়া, লাউ, মোচা, শাক চাপিয়ে বাজার করে' এল। রান্নার চালার একধারে মেয়েরা বসে' আলু ছাড়াচ্ছিল; পিসিমা বল্লেন, 'ওই খানেই সব নামিয়ে দিতে বল তিনু, কতক কুটনো আজই কোটা হবে।' তিনকড়ি ঝুড়ি ধরে' সব সেইখানে ঢেলে দিয়ে মুটেকে পয়সা দিয়ে বিদায় করে' দিলে।

কমলার মা আর জ্যেঠাইমা ভাঁড়ার গোছাচ্ছেন। ধামা ধামা মুড়ি মুড়কি বাতাসা এসে পড়েছে। জ্যেঠাইমা সেগুলি হাঁড়িতে ঢেলে সরা দিয়ে রাখছেন। পাড়ার ছোট ছোট ছেলেরা ভীড় করে' ধামার চারধারে দাঁড়িয়ে আছে আর একটু সুবিধা পেলেই মুঠো মুঠো মুড়কি নিয়ে চাবাচ্ছে। জ্যেঠাইমা চেঁচিয়ে গলা ভেঙে ফেলেছেন তবু কেউ শুনছে না। এমন সময় মাধব বাবুকে আসতে দেখে ছেলেরা ছুটে পালিয়ে গেল। জ্যেঠাই-মাও ভাঁড়ার বন্ধ করে' দিয়ে মাধব বাবুর কি দরকার জানতে চাইলেন।

মাধব বাবু বল্লেন, 'বৌদি, এদিকে যে গোল বেধেছে।' 'কেন ঠাকুরপো? কি হয়েছে আবার? কিসের গোল?' 'শ্যামলাল বাবু বলে' পাঠিয়েছেন গায়ে হলুদের তত্ত্বর দরুণ গোটা ৫০ টাকা দিতে হবে, ওটা নাকি ধরা হয় নি। এখন কি করি বল'ত। হারাধন বাইরে বসে' আছে। আমার হাতে যে ক'টি টাকা আছে, তা এই লোক খাওয়াতেই খরচ হবে।' 'ঠাকুরপো, তুমি যেমন ওখানে বিয়ে দিতে গেলে! আহা! দেখ দেখি এই বিনোদ ছেলেটিকে? দেখলে চোখ ফেরাতে ইচ্ছে করে না। ওমনি ধারা একটি ছেলের সঙ্গে বিয়ে হ'লে কেমন হ'তো—' 'সে যা হবার হয়েছে আর এখন বদলানো যায় না, বৌদি:—এখন হারাধনকে কি বলে' বিদায় করি তাই বল।'

জ্যেঠাইমা খুব বুদ্ধিমতী ছিলেন। তিনি একটু ভেবে

বল্লেন, 'দেখ ঠাকুরপো, তুমি যতই নীচু হবে, ততই ওরা টাকার জন্তে তোমায় চেপে ধর্‌বে। আমি বলি কি, তুমি স্পষ্ট জবাব দাও যে আর এক পয়সাও দিতে পার্‌বে না, এতে বিয়ে হয় হবে—না হয়ত কি করা যাবে। এখনো তো গায়ে হলুদ হয় নি?' 'তাই বলে' দেখি,' বলে' বাইরে চলে' গেলেন।

এদিকে গোবিন্দ এক ঝোড়া কলাপাতা মাথায় করে' এসে বল্লে, 'ও বড়মা—পাতাগুলো কোথায় রাখ্‌ব বলে' দাও না।' 'আমার মাথায় রাখ্‌ আর কোথায় রাখ্‌বি! এতদিনের পুরান লোক, দেখে শুনে যদি কিছু কর্‌তে পারিস্? পাতা ধোয়া হয়েছে?' 'ধোয়া আবার কখন হ'লো, এই তো কাট্‌তে লেগেছে।' 'তবে যা, একেবারে পুকুরে ধুয়ে নিয়ে ওদিককার চালায় রাখ্‌গে যা।' গোবিন্দ গজ্‌ গজ্‌ করে' বক্‌তে বক্‌তে চলে' গেল। এমন সময় রমানাথকে যেতে দেখে জ্যেঠাইমা ডেকে বল্লেন, 'ওরে, হারধন চলে গেছে কি?' 'এই যাচ্ছে; কেন?—কিছু দরকার আছে কি?' 'নারে না, তেমন দরকার নেই।' 'হারাধন আবার টাকার জন্তে এসেছিল জ্যেঠাইমা, কাকা তাকে খুব শুনিয়ে দিয়েছেন! আচ্ছা জ্যেঠাইমা, শ্যামলাল বাবু জমিদার মানুষ, পয়সার অভাব নেই, তবু টাকার লোভ ছাড়্‌তে পার্‌ছেন না কেন, বল দেখি?' 'কি জানি বাছা, যার যত টাকা থাকে তার ততই লোভ হয় বোধ হয়। মেয়েটার বিয়ে এখন ভালয় ভালয় হ'য়ে গেলে বাঁচা যায়!' 'যে রকম গতিক দেখ্‌ছি জ্যেঠাইমা!...এখনো ২০০ টাকার জোগাড় হয়নি। বাবা টাকার চেষ্টায় গিয়েছিলেন কিন্তু শুধু হাতে কেউ টাকা দিতে চায় না।' 'সেই তো ভাবনার কথা রে—' বলে' তিনি ভাঁড়ারে গেলেন। সেদিনের মত কাজ সেরে যে যার ঘরে চলে' গেল।

আট

আজ বিয়ে। পাড়ার মেয়েরা সকাল থেকে এসে বিয়েবাড়ী জমিয়ে তুলেছে। হাঁকাহাঁকি, ডাকাডাকি, মেয়েদের গুণ্‌ গুণ্‌ কথা, ছোট ছেলের মারামারি ঝগড়ায় বাড়ীতে কান পাত্‌বার জো নেই। বাড়ীর চারদিকের জঞ্জাল পরিষ্কার করিয়ে বেড়ার উপর মাটি দিয়ে প্রদীপ জ্বালানো হ'চ্ছে, আলো দেওয়া হবে। একজন ঢুলী আর তার সঙ্গে কাঁসি নিয়ে একটি ছেলে বসে' বাজাচ্ছে। চালায় রান্না চেপেছে, পিসিমা আর তারা-দিদি সেখানে আছেন। জ্যেঠাইমা ভাঁড়ারে বসে' জলখাবার বিলি কর্‌ছেন। ছেলেরা তাঁকে চারদিক থেকে ঘিরে ধরেছে। তিনি ছোট ছোট সরা করে' মুড়ি, মুড়্‌কি, বাতাসা তাদের হাতে হাতে দিচ্ছেন। কমলার মা ঘরে বসে' বরণডালা সাজাচ্ছে। কমলা একখানি লালপেড়ে শাড়ী পরে' কুসুম আর বিনির সঙ্গে ঘরে বসে' আছে। গোবিন্দ ঢুলীদের জন্তে জলখাবার নিতে এসেছে। জ্যেঠাইমা দুখানি সরা তার হাতে দিলেন। এমন সময় 'হলুদ এসেছে' বলে' একটা রব উঠ্‌ল। হলুদ এসেছে শুনে যে যেখানে ছিল হাতের কাজ ফেলে ছুটে দেখ্‌তে এল। আটজন লোক তত্ত্ব নিয়ে এসে থালাগুলি দাওয়াতে নামিয়ে দিলে।

হরনাথ বাবু গোবিন্দকে বল্লেন, 'ওরে, কুটুমবাড়ীর লোকদের বসানা—, ওরা যে দাঁড়িয়ে রইল।' গোবিন্দ তাদের নিয়ে গিয়ে বসালে। জ্যেঠাইমা কমলার মাকে থালাগুলি আজ্‌ড়ে' নিতে বলে', কুটুমবাড়ীর লোকদের জন্তে খাবার গোছাতে ভাঁড়ারে গেলেন।

বিনোদ আর রমানাথ এসে বল্লে, 'জ্যেঠাইমা, কুটুমবাড়ীর লোকদের কি খাবার দেবে দাও, তারা যাবার জন্তে ব্যস্ত হয়েছে।' 'এই যে রে গোছাচ্ছি, নিয়ে যা না,' বলে' এক হাঁড়ী দই, মুড়ি, মুড়্‌কি, গোটাকতক মেঠাই আর পান্তুয়া দিলেন। বল্লেন, 'ভাত এখনো হয় নি তো রে, এই খেতে দে।' রমানাথ আর বিনোদ খাবারগুলি নিয়ে চলে' গেল।

কুটুমবাড়ীর লোকরা একপেট খেয়ে বিদায় নিয়ে চলে' গেল। পিসিমা বল্লেন, 'দেখ্‌ছ দিদি কত বেলা হয়েছে, এখনো মেয়েটার গায়ে হলুদ ঠেকান হ'লো না। বৌয়ের যদি কোন কাজে গা আছে!—এমন গতরকুঁড়ে বৌ আর কোথাও দেখিনি।'

জেঠাইমা বল্লেন, 'আজ আর ওকে কিছু বলিস্‌নে, থাকো! একটি মেয়ে, শ্বশুরবাড়ী চলে' যাবে, তাই ওর মন ভাল নেই।'

এমন সময় পাড়ার বড়-বৌ, মেজ-বৌ, পেঁচি, ক্ষুদি, টেপি, অমলা, বিমলা—এরা কমলাকে ঘিরে'

নিয়ে সেখানে এসে বল্লে, 'এইবার আমরা কমলার গায় হলুদ ঠেকিয়ে দিচ্ছি পিসিমা, তোমরা এস দেখবে।'

বিনোদিনী এসে বল্লে, 'ও জ্যেঠাইমা, আমি কমলার গায়ে হলুদ ঠেকাব।' 'আহা, মেয়ের কথা শুনে বাঁচি নে! তোর কি বিয়ে হয়েছে তাই হলুদ দি'বি? মেয়ের যদি কোন বুদ্ধি আছে।'

বিনি বকুনি খেয়ে মুখটি চুন করে' একধারে সরে' গেল। তার পর শাঁখ বাজিয়ে উলু দিয়ে কমলার গায়ে হলুদ দেওয়া হ'লে, বৌ, মেয়েরা, এ ওর গায়ে হলুদ দিয়ে পুকুরে স্নান কর্‌তে গেল। এদিকে খাওয়া-দাওয়া চুক্‌তেই বেলা চারটে বেজে গেল। গোধূলি লগনে বিয়ে। রমানাথ খেয়ে উঠেই বর আন্‌তে গেছে। বিনোদ ছেলেদের দিয়ে বিছানা পাতাচ্ছে। ফটিক, তিনকড়ি, বিশু আলোর বন্দোবস্ত কর্‌ছে। কতকগুলি তুবড়ি প্রভৃতি বাজি এনে রাখা হয়েছে; বর এলে বাজিপোড়ান হবে। তারা-দিদি পিসিমাকে বল্লেন, 'ও খাকো, ছাউনি নাড়া হবে কোথায়?' 'এই যে দিদি, এই দাওয়াতে হবে।' 'তা ওখানে চারটে কলাগাছ বসাতে হবে যে?' 'তাতো হবে দিদি, গোবিন্দ খেতে গেছে, খেয়ে এলেই বল্‌ছি।'

গোবিন্দ এমন সময় খেয়ে উঠে পেটে হাত বুলাতে বুলাতে সেইখান দিয়ে যাচ্ছিল, পিসিমা ডেকে বল্লেন, 'ওরে ও গোবিন্দ, হাত ধুয়ে শীগ্‌গির চারটে কলাগাছ আন্ দেখি।' 'পিসিমা যেন কি! যা খেয়েছি আগে হজম করি তারপর কাজ কর্‌ব। এখন আমি কোন কাজ কর্‌তে পার্‌ব না তা বলে' দিচ্ছি।' 'দেখ্‌লে দিদি, চাকরের রকমখানা! বলি, অত খেতে গিয়েছিলি কেন? জিনিষ না হয় পরের, পেটটা তো নিজের।' 'তা, দিদিমণির বিয়েতে খাব না? আমি বিশুকে বল্‌ছি কলাগাছ আন্‌তে। আমি হাতটি ধুয়ে শুয়ে পড়্‌ব আর এখন উঠ্‌ছি না পিসিমা, রাগই কর আর যা'ই কর। সেই বর আস্‌বে যখন, যদি বাজনা শুন্‌তে পাই তো উঠ্‌ব—' বলে' হাস্‌তে হাস্‌তে চলে' গেল।

বিশু চারটে কলাগাছ দাওয়াতে বসালে। জ্যেঠাইমা মাণিককে ডেকে 'খুকু'র প্রদীপগুলি সাজাতে বলে'

কমলার মাকে ছাউনি নাড়ার সব গুছিয়ে রাখ্‌তে বল্লেন। পাড়ার সেজবৌমা নাকি খুব ভাল চুল বাঁধ্‌তে আর ক'নে সাজাতে পারেন, তিনি কমলাকে সাজাতে এসেছেন। এঁটে সেঁটে জরী দিয়ে খোঁপা বেঁধে তাতে জ্যেঠাইমা যে সোনার চিরুণী আর ফুল দিয়েছেন সেইগুলি খোঁপায় পরিয়ে দিয়ে, ফুল দিয়ে খোঁপাটি ঘিরে দিলেন। তারপর তিন চারটে চাপড় দিয়ে খোঁপাটি থেব্‌ড়ে দিলেন। কমলার মাথা তখন ঝন্ ঝন্ কর্‌ছে, চোখে জল এসে পড়েছে, তবু সহ্য করে' চুপ করে' আছে। তার পর ভিজে গামছা দিয়ে ডোলে ডোলে মুখ মুছিয়ে পাণের বোঁটা দিয়ে চন্দন পরিয়ে, সিঁদুরের টিপ দিয়ে দিলেন। তার পর মুখটি একবার এদিকে একবার ওদিকে ঘুরিয়ে দেখে বল্লেন, 'এইবার কাপড় নিবে যা, ও ঘরে পরে' আয়।'

কমলা কাপড় নিয়ে উঠে গেল। কাপড় পরে' গলায় ফুলের মালা পরে' কমলা একখানি পিঁড়ের উপর বস্‌ল। সকলে বল্লে, 'সেজবৌমা বেশ সাজিয়েছে কিন্তু, এমন সাজানো এ পাড়ায় কেউ পারে না তা বলে' দিচ্ছি। দেখ দেখি, ঠিক যেন লক্ষ্মী ঠাকরুণের মত দেখাচ্ছে!'

সেজবৌমা একটু হেসে কমলার কোলে একখানি চণ্ডীর পুঁথি দিলেন। এমন সময় দূরে একটা বাজনার শব্দ হ'তে শুনে সকলে উঠে বল্লে,—'ঐরে বর আস্‌ছে, চল্ চল্ বর দেখিগে', বলে' ছুটে বেরিয়ে গেল।

'ওরে বর এসেছে, শাঁখ বাজা, উলু দে', বলে' পিসিমা চেঁচাতে লাগ্‌লেন। 'ওরে শাঁখ কোথায়?' 'বরণডালার উপর আছে নিয়ে আয় নারে—' চারদিকে গোলমাল, কেউ কারু কথা শুন্‌তে পায় না। এদিকে বরের পাল্কী এসে পড়্‌ল। মাধব বাবু বরের হাত ধরে' পাল্কী থেকে নামিয়ে নিলেন। শ্যামলাল বাবু মোটা মানুষ, পাল্কী থেকে অনেক কষ্টে বেরিয়ে হাঁপাতে লাগ্‌লেন। হরনাথ বাবু তাঁর হাত ধরে' সভায় নিয়ে গিয়ে বসালেন। তার পর একটি ছেলের হাতে পাখা দিয়ে বাতাস কর্‌তে বল্লেন। তিনু একখানা কলা-পাতায় করে' পাণ দিয়ে গেল, গোবিন্দ তামাক দিয়ে গেল। বিনোদ কমলাকে এসে জানালে।

পুরোহিত একধারে ঠাকুর নিয়ে বসেছিলেন। তিনি মাধব বাবুকে ডেকে বল্লেন, 'দেখুন লগ্নের সময় খুব কম, এইবেলা মেয়েদের যা রীত-টিত্ কর্‌বার আছে সেরে নিতে বলুন।' 'আচ্ছা আমি বল্‌ছি', বলে' মাধব বাবু 'রমু রমু' করে' ডাক্‌তে লাগ্‌লেন।

রমু এসে বল্লে, 'কাকা ডাক্‌ছেন?' 'হাঁরে, বরকে ভিতরবাড়ীতে নিয়ে যা—ছাউনি নাড়া হবে।' 'আচ্ছা যাচ্ছি', বলে' রমু বর উঠাতে গেল।

শ্যামলাল বাবু হারাধনের সঙ্গে চুপি চুপি কি কথা বল্‌ছিলেন, রমানাথকে দেখে বল্লেন, 'ওহে শোন দেখি একবার, তোমার কাকা কোথায়?' 'ওই যে ওখানে, আমি বরকে নিয়ে যাচ্ছি, ছাউনি নাড়া হবে।' 'সে পরে হবে; এখন হারাধন যাও, কথাটা বলে' এস।' হারাধন উঠে গেল। রমানাথ আর বর না উঠিয়ে, হারাধনের সঙ্গে গেল, কি বলে শুন্‌তে। 'দেখুন বাবু', বলে' হারাধন মাধব বাবুর সামনে দাঁড়াল। তিনি এখন রমানাথের দিকে চেয়ে বল্লেন, 'ওকি রে, বর নিয়ে গেলিনে, চলে' এলি কেন?' 'শ্যামলাল বাবু এখন বর তুল্‌তে বারণ কর্‌লেন কাকা! তাঁর কি কথা আছে; আগে শুনুন।'

হারাধন বল্লে, 'না, কথা এমন কিছু নয় তবে সেই টাকাটা এখন দিয়ে দিলেই ভাল হয়, তাই বল্‌তে বল্লেন।' 'আচ্ছা তুমি যাও, আমি টাকা নিয়ে যাচ্ছি। রামু, তোর খুড়ীমার কাছে থেকে সেই থলিটা নিয়ে আয় তো রে।' রমানাথ টাকা আন্‌তে গেলে, পিসিমা বল্লেন, 'কইরে রমু, বরকে নিয়ে এলিনে? ছাউনি নাড়া কখন হবে?' 'দাঁড়াও পিসিমা, আগে দেনাপাওনা চুকুক!—খুড়ীমা কোথায়?'

রমু কমলার মাকে দেখ্‌তে পেয়ে কাছে গিয়ে টাকার থলেটি চেয়ে বল্লে, 'ছাউনি নাড়ার সব গুছিয়ে রাখ খুড়ীমা, আমি এখনি বর আন্‌ছি—' বলে' থলে নিয়ে মাধবের কাছে বাইরে গেল।

মাধব বাবু টাকাগুলি নিয়ে শ্যামলাল বাবুর কাছে যেয়ে বল্লেন, 'শ্যামলাল বাবু, এই থলেটিতে ৮০০ টাকা রয়েছে আছে, গুনে নিন।' 'আটশ টাকা গুনে নেব—সেকি কথা, মাধব বাবু? কত দেবার কথা ছিল আপনার—মনে নেই?' 'আমার খুব মনে আছে, কিন্তু শ্যামলাল বাবু, উপস্থিত আমি এর বেশি এখন কিছুতেই দিতে পার্‌ছি নে। আপনি বড়লোক, এখন এই টাকা নিয়ে বিয়ের অনুমতি দিন, পরে আমি দুশো টাকা যেমন করে' পারি দেব। এখন অনুমতি দিন—লগ্ন ব'য়ে যাচ্ছে।' 'লগ্ন ব'য়ে যাচ্ছে তাতে আমার কি? আমি আর দুশ টাকা হাতে না পেলে বিয়েতে অনুমতি দেব না', তা বলে' দিচ্ছি। আমি ওসব চালাকির কথা বুঝিনে বাপু, টাকা দেবে কিনা শুন্‌তে চাই।

হরনাথ বাবু এগিয়ে এসে বল্লেন, 'আপনি ব্যস্ত হচ্ছেন কেন মশায়? মাধব যখন বলেছে পরে দেবে, তখন নিশ্চয় টাকা পাবেন। ভয় কি মশায়!' 'আহা ভয়ে তো আমি মরে' গেলুম, আমার আবার ভয় কিসের? ভয় তোমাদের! জান, আমি এখনি বিয়ে না দিয়ে ছেলে নিয়ে চলে' যেতে পারি। যেখানে কথার ঠিক নেই, সেখানে ছেলের বিয়ে দেব কি করে'?' বলে' রাগে ফুল্‌তে লাগ্‌লেন।

কাছেই বরের মামা বসে' ছিলেন, তিনি আস্তে আস্তে বল্লেন, 'ওহে আর কেন—যেতে দাও। ভদ্রলোক যখন বলেছেন দেবেন, তখন আর গোল না করাই ভাল। তোমার ছেলেও তো দোজবরে, ওই দিয়েছে সেই ঢের। আর তোমার ছেলের গুণে ত কেউ মেয়ে দিতেই চাইলে না, তাও তো জান ভাই?'

সেই রকম স্বরে শ্যামলাল বাবু বল্লেন, 'ওহে দেখ্‌ছ না টাকাটা হাতে রেখেছে, একটু চেপে ধর্‌লেই বের কর্‌বে।' 'তবে যা হয় কর—ভাল কথা তো শুন্‌বে না।' বলে' তিনি চুপ কর্‌লেন।

এদিকে পুরোহিত লগ্ন ব'য়ে গেল বলে' চীৎকার কর্‌তে লেগেছেন দেখে, বিনোদ বল্লে, 'মশায়, একটু চুপ করুন, লগ্ন ব'য়ে গেলেও এখন বিয়ে হ'চ্ছে না; দেখ্‌ছেন না ওদিকে টাকা নিয়ে কি গোল বেধেছে!' 'তবে আমার পাওনা দেবে কে!' বলে' উঠে দাঁড়ালেন।

ফটিক কি আন্‌তে ভিতরে গিয়েছিল, তার মুখে বিয়ের গোল বেধেছে শুনে' পিসিমা তুলসীতলায় মাথা দিয়ে উপুড় হ'য়ে পড়্‌লেন। আর সবাই যে যেভাবে ছিল সেই ভাবেই

সব স্থির হ'য়ে বসে' রইল। কমলার মা কমলাকে কোলে নিয়ে চুপ করে' বসে', চোখ দিয়ে ঝর ঝর করে' জলের ধারা ঝর্‌ছে—মুখে কথা নেই। তারা দিদি আর জ্যেঠাইমা গালে হাত দিয়ে শূন্যদৃষ্টিতে দাওয়ার উপর বসে' রইলেন। এত গোলমাল সব একেবারে চুপ হ'য়ে গেছে! এমন সময় রমানাথ ছুট্‌তে ছুট্‌তে এসে বল্লে, 'খুড়ীমা, শীগ্‌গির উঠে ছাউনি নাড়ার জোগাড় কর, বর আস্‌ছে।' 'কি বল্লি রমু, বর আস্‌ছে?—আমার কমলার কি বিয়ে হবে রে! একি স্বপ্ন না সত্যি?' বলে' চীৎকার করে' রমানাথের পায়ের কাছে পড়ে' গেলেন কমলার মা।

কমলা 'ওগো মা গো' বলে' মায়ের গলা ধরে' কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে বল্লে, 'ও রমুদাদা, দেখ না গো মায়ের কি হ'লো, মা যে কথা কইছে না গো!' 'ভয়কি' বলে' রমু তাড়াতাড়ি এক ঘটী জল এনে মুখে ঝাপ্‌টা দিতে লাগ্‌ল। বিনি একটা পাখা নিয়ে বাতাস দিতে লাগ্‌ল। তারাদিদি গিয়ে পিসিমাকে উঠিয়ে বল্লেন, 'ওলো ওঠ্‌ ওঠ্‌ তোর ভাইঝির বিয়ে আর অমন করে' পড়ে' কেন?'

রমু বল্লে, 'বর আস্‌ছে।' 'সত্যি দিদির বর আস্‌ছে—' 'তবে যে ফটিক কি সব বলে' চলে' গেল!' 'তবে চল্ দেখি গে—' বলে' সকলে উঠ্‌লেন।

এদিকে কমলার মা একটু সাম্‌লেছে দেখে, জ্যেঠাইমা বল্লেন, 'ওরে রমু, টাকার গোলমাল কি করে' মিট্‌ল রে? মাধব কোথায় টাকা পেলে?' 'সে বর নয় জ্যেঠাইমা, আমাদের বিনোদ কমলাকে বিয়ে কর্‌তে রাজি হয়েছে?' 'এঁ্যা,—বলিস্ কিরে? কমলার এমন ভাগ্যের জোর তাতো জানিনে রে!'

কমলার মা উঠে বসে' বল্লে, 'ও ঠাকুরঝি, একি সত্যি কথা! বিনোদ আমার জামাই হবে?' 'হ্যাঁলো হাঁ, এখন উঠে জামাই বরণ করে' নে।'

রমু বল্লে, 'যাই আমি বিনোদকে নিয়ে আসি', বলে' বাইরে গিয়ে দেখ্‌লে শ্যামলাল বাবুর হাতে ধরে' মাধব বাবু বলছেন, 'আমার এই শুভ কাজে, আপনাকে আমি না খাইয়ে ছাড়্‌ব না, শ্যামলাল বাবু। আপনার সঙ্গে এতগুলি লোক এসেছে সব কি উপোস করে' থাক্‌বে? আমার এত আয়োজন সব পুকুরে ঢাল্‌ব এওকি একটা কথা!'

রমু বল্লে, 'কাকা, আমি বিনোদকে ভিতরে দিয়ে এখনি আস্‌ছি, আপনি জমিদার মশায়কে কিছুতেই যেতে দেবেন না।' 'কিন্তু মাধব বাবু, আমি তো বলেইছি আজ রাতেই মাণিকের বিয়ে না দিয়ে জলগ্রহণ কর্‌ব না, তার উপায়?' 'মেয়ের অভাব কি মশায়! আমার বাড়িতেই মেয়ে আছে, আপনি দেখুন পছন্দ হয় বিয়ে দেবেন।'

এদিকে বিনোদের তখন ছাউনি নাড়া হ'য়ে গেছে। সভায় এসে বসে' বিয়ে হ'চ্ছে। রমানাথকে ডেকে মাধব বাবু কুসুমকে ডাক্‌তে বল্লেন। তার পর কুসুমকে শ্যামলাল বাবুর কাছে বসিয়ে দিয়ে বল্লেন, 'এই আমাদের কুসুম, যদি পছন্দ হয় বৌ করুন, কিন্তু,—' 'আর কিন্তু নয় মাধব বাবু, আমি বুঝেছি। এই মেয়েটিই নেব।'

মাধব বাবু বল্লেন, 'তা বেশ, আর ওই সঙ্গে সেই ৮০০শ টাকা যা আপনাকে দিয়েছি তাও নিন।' বলে' রমুকে ডেকে মাণিককে নিয়ে যেতে বল্লেন।

শ্যামলাল বাবু বল্লেন, 'দেখ মাধব, তুমি মনে করেছ সকল বিষয়ে আমাকে জিত্‌বে? সে হ'চ্ছে না হে, আমি একপয়সা না নিয়ে বিয়ে দেব, বুঝ্‌লে।' 'কিন্তু আমি যে টাকাটা আপনার নামে সবার সামনে দিয়েছি, তার কি হবে?' 'বেশ টাকাটা আমি নেব; তার জন্ত কি হয়েছে।'

এ দিকে তিনকড়ি গিয়ে দিদিমাকে বল্লে, 'ও দিদিমা, কুসুমেরও বিয়ে।' 'দূর ছোঁড়া, কুসুমের বিয়ে কোথায়?'

মাণিককে নিয়ে রমানাথ এসে বল্লে, 'ও খুড়ীমা এই কুসুমের বর এসেছে— বরণ কর।'

সকলেই অবাক হ'য়ে গেল! কমলার মা তাড়াতাড়ি এসে মাণিককে বরণ কর্‌তে লাগ্‌লেন। কুসুমকে চেলি পরিয়ে ফুলের মালা চন্দন দিয়ে সাত পাক ঘুরিয়ে শুভদৃষ্টি করা হ'ল। তারপর তিনকড়ি বর-ক'নেকে বাইরে নিয়ে এল। ফটিক আর বিশু বরযাত্রীদের খাওয়াতে গেল।

এদিকে বিনোদ আর কমলার তখন বিয়ে হ'য়ে গেছে। তারা উঠে মাধব বাবুকে প্রণাম কর্‌লে। তিনি তখন মেয়ে-জামাইয়ের হাত ধরে' শ্যামলাল বাবুর কাছে নিয়ে গিয়ে বল্লেন, 'বাবা বিনোদ, মা কমলা, এস এই তোমাদের জ্যেঠা মশায়কে প্রণাম কর।'

বিনোদ আর কমলা প্রণাম করে' উঠ্‌তে, শ্যামলাল বাবু আশীর্ব্বাদ করে', সেই টাকার থলিটি কমলার হাতে দিয়ে বল্লেন, 'এই নাও মা, তোমার যৌতুক। তোমার বাবা আমাকে সকল বিষয়ে হারাতে চান, তা আর হ'চ্ছে না, মা।'

কমলা নীচু হ'য়ে পায়ের ধূলো নিয়ে মাথায় দিলে। 'যাও মা, তোমরা এখন ভিতরে যাও', বলে' শ্যামলাল বাবু তাদের নিয়ে যেতে বল্লেন।

মাণিকের বিয়ে হ'য়ে যেতে, বর-ক'নেদের বাসরে বসান হ'লো। তারা দিদি নাত্‌জামায়ের কাছে গিয়ে বস্‌লেন। বিনোদ বল্লে, 'দিদিমা, কুসুমের বিয়েটা কি রকম হ'লো বল দেখি?' 'ও ভাই নাত্‌জামাই, এ যেন ঠিক ওঠ্‌ ছুঁড়ি-তোর-বিয়ে—কেমন?' 'ঠিক বলেছ দিদিমা', বলে' বিনোদ খুব হাস্‌তে লাগ্‌ল। শেষে মেয়েরা বিনোদকে গান করিয়ে তবে ছাড়্‌লে। তারপর খাওয়া-দাওয়া চুক্‌তে ভোর হ'য়ে গেল। যে যেখানে পেলে শুয়ে পড়ে' ঘুমুতে লাগ্‌ল।

নয়

পরদিন সকালে, বেলা তখন ৭টা, বেহারী বাবু চা খাচ্ছেন; ভুতো তামাক দিয়ে এবং খবরের কাগজখানি তাঁর হাতে দিয়ে একটি প্রণাম করে' চলে' গেল। বেহারী বাবু একচুমুক চা খেয়ে কাগজ পড়্‌তে লাগ্‌লেন। হঠাৎ এক জায়গায় চোখ পড়্‌তে চম্‌কে উঠে', 'ভুতো, এই ভুতো', বলে' ডাক্‌তে লাগ্‌লেন। ভুতো এসে দাঁড়াতে, বল্লেন, 'এই শীগ্‌গির ব্রজকে ডাক্।' ভুতো ছুটতে ছুটতে চলে' গেল।

ব্রজলাল তখন ঘরে চা খাচ্ছিল, উমা কাছে বসে' চা ঢেলে তৈরী করে' ব্রজলালের হাতে সবে দিয়েছে। এমন সময় ভুতো এসে বল্লে, 'বাবু ডাক্‌ছেন, চলুন।' 'আচ্ছা আমি এখনি যাচ্ছি', বলে' তাড়াতাড়ি চা-টা ঠাণ্ডা করে' খেয়ে বাইরে গেল।

'আমাকে ডাক্‌ছেন, বাবা?' বলে' ব্রজ পিতার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। বেহারী বাবু একখানা চেয়ার দেখিয়ে দিয়ে বল্লেন, 'বোস, কাগজের এইখানটা পড়ে' দেখ', বলে' কাগজখানা ব্রজলালের হাতে দিয়ে বল্‌লেন, 'চেঁচিয়ে পড়।' ব্রজ পড়্‌তে লাগ্‌ল—

"**বিবাহে গোলযোগ**—গতকল্য কুসুমপুর গ্রামে, মাধব গাঙ্গুলীর কন্যা কমলা দেবীর বিবাহে বড়ই গোলযোগ হইয়া গিয়াছে। বরপণের ২০০ টাকা কম হওয়াতে, বরকর্ত্তা মাধব বাবুর কন্যার সহিত পুত্রের বিবাহ দিতে চাহেন নাই ও মাধব বাবুর অতিশয় অপমান করিয়া পুত্র লইয়া চলিয়া যাইতে চাহেন। বিবাহক্ষেত্রে বিনোদলাল নামে একটি যুবক উপস্থিত ছিলেন। তিনি ভদ্রলোকের এই বিপদ্ দেখিয়া কমলা দেবীকে বিবাহ করিয়া, কন্যার পিতাকে এই বিপদ হইতে রক্ষা করিয়াছেন। আমরা যুবকের এই সৎসাহসের জন্য অন্তরের ধন্যবাদ জানাইতেছি।—ইত্যাদি।"

ব্রজলাল কাগজখানি পিতার হাতে দিয়ে বল্লে, 'তাইতো! কিছু বোঝা যাচ্ছে না।—বিনোদ তো আজ ক'দিন হ'লো কুসুমপুরে গেছে।'

এমন সময় ভুতো একখানা টেলিগ্রাম দিলে এসে। 'এটা বিনোদের টেলিগ্রাম্ বোধ হ'চ্ছে, সেই করেছে নিশ্চয়', বলে' খামটা ছিঁড়ে ব্রজলাল পড়ে' বল্লে, 'বিনোদ কাল ৪টের সময় ষ্টেশনে গাড়ী পাঠাতে লিখেছে, বাবা। আর লিখেছে চিঠি পরে আস্‌বে। আমার মনে হয়, ওরি বিয়ে হয়েছে; দেখা যাক্ চিঠিতে কি লেখে।' 'এদিকে তোমার মা যে অবিনাশ বাবুর মেয়ের সঙ্গে বিয়ের সব ঠিক করেছেন! তাঁকে এখন কি বলা যায়?' 'মাকে এখন কিছু বলে' কাজ নেই, কাল চিঠি এলে বলা যাবে তখন।' 'সেই ভাল; আচ্ছা তুমি এখন যাও।' 'আপনার সঙ্গে একটা কথা আছে।' 'কি বল্‌বে বল।' 'দেখুন, সুরমার এইবার বিয়ে দিলে হয় না?' 'তা তো হয়, কিন্তু ছেলে কই?' 'একটি ছেলেকে আমি জানি, আপনার যদি মত হয় তো দিতে পারেন।' 'কে বল দেখি ছেলেটি?' 'বিনোদের বন্ধু রমানাথ। খুব ভাল ছেলে, বি-এ পড়্‌ছে। এখানে বিনোদের সঙ্গে মাঝে মাঝে আসে, তাই দেখেছি; দেখ্‌তেও বেশ সুন্দর। তার বিলেত যাবার ইচ্ছে আছে। সুরমার সঙ্গে বিয়ে দিয়ে বিলেত পাঠালে ভাল হবে।' 'তা দেখো না চেষ্টা করে', ছেলে যদি ভাল হয় দিতে বাধা কি।' 'আচ্ছা, বিনোদ এলে ঠিক করা যাবে—' বলে' ব্রজ উঠে গেল।

দশ

পরদিন সকালে বিনোদের চিঠিখানি হাতে করে' বেহারী বাবু বাড়ীর ভিতর গিয়ে, সুরমাকে সামনে দেখে বল্লেন, 'ওরে তোর মা কোথা রে?' 'মা পূজো কর্‌ছেন, বাবা।' 'আচ্ছা আমি ঘরে বস্‌ছি, পূজো হ'লে বলিস্।' 'আচ্ছা', বলে' সুরমা পূজো হয়েছে কিনা দেখ্‌তে গেল।

মায়ের তখন পূজো হ'য়ে গেছে, তিনি ঠাকুরকে প্রণাম করে', বাইরে এসে সুরমাকে দেখে তার হাতে দুখানি বাতাসা দিলেন। বাতাসা দুখানি নিয়ে মাথায় হাত মুছে সুরমা বল্লে, 'মা, বাবা তোমাকে খুঁজ্‌ছিলেন।' 'কই রে? কোথায় তিনি?' 'ঘরে আছেন, মা।' 'আচ্ছা, তুই বল্‌ গে', আমি কাপড় ছেড়ে আস্‌ছি।'

কাপড় ছেড়ে ঘরে গিয়ে দেখ্‌লেন, বেহারী বাবু একখানি চিঠি পড়্‌ছেন। দেখে বল্লেন, 'আমাকে খুঁজ্‌ছিলে কেন গো?' 'খুঁজ্‌ছিলুম, বৌভাতের জোগাড় কর্‌বে, তাই।' 'কার বৌভাত?—তোমার নাকি?' 'আমার হ'লে কি তোমাকে বলি? তোমার বিনোদ—কুসুমপুরে বিয়ে করেছে যে!' 'আহা, সকাল বেলা আর কোন কথা পেলে না? মিছে-কথাগুলো বল্‌তে এলে কেন?' 'মিছে-কথা বল্‌ব কেন গো? বিশ্বাস না হয় এই চিঠিটা পড়ে' দেখ না,—আর এই খবরের কাগজ দেখ।' বলে' চিঠি দিলেন। কমলার মা চিঠিখানি মনে মনে পড়ে' বল্লেন, 'তাই তো! সত্যিই বিয়ে হয়েছে দেখ্‌ছি। আমি এখন দিদিকে কি বলি? দিদির ভাসুরের মেয়ের সঙ্গে কথা দিয়েছি, তারা কি ভাব্‌বে?' 'তা' ছেলের মত না জেনে কথা দিয়েছিলে কেন? এখন আর ভাব্‌লে কি হবে। বিনোদ চারটের ট্রেনে আস্‌ছে বৌ নিয়ে, বুঝেছ।' 'তাতো চিঠিতেই দেখেছি গো, তুমি আর বল্‌ছ কি। যাই বৌমাকে বলিগে', বৌ বরণ করে' তুল্‌তে হবে তো? বরণের সব গোছাক্।' বলে' ঘর থেকে চলে' গেলেন।

উমা বিনোদের বিয়ে হয়েছে শুনে খুব খুসী হ'য়ে সুরমাকে নিয়ে বরণের সব গোছাতে লাগ্‌ল।

চারটের সময় বিনোদ কমলাকে নিয়ে মোটরে ক'রে এসে উপস্থিত হ'ল। সকলেই বৌ দেখতে ছুট্‌ল। বিনোদের মা গিয়ে বৌয়ের মুখে একটু মধু দিয়ে গাড়ী থেকে নামিয়ে নিলে। বৌ দেখে তিনি খুব খুসী হ'লেন। রমানাথ, বিশু, তিনকড়ি ফটিক সঙ্গে এসেছিল। উমা বৌয়ের হাত ধরে' উপরে নিয়ে গেল। সকলেই বল্লে, খুব সুন্দর বৌ হয়েছে। উমা একচোট ঠাট্টা ঠাকুরপোকে করে' নিলে।

তার পর—বেহারী বাবুর রমানাথকে দেখে পছন্দ হ'লো। হরনাথ বাবুর মত নিয়ে বিনোদের বিয়ের একমাস পরেই খুব ধুম করে' সুরমার সঙ্গে রমানাথের বিয়ে হ'য়ে গেল। বিয়েতে হরনাথ বাবু, মাধব বাবু শ্যামলাল বাবু সকলেই এসেছিলেন। জ্যেঠাইমা, পিসিমা, তারা-দিদি, কমলার শ্বশুরবাড়ী দেখে অবাক হ'য়ে চেয়ে রইলেন। এত বড় বাড়ী—এত লোকজনে ভরা—ক'ন দেখেন নি। তার উপর বিজলীবাতি য'ন জ্বলে' উঠ্‌ল, তখন তাঁদের বিস্ময়ের সীমা পরিসীমা রইল না।

বিয়ের কিছুদিন পরে রমানাথ তিন বছরের জন্যে বিলেত চলে' গেল।
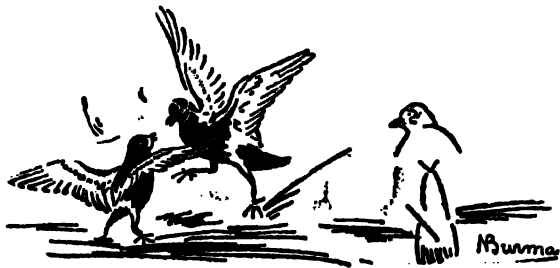
স্বর্ণকুমারী পৃষ্ঠা

স্বর্ণকুমারী দেবী

স্বর্ণকুমারী দেবী তিরোহিতা হইয়াছেন—বঙ্গান্তঃপুরপ্রতিভার একটি পবিত্র রশ্মি পরম জ্যোতিঃপ্রবাহে মিশিয়া গেল। শোকের কোন কারণ নাই,—ভগবদ্ধ্যানে আত্মসমাহিত হওয়া প্রয়োজন। ভগবান্ তাঁর আত্মার কল্যাণ করুন। আমরা শুধু বলি—

অমৃত-লোক, হে বিদেহ আত্মা,
তোমার সম্মুখে;
বৈতরণী পার হ'য়ে যাও, যাও সুখে।

'বিংশপূর্ব্ব শতাব্দীশেষার্দ্ধে যে উগ্র আলোক-রশ্মি সমুদ্রপারের আকাশ হইতে বাংলার গৃহাঙ্গনে পতিত হইয়াছিল, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের তপস্যার হোমশিখায় দ্বিজত্ব লাভ করিয়া সেই আলোক-রশ্মিরই একটি স্ফুলিঙ্গ এই অন্তঃপুরপ্রতিভার প্রাণের-প্রদীপ প্রজ্জ্বলিত করিয়া দিয়াছিল।

বাংলার আদি মহিলা-ঔপন্যাসিকা, সর্ব্বপ্রথম সাময়িক পত্রিকা সম্পাদিকা, সঙ্গীত, প্রহসন, আখ্যায়িকা প্রভৃতির বিশিষ্টা রচয়িত্রীরূপেই তিনি আমাদের স্মরণীয়া নহেন,—সমাজ-সংস্কারের পথে অগ্রবর্ত্তিনীরূপে তিনি যে সেই যুগে হাসিমুখে কত নিন্দা-দুঃখ-অপমান বরণ করিয়া লইয়া এ যুগের মহিলা-সমাজের জন্য চলিবার পথ সুগম করিয়া দিয়া গিয়াছেন, সে কথা সর্ব্বাগ্রে আমাদের স্মরণ করিতে হইবে। 'মহিলা শিল্প-মেলা', 'সখী-সমিতি' প্রভৃতি নারীকল্যাণ-সংঘের প্রবর্ত্তিকারূপেও তিনি আমাদের নমস্যা এবং পূজনীয়া।

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে সুবিখ্যাত জগত্তারিণী পদক প্রদান করিয়া সম্মান জ্ঞাপন করেন; কিন্তু জনসাধারণের পক্ষ হইতে সাধারণভাবে তিনি কোন যশ-জয়ন্তী পর্ব্বে আমন্ত্রিত হইলেন না, ইহা দেশের ও সমাজের পক্ষে গভীর ক্ষোভের বিষয় বলিয়া মনে করি। যদিও আমরা জানি, তিনি এই সব পার্থিব সমারোহ ও সম্মানের বহু উর্দ্ধেই বিরাজ করিতেন।

তাঁর বিষয় বলিতে গেলে আরও অনেক কিছুই বলিতে হয়। কিন্তু এখন তাহা নিষ্প্রয়োজন।

ভগবান্ তাঁর অমৃতলোকবর্ত্তী ঊর্দ্ধ আত্মার কল্যাণ করুন।

—বঃ সঃ—

মহীয়সী স্বর্ণকুমারী

শ্রী সুরমাসুন্দরী ঘোষ

ভারত সাহিত্যাকাশে
হে জ্যোতিষ্করাণী,
সহসা পড়িলে খ'সে—
জননী! কল্যাণী!
কাব্য কথা-ব্রততীর
ছিন্ন সে মুকুল ;

আর ফুটিবে না হেথা
সে সুরভি ফুল।
হ'য়ে গেল চিরতরে
প্রদীপ নির্ব্বাণ,—
করিবে না পূর্ণ কেহ
তব শূন্য স্থান।

মায়ের ছেলে

কুমারী প্রীতিলতা বসু

ছোট গ্রাম, গ্রামের ধারে পুকুর, পুকুরের পাশ দিয়ে একটি সরু মেঠো রাস্তা এঁকে বেঁকে চলে' গেছে। রাস্তার ধারে একখানি কুটীর—তার প্রায় অর্দ্ধেক ভূমিসাৎ হ'য়ে গেছে। কুটীরে একটি দরিদ্র বিধবা তাঁর ছেলে কমলকে নিয়ে বাস করেন।

লোকের বাড়ীর ধান ভেনে রাঁধুনির কাজ করে' বিধবা কোনরকমে তাঁর সেই ছোট্ট সংসারখানি চালান।

কমল গ্রামের পাঠশালায় পড়ে। গুরু মহাশয় তাকে বড় ভালবাসেন। সে পাঠশালার সমস্ত ছেলেদের চেয়ে ভাল। আজ তার ভারী আনন্দ হয়েছে, সে বাড়ী ফিরে এসে মাকে বল্লে, "মা, আজ আমি সমস্ত ছেলেদের চেয়েও ভাল পড়া দিতে পেরেছি। তাই গুরুমহাশয় আমার খুব প্রশংসা করেছেন আর বলেছেন, এই রকম মন দিয়ে পড়্‌লে আমি অল্পদিনের মধ্যেই সহরের স্কুলে পড়্‌তে পারব।" মা আনন্দে চোখের জলে ভেসে বল্লেন, "হ্যাঁ বাবা, মন দিয়ে লেখাপড়া কর', মানুষ হ'তে পারবে। গুরুজনের কথা শুনো, ভগবান তোমায় আশীর্ব্বাদ করবেন।" এই রকম করে' সুখে দুঃখে তাঁদের দিন কাটতো।

একদিন সত্যি সত্যি কমল আনন্দে লাফাতে লাফাতে এসে তার মায়ের কাছে বল্লে, "মা, গুরুমশায় বল্লেন আমার এখানকার পড়া শেষ হ'য়ে গেছে। আমি এবারে সহরের স্কুলে পড়্‌তে যাব।"

আজ তার বুকভরা আনন্দ,—মন দৃঢ়তা ও প্রফুল্লতায় পূর্ণ। কুঁড়ে ঘরের চারিদিকে কতকগুলি ফুলের গাছ সে নিজের হাতে লাগিয়েছিল, সেগুলিতে যত্ন করে' জল দিলে। লাউ, কুমড়োর গাছে মাচা তুলে দিয়ে বল্লে, "মা, তুমি এই লাউ কুমড়ো বিক্রি করে' নিজের খরচ চালিও, আর পরের বাড়ীতে চাকরি করতে যেও না। আমি পড়া শেষ করে' যখন রোজগার করতে আরম্ভ করব, তখন তোমার একটু কষ্টও থাকবে না।" মা আনন্দে অধীর হ'য়ে বল্লেন, "সব সময়ে এই রকম ভাব অন্তঃকরণে নিয়ে, ভগবানে নির্ভর করে' কাজ করিস্—তোর কোন বিপদ হবে না।"

কয়েকদিন পরে কমল মায়ের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে সহরের স্কুলে পড়্‌তে গেল। কমল পাড়াগাঁয়ের ছেলে; সহরের কৃত্রিমতা দেখে নিজের গ্রামের প্রাকৃতিক শোভা, সেই খোড়ো বাড়ীর কথা, বাড়ীর পাশে মেঠো

রাস্তার ধারে ফুলের গাছগুলির কথা,—মায়ের কথা সবই সে ভুলে গেল। এখানে অনেক বন্ধুবান্ধব পেয়ে খুব উৎসাহের সহিত সে নিজের লেখাপড়া কর্‌তে লাগ্‌লো।

কিছুদিন পরে সে একদিন রাত্রে শুয়ে শুয়ে স্বপ্ন দেখ্‌ছে যে, তাদের গ্রামের সেই কুঁড়ে ঘরখানি জরাজীর্ণ হ'য়ে গেছে, ঘরের মেঝেতে তার মা রোগের যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ কর্‌ছেন, তাঁর মুখে একবিন্দু জল দেবারও কেউ নেই! চারিদিক জঙ্গলা মড়কে ছেয়ে গেছে। তারপর, তার ঘুম ভেঙে গেল। উঠে দেখ্‌লে ভোর হ'য়ে গেছে। স্বপ্নের কথা ভেবে তার মন খুবই খারাপ হ'য়ে গেছ্‌লো। মায়ের জন্যে তার মন কেঁদে কেঁদে উঠ্‌ছিলো।—সে আর কোন দিকে না তাকিয়ে কারুকে কোন কথা না বলে'ই, গ্রামের রাস্তা ধরে' বেরিয়ে পড়্‌লো।

সে সময় ট্রেন কিম্বা মোটর কিছুই ছিল না। কোথাও যাবার দরকার হ'লে হেঁটে কিম্বা গরুর গাড়ী করে' যেতে হ'ত। গরুর গাড়ী করে' গেলে তার আবার ভাড়া লাগ্‌বে। কমল গরীবের ছেলে, সে অত ভাড়া দিতে পার্‌বে না,—তাই সে হেঁটেই যেতে লাগ্‌লো। ক্রমাগত দুই তিন দিন হাঁট্‌বার পর সে তার পূর্ব্বপরিচিত কুঁড়ে ঘরের কাছে এসে পৌছলো। মায়ের জন্যে মন তার ভয়ানক ব্যকুল হ'য়ে উঠেছিলো। সে আর স্থির থাক্‌তে পার্‌লে না। যত শীঘ্র পারে পা চালিয়ে কুঁড়ে ঘরে এসে পৌছলো সারাপথ হেঁটে এসে তার শরীর খুবই ক্লান্ত হ'য়ে পড়েছিল। ঘরে ঢুকে দেখ্‌লে তার মা মেজেতে শুয়ে রয়েছেন, ভাব্‌লো, বুঝি তিনি ঘুমুচ্ছেন। সে একটু আশ্বস্ত হ'য়ে মুখহাত ধুয়ে এসে মায়ের মাথায় হাত বুলুতে লাগ্‌লো। কিন্তু গায়ে হাত দিয়েই সে চম্‌কে উঠ্‌লো,—নাকের কাছে হাত দিয়ে দেখ্‌লে, নিশ্বাস নাই। তখন তার আর বুঝ্‌তে বাকি রইল না যে, তার মা চিরনিদ্রায় নিদ্রিত হয়েছেন। কখন যে তিনি এই শোকদুঃখপূর্ণ পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়ে সেই শান্তিধামে চলে' গেছেন, তা সে জান্‌তেই পারে নি। শোকে অধীর হ'য়ে মা, মা বলে' কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে কমল মায়ের শবের উপর লুটিয়ে পড়্‌লো।*

* খুব ছোট একটি বালিকার রচনা।

কেন্দ্রসমিতির কথা

শোক-সভা

গত ১৭ই জুলাই রবিবার সরোজনলিনী দত্ত নারী-মঙ্গল সমিতির কার্য্যালয়ে ৺চন্দ্রমাধব ঘোষের অকালে পরলোক গমনের জন্য একটি শোক-সভার অধিবেশন হইয়াছিল। মাননীয় রাজা স্যার মন্মথনাথ রায় চৌধুরী এম, এল, সি, সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। মিঃ কে, সি, রায় চৌধুরী, এম, এল সি ; মিঃ এইচ, কে, দে, বার এট্-ল ; রায় বাহাদুর আই, এস, মুখোপাধ্যায় ; শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ বক্সী ; মিঃ ও মিসেস জোহা ; ডাঃ এস, কে, বসু, ডি, ও ; শ্রীযুক্ত সদয়কালী চট্টোপাধ্যায় ; শ্রীযুক্তা প্রতিভা সেন ; শ্রীযুক্ত বিনোদ বসু ; শ্রীযুক্ত রাধিকাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় ; মিঃ ডি, সি, বসু ; শ্রীযুক্ত হিমাদ্রিভূষণ রায় ; শ্রীযুক্তা সুকুমারী চৌধুরী প্রমুখ ভদ্রমহোদয় ও মহিলাগণ এবং স্কুলের ছাত্রী ও শিক্ষয়িত্রীগণ সভায় উপস্থিত ছিলেন। শ্রীযুক্তা হেমনলিনী মল্লিক ও শ্রীযুক্তা অমিয়প্রভা বসুর নেত্রীত্বে সরোজনলিনী নারী-শিল্প-শিক্ষালয়ের কয়েকজন ছাত্রী "কোন্ আলোকে প্রাণের প্রদীপ জ্বালিয়ে তুমি ধরায় আস" নামক সুন্দর সঙ্গীতটি গান করেন। তৎপরে শ্রীযুক্ত মাণিকলাল দে একটি সুন্দর কীর্ত্তন গান করেন।

ইহার পর শ্রীযুক্তা হেমলতা দেবী ৺চন্দ্রমাধব বাবুর স্বর্গীয় আত্মার প্রীতি ও শান্তিকামনায় ভাবগম্ভীর ও মর্ম্মস্পর্শী ভাষায় একটি সুন্দর প্রার্থনা করেন।

রায় শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বাহাদুর নিম্নলিখিত প্রস্তাব উপস্থাপিত করেন—সরোজনলিনী দত্ত নারীমঙ্গল সমিতির অন্যতম সহযোগী সম্পাদক এবং ইহার অকৃত্রিম হিতৈষী ৺চন্দ্রমাধব ঘোষ মহাশয় অকালে পরলোক গমন করায় সমিতির যে ক্ষতি হইল তাহা পূর্ণ হইবার নয়।

তিনি সমিতির ভিতর দিয়া নারীসমাজের উন্নতির জন্য অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং বিভিন্ন জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের ভিতর দিয়া আপনার কর্ম্মশক্তির প্রভাবে দেশের উন্নতির কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। সমিতির সভ্যগণের এই সভা তাঁহার এই অকাল মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করিতেছে এবং তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গকে আন্তরিক সহানুভূতি জ্ঞাপন করিতেছে।

শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, এম, এ, বি, এল, মহাশয় উপরোক্ত প্রস্তাব সমর্থন করিয়া চন্দ্রমাধব বাবুর অমায়িকতা, সৌজন্য, কর্ম্মশক্তি প্রভৃতি গুণাবলীর উল্লেখ করিয়া একটি সুন্দর বক্তৃতা করেন।

শ্রীযুক্তা নীরজবাসিনী সোম, বি, এ বি, টি, মহাশয়া তাঁহার স্মৃতিরক্ষার জন্য নিম্নলিখিত প্রস্তাব উপস্থিত করিয়া হৃদয়গ্রাহী ভাষায় চন্দ্রমাধব বাবুর অকাল মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেন।

"৺চন্দ্রমাধব ঘোষ মহাশয়ের স্মৃতি চিরস্থায়ী করিবার জন্য সমিতির কার্য্যালয়ে তাঁহার একখানি তৈলচিত্র প্রতিষ্ঠা ও তাহার নিম্নে একটি প্রস্তরফলক স্থাপন করা হউক এবং তাঁহার উপযুক্তরূপ স্মৃতিরক্ষার জন্য অর্থ-সংগ্রহ করা হউক।

তিনি আরও ঘোষণা করেন যে স্কুল কমিটি ইতিপূর্ব্বেই সরোজনলিনী নারী-শিল্প-শিক্ষালয়ে চন্দ্রমাধব বাবুর স্মৃতি রক্ষার জন্য "চন্দ্রমাধব বৃত্তি" নাম দিয়া দুইটি বিধবা ছাত্রীকে বিনাখরচে পড়িবার ব্যবস্থা স্থির করিয়াছেন।

মিঃ টি, সি, বসু উপরোক্ত প্রস্তাব সমর্থন করেন।

তৎপরে সভাপতি মাননীয় রাজাবাহাদুর চন্দ্রমাধব বাবুর গুণাবলী, সমিতির কার্য্যের প্রতি তাঁহার গভীর শ্রদ্ধা এবং তাঁহার অকালে পরলোক গমন করায় সমিতির অপরিসীম ক্ষতির বিষয় উল্লেখ করিয়া সুন্দর ও মর্ম্মস্পর্শী ভাষায় শোক প্রকাশ করেন।

পরিশেষে রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় আবেগময়ী ভাষায় উপস্থিত ভদ্রমণ্ডলীকে চন্দ্রমাধব বাবুর স্মৃতিরক্ষার জন্য অর্থ সংগ্রহের জন্য আবেদন করেন।—

বিশিষ্ট জনৈক বন্ধু	১০০৲
শ্রীযুক্ত গুরুসদয় দত্ত, আই, সি, এস	১০০৲
মিঃ কে, সি, রায় চৌধুরী এম, এল, সি	১০০৲
চন্দ্রমাধব বাবুর বন্ধু ও আত্মীয়বর্গ	১০০৲
মিঃ এন, বি, বক্সী, আই, সি, এস	৫০৲
শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ বক্সী	৫০৲
রায় বাহাদুর অবিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত বৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	৩০৲
শ্রীযুক্তা নীরজবাসিনী সোম	২৫৲
মিঃ এইচ, কে, দে, বার-এট্-ল	১৫৲
রায় বাহাদুর আই, এস্, মুখোপাধ্যায়	১৫৲
ডাঃ এইচ, এন, রায়	১০৲
মিঃ টি, সি, বসু	৫৲
শ্রীযুক্ত মনোজ বসু	৫৲
শ্রীযুক্তা হেমলতা দেবী	৫৲
শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার	৫৲
মিসেস কাজিতুলনেসা জোহা	৫৲
শ্রীমতী হেমনলিনী মল্লিক	৫৲
শ্রীযুক্ত মাণিকলাল দে	৫৲
শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রপ্রসাদ সিংহ	২৲
শ্রীমতী প্রতিভা সেন, বি, এ	২৲
মিঃ এ, সি, গুপ্ত	২৲
শ্রীমতী মাতঙ্গিনী রায়	২৲
রায় বাহাদুর এস, সি, ব্রহ্মচারী	২৲
মিঃ বি, এম, দাস	২৲
শ্রীমতী সুহাসিনী চৌধুরী	১৲

পরিশেষে শ্রীযুক্ত মাণিকলাল দে মহাশয় একটি সুন্দর ও মর্ম্মস্পর্শী ভগবদসঙ্গীত করিলে সভা ভঙ্গ হয়।

কস্‌বা মহিলাসমিতি

গত ৯ই জুলাই শনিবার—কস্‌বা মহিলাসমিতির উদ্যোগে সমিতির গৃহে একটি মহিলাসভার অধিবেশন হয়। কেন্দ্রসমিতি হইতে পণ্ডিত কামাখ্যাচরণ শাস্ত্রী, শ্রীযুক্ত ননীগোপাল গোস্বামী, এম, এ, এবং শ্রীমতী অমলা সরকার সভায় যোগদান করেন। সভায় ম্যাজিক লণ্ঠন যোগে

বিভিন্ন মহিলাসমিতির কার্য্যপ্রণালী দেখাইয়া সমিতি কিরূপে সুগঠিত করিতে হয় সে বিষয়ে বক্তৃতা দেওয়া হয়।

আন্দুলে মহিলাসভা

আন্দুল মহিলাসমিতির উদ্যোগে গত ৩রা জুলাই রবিবার একটি মহিলাসভার অধিবেশন হয়। গ্রামের বহু মহিলা ও ভদ্রমহোদয় সভায় যোগদান করেন। সরোজ-নলিনী নারীমঙ্গল সমিতির প্রচারক শ্রীযুক্ত ননীগোপাল গোস্বামী, এম, এ, ম্যাজিক লণ্ঠন সাহায্যে মহিলাসমিতি গঠনের উপযোগিতা সম্বন্ধে একটি চিত্তাকর্ষক বক্তৃতা করেন।

ডাফ্ স্কুলে সভা

সরোজনলিনী নারীমঙ্গল সমিতির প্রচারক শ্রীযুক্ত ননীগোপাল গোস্বামী, এম, এ, গত ৬ই জুলাই কলিকাতায় ডাফ্ বালিকাবিদ্যালয়ে ম্যাজিক লণ্ঠন যোগে স্বাস্থ্যরক্ষা বিষয়ে একটি বক্তৃতা করেন।

মহিলাসমিতি পরিদর্শন

গত ১২ই জুন কেন্দ্রসমিতির অন্যতমা সহযোগী সম্পাদিকা শ্রীযুক্তা নীরপ্রভা চক্রবর্ত্তী কলিকাতার শ্যামপুকুর মহিলা সমিতি পরিদর্শন করেন। তিনি উপস্থিত মহিলাগণকে সমিতি কিরূপে সুপরিচালনা করিতে হয় সে বিষয়ে উপদেশ প্রদান করেন।

Printed by A. C. Sirkar at the Classic Press. 9-3 Ramanath Majumdar Street Calcutta. and published by him, at 45 Beniatola Lane, Calcutta.

লক্ষ্মী-নারায়ণ

(ঘরের দেয়ালে অঙ্কিত চালচিত্র)

শিল্পী—শ্রী ব্রজগোপী দেবী

Printed by C. H. Aran & Co.

"বাঁচ্‌লে সবাই তবেই বাঁচি,—
সবার ভালো তাই ত' যাচি।"

৭ম বর্ষ] ভাদ্র, ১৩৩৯ [দশম সংখ্যা

সমাজে নারী

স্বামী জগদীশ্বরানন্দ

'হে জগজ্জননী, প্রত্যেক স্ত্রীলোক তোমার অংশ ও প্রতিমূর্ত্তি।'—চণ্ডী।

যে সমাজে নারীর স্থান যত উচ্চে সেই সমাজ তত সভ্য ও উন্নত। বিভিন্ন সমাজের সহিত হিন্দু-সমাজের তুলনা করিয়া আমরা দেখিব—সমাজে নারী কোথায় কিরূপ সম্মান ও পূজা পাইতেছেন। এই নারী-জাগৃতির যুগে নারী-সমস্যা-সমাধানে উহা অনেক পরিমাণে সহায়ক হইবে মনে হয়।

ইংরাজ রমণী মনোনীতা হইলে পার্লিয়ামেণ্টের সভ্যা হইতে পারেন; ইহা বর্ত্তমানে আইন-সঙ্গত ও আইন-সম্মত হইয়াছে। অপরদিকে নব্য-আবিসিনিয়ার কৃষক লাঙ্গলের একদিকে নারী ও অন্যদিকে গর্দ্দভ জুড়িয়া ভূমিকর্ষণ করে। এই দুই উচ্চতম ও নিম্নতম স্তরের মধ্যে দেশ-বিশেষে নানা তারতম্য দৃষ্ট হয়। ফরাসী-রমণী বিবাহিতা হইলে যথেষ্টরূপ উত্তরাধিকার হইতে বঞ্চিতা হন। হিন্দুরমণীর বিবাহিত বা অবিবাহিত কোন অবস্থাতেই পৈতৃক সম্পত্তিতে অধিকার নাই। আবার আন্দামান-দ্বীপনিবাসী, স্ত্রীর অসম্মতিক্রমে কোন সম্পত্তি গ্রহণ করিতে পারে না। অপর দিকে মার্কিন-রমণী নাকি বিবাহিতা হইলেও সহোদরবৎ পৈতৃক ধনে বঞ্চিতা হন না।

বর্ত্তমান সমাজের কথা ছাড়িয়া, আমরা জগতের প্রাচীন সমাজের দিকে লক্ষ্য করিলেও দেখিতে পাই—নারী তথায়ও সমাজে পুরুষের সহিত সমানাধিকার পাইবার জন্য বিদ্রোহিণী। প্রাচীন গ্রীসের বিখ্যাত লেখক হোরেশের পুস্তকে পাওয়া যায় নোবেল নাম্নী জনৈকা রমণী নিজ ভাগ্যের উপর ধিক্কার দিয়া বলিতেছেন, "পৃথিবীজাত সমস্ত বস্তুর মধ্যে নারী যেন একটি পদদলিতা বিচ্ছিন্না লতিকা।" প্রাচীন হিব্রু-জাতিতেও নারীর অতৃপ্তি দেখা যায়। ওল্ড টেষ্টামেণ্টেও দেখা যায় কোন নারী নিজ প্রতিভা ও শক্তির বলে সমাজে উচ্চাসন লাভ করিয়া যশস্বিনী হইয়াছেন। গ্রীসের শাফো ও এস্পাশিয়া এবং প্যালেষ্টাইনের

ডেবোরা ও রোমান কর্নেলিয়ার নাম উদাহরণ স্বরূপ করা যাইতে পারে। প্রাচীন সমাজের ইতিহাসের গতি সর্ব্বত্র এইরূপ। রমণী কোথায়ও শ্রদ্ধা ও ভক্তির অধিকারিণী, কোথায়ও দুঃখকষ্ট বরণ করিয়া লইয়াছে। তবে প্রাচীনতম সমাজে মাতাই গৃহের কেন্দ্র—পিতা নহে; এইরূপ পাওয়া যায়। পাশ্চাত্যে অতীত যুগের দুইটি প্রধান সভ্যতাকেন্দ্র রোম ও গ্রীসেও আমরা আশাজনক সমাধান খুঁজিয়া পাই না। রোম-রমণী অবিবাহিতাবস্থায় পিতৃআশ্রয়ের এবং বিবাহিতাবস্থায় স্বামীর আশ্রয়ের ভিখারিণী। আবার এথেন্সেও দেখা যায় নারী পর্দ্দার আড়ালে বাস করিতেন। গৃহের সীমানার মধ্যেই তাঁহার কর্ম্মক্ষেত্র নিবদ্ধ ছিল—সমাজে পুরুষই প্রধানতঃ কর্ম্মনিরত থাকিত। সমাজে আসা বা পুরুষদের সহিত আলাপ করা ভদ্রতাবিরুদ্ধ ও সভ্যতাবিরুদ্ধ উভয়ই ছিল। গ্রীসে বাল্যবিবাহ প্রচলিত ছিল; তাই বিবাহের দিন নারীর পক্ষে অতি আনন্দ ও স্বাধীনতার দিন ছিল। পঞ্চম শতাব্দীতে এই অবস্থার কিছু উন্নতি হয়। পেরিক্লিশ্ বলেন; "নারীর শক্তি ও কর্ত্তব্য সম্বন্ধে যদি বিধবাদের কিছু বলিতে হয়, আমি এককথায় এই বলিব যে, "তোমাদের হৃদয় কখনও অবনত করিও না। হৃদয়ের শক্তিতে তোমরা মহাগৌরবের অধিকারিণী হইবে।"

আবার স্পার্টার নারীসমাজ সম্পূর্ণ অন্যধরণের ছিল। তথায় নারীগণের পুরুষের সহিত সমানাধিকার ও সমাজে অবাধগতি ছিল। ব্যায়ামাগারে তাঁহারা কুস্তি ও মুষ্টিযুদ্ধও করিতেন। স্পার্টানগণ ছিল যোদ্ধার জাতি; তাই স্ত্রী-পুরুষ সকলকে উপযুক্ত সেনানীরূপে গঠন করিতে সমাজে সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করিত। বেরি সাহেব বলেন যে, "স্পার্টানগণ রমণীদের যে তেমন সম্মানের চক্ষে দেখিত তাহা নহে; তাই তাঁহারা আদর্শরমণীর আসন গ্রহণ করিতে পারেন না।"

বর্ত্তমান যুগে নারীপ্রগতি আশাতীতরূপে প্রবল হইয়েছে। কিন্তু পাশ্চাত্য সমাজের নারীর অতীত ও বর্ত্তমান অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিলে আমরা নিরাশ ছাড়া আশান্বিত হইতে পারি না। অথচ সমগ্র প্রাচ্য বিশেষতঃ ভারতরমণী আজ পাশ্চাত্য নারীর আদর্শ গ্রহণ করিতে ব্যগ্র। অবশ্য ভগ্নী নিবেদিতা যেমন বলিয়াছেন,—পাশ্চাত্যের দান যথেষ্ট; তবে পাশ্চাত্য ঐহিক নারীত্বের আদর্শ পূর্ণ করিয়াছেন—আর ভারত মাতৃত্বের তথা দেবীত্বের সর্ব্বোচ্চ আদর্শ অভিব্যক্ত করিয়াছেন। বর্ত্তমান যুগে আমরা পাশ্চাত্যকেও অগ্রাহ্য করিতে পারি না বা প্রাচীন ভারতের নারীর আদর্শও ত্যাগ করিতে পারি না। তবে সুসমঞ্জস সমাধান কোন্ পথে?

বর্ত্তমানে পাশ্চাত্য সভ্যতার অভিনব সৃষ্টি—নগ্ন-সমিতি! জার্ম্মেনি, আমেরিকা প্রভৃতিতে এই নগ্ন-সমিতির সভ্যগণ আবার আদাম-ইভের যুগে ফিরিয়া যাইতে চান!! আরও আশ্চর্য্য যে, তৎতৎদেশীয় নারীগণও উল্লিখিত সমিতির সভ্যসংখ্যা বৃদ্ধি করিতেছেন!!!

তুর্কী, আফগানিস্তান প্রভৃতি দেশের মুসলমান নারীগণ এবং সিংহল, শ্যাম, জাপান প্রভৃতি দেশের বৌদ্ধ-নারীগণও পাশ্চাত্যের নারীআদর্শ গ্রহণের অর্দ্ধপথে। হিন্দু-জগতের জননীগণ যে পাশ্চাত্য চাকচিক্যে মুগ্ধ হইয়াছেন, তাহা অত্যন্ত বাহ্যিক। পশ্চিমের মুখে হাসি কিন্তু অন্তরে আগুন! হিন্দু-নারীগণকেই জগতের নারীসমস্যা সমাধানের মহাব্রত গ্রহণ করিতে হইবে। হিন্দু-নারীর আদর্শের এক গৌরবময় যুগ অতীত হইয়াছে—সেই আদর্শকে ভিত্তি করিয়া বর্ত্তমান সভ্যতা ও জ্ঞানালোকে তাহাকে সংস্কৃত করিলেই হইবে। সিংহলেও দেখিলাম দুইজন নারী-সদস্য ষ্টেট্ কাউন্সিলে জনসাধারণ কর্ত্তৃক মনোনীতা হইয়াছেন। ভারতের নানাস্থানে গৃহের শান্তি-স্নেহ-মমতার রাজ্য ত্যাগ করিয়া নারী বহুস্থানে পুরুষের অনুকরণে সামাজিক জীবন গ্রহণ করিতেছেন; কিন্তু তাহাতে লাভ হইল—কি? পাশ্চাত্য নারীগণ প্রায় গত একশতাব্দী যাবৎ এই সামাজিক জীবন যাপন করিয়া ব্যষ্টিগত বা সমষ্টিগত কি উন্নতি সাধন করিয়াছেন?—সুতরাং সমাজে সমানাধিকার লাভ করিলেই যে, নারীসমস্যার সমাধান হইবে ইহা অমূলক। ব্যক্তিত্বের পূর্ণবিকাশসাধনের জন্য যে স্বাধীনতা ও সুযোগ চাই তাহা হিন্দুগণ নারীদিগকে স্মরণাতীত যুগ হইতে অদ্যাবধি দিয়া আসিয়াছেন। তাই প্রাচীন ভারতের ইতিহাস আদর্শ-নারী-দৃষ্টান্তে পূর্ণ। শঙ্করের মাতা, বুদ্ধদেবের মাতা মায়াদেবী, ঈশার মাতা মেরী মাদোনা,

বিবেকানন্দের মাতা ভুবনেশ্বরী, চৈতন্যের মাতা শচীদেবী, রামকৃষ্ণের মাতা চন্দ্রাদেবী, অরবিন্দ-রবীন্দ্র-জননীগণ ত বাহিরের সমাজের মধ্যে না আসিয়াও জগৎপ্রসিদ্ধ সন্তানের জননী হইয়াছেন! বৈদিকযুগেও দেখিতে পাই বিদুষী গার্গী-মৈত্রেয়ী ঋষি যাজ্ঞবল্ক্যের সহিত দর্শনের গভীর তত্ত্বসমূহ আলাপ করিতেছেন। দেবীসূক্তের দ্রষ্ট্রী অম্ভৃন, অদিতি, লোপমুদ্রা শাশ্বতী, বিশ্ববরা, অপালা ও ঘোষা প্রভৃতি বিদুষীগণ ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। মধ্যযুগেও শঙ্করাচার্য্য যখন মণ্ডনমিশ্রের সহিত শাস্ত্রযুদ্ধ করিতেছেন তখন মধ্যস্থা ছিলেন জনৈকা নারী—ভারতী! তাহা ছাড়া সীতা সাবিত্রী দময়ন্তী মদালসা রন্তিদেবের দেশে হিন্দু-নারীগণের ত নিরাশ হইবার কিছুই দেখি না। বর্ত্তমান নারীগণের শিক্ষালাভের পূর্ণসুযোগ দেওয়ার পর তাঁহাদের সমস্যা তাঁহারা নিজেরাই সমাধান করিবেন—অবশ্য অতীত আদর্শের ভিত্তিতে, তবে মালমসলা বর্ত্তমান জগতের প্রাচ্য-পাশ্চাত্য উভয় হইতেই গ্রহণ করিয়া।

নারীত্বের পরিণতি মাতৃত্বে—এই বেদবাক্য যেন আমাদের বঙ্গজননীগণ বিস্মৃত না হন। প্রকৃত মাতা হইয়াই তাঁহারা প্রকৃত দেশ গঠন করিতে পারিবেন! তাঁহারা গৃহের শান্তিময় রাজ্য ছাড়িয়া সমাজে আসায় ফল হইয়াছে এই যে, তাঁহাদের শিশুগণ সমাজের উপযুক্ত সভ্য হইতে পারিতেছে না। আমরা—সন্ন্যাসীরা, স্ব স্ব জীবনে দেখি, পিতামাতা আমাদের সম্মুখে বাল্যকালে উচ্চাদর্শ রাখিয়া আমাদিগকে গঠন করেন নাই বলিয়া আমরা মধ্যজীবনে হৃদয়-মস্তিষ্কের বিকাশ পূর্ণ করিতে পারিতেছি না। আধ্যাত্মিকতা ও পাণ্ডিত্য যাহা প্রত্যেক হিন্দু-বালকের জন্মগত অধিকার ছিল—তাহা আমাদের নিকট সুদূরপরাহত হইয়াছে। তাই বলি, প্রকারান্তরে দেশে জননীগণই সমাজের প্রকৃত সৃজয়িত্রী।

রাস্কিন বলেন যে, "যে গৃহে মাতা রাজত্ব করেন তাহাই আদর্শ গৃহ। এইরূপ গৃহই প্রকৃত শান্তিনিকেতন—তথায় দ্বন্দ্ব, ভয় ও দুঃখের আক্রমণ নাই। লক্ষ্মীহীন গৃহ গৃহই নহে। আনন্দ পবিত্রতা শান্তি সত্য যে গৃহে যত বিরাজ করে সে গৃহ তত উন্নত। তদ্রূপ মধুময় গৃহই প্রকৃত স্বর্গ, প্রকৃত মন্দির, প্রকৃত তীর্থ। সে গৃহের অধিষ্ঠাত্রী দেবী প্রেমপূর্ণা আদর্শ জননী।—সে গৃহে দুঃখদারিদ্র্য থাকিলেও গৃহবাসী স্বর্গীয় শান্তি লাভ করেন। শুধু তাহাই নহে, গৃহহীনের আশ্রয়ও সেই গৃহ।"

সমাজে পুরুষ রাজত্ব করুন কিন্তু গৃহে যদি আদর্শ-জননী বিরাজ করেন সেই গৃহ মন্দিরে পরিণত হয়,—সেই গৃহে দেবতার বাস হয়, তথায় স্বর্গের জ্যোতি ফুটিয়া উঠে। পশ্চিমে এইরূপ গৃহের অভাব বলিয়া সমাজও অধঃপতিত। কারণ সমাজ ত এইরূপ গৃহের সমষ্টি ব্যতীত অন্য কিছু নহে। আজ হিন্দু-সমাজে এইরূপ গৃহের আধিক্য বলিয়া সমাজ এত উন্নত। হিন্দু-জননীগণ বোধ হয় জানেন না যে, জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মানুষ আর কেহ নহে—তাঁহাদেরই সন্তান। কাজেই নারীদের সমাজসংস্কারের জন্য ব্যস্ত না হইয়া গৃহ-সংস্কার করিতে হইবে—তবেই সমাজ দেশ ও সমস্ত জগৎ উন্নত হইবে। আর তাহার জন্য হিন্দু-নারীগণই একমাত্র দায়ী। তাঁহারা এ ব্রত গ্রহণ না করিলে জগতে, দেশে, সমাজে, গৃহে শান্তিরাজ্য পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইবে না। তাই ভগবান বুদ্ধ বলিয়াছেন যে, "বুদ্ধ ঘরে ঘরে জননীরূপে বিরাজ করেন।" কারণ জননী যদি ক্রোড়স্থ শিশুর কোমল হৃদয়ে ধর্ম্মের আদর্শের বীজ বপন করিয়া দেন ও তাহা নিঃসন্দেহে অঙ্কুরিত, পল্লবিত হইয়া উঠে, তবে কালে সমস্ত বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করিয়া তাহা মহামহীরুহে পরিণত হইবে।

মনু মহারাজ বলেন, "যত্র নার্য্যস্তু নন্দ্যন্তে নন্দ্যন্তে তত্র দেবতা—যত্র নার্য্যস্তু নিন্দ্যন্তে নিন্দ্যন্তে তত্র দেবতা"। অর্থাৎ নারীকে সম্মান করিলেই দেবতার সম্মান করা হয়—নারীর অশ্রদ্ধা হইলে দেবতাগণ গৃহত্যাগ করেন। চণ্ডীতে আছে, "স্ত্রিয়া সমস্তাঃ সকলা জগৎসু"—অর্থাৎ নারীগণ জগজ্জননীর অংশ ও প্রতিমূর্ত্তি। রামপ্রসাদও গাহিয়াছেন "জগন্মাতা মাতারূপে গৃহে বিরাজ করেন।"

বাংলা মাতৃপূজার সিদ্ধ পীঠ। কমলাকান্ত, রামপ্রসাদ রামকৃষ্ণ ও কেশবচন্দ্র প্রভৃতি সাধকগণ মাতৃ-পূজার সিদ্ধি লাভ করিয়া তরুণ বাংলাকে এই পথ প্রদর্শন করিয়াছেন। জগতের অন্যত্র ত দূরের কথা, ভারতের অন্যান্য প্রদেশেও এই মাতৃভক্তি বা মাতৃপূজার প্রচলন নাই। গৃহে জীবন্ত মাতাকে জীবন্ত জগজ্জননীরূপে পূজা করিয়া মাতৃশক্তির আরাধনা করিতে হইবে—তবেই দেশ

জাগিবে। ভিক্ষাজীবী সন্ন্যাসী আমরা—পল্লীতে পল্লীতে ভ্রমণ করিয়া দেখিয়াছি, ভারতে বিশেষতঃ বঙ্গে মাতৃশক্তি পূর্ণজাগ্রতা। কিন্তু পূজক কই? মাতৃপূজার হোতা ও উদ্গাতার আজও অভাব দেখিতেছি। গৃহে গৃহে মাতৃ-পূজার আয়োজন ও মাতৃশক্তির উদ্বোধন হউক!

শ্রীরামকৃষ্ণ নিজের জীবনে সেই মাতৃপূজার পুরোহিত হইয়া দৃষ্টান্ত রাখিয়া গিয়াছেন। তিনি ঈশ্বরকে মাতৃরূপে আরাধনা করিলেন—নারীগুরু গ্রহণ করিলেন—এবং নিজের স্ত্রীকে প্রথম শিষ্যারূপে গ্রহণ করিলেন। এবং সাধনার শেষে স্ত্রীকে জগজ্জননী জ্ঞানে পূজা করিয়া দেখাইলেন নারীতে মাতৃদৃষ্টি না হইলে আধ্যাত্মিক জীবনও অপূর্ণ থাকে। ধর্ম্মের অবিরুদ্ধ ভোগ সহায়ে ত্যাগে পৌঁছিবার জন্যই হিন্দুর বিবাহ। বিবাহিত জীবনে ব্রহ্মচর্য্য পালন করিবার প্রথা উচ্ছেদ হওয়াতেই হিন্দুর বর্ত্তমান জাতীয় অবনতি। এই আদর্শ পুর্ন-প্রচলনের জন্য এবং বিবাহিত জীবনে শিক্ষার জন্য স্ত্রীর সহিত শ্রীরামকৃষ্ণ শারীর সম্বন্ধ-রাহিত্যে এক অপূর্ব্ব জীবন যাপন করিলেন। এই আদর্শ অন্ততঃ আংশিকভাবে গ্রহণ না করিলে দেশের কল্যাণ নাই। স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন, "মেয়েদের পূজা করিয়াই সব জাতি বড় হইয়াছে। যে দেশে যে জাতিতে মেয়েদের পূজা নাই সে দেশ সে জাতি কখনও বড় হইতে পারে নাই, কস্মিনকালে হইতেও পারিবে না। আমাদের জাতির অবনতির মূলে এই নারীশক্তির অবমাননা।" সুতরাং গৃহে গৃহে মাতৃপূজার পুনঃপ্রতিষ্ঠা হউক। কারণ শুধু ব্যষ্টি-জীবন নহে, সমষ্টি-জীবনের পাপতাপও সতীসাধ্বী নারীর আশীর্ব্বাদে নষ্ট হয়।

নারীগণ আত্মবিস্মৃত মহাশক্তির আকর। সেই শক্তি উদ্বুদ্ধ করিতে হইলে মাতৃনাম-মহামন্ত্র সাধনে দেশের যুবক-গণকে প্রস্তুত হইতে হইবে। আর জননীগণও বৃথা বাহিরের সমাজে রাজত্ব করিবার বিজয়-প্রয়াস ত্যাগ করিয়া গৃহের মধ্যে তাঁহাদের প্রকৃত কর্ম্মক্ষেত্রে কেন্দ্রশক্তি নিবদ্ধ করুন। এই গৃহের মধ্য হইতেই তাঁহারা সমস্ত সমাজ গঠন ও চালনা করিতে পারিবেন। জননীগণের এই মহাদায়িত্ব যেন মনে থাকে যে, তাঁহাদের পুত্রকন্যাগণ যেন এক একটি বুদ্ধ, শঙ্কর, এক একটি গার্গী, মৈত্রেয়ী হইতে পারেন। গৃহ শুধু শান্তি স্নেহ পবিত্রতার আকর হইবে না,—শিশু কন্যাগণের—সমস্ত পরিবারবর্গের শিক্ষা ও সাধনার কেন্দ্র হইবে। হৃদয়ের পূর্ণবিকাশ সাধন করিতে হইলে ধর্ম্ম ও বিদ্যা প্রথম হইতে শিক্ষা দিতে হইবে। এবং মাতাই প্রকৃত শিক্ষয়িত্রী—শুধু শিশুর নহে, সমাজের ও জগতেরও বটে। ভগ্নী নিবেদিতা বলেন যে, মাতাগণই এইরূপে জগতের আদর্শ সভ্যতা ও আদর্শ মনুষ্যসমাজ গঠন করিতে পারিবেন।

ভারত ও স্বূফী-মতবাদ

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)
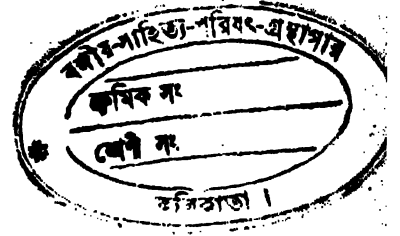
মুহম্মদ এনামুল হক এম্-এ

ভারতীয় স্বূফীদিগকে বুঝিতে গেলে, তাঁহাদের ভাবজগতের সম্যক্ পরিচয় আবশ্যক। এই ভাবজগতে কালক্রমে কিরূপ পরিবর্ত্তন, পরিবর্দ্ধন ও বিবর্ত্তন (evolution সংঘটিত হয়, তাহার একটি চিত্র অঙ্কিত করিতে হইলে, বিদেশীয় স্বূফী-মতবাদের সহিত, ভারতীয় স্বূফী-মতবাদের তুলনামূলক সমালোচনা অপরিহার্য্য হইয়া পড়ে। আরবী, বিশেষতঃ ফারসী ভাষায় আমাদের সম্যক্ ও গভীর জ্ঞানের অভাবে, এ কাজ আমাদের পক্ষে নিতান্ত দুঃসাধ্য—সন্দেহ নাই। তথাপি স্বীয় কৌতুহল নিবারণ করিতে গিয়া, এ বিষয়ে যে সামান্য অনুশীলন করিয়াছি, তাহার ফল সংক্ষেপে নিম্নে লিপিবদ্ধ হইল :—

ইস্‌লামের মূলমন্ত্র হইল,—"তব্‌হ্বীদ্" বা ভগবানের পূর্ণ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর একত্ববাদ (pure and unmixed monotheism)। ভগবানের পূর্ণ ও বিশুদ্ধ একত্বকে মানিয়া লইয়াই, ইস্‌লাম ধর্ম্ম আরম্ভ হইয়াছে। "ঐস্‌লামিক ভগবদ্-সত্তা পূর্ণভাবে বিশুদ্ধ; সংখ্যাবাহুল্য ও ভাগবাটোয়ারা হইতে বিমুক্ত। ইহা ভগবদ্-সত্তায় বহুত্বকে এবং ঐহিক ব্যাপারে কোন জীবের অংশ গ্রহণকে স্বীকার করে না।" (১) ঐস্‌লামিক ভগবান, স্বৃষ্টির বহির্ভূত সর্ব্বগুণান্বিত এমন এক পূর্ণ সত্তা, যাঁহাকে মানুষ দেখিতে পায় না, ধারণা করিতে পারে; স্পর্শ করিতে পারে না, অন্তর দিয়া উপলব্ধি করিতে পারে; তিনি স্বৃষ্টি হইতে বিমুক্ত ও ইহার স্বাভাবিক দোষগুণ হইতে পবিত্র; স্বৃষ্টির ভিতর দিয়া তাঁহার লীলা মানুষের নিকট প্রকাশ পাইলেও, ইহার অবর্ত্তমানে অন্য কোন বিচিত্ররূপে তাঁহার এই অপরূপ লীলা প্রকাশ পাইত। এইজন্য স্বৃষ্টিকেই তাঁহার একমাত্র প্রকাশস্থল (মুয্‌হর্) এবং তাহার অবর্ত্তমানে ভগবানের অস্তিত্ব থাকিত কি না সন্দেহ, প্রভৃতিতে বিশ্বাস করা একান্তই অনৈস্‌লামিক। ভগবদ্-সত্তাকে বর্ণনা করিতে গিয়া কোরাণ বলিতেছেন, "বল (মুহম্মদ্) 'অল্লাহ্ এক; 'অল্লাহ্ তিনিই, যাঁহার নিকট হইতে কিছুই স্বাধীন ও মুক্ত নহে; তিনি (কাহাকেও) জন্মদান করেন না, এবং তিনিও (কাহারও নিকট হইতে) জাত নহেন; এবং তাঁহার তুল্য কেহ নাই।" (১) তিনি অনাদি, অনন্ত ও স্বয়ম্ভু—তিনি কাহারও মুখাপেক্ষী নহেন, সমস্তই তাঁহার মুখাপেক্ষী।

অতি সংক্ষেপে ঐস্‌লামিক "তব্‌হ্বীদের" মূলমন্ত্র হইল ইহাই। এখন দেখা যাক্ এই "তব্‌হ্বীদ্" ভারতীয় স্বূফীদের হাতে কিরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া কোন্ রূপ গ্রহণ করিয়াছে। ভারতীয় স্বূফী মতে "তব্‌হ্বীদ্" দ্বিবিধ; যথা "তব্‌হ্বীদ্-ই-ব্‌জূদী" অর্থাৎ "অস্তিত্ব-প্রধান একত্ব", এবং তব্‌হ্বীদ্-ই-শহূদী" অর্থাৎ "প্রমাণ-প্রধান একত্ব"। (২) প্রথমোক্ত "তব্‌হ্বীদ্", একত্বসম্বন্ধীয় ধারণার প্রথমাবস্থা, এবং শেষোক্ত "তব্‌হ্বীদ্" ইহার দ্বিতীয় বা পূর্ণ পরিণত অবস্থা। প্রথমোক্ত অবস্থায় সিদ্ধ হইলে, শেষোক্ত অবস্থায় পূর্ণত্বলাভ ঘটে। এই দ্বিবিধ তব্‌হ্বীদের সংজ্ঞা এইরূপ :—

(১) তব্‌হ্বীদ্-ই-ব্‌জূদী (অস্তিত্ব-প্রধান একত্ব) :—"তব্‌হ্বীদের" এই অবস্থায় ভগবানকে এক বলিয়া ধরিয়া লইয়া, তিনি সর্ব্বত্র বর্ত্তমান আছেন বলিয়া জানিতে হয়, এবং যাবতীয় স্বৃষ্ট পদার্থকে এই একক ভগবানের "য্‌হূর্" বা

১। "There is absolute Unity in Divine nature; it admits of no participation or manifoldness. It denies all plurality of persons in Godhead, and any participation of any being in the affairs of the world."
Quran, Muhammad Ali, Preface, p. viii.

১। কুল্ হব্-ল্-লাহ 'অহদ; 'অল্লাহু-স্-স্বমদ; লম্ য়লিদ্ ব্ লম্ য়ূলদ; ব্ লম্ য়কুন্-ল্-লহু কুফুব্‌ান্ 'অহদ্।
কুর্‌আন্, ১১২ অধ্যায়।

২। 'তব্‌হ্বীদ্-ই-ব্‌জূদী' শব্দের প্রথম ব্যবহার আমরা পাই ভারতীয় স্বূফী অকবরের লেখায় (ষোড়শ শতাব্দী)। তৎপরে 'তব্‌হ্বীদ্-ই-শহূদী' শব্দ প্রয়োগ করেন অহ্‌মদ্ সর্‌হিন্দী (১৫৬৩-১৬২৪)।

অভিব্যক্তি বলিয়া জ্ঞান করিতে হয় (১)। ইহার মূল কথা হইল,—ঈশ্বর ভিন্ন কোন বস্তু নাই, তিনি সর্ব্বভূতে বিরাজমান, সর্ব্ব বস্তুতে তাঁহার অস্তিত্ব রহিয়াছে। ঈশ্বর এক হইলেও পৃথিবীর প্রত্যেক স্থাবর-জঙ্গমে বিদ্যমান আছেন বলিয়া, পৃথিবীর প্রত্যেক সজীব ও নির্জ্জীব পদার্থ তাঁহার প্রকাশস্বরূপ। পৃথক পৃথক স্থানে, পৃথক পৃথক কালে ও পৃথক পৃথক পাত্রে, তাঁহাকে পৃথক পৃথক ভাবে দেখিতে হইবে। এই অবস্থায় কেবল অস্তিত্বই বৈশিষ্ট্য; এবং সর্ব্বত্রই ভগবানের অস্তিত্ব দেখিতে হয়। একমাত্র অস্তিত্বের ভাবই প্রধান বলিয়া, ইহাকে "অস্তিত্ব প্রধান একত্ব" বলিয়া উল্লেখ করা হইল।

(২) তব্‌হীদ্-ই-শহুদী (প্রমাণ-প্রধান একত্ব):— "তব্‌হীদের" এই অবস্থায়, "সালিক্" (আধ্যাত্মিক পথ যাত্রী) সৃষ্টিকে ভুলিয়া গিয়া কেবল এক স্রষ্টাকেই দর্শন করেন। এক ঈশ্বর ভিন্ন তিনি আর কোন পদার্থই দেখিতে পান না—অথচ পদার্থগুলির অস্তিত্ব বিদ্যমান। ভগবান আধ্যাত্মিক পথযাত্রীর মন এমনই অধিকার করিয়া বসেন যে, তিনি সমস্ত বস্তুর অস্তিত্ব ভুলিয়া, কেবল এক ঈশ্বরকেই দর্শন করেন। আকাশে প্রকৃতপক্ষে সকল সময় তারকারাজি বিদ্যমান থাকিলেও সূর্য্যোদয়ে যেমন সূর্য্য ভিন্ন আর কিছুই দেখা যায় না, এই প্রমাণ-প্রধান একত্বের অবস্থাও অনেকখানি তদ্রূপ। জাজ্বল্যমান চাক্ষুষ প্রমাণই এই অবস্থার বৈশিষ্ট্য; সুতরাং ইহাকে "প্রমাণ প্রধান একত্ব" বলা হইল। (২)

এই দ্বিবিধ তব্‌হীদের মধ্যে ঐক্য ও অনৈক্য কোথায়, তাহাও একবার দেখা আবশ্যক। প্রথমোক্ত তব্‌হীদে, বিভিন্ন সৃষ্টির ভিতর এক স্রষ্টা বর্ত্তমান আছেন বলিয়া কল্পনা করিতে হয়; আর শেষোক্ত তব্‌হীদে সৃষ্টির কথা ভুলিয়া গিয়া, কেবল এক স্রষ্টাকেই দর্শন করিতে হয়। একটি কল্পনার লীলায় লীলায়িত ও ভাবপ্রবণতার ভারে নিপীড়িত; আর অপরটি জাজ্বল্যমান চাক্ষুষ প্রমাণের বিশ্বাসে ভরপুর। উভয়ের মধ্যে একত্ব বস্তুটি সাধারণ,— উভয়েরই একত্বে বিশ্বাসপরায়ণ; তবে প্রথমোক্তটিতে বহু বিভিন্ন বস্তুর মিলনমূলক একত্ব (unification of many constituent elements into one whole); আর শেষোক্তটিতে স্বভাবজাত পূর্ণ একত্ব (absolute uuity)।

আমাদের এই বিবরণ হইতে দেখা যাইবে "অস্তিত্ব-প্রধান একত্বের" পূর্ণ ও পরিণত অবস্থা হইল "প্রমাণ-প্রধান একত্ব।" ভারতীয় সূফীদের মতে যে পর্য্যন্ত "অস্তিত্ব-প্রধান একত্ববাদী"রা "প্রমাণ-প্রধান একত্ববাদী"র শ্রেণীতে উন্নীত না হন সেই পর্য্যন্ত তাঁহাদের সিদ্ধিলাভ হয় না। তাঁহারা বলেন, প্রত্যেক সৃষ্টির ভিতর ঈশ্বরের অস্তিত্ব কল্পনা করিতে করিতে, আধ্যাত্ম-প্রেম সৃষ্টিকে ভুলাইয়া, কেবল এক স্রষ্টাতেই আধ্যাত্মিক পথযাত্রীর দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া দেয়। তখন আধ্যাত্মিক পথযাত্রী (সালিক্) এক স্রষ্টা ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে পান না। এই অবস্থার নামই "প্রমাণ-প্রধান একত্ব"। নক্‌শবন্দীয়হ্ সম্প্রদায় ভিন্ন, ভারতীয় অন্যান্য সকল সম্প্রদায়ে অগ্রে "অস্তিত্ব-প্রধান একত্ব" সিদ্ধ হয় ও পরে "প্রমাণ-প্রধান একত্ব" সাধিত হয়। (১)

"তব্‌হীদ্" সম্বন্ধে নিম্নে কয়েকজন ভারতীয় সূফীর বাণী তাঁহাদের দীব্‌ন্ বা কবিতা-সঙ্কলন হইতে উদ্ধৃত করিতেছি। আশা করি, ইহা দ্বারা পাঠকের সহিত ভারতীয় সূফীদের চিন্তাধারার সাক্ষাৎ পরিচয় ঘটিবে। খব্‌জহ মু'ঈনু-দ্-দীন চিশ্‌তী (১১৪২-১২৩৬) সাহেব বলিতেছেন:—

"আমি মূর্ত্তির সৌন্দর্য্যের মধ্যে মূর্ত্তি-নির্ম্মাতার বদন দেখিয়াছি; (মূর্ত্তি ও তাহার নির্ম্মাতার মধ্যে) বিশুদ্ধ একত্ব বিদ্যমান, (তাই) আমি এখন মূর্ত্তি-উপাসক।"

মন্ দর্ জমাল্ ই-বুত্ রুখ্-ই-বুত্‌গর্ বদীদহ্ 'অম্।
তব্‌হীদ্ মুত্‌লকস্‌ত্ কনূন্ বুত্ পুরস্তিয়ম্॥

"আমি যখন (খোদার) গুণ ও সত্তার একত্বকে অন্য হইতে পৃথক দেখিতেছি না, তখন যাহাই আমি দেখি, খোদা ব্যতীত আর কিছুই দেখিতে পাই না।"

স্বিফাত্ ব্‌ধাত্ চূঁ 'অয্‌হম্ জুদানমী বীনম্।
ব হর্ চিহ্ মী নিগরম্ জুয্-ই-খুদা নমী বীনম্॥

"তুমি যদি তাহার (=খোদার) মুখ দেখিতে ইচ্ছা কর,

১। ইর্‌শাদ্-ই-খালিদীয়হ্, দ্বিতীয় সংস্করণ, পৃঃ ২৬২।
২। ঐ, পৃঃ ২৬৪।

১। ঐ—পৃঃ ১৬৩।

আমার চেহারার দিকে তাকাও ; আমি তাহার দর্পণ ; সে আমা হইতে পৃথক নহে।"

খব্‌ াহী কিহ্‌ রুখশ্‌ বীনী দর্‌ চিহ্‌রহ্‌-ই-মন্‌ ব-নিগর্‌।
মন্‌ আ'য়্‌নহ্‌-ই-উয়ম্‌ উ নীস্‌ত্‌ জুদা 'অয্‌ মন্‌॥

"যে দিকেই আমি মুখ ফিরাই, তোমার সৌন্দর্য্য দর্শন করি, কেননা আমার শরীরের প্রত্যেক অণু পরমাণু তোমার অভিব্যক্তিতে পরিণত হইয়াছে।"

হর্‌ জা কিহ্‌ রুখ্‌ কশুদম্‌ হুস্‌ন্‌-ই-তু মী নমুদম্‌।
হর্‌ ধর্‌রহ্‌ 'অয বজূদম্‌ চুঁ গশ্‌ত্‌ মুয্‌হর্‌-ই-তু॥

শরফুদ্‌-দীন্‌ বু 'অলী কলন্দর্‌ একজন ভারতবিখ্যাত দর্‌বীশ ছিলেন। পাণিপথে ১৩২৪ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই সেপ্টেম্বর তাঁহার মৃত্যু ঘটে। তিনি যে নূতন মণ্ডলী ভারতে প্রচার করেন, তাহা "কলন্দরীয়হ্‌" মণ্ডলী নামে প্রসিদ্ধ। তব্‌হীদ্‌ সম্বন্ধে তাঁহার ধারণা (conception) কিরূপ তাহারও একটু নমুনা দেখুন :—

"প্রত্যেক দর্পণে (—সৃষ্টির ভিতর) প্রিয়তমকে দেখিতে থাক ; প্রতি ধ্বনি-প্রতিধ্বনিতে তাঁহারই বিলাপ ও আকুতি বিরাজিত।"

য়ার্‌ রামী বীঁ তু দর্‌ হর্‌ আ'য়্‌নহ ।
স্য্‌ব্‌ সায-ই-উ-স্‌ত্‌ দর্‌ হর্‌ স্বন্‌স্বনহ্‌॥

"যাহা কিছু দেখিতে পাও, প্রকৃতপক্ষে তাহা সমস্তই তিনি—প্রদীপ, পুষ্প, পতঙ্গ, বুল্‌বুল্‌ সমস্তই তাঁহার কাছ হইতে (আসিয়াছে)।"

হর্‌ চিহ্‌ বীনী দর্‌ হকীকত জুম্‌লহ্‌ উ-স্‌ত্‌
শম'ব্‌ গুল্‌ পর্‌বানহ্‌ বুল্‌বুল্‌ হম্‌ 'অয্‌স্‌ত্‌॥

"তিনি তোমার মধ্যে জন্মলাভ করিয়াছেন, তুমি তোমার সম্বন্ধে বেখবর।"

উ স্‌ত্‌ পয়্‌দা দর্‌ তু তু 'অয্‌ খব্‌রীশ্‌ গুম্‌।

ভারতীয় স্বফীদের বাণী অনুসন্ধান করিলে, এইরূপ অসংখ্য কথা পাওয়া যায়। তাঁহারা কিরূপে কোন্‌ পথে চলিয়াছিলেন তাহার আভাষ তাঁহাদের বাণীতে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। এসকল বিষয় দীর্ঘ আলোচনার স্থান এখানে নহে। সুতরাং আমরা আর তাঁহাদের বাণী আলোচনায় অধিকদূর অগ্রসর হইলাম না। পাঠকগণকে তব্‌হীদ্‌ সম্বন্ধে ভারতীয় স্বফীদের যে পরিচয় প্রদত্ত হইল, ইহার পরবর্ত্তী প্রত্যেক মন্তব্য এইরূপভাবে তাঁহাদের বাণীর সাহায্যে প্রমাণ করা যাইতে পারিবে।

ভারতীয় স্বফীদের বিশ্বাসের ('ঈমান্‌) দিক আলোচনার পর, তাঁহাদের কর্ম্মের বা লৌকিক দিকটুকুরও আলোচনা করা নিতান্তই আবশ্যক ; নহিলে তাঁহাদের প্রতি নিতান্তই অবিচার করা হয়। তাঁহাদের বিশ্বাসের দিক যেরূপই হউক, তাঁহারা ভারতবাসীর জন্য যাহা করিয়াছেন, তাহা চিরদিনই ভারতের আদর্শস্থানীয়। যুগে যুগে ভারতে বহু মহাপুরুষ ও হৃদয়বান ব্যক্তির আবির্ভাব ঘটিয়াছিল, যুগে যুগে তাঁহারা মূল্যবান বাণী প্রচার করিয়া গিয়াছেন। নরের সেবা করিয়া নারায়ণকে সন্তুষ্ট করিবার কথা মূলতঃ ভারতেরই বৈশিষ্ট্য। তাহার অনেক পরে পৃথিবীর নানাস্থানে, নানা মহাপুরুষের বাণীর ভিতর দিয়া, এই মধুময় বাণী প্রকাশ পাইয়াছিল। ভারতের বুকে যুগে যুগে নানা সংসারত্যাগী মহাপুরুষেরও আবির্ভাব হইয়াছিল, জাগতিক সুখ, ঐশ্বর্য্য ও বিলাসের বিপক্ষে তাঁহারাও আজীবন সংগ্রাম করিয়া দেহত্যাগ করিয়াছিলেন। কিন্তু মুসলমান স্বফীদের আগমনের পর হইতে, বিশেষতঃ ভারতে স্বফীদের প্রভাব স্থায়ী হওয়ার পর হইতে, হিন্দু-মুসলমান যত সাধু ও মহাপুরুষের আবির্ভাব হইয়াছিল, ভারতেতিহাসের আর কোন অধ্যায়ে তেমনটি হয় নাই। মুসলমান সাধকদের আগমনের ফলে, ভারতের প্রাচীন সেবাধর্ম্ম, ভারতের প্রাণের জিনিষ সংসার-নিস্পৃহতা ও বৈরাগ্য, এবং ভারতের অস্তোন্মুখ প্রাচীন সাধনা, যেরূপ নূতন প্রাণ, নবীন বল ও অভিনব শক্তি লাভ করিয়াছিল, তাহা স্বীকার না করিলে, সত্যের অপলাপ করা হয়। নানা কারণে, ভারতের চলচ্ছক্তি যখন থামিয়া গিয়াছিল, ভারতের দৌর্ব্বল্য যখন চরমে উঠিয়াছিল, তখন স্বফীরা নব বল ও নূতন প্রেরণা লইয়া ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়াছিলেন। ইঁহাদের কর্ম্মের দিক আলোচনা করিতে গেলে, ভক্তিভরে মস্তক আপনিই অবনত হইয়া পড়ে। ইঁহারা একাধারে ভগবৎ-প্রেমিক (তাই বিশ্বপ্রেমিক) এবং বিশ্ববিজয়ী কর্ম্মী ছিলেন। সংসারের সুখদুঃখ, জ্বালাযন্ত্রণা হইতে দূরে বহুদূরে অবস্থান করিয়া, তাঁহারা কর্ম্ম ও সাধনার জন্য

আত্মোৎসর্গ করিয়াছিলেন। তাই একটি শতাব্দী অতীত না হইতেই, ভারতের প্রতি পল্লী ও জনপদ, তাঁহাদের অক্লান্ত কর্ম্মতৎপরতায় পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। নির্য্যাতিত, নিপীড়িত, রুগ্ন ও ক্লিষ্ট মানুষের দুঃখে, তাঁহারা প্রাণ খুলিয়া কাঁদিয়াছিলেন। তাহাদের নিরাশ ও মৃতপ্রায় প্রাণে সঞ্জীবনী সুধার সঞ্চারণ ও সংসারজ্বালা-দগ্ধ ব্যর্থ ব্যথিত হৃদয়ে সহানুভূতি বহন এবং তাহাদের বধির শ্রবণে মন্ত্রশক্তি দান প্রভৃতি অসংখ্য কাজ করিয়া তাঁহারা ভারতের প্রাণ-হরণ করিয়াছিলেন। তাঁহারা জাতির কথা চিন্তা করেন নাই, সমাজের কথা ভাবের নাই, লৌকিক ধর্ম্মের কথা স্মরণ রাখেন নাই,—যেখানেই মানুষের পতন হইয়াছে, যেখানে মানুষের করুণ বিলাপ ও আর্ত্তনাদ উঠিয়াছে, মানের কথা ভুলিয়া, অপমানের কথা বিস্মৃত হইয়া, সেইখানেই স্বর্গীয় দূতের ন্যায় উদ্ধারের বাণী বহন করিয়া ছুটিয়া গিয়া, তাহাদিগকে আপন কোলে স্থান দান করিয়াছেন। তাঁহারা ক্ষুধার্ত্তকে আহার দিয়াছেন, নিরাশ্রয়কে ছায়া দিয়াছেন, পীড়িতকে শয্যাপাশে দাঁড়াইয়া অথবা শুভাশীর্ব্বাদ সাহায্যে শুশ্রূষা করিয়াছেন, মৃত্যুর পরে কাঁধে করিয়া পারলৌকিক কৃত্য করিয়াছেন। তাঁহাদের সংস্পর্শে বারাঙ্গণা মানুষ হইয়াছে, পাপী পাপাচরণ ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী সাজিয়াছে, স্বার্থপররা কর্ণের মত বা হাতিমের ন্যায় দাতা হইয়াছে, ঘোর সংসারীও পরোপকারে আত্ম বিলাইয়া দিয়াছে। তাঁহারা জিতেন্দ্রিয়, ভোগ-বিলাস-বিমুখ ও সংসারবিরাগী সন্ন্যাসী ছিলেন বলিয়া, মানুষ কখনও কখনও তাঁহাদিগকে অতিমানুষ বা দেবতা বলিয়াও ভ্রম করিয়াছে। তাঁহাদিগকে দেখিলে বাস্তবিকই মূর্ত্ত নিস্পৃহতা বা শান্তির দূত বলিয়াই মনে হইত; তাই মানুষ আপনিই তাঁহাদের পাছে পাছে ছুটিয়া চলিত। মানুষের এই আতিশয্যের অত্যাচার হইতে তাঁহাদের কেহ কেহ দূরে থাকিতে চেষ্টা করিয়াছেন—কিন্তু তাই বলিয়া তাঁহারা কখনও মানুষকে ঘৃণা করেন নাই। তাঁহাদের কর্ম্মময় নৈতিক দিক বাস্তবিকই ভারতবাসীর জন্য আশীর্ব্বাদ স্বরূপ। তাঁহাদের এই দিকটি খব্‌াজহ মুঈনুদ্‌-দীন্ চিশ্‌তী সাহেবের এই কয়টি বাণীর ভিতর হইতে উজ্জ্বল হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে:—

"যে ব্যক্তি খুদা ত'আলার বন্ধু ও তাঁহাকে বাঞ্ছিত বলিয়া মনে করিবে, তাহার মধ্যে চারিটি বস্তু পাওয়া যাইবে,—ভদ্রতা, প্রেম, বদান্যতা ও সৎসঙ্গ।"

"তিনটি বস্তু মানবহৃদয়ে মুক্তা স্বরূপ,—শত্রুর সহিত মিত্রতা করা, নিস্পৃহ ভাবে নিজের দারিদ্র্য গুপ্ত রাখা, স্বীয় দুঃখ কাহারও নিকট ব্যক্ত না করিয়া আত্মস্থ থাকা।"

"যিনি দরিদ্র, ক্ষুধার্ত্ত, পীড়িত ও মৃতের বন্ধু, 'অল্লাহ্' তাঁহার বন্ধু হন; খোদায় আত্মসমর্পণ করা ও কাহারও মুখাপেক্ষী না হওয়া তাঁহার উচিত।" (তধ্‌কিরহ্-ই-ঔলিয়া-ই-হিন্দ্, প্রথম ভাগ, পৃঃ ১৮-১৯)

চিশ্‌তীয়হ মণ্ডলীর আরও কতকগুলি শিক্ষা আলোচনার যোগ্য। কেবল এই সম্প্রদায়ভুক্ত দর্ব্বীশেরাই এই উপদেশ ও শিক্ষাগুলি যে মানিয়া চলিয়া থাকেন তাহা নহে, ভারতে অধিকাংশ দর্ব্বীশরাই এই শিক্ষা অনুকরণ করিতেন। এই শিক্ষাগুলিতে এই মণ্ডলীর কৃচ্ছ্রসাধন ও সন্ন্যাসের দিকই অধিক পরিস্ফুট। সম্প্রদায়ভুক্ত হইলেই তাহাকে শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে:—

"বিপদকে করুণা, বিষাদকে আনন্দ ও উপবাসকে গৌরব বলিয়া মনে করিবে; বেদনা ও আরামকে এক বলিয়া জ্ঞান করিবে; সৎলোকের সংসর্গ রাখিবে; দরিদ্রকে ভালবাসিবে; সাংসারিক ব্যক্তি হইতে দূরে থাকিবে; গুরুর সঙ্গ ত্যাগ করিবে না; ভগবদ্‌ভক্ত সাধুর বাণী অনুধাবন করিবে ও তাঁহাদের কাহিনী অপর্য্যাপ্তরূপে পাঠ করিবে।" (তধ্‌কিরহ্-ই-ঔলিয়া-ই-হিন্দ্, প্রথম ভাগ, পৃঃ ১৯)

আমাদের উপরোক্ত আলোচনা, বিষয়ের গুরুত্ব হিসাবে নিতান্তই সংক্ষিপ্ত ও অপ্রচুর হইলেও, আশা করি ভারতীয় স্বূফীদের মধ্যে কতটুকু ভারতীয় প্রভাব অচ্ছেদ্যভাবে বিজড়িত হইয়া রহিয়াছে, তাহার একটি মোটামুটি আভাস মিলিবে। পাঠকদিগকে কেবল চিন্তা করিয়া দেখিবার অবসর দেওয়া এবং তুলনা করিয়া বুঝিয়া লইবার সুযোগ দেওয়ার জন্যই ইহার পাশে বিশুদ্ধ ঐস্‌লামিক "তব্‌হ্বীদ্"কেও অতি সংক্ষেপে আলোচনায় আনিয়াছি। ভারতীয় স্বূফীদের পরিবর্দ্ধিত "তব্‌হ্বীদ্" হইতে ঐস্‌লামিক "তব্‌হ্বীদ্"টুকুকে বাদ দিলেই দেখা

যাইবে, ইহার অধিকাংশ অবশিষ্টাংশ বিশুদ্ধ ভারতীয় উপাদান হইতে গৃহীত হইয়াছে। হিন্দুদের "সর্ব্বং খল্বিদং" ব্রহ্মবাদ ইহার গোড়ায় অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে রস-সিঞ্চন না করিলে, ভারতীয় সূফীদের এই "তব্‌হীদ্" বা ব্রহ্মবাদ অন্য পথ অবলম্বন করিত, তাহা পরিষ্কার দেখা যাইতেছে। কালক্রমে ভারতীয় সূফী-মতবাদের সহিত উপনিষদ প্রমুখ ভারতীয় দর্শনের চিন্তাধারা ধীরে ধীরে মিশিয়া যাইতেছিল; আর এদেশে সূফী-মতবাদও সেই চিন্তাধারার পরিপুষ্টি সাধন করিতে করিতে ভারতবাসীর হৃদয় জয় করিতে লাগিল।

এ স্থলে, প্রসঙ্গক্রমে আর একটি বিষয়ের প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করা আবশ্যক। ভারতে সূফী-প্রভাব পড়িবার পূর্ব্ব হইতে, সূফী-মতবাদ ভারতীয় চিন্তাধারায় পরিপুষ্ট হইতে থাকে। খ্রীষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে ভারতে সূফী-মত প্রবেশ করে। কিন্তু তৎপূর্ব্ব সূফী-মতেও ভারতীয় দর্শন ও চিন্তাধারার স্পষ্ট ছাপ দেখিতে পাই। পাশ্চাত্য দার্শনিক পণ্ডিতগণ বহু গবেষণার পরেও সূফী-মতবাদের মধ্যে যে ভারতীয় দর্শনের ছাপ রহিয়াছে, তাহাকে অস্বীকার করিতে পারেন নাই। মুসলমানগণ এ কথা স্বীকার করুন বা না নাই করুন, কোন নিরপেক্ষ ও উদার ব্যক্তি এ কথা অস্বীকার করিতে পারিবেন না, যে ভারতীয় চিন্তায় পরিপুষ্ট না হইলে, খ্রীষ্টীয় একাদশ শতাব্দী-পূর্ব্ব সূফী-মত বর্ত্তমানে আমরা যে অবস্থায় লাভ করিতেছি, এরূপ অবস্থায় কখনও লাভ করিতোম না। সে যাহা হউক, সূফী-মতবাদের প্রারম্ভিক কাল হইতে, ইহার উপর ভারতীয় প্রভাব পড়িতে থাকে। খ্রীষ্টীয় একাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত অন্তরাল হইতে সূফী-মতবাদের উপর ভারতীয় চিন্তাধারা প্রভাব বিস্তার করিতে থাকিলেও, ইহার ভারত-প্রবেশের পূর্ব্বে, ভারতীয় চিন্তা প্রকাশ্যভাবে সূফী-মতবাদের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারিয়াছিল বলিয়া মনে হয় না। এত দিন ভারতীয় প্রভাব, অন্তরাল হইতেই, ভারতীয় পুস্তকের আরবী ও ফারসী অনুবাদ ও ভারতীয় (অর্থাৎ বৌদ্ধ) ভ্রাম্যমান সাধু (অর্থাৎ ভিক্ষু) সন্ন্যাসী প্রভৃতির ভিতর দিয়া গোপনে গোপনে উঠন্ত সূফী-মতবাদের মূলে রস-সিঞ্চন করিতেছিল।

অনুবাদের দিক হইতে চিন্তা করিলে দেখিতে পাই, 'অব্বাসী বংশীয় খলীফা 'অল-মন্‌সূর্ (৭৫৪-৭৭৫ খ্রীঃ) এবং হারূন্ 'অ'-র্‌রশীদ্ (৭৮৬-৮০৯ খ্রীঃ) প্রমুখ খলীফাদের পৃথিবীর জ্ঞান-বিজ্ঞান আহরণের চেষ্টাই, প্রাথমিক যুগের সূফীদের সহিত ভারতীয় চিন্তাধারার পরিচয় ঘটাইয়া দিয়াছিল। এই সময়ে অনেকগুলি ভারতীয় পুস্তক, হয় সোজা সংস্কৃত হইতে, নতুবা সংস্কৃত হইতে পাহ্‌লবী (অর্থাৎ প্রাচীন ফারসী) ভাষায় অনূদিত পুস্তক হইতে আরবী ভাষায় অনুবাদিত হয়। এই অনূদিত পুস্তকের মধ্য হইতে, এস্থলে, "বুদ্দ্" পুস্তক (এই পুস্তকে বুদ্ধদেবের মতবাদ লিপিবদ্ধ আছে) এবং "বলোহর্ ব্ বূদাসাফ্" বা "বর্‌লাম্ ও যোসফত্" নামক পুস্তকের নাম করা যায় (১)। (এই পুস্তকে বর্‌লাম্ নামক সন্ন্যাসী কর্ত্তৃক যোসফত্ বা বূদাসাফ্ অর্থাৎ বোধিসত্ত্ব বা বুদ্ধত্বপ্রাপ্তির পূর্ব্বাবস্থায় কোনও ভারতীয় রাজপুত্রের দীক্ষাদানের বিবরণ লিখিত আছে।)

এই যে 'অব্বাসী খলীফাদের সময় হইতে মুসলমানদের বিদেশীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান আহরণের প্রচেষ্টা চলিল, খ্রীষ্টীয় একাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত তাহা কখনও একেবারে থামিয়া যায় নাই। বিদ্যোৎসাহী খলীফাদের সময় জ্ঞান-আহরণের কাজ সুচারুরূপে চলিতেছিল। তাহা ব্যতীত বিশিষ্ট বিশিষ্ট জ্ঞানপিপাসু ব্যক্তিরা নানা দেশ-বিদেশের জ্ঞান-আহরণে জীবন কাটাইয়া দিয়াছেন। এই সকল বিষয় বিস্তৃতভাবে বলিবার স্থান ইহা নহে। যে সকল বিশিষ্ট ব্যক্তি প্রধানতঃ নিজের প্রেরণায়, পরদেশের জ্ঞান-আহরণে নিযুক্ত ছিলেন, তন্মধ্যে এস্থলে বিশ্ববিশ্রুত মহাপণ্ডিত 'অল-বিরূনীর নাম উল্লেখ না করিয়া পারা যায় না। খ্রীষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে তিনি পাতঞ্জল দর্শন ও সাংখ্য সূত্রকে আরবী ভাষায় অনুবাদ করিয়া, মুস্‌লিম জগতের জন্য, রহস্যময় ভারতীয় জ্ঞান ও যোগের দ্বার অবারিত করেন (২)। ভারতীয় সূফীদের পূর্ব্ববর্ত্তীরা

১। (i) Muhammad and Islam—Goldziher. p. 172.
(ii) Indian Islam—Titus. p. 148.

২। History of Indian Literature—Weber. p. 239.

যে ইহার দ্বারা মোটেই প্রভাবিত হয়েন নাই, তাহা নিশ্চয় করিয়া বলিতে যাওয়া মূর্খতা বই আর কিছুই নহে।

বৌদ্ধদিগের সহিত দুই ভাবে প্রাচীন মুসলমানেরা পরিচিত হয়েন। প্রথমতঃ 'অব্বাসী বংশীয় খলীফাদের সময়ে ভ্রাম্যমান বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ আরবের নানা স্থানে ঘুরিয়া বেড়াইতেন। জাহিযে্'র (মৃঃ ৮৬৬খ্রীঃ) বিবরণ হইতে (৩) আমরা এহেন একদল ভারতীয় সাধুর সন্ধান লাভ করি। তাঁহাদিগকে জাহিয্ "যিন্দীক্" সাধু বলিয়া অভিহিত করিলেও, আমরা তাঁহাদিগকে কেবল 'মানী' সম্প্রদায়ভুক্ত (৪) বলিয়া ছাড়িয়া দিতে পারি না। জাহিযে্'র বিবরণ হইতে বুঝা যায়, ইঁহারা ভারতীয় সাধু—বিশেষতঃ বৌদ্ধ ভিক্ষু হউন বা না হউন, অন্ততঃ বৌদ্ধ ভিক্ষু ভাবাপন্ন সাধু ছিলেন। দ্বিতীয়তঃ খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর পূর্ব্বে মুসলমান রাজ্য যখন বুখারা ও সমরকন্দ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া পড়ে, তখন পূর্ব্ব-পারস্য ও ট্রান্সক্সানিয়া প্রভৃতি অঞ্চলে বৌদ্ধ ভিক্ষুদের যথেষ্ট প্রভাব ছিল। যে বল্‌খ্ সহর হইতে অসংখ্য মুসলমান স্বূফী জন্মলাভ করেন, তথায় বৌদ্ধ বিহার তখনও বেশ জাগ্রত ছিল। বল্‌খ্ অধিপতি ইব্রাহীম্ ইব্ন্-'অদ্‌হম্ (মৃঃ ৭৭৭খ্রী) রাজ্যত্যাগ করিয়া বুদ্ধদেবের মতই সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন। (৫)

এ সকল বিষয় চিন্তা করিলে দেখা যাইবে, ভারত-প্রবেশের পূর্ব্ব হইতেই স্বূফী-মতবাদ নানাভাবে ভারতীয় প্রভাবে প্রভাবিত হইতে থাকে। তারপর, খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে স্বূফী-মতবাদ নিয়মিতভাবে ভারতে প্রবেশ করিলে, হিন্দু যোগ ও দর্শনের সহিত তাহার সাক্ষাৎ-পরিচয় ঘটে। তাহা পুস্তকের সাহায্যে যতদূর সাধিত হয় নাই, ভারত-আগত স্বূফীদের সহিত ভারতীয় হিন্দু সাধু-সন্ন্যাসীর সংস্রব সাহায্যে ততোধিক সাধিত হয়। ভারতীয় ও ভারত-আগত স্বূফীদের বিস্তৃত জাবনী পাঠ করিলে, দেখা যায়, তাঁহারা নানা মতাবলম্বী ভারতীয় সাধুদিগকে ইস্‌লাম ধর্ম্মে দীক্ষাদান করিয়াছেন, অথবা ভারতীয় সাধুদিগকে অলৌকিক ক্রিয়াকাণ্ডের কিরামত দ্বারা, কি তর্কের দ্বারা পরাজিত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। খব্‌াজহ্ মু'ঈনু-দ্-দীন্ চিশ্‌তী (১১৪২-১২৩৬ খ্রীঃ) হইতে আরম্ভ করিয়া ভারতবর্ষে প্রত্যেক স্বূফী হিন্দু সাধু-সন্ন্যাসীর সংস্রবে আসিয়াছেন। এহেন সংস্রবের ফলে, উভয় শ্রেণীর সাধকের উপর উভয়ের প্রভাব বিস্তার নিতান্তই স্বাভাবিক।

উপরে, স্বূফী-মতবাদের মধ্যে ভারতীয় প্রভাব প্রবেশের যে সকল পথ নির্দ্দেশ করা হইল, তাহা হইতে স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হইয়া যায়, স্বূফী মতবাদ উদ্ভবের সময় হইতে আরম্ভ করিয়া তাহার ভারতে প্রবেশের পর পর্য্যন্ত, ইহা ভারতীয় প্রভাব হইতে মুক্ত ছিল না। স্বূফী-মতবাদ ভারতে প্রবেশ করিলে, তাহাতে ভারতীয় প্রভাব অসম্ভাবিতরূপে ক্রিয়া করিয়াছিল। নিম্নে আমরা এই ক্রিয়ার স্বরূপ নির্ণয় করিতে চেষ্টা করিতেছি।

আমরা স্থানান্তরে দেখিয়াছি, খ্রীষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর পূর্ব্ব-স্বূফী-মতবাদে, কি প্রবলভাবে বিশ্বব্রহ্মবাদ (Pantheism) দেখা দিয়াছিল (৬)। তাহার মূলে ভারতীয় চিন্তাধারা যদি কোনই ক্রিয়া না করিয়া থাকে, তবে দৃঢ় একেশ্বরবাদী মুসলমান, ইহা কোথা হইতে লাভ করিয়াছিল? সত্যই পৃথিবীর সকল যুগের মর্ম্মবাদী সাধকের মধ্যে, কোন কোন সময় এহেন মানসিকতা প্রকাশ পাইয়াছে;—তাহাদের উপর ভারতীয় প্রভাব আরোপ করা যায় না। তথাপি, স্বূফী-মতবাদের ঐতিহাসিকতা ও পারিপার্শ্বিকতার কথা স্মরণ রাখিলে, ইহার উপর ভারতীয় প্রভাব একেবারে অস্বীকার করা অসম্ভব। হয়ত অপরাপর দেশের মর্ম্মবাদী

৩। Muhammad and Islam—pp. 172-173.

৪। "যিন্দীক" কথার দ্বারা জরথুশ্‌ত্র প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মাবলম্বীকেও বুঝায়। জেন্দ-আবেস্তাই ইহাদের ধর্ম্মগ্রন্থ। ভারতের পার্শী সম্প্রদায় এখন জরথুশ্‌ত্র ধর্ম্মাবলম্বী। এই সকল সম্প্রদায় ইকবেতেনার (Ecbatana) অধিবাসী মানী নামক কোন সাধুপুরুষের শিষ্য। মানীর জীবনকাল ২১৫ হইতে ২৭৬ খ্রীষ্টাব্দ। তিনি তাঁহার শিষ্যদিগকে শিক্ষা দিয়াছিলেন যে, প্রত্যেক বস্তু দুইটি মূল বস্তু হইতে উদ্ভূত হইয়াছে,—আলোক ও অন্ধকার, অথবা ভাল ও মন্দ। ইংরাজীতে এই সম্প্রদায়ের নাম Manichæan. —লেখক।

৫। The Mystics of Islam—R. A. Nicholson. pp. 16—17.

৬। ১৩৩৮ বৈশাখের "বঙ্গলক্ষ্মী" পত্রিকায় মৎলিখিত "স্বূফী-মতবাদের উদ্ভব" শীর্ষক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

সাধকদের মধ্যে যেমন দেখা দিয়াছিল, তেমনই মুসলমান মর্ম্মবাদী সাধকদের মধ্যেও স্বাভাবিকভাবে বিশ্বব্রহ্মবাদ দেখা দিয়াছিল। তথাপি স্বীকার করিতে হয়, এই স্বাভাবিক বিকাশটি ভারতীয় প্রভাবে সজাগ ও বলিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছিল। তাই আমরা দেখিতে পাই, একাদশ শতাব্দীর পূর্ব্ব-সূফী-মতবাদে যে বিশ্বব্রহ্মবাদ দেখা দেয়, তাহা ইস্‌লামী আব্‌ছায়ায় আবৃত; তাহাকে ঠিক "সর্ব্বং খল্বিদং" ব্রহ্মবাদ বলা চলে না। ইহাকে সাবধানতার সহিত মর্ম্মবাদের অস্পষ্ট দিক বলিয়া উল্লেখ করা সমীচীন। এই চিন্তাধারায় শৃঙ্খলা নাই, যেন একটু অস্পষ্ট, যেন একটু বাতুলতাযুক্ত। ইহা যখন পারস্যে আসিয়া কিছুদিন বাস করিল, তখন যেন একটু শৃঙ্খলালাভ করিল, একটু স্পষ্ট হইল। এইরূপ হওয়ার কারণ, ভারতীয় বা আর্য্য-প্রভাব। চিরদিনই ভারত ও পারস্যের আত্মা সমসূত্রে গ্রথিত। ভারত পারস্যের মধ্যস্থতায় হউক কি সোজাসুজিই হউক, সূফীদের উপর প্রভাব বিস্তার না করিলে, সূফী মতবাদ পারস্যে আসিয়া স্পষ্টতর হইত কি না সন্দেহ। তারপর সূফী-মতবাদ যখন ভারতে প্রবেশ করে, তখন হইতে ইহা ভারতীয় প্রভাব-পরিপুষ্ট হইয়া বিশ্বব্রহ্মবাদের ভিত্তি সুদৃঢ় করে। পারস্যবাসী সূফীদের "হমহ্‌ উস্‌ত্‌"—সকল বস্তুই ভগবান—অর্থাৎ বিশ্বব্রহ্মবাদ, ভারতে আসিয়াই পূর্ণভাবে বিকাশ পায়, অর্থাৎ পারস্যের "হমহ্‌ উস্‌ত্‌" ভারতে আসিয়া "সর্ব্বং খল্বিদং" ব্রহ্মবাদে পরিণত হয়।

সূফীদের "ফণা" বা "অহংলোপ"-মতবাদের গোড়ায় ভারতীয় প্রভাব সুস্পষ্ট। পারস্যের অন্তর্গত বিস্‌তামের মর্ম্মবাদী সাধক বায়িযীদ্‌ (মৃঃ ৮৭৪খ্রীঃ) এই মতের প্রতিষ্ঠা করেন। (১) বায়িযীদ্‌ বিস্‌তামীর গুরু 'অবু 'অলী সিন্ধুদেশবাসী ছিলেন (২)। সুতরাং বায়িযীদ্‌ এই মতবাদের ধারণাটি (conception) যে তাঁহার গুরুর নিকট হইতে লাভ করিয়াছিলেন তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। "ফণা"র মধ্যে ভারতীয় প্রভাব নিহিত আছে বলিয়াই, সর্ব্ববিষয়ে না হইলেও, ইহার সহিত অনেক বিষয়ে "নির্ব্বাণ"-মতবাদের মিল রহিয়াছে। জগৎ হইতে সমস্ত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিয়া, 'অল্লাহ্‌র সহিত মিশিয়া যাওয়ার অবস্থার নামই "ফণা"; আর, জগতের পাপ হইতে, কর্ম্ম হইতে মুক্ত হইয়া, ভগবদ্‌প্রাপ্তি ঘটিলে বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বীদের "নির্ব্বাণ' লাভ ঘটে।

ভগবদ্‌-লাভের নূতন পন্থা উদ্ভাবন করিতে গিয়া নক্‌শবন্দীয়হ্‌ মণ্ডলী মানবশরীরে পরমার্থ আলোকের ছয়টি বিশিষ্ট "লত্বীফহ্‌" বা আলোক-কেন্দ্র নির্দ্ধারিত করিয়াছে। ভারতীয় অন্যান্য মণ্ডলীগুলি পরবর্ত্তী সময়ে এই "ষড়্‌-আলোককেন্দ্রকে" স্বীকার করিয়া লইয়াছে। "লত্বীফহ্‌"-সাধনপ্রয়াসী ভারতীয় সূফীদের প্রধান উদ্দেশ্য হইল,—কোন কোন বিশিষ্ট পদ্ধতির অনুসরণ করিয়া "লত্বীফহ্‌"-নির্গত বিবিধ বর্ণের আলোকমালার ধ্যান করিতে করিতে এক এক আলোককে এক কেন্দ্র হইতে অন্য কেন্দ্রে স্থানান্তরিত করা। এইরূপ ভাবে আলোকমালা স্থানান্তরিত করিতে করিতে নাকি সূফীর সমগ্র শরীর আলোকিত হইয়া উঠে, এবং তিনি নিজকে মৌলিক আলোকের (Primal Light) সহিত এক বলিয়া মনে করিতে থাকেন এবং পরিশেষে তাহার সহিত একেবারে মিশিয়া এক হইয়া যান ১)। নক্‌শবন্দীয়হ্‌ মণ্ডলীর এহেন ভগবদ্‌লাভের পন্থা-নির্দ্ধারণ, হিন্দু যোগশাস্ত্রের "কুণ্ডলিনী"-সাধনের অনুকরণ বই আর কিছুই নহে (২)। এই উভয়বিধ পদ্ধতির বিশেষ কোন বিরোধ নাই। ভারত হইতে ইহা লাভ না করিলে এ দেশীয় সূফীরা তাহা কোথা হইতে প্রাপ্ত হইল? প্রধান প্রধান প্রাচীন সূফীরা এবম্বিধ পন্থার বিশেষ কোন আবশ্যকতা উপলব্ধি করেন নাই। প্রকৃতপক্ষে এরূপ পন্থার মধ্য দিয়া ভগবদ্‌প্রাপ্তিকে অনৈসর্গিক পন্থা বলিয়া উল্লেখ করা যায়।

ভারতীয় সূফীদের উপর এদেশীয় প্রভাবের স্বরূপ জানিবার পর, স্বতঃই মনে একটি কৌতূহল জাগে,—কিরূপে এই প্রভাব, সূফী-মতবাদের মত এতখানি বিদেশীয় একটি নূতন চিন্তাধারায় প্রভাব বিস্তার করিল? এবং কখন

১। Encyclopædia of Islam—Article "Yasawul."

২। The Mystics of Islam—P. 17.

১। 'ইর্‌শাদ্‌-ই-খালিকীয়হ্‌— পৃঃ ১২৫-১৩২ (দ্বিঃ সঃ)

২। Development of Metaphysics in Persia—Dr. Iqbal. P. 110.

কি ভাবে তাহার ক্রিয়া চলিয়াছিল? এ প্রশ্নের উত্তর দিতে যাওয়া বিপজ্জনক ও শক্ত ব্যাপার। সাধারণভাবে এইটুকু পর্য্যন্ত বলিতে পারা যায়, দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ ও ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথমভাগ হইতে ইহার আরম্ভ হয় এবং কবীরের পর হইতে তাহা ক্রমশঃ চরমে উঠিতে থাকে। কিরূপে সূফী-মতবাদে ভারতীয় প্রভাব প্রবেশ করিল, তাহার একটি ধারা নির্ণয় করিতে চেষ্টা করিলাম:—

সূফীরা 'অল্লাহ্‌র সংজ্ঞা দিতে গিয়া বলিয়া থাকেন, "'অল্লাহ্‌ আকাশ ও পৃথিবীর আলোক স্বরূপ।" পরবর্ত্তীকালে পরিবর্ত্তিত হইয়া মতটিতে রং ধরিল, "সৃষ্টিই 'অল্লাহ্‌র আলোক স্বরূপ।" অর্থাৎ যেহেতু 'অল্লাহ্‌ আলোক, এবং সৃষ্টি ইহার আলোক স্বরূপ, সেই হেতু সৃষ্টির বাহিরে তাঁহার অস্তিত্ব নাই। সৃষ্টির ভিতর দিয়াই তাঁহাকে প্রকাশিত হইতে হয়, সুতরাং সৃষ্টি না হইলে তাঁহার প্রকাশ হয় না;—ইত্যাকার মত দাঁড়াইয়া যাইতে লাগিল। আরও পরবর্ত্তীকালে ইহার সহিত উপনিষদের সৃষ্টিবাদ মিলিত হইয়া আরও একটু নূতন রং ধরিল। এই সৃষ্টিবাদের মিলনের ফলে সূফীদের মধ্যে কত যে নূতন নূতন সৃষ্টিরহস্যের উদ্ভব হইল, তাহার ইয়ত্তা নাই।

সূফীরা বলিয়া থাকেন, ইসলামে "শরী'অত" বা কর্ম্মভাগের যেমন "কলিমহ্", "নমায্", "রোযহ্" (রোজা), "হজ্জ্" ও "যকাত্" এই পাঁচটি সর্ব্বপ্রধান বিষয় রহিয়াছে, তেমই "ত্বরীকত" বা মর্ম্মভাগেরও "ধিক্র্" (জপ), "রাবিতা" (সংযোগ-সূত্র) ও "মুরাকিবহ্" (ধ্যান) এই তিনটি প্রধান বিষয় রহিয়াছে। কর্ম্মভাগের কর্ত্তব্য-পঞ্চকের কোন একটি পালন অথবা বিশ্বাস পর্য্যন্ত না করিলে যেমন প্রকৃত মুসলমান হওয়া যায় না, ঠিক তেমনই মর্ম্মভাগের ত্রিকর্ত্তব্যের কোন একটি সম্পাদন না করিলেও নাকি প্রকৃত সাধক হওয়া যায় না।

ধিক্র্ বা জপ:—খুদার পবিত্র নাম "'অল্লাহ্" শব্দকে সতত জপ করার নাম "ধিক্র্"। মনকে সংসার-চিন্তা হইতে বিশুদ্ধ ও নির্ম্মল করিয়া, কেবল ভগবদ্‌চিন্তায় বিভোর রাখিবার জন্য, প্রাথমিক অনুষ্ঠান হইল "ধিক্র্"। কোন মানসিক বিষয় সাধন করিতে হইলে, সে বিষয়ে গভীর একাগ্রতা নিতান্ত প্রয়োজন। ভগবানের চিন্তায় একাগ্রতা বৃদ্ধির জন্য, এই "ধিক্র্" আবশ্যকীয়। ইহা যেন বীজ বপনের পূর্ব্বে ক্ষেত্র প্রস্তুত করিবার পন্থা। মনকে সমস্ত চিন্তা হইতে ফিরাইয়া লইয়া একমাত্র ভগবদ্-চিন্তায় পরিচালিত করিতে হইলে, ভগবানের নাম সতত ভক্তিভরে জপ করিতে হয় এবং তদ্দ্বারা ভক্তের সমস্ত চিন্তা ভগবানময় হইয়া যায়। এইরূপ ভাবে, ভগবদ্‌ চিন্তায় মানবহৃদয় ভরপুর হইয়া উঠিলে, মানব ভগবান সম্বন্ধে ধারণা করিতে সমর্থ হয়।

সূফীদের এই "ধিক্র্" কালক্রমে ভারতীয় কৃচ্ছ্রসাধন-মূলক জপে পরিণত হইল। ভারতীয় সাধু-সন্ন্যাসীরা যে প্রণালীর সাহায্যে ভগবানের নাম জপ করিতেন, ঠিক সেই প্রণালীর অনুসরণ করিয়া ভারতীয় সূফীরা পূর্ব্ব-সূফীদের "ধিক্র্"কে বিশুদ্ধ ভারতীয় "প্রাণায়ামে" পরিণত করিতে লাগিল। পূর্ব্ববর্ত্তী সূফীদের সরল সহজ "ধিক্র্"কে কতকগুলি বিশিষ্ট বিশিষ্ট প্রকরণ, বিশেষ বিশেষ ভাব, নির্দ্দিষ্ট সময় এবং স্থিরীকৃত সংখ্যার গণ্ডীর মধ্যে ফেলিয়া, নিরুদ্ধ নিশ্বাস ও দৈহিক কৃচ্ছ্রতার আমদানী করিয়া ভারতীয় সূফীরা ইহাকে সাধু-সন্ন্যাসীর তপ-জপ-প্রাণায়ামের পর্য্যায়ে আনিয়া দাঁড় করাইলেন। সূফীরা যে ধীরে ধীরে মূল হইতে সরিয়া পড়িতেছিলেন, তাহা হয়ত প্রথমতঃ তাঁহারা বুঝিতে পারেন নাই,—কিন্তু তাঁহারা যে সরিয়া পড়িতেছিলেন, তাহা নিতান্তই সত্য।

রাবিতা বা সংযোগ-সূত্র:—"রাবিতা" শব্দের মৌলিক অর্থ হইল সংযোগ সূত্র। বাঞ্ছিতের সঙ্গে সংযোগ-সাধনের জন্য, পরমার্থ বিষয়ে অভিজ্ঞ ও পরিপক্ক ব্যক্তির সদুপদেশ ও সাহায্য লইয়া, বাঞ্ছিত ও বাঞ্ছাকারীর মধ্যে মিলন ঘটিলে, উপদেশদাতা ও বাঞ্ছাকারীর মধ্যে প্রধানতঃ ভক্তিবিমিশ্র কৃতজ্ঞতামূলক যে সম্বন্ধ সংস্থাপিত হয়, তাহা বাঞ্ছিত ও বাঞ্ছাকারীর মিলনে যে নৈতিক যোগসূত্র রচনা করে, তাহার নাম "রাবিতা"। পরমার্থ বিষয়ে উপদেশদাতার নাম "মুর্‌শিদ" (সৎপথে পরিচালক) বা গুরু। "রাবিতা"র কোথাও গুরুপূজার বা গুরুধ্যানের কথা নাই। গুরু পরমার্থ বিষয়ে অভিজ্ঞ বলিয়া ভক্তকে উপদেশ দান করেন, আর ভক্ত তাঁহার উপদেশানুযায়ী কাজ করিয়া স্বীয় চেষ্টায় বাঞ্ছিতের সঙ্গে মিলিত হন। ইহা ঠিক জ্ঞানলাভের পথে

শিক্ষকের কাজ। শিক্ষার্থী শিক্ষকের উপদেশমত কাজ করিয়া যে জ্ঞানার্জ্জন করে, তাহা তাহার নিজস্ব চেষ্টা, একাগ্রতা ও ঐকান্তিক আগ্রহের মধুময় ফল। অর্জ্জিত জ্ঞান ও শিক্ষার্থীর যোগসূত্রে শিক্ষকের একটি নৈতিক সম্বন্ধ রহিয়াছে। এইজন্য শিক্ষার্থীর নিকট হ'তে শিক্ষক নৈতিক ভক্তি লাভ করিবার একান্তই যোগ্য, কিন্তু পূজার বা ধ্যানের পাত্র নহেন। অথবা এমনও নহে,—হৃদয়ের সমগ্র একাগ্রতা ও ভক্তি দিয়া অহোরাত্র কেবল শিক্ষকের পূজা করিলে, কিংবা শিক্ষকের মূর্ত্তি ধ্যান করিতে থাকিলে আর শিক্ষার্থী স্বয়ং জ্ঞানার্জ্জনে নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকিলে, জ্ঞান আপনিই শিক্ষার্থীর ভিতর প্রবেশ করিবে।

প্রাথমিক যুগের স্থূফীরা এহেন পবিত্র "রাবিতা"র কথাই চিন্তা করিতেন। ইহাতে অনৈস্লামিক কোন কথা নাই। ধীরে ধীরে এই "রাবিতা" সরিয়া গিয়া "ফণা ফী-শ্-শয়্খ্" বা "গুরুত্বে বিলীন" অবস্থায় আসিয়া দাড়াইল। এই "ফণা ফী-শ্-শয়্খ্" হইল, শিক্ষার্থী তাহার অভীপ্সিত আধ্যাত্ম জ্ঞানলাভের কথা ভুলিয়া, নিজের স্বাধীন ইচ্ছা ও মুক্তবুদ্ধির ক্রিয়াকে, গুরুর ইচ্ছা ও বুদ্ধির মধ্যে সম্পূর্ণভাবে লীন করিয়া দিয়া, স্বয়ং নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া জ্ঞানলাভের প্রত্যাশা করা। আরও ভীষণ কথা হইল,—এই অবস্থায় শিষ্যকে, গুরুর বিদ্যমানতায় কি অবিদ্যমানতায় সকল ক্ষেত্রে ও সকল সময়ে, কেবল গুরুর মূর্ত্তিকেই হৃদয়ের মধ্যে অঙ্কিত করিয়া ভক্তি-শতদলে পূজা ও স্তিমিতনেত্রে ধ্যান করিতে হয়। ভগবানের কথা দূরে রাখিয়া, বাঞ্ছিতের কথা ভুলিয়া কেবল গুরুর মূর্ত্তি ধ্যান করা কি ঐস্লামিক?

এই "রাবিতা" ভারতে আসিয়া কালক্রমে "ফণা ফী-শ্-শয়্খ্" হইতেও অনৈস্লামিকতার দিকে অগ্রসর হইয়া পড়িল। ভারতের মূর্ত্তিপূজা ও ভক্তিবাদ "ফণা ফী-শ্-শয়্খ্"কে পূজার খেয়ালে এবং তদানুষঙ্গিক ভক্তির প্রাবল্যে ভরিয়া দিল। "রাবিতা" সর্ব্বপ্রথম নৈতিক যোগ-সূত্র ছিল; পরে গুরুময় ভাবে পূর্ণ হইয়া উঠিয়া উপায়ের দ্বারা অভীষ্ট পশ্চাতে পড়িয়া গেল; আরও পরে ভারতে আসিয়া তাহা স্পষ্ট গুরুপূজা এবং দেবোপম ভক্তির আমেজে রঙীন হইয়া উঠিল। ভারতীয় স্থূফীদের মতে আধ্যাত্মিক পথযাত্রী (সালিক্) নিরাকার ও নিরুপম ভগবানকে অন্তরে ধারণা করিতে পারেন না বলিয়াই নাকি সাকার ও উপমাযোগ্য গুরুর প্রতিমা অন্তরে ধ্যান করিবে, তাঁহাকে দেবতার ন্যায় ভক্তি করিবে, এবং তাঁহার কথাকে কোরাণের কথা হইতেও সমধিক জ্ঞান করিবে। ইহা যেন হিন্দু দার্শনিকের প্রতিমা-পূজার সাপক্ষে দর্শনসম্মত ব্যাখ্যা: নিরাকার ভগবানকে ধারণা করিতে সাধারণের পক্ষে কষ্ট হয় বলিয়া, কর্ম্মভেদে তাহার বিভিন্ন কাল্পনিক মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া তাহার ভিতর দিয়া সেই নিরাকার ভগবানকে পূজা ও ভক্তি করার বিধান। "রাবিতা"র উপর এহেন অসম্ভব ভারতীয় প্রভাবের ফলে, ভারতের সর্ব্বত্র, বিশেষতঃ সমগ্র বাঙ্গালাদেশে অজ্ঞ অশিক্ষিত লোকদের মধ্যে আজ ভীষণভাবে পীরপূজা, তাঁহাদের প্রতি দেবোপম ভক্তির বহুল প্রচলন, এমন কি তাঁহাদের মৃত্যুর পর গোরপূজা প্রভৃতি অসংখ্য অনৈস্লামিক কুসংস্কারের প্রচলন হইয়া, তাহা একশ্রেণীর মুসলমানের ধর্ম্মের অঙ্গীভূত বস্তুতে পরিণত হইয়া গিয়াছে।

মুরাকিবহ্ বা ধ্যান:—"ধিক্‌র্" বা জপ দ্বারা হৃদয়কে বিশুদ্ধ ও নির্ম্মল করিয়া, "রাবিতা" বা সংযোগসূত্রের দ্বারা অভিজ্ঞ গুরুর সদুপদেশ লাভ করার পর, ধীর, স্থির ও প্রশান্ত চিত্তে বসিয়া, সংসারের কথা ভুলিয়া গিয়া 'অল্লাহ্'র ধ্যান করার নাম "মুরাকিবহ্"। এইরূপভাবে পবিত্র, উপদিষ্ট, ধীর ও প্রশান্তমনে 'অল্লাহ্'র ধ্যান করিতে করিতে, মানুষ স্বাভাবিকভাবে জ্যোতির্ম্ময় 'অল্লাহ্‌কে জ্যোতিষ্মান দেখিতে পান এবং সেই অপরূপ জ্যোতিতে আপনাকে বিলীন করিয়া দিয়া মানুষ আপনার অস্তিত্বের কথা ভুলিয়া যান। ইহাই "ফণা ফীল্লাহ্" বা "পরমার্থে বিলীন" অবস্থা।

স্থূফী-মতবাদ ভারতে আসিবার পর হইতে, এই "মুরাকিবহ্"র মধ্যেও পরিবর্ত্তন দেখা দিল। কালক্রমে ভারতীয় স্থূফীরা ইহাতে নির্দ্দিষ্ট ভঙ্গীর বৈঠক, বিশিষ্ট প্রকারের মনঃসংযোগের উপায় এবং বিশেষ বিশেষ ধ্যান-ধারণার নূতন নূতন প্রণালীর আমদানী করিয়া ফেলিলেন। এই আমদানীর ফলে, ইহা যে ভারতীয় যোগ-শাস্ত্রের পর্য্যায়ভুক্ত হইয়া উঠিতেছিল, তাহা তাঁহারা বুঝিতে

পারিয়াছিলেন কিনা জানি না। আদি স্বূফীদের সরল ও "মুরাক্কিবহ্" ভারতে আসিয়া কয়েক শতাব্দীর মধ্যেই এইরূপে যোগশাস্ত্রের "আসন","ধারণা" ও "সমাধি"র যোগে চতুর্ব্বেণীতে পরিণত হইয়া উঠিল। যোগ ও স্বূফী-মতবাদের সম্মিলনে, ভারতে যে চতুর্ব্বেণীর নবতীর্থ প্রতিষ্ঠিত হইল, তাহাতে কেবল যে ত্রিবেণীভক্ত ভারতবাসী হিন্দু অবগাহন করিয়া পরমার্থপথ উন্মুক্ত করিবার চেষ্টা করিল, তাহা নহে, পীরপূজক মুসলমানও ইহার মিশ্রিত সলিলে স্নান করিয়া 'অল্লাহ্'র সহিত সম্মিলনের পথ অন্বেষণ করিতে লাগিল।

উপরে, ভারতীয় স্বূফী-মতবাদের প্রবেশ, প্রতিষ্ঠা, বিস্তৃতি, পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করিতে গিয়া, শুধু স্বীয় কৌতূহল নিরাকরণার্থে যে সামান্ত অনুশীলন করিয়াছি, তাহার ফল সন্নিবেশিত হইল। বিষয়টি এত বিস্তৃত, বিশাল ও কৌতূহলজনক যে, অল্পকথায় বলিতে পারা একরূপ মুস্কিল। তাই, বিষয়টিকে ক্ষুদ্র করিতে গিয়া অনেক আবশ্যকীয় কথাও বাধ্য হইয়া বাদ দিতে হইয়াছে। এই কারণে, বিশেষতঃ এত বিস্তৃত বিষয়ে আমার সম্যক্ জ্ঞানের অভাবে, বিষয়টি অনেকস্থানে অসম্পূর্ণ রহিয়া গেল। আশা করি, পাঠকগণ আমাকে ক্ষমা করিবেন।

কাঁচা

আচার্য্য শ্রী বিজয়চন্দ্র মজুমদার বি-এল্

মোহিয়া হিয়া উদয় তব রোদনে-ধোয়া রূপে ;
সহে না দেহে ছোঁয়ার ভর হাওয়ায় যাও উপে।
কোমল, তবু ঝাঁকিয়া যাও হাড়ের গড়া খাঁচা ;
গন্ধে রসে পরশি' যাও ওগো ও কচি, কাঁচা।

তরুণ করি' পুরানো আশা করুণ চোখে চাহ ;
দীপিয়ে দাও নিবানো হাসি, নিবিয়ে যাও দাহ।
ধাঁধার পরে আনিয়ে দাও, সাঁচার পরে সাঁচা ;
নিত্য নব নবীন দাও ওগো ও কচি, কাঁচা।

প্রেমের ঝোঁকে নোয়ানো বুকে প্রপাত-ধারা ঝরে ;
আলোকে-ঝলা সলিলে কেঁপে তোমার ছায়া পড়ে
পুলকে হয় উচ্ছ্বসিত আমার মরা-বাঁচা ;
করুণ ধারে তরুণ কর ওগো ও কচি, কাঁচা।

শিশু-অপরাধী

শ্রী নীরজবাসিনী সোম বি-এ, বি-টি

আপনাদের কাছে আজ এখানে ছেলেমেয়েদের কথা কিছু বল্‌ব। এদের চেয়ে আনন্দদায়ক পৃথিবীতে আর কিছু নেই। তাই যীশু খ্রীষ্ট বলেছিলেন, "শিশুদিগকে আমার নিকটে আসিতে দেও, বারণ করিও না, কারণ স্বর্গরাজ্য এইমত লোকদেরই।" শুধু স্বর্গরাজ্য নয়,—তারা গৃহের সম্পদ, রাষ্ট্রের সম্পদ, তাই প্রত্যেক নারীর কর্ত্তব্য সন্তানদের এই সকল মহামূল্য সম্পদের উত্তরাধিকারী হবার উপযুক্ত ক'রে গ'ড়ে তোলা। আজ আপনাদি'কে যাদের কথা বল্‌ব তারা সুখময় গৃহের আবেষ্টনের মধ্যে পিতামাতার স্নেহযত্নে লালিত-পালিত সাধারণ ছেলে নয়; এদের জুভেনাইল অফেণ্ডার বা শিশু-অপরাধী বলে।

যে সকল হতভাগ্য শিশু পিতামাতার অনবধানতায় বা অবহেলায় অসৎ সংসর্গে প'ড়ে উচ্ছৃঙ্খল হ'য়ে যায় এবং আইনভঙ্গ অপরাধে অপরাধী হ'য়ে আদালতের কাঠগড়ায় এসে দাঁড়ায়, আমি তাদেরই কথা বল্‌তে যাচ্ছি। বয়ঃপ্রাপ্ত সাধারণ অপরাধীদের মত তাদের বিচার করা চলে না। বিভিন্ন দেশের গভর্ণমেণ্ট তাই এদের বিচারের পৃথক ব্যবস্থা ক'রে তার পরিচালনের জন্য নারীদের সাহায্য নিয়েছেন। বালক-বালিকাদের কোন কাজে নারীকে বাদ দেওয়া চলে না। ইউরোপ আমেরিকার সমস্ত দেশ তা মেনে নিয়েছে। বাঙ্গালী মায়ের মত ছেলে ভালবাস্‌তে পৃথিবীর অন্য কোন দেশের মেয়েরা পারে না। এই সকল শিশু-অপরাধীদের নৈতিক উন্নতি ও সংশোধনের ভার নেবার জন্য তাঁদেরই প্রস্তুত হ'তে হবে। তাদের মানুষ ক'রে দিতে মা'রা ছাড়া আর কেউ পারবে না।

ইংরাজি ১৮৯৭ সালে শিশু-অপরাধীদের সংশোধন ও নৈতিক উন্নতির উদ্দেশ্যে ভারতের সব প্রদেশের জন্য রিফর্মেটারি স্কুলস্ এক্ট (Reformatory Schools Act) নামে একটি আইন বিধিবদ্ধ হয়। এই আইনের মধ্যে শিশু-অপরাধীদের সংশোধনের জন্য নানাস্থানে স্কুল স্থাপন করবার প্রস্তাব আছে। কিন্তু সমস্ত ভারতের অভাবের পক্ষে এই আইন তাদৃশ কার্য্যকরী হয় নি। ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডে সর্ব্বপ্রথম শিশুরক্ষণ আইন হয়। তাহার বারো বৎসর পরে যথাক্রমে মান্দ্রাজ, কলিকাতা এবং বোম্বাই ও তাদের সহরতলীগুলিকে শিশুরক্ষণ আইনের অধীনে আনা হয়।

আমাদের দেশে প্রবর্ত্তিত শিশুরক্ষণ আইনের একটা মস্ত গলদ হ'চ্ছে এই যে কেবল মাত্র মান্দ্রাজ, কলিকাতা ও বোম্বাই সহর এই আইনের অধীন। এই প্রধান তিনটি সহরের বাইরে কোন জেলা এই আইনের অধীন নয়। এই সকল স্থানে শিশু-অপরাধিগণ প্রায় সাধারণ বয়ঃপ্রাপ্ত অপরাধিগণের মতই পরিগণিত হ'য়ে থাকে। আপনারা সকলেই স্বীকার করবেন বালকগণকে সাধারণ অপরাধীর দলে ফেলা নিতান্ত অবাঞ্ছনীয়। এখন আমাদের উচিত যাতে এই আইন সমস্ত জেলায় কার্য্যকরী হয়, তার জন্য চেষ্টা করা। এইপ্রকার শিশুরক্ষণ আইনের মধ্যে নিম্নলিখিত ব্যবস্থাগুলি থাকা উচিত:—

১। বিচারাধীন সময়ে শিশু-অপরাধীদের জন্য পৃথক আটক-ঘরের ব্যবস্থা।

২। শিশুদের বিচারের জন্য পৃথক আদালত এবং সেই সকল আদালতে মহিলা ম্যাজিষ্ট্রেট কর্ত্তৃক বিচারের ব্যবস্থা।

৩। অপরাধী ছেলেমেয়েদের জন্য সংশোধনাগার ও শিল্প-বিদ্যালয়গুলি সরকারী শিক্ষা বিভাগের অধীনে রাখা। সংশোধনাগারে ছোট ও বড় ছেলেদের জন্য পৃথক পৃথক শ্রেণীর ব্যবস্থা।

৪। অপরাধী বালক-বালিকাগণকে পরিদর্শন ও

স্নেহভালবাসার ভিতর দিয়া উপদেশ দিবার জন্য উপযুক্ত ব্যক্তি নিয়োগ,—বিশেষভাবে মহিলাগণকে এই কার্য্যে নিয়োগ (Probation Officer)।

বোম্বাই, মাদ্রাজ ও বাংলা দেশে যে শিশুরক্ষণ আইন হয়েছে তাতে অনেক পরিমাণে পূর্ব্বোক্ত ব্যবস্থাগুলি প্রচলিত আছে। প্রথম যে শিশু-অপরাধীদের সংশোধন আইন হয়েছিল তার চেয়ে পরের শিশুরক্ষণ আইনটি অনেক ভাল। কিন্তু দেশের অতি সামান্য অংশেই তা প্রবর্ত্তিত। আমাদের এখন বিশেষ দরকার যাতে ভারতের সবস্থানে এই আইন জারী হয়। উক্ত আইনে আমরা কি কি চাই, আরও বিশদ ভাবে বল্‌ছি।—

(১) বিচারাধীন থাক্‌বার সময় ছেলেদের জন্য পৃথক আটকঘর রাখ্‌তে হবে। প্রাপ্তবয়স্ক অপরাধিগণের নিকট হ'তে বালকদের পৃথক রাখা,—বিশেষ ভাবে তাদের শারীরিক, মানসিক ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা উত্তমরূপে পর্য্যবেক্ষণ করা। কোন্‌দিকে তাদের ক্ষমতা এবং কোন্‌দিকে দুর্ব্বলতা এইগুলি উত্তমরূপে পরীক্ষা কর্‌বার জন্যই এইরূপ আটকঘর দরকার। অপরাধী বালক-বালিকাগণকে আলাদা আটকঘরে রেখে পর্য্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা কর্‌লে আদালতও কার বিষয়ে কি ব্যবস্থা করা যেতে পারে, তা ভালরূপে বুঝ্‌তে পার্‌বেন।

কলিকাতায় লোয়ার সার্কুলার রোডে একটি দোতালা বাড়ীর উপরতালায় শিশু-অপরাধীদের জন্য এইপ্রকার আটকঘর (House of Detention) আছে। নীচের তালায় কোর্ট বসে। বিচার শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত ছেলেরা কাগজের ঠোঙা তৈরী কর্‌তে শেখে।

২।, তারপর দ্বিতীয় কথা :—সব জায়গায় ছেলেদের বিচারের জন্য পৃথক আদালত স্থাপন কর্‌তে হবে। বিশেষ বিবেচনা ক'রে এই সকল আদালতে ম্যাজিষ্ট্রেট নির্ব্বাচন করা আবশ্যক। সহানুভূতি সম্পন্ন, দূরদর্শী এবং তীক্ষ্মবুদ্ধিশালী ব্যক্তিগণকে শিশু-আদালতের ম্যাজিষ্ট্রেট করা উচিত। শিশু-অপরাধীর সঙ্গে সাধারণ চোর-ডাকাতের মত ব্যবহার করা উচিত নয়। বিপথগামী শিশুকে সুপথে ফিরিয়ে আন্‌বার জন্য তা'দি'কে গভীর সহানুভূতির সহিত ভবিষ্যৎ ভালর দিকে লক্ষ্য রেখে শাসন কর্‌তে হবে। এই স্থানেই নারীহৃদয়ের স্নেহসলিল-সিঞ্চন অত্যাবশ্যক। সংসারে একমাত্র নারীই শিশুকে প্রকৃত ভালবাস্‌তে পারে, তাদের প্রকৃত অভাব অনুভব কর্‌তে পারে। ইউরোপ আমেরিকার সমস্ত দেশ নারীর এই অধিকারকে মেনে নিয়েছে। তাই সেখানকার শিশু-আদালতগুলিতে মহিলারা ম্যাজিষ্ট্রেটের কাজ করেন। বহুদিন পরে মাত্র কয়েক বৎসর হ'ল এদেশের বোম্বাই ও মাদ্রাজে শিশু-আদালতে মহিলা-ম্যাজিষ্ট্রেট রাখার ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হয়েছে। কিন্তু কলিকাতায় এখনও হয় নি। শিশুদের বিচার মহিলাদের দ্বারাই হওয়া উচিত। সমস্ত ভারতবর্ষে যেখানে যেখানে শিশু-আদালত হবে সব জায়গাতেই যাতে মহিলা-ম্যাজিষ্ট্রেট রাখা হয় তার ব্যবস্থা করা অত্যাবশ্যক।

৩। তারপর শিশু-অপরাধীদের সম্বন্ধে ব্যবস্থার তাদের সুশিক্ষা দিয়ে সংশোধন করার রীতিই সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম। এজন্যে সম্ভব হ'লে প্রথম অপরাধী—যাদের বাড়ীর অবস্থা অপেক্ষাকৃত ভাল—তা'দি'কে পিতামাতার কাছে ফিরিয়ে দেওয়া উচিত। অথবা এমন যদি কোন লোক থাকে যে তাদেরকে ভালবেসে সংশোধন ক'রে দিতে পারে তবে তার কাছে রাখা উচিত। অপরাধী শিশুকে সৎশিক্ষা দেওয়ার জন্য এবং ভালরূপ পর্য্যবেক্ষণ কর্‌বার জন্য উপযুক্ত তত্ত্বাবধায়কের প্রয়োজন। এই সকল ব্যক্তিকে ইংরাজিতে Probation Officer (তত্ত্বাবধায়ক) বলে। ছেলেদের উপযুক্ত সৎশিক্ষা দেবার উপযুক্ত ব্যক্তিকেই কেবল Probation Officer পদে নিযুক্ত করা উচিত। কারণ অপরাধী বালকগণকে শিক্ষা দেওয়া আরও শক্ত। কেবল-মাত্র অপরাধী ছেলেদের শিক্ষার ব্যবস্থা কর্‌লেই চল্‌বে না, উপরন্তু সেই সব ছেলেদের পিতামাতার ঘরের আবহাওয়াকে পরিবর্ত্তন ক'রে বন্ধুভাবে তাদের গৃহেও সদ্ভাবের বীজ বপন কর্‌তে হবে—যার দ্বারা পিতামাতার কাছে ফিরে গিয়ে শিশুর স্বভাব পরিবর্ত্তিত হ'য়ে ভালর দিকে যায়। এখানেও শিশুকে সৎশিক্ষা দিবার জন্য নারীর প্রকৃতি-সুলভ স্নেহের আবশ্যক। মাতৃত্বের সুশীতল আশ্রয় ভিন্ন শিশুদের মনে সদ্‌গুণের বিকাশ হয় না—জননী-হৃদয়ের সহজাত অনুরাগ ব্যতীত তাহাকে সুপথে চালনা করা যায় না। এই জন্য মহিলা Probation Officer (তত্ত্বাবধায়ক) নিযুক্ত করা

একান্ত আবশ্যক। উক্ত বিষয়ে বিশেষজ্ঞ শিক্ষাবিদ্‌গণের সাহায্য ও সহযোগিতা একান্ত প্রয়োজন।

বালকদের অবসরকালের প্রতি যাতে লক্ষ্য রাখা হয় তার জন্য বিশেষ চেষ্টা কর্‌তে হবে। অনেক পিতৃমাতৃ-পরিত্যক্ত গৃহহীন বালক নিষ্কর্ম্মা হ'য়ে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়ায়। বাপ-মা তাদের খোঁজ-খবর নেয় না—কাজেই আস্তে আস্তে তারা কুসংসর্গে প'ড়ে যায়। চোর, বদমাস, কোকেন-খোর্‌রা এই সব ছেলেদের ভুলিয়ে নিজেদের স্বার্থ-সিদ্ধির জন্যে চুরি কর্‌তে শেখায়। যখন বালকদের কোন কাজ থাকে না সেই সময়ে তাদের মনোরঞ্জনের জন্যে নানারূপ খেলা, সিনেমা, ম্যাজিক লণ্ঠন দেখান প্রভৃতি আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা থাকা দরকার। যাঁরা Probation Officer বা সরকার-নিযুক্ত তত্ত্বাবধায়ক থাকবেন তাঁ'দি'কে রাস্তার ছেলেদের জন্যে বিশুদ্ধ আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা কর্‌তে হবে। দেশহিতব্রত প্রত্যেক ব্যক্তির উচিত এই সব ছেলেদের পাপের পথ হ'তে দূরে রাখ্‌বার চেষ্টা করা, তাদের কাজ যোগাড় ক'রে দেওয়া এবং যাতে পিতামাতার সংসর্গে ভাল আবহাওয়ার ভিতর তারা জায়গা পায় তার ব্যবস্থা করা। পাশ্চাত্য দেশে প্রধানতঃ মেয়েদেরই চেষ্টাতে এই সকল সমাজসেবার কাজ সাফল্যমণ্ডিত হয়েছে। আমাদের দেশেও আজকাল মেয়েরা সমাজসেবার কাজে অনুপ্রাণিত হয়েছেন। প্রত্যেক নারী-প্রতিষ্ঠানের কর্ত্তব্য দেশের দরিদ্র, নিঃসম্বল, অযত্নবর্দ্ধিত এই বালকদের উন্নত স্তরে নিয়ে যাবার জন্যে কিছু করা।

তারপর যে সকল বালকদের উপযুক্ত অভিভাবক নাই তাদের জন্যে সংশোধনাগার (Reformatory) এবং শিল্পবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা একান্ত প্রয়োজন। এই সকল স্কুলকে সরকারী শিক্ষা বিভাগের কর্ত্তৃত্বাধীনে এনে আজকাল গভর্ণমেণ্ট সুব্যবস্থার পরিচয় দিয়েছেন। তবে বর্ত্তমানে শিশু-অপরাধীদের জন্যে স্কুল ও শিল্পবিদ্যালয়ের সংখ্যা খুবই কম। দেশের সমস্ত অভাব দূর কর্‌তে হ'লে আরও অনেক হওয়ার দরকার। ১০ হ'তে ১৮ বছরের অপরাধী ছেলেদের এক বাড়ীতে রাখা উচিত নয়। একমাত্র মান্দ্রাজে ছোট ও বড় ছেলেদের জন্যে পৃথক ব্যবস্থা আছে। মান্দ্রাজের দৃষ্টান্ত সবস্থানেই অনুসরণ করা উচিত।

তার পরে দেখা যায় অনেক ছেলের পাপপ্রবৃত্তির কারণ তাদের মানসিক বিকৃতি। এই মানসিক বিকৃতির উপযুক্ত চিকিৎসার ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। তাই ডাক্তার দিয়ে এই সকল বালকের পরীক্ষা কর্‌তে হবে। মনোবিজ্ঞানবিদেরাও এ বিষয়ে সাহায্য কর্‌তে পারেন। তাহ'লে শিশু-আদালতের কর্ত্তৃপক্ষেরা কোন্ বালকের সম্বন্ধে কিরূপ ব্যবস্থা কর্‌তে হবে বুঝ্‌তে পার্‌বেন। পাশ্চাত্য দেশে অপরাধীর মানসিক কারণগুলি সম্বন্ধে অনেক বড় বড় গবেষণা হ'য়ে গেছে। কিন্তু আমাদের দেশ সে বিষয়ে বড়ই পশ্চাৎপদ। মানসিক স্বাস্থ্য বিষয়ে গবেষণা কর্‌বার জন্য সম্প্রতি যে দেশীয় প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়েছে তার নাম Indian Association of Mental Hygiene। এই প্রতিষ্ঠানের কাজ এখনো বেশীদূর অগ্রসর হয় নি। কলিকাতায় ব্যবহারিক মনোবিজ্ঞান শিক্ষা দিবার জন্য যে কলেজ আছে তাতে সম্প্রতি অপরাধী বালকদের মানসিক অবস্থা বিষয়ে গবেষণা করা হয়। কিন্তু দুর্ব্বল ও বিকৃত মনের ছেলেদের চিকিৎসার জন্য কোন প্রতিষ্ঠান নাই। এই অভাবটি অচিরে দূরীভূত হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয়।

পূর্ব্বে বালকদের সম্বন্ধে যা বলেছি বালিকাদের সম্বন্ধেও তা' খাটে। বালক-অপরাধীদের মতন বালিকাদের জন্য উপস্থিত কোন বন্দোবস্ত নাই। তাদের জন্য পৃথক ব্যবস্থা হওয়া একান্তই প্রয়োজন। বালিকাদের আলাদা আটকঘর বা "হাউস অফ ডিটেনশন" এবং রিফর্মেটারি স্কুল ও শিল্পবিদ্যালয়ের ব্যবস্থা কর্‌তে হবে।

বালক-অপরাধীদের সমস্যা মোটেই অবহেলা কর্‌বার নয়। দেশের সমস্ত নারীপ্রতিষ্ঠান যাতে একযোগে কাজ ক'রে এই সমস্যা উত্তমরূপে সমাধান কর্‌তে পারেন তার জন্য বিপুল চেষ্টা কর্‌তে হবে। বিভিন্ন প্রদেশের নারী-প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিগণকে নিয়ে একটা সুসঙ্গত বিধি প্রণয়ন অত্যাবশ্যক।

প্রত্যেক শিশুর জীবন অতি মূল্যবান—তারাই দেশের ভবিষ্যৎ আশা—তারাই সংসারে আনন্দের প্রতিরূপ। তাই কারও জীবন তুচ্ছ নগণ্য নয়। সুযোগ-সুবিধা দিলে তারাও সফল ও উন্নত হ'য়ে জাতির সম্পদ বাড়িয়ে দেবে।

একটি ছেলের জীবনও যদি সফল হয় তাহ'লে সমস্ত জগতের কল্যাণ হবে। আজ যে সামান্য অপরাধী শিশু সে-ই হয়ত একদিন জাতির ভবিষ্যৎ নেতা হবে।

তাই আমি কবির ভাষায় জননীদের আহ্বান ক'রে বল্‌ছি :—

ইহাদের করো আশীর্ব্বাদ,—
ধরায় উঠেছে ফুটি' শুভ্র প্রাণগুলি,
নন্দনের এনেছে সংবাদ।
কোলে তুলে' লও এরে এ যেন কেঁদে না ফেরে
হরষেতে না ঘটে বিষাদ,
বুকের মাঝারে নিয়ে পরিপূর্ণ প্রাণ দিয়ে
ইহাদের করো আশীর্ব্বাদ।
এই হাসি-মুখগুলি হাসি পাছে যায় ভুলি'
পাছে ঘেরে আঁধার প্রমাদ ;
ইহাদের কাছে ডেকে বুকে রেখে কোলে রেখে
তোমরা করো গো অশীর্ব্বাদ !

ঊনবিংশ শতাব্দীর কাব্য-সাহিত্য

শ্রী হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় আই-সি-এস্

সীলেটী কম্‌লাকে যদি সীলেটের পর্ব্বতময় ভূমি হ'তে কেউ বাংলার সমতল ক্ষেত্রে স্থাপন করেন, তা হ'তে আর তেমন উপাদেয় ফল পেতে আশা কর্‌তে পারেন না। চা ভাল হ'তে হ'লে দার্জ্জিলিংয়েই তাকে হ'তে হবে, দার্জ্জিলিং-য়ের বাইরে তাকে টেনে আন্‌লে পরে তার ভালত্ব লোপ পেয়ে যাবে। স্থানমাহাত্ম্য ব'লে একটা জিনিষ আছে, সেটা যে দেশের জিনিষ সে দেশের মাটির সঙ্গে এমন ভাবে লিপ্ত যে সে মাটি ছাড়া হ'লে তার সে গুণ আর থাকে না। কোন কিছু বিষয়ে ভাল যদি কোন দেশ হয়, তা সে ভাল হবার অঙ্কুর সেই দেশের মাটিতেই আছে, সেই অঙ্কুরকেই ফুটিয়ে তুলে' বড় ক'রে ভাল হ'তে হবে, বিদেশের অঙ্কুর আমদানী ক'রে ভাল হওয়া যায় না! বিদেশী অঙ্কুর তার স্বদেশী মাটি ছাড়্‌লে একান্তই গুণহীন হ'য়ে পড়ে—তার একান্ত স্বদেশপ্রেমের জন্যেই হয় ত বা। ঠিক সেই ভাবে যাঁরা ব'লে থাকেন যে এক দেশের সাহিত্য আর এক দেশের সাহিত্যের কাছে ধার ক'রে বড় হয়েছে, তাঁরা একান্তই ভুল বলেন। রোনাল্ডসে তাঁর "হার্ট অব আর্য্যাবর্ত্ত" শীর্ষক বইতে ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাংলা সাহিত্যের অভিনব জাগরণের কথা উল্লেখ ক'রে বলেছেন, যে ইংরাজি সাহিত্য চর্চ্চাই নাকি সেই জাগরণের মূল কারণ, এবং ইউরোপীয় সভ্যতার সম্পর্কে এসেই তার এমন উৎকর্ষ লাভ হয়েছে। স্বদেশ-প্রেমিকতার দিক হ'তে কথাটি বেশ শুন্‌তে ভাল হ'য়ে থাক্‌লেও সত্যের খাতিরে একথা বল্‌তে হবে যে এ অতি ভুল ধারণা। স্বদেশ-প্রেমিকতার অনেক গুণ থাক্‌লেও এটার একটা মহা দোষ যে অন্যের গুণ গ্রহণে মনকে একান্ত পরাঙ্মুখ ক'রে তোলে। আমার যা কিছু সব ভাল এবং অন্যের যা কিছু সব খারাপ, আর যদি বা কিছু ভাল থাকে, সে আমাদের কাছ হ'তে ধার করা—এই হ'ল স্বদেশ-প্রেমিকতার একমাত্র বড় কুশিক্ষা। সন্তানবৎসলা মা পরের ছেলের গুণ গ্রহণে যতখানি অসমর্থ স্বদেশপ্রেমিক গবেষক বা লেখক অন্য দেশের গুণ গ্রহণে তার দশগুণ বেশী অসমর্থ, কারণ তাঁদের চোখে যে ঠুলি এঁটে যায় তার চামড়া সন্তানবৎসলা মায়ের ঠুলির চামড়া হ'তে দশগুণ বেশী শক্ত এবং তার জন্যে দৃষ্টিশক্তিকে দশগুণ বেশী খর্ব্ব করে। তার জন্যেই পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা যখন সংস্কৃত সাহিত্যের আলোচনা আরম্ভ কর্‌লেন তখনই দেখ্‌তে আরম্ভ কর্‌লেন যে সংস্কৃতের যা কিছু সম্পদ সে সমস্তই গ্রীক্‌দের কাছ হ'তে ধার করা বা তাদের প্রভাব হ'তে উৎপন্ন। ঋগ্‌বেদ যে খুব বেশী পুরানো নয় সে কথা প্রমাণ কর্‌তে তাঁদের কি প্রাণপণ চেষ্টা! যেহেতু সংস্কৃত

নাটকে 'যবনিকা' কথাটি ব্যবহার হয়েছে সেই হেতু তাঁরা আবিষ্কার ক'রে বস্‌লেন যে সকল সংস্কৃত নাটকই গ্রীক নাটকের জাল, প্রমাণ—'যবন' অর্থে গ্রীক! অতি অকাট্য প্রমাণ সন্দেহ নাই! এমনি তুচ্ছ প্রমাণকে ভিত্তি করিয়ে তাঁরা অতি অসত্য সব তথ্য দাঁড় করিয়ে তবু জগতের কাছে জাহির কর্‌লেন পরম সত্য ব'লে! যেহেতু এ সব ইউরোপের বাইরের জিনিষ এবং ভাল জিনিষ সেই হেতু তারা কখনই ভারতীয় জিনিষ নয়, এই মনোভাবই কি এই সকল তথ্যের পেছনে লুকানো নয়? এমনতর হ'লে পরে সত্যের পথ একান্ত জটিল হ'য়ে উঠে এবং তারি জন্তে সত্যকে পাওয়া একান্ত দুষ্কর হ'য়ে পড়ে, এবং যদিই বা কিছু পাওয়া যায় সে একান্ত বিকৃত সত্য এবং সকলের অবহেলার যোগ্য। সংস্কৃত সাহিত্যের ওপর যে অত্যাচার চ'লে এসেছিল, তার সব থেকে গুণবতী কন্যাটির ওপরেও উত্তরাধিকারসূত্রে সে অত্যাচার বেশ খানিক বর্ষিয়েছে। তার প্রথম প্রমাণ উপরের উক্তিটি এবং দ্বিতীয় প্রমাণ টমসন-লিখিত রবীন্দ্র-সাহিত্যের ইংরাজিতে সমালোচনা।

অন্তদেশী সভ্যতা বা অন্তদেশী সাহিত্যের সম্পর্কে এসে দেশী সাহিত্য উন্নত বা সমৃদ্ধ হবে না কেন? হয়। কিন্তু সে অন্য ভাবে, ধার ক'রে নয় একটি বলবান পালোয়ানের কাছ হ'তে অন্য লোক যেমন বল ধার ক'রে নিজে বলবান হ'তে পারে না, নিজের চেষ্টায় যে প্রকার ব্যায়াম তার শরীরকে উন্নত কর্‌বে, সেই ব্যায়াম অবলম্বন ক'রে তবে বল সঞ্চয় করে, এ ক্ষেত্রেও তেমন। তাকে দেখে বরং নিজের শরীরের উন্নতিসাধন বিষয়ে সে উৎসাহ পেতে পারে বা প্রতিদ্বন্দ্বী ভাব হ'তে বল-সঞ্চয়ের ইচ্ছেটা প্রবল হ'য়ে উঠ্‌তে পারে। এই ভাবেই সাহায্য হ'তে পারে মাত্র। ইউরোপীয় সাহিত্যের সমৃদ্ধির কথা শুনে বা ইংরাজি সাহিত্যের সম্পদ-ভাণ্ডার দেখে বাঙালীর সেই ভাবেই নিজের সাহিত্যকে গ'ড়ে তোল্‌বার ইচ্ছে হয়েছিল, সেটুকু মাত্র সাহায্য ইংরেজি সভ্যতা আমাদের দিয়েছে। কিন্তু সাহিত্যের উন্নতি যা কিছু হয়েছে সে সব সম্পূর্ণ নিজস্ব। যে ভাব কেবল বাংলাতেই জাগ্‌তে পার্‌ত, যে ভাষা কেবল বাঙালী কবির কাছেই ফুটতে পার্‌ত, সেই ভাব এবং সেই ভাষাই এই সমৃদ্ধির মূলে। এদের কোনটিই ইংরেজি বা ইউরোপীয় অপর কোন সাহিত্য হ'তে চুরি নয় বা ধার করা নয়—একান্তই এই দেশের মাটির এই দেশের হাওয়ার জিনিষ, এইটাই হ'ল আসল সত্য।

উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যের দিকে চাইলে পরে, সব থেকে বড় ক'রে যার উপর চোখ পড়ে সে হ'চ্ছে বাংলা গদ্য সাহিত্যের দ্রুত ক্রমবিকাশ। এত অল্প সময়ের মধ্যে এমন আশ্চর্য্য উন্নতিলাভ—জগতের কোন সাহিত্যেই বুঝি এর তুলনা নেই। বাংলা গদ্য-সাহিত্য অতি অল্প-কালের জিনিষ, উনবিংশ শতাব্দীর আগে সে ছিল চিঠি-পত্তরে, নিতান্ত উপেক্ষার জিনিষ। প্রকৃতরূপ গদ্য-সাহিত্যের সৃষ্টি হয় উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ায় রামমোহন, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ও রাজেন্দ্র মিত্রের লেখায়। তার-পর বিদ্যাসাগর ও অক্ষয় দত্ত এবং তারপর বঙ্কিমচন্দ্র।

রামমোহন প্রভৃতির প্রথম পুস্তক প্রকাশের সময় ১৮৩০ সাল এবং বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম নভেল দুর্গেশনন্দিনীর প্রকাশের তারিখ ১৮৬৪ সাল। মাত্র ৩০টি বছরের ব্যবধান অথচ সাহিত্যিক সমৃদ্ধির দিক হ'তে যে ব্যবধান আমরা দেখ্‌তে পাই তা সাধারণ কাল দিয়ে নির্দ্দেশ কর্‌তে হ'লে অন্ততঃ দুই পূর্ণ শতাব্দীর জিনিষ ব'লে ধর্‌তে হবে। কিন্তু একটা লক্ষ্য কর্‌বার বিষয় এই যে বাংলা কাব্য-সাহিত্যের বয়স কম ক'রে এক হাজার বছর। গদ্য-সাহিত্যের এমন অপ্রচলনের একটা বিশেষ কারণ ছিল। যখন ছাপার ব্যবস্থা ছিল না তখন সাহিত্যিক স্থায়ী রকম যা কিছু রচনা সম্ভব তাদের কবিতায় আত্মপ্রকাশ কর্‌বার প্রতি একটা স্বাভাবিক আকর্ষণ থাকে। কারণ তখনকার যুগে পাঠকের মন আকর্ষণ কর্‌তে পদ্যের মত মনোহর জিনিষেরই প্রয়োজন। শুধু তাই নয়, পদ্য যেমন সহজে মনে রাখা যায় বা কোন-রূপে মুখে মুখে তার যেমন বহুল প্রচারের সম্ভাবনা, গদ্যের তেমন নয়। সেই কারণেই পদ্য-সাহিত্যের উৎপত্তি প্রায় সকল দেশেই গদ্য-সাহিত্যের অনেক আগে হ'য়ে এসেছে। বাংলা গদ্য-সাহিত্যের উৎপত্তি একটু বেশী দেরী ক'রে হয়েছে এইমাত্র তফাৎ। তার কারণ অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে এবং উনবিংশ শতাব্দীর আরম্ভে সারা ভারত তথা বাংলা অবনতির চরম সীমায় গিয়ে ঠেকেছিল। ভারতের ঝিমানো সভ্যতা একান্তই তখন ঘুমিয়ে পড়েছিল।

ভারতবর্ষের সত্যই সেটা বড় আঁধারের যুগ। সেই আবহাওয়ায় সাহিত্য একান্তই জন্মাতে পারে না। অবস্থা বিপর্য্যয়ে বাংলা গদ্য-সাহিত্যের জন্মতারিখ তাই অনেক পিছিয়ে গিয়েছিল। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে ভারতের সেই কুম্ভকর্ণের নিদ্রা ভাঙানোর প্রথম চেষ্টা হয়। সেই চেষ্টার অগ্রণী হলেন রামমোহন রায়। দেশাত্মবোধ, নিজেদের সভ্যতার সম্পদে দৃষ্টিক্ষেপ এবং নিজেদের বড় ক'রে তোল্‌বার চেষ্টা—সকল আন্দোলনগুলিরই অঙ্কুর তাঁর বাণীতে লুকানো ছিল। সেই নবজাগরণের উষার আলোয় অনুকূল হাওয়া পেয়ে বাংলা গদ্য-সাহিত্য জন্ম নিলে। ইউরোপীয় সভ্যতার সহিত সংঘর্ষ ভারতের সে মহানিদ্রা ভাঙানোর সাহায্য করেছিল—এই হ'ল ইউরোপের কাছে ভারতের ঋণ, আর কিছু নয়। এমন অনুকূল আলো হাওয়ায় জন্মলাভ করেছিল বলেই গদ্য-সাহিত্য কত অল্প সময়ের মধ্যে এত বড় হ'তে পেরেছিল। যেটি ছিল এতটুকুন চারা গাছ সেটি দুদিনে হ'য়ে পড়্‌ল এত বড় মহাবৃক্ষ! এমন আশ্চর্য্য উন্নতিলাভের এই হ'ল কারণ। সভ্যতা মানে আমরা বুঝি এক একটি বিশেষ দেশবাসীকে অবলম্বন ক'রে যে সৌন্দর্য্যের সমষ্টি গ'ড়ে ওঠে তাই এবং সভ্যতা বল্‌তে আমরা যা বুঝি তার শ্রেষ্ঠতম অঙ্গ হ'চ্ছে সাহিত্য। সভ্যতা যেমন দেশ-বিশেষের জিনিষ, সাহিত্যও তেমনি। সেই জন্য সভ্যতার উৎকর্ষলাভ এবং সাহিত্যিক উন্নতিলাভ সম্ভব হ'তে হ'লে চাই দেশাত্মবোধভাবের উদ্বোধন। সাহিত্য যদি চারা গাছ হয় দেশাত্মবোধ হ'ল সেই চারা গাছের গোড়ায় সেচনের জল। সে জল না পেলে গাছ বাড়্‌তে পারে না। দেশাত্মবোধকে আমাদের জাতীয়তা ভাব হ'তে স্বতন্ত্র ব'লে ধর্‌তে হবে। এর মানে অন্য জাতির প্রতি বিদ্বেষ নয়, নিছক নিজের জাতির প্রতি এবং জাতীয় যা কিছু তাদের প্রতি নিগূঢ় প্রীতি এবং তাদের উৎকর্ষ-কামনা। এমনি দেশাত্মবোধের উদ্বোধনের যুগে গদ্য-সাহিত্যের উৎপত্তি হয়েছিল বলেই তার এত অল্পকালের মধ্যে এমন উৎকর্ষলাভ এবং এমন সর্ব্বজন-মনোহারী শোভা।

বাংলা কাব্য-সাহিত্যের ইতিহাস কিন্তু অন্য রকম। তার বয়স এক হাজার বছর এবং সেই একটি হাজার বছরের প্রতি শতাব্দীটিই ঘটনা-পরম্পরায় সন্নিবিষ্ট। বাংলা সাহিত্যে কবির অভাব কোন যুগেই হয় নি। গোড়াতেই আমরা পাই বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসকে। বিদ্যাপতিকে অনেকে বাঙালী কবি ব'লে স্বীকার কর্‌তে চাইবেন না, কিন্তু আমি বল্‌ব তিনি নিশ্চয় বাঙালী কবি। পঞ্চগৌড় তখনকার যুগে বাংলা দেশের অন্তর্গত ছিল কিনা, কিম্বা বিদ্যাপতি মৈথিলী ভাষায় কবিতা লিখেছিলেন কি বাংলা ভাষায় লিখেছিলেন সে কথার পুনরুত্থাপনের প্রয়োজন নেই। আমি বল্‌ব তিনি বাঙালী কবি, যেহেতু বাঙালী তাঁকে নিজের ব'লে গ্রহণ করেছে, বাঙালী তাঁর কবিতাকে ভালবেসেছে এবং একান্তই আপন ক'রে নিয়েছে। এই হ'ল এর বড় প্রমাণ যে তিনি বাঙালী কবি। যাক সে কথা। তারপর চৈতন্য যুগের কবিসম্প্রদায়; শৈবকবির দল; তারপর মুকুন্দরাম; তারপর ভারতচন্দ্র এবং রামপ্রসাদ—তারও পর উনবিংশ শতাব্দীর কবিবৃন্দ। কাব্যসাহিত্যের এমন প্রাচীন কাল হ'তে প্রচারের একটা কারণ, কবিতার প্রচার মুদ্রণের ওপর তেমন ক'রে নির্ভর করে না যেমন করে গদ্য রচনা। কিন্তু আরও একটা বড় কারণ বোধ হয় বাঙালীর প্রকৃতিগত কোন বৈশিষ্ট্য। বাঙালীর হৃদয়ে এমন কিছু আছে স্বভাবতঃই তাকে কবি ক'রে তুলে বা কবিতায় উপভোগক্ষম ক'রে তুলে। তার হাওয়ায়, আলোয়, তার মাটিতে বা নদীর ধারায় হয়ত এমন কোন গুণ আছে যা তাকে এমনতর কবিতাপ্রিয় এবং কবি ক'রে গ'ড়ে তোলে। সেই জন্যই বাংলায় কবিরও যেমন অভাব হয় না কবিতার সমঝদারের সংখ্যাও তেমনি যথেষ্ট। একদিকে কবির যেমন ছড়াছড়ি, তাদের মধ্যে গুণী কবিরও তেমনি অভাব হয় না। এইজন্যই এ দেশ জয়দেবের মত কবি পেয়েছিলেন যিনি জলের সুর, হাওয়ার সুর, আলোর সুরকে ছন্দে বাঁধ্‌তে পার্‌তেন, এবং চণ্ডীদাসের মত আত্মভোলা প্রেমিক পাগল এ দেশে জন্ম নিয়েছিলেন। আধুনিক যুগে রবীন্দ্রনাথ বিশ্বের প্রশংসা বাংলা সাহিত্যের পায়ে দিগ্বিজয়ীর মত লুট ক'রে এনে দিয়েছেন।

এখন আমাদের আলোচ্য বিষয় উনবিংশ শতাব্দীর কাব্যসাহিত্য। তার ধারা কোন্ পথে সেইটাই আমাদের অনুসন্ধান ক'রে বা'র কর্‌তে হবে। বাংলা সাহিত্যে অষ্টাদশ

শতাব্দী হ'ল ভারতচন্দ্রের যুগ। সে যুগের কবিতাযজ্ঞের প্রধান হোতা ভারতচন্দ্র, এবং সেই কারণে তাঁর গ্রন্থে আমরা সে যুগের বৈশিষ্ট সবই পাই। তাঁর গ্রন্থে কৃত্রিম উপায়ে কবিতার সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি কর্‌বার একটা বিশেষ চেষ্টা আমরা দেখি। ছন্দের বৈচিত্র্য সম্পাদনে তিনি অনেকখানি সামর্থ্য ব্যয় করেছেন—তাঁর অনুপ্রাস,তাঁর দ্ব্যর্থবঞ্জক শব্দের ছড়াছড়ি ইত্যাদিই তাঁর বৈশিষ্ট্য। এই কৃত্রিমতার প্রতি লক্ষ্যটি উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তেও সমানই বর্ত্তমান আমরা দেখ্‌তে পাই। ঈশ্বরচন্দ্র এখানে ভারতচন্দ্রেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করেছেন। তিনি এক-হিসেবে ধর্‌তে গেলে বাংলার শেষ খাঁটি কবি। এই হিসেবে খাঁটি যে ইংরেজি শিক্ষার প্রভাব হ'তে তিনি একেবারে মুক্ত ছিলেন। ঠিক এই কারণেই তিনি অষ্টাদশ শতাব্দীতে বাংলা কবিতা যে মুখে বসেছিল সেই মুখেই তাঁর কবিতার স্রোত চালিত করেছিলেন। পুরাতন যুগের শেষ কবি—ভারতচন্দ্রের মতই তিনিও অনুপ্রাস ও দ্ব্যর্থব্যঞ্জক কথার ব্যবহার অত্যন্ত বেশী করতেন। কিন্তু ভারতচন্দ্রের যে কবিত্বশক্তি ছিল তাঁর তা ছিল না। ভারতচন্দ্র যেখানে বর্ণনার সৌন্দর্য্যে বা হৃদয়ের অনুভূতি জাগিয়ে পাঠকের মনোরঞ্জন করেছেন, সে স্থানে ঈশ্বর গুপ্ত গ্রাম্য রসিকতা দিয়ে প্রশংসা লুট কর্‌বার চেষ্টা করেছেন। তাঁর ছাগল শীর্ষক রচনাই এ বিষয়ে যথেষ্ট প্রমাণ হবে।

ঠিক বল্‌তে গেলে ঈশ্বর গুপ্তের কবিতায় বাংলা কাব্য-সাহিত্য অবনতির ধাপে চলেছিল। দুর্ভাগ্যক্রমে বাংলা পদ্য-সাহিত্যের দুর্দ্দশার শেষ সেখানেই নয়, অবনতির চরম হয়েছিল তার নিধুবাবু প্রমুখ কবিওয়ালাদের হাতে। বাংলার কবিত্বশক্তি সে যুগে সুন্দর সাহিত্যসৃষ্টিতে ব্যবহার হ'ত না, ব্যবহার হ'ত গালাগালির বাহনরূপে এবং বেশীর ভাগ স্থানে অশ্লীলতার উপাদান রূপে। *

এই হ'ল বাংলা কাব্য-সাহিত্যর অবনতির অঙ্কের শেষ দৃশ্য। তারপর যে অঙ্কের সূত্রপাত হ'ল, সে অঙ্কের নায়ক হ'লেন তিন জন মাইকেল মধুসূদন, হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্র। তাঁদের সাহিত্যকাল বাংলার উন্নতির যুগ নয়, অবনতিরও যুগ নয়—এক নূতন পথে চলার চেষ্টার যুগ, এক exporiment-এর যুগ; কিন্তু সে এক্সপেরিমেণ্ট কোন দিন সাফল্যমণ্ডিত হয় নি, ব্যর্থ হ'য়েই সাহিত্যসেবীদের পরিত্যাজ্য হয়েছিল। † এই যুগটা একটা বিক্ষিপ্তির (digression) যুগ। বাংলা কবিতার উন্নতির ধারা সে পথে নয়, অন্য পথে। তাঁরা তিন জনই প্রথম ইংরাজী-শিক্ষিত কবি। ইংরেজি শিক্ষা ও ইংরেজি সাহিত্যের প্রভাব এঁদের সাহিত্যে অতি সহজেই চোখে পড়ে। এটি সত্যই ধারের যুগ। কিন্তু ধারের মূলধন দিয়ে যেমন ব্যবসা চলে না সেই রকম এই ধারকরা জিনিষে খাঁটি সাহিত্য-সৃষ্টি সম্ভব হয় নি। নিজের মূলধন চাই তবেই ব্যবসা চল্‌বে, নিজের জাতীয় প্রতিভার উৎস যেখানে,সেই উৎসের জল সংগ্রহ করেই সাহিত্য-শক্তিকে পরিপুষ্ট কর্‌তে হবে, তবেই খাঁটি সাহিত্য-সৃষ্টি সম্ভব। এই হ'ল সেই সীতলটী কম্‌লাকে বাংলার সমতল ভূমিতে আনার চেষ্টা বা দার্জ্জিলিংয়ের চা'কে রাজপুতানার বুকে পরিবর্দ্ধনের চেষ্টা। কেবল এই সাহিত্যটুকু সম্পর্কেই ধার করা বা বিলাতী প্রভাব খুব ব'লে অপবাদ দেওয়া চলে। অন্য কোন সময়ের সাহিত্য সম্পর্কে নয়। এবং এই সাহিত্যটুকু বাঙালীর তেমন গৌরবের জিনিষও নয়। (—?) তার কারণ তা ধারকরা দোষে দুষ্ট।

মাইকেল যে গোড়া হতেই খাঁটি বিদেশী ভাবাপন্ন, তাতে সন্দেহ মাত্র নেই। ইংরেজি শিক্ষার সংস্পর্শে এসে অল্প বয়সেই খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ এবং অল্পদিন পরে ইংরাজ-মহিলার পাণিগ্রহণ তার যথেষ্ট প্রমাণ। প্রথম জীবনে তাঁর নাকি একান্ত আকাঙ্ক্ষার বিষয় ছিল এই যে তিনি ইংরেজি ভাষায় কথা বল্‌বেন, ভাব্‌বেন,এমন কি স্বপ্ন পর্য্যন্ত দেখ্‌বেন। তাঁর কবিক্ষমতা ছিল, তাই তিনি ইংরেজি ভাষায় কবিতা লেখার মক্স কর্‌তে আরম্ভ কর্‌লেন। ইংরেজি ভাষায় কবিতা লিখ্‌লেন বটে কিন্তু তার তেমন

* লেখক ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ও নিধুবাবু সম্বন্ধে যে মন্তব্য প্রকাশিত করেছেন তা তাঁর একদেশদর্শী মনোবৃত্তি-প্রসূত। ঈশ্বর গুপ্ত ও নিধুবাবুর কবিত্ব আদৌ উপেক্ষণীয় নয় এবং কাব্যরসজ্ঞ বাঙালী তা গৌরবপ্রদ ব'লে এখনও মনে করেন। অশ্লীলতা-দোষে বিংশ শতাব্দীর কাব্য-সাহিত্যও সম্পূর্ণ মুক্ত নয় এবং সত্যই তা নিন্দনীয়ও বটে। অশ্লীলতা বাদ দিয়েই আমরা তাঁদের দেখ্‌তে বলছি। —বঃ সঃ

† প্রবন্ধ লেখকের সহিত আমরা একমত নই। —বঃ সঃ

সমাদর হ'ল না। তাঁর প্রতিভা বিফলে যেতে বস্‌ল। তারপর একদিন শুভমুহূর্ত্তে তাঁর চেতনা ফুট্‌ল—যে 'মজিলেন বিফল ফলে অবরেণ্য বরি।' তাই তিনি নতুন ক'রে নিজের মাতৃভাষায় কবিতা লিখ্‌তে বস্‌লেন। কিন্তু তাঁর সে কবিতা ভাল হলেও, কবিত্বশক্তির পরিচায়ক হলেও একটা মস্ত বড় দোষ তাঁর ছিল, তা হ'ল তা ইউরোপীয় সাহিত্যের প্রভাববিশিষ্ট। ইংরাজ কবি স্পেন্‌সার, মীল্টন, বা সেই সময়কার টেনিসন এঁরাই তাঁর আদর্শস্থানীয় হলেন। 'মেঘনাদবধ কাব্যে' রামচন্দ্রের নরকগমন প্রভৃতির বর্ণনায় 'দান্তে'র 'ইনফার্ণো'র যথেষ্ট ছায়াপাত হয়েছে। এই সাহিত্য বাস্তবিকই বিলাতি প্রভাববিশিষ্ট এবং সেই কারণে কোনক্রমেই প্রথম শ্রেণীর সাহিত্য ব'লে পরিগণিত হ'তে পারে না। (–?)

মাইকেল যে পথ দেখালেন, হেমচন্দ্র ও নবীন সেন সেই পথে তাঁকে অনুসরণ ক'রে বাংলা সাহিত কে পরিপুষ্ট কর্‌তে চেষ্টা করেছিলেন। এবং তাঁরা বাস্তবিকই তাঁর খাঁটি শিষ্য ছিলেন। মাইকেল অমিত্রাক্ষর ছন্দ প্রবর্ত্তন করেন এবং সেই ছন্দে কাব্য লেখেন; তাঁদেরও সাহিত্যিক সৃষ্টি প্রধানতঃ তাই। হেমচন্দ্রের প্রধান কাব্যগ্রন্থ 'বৃত্রসংহার' অমিত্রাক্ষর ছন্দে হুবহু 'মেঘনাদবধ কাব্যের' অনুকরণে লিখিত। তাঁর 'আশা কাননেও' সেই নরকাদির বর্ণনা। তাঁর আর একটা কীর্ত্তি ইংরেজী কবিতার বাংলা অনুবাদ। অনুবাদক-কবি হিসাবে তিনিই বাংলায় প্রথম। এ ছাড়া তাঁর গৌরবের বিষয় আর কিছু ছিল না।(—? নবীন সেনও এঁদেরই মত ইংরেজি-শিক্ষিত, এঁদেরই মত প্রধানতঃ অমিত্রাক্ষর ছন্দে কাব্য লিখে নাম ক'রে গেছেন। তাঁর রৈবতক, কুরুক্ষেত্র ও প্রভাস শ্রীকৃষ্ণের জীবনকাহিনী; অমৃতাভ—বুদ্ধের জীবন নিয়ে কাব্যগ্রন্থ। এমন কিছু সৌন্দর্য্য বা বিশিষ্টতা তাদের মধ্যে নাই। (—?) পলাশীর যুদ্ধই তাঁর একমাত্র কাব্য, যা তুলনায় অধিক সমাদর পেয়েছে। তার কারণ এটা নূতন-শেখা জাতীয়তাবোধে অনুপ্রাণিত। তা ছাড়া নিছক কবিত্বশক্তির পরিচায়ক হিসাবে তা খুব বড় গ্রন্থ নয়।

এই তিন কবির মধ্যে মাইকেলের কবিক্ষমতা সব থেকে বেশী ছিল, তারপর হেমচন্দ্র এবং তারপর নবীন সেন। ঠিক সেই কারণেই কবি হিসাবে তিনি এ তিন জনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। তাঁর 'মেঘনাদবধ কাব্য' বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে চিরদিন সম্মানের আসন পেয়ে আস্‌ছে, কিন্তু হেমচন্দ্র বা নবীন সেনের হয়ত আস্‌বে না। কবি হিসাবে ঊনবিংশ শতাব্দীর যুগে তাঁরা কম ছিলেন না। কিন্তু এখনকার মাপকাঠিতে তাঁদের দর অনেক কম্‌বে। তার খানিকটা কারণ কবিত্বশক্তির নিকৃষ্টতা বটে কিন্তু বড় কারণ আমি বল্‌ব তাঁরা পরের ধার করেছিলেন ব'লে।

সৌভাগ্যক্রমে এই ইউরোপীয় সাহিত্যের অনুকরণে বাংলা কাব্যসাহিত্যকে সমৃদ্ধ কর্‌বার চেষ্টা বেশীদিন আমাদের দেশে চল্‌তে পারে নি। অল্পদিনের মধ্যেই এমন একটি কবি জন্ম নিলেন যিনি দেখিয়ে দিলেন বাঙালী কবির চল্‌বার পথ মাইকেল প্রভৃতি যেদিকে দেখিয়েছিলেন সেদিকে নয়, অন্য দিকে। সেটা ভুল পথ, খাঁটি পথ ধর্‌তে গেলে চল্‌তে হবে অন্যদিকে। মাইকেলের ভাষায়ই বলি তিনি এবং তাঁর শিষ্যসম্প্রদায়—'পরধন লোভে মাত্র করিল ভ্রমণ পরদেশে, ভিক্ষাবৃত্তি কুক্ষণে আচরি'।' মাইকেলের কাছে কুললক্ষ্মী এসে পরে ব'লে গেলেন—'মাতৃকোষে রতনের রাজি, এ ভিখারী দশা তবে কেন তোর আজি।' মাইকেলের ঘুম ভাঙল, চেতনা ফুট্‌ল, কিন্তু তিনি তার ভুল মানে ক'রে বস্‌লেন। তিনি ইংরেজীতে কবিতা লিখ্‌তেন তাই ভাব্‌লেন এ স্বপ্নের নির্দ্দেশ হ'ল বাংলা ভাষায় কবিতা লেখা। ভাষা তাঁর মাতৃভাষা হ'ল বটে, কিন্তু ভাব তাঁর বিজাতীয় হ'য়ে গেল, পরের র'য়ে গেল। ভাবেতেও তিনি যদি খাঁটি স্বদেশী হ'তে পার্‌তেন তাহ'লে কবি হিসাবে তিনি আরও বড় হ'তে পার্‌তেন। তবে যে তিনি একেবারেই কোথাও খাঁটি হন নি তা আমি বলি না। 'ব্রজাঙ্গনা কাব্যে' তিনি সম্পূর্ণ বৈষ্ণব কবিদের ভাবে অনুপ্রাণিত। ঠিক সেই কারণেই বোধ হয় এই কবিতাগুলি তাঁর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। কিন্তু এই ভাবে স্বাধীনতা বা স্বদেশীয়ানা জাগানো বা দেখানোর কাজটা বিশেষ ভাবে ক'রে গিয়েছিলেন আর এক জন। সেখান হতেই বাংলা কাব্য-সাহিত্যের নূতন উন্নতির যুগের আরম্ভ এবং সেখান হতেই এই বিদেশ হ'তে ধারকরা বিকিকিনির যুগের শেষ।

এই নূতন যুগের প্রবর্ত্তক হলেন কবি বিহারীলাল। তিনি ইংরাজি-শিক্ষিত যে ছিলেন না তা নয়, তবে আরও বেশী শিক্ষিত ছিলেন সংস্কৃতে। উপনিষদের বাণী তিনি পড়েছিলেন এবং বুঝেছিলেন, ধ্যানের শক্তিও তাঁর ছিল। কবিতা তিনি বুদ্ধিবৃত্তির সাহায্যে কলমের আগায় ফোটাতেন না, নিভৃতে হৃদয়ঙ্গম করতেন এবং পরে তৈরী জিনিষ কলমের আগায় ঢেলে দিতেন। তারি জন্যে তিনি গীতি-কবিতাই প্রধানতঃ লিখতেন, কারণ কেবল হৃদয় দিয়ে লিখতে গেলে কাব্য লেখা যায় না। বাংলা সাহিত্যের নূতন যুগে গীতিকবিতার প্রাধান্য তিনিই স্থাপন ক'রে গেছেন এবং পরে রবীন্দ্রনাথ সেই প্রাধান্যের গৌরব পূর্ণ ক'রে দিয়েছেন। পূর্ব্ববর্ত্তী কবিদের লক্ষ্য ছিল তথাকথিত কাব্যপ্রণয়নে, কারণ তাঁরা অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন ইংরেজি সপ্তদশ শতাব্দীর মীণ্টনী পদ্যে। তাঁদের যদি দৃষ্টিশক্তি আর একটু প্রখর হ'ত তাহ'লে দেখতে পেতেন যে কাব্যের প্রাধান্যের যুগ কেটে গিয়েছে, নূতন যা যুগ প্রবর্ত্তিত হবার তা গীতি-কবিতার যুগ। উনবিংশ শতাব্দীর ইংরেজি সাহিত্য সম্বন্ধেও এ কথা সমানেই খাটে। সেই শতাব্দীর গোড়ায় পাঁচটি খ্যাতনামা গীতিকবি ইংরেজি সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেন। তাঁদের কেউই কাব্যপ্রণয়নের প্রতি তেমন নজর দেন নি। উনবিংশ শতাব্দীর শেষে টেনিসন্ গিয়েছিলেন বটে কিন্তু আর্থারের গল্পসমষ্টি তাঁর প্রধান কীর্ত্তি নয়। তাঁর 'ইন্ মেমোরিয়ম্'—গীতিকবিতার সমষ্টি। ব্রাউনিং ত অনেকের মতে শ্রেষ্ঠ ইংরেজ কবি, তিনিও গীতিকবিতা লেখক। বাংলা সাহিত্যে নূতন ক'রে কাব্যপ্রণয়নের একটা চেষ্টা এসেছিল এবং সেই চেষ্টার পথপ্রদর্শক হলেন 'মেঘনাদবধ কাব্য' প্রণেতা মাইকেল। পরেও কয়েকটি কাব্যগ্রন্থ রচিত হয়েছে। এমন কি রবীন্দ্রনাথও 'চিত্রাঙ্গদা' কাব্য লিখে তাঁদের অনুসরণ করেছেন। কিন্তু এই কাব্যগ্রন্থগুলির সাহিত্যের বাজারে আর তেমন দাম নেই, কারণ যে কালে তার দাম ছিল সে কাল এখন কেটে গিয়েছে। তখনকার যুগে মানুষের অবসর ছিল প্রচুর এবং কবিতা তারা উপভোগ করত পরের মুখে আবৃত্তি শুনে শুনে, তাই লম্বা লম্বা গল্প নিয়ে কাব্যই ছিল সে যুগের ভোগের উপাদান। এখন মানুষের অবসরও যেমন কম, কবিতা সম্বন্ধে মনোভাবও তেমনি বদ্‌লেছে। এখন সে সভায় ব'সে দশজনের সঙ্গে আবৃত্তি শুনে কবিতা উপভোগ করে না, কবিতা পড়ে একা একা অবসর-সময়ে। বিংশ শতাব্দীতে বাংলা সাহিত্যে তাই আর কাব্য রচিত হয় না, এখন গীতিকবিতার প্রাধান্য সম্পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত।

বিহারীলালের আরও বড় মহত্ত্ব হ'ল তিনি ভাব এবং প্রেরণা সংগ্রহ করেছিলেন বিদেশী সাহিত্য থেকে নয়, সম্পূর্ণভাবে সংস্কৃত সাহিত্য ও দেশী আবহাওয়া হ'তে। তাঁর সব থেকে বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ 'সারদা-মঙ্গলের' বিষয় —সরস্বতী দেবীর সঙ্গে কবির বিরহ ও মিলন। এ কবি সেকালের ঋষিদেরই মত ঐশ্বর্য্যসম্পদে বিরাগসম্পন্ন। তিনি যোগী, তাই সম্পদহীন তপোবনই তাঁর প্রিয়। তিনি লক্ষ্মীকে চান না ; তাই তিনি বল্‌ছেন—

এস আদরিণী বাণী সমুখে আমার,
যাও লক্ষ্মী অলকায়
যাও লক্ষ্মী অমরায়
এস না এ যোগিজন-তপোবনে আর।

তারপর বাণীর বিরহে তিনি কাতর, তাই তাঁরই অন্বেষণে তিনি স্বর্গ-মর্ত্ত্য ঘুরে বেড়াচ্ছেন। কারণ—

তুমিই মনের তৃপ্তি
তুমি নয়নের দীপ্তি
তোমা-হারা হ'লে আমি প্রাণহারা হই।

তাই তাঁর জীবনের একমাত্র আকাঙ্ক্ষা হ'ল—

যে ক'দিন আছে প্রাণ
তোমার করিব ধ্যান
আনন্দে ত্যজিব তনু ও রাঙা চরণতলে—।

এই সম্পর্কে আমরা তাঁর হিমালয়ের বর্ণনা পাই। তেমন বর্ণনা এক কালিদাসের বিক্রমোর্ব্বশীতে আছে, আর পাই তাঁরই সারদা-মঙ্গলে। তিনি সেই হিমালয়ের মধ্যেই অলকা অমরাবতী খুঁজে পেয়েছেন—

লুকানো লুকানো যেন রয়েছে ভিতরে
অলকা অমরাবতী রয়েছে ভিতরে।

বলতে ইচ্ছে করে তিনি মাইকেল বা হেমচন্দ্র হ'লে হয়ত অমরাবতীর পরিবর্ত্তে ওলিম্পাস আবিষ্কার ক'রে বস্‌তেন।

বিহারীলাল সম্বন্ধে যে কথা খাটে, আমাদের আধুনিক যুগের শ্রেষ্ঠ কবি রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে সে কথা আরও বেশী ক'রে খাটে। তিনি আরও অনেক বড় কবি, লেখা তাঁর আরও অনেক বেশী, ভাব ও ভাষায় স্বদেশীয়ানার প্রমাণ তাঁর বইতে তাই আমরা অনেক বেশী পাই। তাঁর লেখায় মণ্ডিত হ'য়ে বাংলা সাহিত্য আজ জগতের শ্রেষ্ঠ সাহিত্য-গুলির মধ্যে একটি ব'লে পরিগণিত হয়েছে। তাঁর লেখা, বাংলা সাহিত্য-জননীর চরণে বিশ্ববাণীর ভক্তিঅর্ঘ্য লুটে এনে দিয়েছে। আমাদের আধুনিক যুগের কাব্য-সাহিত্যের উন্নতির মধ্যে সব থেকে গর্ব্ব করবার বিষয় হ'ল তাঁর কবিতাবলী। এবং তাঁর সে কবিতাবলী হ'ল ভারতের সম্পূর্ণ নিজস্ব সম্পদ। তাঁর সে কবিতার মধ্যে আমরা পাই সেই পুরানো ঋষিদের উপনিষদের বাণী, সেই ভারতীয় জীবন এবং ভারতীয় আশা-আকাঙ্ক্ষার ও মাধুর্য্যের কীর্ত্তন। তাঁর কবিতায় পাই আমরা কালিদাসের গৌড়ী রীতিতে লেখা উপমাবহুল মনোরম বর্ণবিন্যাস, জয়দেবের চিত্তহারী শব্দসংযোগ এবং চণ্ডীদাসের বৈষ্ণব কবিতার উন্মাদনা। এই কথাটা বড় ক'রে বোঝাবার এইটুকু প্রবন্ধে স্থান নেই, কেবল আভাসে একটুখানি পরিচয় দিয়েই তাই আমাদের ক্ষান্ত হ'তে হবে। যে কবিতা তাঁকে বিশ্ববরেণ্য ক'রে তুলেছে, তা' হ'ল গীতাঞ্জলির কবিতা। সেই ভগবানের সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্বন্ধ স্থাপন, মধুর রসের সম্বন্ধ স্থাপন আমাদের দেশের বৈষ্ণব কবিতার প্রাণ নয় কি? তাঁর বলাকার দার্শনিক মতবাদ আমাদের দেশের উপনিষদের ঋষিদেরই ন্যায় অন্তর্দৃষ্টির গভীরতা-ব্যঞ্জক নয় কি? এই ত গেল বড় জিনিষের দিক দিয়ে। ছোট খাটো আমাদের দেশের কত জিনিষ—তাই নিয়ে তিনি কত মাধুর্য্য সৃষ্টি করেছেন। তাঁর 'বেলা যে প'ড়ে এলো জলকে চল্'এর কথা এ সম্পর্কে বলা যেতে পারে। তাঁর 'বালিকা বধূ' নিতান্তই আমাদের দেশের জিনিষ এবং আজকালকার শিক্ষিত-সাধারণের মতবিরুদ্ধ, তবু তিনি তার মধ্যে কত সৌন্দর্য্য কত সুহানুভূতি অনুপ্রবিষ্ট ক'রে দিয়েছেন। এই ধরণের উদাহরণের সংখ্যা খুঁজলে অনেক মিলবে, বাড়িয়ে লাভ নেই। রবীন্দ্রনাথ যে আমাদের সম্পূর্ণ নিজস্ব, তাই আমাদের সব থেকে বড় গৌরব। আমরা যেখানে সব থেকে বড় হয়েছি, আমরা যেখানে সত্যি বড় হয়েছি, সেখানে নিজের পায়ে দাঁড়িয়েই হয়েছি, কারও সাহায্য নিয়ে হইনি,—সে কথা সারা বিশ্বকে জোর-গলায় আমরা শুনিয়ে দিতে পারি।

বিজয়ী

শ্রী নিশিকান্ত রায় চৌধুরী

কদি নর পরে আজ দুপুরের বেলাতে,
ভয়ে বুক গগনের আলোকের খেলাতে।
এতদিন কত রণ, মেঘ-দল ও তপন,
দুবেলাই থামে নাই, দুবেলাই ক্রুদ্ধ,
দুবেলায় শুধু কয়—দাও দাও যুদ্ধ!

ওরা সব কতজন, অগণন সৈন্য,
একা-বীর এ রবির শকতির ধন্য।
ওরা সব কালো রূপ, বলে "চুপ্, আলো চুপ্";
রবি কয়, "নয় নয়, কেন ভয় করব—?
কিরণের ভরা তূণ গরবেই ধরবো!"

লুকোচুরি

শ্রী দীপ্তি দেবী বি-এ, বি-টি

লেলেচ্‌কার ঘরের সব জিনিষই চক্‌চকে, ফুটফুটে, সুন্দর। লেলেচ্‌কার মিষ্টি গলা যেন মধু ঢাল্‌ত তার মার কানে। লেলেচ্‌কা মেয়েটি সত্যিই চমৎকার। অমন মেয়ে পূর্ব্বে কখনো জন্মায় নি, এখনও ওর জুড়ি নেই; অন্ততঃ ওর মা সেরাফিমা এলেক্সান, দ্রোভ্‌নার এ বিষয় কোন সন্দেহ ছিল না।

লেলেচ্‌কার চোখ দুটো ছিল বড় বড় আর কালো কুচ্‌কুচে, গাল দু'খানা লাল টুকটুকে, আর তার ঠোঁট দুটি যেন তৈরী হয়েছিল কেবল হাসি আর চুম্বনের জন্তে। কিন্তু শুধু এই সবের জন্তেই লেলেচ্‌কার মার মনে এত আনন্দ হ'ত না, লেলেচ্‌কা যে ছিল তার মার একটি মাত্র সন্তান।...এই জন্তে লেলেচ্‌কার প্রত্যেক ভঙ্গিটিই তার মাকে পাগল ক'রে তুল্‌ত। কোলে বসিয়ে লেলেচ্‌কাকে আদর করা, সেই ফুটফুটে ছোট্ট পাখীর মত মেয়েটাকে নিজের বাহুর মধ্যে অনুভব করা,—এ যে এক স্বর্গীয় আনন্দ!

সত্য কথা বল্‌তে কি সেরাফিমা এলেক্সান দ্রোভ্‌নার আনন্দের একমাত্র জায়গা ছিল লেলেচ্‌কার ঘর। স্বামীর সংস্রবে আস্‌লেই সে যেন বরফের মত জ'মে যেত। হয়ত তার কারণ হ'চ্ছে যে তার স্বামী সব জিনিষই ঠাণ্ডা ভাল-বাস্‌তেন—ঠাণ্ডা জল,ঠাণ্ডা বাতাস, এ সবই তাঁর বড় প্রিয়। নিজেও তিনি যেন সর্ব্বদা ঠাণ্ডা,—মুখের হাসিটুকুও যেন বরফের ছাঁচে তৈরী,—যেখান দিয়ে তিনি হেঁটে যেতেন সেখানকার বাতাসটুকুও যেন হিম হ'য়ে যেত।

অনুরাগ বা দেনা-পাওনার জন্তে সার্জ্জি মডেষ্টোভিচ্‌ আর সেরাফিমা এলেক্সান দ্রোভ্‌নার বিবাহ হয়নি। এদের দুজনের বিয়েটা যেন হবেই ব'লে সবাই ধ'রে নিয়েছিল। ছেলের বয়স ৩৫, মেয়ের ২৫; দুজনেই এক সমাজের লোক, ভালো ভাবে মানুষ। ছেলেকে বৌ আন্‌তে হবে, মেয়েরও বিয়ের দরকার। বিয়ের আগে সেরাফিমা এলেক্সান দ্রোভ্‌নার ধারণা হয়েছিল যে সে তাঁর ভাবী স্বামীকে বেশ ভালোই বাসে; এটা ভেবেও তার আনন্দ হ'ত। ভাবী স্বামী তার সুশিক্ষিত,সুপুরুষ। তাঁর দীপ্ত চোখে বেশ একটা গম্ভীর ভাব ছিল, আর ভাবী স্বামীর কর্ত্তব্য তিনি বেশ সুন্দর-ভাবেই পালন কর্‌তেন। ক'নেও সুন্দরী, রং বেশ ফর্সা, লম্বা, মাথার চুল ও চোখের রং বেশ ঘন-কালো,—একটু লাজুক, তবে কার সঙ্গে কেমন ব্যবহার কর্‌তে হয় সে বেশ ভালো করেই শিখেছিল। কেবল টাকার জন্তে ভদ্রলোক বিয়ে কর্‌তে সম্মত হননি, তবে মেয়ে যে কিছু পাবে জেনে মনে মনে সন্তুষ্টই হয়েছিলেন। তাঁর নিজের বংশ ভাল, ক'নেও নামজাদা ঘরের মেয়ে। দরকার হ'লে এ থেকে অনেক সুবিধার হ'তে পারে।

সার্জ্জি মডেষ্টোভিচ্‌ নেস্‌লেটিভিসের কাজের কোন খুঁত ধরা যেত না, আর সকলের সঙ্গে ঠিকমত ব্যবহার করার দরুণ ধীরে ধীরে তাঁর বেশ উন্নতিও হচ্ছিল, অবশ্য এমন কিছু নয় যাতে পাঁচজনের হিংসা হ'তে পারে, আবার এমন কিছু কমও নয় যাতে তাকেও অন্তের হিংসা কর্‌তে হয়। সবই তার আস্‌ত, সবই সে পেত ঠিকমত, আর ঠিক সময়ে।

কোথাও যে কিছু গোল আছে তা বিয়ের পর সার্জ্জি মডেষ্টোভিচের ব্যবহারে তার স্ত্রী টের পায় নি। পরে কিন্তু যখন তার স্ত্রীর সন্তানসম্ভাবনা হ'ল তখন সে অন্যত্র একটা হাল্‌কা রকমের সম্বন্ধ স্থাপন করেছিল বটে। সেরেফিমা এলেক্সান দ্রোভ্‌না এ বিষয় সন্ধান পায়, কিন্তু সে নিজেই আশ্চর্য্য হ'য়ে গেল যখন দেখ্‌ল যে এ খবরটা তাকে তেমন ক'রে আঘাত কর্‌তে পারে নি। সে তার সন্তানের আগমনের জন্তে এমন উৎসুক হয়েছিল যে অন্য সব বিষয় চাপা প'ড়ে গেল।

একটি ক্ষুদ্র কন্যা জন্মাল,—সেরাফিমা এলেক্সান দ্রোভ্‌না নিজেকে মেয়ের কাছে ঢেলে দিল। প্রথম প্রথম

তার আদরের লেলেচ্‌কার খুঁটিনাটি সব কথাই সে তার স্বামীর কাছে বল্‌তে বেশ আগ্রহ ক'রে, কিন্তু পরে দেখ্‌ল এ সবে তার স্বামীর সত্যকারের কোন আনন্দ নেই, তিনি কেবল শুনে যেতেন ভদ্রতার খাতিরে। ধীরে ধীরে সেরাফিমা এলেক্সান্‌ড্রোভ্‌না স'রে গেল তার স্বামীর কাছ থেকে বেশ দূরেই।

অন্তরের ক্ষুধা মেটাবার খোরাক স্বামীর কাছ থেকে না পেলে কেউ কেউ যেমন নিজেকে বিলিয়ে দেয় যে কোন লোকের হাতে, সেরাফিমা এলেক্সান্‌ড্রোভ্‌নাও নিজেকে দিয়ে দিল তার ছোট্ট মেয়েটির হাতে।

"মা-মণি, উকোচুই খেল্‌বে এস!" লেলেচ্‌কা এখনও 'র' কি 'ল' বল্‌তে পারে না তাই লুকোচুরিকে 'উকোচুই' বলে। এই আধ-আধ কথা শুন্‌লেই সেরাফিমা এলেক্সান্‌ড্রোভ্‌নার মুখে কেমন একটা স্নেহের হাসি ফুটে ওঠে। কথাগুলো বলেই লেলেচ্‌কা কার্পেটের উপর দুপ্‌দুপ্‌ ক'রে মোটা মোটা পা ফেলে দৌড়ে গিয়ে খাটের পাশের পর্দার আড়ালে লুকিয়ে পড়্‌ল। দুষ্টু দুষ্ট একটা চোখ বা'র ক'রে হাসিভরা স্বরে ডাক্‌ল—"টু...ই"। মাও অম্‌নি মিছামিছি এদিক ওদিক খোঁজাখুঁজি ক'রে বল্লেন—"আমার খুকীটা গেল কোথায় রে? এদিকে লেলেচ্‌কা তার লুকানো জায়গা থেকে খিল্‌ খিল্‌ ক'রে হেসে উঠে, একটু বেরিয়ে এল। তার মাও যেন তাকে তখুনি খুঁজে পেলেন এমনই ভাণ ক'রে দুই হাতে তাকে জড়িয়ে ধ'রে আনন্দে উৎফুল্ল হ'য়ে বল্লেন—"ওমা, এই যে আমার লেলেচ্‌কাকে খুঁজে পেয়েছি!" লেলেচ্‌কা অম্‌নি মার কোলে মুখ গুঁজে সমস্ত শরীরটা মার বাহুর মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে হাস্‌ল অনেকক্ষণ ধ'রে, তার মায়ও চোখ স্নেহের হাসিতে ভরা। অবশেষে হাসি থামিয়ে লেলেচ্‌কা বল্ল—"এবার, মাগো তুমি লুকোও!" মা আলমারির পাশে লুকিয়ে ডাক্‌লেন—"টু...ই, খুকুমণি!" মা যখন লুকোচ্ছিলেন, লেলেচ্‌কা পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে ছিল বটে কিন্তু চুরি ক'রে দেখ্‌তেও ছাড়ে নি, এখন সে তার মার মতই এদিক ওদিক খুঁজ্‌তে সুরু কর্‌ল যদিও সে ভালো করেই জান্‌ত মা কোথায় আছেন। "আমার মা কোথায় রে?" সে একবার এ কোণায় উঁকি মারে—"না, [illegible] এখানে নেই!" আবার আর একটা কোণায় দেখে—"কৈ না, মা তো এখানেও নেই।" চুলগুলো উস্কখুস্ক, নিশ্বাস প্রায় বন্ধ ক'রে দেয়ালে ঠেসান দিয়ে মা আছেন দাঁড়িয়ে। তাঁর লাল ঠোঁট দুটিতে পরম তৃপ্তির হাসি।

লেলেচ্‌কার ধাত্রী ফিডোসিয়ার মেজাজটা বেশ ঠাণ্ডা, চেহারাও মন্দ নয় যদিও একটু বোকা সোকা দেখ্‌তে। মনিবের মুখের ভাব দেখে সে একটু হাস্‌ল, ভাবের অর্থ যেন এই:—"বড় ঘরের মেয়েরা যা খুসী কর্‌বে, তোমরা তাতে বাধা দিতে যেও না।" সে মনে মনে ভাব্‌ল —"মা-ঠাক্‌রুন আমার যেন ঠিক একটি কচি মেয়ে... কি রকম উত্তেজিত হ'য়ে পড়েছেন!"

লেলেচ্‌কা তার মার লুকানো জায়গায় প্রায় এসে পড়েছে। তার মাও খেল্‌তে খেল্‌তে হ'য়ে গিয়েছিলেন তন্ময়, বুক তাঁর কাঁপ্‌ছে দুরুদুরু ক'রে, তিনি আরও ঠেসে দাঁড়ালেন দেয়ালের গায়ে, চুলগুলো প্রায় খুলে এল। হঠাৎ লেলেচ্‌কা মার দিকে চেয়ে আনন্দে চীৎকার ক'রে উঠ্‌ল— "তোমায় পেয়েছি কুঁজে!"—ভুলভাল উচ্চারণ ক'রে সে চেঁচাতে লাগ্‌ল আর সেই ভাঙাচোরা কথা শুনে তার মার কি আনন্দ!

হাত ধ'রে সে তার মাকে টেনে এনে ঘরের মাঝখানে দাঁড় করাল, আহ্লাদে দুজনেই হেসে খুন। লেলেচ্‌কা আবার তার মুখ ঢাক্‌ল মার কোলে, আধো আধো ভাষায় কত যে অনর্গল ব'কে গেল,—শুন্‌তে ভারি মিষ্টি।

সার্জ্জি মডেস্টোভিচ্‌ ঠিক এই সময় মেয়ের ঘরের দিকে আস্‌ছিলেন। আধভেজান দরজা দিয়ে হাসি, চীৎকার, দৌড়ঝাঁপের আওয়াজ সবই কানে এল। ঘরে ঢুকে তিনি একটু হাস্‌লেন, সেই রকম কন্‌কনে হাসি। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ভাবে সজ্জিত, ঠাণ্ডা মোলায়েম চেহারা। তাঁর আশে পাশের সব জিনিষই যেন পরিষ্কার, টাট্‌কা, তাজা আর ঠাণ্ডা। তাদের হুড়োহুড়ির মধ্যে তিনি তাঁর তক্‌তকে চক্‌চকে শীতলতা এনে সকলকেই বিব্রত ক'রে দিলেন। এমন কি ফিডোসিয়াও নিজের ও মনিবের জন্যে লজ্জিত হ'য়ে পড়্‌ল সেরাফিমা এলেক্সান্‌ড্রোভ্‌না মুহূর্ত্তের মধ্যে গম্ভীর হ'য়ে গেলেন, তাঁর মনের ভাব যেন ছোট্ট মেয়েটিকেও স্পর্শ কর্‌ল, সেও হাসি থামিয়ে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে রইল তার বাপের দিকে।

সার্জ্জি মডেষ্টোভিচ্ চকিতে ঘরের চারিদিকে চেয়ে নিলেন। এ ঘরে তাঁর আস্‌তে ভালই লাগে। এ ঘরের সব জিনিষই কেমন সুন্দর ভাবে গোছান। সেরাফিমা এলেক্সান দ্রোভ্‌নার ইচ্ছে ছিল যে শৈশব থেকেই যেন তাঁর ছোট মেয়েটি সৌন্দর্য্যের মাঝে মানুষ হয়, তাই এ ঘরের সব জিনিষ তিনি নিজের হাতেই সাজিয়েছিলেন, এমন কি তিনি নিজেও যে সুন্দর ভাবে সাজ্‌তেন সেও কেবল মেয়ের জন্তে। একটা বিষয় সার্জ্জি মডেষ্টোভিচের আজও অভ্যস্ত হয় নি, সেটা হ'চ্ছে তাঁর স্ত্রীর এই অষ্টপ্রহর মেয়ের ঘরে আড্ডা জমানো।—"যা ভেবেছিলাম তাই, জান্‌তাম তোমায় এ ঘরেই পাওয়া যাবে।"—মুখে তাঁর ক্রূর বক্র হাসি।

দুজনে ঘর থেকে বেরুলেন। স্ত্রীর পিছন পিছন দরজা দিয়ে বেরিয়ে, যেন বিশেষ কিছু নয় এম্‌নি ভাবে সার্জ্জি মডেষ্টোভিচ্ বল্লেন—"আচ্ছা তোমার মনে হয় না, মেয়েটাকে এক একবার ছেড়ে দেওয়া ভাল?" স্ত্রীর জিজ্ঞাসু দৃষ্টির উত্তরে পুনরায় বল্লেন—"মেয়েটার নিজত্বটা যে আছে সেটা তো ওর বোঝ্‌বার দরকার?" সেরাফিমা এলেক্সান দ্রোভ্‌না বল্লেন—"ও যে নেহাৎ বাচ্চা!" "যা'ই হোক, ওটা আমার ক্ষুদ্রবুদ্ধির সামান্য বিশ্বাস, আমি জোর কর্‌ছি না, মেয়ের ঘরে তো তোমারই রাজত্ব!" "আচ্ছা আমি ভেবে দেখ্‌ব।"—তাঁর স্ত্রী হাস্‌লেন, তাঁরই মত জুড়ানো, ঠাণ্ডা হাসি। এর পর দুজনে অন্য কথা পাড়্‌লেন।

ধাত্রী ফিডোসিয়া ঝি আর রাঁধুনীর সঙ্গে গল্প কর্‌ছিল রান্নাঘরে ব'সে। ঝি দরিয়া বেজায় চুপ্‌চাপ্, কিন্তু র‍্যাগাথা রাঁধুনীটি ঠিক তার উল্টো। বাড়ীর ক্ষুদে মনিবটির বিষয়ই গল্প হচ্ছিল, কেমন সে মার সঙ্গে লুকোচুরি খেল্‌তে ভালবাসে—"জান না, সে কি মজা ক'রে মুখখানা লুকিয়ে ডাকে—'টু...ই'।" ফিডোসিয়া বল্‌তে লাগ্‌ল—"আর মা-ঠাক্‌রুনও যেন ঠিক কচি ছেলে!" র‍্যাগাথা বিজ্ঞের মত মাথা নেড়ে গম্ভীর অথচ বিরক্ত হয়েই বল্ল—"মা ঠাক্‌রুন খেলেন সে আলাদা কথা, কিন্তু খুকী খেলে সেটা বাপু বড় খারাপ!" ফিডোসিয়া অবাক হ'য়ে জিজ্ঞাসা কর্‌ল—"কেন?" জোরের সঙ্গে র‍্যাগাথা বল্ল—"হ্যাঁ খারাপ, ভীষণ খারাপ!" "বাঃ রে কেন?"—ফিডোসিয়া জিজ্ঞেস না ক'রে থাকৃতে পার্‌ল না।

সাবধানে দরজার দিকে চেয়ে চাপাগলায় র‍্যাগাথা বল্ল—"ও অমন ক'রে লুকিয়ে একেবারেই লুকিয়ে যাবে।" ভয়ে ভয়ে ফিডোসিয়া জিজ্ঞাসা কর্‌ল—"কি বল্‌ছ তুমি?" সেই রকম গম্ভীর ভাবে চুপিচুপি র‍্যাগাথা ফের মাথা নেড়ে বল্ল—"আমি সত্যি বল্‌ছি, দেখে নিও আমার কথা, ওটা একটা নির্ঘাত খারাপ লক্ষণ।" বুড়ীটা লক্ষণটা তখুনি তখুনি তৈরী ক'রে বেশ গর্ব্ব অনুভব করতে লাগ্‌ল।

লেলেচ্‌কা ঘুমুচ্ছে ঘরে, সেরাফিমা এলেক্সান দ্রোভ্‌না নিজের ঘরে ব'সে ভাব্‌ছিল তারই কথা। তাকে একেবারে ছোট শিশুর মত মনে হ'ল, সে নেহাৎ বাচ্চা! আবার যেন মনে হ'ল সে তো বেশ ডাগরটি হয়েছে···ফের মনে হ'ল, সে নেহাৎ বাচ্চা!—এমন ক'রে ঘুরে ফিরে শেষে কিন্তু সে র'য়ে গেল মারই ছোট্ট লেলেচ্‌কা। ফিডোসিয়া, সেরাফিমা এলেক্সান দ্রোভ্‌নার সাম্‌নে এসে দাঁড়াল। মুখ চোখ তার ভয়-ভাবনায় ভরা। সেরাফিমা এলেক্সান দ্রোভ্‌না প্রথমে তাকে লক্ষ্য করেন নি শেষে যেমন সে—"মা-ঠাক্‌রুন, ও মা-ঠাক্‌রুন--" ব'লে ডাক্‌ল কাঁপা গলায়, তখন সেরাফিমা এলেক্সান দ্রোভ্‌না চেয়ে দেখ্‌লেন চম্‌কে। ফিডোসিয়ার মুখ দেখে তাঁর সত্যি ভয় হ'ল। ব্যস্ত হ'য়ে জিজ্ঞাসা কর্‌লেন—"কি হয়েছে ফিডোসিয়া, লেলেচ্‌কার তো কিছু হয় নি?" হাত দিয়ে ইসারায় তাঁকে বস্‌তে বলে ফিডোসিয়া বল্ল – "না মা-ঠাক্‌রুন, লেলেচ্‌কা ঘুমুচ্ছে, ভগবান তাকে রক্ষা করুন! আমি কিন্তু একটা কথা বল্‌তে চাই। লেলেচ্‌কা—বুঝেছেন কিনা? লেলেচ্‌কা কেবলই লুকোয়, ওটা ভাল নয়।" স্থির দৃষ্টিতে ফিডোসিয়া তার মনিবের দিকে চেয়ে রইল, ভয়ে তার চোখ দুটো হ'য়ে গিয়েছিল একেবারে গোল। মনটা তার দ'মে গেল, বিরক্ত হ'য়ে সেরাফিমা এলেক্সান দ্রোভ্‌না যখন বল্লেন—"কেন ভাল নয়?"

"আমি বলতে পারি না কত খারাপ " বেশ জোরের সঙ্গেই কথাগুলো বল্লে সে। শুষ্ক ভাবে সেরাফিমা বল্লেন—"ভাল ক'রে গুছিয়ে বল, আমি তোমার কথা বুঝতে পারছি না।" লজ্জিত হ'য়ে চট্ ক'রে ফিডোসিয়া ব'লে ফেল্ল – "ওটা যে একটা কুলক্ষণ!" "বাজে কথা—।" সেরাফিমা লক্ষণ টক্ষণ সম্বন্ধে আর কিছু শুনতে চাইল না। মেজাজটা তার বিগ্‌ড়ে গেল, একটা বাজে কথায় যে তার সুখের স্বপ্ন এমন ক'রে নষ্ট হ'য়ে গেল তার জন্যে সে সত্যিই বিরক্ত হ'ল। এদিকে মনটাও তার ভ'রে গেল একটা আশঙ্কায়।

ফিডোসিয়া করুণ সুরে বলেই চল্ল—"জানি ভদ্দর লোকে এসব লক্ষণ টক্ষণ মানে না, কিন্তু যা'ই বল মা, অমঙ্গল না ঘটে। ছোট মা-ঠাকুরুনটি আমার লুকুতে লুকুতে, শেষে স্যাঁৎসেঁতে একটা কবরের মধ্যে আমার দেবশিশুটি লুকিয়ে যাবে।" কাপড় দিয়ে সে তার চোখ মুছ্‌ল। শান্ত গম্ভীর স্বরে সেরাফিমা এলেক্সান দ্রোভ্‌না জিজ্ঞাসা করলেন—"কে তোমার একথা বলেছে?" ফিডোসিয়া উত্তর দিল—"য়্যাগাথা বলেছে মা, ও সব জানে।" নিজেকে এই আচম্‌কা বিপদ থেকে বাঁচাবার আশাতেই যেন বিরক্ত হ'য়ে সেরাফিমা এলেক্সান দ্রোভ্‌না বল্লেন—"জানে? সব বাজে কথা,—ভবিষ্যতে এ সব যা তা কথা নিয়ে আমার কাছে এস না। এখন তুমি যেতে পার।" ব্যথিত মনে ফিডোসিয়া সেখান থেকে চ'লে গেল।

লেলেচ্‌কার মৃত্যুর বিষয় ভাব্‌তেই বুকখানা যেন ভেঙে পড়্‌ল। নিজেকে এ চিন্তা থেকে মুক্ত করবার জন্যে সে মনে মনে বল্লে—"সব বাজে কথা, বাছা আমার মরতে যাবে কেন? ঝি-চাকরানীরা অমন ব'লে থাকে, মূর্খ ওরা, তাই ওসব লক্ষণ টক্ষণ মানে। ছোট ছেলেপেলের খেলার সঙ্গে তাদের জীবনের নাকি কোন সম্পর্ক থাকতে পারে?" নানা কাজের মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে দিল কিন্তু সব কাজের ফাঁকে তার মনে হ'তে লাগ্‌ল—"লেলেচ্‌কা লুকোতে ভালোবাসে।"

লেলেচ্‌কা যখন খুব ছোট, এই সবে তার মা আর বাবাকে চিনতে শিখেছে, তখনও মাঝে মাঝে দাইয়ের কোলে ব'সে মাকে দেখে মুখখানা বাঁকিয়ে কস্ ক'রে সেটা লুকিয়ে ফেলত তার দাইয়ের কাঁধে। তারপর দুষ্টু মি-ভরা চোখে সে চেয়ে দেখ্‌ত। শেষাশেষি ফিডোসিয়া যদি কদাচ কখনো লেলেচ্‌কাকে একা পেত, তো ঐ রকম লুকোতে শেখাত। লেলেচ্‌কার মা ঘরে ঢুকে যখন দেখতেন যে লেলেচ্‌কাকে ও-রকম ক'রে মুখ লুকোলে কেমন সুন্দর দেখায় তিনি তখন তাঁর এই ছোট্ট মেয়েটির সঙ্গে লুকোচুরি খেলতে সুরু করেন।

পরদিন লেলেচ্‌কাকে নেড়ে চেড়ে সেরাফিমা এলেক্সান দ্রোভ্‌না, ফিডোসিয়ার কথা প্রায় একরকম ভুলেই গিয়েছিলেন। কিন্তু খাবার দাবারের ব্যবস্থা ক'রে লেলেচ্‌কার ঘরে ঢুকতেই যখন লেলেচ্‌কা টেবিলের তলা থেকে মুখ বাড়িয়ে ডাক্‌ল—"টু···ই", তখন হঠাৎ মনটা ভয়ে ব্যাকুল হ'য়ে উঠ্‌ল। যদিও তখুনি ভয়টাকে একটা কুসংস্কার ব'লে ঝেড়ে ফেল্‌বার চেষ্টা করলেন কিন্তু মনটা খারাপ হ'য়ে গিয়েছিল, তেমন ক'রে লেলেচ্‌কার খেলাতেও যোগ দিতে পারলেন না। লেলেচ্‌কাকে অন্য খেলা শিখিয়ে অন্যমনস্ক করবার চেষ্টা করতে লাগ্‌লেন। লেলেচ্‌কা শুধু সুন্দর নয়, সে খুব বাধ্যও ছিল, সে তৎক্ষণাৎ মা যে নতুন ইচ্ছা প্রকাশ করলেন তাতেই মেতে গেল। কিন্তু অভ্যাস বশতঃ মাঝে মাঝে সে কস্ কোরে লুকিয়ে গিয়ে "টু...ই" ব'লে ডাক দিত।

সেরাফিমা প্রাণপণে চেষ্টা করছিলেন যাতে লেলেচ্‌কা লুকোচুরি খেলা ছেড়ে অন্য খেলায় আনন্দ পায়, কিন্তু নানা রকম দুশ্চিন্তায় নিজের মন খারাপ থাকায় কাজটা হ'য়ে পড়েছিল শক্ত। "কেন যে লেলেচ্‌কা অমন 'টু··ই' ব'লে সাড়া দেয়? একঘেয়ে খেলাটা কি ওর এতই ভালো লাগে? সেই দিনরাত ঐ চোখ বন্ধ করা আর মুখ লুকোনো।" সেরাফিমা এলেক্সান দ্রোভ্‌না ভাবলেন—"হয়ত অন্য ছেলে-মেয়েদের মত পৃথিবীর উপর ওর অত টান নেই, এতে কি বোঝায় ওর শারীরিক কোন দুর্বলতা আছে? হয়ত না বাঁচবার প্রবৃত্তির বীজ ওর শরীরের মধ্যে আছে কোথাও—।"

আশঙ্কায় মন তাঁর ভরা। লেলেচ্‌কার সঙ্গে লুকো-

চুরি খেলা বন্ধ কর্‌বার দরুণ মনে মনে লজ্জা হয় কিন্তু কোন উপায়ও যে নেই, প্রাণ চায় খেল্‌তে কিন্তু মন ওঠে না। মাঝে মাঝে জোর ক'রে সে খেল্‌ত, কিন্তু ভারাক্রান্ত মনে কেবলই মনে হ'ত জেনে শুনে সে যেন কি একটা অমঙ্গল টেনে আন্‌ছে।

সেরাফিমা এলেক্সান ড্রোভ্‌নার দিনগুলো কাট্‌ছিল বড় দুঃখেই।

লেলেচ্‌কার চোখ ঘুমে ঢুলে এসেছে। রেলিং দেওয়া ঘেরা-খাটটিতে ঢুক্‌তেই ক্লান্তিতে তার চোখ জুড়ে এল। মা তাকে ঢেকে দিলেন একখানা নীল কম্বল দিয়ে। মাকে আদর কর্‌বার জন্তে লেলেচ্‌কা কম্বলের ভিতর থেকে তার ছোট ছোট হাত দুটি বের কর্‌তেই মা ঝুঁকে এলেন। ঘুমন্ত মুখে তার একটা শান্ত-স্নিগ্ধ ছায়া, মাকে চুম্বন কর্‌তেই বালিশের উপর তার মাথাটা নুয়ে পড়্‌ল। হাত দুটো কম্বলের মধ্যে ঢুকিয়ে নিতে নিতে সে বল্লে—"টু···ই হাত!"

মার রক্তচলাচল বন্ধ হ'য়ে যাবার দাখিল। লেলেচ্‌কা বিছানায় প'ড়ে আছে,—কি স্থির শান্ত ক্ষীণ মেয়েটা! লেলেচ্‌কা মৃদু হেসে চোখ বুজে আস্তে আস্তে বল্ল—"টু···ই চোখ!" তারপর আরও ক্ষীণ স্বরে বল্ল—"টু...ই লেলেচ্‌কা!" এই কথাগুলো ব'লে, বালিশে মাথাটি গুঁজে সে ঘুমিয়ে পড়্‌ল।

কম্বল মুড়ি দিয়ে সে যখন ঘুমোচ্ছিল তখন তাকে কি রকম ছোট আর দুর্ব্বল দেখাচ্ছিল। মা তার দিকে চেয়ে রইলেন বেদনাভরা ম্লান চোখে। নানা আশঙ্কায় যখন তাঁর মন ভ'রে এল তখন তিনি মনে মনে বল্লেন—"আমি মা, আমি কি আমার সন্তানকে সকল অমঙ্গল থেকে রক্ষা কর্‌তে পারব না?" অনেক রাত পর্য্যন্ত সেরাফিমা এলেক্সান ড্রোভ্‌না লেলেচ্‌কার খাটের পাশে দাঁড়িয়ে তাকে দেখ্‌তে লাগ্‌লেন। সারা রাত প্রার্থনা করেও মনের গুরুভার সরাতে পার্‌লেন না।

অনেকগুলো দিন এমনি ভাবে কেটে গেল। ঠাণ্ডা লেগে লেলেচ্‌কার একদিন জ্বর এল। এক রাতে ফিডোসিয়া, সেরাফিমা এলেক্সান ড্রোভ্‌নাকে লেলেচ্‌কার ঘরে ডেকে নিয়ে গেল। লেলেচ্‌কার উত্তপ্ত গায়ে হাত দিয়ে, তাকে কষ্টে ছট্‌ফট্‌ কর্‌তে দেখে, সেই অলুক্ষণে কথাগুলো মনে প'ড়ে গেল সেরাফিমা এলেক্সান ড্রোভ্‌নার। সে একেবারে হতাশ হ'য়ে পড়্‌ল গোড়াতেই।

ডাক্তার এল,—এ অবস্থায় যা যা কর্‌বার সবই করা হ'ল কিন্তু যেটা হবার সেটা কেউ বন্ধ কর্‌তে পার্‌ল না।

লেলেচ্‌কা আবার উঠ্‌বে, হাস্‌বে, খেল্‌বে এই সব ব'লে সেরাফিমা এলেক্সান ড্রোভ্‌না বৃথা মনকে প্রবোধ দিতেন, কিন্তু লেলেচ্‌কা দিন দিন মিশিয়ে যেতে লাগ্‌ল বিছানার সঙ্গে।

সে যাতে না ভয় পায় তাই সেরাফিমা এলেক্সান ড্রোভ্‌নাকে দেখ্‌লে সকলে একটা শান্ত গাম্ভীর্য্যের ভাণ কর্‌ত কিন্তু তাতে সে হ'য়ে পড়্‌ত আরো উতলা।

সব চেয়ে কিন্তু তার খারাপ লাগ্‌ত ফিডোসিয়াকে দেখ্‌লে। সে যখন ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদ্‌ত আর বল্‌ত— "বাছা আমার নিজেকে কেবল লুকোতেই চায়—" তখন তার মন একেবারে ভেঙে পড়্‌ত।

সেরাফিমা এলেক্সান ড্রোভ্‌নার চিন্তাগুলো সব হ'য়ে পড়েছিল এলোমেলো। কি যে হ'চ্ছে সে যেন বুঝ্‌তে পার্‌ত না কিছুই।

এদিকে লেলেচ্‌কার জ্বর বেড়েই চল্ল। বিকারের ঘোরে সে অচেতন হ'য়ে যা' তা' বকত, কিন্তু জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে সে তার সব কষ্ট সব শ্রান্তি ভাল মনেই গ্রহণ কর্‌ত। মা যাতে তার কষ্টটা টের না পান তাই সে তার মার দিকে চেয়ে চেষ্টা কর্‌ত হাস্‌বার।

একটা দুঃস্বপ্নের মত তিনটে দিন কেটে গেল। লেলেচ্‌কার শরীরে আর কিছু নেই, কিন্তু সে যে মর্‌তে বসেছে তখনও সে টের পায়নি।

মার দিকে চায়, দেখ্‌তে পায় না স্পষ্ট ক'রে, তবু সে বলে—"মাগো, টু···ই!" গলার স্বর নিঃশক্ত ক্ষীণ। সেরাফিমা এলেক্সান ড্রোভ্‌না মুখখানা ঢেকে ফেল্লেন খাটের পাশের পর্দার আড়ালে।—কী ভীষণ!

"মাগো!"—লেলেচ্‌কার গলার স্বর প্রায় বন্ধ। মা ঝুঁকে পড়্‌লেন একেবারে তার মুখের কাছে। লেলেচ্‌কার দৃষ্টি হ'য়ে এল আরও ক্ষীণ, সে তার মার ফ্যাকাশে মুখ শেষবারের মতই দেখ্‌ল। "আমার ধব্‌ধবে শাদা মা!"—সে ধীরে ধীরে বল্ল। অবশেষে মার শাদা মুখখানাও মুছে যাবার জোগাড় হ'ল,—লেলেচ্‌কার চোখের সাম্‌নে সবই যেন হ'য়ে এল কালো। দুর্ব্বল হস্তে সে গায়ের চাদরখানা চেপে ধ'রে চাপা গলায় বল্ল—"টু...ই!"

গলার মধ্যে একটা ঘড়্‌ঘড়্‌ আওয়াজ হ'ল, লেলেচ্‌কার ফ্যাকাশে ঠোঁট দুটো একবার নোড়ে উঠে তখুনি বন্ধ হ'য়ে গেল। সে ঘুমিয়ে পড়্‌ল চিরদিনের জন্যে মরণের কোলে!...

সেরাফিমা এলেক্সান ড্রোভ্‌না বেরিয়ে গেল লেলেচ্‌কার ঘর থেকে। পথে দেখা হ'ল স্বামীর সঙ্গে। ধীর শান্ত গম্ভীর ভাবে সে বল্ল—"লেলেচ্‌কা আর নেই।" স্ত্রীর শাদা মুখ দেখে সার্জ্জি মডেষ্টোভিচের কেমন ভয় হ'ল—এমন চেহারা তো তিনি পূর্ব্বে কখনও দেখেন নি।—

"সিমা, অমন কোরো না, এও কি সম্ভব? তা যদি হয় তো একটা মিরাকেল্ হবে বল? ও সা কি উনিশশো শতাব্দীতে হয়?" কথাগুলো বলেই সার্জ্জি মডেষ্টোভিচের মনে হ'ল বলাটা সঙ্গত হয় নি।

তাঁর রাগ হ'ল। হাত ধ'রে স্ত্রীকে কফিনের কাছ থেকে সরিয়ে নিলেন, সে কোন আপত্তি কর্‌ল না।

চোখ তার শুষ্ক, চেহারা শান্ত। লেলেচ্‌কার ঘরে গিয়ে সে যেখানে যেখানে লুকোত সে জায়গাগুলো দেখ্‌ল, মাঝে মাঝে টেবিল বা খাটের নীচেও উঁকি মেরে দেখ্‌ল আর কেবলই বল্‌তে লাগ্‌ল—"আমার খুকী কৈ? লেলেচ্‌কা কোথায়?" একবার ঘর খোঁজা শেষ হয় তো সে আবার সুরু করে।

ঘরের একটা কোণে বিষণ্ণ ভাবে বসে ছিল ফিডোসিয়া, সে তার মনিবের কাজ দেখে ভয়ে কাঠ হ'য়ে গেল, তারপর কেঁদে উঠে বল্ল—"সে নিজেকে লুকিয়ে ফেল্ল, আমাদের লেলেচ্‌কা গো, আমাদের দেবশিশু!"

সেরাফিমা এলেক্সান ড্রোভ্‌নার সারা শরীরটা উঠ্‌ল কেঁপে, চুপ কোরে সে দাঁড়াল, তারপর অবাক হ'য়ে ফিডোসিয়ার দিকে চেয়ে কাঁদতে কাঁদতে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

লেলেচ্‌কাকে ফর্‌সা কাপড় পরিয়ে কফিনে শুইয়ে, নিয়ে গেল বস্‌বার ঘরে। সেরাফিমা এলেক্সান ড্রোভ্‌না কফিনের পাশে দৃষ্টিহীন চোখে তার মৃত সন্তানের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। সার্জ্জি মডেষ্টোভিচ্‌ স্ত্রীর কাছে গিয়ে একঘেয়ে ফাঁকা কথায় সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা ক'রে তাকে কফিনের কাছ থেকে সরিয়ে নিতে গেলেন, সেরাফিমা এলেক্সান ড্রোভ্‌না হাস্‌ল, আস্তে আস্তে সে বল্ল—"স'রে যাও—লেলেচ্‌কা খেল্‌ছে, এখুনি উঠে বস্‌বে।" চাপা গলায় সার্জ্জি মডেষ্টোভিচ্‌ বল্ল—"সিমা, অমন ক'রে উতলা হ'ও না, যেটা ভবিতব্য সেটা মেনে নেওয়া ছাড়া উপায় নেই।" মৃত সন্তানের দিকে চেয়ে জোরের সঙ্গে সে বল্ল—"দাঁড়াও না, ও এখুনি উঠ্‌বে।" দৃষ্টি তার পলকহীন।

সার্জ্জি মডেষ্টোভিচ্‌ একবার সাবধানে এদিক ওদিক চেয়ে দেখ্‌লেন, কেউ ত নেই কাছে? এ সব অদ্ভুত হাস্যকর কথাবার্ত্তা তাঁকে কেমন লজ্জা দিচ্ছিল।—

সার্জ্জি মডেষ্টোভিচ, লেলেচ্‌কার সৎকারটা তাড়াতাড়ি সেরে ফেল্‌তে চাইলেন। সেরাফিমা এলেক্সান ড্রোভ্‌না যে রকম আঘাত পেয়েছেন তাঁর ভয় হ'ল হয়ত বা তাঁর মাথার ঠিক থাক্‌বে না। লেলেচ্‌কার মৃতদেহ যত শীঘ্র কবরস্থ হয় তার মার পক্ষে ততই ভাল, সে তাহ'লে একটু সাম্‌লে নিতে পার্‌বে।

পরদিন লেলেচ্‌কারই জন্যে সেরাফিমা এলেক্সান ড্রোভ্‌না সাজ্‌ল বেশ ভাল করেই। বস্‌বার ঘরে এসে দেখেন তাঁর ও লেলেচ্‌কার মাঝে অনেকগুলি লোক দাঁড়িয়ে। পাদ্রী সাহেব ঘরের সামনে পাইচারী ক'রে বেড়াচ্ছিলেন।

ধূপের ধোঁয়া ধীরে ধীরে উঠে যাচ্ছিল আকাশের দিকে। ঘরটা ভ'রে উঠেছিল ধুনোর গন্ধে।

সেরাফিমা এলেক্সান ড্রোভ্‌নার মাথা কেমন ভার ভার, সে আস্‌তে আস্‌তে লেলেচ্‌কার পাশে এসে দাঁড়াল্। লেলেচ্‌কাকে অমন স্থির হ'য়ে শুয়ে থাকতে দেখে সে একটু করুণ ভাবে হাস্‌ল। গালটা তার কফিনের উপর রেখে সে বল্ল—"টু···ই খুকী!"

খুকী কিন্তু কোন সাড়া দিল না। তারপর সেরাফিমা এলেক্সান ড্রোভ্‌নার পাশে কিসের একটা সাড়া পড়্‌ল। অচেনা, অপ্রয়োজনীয় কতকগুলো মুখ ঘিরে ফেল্ল তাকে। কে যেন তাকে ধর্‌ল চেপে, তারপর লেলেচ্‌কাকে কোথায় নিয়ে গেল। সেরাফিমা এলেক্সান ড্রোভ্‌না দাঁড়াল সোজা হ'য়ে,—একটি দীর্ঘশ্বাস তার বুক থেকে ফেটে বেরুল, সে ক্যালফ্যাল ক'রে চেয়ে রইল, তারপর একটু হেসে সে ডাক্‌ল—"লেলেচ্‌কা!"

লেলেচ্‌কাকে তখন বা'র ক'রে নিয়ে যাচ্ছে। ফুঁপিয়ে কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে মা কফিনের উপর পড়্‌তে গেল কিন্তু তাকে যেতে দেওয়া হ'ল না। লেলেচ্‌কাকে যে দরজার পাশ দিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল তারই পিছনে সে লাফ দিয়ে গিয়ে বস্‌ল। আর দরজার ফাঁক দিয়ে সে বাইরের দিকে চেয়ে ডাক্‌ল—"লেলেচ্‌কা টু···ই!"

তারপর দরজার থেকে মুখ বাড়িয়ে সে জোরে জোরে হাস্‌তে লাগ্‌ল।

তাড়াতাড়ি লেলেচ্‌কাকে তার মার কাছ থেকে নিয়ে যাওয়া হ'ল, যারা নিয়ে যাচ্ছিল তারা যেন না হেঁটে দৌড়্‌তেই লাগ্‌ল। *

* রুশিয়ান গল্প থেকে।

বালুচর

শ্রী যতীন্দ্র সেনগুপ্ত

নদী-বুক চিরে' উঠিয়াছে জেগে একখানি বালুচর;
ধূসর ধূলায় উষর বেদনা রোদে কাঁপে ওর 'পর।
শ্যামল তৃণেরা কোমল বুকের মমতা আঁকেনি বুকে;
নীরবে কেবলি কেঁদে যায় ও যে না জানি সে কত দুখে!
ওরে ঘিরে হায় নেচে নেচে ফিরে ছোট ছোট ঢেউগুলা;
তবু বুকে শুধু তাতিয়া উঠে যে বেদনার ধূধূ ধূলা!
চারিদিকে জল ছল্ ছল্ করি' ছলনা কেবলি হানে,
আকুল নয়নে চাহে ও' কেবল দূরের গ্রামের পানে।

সোনালী ফসল নদীর দু'ধারে ও'রে দেয় হাতছানি;
সুদূর-বিসারী প্রান্তর ডাকে উড়ায়ে আঁচলখানি।
সরিষা-পীবের পীব্‌মহলের রূপসীরা ডাকে ও'রে;
আমি এ বিমনা অচেনা পথিক আজিকে ডাকিছি তোরে।
তরুরা কেহ যে মিটায়নি তোর মরুর পিপাসা হায়!
হাজার ফেনার বিষ-জ্বালা তোর গেঁজে উঠে কিনারায়

বালুচর,—বালুচর!
আমার দগ্ধ পরশ বুলাব তোর ও বুকের 'পর।
বুক ভরি' মোর পড়িয়াছে চর—দুখের রৌদ্রদাহ
দহিয়াছে মোরে; পাইনি ত কভু সুশীতল অবগাহ।
আমারে ঘেরিয়া করিছে নৃত্য ছলনার শত ছল;
তোরই মত মোর বেদনার বালু বুকে শুধু সম্বল।

বালুচর,—বালুচর!
আমার এ বুক মিশায়ে কাঁদিব তোর ও বুকের 'পর।

সম্মিলনীর সাম্মিলনে

শ্রী অনুরূপা দেবী

আপনারা আমায় আপনাদের মধ্যে আহ্বান ক'রে এনে যে আনন্দ দিয়েছেন তার জন্যে আমি আপনাদের সর্ব্বান্তঃকরণে ধন্যবাদ দিচ্ছি। এর আগে আর একদিন, যেদিন আমায় আপনারা ডেকে এনেছিলেন, সেদিনও আমার বেশ ভাল লেগেছিল এবং আর একদিন আস্‌বার নিমন্ত্রণ সেদিনই আমি আপনাদের কাছ থেকে গ্রহণ ক'রে গেছলুম। একটু সাংসারিক অসুবিধা ঠেলেও সেই প্রতিশ্রুতি আজ পালন করতে এসেছি। শরীর মন তত সুস্থ নেই, ভাল ক'রে কিছু বল্‌বার শক্তিতে কুলোবে না। সেদিক থেকে যদি কেউ কিছু আশা ক'রে এসে থাকেন, দুঃখের সঙ্গে বল্‌ছি, তাঁকে একটু ক্ষুণ্ণ হ'য়ে ফিরতে হবে। তবে আমার ইদানীংকার ভাঁটাপড়া-সাহিত্যসেবার গতি যাঁরা লক্ষ্য করেছেন, তাঁরা হয়ত আজও নূতন ক'রে বা বেশি ক'রে বিস্মিত হবার কিছু পাবেন না। ভগবান মানুষকে শক্তির হয়ত একটা সীমা বেঁধে দিয়েছেন, অনন্য-সাধারণ ব্যক্তিবিশেষের জন্য ছাড়া অবিশেষ সাধারণদের এই সীমাবদ্ধ শক্তি একটা নির্দ্দিষ্ট মাপের মধ্যে মাপা আছে। আমার মনে হয় আমার ক্ষমতা মাপকাঠির শেষ পর্য্যন্ত উঠে এসেছে, ছাপাছাপি হ'য়ে উঠ্‌তে তার আর বেশি ক'রে বাকি নেই। তাই নিজের মনের এ দৈন্য-দুর্দ্দশাকে আমি নিজে ক্ষমা করতে পারছি,—এবং হয়ত অন্যেও 'তা' পার্বেন। এমন এক সময় ছিল, মাসিকে ক্রমশঃ-প্রকাশ্য উপন্যাসের একটি মাসও বাদ পড়াকে আমি নিজেই নিজের পক্ষে অপরাধ ব'লে মনে করতুম। কেউ লক্ষ্য করেছেন কিনা জানি না, আমার লেখার ইতিহাসে এ রকম ঘটনা অত্যন্তই বিরল ছিল। 'মা' উপন্যাস ভারতবর্ষে বেরুবার সময়ে একবার এক সংখ্যায় "চক্র" উপন্যাসে ঘটনা-চক্রে বিশেষ ভাবে এ অপরাধ আমায় করতে আমার ভাগ্য বাধ্য করেছিল। এখন কিন্তু জীর্ণহওয়া দেহ-মন আর একে অপরাধ ব'লে স্বীকার করতেই রাজী হয় না। তারস্বরে তারা বলে, তাদের শক্তির 'লীমিট' ফুরিয়েছে, এখন এই রকমই হবে। এই এখন তাদের পক্ষে স্বাভাবিক। এ এখন আর তাদের পক্ষে অপরাধ নেই। মনকে আঁখি-ঠারা ব'লে আমাদের দেশে একটা কথা আছে; হ'তে পারে ও হয় ত কতকটা তাই। জানি না,—কিন্তু আগেই তো বলেছি সবার জন্য শক্তির সঞ্চয় অপর্য্যাপ্ত নয়। এখন আমার নেবার পালা, দেবার নয়। আবহমান কাল ধ'রে এই আবর্ত্তমান, চির সংসরণশীল সংসারের সকল ক্ষেত্রে সকল স্তরে সমস্ত বিভাগেই এই নীতি সনাতন ভাবে চিরা চরিত হ'য়ে আস্‌ছে। বসন্তের আগমনে গাছের শাখায় পাতা ধরে, ফুল ফোটে,—ফল ফলে। রোদের তেজে শুকিয়ে আসে, শীতের হাওয়ায় আপনি আবার ঝ'রে পড়ে। কিন্তু তাই বলেই গাছ চিরদিনের জন্যে নিরাভরণ হ'য়ে থাকে না। আবার নূতন ক'রে বসন্ত এসে তাকে নবীন পত্র-মঞ্জরীতে ভরিয়ে তোলে, নবমুকুলের অভিনব সৌন্দর্য্যে সাজিয়ে দেয় নব প্রস্ফুটিত ফুলবাসে, নূতন রংয়ে বাগান আবার নূতন মূর্ত্তি ধারণ করে। জীর্ণ হ'য়ে খ'সে পড়া ঝরা পাতার জন্য শোক কর্ব্বার অবসর কারুরই থাকে না, তার দরকারও হয় না। আমিও তাই আমার আজকের এই অক্ষমতার জন্যে বিন্দুমাত্রও দুঃখিত নই। আমাদের জীবনে এখন শীতের হাওয়া দেখা দিয়েছে, গাছের পাতা শুকনো হ'তে সুরু করেছে। এখন নূতন গজানো কচি পাতা, ফোটা ফুল গাছের শোভা বর্দ্ধিত করুক, দেখে দৃষ্টি সার্থক হোক, ঘ্রাণে অন্তর পুলকিত হ'য়ে উঠুক,—প্রাণ তৃপ্তিতে ভ'রে যাক্। তবে আপনাদের কাছে আমার এই একটি মাত্র নিবেদন ফুল যে গাছে ফুট্‌ছে, সে গাছ কি আগাছা, গোলাপ কি কুকুর-শোঁকা সেইটুকুর উপর আপনাদের সকলকারই লক্ষ্য রাখা দরকার। সাহিত্যের উপবনে বাগ্‌বাদিনীর পূজার মন্দির, তাঁর আরামকুঞ্জ, বিরামের আসন। সাহিত্যের উপাসক যাঁরা, তাঁদের শুদ্ধশুচি ভাবে

দেবী বীণাপাণির চরণ-পূজার উপযোগী সুগন্ধি পুষ্পসম্ভারের আয়োজন রাখা প্রয়োজন। এখানে বিশেষ ভাবেই বাছা বাছা তাজা তাজা ফুলের ফসল ফলানো তাঁদের কাজ, কালকাসন্দা, সেয়ালকাঁটার জঙ্গল করার দরকার নেই। শুধু দরকার নেই তা নয়, সে যাঁরা কর্ব্বেন,—তাঁরা একটু অত্যাচার কর্ব্বেন, কারণ জগতে মন্দ জিনিষ আপনি গজায়, তাকে চেষ্টা ক'রে সৃষ্টি করতে হয় না। সে রকম সৃষ্টি করা অনাবশ্যক। অনেক সময় সে সব ফুলের বাহারও বড় মন্দ হয় না, কিন্তু ঘ্রাণে কেবল শুধু দুর্গন্ধ, শরীর মনের স্বাস্থ্যের পক্ষে তা কখনই অনুকূল নয়।

পরিশেষে আমার আত্মীয় ও বন্ধু শ্রীযুক্ত সম্পাদক মহাশয়, যাঁর মধ্য দিয়ে আমি আপনাদের সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ পেয়েছি, তাঁকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ দিয়ে আজকের মতন আপনাদের কাছে বিদায় নিলুম।

সংবাদপত্রে সেকালের কথা

শ্রী ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

(পুরাতন সংবাদপত্র হইতে সঙ্কলিত)

রাণী রাসমণি

(সংবাদ প্রভাকর, ১৬ ফেব্রুয়ারি ১৮৫৩। ৬ ফাল্গুন ১২৫৯)

আমরা অত্যন্ত আহ্লাদ পূর্ব্বক প্রকাশ করিতেছি, জানবাজার নিবাসিনী [মৃত রাজচন্দ্র দাসের সহধর্ম্মিণী] পুণ্যশীলা সৎকীর্ত্তিকারিণী শ্রীমতী সুশীলা রাসমণি দাসী সংপ্রতি এক অতি সৎকার্য্যের সূচনা করিয়াছেন, তচ্ছ্রবণে সকলেই তাঁহাকে অগণ্য ধন্যবাদ প্রদান করিবেন। উক্তা শ্রীমতীর বাটীর নিকট হইতে মৌলালির দর্গা পর্য্যন্ত জলপ্রণালী না থাকাতে পথিক ও পল্লীস্থ লোকদিগের বিশেষ ক্লেশ হইতেছে, তালতলা নিবাসী সুচিকিৎসক বিচক্ষণবর বাবু দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় সেই কষ্ট দূরীকরণার্থ এক জলপ্রণালী নিৰ্ম্মাণ নিমিত্ত চাঁদা দ্বারা অর্থ সংগ্রহ করণে উদ্যত হইয়াছিলেন। এ বিষয়ে শ্রীমতীর কর্ণগোচর হইলে তিনি স্বয়ং ২৫০০ টাকা দান পূর্ব্বক একাকিনী তৎকার্য্য সম্পন্ন করণে সম্মতা হইয়াছেন। এই দান সাধারণ দান নহে এবং এই কীর্ত্তি সামান্য কীর্ত্তিও নহে, ইহা পৃথ্বী মধ্যে বহুকাল ব্যাপনী হইয়া জনসমূহের মহোপকার করত কীর্ত্তিকারিণীকে চিরস্মরণীয়া করিবেক।
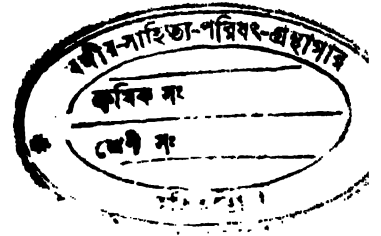
(সংবাদ প্রভাকর, ৩১ জুলাই ১৮৫৬। ১৭ শ্রাবণ ১২৬৩)

কুলীনদিগের বহুবিবাহ নিবারণ জন্য কলিকাতা হইতে দুইখানা, শান্তিপুর হইতে একখানা এবং শ্রীমতী রাসমণি দাসী একখানা, এই কয়েকখানা আবেদনপত্র ব্যবস্থাপক সমাজে অর্পিত হইয়াছে, উক্ত সভার সভ্য শ্রীযুক্ত কালবিল সাহেব তাহা মুদ্রিত করণের অনুমতি করিয়াছেন।

ছাতু বাবুর মৃত্যু

(সংবাদ প্রভাকর, ১ ফেব্রুয়ারি ১৮৫৬। ২০ মাঘ ১২৬২)

"আমরা গভীর শোকসাগরে নিমগ্ন হইয়া প্রকাশ করিতেছি যে গত মঙ্গলবার রজনী অবসান সময়ে বাবু আশুতোষ দেব মহাশয় পাণিহাটির উদ্যানের সম্মুখে ভাগীরথী তীরে নীরে সজ্ঞান পূর্ব্বক পরমেষ্ট দেবতা ভাবনা করিতে করিতে মর্ত্যলীলা সম্বরণ পূর্ব্বক যোগ্যধামে গমন করিয়াছেন। হে পাঠকগণ এই হৃদয় বিদীর্ণকর সংবাদ লিখিতে আমারদিগের লেখনী মসীছলে শোকাশ্রু নিক্ষেপ করিতেছে। আহা! কি অশুভক্ষণে নিষ্ঠুর ক্ষতরোগ তাঁহার রসনাগ্রে উপস্থিত হইয়াছিল, ইংরাজ, বাঙ্গালি, ফরাসি, ইউনানি প্রভৃতি বহুগুণসম্পন্ন চিকিৎসকগণ বহু পরিশ্রম ও উপায়াবলম্বন করিয়াও তাহা আরোগ্য করিতে পারিলেন

না। ঐ সংঘাতিক নিদারুণ রোগ কয়েকমাস পর্য্যন্ত বাবুকে অসীম ক্লেশ দিয়া তাঁহার দেহের সহিত জীবনের বিচ্ছেদ করিল, কি পরিতাপ! বাবু আশুতোষ দেব এ প্রকার উৎকট ও ভয়ানক রোগাক্রান্ত হইয়া আমারদিগকে একেবারে পরিত্যাগ করিবেন আমরা তাহা স্বপ্নেও জানিতে পারি নাই, এত দিনের পর দেবপুর অন্ধকার হইল, দেব পরিবারের হাহাকার শব্দে পাষাণ-তুল্য কঠিন হৃদয়ও আর্দ্র হইতেছে। প্রাতঃস্মরণীয় পুণ্যাত্মা ৺ রামদুলাল দেব মহাশয়ের বংশধর সকল ক্রমে ক্রমে অন্তর্হিত হইলেন। হা পরমেশ্বর! আশুতোষ বাবু জীবিত থাকাতে আমারদিগের পূর্ব্বকার সকল শোক নিবারণ হইয়াছিল, অধুনা তাঁহাকেও কৃতান্তের করাল দন্তে নিক্ষেপ করাতে আমরা একেবারে অসীম শোকে অভিভূত হইয়াছি, কি লিখিতেছি কিছুই স্থির নাই। হে বন্ধুবর বাবু গিরীশচন্দ্র দেব কোথায়? তোমার পিতৃ বিয়োগ হইল, শীঘ্র আসিয়া আমারদিগের সহিত বিলাপ বারিধিবারি প্রবাহে নিমগ্ন হও। হে প্রমথনাথ বাবু তুমি অতি পুণ্যাত্মা ছিলে, ভ্রাতৃ বিয়োগের গুরুতর যন্ত্রণা তোমাকে সম্ভোগ করিতে হইল না।

আহা! বাবু আশুতোষ দেব মহাশয়ের তুল্য সরলস্বভাব উদারচিত্ত, সদালাপী, মিষ্টভাষী, সর্ব্বগুণসম্পন্ন, লোক প্রায় প্রাপ্ত হওয়া যায় না, তিনি করুণার সাগর ছিলেন, পরোপকার-গুণ তাঁহার বিমল মনের অলঙ্কার স্বরূপ ছিল, কত পরিবার ও কত নির্দ্ধন লোক কেবল তাঁহার অসামান্য বদান্যতার উপর নির্ভর করিয়া স্বচ্ছন্দে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন তাহার সংখ্যা করা যায় না, আহা এই নিদারুণ ঘটনা শেল স্বরূপ হইয়া তাঁহারদিগের বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ করিবেক। আহা! তাঁহারদিগের দশা কি হইবেক তাহা অনুভূত হয় না, রে নিষ্ঠুর কৃতান্ত এই সর্ব্বজনপ্রিয় বহুজনাশ্রয় বঙ্গ দেশের মহারত্ন স্বরূপ আশুতোষ দেব মহাশয়কে অপহরণ করিতে তোমার অন্তঃকরণে কিছুমাত্র করুণার সঞ্চার হইল না, আহা! যে মহাত্মা পরদুঃখ দর্শনে সর্ব্বদা কাতর হইতেন এবং তাহা নিবারণ করিতে পারিলেই আনন্দ অনুভব করিতেন, দুঃখি বালকদিগকে আহার দিয়া তাহারদিগের বিদ্যানুশীলন বিষয়ে যত্ন করা যিনি অতি কর্ত্তব্য কার্য্য বলিয়া জানিতেন, শাস্ত্র বিষয়ে তাঁহার এরূপ যত্ন ছিল যে বিদ্বান লোক পাইলে তাঁহাকে মাসিকবৃত্তি দিয়া অতিশয় আদর পূর্ব্বক রাখিতেন এবং সময়ে সময়ে তাঁহার সহিত শাস্ত্র বিষয়ের আলাপ করিয়া পরম প্রীত হইতেন তিনি আপনার পুস্তকালয়ে সংস্কৃত প্রায় সমুদয় গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়াছিলেন। দেশের হিত বর্দ্ধন ও হিন্দু ধর্ম্ম সংস্থাপন বিষয়ের কোন সদনুষ্ঠান হইলে সর্ব্বাগ্রে তাহার প্রতি প্রচুররূপে আনুকুল্য করিতেন তাঁহার ন্যায় সংগীত বিদ্যানুরাগী অধুনা প্রায় প্রাপ্ত হওয়া যায় না, ভিন্ন ভিন্ন দেশ হইতে যে সকল উত্তমোত্তম গায়ক সময়ে সময়ে নগরে আসিয়াছেন তিনি তাঁহারদিগকে লইয়া যথেষ্ট আমোদ করিয়াছেন, এবং তাঁহারদিগের সাহায্যার্থ অকাতরে অর্থ দিয়াছেন। আহা! এইক্ষণে সংগীত বিদ্যানুনিপুণ ব্যক্তিগণ কোথায় সেইরূপ আদর ও সাহায্য প্রাপ্ত হইবেন, আশুতোষ বাবু স্বয়ং সুকবি ছিলেন, তাঁহার বিরচিত অনেক গীত প্রচলিত আছে এবং উত্তমোত্তম গায়কগণ তাঁহার ভাব রস, সুর, রাগ, তাল মান অনুভূত করিয়া বাবুকে সাধুবাদ করিয়াছেন।

মৃত মহাত্মা আশুতোষ দেব মহাশয়ের সমুদয় গুণ বর্ণনা করিতে হইলে দশ দিবসের পত্রেও স্থানের সঙ্কীর্ণতা হয়, অদ্য আমরা তাঁহার মৃত্যু শোকে অত্যন্ত কাতর হইয়াছি, এই বঙ্গদেশের এক মহারত্ন কৃতান্ত কর্ত্তৃক অপহৃত হইল, এতৎ পাঠে সকল লোকেই শোকাভিভূত হইবেন।

জ্ঞানপ্রদায়িনী সভা

(সংবাদ প্রভাকর, ৩রা জুলাই ১৮৫৬। ২১ আষাঢ় ১২৬৩)

জ্ঞান প্রদায়িনী সভা।—আগামি ২২ আষাঢ় শুক্রবার সন্ধ্যা সপ্তঘটিকার সময়ে সিমুলিয়াস্থ ৺আশুতোষ দেব মহাশয়ের ভবনে উক্ত সভার প্রথম বাৎসরিক নিয়মিত সভা হইবেক বিদ্যানুরাগী মহাশয়েরা উক্ত সময়ে সভাস্থ হইয়া বাধিত করিবেন। শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষ। সহকারী সম্পাদক।

ছাতুবাবুর পিতা রামদুলাল দেব

(সংবাদ প্রভাকর, ২১ অক্টোবর ১৮৫৬। ৬ কার্ত্তিক ১২৬৩)

কলিকাতা নগর বাসি বাঙ্গালিদিগের মধ্যে ৺ প্রাপ্ত বাবু রামদুলাল সরকার মহাশয় প্রধান ব্যবসায়ী ছিলেন, তাঁহার

প্রথমাবস্থা কষ্টে কালযাপন হইয়াছিল, পরে তিনি বাণিজ্য ব্যবসায়ে স্বহস্তে প্রায় এক কোটি মুদ্রা উপার্জ্জন করিয়াছিলেন, আমেরিকান ও ইউরোপীয় বণিকেরা তাঁহাকে অতিশয় মান্য করিতেন, বিশেষতঃ আমেরিকান বণিক দিগের সহিত তাঁহার অধিক কারবার ছিল তাহাতে ফিলেডেলফিয়া নগরের কোন সম্ভ্রান্ত বণিক জেনরল ওয়াসিংটনের এক প্রতিমূর্ত্তি তাঁহাকে উপঢৌকন দিয়াছিলেন, বাবু আশুতোষ দেব ঐ প্রতিমূর্ত্তি অতি যত্নে রাখিয়াছিলেন, সম্প্রতি তাঁহার লোকান্তর হওয়াতে তাঁহারদিগের অবিভক্ত স্থাবরাস্থাবর সম্পত্তি নীলামে বিক্রয় হইয়া গিয়াছে, তন্মধ্যে ঐ প্রতিমূর্ত্তি ২২০০ টাকা মূল্যে বিক্রয় হইয়াছে, শ্রীযুত বাবু দয়ালচাঁদ মিত্র উক্ত প্রতিমূর্ত্তি ক্রয় করিয়াছেন।

'বেঙ্গলী'-সম্পাদক গিরিশচন্দ্র ঘোষের লিখিত রামদুলাল দেবের একটি সংক্ষিপ্ত জীবনচরিত আছে। লোকনাথ ঘোষ মহাশয় তাঁহার *Indian Chiefs, Rajas, Zemindars, etc.* গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে সংক্ষেপে দেব-পরিবারের কথা বর্ণনা করিয়াছেন।

সাহিত্য-সেবায় বঙ্গমহিলা

(সংবাদ প্রভাকর, ৩ ডিসেম্বর ১৮৬৩। ১৮ অগ্রহায়ণ ১২৭০)

হিন্দুমহিলাগণের হীনাবস্থা নামক এক খানি নূতন পুস্তক আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি, আমারদিগের বন্ধুবর শ্রীযুত বাবু দুর্গাচরণ গুপ্তের সহধর্ম্মিণী শ্রীমতী কৈলাশবাসিনী এই পুস্তকখানি অতি সুললিত অথচ কোমল সাধু ভাষায় বিরচনা পূর্ব্বক গুপ্ত যন্ত্রে অতি পরিষ্কাররূপে মুদ্রাঙ্কণ করিয়াছেন, আমরা ইহার আদ্যোপান্ত পাঠে পরিতুষ্ট হইলাম, হিন্দু নারী প্রণীত কোন পুস্তক আমরা এপর্য্যন্ত প্রাপ্ত হই নাই, ললনাদিগের বিরচিত গদ্য পদ্য পূরিত প্রবন্ধ সকল আমরা সময়ে২ প্রভাকরে প্রকাশ করিয়াছি, অতএব এই বঙ্গদেশ মধ্যে বঙ্গভাষায় পুস্তক প্রকাশের প্রথা কৈলাশবাসিনীর দ্বারাই আরম্ভ হইল, ইহা সামান্য আনন্দজনক নহে, অন্যান্য গুণবতী ও বিদ্যাবতীগণ এই মহৎ দৃষ্টান্তের অনুগামিনী হইয়া আপনাপন মনোগত ভাব ও অভিপ্রায় সকল স্বদেশীয় ভাষায় লিখিয়া পুস্তক প্রকাশে অনুরাগিণী হয়েন, তবে রমণী মণ্ডল হইতে অজ্ঞানতা কেবল তিরোহিত হইবে এমত নহে, এই বঙ্গদেশও বিদ্যালোকে উজ্জ্বল হইতে পারে।

কৈলাশবাসিনী এই পুস্তকের প্রথম ভাগে আপনার বিদ্যা শিক্ষার যে পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, আমরা তৎপাঠে বিস্ময়াপন্ন হইলাম যে, চেষ্টার অসাধ্য কোন কার্য্য নাই, কৈলাশবাসিনী কোন প্রকাশ্য বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করেন নাই, এবং বাল্যকালে বিদ্যানুশীলনে প্রবৃত্ত হওয়া দূরে থাকুক, তাঁহার মনোমধ্যে এপ্রকার সংস্কার ছিল যে, বিদ্যানুশীলন করিলে নারীর বৈধব্য প্রাপ্ত হয়, এই নিমিত্ত তিনি পুস্তকাদি পাঠ করেন নাই, বিবাহ হইলে কেবল স্বামীর অনুরোধে ও উপদেশের দ্বারা বিদ্যা শিক্ষায় নিযুক্ত হইয়া তাঁহারি নিকটে বিবিধ পুস্তক অধ্যয়ন করিয়াছেন, এবং সেই অধ্যয়নের ফলস্বরূপ এই পুস্তকখানি প্রকটিত হইয়াছে, ইহার উপদেশ ভাব অতি উত্তম,...।

(সোমপ্রকাশ, ১৭ কার্ত্তিক ১২৭০)

নূতন গ্রন্থ।—হিন্দু মহিলাগণের হীনাবস্থা। এখানি শ্রীমতী কৈলাসবাসিনী গুপ্ত প্রণীত।...আমরা একবার শ্রীমতী বামাসুন্দরী দেবী প্রণীত একখানি ক্ষুদ্র পুস্তক প্রাপ্ত হইয়াছিলাম, স্ত্রীলোক প্রণীত এই আর একখানি নূতন গ্রন্থ পাইলাম।

আগ্রায় বালিকা-বিদ্যালয়

(সংবাদ প্রভাকর, ২৪ নভেম্বর ১৮৫৬। ১০ অগ্রহায়ণ ১২৬৩)

...কতিপয় মাসের মধ্যে আগ্রা জিলার মধ্যে শ্রীযুত গোপাল সিংহ পণ্ডিতের উদ্যোগে দুই শত বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়া তাহাতে প্রায় তিন সহস্র বালিকা বিদ্যাভ্যাস করিতেছে, স্ত্রী শিক্ষক অভাবে স্ত্রী বিদ্যালয়ের কমিটীর মেম্বরেরা বিশ্বাসী পুরুষ-শিক্ষক মনোনীত করিয়া বিদ্যালয়ে নিযুক্ত করিয়াছেন।...

(সংবাদ প্রভাকর, ২৬ নভেম্বর ১৮৫৬। ১২ অগ্রহায়ণ ১২৬৩)

আমরা ইংরাজী পত্র পাঠে অবগত হইলাম যে আগ্রা-নিবাসি গোপালচন্দ্র পণ্ডিত মহাশয় তথায় বালিকাদিগের বিদ্যানুশীলন বিষয়ে অনুরাগী হইয়া বিলক্ষণরূপে কৃতকার্য্য হইয়াছেন, এই বঙ্গ দেশের ন্যায় উত্তর পশ্চিম রাজ্যেও ভদ্র পরিবারস্থ বালিকাদিগের বিদ্যাশিক্ষার নিয়ম প্রচলিত

ছিল না, ভদ্র পরিবারগণ বালাগণকে বিদ্যালয়ে প্রেরণ করা অতিশয় অপমানজনক জ্ঞান করিতেন, কিন্তু পণ্ডিতবর গোপালচন্দ্রের অবিশ্রান্ত পরিশ্রম ও সদুপদেশ দ্বারা তাঁহারদিগের সেই স্বভাবের ক্রমে অভাব হইয়া আসিতেছে।

(সংবাদ প্রভাকর, ২৬ নভেম্বর ১৮৫৬। ১২ অগ্রহায়ণ ১২৬৩)

আমরা ইংরাজী পত্র পাঠে অবগত হইলাম যে আগ্রা-নিবাসি গোপালচন্দ্র পণ্ডিত মহাশয় তথায় বালিকাদিগের বিদ্যানুশীলন বিষয়ে অনুরাগী হইয়া বিলক্ষণরূপে কৃতকার্য্য হইয়াছেন, এই বঙ্গ দেশের ন্যায় উত্তর পশ্চিম রাজ্যেও ভদ্র পরিবারস্থ বালিকাদিগের বিদ্যা শিক্ষার নিয়ম প্রচলিত ছিল না, এবং ভদ্র পরিবারগণ বালাগণকে বিদ্যালয়ে প্রেরণ করা অতিশয় অপমানজনক জ্ঞান করিতেন, কিন্তু পণ্ডিতবর গোপালচন্দ্রের অবিশ্রান্ত পরিশ্রম ও সদুপদেশ দ্বারা তাঁহারদিগের সেই স্বভাবের ক্রমে অভাব হইয়া আসিতেছে।

প্রথমতঃ উক্ত পণ্ডিত মহাত্মা যে সময়ে আগ্রা রাজধানীতে বালিকা বিদ্যালয় সংস্থাপনের অনুষ্ঠান করেন সেই সময়ে অনেকেই তাঁহার প্রতি আপত্তি করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি তাহাতেও সঙ্কল্পিত বিষয়ে ভীত হয়েন নাই, স্বয়ং সকল ভদ্র লোকের ভবনে গমন করিয়াছেন, যুক্তি ও প্রমাণ এবং বিচার দ্বারা তাঁহারদিগের সকল আপত্তি নিবারণ পূর্ব্বক প্রবৃত্তি প্রদান করাতে উত্তর পশ্চিম দেশীয় লেপ্টেনাণ্ট গবরনর সাহেবের অধিকারস্থ আগ্রা রাজধানী ও অপর কতিপয় স্থানে প্রায় দুই শত বালিকা বিদ্যালয় সংস্থাপিত হইয়াছে। গবর্ণমেণ্ট সাতিশয় আহ্লাদিত হইয়া তাহার সমুদয় ব্যয় নির্ব্বাহ করিতেছেন, ঐ সমস্ত বিদ্যালয়ে প্রায় দুই সহস্র ভদ্র বংশোদ্ভবা বালিকা স্বজাতীয় ভাষায় বিদ্যানুশীলন করিতেছে, এবং ক্রমে তাহারদিগের সংখ্যা বৃদ্ধি হইবারও বিলক্ষণ সম্ভাবনা আছে।

লালা ও বণিক যাঁহারা এতদ্বিষয়ের প্রধান বিপক্ষ ছিলেন তাঁহারা সানুকূল বন্ধু হইয়া বিহিতরূপ সাহায্য প্রদানে উৎসাহি হইয়াছেন, স্ত্রী শিক্ষক প্রাপ্ত না হওয়াতে প্রথমতঃ পণ্ডিত গোপালচন্দ্র অত্যন্ত ভাবিত হইয়াছিলেন, কিন্তু যাঁহারা ঐ সমস্ত বিদ্যালয়ে আপনাপন সন্ততিদিগকে প্রেরণ করিয়া থাকেন তাঁহারদিগের প্রতি শিক্ষক মনোনীত করণের ভারার্পিত হওয়াতে কোন গোলযোগ হয় নাই, তাঁহারা যে সকল ব্যক্তিকে সচ্চরিত্র বিজ্ঞ এবং বিদ্বান বিবেচনা করিয়াছেন তাঁহারাই শিক্ষকের পদে অভিষিক্ত হইয়াছেন, গবর্ণমেণ্ট তাঁহারদিগের মনোনীত ব্যক্তির প্রতি কোন প্রকার আপত্তি করেন নাই।

এইরূপ রুচির নিয়মে ও পণ্ডিতবর গোপালচন্দ্রের উৎসাহ পরিশ্রম এবং যত্ন দ্বারা উত্তর পশ্চিম রাজ্যের বালিকাদিগের বিদ্যা শিক্ষার উপায় হইয়াছে, অতএব উক্ত পণ্ডিত মহাশয়ের যথেষ্ট সাধুবাদ করিতে হইবেক। আহা! এই সময়ে যদ্যপি মৃত মহাত্মা বিটন সাহেব জীবিত থাকিতেন তবে তিনি পণ্ডিতবর গোপালচন্দ্রকে রাজধানীতে আহ্বান করিয়া রাজভবনে তাঁহাকে সম্মানিত করিতেন। আমরা আরো অবগত হইলাম যে পণ্ডিত গোপালচন্দ্রের প্রতি শিক্ষাবিষয়ে অন্যান্য যে যে কার্য্যের ভার সমর্পিত আছে, তাহা আর কিছুই থাকিবেক না, তিনি কেবল স্ত্রী শিক্ষার প্রাচুর্য্য বিধানার্থ আপনার সমুদয় সময় ক্ষেপণ করিয়া বেতন গ্রহণ করিবেন।

বঙ্গ-মহিলার কাব্যচর্চ্চা

(সংবাদ প্রভাকর, ২৮ নভেম্বর ১৮৫৬। ১৪ অগ্রহায়ণ ১২৬৩)

আমরা পরমানন্দ-সাগর সলিলে নিমগ্ন হইয়া প্রকাশ করিতেছি যে "চিত্তবিলাসিনী" নামক অভিনব গ্রন্থ প্রাপ্ত হইয়া পাঠানন্তর চিত্তানন্দে আনন্দিত হইয়াছি, অঙ্গনাগণের বিদ্যানুশীলন বিষয়ে যে সুপ্রণালী এদেশে প্রচলিতা হইতেছে, তাহার ফল স্বরূপ এই গ্রন্থ, আমরা গত বুধবাসরীয় পত্রে লিখিয়াছি যে পণ্ডিতবর গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য পশ্চিম প্রদেশে স্ত্রী বিদ্যার প্রচার নিমিত্ত বিশেষ প্রযত্নশীল হইয়াছেন, কিন্তু তাঁহার অধীনস্থ অবলাগণের বিরচিত কোন পুস্তক আমরা প্রাপ্ত হই নাই, যদিও আমরা ঐ পণ্ডিতবরের যথেষ্ট প্রশংসা করিয়াছি তথাচ তাঁহার প্রতিষ্ঠিত বিদ্যাগারের কামিনীগণের সুশিক্ষার ফল স্বরূপ কোন প্রবন্ধ আমারদিগের দৃষ্টিগোচর হয় নাই, অবলাগণ বিদ্যানুশীলন পূর্ব্বক অবনীমণ্ডলে প্রতিষ্ঠিতা হয়েন ইহাই আমারদিগের প্রার্থনা, এ কারণ আমরা প্রাগুক্ত পুস্তক হইতে একটি বিষয় নিম্নভাগে উদ্ধৃত করিলাম এতৎ পাঠে পুস্তক লেখক শ্রীমতী কৃষ্ণকামিনী দাসির কবিতাশক্তি বিবেচনা করিবেন।

"দয়া ছাড়া ধর্ম্ম নাই।

এক দিবস নিশীথ সময়ে নিদ্রিত হইয়া স্বপ্ন যোগে দর্শন করিলাম, যে কোন সুষুপ্ত মহাশয় পুরুষের নাসিকারন্ধ্র হইতে প্রথমতঃ এক অসামান্য রূপ লাবণ্য বিশিষ্ট ষোড়শ-বর্ষীয়া কামিনী এবং পরক্ষণেই এক তরুণ বয়স্ক তেজঃপুঞ্জ বিশিষ্ট পুরুষ নিঃসৃত হইলেন, পরে তাঁহারা এক স্থানে উপস্থিত হইয়া পরস্পর যাদৃশ কথোপকথন করিয়াছিলেন এবং পরিশেষে যাহা ঘটনা হইয়াছিল পশ্চাল্লিখিত পংক্তি কতিপয়ে প্রকাশ করিতেছি।

পুরুষের উক্তি।

ঘোর রজনীতে তুমি কাহার কামিনী।
কিসের লাগিয়ে ভ্রমিতেছ একাকিনী॥
বয়েসে নবীন অতি রূপ মনোহর।
আছ রঙ্গে নাহি সঙ্গে সঙ্গিনী অপর॥
কি নাম কাহার কন্যা বল রসবতি।
অপ্সরী কিন্নরী কিম্বা হবে দেবজাতি॥

কামিনীর উক্তি।

লঘুত্রিপদী।

আমি হে রমণী, আছি একাকিনী,
কুলের কামিনী তায়।
তুমি হে এখানে, কিসের কারণে,
বল ওহে যুবরায়॥
একি তব রীত, হেরি বিপরীত,
নাহি চিতে কিছু ভয়।
রমণীর পাশে, এলে অনায়াসে,
কিরূপেতে মহাশয়॥
আলাপ করিতে, বাসনা মনেতে,
নাহি ভাব তাহে লাজ।
আমি নারী জেতে, তোমার সহিতে,
পরিচয়ে কিবা কায॥
সর সর সর, কি কর কি কর,
যাও নিজ নিকেতনে।
দেখে যদি পরে, কি বলিবে পরে,
কিছু নাহি ভাব মনে॥

পুরুষের উক্তি।

হেরিয়ে তোমার রূপ ওলো রসবতি।
হয়েছে আমার অতি সচঞ্চলা মতি॥
অকপটে যদি নাহি দিবে পরিচয়।
নিতান্ত প্রাণান্ত হবে জানিবে নিশ্চয়॥
কেনলো বাড়াও জ্বালা ছলনা করিয়ে।
কি নাম কোথায় ধাম বল প্রকাশিয়ে॥

কামিনীর উক্তি।

ভাবে বোধ হয় তুমি হবে মহাজন।
ব্যবহারে কিছু তব না হয় তেমন॥
পরিচয় লবে যদি নিতান্ত আমার।
আগেতে উচিত হয় জানিতে তোমার॥
সত্য করে বল দেখি করিয়া প্রকাশ।
কি নাম ধরহ তুমি কোথায় নিবাস॥

পুরুষের উক্তি।

দেবগণ মধ্যে হয় আমার বসতি।
ধর্ম্ম নামে খ্যাত আমি শুন রসবতি॥
সমাদরে যারা করে আমার সাধন।
তাদের শরীরে করি সতত ভ্রমণ॥
মর্ত্যলোকে সেই হেতু আমার বসতি।
আপন বৃত্তান্ত ধনি কহ লো সম্প্রতি॥

কামিনীর উক্তি।

প্রবৃত্তির কন্যা আমি দয়া নামে খ্যাত।
শ্রদ্ধা নামে ভগ্না মম জগতে বিদিত॥
মর্ত্যলোকে মহাত্মাগণের অন্তরেতে।
নিবাস আমার তাই ভ্রমি হেনমতে॥
সুরগণ শ্রেষ্ঠ তুমি ধর্ম্ম মহামতি।
এরূপ ব্যাভার কেন অবলার প্রতি॥
তোমার উচিত কভু না হয় এমন।
ছাড় ছাড় পথ করি স্বস্থানে গমন॥

পুরুষের উক্তি।

বল দেখি বিধুমুখি সে কেমন কথা।
আমারে ছাড়িয়ে তুমি যাবে বল কোথা॥
নিশ্চয় তোমায় হেরি হয়েছি মোহিত।
অনঙ্গ আমার অঙ্গ করিছে পীড়িত॥
দয়া নাম ধরে তুমি নির্দ্দয় হৈওনা।
দয়া হলে দয়া হীনে কি হবে বলনা॥
অতএব আমারে করহ পরিণয়।
নাহি কর যদি হবে জীবন সংশয়॥

কামিনীর উক্তি।

শুন ধর্ম্ম মহামতি আমার বচন।
বিবাহ করিতে মম নাহিক্ মনন॥
পুরুষের সঙ্গে দেখ মিলন হইলে।
সতত দহিতে হয় বিচ্ছেদ অনলে॥
তবে মাত্র আছে এক দৃঢ়তর পণ।
যদি কেহ পারে ইহা করিতে পালন॥
আমা ছাড়া তিলেক না হবে কদাচন।
তা হলে তাহারে পারি করিতে বরণ॥

পুরুষের উক্তি।

দয়া ছাড়া ধর্ম্ম বল আছে কোন খানে।
যেথানেতে দয়া দেখ ধর্ম্ম সেইখানে॥
অতএব কেন কর এমন ভাবনা।
দয়া ছাড়া ধর্ম্ম প্রিয় কখন হবে না॥
দয়া হীনে ধর্ম্মের নাহিক হয় গতি।
দয়া ধর্ম্ম দুয়ে হয় একাধারে স্থিতি॥

কামিনীর উক্তি।

শপথ করিতে যদি পার মহাশয়।
তবে সে আমার ইথে হইবে প্রত্যয়॥
যেথানেতে রব আমি সেইখানে রবে।
তিলেক তিলার্দ্ধ নাহি ছাড়াছাড়ি হবে॥
তুমি ধর্ম্মরাজ হও সত্যের আশ্রয়।
ত্রিসত্য করিলে পরে ঘুচিবে সংশয়॥

পুরুষের উক্তি

শুন শুন শুন ওলো ও বিধুবদনি।
চন্দ্র সূর্য্য সাক্ষী আর দিবস রজনী॥
আমি ধর্ম্ম আর করে নির্ভর আমাতে।
তোমা ছাড়া কথন না হব কোনমতে॥
অতএব বিলম্বের নাহি প্রয়োজন।
আলিঙ্গন দিয়ে প্রিয়ে যুড়াও জীবন॥

পয়ার

দুই জনে সত্য বন্ধ করি হেন মতে।
পারিজাত হার ছিল দোঁহার সনেতে॥
আপন আপন করে লইয়ে আপন।
উভয়ে উভয় গলে করিল অর্পণ॥
হেন কালে আচম্বিতে নিদ্রা ভঙ্গ হলো।
কিছু নাহি জানিলাম পরে কি ঘটিল॥"

জীবনচরিত-রচনায় ঔদাসীন্য

(সম্বাদ ভাস্কর, ২৭ মে ১৮৫১। ১৪ জ্যৈষ্ঠ ১২৫৮)

বিলাতী ভাষায় লিখিত তদ্দেশীয় লোকেদের জীবন বৃত্তান্ত যাহা বঙ্গভাষায় সংগৃহীত হইতেছে আমারদিগের দেশস্থ লোকেরা ঐ সকল সংগ্রহ গ্রন্থ পাঠ করিয়া দেখিবেন কোন ব্যক্তি যাবজ্জীবন দয়ার কর্ম্ম করিয়াছেন, কেহ বাহু-বলে রাজা হইয়াছিলেন, কেহ বিদ্যাদ্বারা স্বদেশস্থ সমুদায় মনুষ্যকে সদুপদেশ দিয়াছেন, কেহ বা পুণ্যবলে তাবৎকে পুণ্যাত্মা করিয়াছেন, ইত্যাদি বিবিধ বিষয়ে এতদ্দেশীয় লোকেরা উপদেশ প্রাপ্ত হইবেন, কিন্তু আমরা কি দুর্ভাগ্য এই সুফলকালেও আমারদিগের দেশস্থ মান্য লোকদিগের জীবন বৃত্তান্ত দেখাইয়া উত্তর প্রদান করিতে পারিলাম না, ব্রহ্মদেশ, জয়ন্তী, কাছাড়, মণিপুর, নেপাল, চীনাদি প্রদেশীয় রাজ্যপালদিগের জীবনবৃত্তান্ত কি দেশীয় ভাষায় লিখিত আছে, এক খানী চিরকুটও নাই, ফ্রেণ্ড অফ ইণ্ডীয়া সম্পাদক মহাশয়ের সহিত বিচার কালে আমরা নবদ্বীপের মহারাজগোষ্ঠীর জীবনবৃত্তান্ত চাহিয়াছিলাম, রাজবাটী হইতে প্রত্যুত্তর আসিল আমরা যাহা জানি তাহাই লিখিয়া উত্তর দিব তাহাতেই অনুভব হইল রাজপরিবারেরা আমারদিগের

অপেক্ষা তাঁহারদিগের বংশাবলীর বিষয় অধিকানুসন্ধান করেন নাই, সুতরাং আমারদিগের জ্ঞাত বিষয় মাত্রই লিখিতে হইল আমরা তাহাতেই ফ্রেণ্ড অফ ইণ্ডীয়া সম্পাদক মহাশয়ের সহিত বিচারে জয়ী হইয়াছি, নাটোর পুঁঠিয়া রাজবংশ্যদিগের পূর্ব্ব পুরুষীয় কাণ্ডও এই প্রকার গোলযোগে রহিয়াছে, কলিকাতা নগরীয় রাজগণ ও ধনিগণ কেহ পূর্ব্ব পুরুষদিগের জীবনবৃত্তান্ত লেখেন নাই, কেবল শ্রীযুত রাজা কালীকৃষ্ণ বাহাদুর তাঁহার পূর্ব্বপুরুষীয় কার্য্য চরিত্র প্রকাশ করিয়াছিলেন, আর রাজা রামমোহন রায়ের জীবন বিবরণ প্রকাশ হইয়াছে, দ্বারকানাথ বাবুর বৈবনিক বিষয় আমরা সংক্ষেপে যাহা লিখিয়াছি তাহাতেই শেষ আর কেহ বিস্তারিত বিবরণ লেখেন নাই, কিন্তু প্রকৃত রূপে তাহা লিখিলে এক বৃহৎ পুস্তক হয় এবং সাধারণ লোকেরাও তাহা পাঠ করিয়া সন্তুষ্ট হইতে পারেন, দর্পনারায়ণ ঠাকুর, গোপীমোহন ঠাকুর, হরিমোহন ঠাকুর, মোহিনীমোহন ঠাকুর, রাজা জয়নারায়ণ ঘোষাল বাহাদুর, রাজা কালীশঙ্কর ঘোষাল বাহাদুর, গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ, রাজা রাজবল্লভ রায় বাহাদুর, শান্তিরাম সিংহ, প্রাণকৃষ্ণ সিংহ, জয়কৃষ্ণ সিংহ, রামদুলাল দেব, রামলোচন ঘোষ, নিমাইচরণ মল্লিক, গৌরচরণ মল্লিক, বৈষ্ণবদাস মল্লিক, রাজা গোপীমোহন দেব বাহাদুর, অক্রূরচন্দ্র দত্ত, দেওয়ান কাশীনাথ মল্লিক, দেওয়ান রামসেবক মল্লিক ইত্যাদি মহামহিম ব্যক্তিগণ...হসদয়াদি প্রকাশের বিবিধ কর্ম্ম করিয়া পৃথিবী হইতে গিয়াছেন তাঁহার দিগের এক এক ব্যক্তির জীবন বৃত্তান্তে এক ২ ইতিহাস পুস্তক হয় কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে ঐ সকল মহাপুরুষগণের বংশাবলীর নিকট প্রার্থনা করিলে তাঁহারা এমত চতুরঙ্গুলীপরিমিত পত্রও দেখাইতে পারিবেন না তাহাতে কোন মহাজনের জীবন বৃত্তান্ত লিখিত হইয়াছে।

যেসকল মহামহিমেরা বর্ত্তমান আছেন, ইহাঁরাও অনেক সৎকর্ম্ম করিয়াছেন ইহাঁরদিগের জীবন বৃত্তান্তইবা কোথায় লিখিত হইল, মাত্র এক শত বৎসর পরে যদি কেহ জিজ্ঞাসা করেন রাজা সত্যচরণ ঘোষাল বাহাদুর, হরকুমার ঠাকুর, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, রামানাথ ঠাকুর, গোপাললাল ঠাকুর, উপেন্দ্রমোহন ঠাকুর,দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাজা রাধাকান্ত বাহাদুর, রাজা কালীকৃষ্ণ বাহাদুর, এবং তাঁহার ভ্রাতৃগণ, শিবনারায়ণ ঘোষ,রামনারায়ণ দত্ত, দুর্গাচরণ দত্ত দেবনারায়ণ দেব, আশুতোষ দেব, শ্রীকৃষ্ণ সিংহ, রাজা বৈদ্যনাথ রায় বাহাদুর, মতিলাল শীল, প্রাণকৃষ্ণ মল্লিক, শ্রীকৃষ্ণ মল্লিক, গুরুদাস দত্ত ইত্যাদি ধনিলোকেরা কি২ সৎকর্ম্ম করিয়াছিলেন তবে এই সকল মহাশয়দিগের কর্ম্মের বিষয় কেহ বলিতে পারিবেন না, অথচ অনেকেই বলিয়া থাকেন,"মহাজনো যেন গতঃসপন্থা" এস্থলে মহাজন বাক্যার্থ-পূর্ব্বপুরুষগণ, তাঁহারা যে পথে চলিয়াছেন সেই পথই পথ, কিন্তু পূর্ব্বপুরুষেরা কিং সৎকর্ম্ম করিয়াছিলেন কেহ তাহা বলিতে পারেন না, ভিন্নদেশীয় লোকেরা হিন্দু জাতির ভাষায় তাঁহারদিগের পূর্ব্বপুরুষগণের জীবন বৃত্তান্ত প্রকাশ করিতেছেন হিন্দু বালকেরা ঐ সকল লোকের জীবন বৃত্তান্ত দেখিয়া তাঁহারদিগের কার্য্যের অনুগমন করিবে,?হাতে,কেন, খ্রীষ্টীয়ান হইবেক না, অতএব আমরা পরামর্শ বলি ধনি হিন্দু মহাশয়েরা আপনারদিগের মধ্যে চাঁদা করিয়া টাকা সংগ্রহ করুন, সেই টাকাতে পূর্ব্বপুরুষগণের জীবন বৃত্তান্ত লিখিত পুস্তক হউক, এবং আপনারদিগের জীবনের কার্য্যও লেখা হইতে থাকুক, এই সকল পুস্তক দেখিয়া উত্তর কালীন বংশাবলী পৈত্রিক পথে চলিবেন, এবং ধনি মহাশয়দিগের নাম কর্ম্ম লিখিত পুস্তক সকল পৃথিবীর ক্রোড়ে থাকিয়া সহস্র ২ বৎসর পরেও তাঁহারদিগের পরিচয় দিবে, বারয় লক্ষ রাজস্বের মহীশ্বর "মহারাজাধিরাজ রামকৃষ্ণ রায় বাহাদুর" কত সৎকর্ম্ম করিয়াছিলেন এবং তাঁহার কিপ্রকার জ্ঞানমৃত্যু হয় কোন পুস্তকে তাহা লেখা নাই, কেবল মহারাজের মৃত্যুকালের একটা ভাবা গান যাহা ভদ্রেতর সাধারণ লোক মুখে শুনিতে পাই এইস্থলে তাহার কিয়দংশ গ্রহণ করি, ঐ মহারাজ গঙ্গাতীরে দেহ স্থাপন করিয়া গান স্বরে তাঁহার ভোলানাথ নামক ভৃত্যকে বলিয়াছিলেন, "আমার মন যদিরে ভুলে, বালির শয্যায় কালীর নাম বলিও কর্ণমূলে" এই গান করিতে করিতেই তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল, অতএব অনিত্য ধনের ও দেহের অভিমান মিথ্যা, ধন দেহ সঙ্গে যায় না, জীবনে যিনি যাহা করেন তাহা লিপিবদ্ধ হইলে বহুকাল থাকে, এতদ্দেশীয় মান্য মহাশয়েরা ইহা বিবেচনা করিবেন।

তেলিনীপাড়ার অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

(সংবাদ প্রভাকর, ১৮ ডিসেম্বর ১৮৫৪ । ৪ পৌষ ১২৬১)

তেলিনীপাড়া নিবাসি ধনরাশি ধার্ম্মিকবর শ্রীযুত বাবু অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় প্রাচীন কবিদিগের বিরচিত সংগীত সকল সংগ্রহ পূর্ব্বক আমারদিগের মাসিক প্রভাকরের সাহায্য করণে প্রবৃত্ত হওয়াতে আমরা তাঁহার নিকট যে পর্য্যন্ত বাধিত হইলাম তাহা লিখিয়া ব্যক্ত করিতে পারি না, আমরা যে অভিপ্রায়ে এই বিষয়ে প্রবৃত্ত হইয়াছি তাহা তিনি বিলক্ষণরূপেই জানিতেছেন, এদেশের অশিক্ষিত লোক সকল যখন অতি অপূর্ব্ব মনোহর ও মোহকর কবিতা সকল রচনা করিয়া সহস্র সহস্র লোকের চিত্ত হরণ করিয়াছেন তখন তাঁহারা সুশিক্ষিত হইলে তাঁহারদিগের কবিতাশক্তি কত গুণে বৃদ্ধি হইত তাহার অনুমান করাও অসাধ্য, অতএব এই সময়ে ঐ কবিকদম্বের কবিতা সকল সংগ্রহ করা অতি আবশ্যক, কিন্তু আমরা এই প্রতিজ্ঞারূঢ় হইয়া যেপর্য্যন্ত পরিশ্রম ও অর্থব্যয় ও উপাসনা করিতেছি তাহার একমাত্র সাক্ষি সেই পরমেশ্বর আছেন, অধুনা শ্রীযুত বাবু অন্নদাপ্রসাদ বন্দোপাধ্যায় মহাশয় এই বিষয়ে আমারদিগের সাহায্য দানে প্রবৃত্ত হওয়াতে তাঁহার যেরূপ মহত্ব প্রকাশ হইল তাহা পাঠক বর্গই বিবেচনা করিবেন, অন্নদাপ্রসাদ বাবু বিশেষ গুণগ্রাহী ও স্বয়ং অতি সুকবি এবং বিদ্যানুরাগী,... প্রাচীন কবিদিগের কবিতা সকল সংগ্রহ করিয়া এই প্রভাকরে প্রকাশ পূর্ব্বক স্বদেশের মুখোজ্জ্বল করা তাঁহার অতি কর্ত্তব্য কার্য্য হইয়াছে,...।

(ক্রমশঃ)

অতৃপ্তি

৺ইন্দিরা দেবী
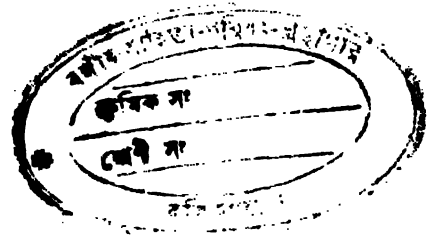
প্রথম যেদিন দেখা তোমায় আমায়,
মনে পড়ে সেদিনের কথা ?
কি আলোকে কি পুলকে ভরেছিল বুক—
অজানিত কোন্ মদিরতা ।
মনে পড়ে সেদিনের শুক্লা নিশীথিনী
ঢেলেছিল কি মধু কিরণ,
মনে পড়ে বাতাসের কত আনাগোনা
লুটি' লুটি' ফুট ফুলবন ।

রূপ রস গন্ধ ল'য়ে নবীনা ধরণী
আপনারে করেছিল দান,—
পাপিয়ার কলতানে, বাঁশীর ঝঙ্কারে
বেজেছিল মিলনের গান ।
আজও আছে জ্যোৎস্নানিশি, আজিও বাতাস
পরশিয়া ফিরিছে তেমনি ;
আজও আছি তুমি আমি,—শুধু মাঝে নাই
সেদিনের সেই হৃদিখানি ।

সম্পাদিকার জল্পনা

ভগবানকে ডাকা কেন ?

পাঁচটা কথার প্রসঙ্গে একদিন হঠাৎ একটা প্রশ্ন উঠ্‌ল —"ভগবানকে ডাকা কেন ? অনর্থক সময় নষ্ট হয় ঢের ; দেশের কাজ এগোয় না তাতে একটুও। নূতন নূতন কারখানা স্থাপন, শিল্পশিক্ষালয় গঠন, ইস্কুল কলেজ গড়ে' তুলে' দেশে মানুষ তৈরি করে' তোলাই হ'চ্ছে আসল কাজ। যদি ভগবান থাকেন তবে তিনি তুষ্ট হবেন তাতেই।"

পাশের অন্য মানুষ বলে' উঠ্‌লেন—"তাই কি হয় হে ! এতকাল ধরে' ভগবানকে মানুষ ডেকে এসেছে, সে কি খামোকা ? মানুষের মর্ম্মগত অভ্যাস ভগবানকে ডাকা ; তোমার কথায় হঠাৎ সেটা মানুষ উঠিয়ে দেবে বুঝি ? আচ্ছা তোমার স্পর্দ্ধা দেখি !"

পূর্ব্বের লোক : "এতকাল ত ভগবানকে ডাক্‌লে, ফলটা পেলে কি ?—তুমি যে তিমিরে তুমি সে তিমিরে,—দেশের যে দুর্দ্দশা সেই দুর্দ্দশা ! পৃথিবীর কাজে হেরে হেরে হয়রান হ'য়ে মর্‌ছ, মাথা তুলে' দাঁড়াতে পার্‌ছ কই ? ডাকাডাক বন্ধ রেখে এখন কাজে লাগো দেখি, বাপু !"

তৃতীয় আর এক ব্যক্তির দিকে চেয়ে দ্বিতীয় মানুষ : "তুমি বাপু জ্ঞানীও বটে সাধকও বটে, বল ত হে ব্যাপারটা আসলে কি ? তোমার কাছ থেকে আমরা এ প্রশ্নের উত্তর চাই।"

কিছুক্ষণ চুপ করে' থেকে তৃতীয় ব্যক্তি বল্‌লেন,—"নিজের শ্রেষ্ঠতম ও উৎকৃষ্টতম প্রকৃতিটি ফুটিয়ে তোলার জন্যই ভগবানকে ডাকা, ভগবানকে বাড়িয়ে তোলার জন্য নয়। ডাকা না ডাকায় যিনি বাড়েন কমেন না তিনিই যে ভগবান একথা সকলেই জানেন। কিন্তু তেমন কোন কিছু না থাক্‌লে মানুষের শেষ বিশ্রাম বা শান্তির কোন পথ থাকে না—মানুষের কাছে নিজের অন্তরতম সত্তা বা আত্মার পরিপূর্ণ সৌন্দর্য্যময় রূপটিও প্রত্যক্ষ হয় না। কাজেই এই প্রয়োজনটি সাধনের জন্য মানুষকে 'ভগবান', 'ভগবান' বলে' নিজের অন্তরতম সত্তাকে ডাক দিয়ে জাগিয়ে তুল্‌তে হয় নিজের অনুভূতির মধ্যে। জল, মাটি ও সূর্য্য-কিরণ থাকা সত্ত্বেও যেমন লাঙলের ফলা দিয়ে মাটি উথ্‌ড়িয়ে দিতে হয় ভালো করে' ফসল ফলাবার জন্য, তেমনি 'ভগবান' এই নামটুকুর সাহায্যে নিজের অন্তর-প্রকৃতির শক্ত আবরণটুকু উথ্‌ড়িয়ে দিতে হয় অন্তরতম সৌন্দর্য্যলোকে প্রাণটি অঙ্কুরিত করে' তোলার জন্য।"

প্রথম ব্যক্তি বলে' উঠ্‌লেন—"চষে' মর সৌন্দর্য্যলোক, খুঁজে' ফেরো আত্মার প্রেরণা দিনরাত, দেশের তাতে হবে কি ? দেশের মানুষগুলো কি দুর্গতি ভোগ কর্‌ছে, চোখে দেখ্‌ছ ত ? তাদের বাঁচাবে কি করে' ? দেশের উন্নতির পথ কোন্ দিক দিয়ে ? ডাকো ভগবানকে,—বাঁচুক্ তারা ! দেখি দেশ বড় হ'য়ে মাথা তুলে উঠুক্ পৃথিবীর সামনে। আধ্যাত্মিক সাধনা করেছেন দেশের অনেক মানুষ, দেশটা তবু উদ্ধার হ'ল না কেন আজও ? পাঁকে পড়ে' মুখ থুব্‌ড়িয়ে পচে' মর্‌ছে হাজার মানুষ ;—সুন্দর ও সুস্থ করে' তোল দেখি তাদের ? দেখি তোমার আত্মার সাধনবল। অন্তর স্বাধীন হ'লে বাইরের স্বাধীনতা পেতে বাকী থাকে কি আর এক মুহূর্ত্ত ? পৃথিবীর কাজ করা চাই সবাই মিলে',—তবেই উদ্ধার !—মনে মনে কোন কিছুকে ডাকাডাকির কর্ম্ম নয়।"

তৃতীয় ব্যক্তি শান্তভাবে বল্‌লেন—"পৃথিবীর কাজটা পাঁচজনে মিলে' কর্‌লে তবেই ত পৃথিবীর উন্নতি এগিয়ে চল্‌বে— একলা ত তুমি পার্‌বে না, পাঁচজনকে ত চাই ? ভগবানকেও তেমনি পাঁচজনে মিলে' একযোগে ডেকে দেখ দেখি কি ফল হয়। পৃথিবী শুদ্ধ লোক মিলে' পৃথিবীর উন্নতির চেষ্টায় লাগ্‌লে এক মুহূর্ত্তে পৃথিবী হাজার বছরের উন্নতির পথে এগিয়ে পড়্‌বে। পৃথিবী শুদ্ধ মানুষ যদি একযোগে এক মুহূর্ত্ত ভগবানকে এক জেনে ডাক্‌তে পারে, পৃথিবীর অন্তরতম সৌন্দর্য্যলোকের দ্বার এক মুহূর্ত্তে উদ্‌ঘাটিত হ'য়ে যাবে সবার সামনে বাইরেও, এবং মানুষের

প্রতি কাজে পৃথিবী সুন্দর হ'য়ে উঠ্‌তে থাক্‌বে গ্লানিমুক্ত হ'য়ে।"

প্রথম লোক : "ঘটা শক্ত।"

তৃতীয় ব্যক্তি : "অসম্ভব নয়।"

উপার্জ্জনক্ষেত্রে নারীর ভিড়

দলে দলে মেয়েরা এখন উপার্জ্জনের চেষ্টায় বেরিয়ে পড়্‌ছেন। এতদিন এ ক্ষেত্রে অসাহায়া বিধবা ও স্বামি-পরিত্যক্তাদেরই উমেদার দেখা যেত; এখন চাকরী-যাওয়া ও মাইনে কমা বাবুদের স্ত্রীরাও কিছু না কিছু উপার্জ্জনের জন্য ব্যাকুল হ'য়ে উঠেছেন।—এমন কি, মাসিক দশ টাকার জোগাড় হ'লেও তাঁরা অনেকখানি তৃপ্ত হন। কিন্তু উপার্জ্জন করেন কোথায়?—ক্ষেত্র কই? কাগজের ঠোঙা বানানো, বিড়ি পাকানো, দোকানওয়ালাদের জন্য সুপুরি কেটে দেওয়া প্রভৃতি ছোটদরের কাজ নিতে সঙ্কোচ থাকা সত্বেও তাঁরা ঐ সকল কাজ গ্রহণ কর্‌তে বাধ্য হন। তবে একান্ত ভাবে চান যদি কোন উঁচুদরের শিল্প সাহায্যে কিছু সংগ্রহ কর্‌তে পারেন। তাতে মান থাকে আত্মীয়-কুটুম্বের কাছে। মানের দায়ে ঐ সকল কাজ তাঁরা লুকিয়ে ক'রে থাকেন। আমাদের কাছে চিঠি আসা ও লোক আনাগোনার অন্ত নেই। শিল্প সাহায্যে উপার্জ্জন ছাড়া শিক্ষাকার্য্যে উপার্জ্জন করার সময়ও নেই তাঁদের, সামর্থ্যও নেই। দেশের এই অবস্থার দিকে দেশবাসী নরনারী দৃষ্টিপাত করুন। সমিতি-কেন্দ্রেই তাঁরা একত্র হ'য়ে একটুখানি পথ পেতে পারেন শিল্পচর্চ্চার, কিন্তু স্থানীয় লোকের অর্থসাহায্যের অভাবে সমিতি চালানই দুষ্কর হ'য়ে উঠেছে। গৃহস্থ লোক কি অভাবে পড়েছে বলার নয়। প্রত্যেক ছোট ছোট পাড়ার ধনী ও শিক্ষিতা মহিলারা এক একজন মাথা হ'য়ে দাঁড়িয়ে এই গৃহস্থ পরিবারের পরিশ্রমী মেয়েদের কাজে লাগাতে চেষ্টা করুন। বাইরে অনেক চাঁদা দিতে হয়, তা না দিয়েও যদি তাঁরা নিজ নিজ পাড়াকে কেন্দ্র ক'রে কতকগুলি মেয়ের উপার্জ্জনের সহায়তা কর্‌তে পারেন, তাতে ধর্ম,পুণ্য ও কর্ত্তব্য তিনই একযোগে সাধন করা হবে। অনেকে কর্‌ছেন,—আরও অনেকের এ কাজে নাম্‌তে হবে। ধনী ও শিক্ষিতারা এই সকল ভদ্র দরিদ্র গৃহস্থ মেয়েদের সঙ্গে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে পরিচিত হ'লে ও তাঁদের সহায়তা কর্‌তে পার্‌লে নিজেরা অনেকখানি সুখী হ'তে পার্‌বেন ব'লে আমাদের বিশ্বাস এবং হৃদয় দিয়ে তাঁরাও তাঁদের প্রতিদান দেবেন অনেকখানি।

মাতৃপূজা

বাংলার সুসন্তান শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ বসু পুরী বেড়াতে গিয়েছিলেন অল্প কয়েকদিনের জন্য। উঠেছিলেন আমাদের বিধবাশ্রমের ঠিক পাশের একটি বাড়ীতে। তাঁর মেয়েরা যাতায়াত কর্‌তেন আশ্রমের মধ্যে প্রায়ই। ব্যবহার খুব সুন্দর - ভদ্র, অমায়িক এবং সৌজন্যভরা।

সমুদ্রপথে যেতে একদিন রাস্তায় উক্ত বসু মহাশয়ের সঙ্গে দেখা। ক্ষণকালের জন্য আমার সঙ্গে পরিচিত হ'য়েই বল্‌লেন, "আমার মায়ের স্মৃতিরক্ষার কোন ব্যবস্থা আজও কর্‌তে পারিনি একান্ত ইচ্ছা সত্বেও, সুযোগ হয়নি। বড় যত্নেই মা আমাদের মানুষ করেছিলেন। মায়ের নামে মাতৃপূজার একটি আয়োজন না ক'রে যাই কি ক'রে? বাবার জন্য একটা কিছু করেছি এক জায়গায়; মায়ের স্মরণে কিছু করা হয়নি। মনে হয়েছে, এইখানে এই বিধবাশ্রমের সঙ্গে যোগে কিছু কর্‌ব—মনের সঙ্গে মিল খেয়েছে এই জায়গাটির। সমুদ্রতীরের মাহাত্ম্যও আছে স্থানটিতে একটু।"

যে কথা সেই কাজ! পরদিন সকালে ইঞ্জিনিয়ার ডেকে হিসাবপত্র হ'য়ে গেল একদণ্ডে। বেলা তিনটার সময় এক হাজার টাকার চেক আমার হাতে এসে পৌঁছল—শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ বসুর মাতৃদেবীর স্মরণার্থে আশ্রম ও বালিকাবিদ্যালয়ের ছাত্রী-শিক্ষয়িত্রীদের জন্য একটি নূতন পাঠাগার স্থাপনের উদ্দেশ্যে। দ্বিধা নাই,—প্রশ্ন নাই,—সন্তানের শ্রেষ্ঠ ভক্তির সহজ দান মাতৃপূজার নিয়োজিত হ'ল।

পাঠাগার নির্ম্মাণ শুরু হয়েছে যথাসময়ে।

স্বর্ণকুমারী স্মৃতি-সভা

গত ৩১শে জুলাই রবিবার বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ গৃহে সন্ধ্যা ৬॥৹টার সময় পূজনীয়া স্বর্ণকুমারী দেবীর স্মৃতিরক্ষার

জন্য একটি সভা আহূত হয়। বাংলার নারী-সাহিত্যিকদের মধ্যে তাঁর স্থান বঙ্কিমচন্দ্রের সমশ্রেণীয়। বঙ্কিমচন্দ্রের নূতন সাহিত্যসৃষ্টি ও বঙ্গদর্শন মাসিকের নূতন ধারা যেমন নবযুগে বাঙালীকে নূতন পথ দেখিয়েছে ও ধরিয়েছে, স্বর্ণকুমারীর নূতন নূতন উপন্যাস ও মাসিক ভারতীর নবকলেবর ও নূতন ধারা বাংলার নরনারী উভয় দলকেই তেমনি আনন্দ দিয়েছে কম নয় সেই যুগে। শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার সঙ্গে সেদিন সকলেই সে কথা স্মরণ করে' তাঁর আত্মার তর্পণ করেছিলেন সুন্দরভাবে।

"সখী-সমিতি" ও "মহিলা শিল্পমেলা" প্রবর্ত্তিত করে' তিনি নব্যবঙ্গের মহিলাদের রুচি ফেরান শিল্পচর্চ্চার দিকে ও "সখী-সমিতি"র সাহায্যে অভাবগ্রস্ত পরিবারের মেয়েদের শিক্ষার ব্যয়বহনের ব্যবস্থা করে' সঙ্ঘবদ্ধভাবে নারীদের দ্বারাই যে নারীশিক্ষার উন্নতির চেষ্টা হওয়া উচিত তারও সূচনা করেন। উভয় বিষয়েই যে তিনি জাতির অগ্রবর্ত্তিনী সে কথাও সেখানে আলোচিত হয়েছিল সেদিন।

সাধারণের পক্ষ হ'তে এঁর স্মৃতিরক্ষার ব্যবস্থা হওয়া জাতির পক্ষে গৌরবজনক।

দেশী ছাঁচে দেশের কাজ

বাংলার ইংরাজী-অনভিজ্ঞা ঘোরো মেয়েরা দুঃখ জানান, "ইংরাজী-জানা বিদেশ-ঘোরা মেয়েরা যেমন ব্যাপক ক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে দেশের কাজ করতে সমর্থ হন, আমরা তা পারি না। বিদেশী ধরণের সঙ্গে আমরা অপরিচিতা—ভাষা না জানায় বোঝাপড়াও করতে পারি না বিদেশী ব্যাপারের সঙ্গে ভালো করে'। দেশী ছাঁচে দেশের কাজ করতে পারি যদি পথ দেখাতে পারেন।"

দেশী ছাঁচে দেশের কাজ করার দরকার আছে খুব বেশী, এ কথা তাঁদের জানাতে হবে। দেশী ছাঁচেই দেশের মানুষ গড়ে' উঠবে, বিদেশী ছাঁচে ঢালা দেশের ধাতে সইবে না পুরোপুরি,—সকলেই বুঝেছেন। অতএব দেশী মেয়েরা ফেলা নন দেশের কাজের ক্ষেত্রে। অবশ্য পৃথিবীর সঙ্গে যোগে চলতে হ'লে নানা দেশের জ্ঞান ও ভাষার সঙ্গে পরিচিত হওয়াও দরকার বটে,—কিন্তু ছাঁচ বদল হবে না একেবারে তা'ই বলে'। দেশের চিড়ে-মুড়ির আদর যাবে না কোন কালে বিদেশী বিস্কুট পেলেও। গরুর খাঁটি দুধটুকু প্রাণ বাঁচাবে চিরকাল—বিদেশী টিনের-দুধ এসে তার জায়গা দখল করতে পারবে না কোনমতে। দেশের সোনামুগের দাল ও সরু চালের ভাতেই রোগী স্বাস্থ্য লাভ করবে সহজে স্বল্প-ব্যয়ে—বিদেশী হর্লিক্স ও ছ'মাস ধরে' টিনে-পোরা ব্যয়সাধ্য পেটেণ্ট খাদ্যে অভাব ঘুচবে না দেশের মানুষের। দেশের খাঁটি জিনিষগুলি বাঁচাতে পারা ও সেগুলিকে উপাদেয় করে' তোলার ভার দেশের মেয়েদের হাতে। এটি বড় কম কাজ নয় দেশের মেয়েদের পক্ষে। ব্যাপক ক্ষেত্রের দিকে না তাকিয়ে পরিবার ও পাড়াটির প্রতি দৃষ্টি ফেলুন দেশের মেয়েরা। নিজ নিজ পরিবার ও পাড়াকে স্বাবলম্বী করে' তুলুন বহু-ব্যয়ের হাত থেকে উদ্ধার করে'। সদ্ভাব রক্ষা করে' মিলতে শিখুন পরস্পরের মধ্যে ও এই ভাবে দেশের মেয়েরা স্বরাজ আনুন স্বঘরে। ঐ সকল সাধ্বী মেয়েদের নাম কাগজে কাগজে ধ্বনিত না হ'লেও "বঙ্গলক্ষ্মী" তাঁদের নাম লিখে রাখবে চিরস্মরণীয় করে' নিজের বুকে।

হাওয়ার গুণে স্বাস্থ্যলাভ

সুপথ্য ও সুখাদ্যের গুণে মানুষ স্বাস্থ্যলাভ করে, সকলেই জানেন। কিন্তু খোলা হাওয়ার গুণে স্বাস্থ্যের কতদূর উন্নতি হয়, এ দেশের সাধারণ লোকের মনে সে সম্বন্ধে খুব স্পষ্ট ধারণা এখনো জন্মায়নি। এঁদের মধ্যে যাঁরা কতকটা বোঝেনও, অর্থাভাবে নিজেদের রুগ্ন শীর্ণ দুর্ব্বল সন্তানদের জন্য তার কোন ব্যবস্থা করতে তাঁরা প্রায়ই অক্ষম। এই সকল অভাবগ্রস্ত পরিবারের সন্তানদের বৎসরে দুইবার—গ্রীষ্ম ও পূজার ছুটির সময়—স্বাস্থ্যকর জায়গার খোলা হাওয়ায় বেড়িয়ে আনবার একটি সুন্দর আয়োজন করেছেন দেশের কয়েকজন উচ্চশিক্ষিতা ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহোদয়গণ মিলে'। এর উপকারিতা আমাদের স্বচক্ষে দেখা—কানে শোনা কথা মাত্র নয়। জাতির হিতকারিণী ও হিতকারী এই সকল মহিলা ও মহোদয়গণকে জাতির তরফ থেকে আমরা ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এই অনুষ্ঠানের নেত্রীস্থানীয়া ডাঃ মৃগেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয়ের পত্নী শ্রীযুক্তা হেমলতা মিত্রের অক্লান্ত পরিশ্রম অতীব প্রশংসনীয়। অনুষ্ঠানটির প্রতি সাধারণের সহানুভূতি ও দৃষ্টি আকর্ষণ করি।

বাণী-ভবনের ভিত্তিস্থাপন

বহু চেষ্টা ও প্রয়াসের পরে গত ১৩ই আগষ্ট, শনিবার "বিদ্যাসাগর বাণীভবন" আশ্রমের নিজস্ব বাটীর ভিত্তি স্থাপন কার্য্য সুন্দরভাবে সুসম্পন্ন হয়েছে। মাননীয়া শ্রীযুক্তা যাদুমতী মুখার্জ্জি এই মঙ্গল-অনুষ্ঠানের নেতৃত্ব করেছেন। বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি সভায় উপস্থিত হয়েছিলেন।

সাধ্বী অবলা বসুর ঐকান্তিকতা ও একাগ্রতাই এই শুভানুষ্ঠানের মূল। তাঁর প্রতি নারীজাতির তরফ থেকে আমরা গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি।

স্মারিকা

চন্দ্রমাধব

শ্রী হেমলতা দেবী

স্মরণে থাকিবে তুমি হে চন্দ্রমাধব,
জননীর সুসন্তান স্বদেশবান্ধব!
কি গভীর স্নেহ তব স্বদেশের প্রতি,
কি আগ্রহ ছিল প্রাণে দেশের সদ্গতি
হোক্ সর্ব্বদিকে,—দেশ হোক্ পুণ্যময়,
পৃথিবীর প্রাণ সাথে প্রাণ বিনিময়
করুক্ সে সারাক্ষণ,—পৃথিবীর ডাকে
সাড়া দিক্ নরনারী যে যেখানে থাকে।
তোমার নিঃস্বার্থ প্রেম নীরবে উথলে
শ্রমিকের শ্রমে আর নারীর মঙ্গলে।
পেয়েছি অনেক, দিতে না হ'ল সময়,—
উত্তপ্ত বেদনা তাই বক্ষ জুড়ি' রয়।
অকালে ঝরিলে তবু করি' গেলে দান
অসমাপ্ত কার্য্যসাথে অফুরন্ত প্রাণ!

* * * *

স্বর্ণকুমারী

শ্রী মমতা মিত্র

রমণী যখন বন্দিনী ছিল আপনার গৃহ-কোণে
নিজের মাঝারে লুকায়ে সঙ্গোপনে।
খোঁজেনি কেহই তাহার প্রাণেও শক্তি রয়েছে কি না,
বোঝেনি কেহই বাণীর দেউলে বাজিবে সোনার বীণা।
তুমিই প্রথম বাহিরি' আসিলে জ্বালায়ে কিরণ-শিখা,
ভাষা জননীর ললাটে আঁকিলে দিব্য অরুণ টিকা।
মায়ের পূজার মন্দিরে এলে প্রথম তুমিই নারী
ল'য়ে মঙ্গল-ঝারি।
সাজালে মায়েরে কাব্যে নাটকে গাথায় মধুর গানে,
ভরিল আঙিনা অফুরান তব দানে।
কাব্য-কাননে কুণ্ঠাবিহীন সুন্দর তব গতি
দিনে দিনে হ'ল সুন্দরতর, বাড়িল তাহার জ্যোতি।
তোমারি দেখানো পথটি ধরিয়া আজি যে গো কত নারী
বাণার চরণে পূজা-উপচার আনিতেছে সারি সারি।
অগ্রণী তুমি, অগ্রজা তুমি বঙ্গরমণী-কুলে,
পূজিলে মায়েরে মনোহর নানা ফুলে।
যে আলো জ্বেলেছ সেই আলো আজ নব তেজে উঠে জ্বলে'
যাত্রিণী সবে পথখানি দেয় বলে'।
অমর হইয়া রহিবে গো তুমি বাঙলার ঘরে ঘরে,
স্মরিবে তোমার বাঙলার মেয়ে যুগে যুগে সমাদরে।
দেহের অতীত হয়েছ আজিকে, তবুও তোমার দান
চিরকাল ধরে' হরষে বিষাদে আকুল করিবে প্রাণ।
মৃত্যুর মাঝে হারায়ে তোমারে পাইব নিবিড় করে'—
নূতন রূপেতে সকল হৃদয় ভরে'।

আমাদের ছেলেমেয়েরা বিপথগামী হয় কেন ?

শ্রীমতী রায়

"বিপথ-গামীর" অর্থ কি

বেতারের এই "মজলিশ" অদৃশ্য মহিলাদিগের মিলন ক্ষেত্র এবং তাঁহাদেরই নিজস্ব জিনিষ। মধ্যে মধ্যে এখানে আমাদের সাংসারিক ও সামাজিক কথার আলোচনা হওয়া খুব উচিত। এই ভেবে, আজ আমাদের একটা সামাজিক বিপ্লবের কথা আপনাদের সঙ্গে আলোচনা কোর্ত্তে এলাম। আশা করি, আপনারা নিজ নিজ মত ব্যক্ত কোর্ত্তে কুণ্ঠিত হবেন না। এবং আপনাদের সকলের কাছে আমার করজোড়ে এই নিবেদন, যে, আমার এই বলার মধ্যে যা ভুল-ভ্রান্তি হবে, আপনারা সকলে নিজগুণে ক্ষমা কোরবেন ও সেই সব আমাকে দেখিয়ে ও বুঝিয়ে দেবেন।

অনেকেই বলেন,—"আজ-কালকার ছেলে-মেয়েরা বিপথগামী হচ্ছেন।" এই কথাটা সত্য কিনা, এবং যদি সত্য হয়, তো তার কারণ কি, এইটুকুই আমি আজ বলবার চেষ্টা কোরবো। কতদূর কৃতকার্য্য হবো, তা ভগবানই জানেন।

"বি-পথ" বুঝতে গেলে, আগে "সু-পথ" বা "ন্যায্য-পথটা" কি, সেটা আমাদের জানা চাই। আমরা হিন্দু; একই সঙ্গে "শাস্ত্র"ও মানি, এবং "অদৃষ্ট"ও মানি। কাযেই, আমাদের ছেলে-মেয়েদেরও শাস্ত্র মানা ও শাস্ত্রে অচলা ভক্তি থাকা, অতীব-প্রয়োজন মনে করি। কিন্তু, তাই কি আজ তা'দের আছে? না! কেন নেই? কারণ, একে তো সংস্কৃত ভাষার চর্চ্চা ক্রমশঃই দেশ থেকে উঠে যাচ্ছে; তার উপর, সন্ধ্যাবন্দনাদি "নিত্য" সদনুষ্ঠানগুলির প্রতি শিক্ষিতদের অহেতুক অশ্রদ্ধা জন্মাচ্ছে। কাযেই, মাত্র দু-চারটা নিতান্ত প্রয়োজনীয় "নৈমিত্তিক" অনুষ্ঠানই আমাদের বালক-বালিকারা দেখে,—যেমন, বিবাহ, পৈতা, অন্নপ্রাশন, ইত্যাদি। "অনুষ্ঠান বা "আচার"-গুলি, প্রাণহীন বস্তু; অথচ, যেখানে প্রাণ আছে, রসও আছে, সে সকল সম্বন্ধে জ্ঞান, সংস্কৃতে সুপণ্ডিত না হইলে, লাভ করার উপায় নেই বলেই, ছেলেমেয়েরা মনে করে যে, হিন্দু-ধর্ম্মের খোলসটাই বুঝি সব,—কাযেই ঝুটা! এই ভাবে, তাদের শাস্ত্রে অশ্রদ্ধা এসেছে। তাহার উপরে, বৈদেশীয় প্রোপাগ্যাণ্ড' এই ধারণায় কম ইন্ধন যোগায় নাই।

তার পরে,—গুরুজনে ভক্তি। জাতি-বর্ণ নির্ব্বিশেষে, বয়সে বড় হ'লেই, এ দেশে তাঁ'কে "গুরুজন" ব'লে মানা হ'ত। যাঁ'র কাছে এতটুকু শেখা যে'ত, বা যাঁহার দ্বারা এতটুকু উপকার পাওয়া যে'ত, তাঁকে চিরকালই শ্রদ্ধা করা হোতো। তাই, এ দেশে, ধাইকে মাতা ব'লে; ও শিক্ষা-গুরু, দীক্ষা-গুরু ও জন্মদাতা গুরু সকলকেই, সমানে গুরু ব'লে মানার প্রথা ছিল। তুমি জজই হও আর ম্যাজি-ষ্ট্রেটই হও, তোমার বালক-কালের পাঠশালার গুরুমহাশয়ও চিরকালই তোমার শ্রদ্ধার পাত্র। আগে, শিক্ষক ও ছাত্রের সম্বন্ধ বড় মধুর বড় পবিত্র ছিল। কিন্তু, এখন?—এখনকার বেতনভোগী শিক্ষক, অশ্রদ্ধার পাত্র, কেন না, প্রথমতঃ তিনি বেতনভোগী, এবং দ্বিতীয়তঃ, সেই জন্যই, ছাত্রের ইষ্ট অপেক্ষা, তাঁহার বেতনই তাঁহার পরম ইষ্ট!

আবার, এ'দিকে, ঘরে,—পিতামাতা নিজ-নিজ কায লইয়াই থাকেন; ছেলেমেয়েদের বিদ্যালয়ের বেতন যোগান; শিশুর খোঁজ-খবর বড় একটা রাখেন না; কাযেই, ধীরে ধীরে কতকটা ব্যবধান (কঠিনতা, ও অনাত্মীয়তা) উভয়ের মধ্যে গড়িয়া উঠে; তাহার ফলে, পিতা-মাতাকে যথেষ্ট শ্রদ্ধাভক্তি করা দূরে থাকুক, ছেলেমেয়েরা পিতামাতার অবাধ্যও হয়।

তৃতীয় কথা—পরিজন বিষয়ে।—স্বজন, জ্ঞাতি, কুটুম্ব লইয়াই চিরকাল হিন্দুর সংসার। এখন, সে সব তো দূরের

কথা, নিজের ভাই-বোনের মধ্যেও সম্প্রীতি, সব-বাড়ীতে দেখা যায় না—যে যা'র লইয়াই, কোটরে রাজত্ব করেন।

চতুর্থ কথা—স্বদেশীয়গণের প্রতি অনুরাগ।—এখন ছেলে-মেয়েদের চিণ্ময়ী "দেশ"-মাতৃকার প্রতি অনুরাগ দেখা যাচ্ছে। কিন্তু, এই দেশের সকল শ্রেণীর মৃণ্ময়ী "মানুষকে" মনুষ্যত্বের দাবী দিতে তাঁরা এখনো অস্বীকার কর্চ্ছেন কেন?

অভিভাবকদের দোষ কতটা?

তাহা ছাড়া,—ঘরে ঘরে অসংযমের শ্রীক্ষেত্র—অর্থাৎ, স্বেচ্ছা মত বেশ ভূষা, যদৃচ্ছা আহার, বিলাস, ব্যসন প্রভৃতির কথা, শোনা ও দেখা যায়—বিশেষ করিয়া তথাকথিত শিক্ষিতদের সংসারে।

এই যে ছেলে-মেয়েদের ধর্ম্মশাস্ত্র, গুরুজন, পরিজন ও স্বদেশবাসী সম্পর্কিত অন্যায়-আচরণের কথা উল্লেখ করিলাম; এ'র অপর দিকে—অর্থাৎ, আমাদের অভিভাবকদের দিকে—একবার দেখা প্রয়োজন। বিচার করিতে হইবে,—আমাদের বালক-বালিকাদেরই বা কত দোষ, এবং অভিভাবকদেরই বা হাত কত? এই সঙ্গে, আমরা কি ছিলাম, ও কি হইয়াছি,—তাহারও আলোচনা করিতে হইবে।

ইতিহাস সাক্ষ্য দিবে যে, এই বাঙ্গালাদেশে, রাজা-উজীর যতই বদল হউক না কেন, এদেশের পল্লীজীবন-ধারা অটুট থাকিত। সেই পূজা-পার্ব্বণ, সেই চণ্ডীমণ্ডপে সভা, সেই পাঠশালা-টোল, সেই যাত্রা-কথকতা-পালা-কীর্ত্তন-পাঁচালী, সেই অতিথি-সৎকার-সদাব্রত, সেই গো-সেবা ও সাধুসেবা—সকলই সমানে চলিত। দলাদলি থাকিলেও, তখন পরস্পর পরস্পরের অনুগত ছিলেন। তখনকার বাঙ্গালায় আনন্দ ছিল, প্রাণও ছিল, প্রীতির বন্ধনও ছিল। এখন সে বন্ধন ত' নাই—বরং আইন-আদালতের কল্যাণে, অর্থের অহঙ্কারে, ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই হইতেছেন! এখনকার বাঙ্গালায় সকলেরই যেন মূলমন্ত্র দাঁড়াইয়াছে,—যে-যা'র, সে শুধু আপনারই!

তখন কিসের জোরে বাঙ্গালাদেশে এত ছিল, আর এখন কিসের অভাবে, তাহা নাই? ইহার উত্তর—প্রধান দুইটি কারণ তখন ছিল, একান্নবর্ত্তীতা ও পঞ্চায়তী প্রথা। এখন তাহার স্থানে ঢুকিয়াছে, নগদ টাকার গরম, ও আইন-আদালতের নেশা। কাযেই, একান্নবর্ত্তীতা ও পঞ্চায়ত, এই দুইটি বহুকালের বাঁধন শিথিল হইয়াছে। তখনকার একান্নবর্ত্তী পরিবার বা "জয়েণ্ট ফ্যামিলি," এক একটি গণ-তন্ত্র (democracy) বিশেষ ছিল। এই একান্নবর্ত্তী পরিবারে, প্রত্যেকেই নিজ-নিজ সামর্থ্য অনুসারে অর্থ ও সামর্থ্য দিতেন; এবং নিজ নিজ আবশ্যকমত দ্রব্যাদি পাইতেন (*from* each man according to his *ability*, *to* each man according to his *need*); সমর্থ অসমর্থ, সকলেই, হাসিমুখে সমগ্র পরিবারের সুখ-স্বচ্ছন্দ সমানে ভোগ করিতেন। এবং এখন দেখা যায় যে, যথেষ্ট রোজগার না করিতে পাইলে, ছেলেরা বিবাহ করিতে চায় না—মানব-জীবনের পরম ও চরম আকাঙ্ক্ষা—দাম্পত্য-সুখ—ভোগ করা স্বল্পবিত্ত যুবকদের পক্ষেও দুরূহ ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে; তখন কিন্তু একান্নবর্ত্তী পরিবারে সকলেরই ভাগ্যে এই অত্যাবশ্যকীয় সুযোগ ঘটা (অর্থাৎ, দাম্পত্য-জীবন) সম্ভবপর ছিল। সুধু তাহাই নহে; সাংসারিক শিক্ষার দিক দিয়া দেখিলে, প্রত্যেক একান্নবর্ত্তী পরিবারকে এক একটি ক্ষুদ্র বিশ্ববিদ্যালয়ও বলা চলিত। সেই পরিবারে, কাহারো কোনরূপ সাংসারিক অভিজ্ঞতা লাভে বঞ্চিত হইবার কথা ছিল না—সকলেই, সাংসারিক সকল বিষয়ে, সমানে জ্ঞান লাভ করিতে পারিতেন। এবং, কি রোগী-পরিচর্য্যা, কি অক্ষম-প্রতিপালন—সকল কিছুরই সুব্যবস্থা এই একান্নবর্ত্তী পরিবারে সুন্দর ভাবেই বর্ত্তমান ছিল।

তার পর, গ্রাম্য পঞ্চায়তের কথা।—সকল মানুষই চায়, নিজ সমাজের কল্যাণ এবং স্ব-স্ব সমাজের মর্য্যাদা রক্ষণ। এবং আপনার স্বগণ দ্বারাই মানুষ বিচার প্রার্থনা করে;—এ প্রথা ইংরাজদের "জুরী" দ্বারা বিচারের মধ্যেও বর্ত্তমান আছে। এ দেশের গ্রাম্য পঞ্চায়ৎ, হয় ত, 'ইণ্ডিয়ান্ পিনাল্ কোড্' মত চুলচিরে বিচার কর্ত্তে পারতেন না—হয় ত' বা তাঁহারা অবিচার এবং অন্যায় বিচারও মধ্যে মধ্যে করিতেন;—কিন্তু তাহাতে কাহাকেও ভিটামাটি বিক্রয় করিতে হইত না; কাহাকেও শতক্রোশ দূরে যাইয়া, ডাম-

বিচার 'ভিক্ষা' করিতে হইত না; এবং গ্রামের মধ্যেই পঞ্চায়ত থাকার জন্য,গ্রামের লোকদের পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভয় বা উভয়ই থাকিত। এখন, তাহার যায়গায়, আইন-আদালত বসায়, গ্রামের লোকের প্রতি শ্রদ্ধা, ভক্তি ও ভয় ঘুচিয়াছে;—কাযেই, অনাচার ও অত্যাচারের পথ অবাধ হইয়াছে। তাহার উপরে, আদালতে শ্রম ও ব্যয়-বাহুল্য ভয় থাকায়, এখন দুষ্টলোকদের মধ্যে সহজে উচ্ছৃঙ্খলতা ও স্বৈরাচার যথেষ্ট প্রশ্রয় পাইতেছে। আজ, তাই, কেহ কাহাকেও মানে না; এবং চক্ষের সম্মুখে দেখে,—অনাচারের বিরুদ্ধে দীন ভীরু সমাজ নীরব। বস্তুতঃ, পঞ্চায়তী ধ্বংসের সঙ্গে সঙ্গেই, সমাজের মেরুদণ্ড ভাঙিয়া গিয়াছে!

তাহা হইলেই, আমরা দেখিতেছি যে, আগেকার বহু-কালের একান্নবর্ত্তী পরিবারেও পঞ্চায়ৎ ধ্বংসের সঙ্গে সঙ্গেই, ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য গজাইয়াছে, যাহাকে সোজা বাঙ্গালায় বলে "কেহ কাহারো চাকর নয়," এই ভাব। ব্যাধি-বিশেষের উপর বিস্ফোটক স্বরূপ, তাহাতে ইন্ধন যোগাইতেছে,—নগদ টাকার অহঙ্কার! টাকায় কি না করা যায়? টাকার জোরে কি না ঢাকা যায়? ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র এতদিন জীবিত থাকিলে, হয় ত তাঁহার "সুবর্ণ-গোলক" নিবন্ধের উপরে, অনেক কিছু পালিশ ও রং চড়াইতে পারিতেন! এখন যাঁহার হাতে নগদ টাকা, সারা জগতের লোকের সেবা (service) তাঁহারই করায়ত্ত!

এই নগদ টাকা আমাদের মধ্যে অনেক অনর্থ ঘটাই-য়াছে। একটু খুঁটিয়া খাইতে শিখিলেই,—অর্থাৎ, কিছু উপার্জ্জন করিতে শিখিলেই,—তা' সে যত সামান্যই হউক না কেন,—এখন স্ত্রী পুত্র লইয়া, আলাদা ভোগ করিবার বাসনা তথাকথিত শিক্ষিতদের মধ্যেই প্রবল হয়; ষোল আনা রকম নিজের টাকা নিজে ভোগ করিবার আশায়, একান্নবর্ত্তী পরিবার হইতে তাঁহারা আলাদা হন। যেখানেই এরূপ ভিন্ন হইয়া সংসার পাতান হয়, বেশীর ভাগ সে রকম স্বার্থপর সংসারে, অলক্ষ্যে ছেলে-মেয়েরাও ঘোর স্বার্থপর ও ভোগবিলাসী হইতে থাকে। তাহাদের শিরায় শিরায় ভোগ-লোলুপতা ও স্বার্থপরতার স্রোতঃ বহে। ভোগ ও স্বার্থপরতা, মানুষকে সকল বিষয়ে অসংযত করে। কাযেই, এমন পৃথক সংসারে —আপনি ও কোপ্নীর সংসারে —নিজ পিতা-মাতা ছাড়া, যে ছেলে-মেয়েরা "মানুষ" হয়, তাহারা অপর আত্মীয়কে চিনেও না, এবং চিনিতে চাহেও না,—পাছে, আত্মীয়তা স্বীকার করিলে, ভোগের এতটুকুও ভাগ দিতে হয়! এই স্বার্থপরতা ও ভোগস্পৃহা, কালে, সেই সংসারে পালিত বালক-বালিকাদের অস্থি মজ্জায় এমন ভাবে বসিয়া যায় যে, প্রয়োজন স্থলে,সে নিজ পিতা-মাতারও অসম্মান করিতে বা তাঁহাদের অবাধ্য হইতে আদপে কুণ্ঠিত হয় না! ক্রমে, অসংযমের বাঁধ ভাঙ্গিয়া, যে কতদূর গড়াইতে পারে, তাহা অনুমান করা কঠিন নয়।

যেখানে এখনো নামেমাত্র ও সুবিধাবাদের একান্নবর্ত্তীতা বজায় আছে—অর্থাৎ, দু-দশ টাকা খরচ বাঁচাইবার জন্য, সুবিধার খাতিরে, যেখানে পাঁচ-ভাই এক বাড়ীতে থাকেন,—সেখানে, মনের মিল তেমন দেখা যায় না। যে যা'র খরচ দিয়া, "মেসের" বাড়ীতে থাকার মতই, সে সব তথাকথিত একান্নবর্ত্তী পরিবারে থাকা হয়। বরং, মেসের বাসায়, অর্থগত পরস্পর সম্বন্ধ না থাকার জন্য, কাহারো সঙ্গে অপর কাহারো প্রতি প্রচ্ছন্ন বিদ্বেষবুদ্ধি থাকে না; মেসের বাসার ধরণের,এই সব তথাকথিত অধিকাংশ একান্নবর্ত্তী পরিবারে, কেহ কাহারো আত্মীয় ত ননই, বরং তথায় পরস্পর পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষ-ভাবাপন্ন। কাযেই, একই বাড়ীর ছেলে-মেয়ে হইলেও, পরস্পর অনাত্মীয় থাকিয়া যায়,—গুরুজনে শ্রদ্ধা, আত্মীয়ের প্রতি প্রীতি জন্মে না—কাযেই, তাঁহাদের সম্মুখে উচ্ছৃঙ্খলতা করিতেও বালক-বালিকাদের বাধেও না!

বর্ত্তমান পাশ্চাত্য-শিক্ষা-প্রণালীর দোষ

এতক্ষণ,—আমাদের যাহা ছিল, তাহা ধ্বংসের ফল কি, তাহাই আলোচনা করিলাম। এইবারে, বিংশ-শতাব্দীর সভ্যতা ও শিক্ষার প্রভাবের কথা আলোচনা করা যাউক। "বর্ত্তমান সভ্যতা" বলিলে, ইয়োরোপ ও আমেরিকার সভ্যতাকেই বুঝায়; এবং পাশ্চাত্যশিক্ষার ভিতর দিয়াই, আমরা তাহার পরিচয় ও আস্বাদ পাই'। অনেক বিষয়ে, এই পাশ্চাত্যশিক্ষা, আমাদের অনেকেরই

ভুলপ্রাপ্তি দেখাইয়াছে, অনুসন্ধিৎসা ও বিচারবুদ্ধি বাড়াইয়াছে, এবং দৃষ্টির প্রসার ও দেশাত্মবোধ আনিয়াছে। তজ্জন্য, আমরা অনেকটাই পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রতি কৃতজ্ঞ। কিন্তু পাশ্চাত্য শিক্ষার কয়েকটি কুফলও অত্যন্ত অনর্থ ঘটাইতেছে;—যাহার ফলে, আজ, আমাদের বালক বালিকারা বিপথগামী হইতেছে।

প্রথমতঃ, যে শিক্ষা, দেশের ও অতীতের সঙ্গে যোগসূত্র ছিন্ন করে, সে শিক্ষা, শ্রদ্ধার ও ভক্তির মূলে কুঠারাঘাত করে—অবিনয়ী, উদ্ধত করে। এখন দেখা যাউক, এদেশে, পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রবর্ত্তনের মূল কোথায়? ইংরাজের নূতন অধিকৃত জমীদারী,—এই ভারতবর্ষে, অনেক রকম, ও অনেকগুলি, দক্ষ কর্ম্মচারীর আবশ্যক হয়,—যেহেতু, এদেশীয়দের দ্বারা, অপেক্ষাকৃত সস্তায়, কার্য্য চালান সম্ভবপর হয়। প্রধানতঃ, ইংরাজের দপ্তরে কায করিবার মত, এবং ইংরাজের ব্যবসায়ে সহায়তা করিবার মত, লোক তৈয়ারি করিবার জন্যই, প্রথমে, এ দেশে ইংরাজী শিক্ষার আরম্ভ হয়। এখন, সে জাতীয় বহু সংখ্যক লোক সৃষ্টি হইয়া গিয়াছে এবং মেকলের স্বপ্ন ফলিয়া গিয়াছে—আমরা মনে ও প্রাণে পরদেশী হইয়া গিয়াছি;—কাযেই, দেশের লোকদের দরকার মত, এখন এই শিক্ষার যৎকিঞ্চিৎ অদল-বদল হইতেছে ও হয় ত হইবে। তাহার পরে, শিক্ষার পুরস্কার,—জ্ঞান লাভ ও মনের আনন্দ। শিক্ষার্থীকে প্রলুব্ধ করিবার জন্য, পারিতোষিক দানের ব্যবস্থা ও বিদ্যাবিক্রয়,—এই দুইটি নূতন প্রথা, বিদ্যাদান করাকে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ের গণ্ডীতে আনিয়াছে। বিদ্যাদান-রূপ মহৎ কার্য্যের আদর্শকে এত খাটো করিয়া, আবার তাহার সঙ্গে, যদি, শৈশব হইতেই, আমাদের বালক-বালিকারা শোনে যে—বেদ হইল চাষার গান, ব্রাহ্মণেরা নিজ হাতে ক্ষমতা পাইয়া, অপর সকল বর্ণের লোকদিগের মাথায় পা দিয়া চলিয়াছেন; পুরুষ চিরকালই নারীকে মথিত ও দলিত করিয়াছে; দেব-দেবীরা, প্রাণহীন নুড়ি ও মাটির ঢিপি; জাতি বর্ণ-বিভাগ, অত্যন্ত নিষ্ঠুর প্রথা; হিন্দুরা চিরকালই ঘরের কোণে বসিয়া থাকিতেন, ব্যবসায় বাণিজ্য বুঝিতে পারিতেন না; এ দেশের কবিরাজিটা, হাতুড়েপনার নামান্তর মাত্র; সকল মানুষই মানুষ বৈ আর কিছু নয়, কাযেই দেব-দ্বিজে ভক্তি করা ভুল;—ইত্যাদি ইত্যাদি,—তবে, কেমন করিয়া, তাহারা দেশের কোন কিছুর প্রতি শ্রদ্ধাবৃত্তি-সম্পন্ন হইতে পারে? এবং রামায়ণের আদর্শ চরিত্রগুলির কথা না শিখিয়া, রাবণের দশ মুণ্ডের ও বিশ হাতের কথা মাত্র শিখে, তবে কেমন করিয়া তাহারা ভক্তি-শ্রদ্ধা করিতে পারে? কাযেই দুপাতা ইংরাজী পড়িয়া, এ দেশের ছেলে-মেয়েরা—স্ব স্ব জাতি (caste) না হারাইলেও, (interests of the nation) নিজ জাতির স্বার্থ অতলতলে দেয়; তাহারা, নৈতিক অনুশীলন (বা, মরাল্ ডিসিপ্লিন্) হিসাবে, পূজাপাঠ করিতে লজ্জা বোধ করে; এবং কোনও গতিকে মেয়ে মহলে, পূজাপার্ব্বণ, ব্রতনিয়ম সাঙ্গ করাটাকে, ঢোক গিলিয়া, চক্ষু বুজিয়া মনকে চোখ-ঠারা দিয়া, মানিয়া লয়। ধর্ম্মে অনাস্থা, কর্ম্মে, ভিতর-বাহির দুই রকম;—ইহাতে না ভগবানে ভক্তি জন্মায়, না দেশের প্রতি শ্রদ্ধা থাকে, না আত্মপ্রতিষ্ঠা জন্মে। এ শিক্ষায় মানুষ অমানুষ হয়।

বর্ত্তমান শিক্ষার দ্বিতীয় দোষ—এই শিক্ষা অর্থকরী,—সকল রকম পার্থিব সুখ ভোগ করিবার জন্যই যেন এই শিক্ষা। ভোগে, ভোগের ইচ্ছা, ভোগের জ্বালা বাড়ায়—আরো ভোগের জন্য অধীর করিয়া তোলে! কাযেই, আরো ভোগের আয়োজনে, চিত্তবৃত্তিগুলি অত্যুগ্র হইয়া উঠে;—কাযেই, ভোগ মিটাইবার জন্য, অর্থের পিপাসা ক্রমাগতই বাড়ে। কাযেই, নিত্য নূতন-অভাব কল্পনা করিয়া, সেই কাল্পনিক অভাব মিটাইবার জন্য, মানুষ পাগল হইয়া বেড়ায়!—দেহই জমীদারী যাহাদের, তাহাদের পক্ষে, এই অলীক পদমর্য্যাদাবোধের তাড়নে, অযথা দ্রব্য-সামগ্রী সংগ্রহ, খাওয়া পরায় বাহুল্য, গৃহসজ্জায় বাহুল্য, যানাদির বাহুল্য, দাস দাসীর বাহুল্য, ইত্যাদিতে ব্যয়-বাহুল্য ঘটান বিড়ম্বনা মাত্র। তাহার ফলে, হয় কি? একদিকে যে হারে আপনার অহঙ্কারের অসীম প্রসার ঘটে; মনের তদনুরূপ সঙ্কোচ ঘটে। ফলে, একজনের সর্ব্বগ্রাসী, অফুরন্ত ও অন্যায় ক্ষুধা; অপরদিকে, শত-সহস্র, নিরন্ন দেশবাসীর জীবনের আবশ্যকীয় গ্রাসাচ্ছাদনেরও অভাব! বিদ্যা অর্থকরী হওয়ায় মোট-ফল, তবে কি

দাঁড়াইল?—একদিকে, পর্ব্বত-প্রমাণ টাকার স্তূপে ছাতা পড়িতেছে; অপরদিকে, বুভুক্ষু দেশবাসীরা, ক্ষুধার জ্বালায় পেটে হাত বুলাইতেছে!—অর্থাৎ, জাতি-বিড়ম্বিত দেশে, ধনী ও নির্ধন, দুইটি নূতন জাতির সৃষ্টি!

অধিকাংশ শিক্ষিত ভদ্রলোকের এমনই মনোবৃত্তি দাঁড়ায় যে, স্বস্ব ভোগেচ্ছা ও বিলাসিতা নিজ নিজ সন্তানদিগের মধ্যেও জোর করিয়া চালাইতে দ্বিধাবোধ করেন না! "আমার ছেলের এ রকম সুট, ও রকম কোট, সে রকম হ্যাট" ইত্যাদি ইত্যাদি না হইলে, আমার পদমর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ থাকে কেমন করিয়া,"—এই মনোবৃত্তির তাড়নায়, অনেকে, শৈশব হইতেই, নিজ নিজ সন্তানদিগের চাল-চলন চির-দিনের মত নষ্ট করিয়া দিতে ছাড়েন না! যে শিশু, নিত্য ভোগে ডুবে থাকে, সে ঘোরতর স্বার্থপর ও অসংযত না হইয়া, আর কি হইতে পারে? অথচ, ত্যাগে যতটা সুখ, ভোগে ততটা বা তাহার বেশী দুঃখ। শৈশব হইতে, স্বকীয় ব্যবহারিক দৃষ্টান্ত দ্বারা, অভিভাবক কর্ত্তৃক শিশু-দিগকে যতই ত্যাগের পথে চালান যায়, তাহারা ততই সংযমী ও "মানুষ" হইয়া উঠে।

বর্ত্তমান শিক্ষার তৃতীয় দোষ,—দেহকে বাদ দিয়া, মাথার পুষ্টির দিকে লক্ষ্য রাখা। অথচ, "দৈহিক" স্বাস্থ্য ভাল না হইলে, কখনোই, "মানসিক" স্বাস্থ্য ভাল হয় না, ও ভাল থাকে না। প্রথমেই বলিয়া রাখি, এ দেশে, যে শিক্ষা বর্ত্তমান সময়ে প্রচলিত আছে, তাহাকে কোনও ক্রমেই মানসিক বৃত্তিগুলির স্ফুরণে সমর্থ (প্রকৃত education) বলা যায় না;— কতকগুলি বাঁধা-গৎ শিখাবার কৌশল বলা যাইতে পারে। যাহা হউক, শিক্ষার এই হীন-আদর্শ গ্রাহ্য করিলেও, এদেশে, তাহারও পুরা কায হয় না, কারণ, এ দেশে বিদ্যাশিক্ষার সঙ্গে,দৈহিক উন্নতির এতটুকুও চেষ্টা নাই।—বনিয়াদ ভাল কি মন্দ, তাহা না দেখিয়াই, তাহার উপরে যেমন-তেমন ইমারত এ দেশেই গড়া হয়! আপনারা শুনিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইবেন যে, এই কলিকাতা সহরের কোনও প্রবীণ ও দূরদর্শী বাঙ্গালী চিকিৎসক, কয়েক বৎসর আগে, বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ, কলিকাতা কর্পোরেশনের এবং তদানীন্তন শিক্ষাবিভাগের ভারপ্রাপ্ত বাঙ্গালী মন্ত্রী মহাশয়কে প্রশ্ন করেন যে,—"বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের স্বাস্থ্যোন্নতিকল্পে আপনাদের দায়িত্ব কতটুকু"—তখন প্রায় খোলাখুলি ভাবেই, সকল দিক থেকেই, ঐ দায়িত্ব অস্বীকার করা হয়! তাহার পর থেকে, এখন, বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ হইতে, বৎসরে বৎসরে বহু সহস্র অর্থ ব্যয় করিয়া, গতানুগতিক-ভাবে, সুধু ছাত্র-স্বাস্থ্য পরীক্ষাই চলিয়াছে—যেন পরীক্ষা করাটাই আবহমান কাল চলিবে, এবং পরীক্ষা করাটাই পরম পুরুষার্থ—কিন্তু, ভগ্ন, বা ক্ষুণ্ণ-স্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটাইবার জন্য, না বিশ্ববিদ্যালয়, না মিউনিসিপালিটি, না গবর্ণমেণ্ট—কেহই বলিবার-মত কিছুই করেন নাই! "দেহ" ঠিকমত গড়িবার চেষ্টা নাই বলিয়া, কস্মিন্‌কালে, আমাদের বালক-বালিকাদের "মানসিক" স্বাস্থ্য ভাল থাকিতে পারে না! অথচ, আপনারা বোধ হয় সকলেই জানেন যে, খেলার (sports) সুযোগ না দিতে পারিলেও, প্রত্যেক বিদ্যালয়ে, স্পোর্টস্ ফি নামক টেক্স্ অন্যায়রূপে আদায় করা হয়! এবং, প্রত্যেক বিদ্যালয় হইতে, ছাত্রের উন্নতি-সংক্রান্ত "প্রোগ্রেস-রিপোর্ট" পাঠাইবার ঘটা নিত্য বৃদ্ধি পাইলেও, না বিদ্যালয়ের তরফ্ হইতে, না অভিভাবক-দের তরফ্ হইতে, এই রিপোর্টে ছাত্রদের স্বাস্থ্য-কথার ঘুণাক্ষরেও উল্লেখ থাকে না—যেন এদেশের ছাত্ররা সকলেই আদর্শ স্বাস্থ্যযুক্ত!

বর্ত্তমান শিক্ষার চতুর্থ দোষ—উহা একদেশদর্শী।—এই হিন্দুস্থানে, হিন্দুদের বিদ্যালয়ে, হিন্দু-ধর্ম্ম সংক্রান্ত কোনও শিক্ষা দেওয়া হয় না—বা, সেরূপ শিক্ষার আবহাওয়াও সৃষ্টি করা হয় না। অথচ, মুসলমান, খৃষ্টান প্রভৃতি বিদ্যালয়ে—এমন কি সরকারী বিদ্যালয়েও—বাধ্যতামূলক ভাবে ধর্ম্ম শিক্ষা দেওয়া না হইলেও, ধর্ম্ম শিক্ষার যথেষ্ট আবহাওয়াও সৃষ্টি করা হয়, এবং ধর্ম্মশিক্ষার যথেষ্ট সুযোগও দেওয়া হয়। এই প্রাচীন হিন্দুস্থানের, যুগযুগান্তরের সাধনা ও সংস্কৃতির (বা কাল্‌চারের) মধ্যে, ব্রহ্ম-সাধনার সুর ওতঃপ্রোত-ভাবে বিদ্যমান আছে। তাই, ইতিপূর্ব্বে, ভারতবাসী কখনো বিদ্যা, ধর্ম্ম ও স্বাস্থ্য-চর্চ্চাকে বিভিন্ন করিয়া দেখেন নাই।

এবং সেই জন্যই, ভারতের স্বাস্থ্য-শাস্ত্র বেদের পর্য্যায়ে উন্নমিত; তাই, ভারতের ধর্ম্ম "রিলিজান্" নহে;—যাহা কিছু সমগ্র মানুষটাকে তাহার সাধনাপূত সমাজের সহিত ধারণ করিয়া আছে, ভারতবাসীর চক্ষে, তাহাই ধর্ম্ম। আলাদা, ষড়ৈশ্বর্য্যশালী, ভগবান; বা ব্রহ্ম-রূপ অতীন্দ্রিয়-পুরুষের সহিত সম্বন্ধ লইয়া, হিন্দুর "ধর্ম্ম" নহে। আর আজ, সেই হিন্দুকে ধর্ম্মজ্ঞান ও স্বাস্থ্যতত্ত্ব-বিবর্জ্জিত শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। পাশ্চাত্যরা, সকল জিনিষকে নাম (label আঁটিয়া) দিয়া, আলাদা মোড়কে মুড়িয়া, স্বতন্ত্র পেটিকাবদ্ধ করিয়া, (in separate water-tight compartments) দেখিতে ভালবাসেন; তাই, ইংরাজ-রাজত্বে, শিক্ষা-বিভাগের সঙ্গে স্বাস্থ্য-বিভাগের কোন যোগ-সূত্রটি পর্য্যন্ত নাই; তাই, আজ, আমাদের ছেলেরাও একটা জিনিষকে—ও মানুষকে—শত খণ্ড করিয়া, শত দিক দিয়া দেখে,—একসঙ্গে সমগ্র-জিনিষটাকে দেখিতে চায় না, পারেও না!

বর্ত্তমান শিক্ষার পঞ্চম দোষ—ইহার প্রাণহীনতা। বৎসরের পরে বৎসর ধরিয়া, অনবরতই, পরের-সিদ্ধান্ত মুখস্থই করান হয়, হাতে হাতিয়ারে এতটুকু কিছুই শিখান হয় না;—ইন্দ্রিয়কে সজাগ করা দূরের কথা, সহজাত বৃত্তি-গুলিরও (natural parts) স্ফুরণ হইবার সুযোগ এদেশে মিলে না। প্রাণহীন শিক্ষায়, হৃদয়হীনতা, মানসিক দীনতা, বুদ্ধির মলিনতাই ও ইন্দ্রিয়াদির জড়তা পরিস্ফুট হওয়া ছাড়া, আর কি আশা করা যায়?

বর্ত্তমান শিক্ষার ষষ্ঠ দোষ বলিয়াই, আজকার মত ক্ষান্ত হইব। এই শিক্ষা, অলক্ষ্যে, একদিকে, বালক-বালিকা ও অপর পক্ষে, অভিভাবক এবং সমাজের মধ্যে যে ঘনিষ্ঠ ও মধুর সম্বন্ধ তাহার মূলে কুঠারাঘাত করিতেছে। যে পল্লীবাসী ছাত্রের মন, তাহার সহরে প্রাসাদোপম হষ্টেলের বিজলীবাতির আলোর মত বা হারে উদ্দীপিত হয় নাই,—সে দীন, অথচ শান্ত, সমাহিত তাহার পল্লীভবনে ফিরিতে চাহে কি? যে বালক-বালিকা দেখে যে, বিদ্যালয়ে কামাই করিলে, তাহার অভিভাবকের চিঠি অগ্রাহ্য হয়—পাশ্চাত্যমতে শিক্ষিত ডাক্তারের সার্টিফিকেটকে আদর দেওয়া হয়—সে কি কখনো অভিভাবককে শ্রদ্ধা করিবে? শুনিয়াছি যে, মহাত্মা গান্ধীর জীবন-চরিতে লিখিত আছে, একদিন তাঁহার পিতা পীড়িত ও আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকায়, বেলার আন্দাজ না পাওয়ায়, দৈবাৎ একটু বিলম্বে তিনি বিদ্যালয়ে যান। প্রথম ভাগেই, ড্রিল হইত। আকস্মিক বিলম্বের সত্য কারণ—পিতার পীড়া বৃদ্ধি ও বেলার আন্দাজ না পাওয়া—বলা সত্ত্বেও, তাঁহাকে শাস্তি দেওয়া হয়। সত্যনিষ্ঠ বালক, সেদিন বাটী ফিরিয়া, আহারও করিতে পারেন নাই এবং সারা রাত্রি নিদ্রা যাইতেও পারেন নাই। শাস্তির যন্ত্রণা তাহার কারণ নহে; তাহার কারণ, প্রথমতঃ, তাঁহাকে অবিশ্বাস করা হইয়াছিল বলিয়া এবং দ্বিতীয়তঃ, পীড়িত পিতার সেবার চেয়ে সময়মত ড্রিলে যোগ দেওয়াটাকে বড় করিয়া দেখান হইয়াছিল, বলিয়া। গুরু-শিষ্যে ভালবাসা দূরের কথা, এখন উভয়ের মধ্য বিশ্বাসও নাই; বিদ্যালয়ের আবহাওয়ার মধ্যে, পিতামাতার কথায় অবিশ্বাস;—এত বড় সর্ব্বনেশে জিনিষ কি রকম অলক্ষ্যে গজাইতেছে! ঘরে বাহিরে এই আবহাওয়া আমাদের বালক বালিকাদিগকে কোন্ পথে লইয়া যাইতে পারে, আপনারা বিবেচনা করুন।

বালক-বালিকারা সুকোমল ও তরলমতি—তাহাদিগকে যেমন ছাঁচে ঢালা যাইবে, তাহারা সেই রকমই হইবে। ইংরাজীতে দুইটা প্রবাদ-বচন আছে; একটা—যেমন বীজ পুতিবে, সেই জাতীয় গাছই জন্মাইবে; অপরটা—যদি তুমি হাওয়ার বীজ পোত, তবে ফসল তুলিবার সময়ে তোমার ভাগ্যে ঝড়ই প্রাপ্য।

এখন আপনারা—বুঝুন, ছেলে মেয়েরা বিপথগামী কেন হয়?

———

অপরাজিত

শ্রী মনোজ বসু

'পথের পাঁচালী'তে একটি দেবশিশুর মতো সুন্দর নিষ্পাপ ভাবপ্রবণ বালককে দেখিয়াছিলাম। এক উঠান লোকের সম্মুখে বিনাবিচারে মার খাইয়া তার চোখ দিয়া এক ফোঁটা জল বাহির হয় নাই। তারপর নির্জ্জন ঘরের জানলায় একেলা দাঁড়াইয়া আকুল উচ্ছ্বসিত চোখের জলে মনে মনে সে বলিয়াছিল—ভগবান, তুমি এই কোরো ঠিক যেন নিশ্চিন্দিপুর যাওয়া হয়—নৈলে বাঁচবো না—পায়ে পড়ি তোমার—

অবোধ অপু সেদিন ভুল ভাবিয়াছিল। মনে করিয়াছিল, বুঝি তার শৈশব-স্বপ্নোজ্জ্বল নিশ্চিন্দিপুরের বাঁশবন, মাঠ, ফুলেভরা বন-ঝোপ, ইচ্ছামতীর মায়াময় নির্জ্জন চরই কেবল তাহাকে বাঁচাইয়া রাখিতে পারিবে। হায় মূর্খ বালক! দুর্ব্বার জীবন-ধারার কূলে কূলে কতবারই মানব-যাত্রীকে পিছনের শান্ত গ্রামান্তরাল এমনি হাতছানি দিয়া ডাকিয়া থাকে! কিন্তু নব নব অভিযানের মধ্য দিয়া যে অপরাজিত জীবন-রহস্য ভাস্বর মহিমায় আত্মপ্রকাশ করিতে চায়, পিছন ফিরিয়া স্থির হইয়া দাঁড়াইবার তাহার অবকাশ কোথায়?

তাই 'অপরাজিতে'র শেষভাগে সেদিনের সেই নিশ্চিন্দিপুর-পিপাসু অপু আবার যখন তাহার গ্রামে ফিরিয়া আসিল, একটা দিনও সেখানে সে স্থির হইয়া দাঁড়াইতে পারিল না। মা-হারা কাজলকে পরম বিশ্বাসে এবং পরম কৃতজ্ঞতায় নিশ্চিন্দিপুরের হাতে সমর্পণ করিয়া অপু চলিয়া গেল। এবার রহস্য-যাত্রা আরম্ভ হইল সুদূর সমুদ্র-পারে।

এই সুদীর্ঘ উপাখ্যানটি পড়িতে পড়িতে 'পথের পাঁচালী'র পথের দেবতার সেই উক্তিটি বারম্বার মনে ভাসিতে থাকে। শিশু অপু একদা যখন একাগ্র কামনা জানাইতেছিল নিশ্চিন্দিপুর ফিরিয়া যাইবার জন্য দেবতা প্রসন্ন হাসিয়া বলিয়াছিলেন যে পথ তাঁহার শেষ হয় নাই তাহাদের গ্রামের বাঁশের বনে···পথ চলিয়া গিয়াছে সামনে, সামনে, শুধুই সামনে···দেশ ছাড়িয়া বিদেশের দিকে, সূর্য্যোদয় ছাড়িয়া সূর্য্যাস্তের দিকে, জানার গণ্ডী এড়াইয়া অপরিচয়ের উদ্দেশে···অনির্ব্বাণ তার বীণা শোনে শুধু অনন্ত কাল আর অনন্ত আকাশ···

অপুর অশ্রান্ত জীবন-প্রবাহ এবং শেষকালে ফিজি-যাত্রা অক্ষরে অক্ষরে ঐ কথাগুলাই প্রমাণ করিয়া দেয়। 'পথের পাঁচালী' ও 'অপরাজিত'কে জীবনের বহুবিস্তীর্ণ অপরূপ রহস্যময় পথের ধারাবাহিক ইতিহাস বলিলে অন্যায় হয় না। এইরূপ বিশাল পটভূমি লইয়া বাংলাদেশে আর কেহ উপন্যাস লেখেন নাই। যে জীবনধারা জীবজগতের উপর যুগযুগান্তর ধরিয়া প্রতিনিয়ত প্রবহমান, যাঁহার পথের বাঁকে বাঁকে নানা রূপ রস ও সুবিপুল রহস্য গতির দুঃখ ও অবসাদকে আনন্দে রূপান্তরিত করিয়াছে, পুরাতন গতানুগতিকতাকে নব নব মহিমায় মনোহর করিয়া তুলিয়াছে তাহাই নানা ছন্দে ও ছবিতে এই বই দুটিতে বিচিত্র রূপ পাইয়াছে। 'অপরাজিত' যেখানে শেষ হইয়াছে সেখানে অপুর বয়স বোধ করি ত্রিশ-পঁয়ত্রিশের কাছাকাছি। এই ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বছরের ছবি আঁকিতে দু'খানা বইয়ে (৪২৭+৬১৯) ১০৪৬ পৃষ্ঠা ব্যয়িত হইয়াছে। শুধু এই অঙ্কের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেই বোঝা যাইবে জীবনকে কত পরিপূর্ণ ভাবে চিত্রিত করিতে বিভূতিবাবু প্রয়াস পাইয়াছেন। এই-রূপ সুপরিসর ক্ষেত্র নির্ব্বাচন লেখকের পক্ষে অত্যন্ত সাহসের পরিচয়।

কোন সাধারণ পর্য্যায়ের লেখক নিশ্চয় এই সাহস করিতেন না। কারণ ইহাতে বিস্তর বিপদ আছে। জীবন-চিত্র বহুবিস্তীর্ণ ভাবে আঁকিতে গেলে দৈনন্দিন ব্যাপার

অপরাজিত—উপন্যাস। শ্রী বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। প্রথম খণ্ড ২৷৹, দ্বিতীয় খণ্ড ২ টাকা। প্রকাশক রঞ্জন প্রকাশালয়, ৩সি রাজেন্দ্রলাল ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ও মানসিক সামান্যতম বিবর্ত্তনের ইতিহাস দিতে হয়। দশ বছরের ব্যবধানে একটা লোককে দেখিয়া তাহার জীবনে যে পরিবর্ত্তন আসিয়াছে তাহা ধরা সহজ। কিন্তু প্রতিদিনের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিতে হইলে যে তীক্ষ্ণ সন্ধানী-দৃষ্টির আবশ্যক তাহা সকলের নাই। আমার আজিকার দিনের জীবন আপাতদৃষ্টিতে হয়ত কল্যকারই পুনরাবৃত্তি মনে হইবে কিন্তু সূক্ষ্মদ্রষ্টার কাছে প্রতি পলকের পরিবর্ত্তন-টুকুও ধরা পড়িয়া যায়। এই পরিবর্ত্তন আবার বিভিন্নরূপে চিত্রিত করিয়া চোখের সম্মুখে ধরা আরো কঠিন। বিভূতি-বাবু সেই অগ্নিপরীক্ষায় অদ্ভুতরূপে উত্তীর্ণ হইয়াছেন। যেখানে প্রতিমুহূর্ত্তে পদে পদে পুনরাবৃত্তি ও একঘেয়েমি আসিবার শঙ্কা রহিয়াছে সেখানে নব নব রস ও রূপসৃষ্টির দ্বারা অভিনবতার সমাবেশ শিল্পচাতুর্য্য ও দৃষ্টিক্ষমতার প্রকৃষ্টতম পরিচয়। বিভূতি-সাহিত্যে যে পুনরাবৃত্তি আদৌ নাই তাহা বলিতেছি না কিন্তু তাহা এত সামান্য যে রস-সৃষ্টিকে ব্যাহত করে নাই।

নেপোলিয়নের মতো মহা দিগ্বিজয়ীর জীবনকথা প্রকাণ্ড করিয়া লেখা সহজ, কারণ বাহিরের ঘটনার বাহুল্যে উহা পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় নূতন উদ্দীপনার সঞ্চার করিয়া যাইতে পারে। অপুর জীবন সেরূপ নহে। অথচ পাঠক-চিত্তকে চমক দিবার জন্য প্রচুর রস না থাকিলে উপন্যাসের গতির সহিত পাঠক-চিত্তের সমতা থাকে না, পাঠক শ্লথগতি হইয়া পিছাইয়া পড়েন, উপন্যাসের সহিত ছুটিতে চাহেন না। ঘটনার চমকে পাঠককে ভুলাইয়া লইবার মতো রোমাঞ্চকর উপন্যাস পৃথিবীর সর্ব্বদেশে অনেক লেখা হইয়াছে। উহা নিম্নশ্রেণীর ক্ষমতার পরিচয় দেয়। অপুর জীবনে সেরূপ ঘটনা সম্ভবও নহে। তাহার জীবন সবিস্তারে বিশ্লেষণ করিতে গিয়া পাঠকের বিরক্তির যে আশঙ্কা ছিল তাহা দূর হইয়াছে অপুর সচল ক্রিয়াশীল মনের গতিবেগে। গতিই জীবন—এবং অপুকে জীবন্ত করিয়া আঁকিয়া লেখক তাঁহার উপন্যাসকে অপূর্ব্ব গতিবান করিয়াছেন।

সেই যে বিজ্ঞাপনে লিখিয়া থাকে—ব্রহ্মাণ্ড লণ্ডভণ্ড হইয়া গেলেও কাহার সাধ্য এ উপন্যাস শেষ না করিয়া উঠিতে পারে!—পথের পাঁচালী বা অপরাজিত সে ধরণের উপন্যাস নয়। বস্তুতঃ তাড়াতাড়ি শেষ করিয়া ফেলিবার ইচ্ছা অথবা উপসংহার অংশটি আগে-ভাগে দেখিয়া লইবার প্রলোভন এই উপন্যাস পড়িতে পড়িতে কাহারও মনে জাগিয়া উঠিবে না। আমি 'গতিবান' বলিতেছি এই অর্থে যে অপু ও অন্যান্য চরিত্র বইয়ের গোড়া হইতে সুরু হইয়া পাতায় পাতায় উপযুক্তরূপ অগ্রসর হইয়া সুসমঞ্জস পরিণতি লাভ করিয়াছে, কোন চরিত্র একজায়গায় স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া নাই। জীবনকে সুবিস্তৃত ভাবে পর্য্যবেক্ষণ করায় দৈনন্দিন মন্থর গতি স্থূল দৃষ্টির সম্মুখে হয়ত ধরা পড়ে না; কিন্তু যদি আমরা বিবেচনা করি, আট-দশ বছরের অপুর কাছে এক-দিন নিশ্চিন্দিপুরে ফিরিবার চেয়ে বড় কামনা কিছুই ছিল না আবার সেই অপুই ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বছরের সময় নিশ্চিন্দি-পুরকে সকৃতজ্ঞ প্রণাম দিয়া স্বচ্ছন্দে বিদায় লইল—দীর্ঘ কুড়ি-বাইশ বছরের এই ব্যবধান দিয়া দেখিলে অপু-চিত্ত এবং উপন্যাসের গতিশীলতা সম্বন্ধে আমরা নিঃসংশয় হইতে পারিব।

অর্থাৎ বিভূতিবাবু যদি অপুর ত্রিশ বছরের জীবন-চিত্রণে হাজার পৃষ্ঠা ব্যয় না করিয়া পৃষ্ঠা পঞ্চাশের মধ্যে সারিতেন তাহা হইলে উপন্যাসের গতিশীলতা সম্বন্ধে অতি বড় অরসিকেরও সন্দেহ থাকিত না। এবং এইরূপে ঘটনার যে ঠাসবুনানি হইত তাহার ফলে পাঠকের কৌতূহল স্বভা-বতঃই জাগ্রত থাকিত, উচ্চতম কলাকৌশলের কিছুমাত্র প্রয়োজন হইত না। সুবিধা সকল দিকেই। আর ঐ সুবিধার আকর্ষণেই প্রত্যেক সাহিত্যে ঘটনাবহুল উপন্যাসের সংখ্যা শতকরা নিরানব্বই খানা।

কিন্তু গতানুগতিক হাইস্পীডের উপন্যাস-রাজ্যের মধ্যে যখন 'অপরাজিতে'র ন্যায় একখানা মন্থরগতি বই পড়িতে পাই তখন এমন একটি অপরূপ শান্ত তৃপ্তিরসে মন ভরিয়া যায়, যাহা ঘটনাসঙ্কুল উপন্যাসে মেলে না। মোটরে চড়িয়া দ্রুত পথ অতিক্রম করায় কাজের লোকের সুবিধা বটে কিন্তু রসসন্ধানীর পক্ষে পদব্রজে চলিবার আবশ্যকতা আছে। বস্তুতঃ যে উপন্যাসে ঘটনা লঘুপক্ষ পাখীর মতো উড়িয়া চলিয়াছে সেখানে পারিপার্শ্বিকতাকে অতিক্রম করিয়া ঘটনাই প্রধান হইয়া উঠে। দু'শ' মাইল বেগে গাড়ী হাঁকাইয়া কাশ্মীর যাওয়ার মধ্যে ঐ কাশ্মীর যাওয়াটাই একমাত্র লাভ, পথের প্রকৃতির কোন পরিচয় পাওয়া যায়

না। আমি পদব্রজেই চলিব, তাহাতে শেষ পর্য্যন্ত কাশ্মীর পৌছানো নাও ঘটিতে পারে কিন্তু যে পুকুরঘাটে নামিয়া আমি অঞ্জলি ভরিয়া জল খাইলাম, যে অশ্বত্থতলায় রাত্রি যাপন করিলাম এবং যে গ্রামকুমারীর কৌতূহলী দৃষ্টি আমাকে অভিষিক্ত করিয়া দিল—ইহার স্মৃতিগুলি জীবনের পক্ষে ত কম মূল্যবান নহে।

অতএব এই ধরণের ধীরগামী উপন্যাসের বিশিষ্টরূপ প্রয়োজন আছে এবং সেই হিসাবে 'পথের পাঁচালী'-'অপরাজিত' বাংলা সাহিত্যের একটি জয়স্তম্ভ। মহাকাব্যের সহিত এই জাতীয় উপন্যাসের ধর্ম্ম-সাদৃশ্য আছে। মহাকাব্যের কোন একটি সর্গের মধ্যে পাঠক-চিত্ত ডুবিয়া যায়, তাহার রসে আপ্লুত হইয়া চিত্ত সেই রস আকণ্ঠ পান করিতে থাকে, চলিবার মুখে তাড়াতাড়ি এক ঢোক গিলিয়া তৃপ্ত হইতে পারে না। বিভূতিবাবুর উপন্যাসের কোন একটি পৃষ্ঠা খুলিয়া পড়িতে আরম্ভ করিলে সেইরূপ ডুবিয়া যাইতে হয়—'তারপর?' এই প্রশ্ন বিস্মৃত হইয়া যাই। বলিয়াছি যে যেখানে অপরাজিতের সমাপ্তি হইয়াছে সেখানে অপুর বয়স ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ। এই ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বছরের মধ্যেকার কোন একটা বয়স যদি পাঠক আর একবার ফিরিয়া উপভোগ করিতে চাহেন, আমার বিশ্বাস বিভূতিবাবুর বইয়ের সেইরকম জায়গা খুলিয়া পড়িলেই ক্ষণিকের জন্য পরম ঈপ্সিত বিগত কালের সেই দিনগুলি ফিরিয়া আসিবে। অপুর জীবন একেলা অপুর নহে—উহা অপূর্ব্ব বিশ্বজনীনতা লাভ করিয়াছে—উহা এমনি পরিপূর্ণ সজীব ও সত্য! এইখানেই লেখকের গভীর অন্তর্দৃষ্টির পরিচয়।

বিভূতিবাবুর অন্তর্দৃষ্টি সত্য সত্যই বিস্ময়কর। নিকৃষ্ট শিল্পীর হাতে পড়িলে এইরকম বই জীবনের ঘটনাবলীর ক্যাটালগ হইয়া দাঁড়াইতে পারিত, কিন্তু দৃষ্টিশক্তি ও রসজ্ঞানের ফলে দৈনন্দিন ঘটনাকে বাছাই করিয়া ও সাজাইয়া লেখক সাধারণ পরিদৃশ্যমান বস্তুর মধ্য হইতে অপরিমেয় রূপ ও সৌন্দর্য্যের আবিষ্কার করিয়াছেন। প্রতিদিনের জীবন-যাত্রায় মনের অলক্ষ্যে যে রস আমাদের হৃদয়ে সঞ্চারিত হইয়া থাকে—আমরা যার কিছুমাত্র খোঁজ-খবর রাখি না—বিভূতিবাবুর বই পড়িতে পড়িতে সহসা তৎসম্বন্ধে সচেতন হইয়া আমরা উহা স্পষ্ট অনুভব করিয়া থাকি। এই অজস্র দৈনন্দিন খুঁটিনাটির মধ্যভাগ দিয়া চলিয়াছে অপুর জীবনধারা। কোন দিকে কোন বদ্ধতা নাই—যেন দিগন্তব্যাপ্ত সুবিপুল প্রসারের মধ্য দিয়া কলনাদিনী নদী বহিয়া চলিয়াছে।

'অপরাজিত' পড়িতে পড়িতে মনে হইয়াছিল, আমরা যেন আকাশের উপর দিয়া মন্থরভাবে নিম্নদেশের সুবিস্তীর্ণ দেশ দেখিতে দেখিতে চলিয়াছি। সেই দেশের উপরে নগর গ্রাম খাল বিল কত যে পড়িয়া রহিয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। কত নদী কত কতদূর হইতে আসিয়া পথের মধ্যে শেষ হইয়া গেল অথবা বাঁক ঘুরিয়া অন্য কোন্ দিকে বহিয়া গেল তাহা আমরা জানি না। তাহাদের জন্য ক্ষণেক মন উন্মনা হইয়া ওঠে, কয়েক বিন্দু অশ্রু ঝরিয়া পড়ে। সর্ব্বজয়া অপর্ণা লীলা অনিল ইহাদের বিয়োগে বেদনা অনুভব করি, কখন বা দারুণ ঔৎসুক্যে ভাবিতে থাকি সেই হতভাগিনী পটেশ্বরীর পরিণাম কি হইয়াছিল?…এমনি করিয়া পথের মধ্যে বহুজনকে পাইয়া ভালবাসিয়া এবং হারাইয়াও আমরা কোথাও থামিতে পারি নাই—একটি দূরগামী বিপুল কল্লোলময় জীবনধারাকে লক্ষ্য করিয়া কেবলি তাহার অনুগমন করিয়া ফিরিতেছি। সেই ধারাটির নাম অপু। এই সুদীর্ঘ যাত্রায় অপুর সহিত মিলন ও বিচ্ছেদ ঘটিয়াছে অনেকের—তার মধ্যে প্রধানতম হইতেছে লীলা অপর্ণা এবং 'নিশ্চিন্দিপুর' নামক একটি অতিজীবন্ত রহস্যময় প্রাণী।

গুরুসদয়

(শ্রীযুক্ত গুরুসদয় দত্ত, আই, সি, এস্-এর উদ্দেশে)

শ্রী কুমুদরঞ্জন মল্লিক বি·এ

এত দিবস সমান সমান ছিনু,
এখন তোমার নাগাল পাওয়া ভার,
দেখে তোমায় অবাক হ'য়ে থাকি,
পল্লী-পাগল বন্ধু হে আমার !

নিরঞ্জনের অমৃত-অঞ্জনে
পেলে দিব্য দৃষ্টি চমৎকার,
পরশ-পাথর তুমিই পেলে বুঝি,
আনন্দেতে পাঠাই নমস্কার।

পল্লীমাতা সোহাগ-ভরে তুলে'
তোমায় দিলেন ভাণ্ডারেরি চাবী,
রত্ন এত কোথায় ছিল ঢাকা,
আপন মনে আজকে আমি ভাবি।

'রায়-বেঁশে' ত অবজ্ঞাতই ছিল
লক্ষ্যও কেউ কর্‌ত নাক তাকে,
পার্থ ছিল বৃহন্নলা হ'য়ে
চিন্‌তো কে তা তুমি আসার আগে ?

আলিম্পনের রজত-রেখা-দলে
কতই শোভার ঝরণা ছিল ভাই,
দ্বারে আঁকা পদ্মফুলের মাঝে
পারিজাতের গন্ধ এখন পাই।

পল্লীকে হায় এম্‌নি ভালোবাসো
ধূলায় মুঠি স্বর্ণমুঠি করো,
সারডোবাতে পদ্ম ফুটাও তুমি
দেখ্‌ছি তোমার সবই নূতনতর।

হে দরদী, দেশের সুসন্তান,
তোমায় আমায় প্রভেদ ভাবি রোজ,
আমি গাহি অশথ্‌-তলায় গান
তুমি রাখ কল্পতরুর খোঁজ।

আমি কেবল অজয়-কূলে বসে'
বালির বেলায় জলের রেখা টানি,
তুমি রচ অমিতাভের ছবি
বন্ধু আমার অমৃত-সন্ধানী ! *

---

* 'বঙ্গলক্ষ্মী'তে "পশ্চিম-বাংলার মেয়েদের প্রাচীরচিত্র-শিল্প" পাঠাচ্ছে।

হাওয়া-সমিতি

শ্রী করুণাবন্ধু মুখোপাধ্যায়

রবীন্দ্রনাথ কলকাতাকে "পাষাণকারা" বলেছেন। তাঁর মতে এখানে শুধু "ইঁটের পর ইঁট, মাঝে মানুষ কীট।" কত রাজপথ, কত রাজপ্রাসাদ, আমোদ-প্রমোদের কত শত উপকরণ, তবু কবিগুরুও এই বিশাল নগরীর এরূপ বর্ণনা কেন কর্‌লেন তা হৃদয়ঙ্গম কর্ত্তে হ'লে তাঁর মত হৃদয় নিয়ে ধনীগণকে নির্ধনদের হৃদয় স্পর্শ কর্ত্তে হবে। যাঁদের বড় বড় বাড়ী, মোটর গাড়ী আছে তাঁদের কাছে এই নগরী স্বর্গ এবং তাঁরা অনেকেই সহজে বুঝ্‌তে পার্‌বেন না কত বড় বিরাট শ্মশান এই নগরী দীন হীন দরিদ্রদের কাছে। আর এই দরিদ্র লোকেদের সন্তানদের দুর্গতি কী ভীষণ তা আমরা অনেক সময় ভেবেও দেখি না। যে সব বাসায় বা বস্তীতে এরা থাকে, এক কথায় সে সবকে নরক বল্‌লেও বেশী মিথ্যা বলা হবে না। যখন ইস্কুলে এসে বড় লোকদের ছেলেদের সঙ্গে মেশে তখন এদের বিপদ আরও বেশী। ধনীর ঘরের দুলালদের সাথে এদের কত প্রভেদ। সব চেয়ে দুঃখ হয় যখন লম্বা ছুটীর পর ওদের মুখ থেকে হতভাগ্য ছেলেমেয়েরা দেশবিদেশের কথা শোনে অথবা মাষ্টার মহাশয়গণ যখন মানচিত্রে দার্জ্জিলিং, পুরী প্রভৃতি স্থানের স্বাস্থ্য এবং সৌন্দর্য্যের কথা বর্ণনা করে' আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেন। রবীন্দ্রনাথের কাঙ্গালিনী মেয়ের মত এদের "ম্লান চোখে দুরাশার সুখের স্বপন" ভেসে যায়। আমরা ইস্কুলের মাষ্টার, তাই এই কঠোর সত্য অনেকবার প্রত্যক্ষ করেছি।

দু'বৎসর আগে একদিন যখন শুনলাম মাতৃস্থানীয়া শ্রীযুক্তা হেমলতা মিত্র প্রভৃতি কলিকাতার কয়েকজন নিঃস্বার্থ সেবক-সেবিকা উল্লিখিত সমিতি স্থাপন করেছেন তখন বড়ই আনন্দিত হয়েছিলাম এবং ভেবেছিলাম যদি এই সমিতির কোনরূপ সেবা করার দুরূহ সৌভাগ্য হয় তবে আপনাকে ধন্য মনে কর্‌বো।

বইতে পড়ি এবং লোকমুখে শুনি ইউরোপ প্রভৃতি দেশের যুবক-যুবতীগণ "নির্ব্বারিত স্রোতে দেশে দেশে দিশে দিশে অজস্র সহস্রবিধ চরিতার্থতায় ঘুরে বেড়ায়।" অর্থাভাবে অবসন্ন, রোগে শোকে মরণাপন্ন, অজ্ঞান-তমসাচ্ছন্ন আমাদের এই দেশে বর্ত্তমানে তা অসম্ভব। তবু এই অল্পকালের মধ্যে এই সমিতি যা করেছেন তা নিতান্ত সামান্য নয়। বাংলার বাইরে বিভিন্ন প্রদেশে কলকাতার প্রায় চারিশত বালক-বালিকা বিনাখরচে কত পাহাড়-পর্ব্বত, নদনদী, সাগর-সরোবর, বনজঙ্গল, কত মনোরম দৃশ্য দেখে আস্‌লো এই দুই বৎসরের মধ্যে। এই দেখা-শোনার ভিতর দিয়ে এরা যে সর্ব্বপ্রকারে উপকৃত হয়েছে সে কথা বলাই বাহুল্য। আমরা এই সমিতির কর্ম্মকর্ত্তাদের কর্ম্মকুশলতা এবং ঐকান্তিকতার উপর দৃঢ় বিশ্বাস করি এবং আশা করি দেশের ধনশালী নরনারীবৃন্দ যথাসাধ্য সাহায্য কর্‌বেন এই শিশু-অনুষ্ঠানটি বাঁচিয়ে রাখ্‌তে। যদি এ স্বল্পায়ু না হয় তবে বাঙ্গালী আজ যা ভাব্‌ছে, ভারতের অন্যান্য প্রদেশের লোকেরাও কাল তা ভাব্‌বে এবং ধীরে ধীরে ভারতময় বালক বালিকা, যুবক-যুবতীদের দেহে মনে হৃদয়ে প্রভূত কল্যাণ সাধিত হবে। দেশের যারা ভবিষ্যতের আশা-ভরসা তাদের "শ্রান্ত ভগ্ন শুষ্ক বুকে" আশা, আনন্দ এবং বল সঞ্চার করার একটা পথ খুলে দিতে হবে। যতদিন সমাজের বর্ত্তমান উচ্চনীচ অবস্থা থাক্‌বে ততদিন জনসাধারণ দেশের বড়লোকদের কাছে এইটুকু সাহায্য আশা করে—এ তাদের প্রার্থনা ও দাবী। শিক্ষা-বিস্তারের জন্য আজকাল অনেকেই চিন্তা করে' থাকেন। তাঁদের দৃষ্টি আমরা এই সমিতির দিকেও আকর্ষণ করি।

---

* "দি চাঁলড্রেনস্ ফ্রেস এয়ার এণ্ড এক্সকারসন সোসাইটী"র সহজ ভাষায় "হাওয়া-সমিতি" নাম দেওয়া গেল।—বঃ সঃ

প্রথম যুগের ফরাসী সাহিত্য

শ্রী ধীরেন্দ্রলাল ধর বি-এ

প্রথমেই ফরাসী ভাষার উদ্ভবের কথা —।

রোমক যুগে "গল্" হিসাবে যে জাতি ছিল জগতের বুকে পরিচিত, তারা ফরাসী জাতির নামান্তরিত পূর্ব্বপুরুষ। যুদ্ধপ্রীতি ও বাক্-পদ্ধতির সৌন্দর্য্যের সঙ্গে সে জাতির ছিল নিবিড়-পরিচয়। তাদের বংশধর হিসাবে জীবনধারার সেই বৈশিষ্ট্য বোধ প্রথম যুগের ফরাসী সাহিত্যে কম-বেশী হিসাবে প্রকাশ পেয়েছিল।

শুধু তাই নয়, রোম্যানদের "গল্" বিজয়ের পর রোমক্ ভাষা—তদানীন্তন প্রাতীচ্যের শ্রেষ্ঠ সাহিত্য রাজভাষা হিসাবে এ দেশটির বুকে বিস্তৃতি লাভ করে। তাদের সাহিত্যসৃষ্টিতে প্রভাবান্বিত হ'য়ে গল্দের মনে প্রথম জাগে নিজেদের সাহিত্যসৃষ্টির আকাঙ্ক্ষা। কিন্তু তাদের আকাঙ্ক্ষা সার্থক হবার আগেই অসভ্য জার্ম্মেন বোম্বেটেরা ফ্রান্স দখল করে' ফেল্লো রোমক্ সাম্রাজ্যের শেষ যুগে। কিছুদিন পরে এই অসভ্যদের অত্যাচার ও অসংযমের উপর যখন শ্রান্তির যবনিকা নেমে এলো, তখন প্রথম একটা উন্নত ভাষা সৃষ্টির আকাঙ্ক্ষা এদের মনে আবার জাগরূক হোল। তাদের সে প্রচেষ্টা সার্থক হয় ফরাসী ভাষার সৃষ্টিতে।

—লাটিন্ ও জার্ম্মেন অসভ্যদের ভাষার মিশ্রণে প্রথম ফরাসী ভাষার সৃষ্টি।

এই ভাষার প্রথম বই হোল Glossaries of Reichenan and Cassel— এইখানিই এই ভাষার প্রথম অভিধান।

ক্রমে ক্রমে এই ভাষাটিই সাধারণ ভাষা হিসাবে দেশের বুকে বিস্তৃতি লাভ কর্‌লো দুটি বিভিন্ন ধারায় বিভক্ত হ'য়ে— Langue d'oc আর Langue d'oil। প্রথমটি দক্ষিণাংশের অধিবাসীদের কথিত ভাষা হোল ব্যাপক ভাবে আর শেষোক্তটি হোল উত্তরাংশের। শেষেরটিই পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত হ'য়ে আধুনিক ফরাসী ভাষার জন্ম।

—এই গ্যালো ফরাসী ভাষার জন্মেতিহাস। যে কোন সাহিত্য সম্বন্ধে আলোচনা কর্‌তে হ'লে সেই ভাষার উদ্ভব সম্পর্কে কিছু আলোচনার প্রয়োজন আছে মনে ক'রে আমরা ফরাসী ভাষার জন্মেতিহাসের অবতারণা কর্‌লাম এখানে।

দশম শতাব্দীর কথা।—

দশম শতাব্দীর আগে ফরাসী সাহিত্য আত্মপ্রকাশ কর্‌তে পারেনি। সাহিত্য কি, তা তখনকার লোকের চিন্তাধারার গণ্ডীর মধ্যে ধরা দেয়নি, সেইজন্যই ফরাসী সাহিত্য সৃষ্টি হ'তে পারে নি এর আগে।

দশম শতাব্দী থেকেই প্রথম ফরাসী সাহিত্যের সৃষ্টি।

মধ্যযুগের অপর সব দেশের মত এদেশেও ছিল চারণ-কবিদের আধিক্য। এদের মুখে মুখেই প্রথম গীতিকাব্য Chanson de Rolandএর সৃষ্টি। "সাগা" বা 'এপিক্' বল্‌তে যা বোঝায় এখানিকে তা বলা যেতে পারে। সে যুগের বিখ্যাত নৃপতি "শার্লেম্যাগনের শেষ যুদ্ধের কথা সরল অনাড়ম্বর সংযমের সঙ্গে এই বইখানিতে ছন্দোবদ্ধ। একঘেয়েমির একটা সুর থাকলেও, এ বইখানি সে যুগের একটি বিশেষ সৃষ্টি। চারণ-কবিদের গীতিকাব্যের মধ্য দিয়েই এমিভাবে অনেকগুলি সাগার সৃষ্টি হয়— Chansons de Geste নামেই সেগুলি প্রসিদ্ধ।

চারণদের মুখে মুখে এই ধরণের গীতিকাব্য সৃষ্টি হ'তে থাকে দু'শতাব্দী ধরে'—দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগ পর্য্যন্ত।

তারপর ত্রয়োদশ শতাব্দীর পূর্ব্ব ও মধ্যভাগে গীতি-কাব্যের ভিতর দিয়েই ইতিহাস লেখ্‌বার প্রচেষ্টা সুরু হোল। যে ঐতিহাসিক ঘটনা ব্যক্তি মাত্রকেই আকৃষ্ট করে' মনোবিবর্ত্তন ও চিত্তক্ষেপ ঘটাবে, এমনি ঘটনার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে' ক্রুসেড্ (Crusade)এর ঘটনা নিয়েই রচনার আরম্ভ হোল। (সেরাসিন্ তুর্কীদের অধীনতা থেকে যিশুখৃষ্টের জন্মভূমি প্যালেষ্টাইন্‌কে মুক্ত কর্‌বার জন্য য়ুরোপের বিভিন্নদেশীয় সৈন্যদল একত্রে যে

যুদ্ধযাত্রা কর্তো—তাই ক্রুসেড্ নামে প্রসিদ্ধ।) সে যুগে দুটি লেখক এই রচনায় অসামান্য পারদর্শিতা দেখান, তাঁরা হচ্ছেন ভিল্লেহার্দু ও জেঁভিল্। ভিল্লেহার্দু লিখেন চতুর্থ ক্রুসেড্ সম্বন্ধে। এঁর রচনায় বিশেষ উৎকর্ষ না থাকলেও এঁর পরবর্ত্তী লেখক জেঁভিল নবম ক্রুসেডের কথা বর্ণনা করেন ছবির মত সৌন্দর্য্যের চমৎকারিত্বে। এঁরা দুজনেই সম্ভবতঃ ক্রুসেডে সৈন্য হিসাবে যোগ দিয়েছিলেন—অনেকের বিশ্বাস। না হ'লে ছবির মত ঘটনাগুলোকে অমনভাবে বর্ণনা করা শুধু শোনা কথার ওপর নির্ভর করে' চল্‌তো না।

তাবপর দুজন তদনীন্তন শ্রেষ্ঠ গীতিকবির রচনা-গৌরবে প্রথম যুগের ফরাসী সাহিত্য অলঙ্কৃত হয়। থিবাঁদ্ দ্য ক্যাম্পাগন্ ও 'রুতেব্যাফ্' দু'জনেই সে যুগের শ্রেষ্ঠ গীতি-কবি ছিলেন বল্‌লেও অত্যুক্তি হয় না—নানা ছন্দের কবিতা লিখে তাঁরা শ্রেষ্ঠত্ব অর্জ্জন করেছিলেন। শুধু তাই নয়, সেযুগের 'জ্যার্ণালিষ্ট' (journalist) বল্‌তেও ছিলেন তাঁরাই।

কাব্যলোকের কল্পনার মানসীকে ছেড়ে দিয়ে বাস্তব জীবনের নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা নিয়ে কবিতা লিখ্‌তে সুরু কর্‌লেন "রোম্যান্স্-দ্য-রেনার্ত্"। এঁর কবিতা জনপ্রিয় হ'য়ে উঠেছিল অভিনব বৈশিষ্ট্যের জন্য—প্রতিদিনকার সাধারণ ঘটনাকে ভিত্তি করে' ইনি কাব্য সৃষ্টি কর্‌তেন কাল্পনিক জন্তু-বিশেষের নাম দিয়ে। তাঁর কাব্যপ্রতিভার কথা না হয় বাদ্‌ই দিলাম, সৃষ্টির মৌলিকত্ব হিসাবেও তিনি ছিলেন বিশিষ্ট অন্যতম।

তারপর হ'চ্ছে ফরাসী "ফেব্‌লা"র কথা।

সাধারণ বুর্জ্জোয়া-জীবনের কাহিনী বা ছোট গল্প সে যুগে 'ফেব্‌লা' নামে প্রসিদ্ধ ছিল। যদিও সে গীতিকাব্য-যুগে ছোটো গল্প বা কাহিনী বিশেষ পরিপুষ্টি লাভ করতে পারেনি, তবু যে ক'জন প্রতিভাশালী লেখক ফেব্‌লায় উৎকর্ষের চেষ্টা করেন "নিকোলেৎ"ই তাঁদের মধ্যে বিশেষ শক্তিসম্পন্ন। এঁর রচনার গতি ছিল দ্রুত, প্রকাশভঙ্গী ছিল মিষ্ট ও মাঝে মাঝে বিদ্রূপাত্মক। এঁর প্রতিভাপ্রসূত সৃষ্টিতে সাধারণতঃ সে যুগের লোকেরা তৃপ্তি ও আনন্দ পেতো; এজন্য তাঁর জনপ্রিয়তা বড় কম ছিল না।

ত্রয়োদশ শতাব্দীতে আধ্যাত্মিক ও উপদেশমূলক রচনারও সৃষ্টি হয়। এই সম্পর্কে সর্ব্বপ্রথম ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি হ'চ্ছে "রোম্যান্-দ্য-লা-রোজ্"। দুটি প্রতিভাশালী লেখক এই বইখানিকে কবিতার মধ্য দিয়ে পূর্ণতা দেন—"গিলাম্-দ্য-লরিস্" লেখেন চল্লিশ হাজার লাইন দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে; এর পঞ্চাশ বছর পরে "জিন্-দ্য-ম্যাঙ্" লেখেন আঠারো হাজার লাইন। গিলামের রচনা উদ্দেশ্যমূলক, আর জিনের রচনা আধ্যাত্মিক। এই রচনা দু'শো বছর ধরে' জনসাধারণের মুখে মুখে সজীব হ'য়ে থাকে।

তারপর চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে ইতিহাস ও ধর্ম্মসম্বন্ধীয় রচনার সৃষ্টি হয়। "ফ্রয়জার্ত" লেখেন প্রকৃত ইতিহাস আর বিখ্যাত পণ্ডিত ডাক্তার গার্সন প্রথম ধর্ম্মসম্বন্ধে বই লেখেন—Imitation of Christ। আজও খৃষ্ট-ধর্ম্মীদের মধ্যে এ বইখানির বিশেষ আদর আছে।

পঞ্চদশ শতাব্দীর কথা—।

কাব্যের উৎকর্ষ সাধিত হয় "ফ্রাঙ্কয় ভিলন্"এর প্রতিভাপ্রসূত সৃষ্টিতে। কবিতার মধ্যে ব্যঙ্গ, রসিকতা, আবেগ, কারুণ্য ও বীরভাব সৃষ্টি কর্‌তে তিনি ছিলেন অদ্বিতীয়। এঁর জীবন বৈচিত্র্যপূর্ণ—একাধারে ইনি দস্যু, হত্যাকারী, ভবঘুরে ও কবি ছিলেন। যখন ফাঁসীর সম্ভাবনা ঘটে, আসন্ন সেই মৃত্যুর সম্মুখীন হয়েও সেই সময়ে এঁর বিখ্যাত কবিতা L'Epitaphe en forme de Balladটি লেখেন। এঁর এই দস্যু-জীবনের জন্যই বোধ হয় এর নামের শেষে 'ভিলন্' কথাটি যোগ করা আছে—এটি হয়তো villainএরই অপভ্রংশ।

এই শতাব্দীতে নাটক লেখ্‌বার চেষ্টাও চলে—বিয়োগান্ত মিলনান্ত, ব্যঙ্গাত্মক, জাতীয়, ঐতিহাসিক, রহস্যময়—সকল ভাবেরই নাটক সৃষ্টির প্রচেষ্টা চলে এই যুগে। এই নাট্য-সাহিত্যে পূর্ণতা দেবার চেষ্টা করেন—আংশিকভাবে কৃতকার্য্যও হন সে যুগের খ্যাতনামা নাট্যকার "ফিলিপ-দ্য-কমিনস্"। শুধু নাট্যকার বল্‌লেই এঁর পরিচয় সম্পূর্ণ হবে না, ফরাসী-রাজ একাদশ লুইয়ের রাজত্বকালে ইনি ছিলেন রাজ-ঐতিহাসিক। রাজনীতিবিদ্ বল্‌তে যে চিন্তাশীলতা,

ধীরবুদ্ধি ও দূরদৃষ্টি থাকা দরকার তা এঁর ছিল—সবার উপরে ছিল এঁর আভিজাত্যের গর্ব্ব। ইনি চৌষট্টি বছর জীবিত ছিলেন—চৌদ্দ-শো-সাতচল্লিশ থেকে পনেরো-শো-এগারো খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত।

ষোড়শ শতাব্দীতে রেনেসাঁসের যুগ ঘনিয়ে এল। নতুন ভাবধারার সংমিশ্রণে পুরাতনের সংস্কার-শুদ্ধি কর্‌তে হবে, বদ্ধমূল চিন্তাধারার সঙ্গেই সদ্যোজাত স্বভাবজ মনোন্মেষের স্থান হবে,—শাশ্বতের ভিত্তি শক্ত কর্‌তে হবে আধুনিকতার যুক্তিতর্কের সঙ্গে মিলিয়ে;—এই হ'চ্ছে রেনোসাঁসের মূল কথা। অতীত ভাবধারার মশালকে বর্ত্তমানের হাওয়ায় তুলে ধরা শুধু। এই যুগের সর্ব্বপ্রথম লেখক হিসাবে 'ক্লিমেন্ত্‌ ম্যারৎ'এর নামই উল্লেখযোগ্য। এঁর পরেই বল্‌তে হবে "সেন্ত্‌গেলায়" আর 'ফ্রাঙ্কয় রাবেলায়"এর কথা। গেলায় খ্যাতিলাভ করেন বিশিষ্ট অনুবাদক হিসাবে; বহু ইতালীয়ান সনেটের ইনি অনুবাদ করেন। আর রাবেলায় দুখানি গদ্য-কাব্য লিখে খ্যাতিলাভ করেন—Gargantua ও Pantagruel। প্রথমখানি লেখেন পনোরো-শো-তেত্রিশ খৃষ্টাব্দে, আর দ্বিতীয়খানি তার দু'বছর বাদেই। এঁর বর্ণনাভঙ্গী ভালো হলেও ভাষা মাঝে মাঝে অত্যন্ত কূট। আরও, দর্শনবাদের শ্রেষ্ঠত্ব থাক্‌লেও যুক্তিতর্ক ও থিওরীর শেষ নেই। এ সব দোষ-ক্রটি থাক্‌লেও চরিত্র সম্বন্ধে এঁর পর্য্যবেক্ষণ-শক্তি ও লিখন-পদ্ধতি সুন্দর। ফরাসী সমালোচকরা এঁকে সেক্‌স্‌পীয়রের সঙ্গে তুলনা করেন, বলেন, মানব-জীবনকে দেখ্‌বার শক্তি ছিল এঁর সেক্‌স্‌পীয়রের মতই।

ষোড়শ শতাব্দীর এই প্রথমভাগেই একদল তরুণ কবি দলবদ্ধ হন নব্যভাবধারার প্রবর্ত্তনের আকাঙ্ক্ষা ও আগ্রহ নিয়ে—এঁদের মধ্যে রোঁসার্ড, বেলে, পন্তাস্‌-দ্য-ত্যার্ড, ব্যেফ্‌, জোডেল্‌, ডারাৎ, লেবে—এই ক'জন ভবিষ্যতে খ্যাতিলাভ করেন। এঁদের লক্ষ্য ছিল ক্লাসিক্যাল সাহিত্যে যে সব শ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থ আছে, আধুনিক সাহিত্যে সেইরূপ কাব্যগ্রন্থের সৃষ্টি করা। গতানুগতিক তদানীন্তন রচনাপদ্ধতিকে এঁরা ঘৃণার চক্ষে দেখ্‌তেন। এঁরা চেয়েছিলেন নূতনভাবে সৃষ্টি কর্‌তে, প্রকাশভঙ্গীকে জোরালো ও শুদ্ধ কর্‌তে। ফরাসী সাহিত্যের বুকে এঁরা বিপ্লব ঘটিয়ে তোলেন এবং ফরাসী সাহিত্যের সত্যিকারের নবযুগের সৃষ্টি করেন এঁরাই।

এই দলটির নাম প্যাড।

এই দলটির মধ্যে বিশেষ ব্যক্তিত্ব ছিল রোঁসার্ড, বেলে ও লেবের। প্রসিদ্ধ গ্রীক কবি পিণ্ডারের অনুকরণে রোঁসার্ড কবিতা লিখ্‌তে সুরু করেন—চমৎকার নির্দ্দোষ লিরিক্‌ কবিতা। বেলের কবিতায় যে লালিত্য পাওয়া যায় তা ফরাসী সাহিত্যের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য, ভিন্ন সাহিত্যে অমন লালিত্য নেই। আর লেবের কবিতা সম্বন্ধে এইটুকু বল্‌লেই যথেষ্ট হবে—লেবে ষোড়শ শতাব্দীতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠা স্ত্রীকবি ছিলেন।

রেনেসাঁসের যুগে গদ্যসাহিত্যেও নামকরা অনেকে ছিলেন। তাঁদের মধ্যে মনটেগম অন্যতম। 'এসে' (essay) বল্‌তে যা বুঝি—তা এঁরই সর্ব্বপ্রথম সৃষ্টি। জ্ঞান ছিল এঁর অনন্যসাধারণ, পাণ্ডিত্যের গর্ব্বও ছিল যথেষ্ট। উদাহরণ প্রয়োগ কর্‌তেন ইনি অক্লান্ত ভাবে অনবরতঃ, আর বইয়ের প্রতি পৃষ্ঠাতেই অন্যের লেখা উদ্ধৃত না কর্‌লে এঁর লেখনী যেন অগ্রসর হ'তে চাইতো না। ছোট ছোট করে' সংক্ষেপে কিছু বল্‌তে ইনি শেখেন নি—বড় বড় শব্দবিন্যাসে বড় বড় বাক্য না লিখ্‌লে, স্বপ্রতিভার উপযুক্ত স্ফুরণ হোল না বলে' ইনি মনে কর্‌তেন। আধুনিক বল্‌তে আমরা এখন যা বুঝি ইনি তারই সূচনা করে' গ্যাছেন ফরাসী গদ্য-সাহিত্যে। লেখার যা নাম দিতেন তাতে রচনার মর্ম্মগত বিষয় সম্বন্ধে কোন ধারণাই হ'ত না। আধুনিকদের মতই রচনাকে ইনি সহজ ও জোরালো কর্‌তে চেয়েছিলেন—স্বতঃস্ফূর্ত্ত লেখনীর গতিকে সংযত কর্‌তে চেষ্টা করেন নি কোথাও। সরল গতিশীল ধারায় অনেক গভীর চিন্তাপূর্ণ প্রবন্ধ ইনি ফরাসী ভাষায় পরিবেষণ ক'রে স্বদেশী সাহিত্যের গৌরব বৃদ্ধি করেন। ইনিই ষোড়শ শতাব্দীর শেষ লেখক, পনেরো-শো-তেত্রিশ খৃষ্টাব্দে ইনি জন্মান, পনেরো-শো-নিরানব্বই খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ইনি জীবিত ছিলেন।

এইখানেই এই প্রবন্ধের যবনিকা ফেল্‌লাম। এর পর সপ্তদশ শতাব্দীর ফরাসী সাহিত্য সম্বন্ধে আলোচনা কর্‌বার চেষ্টা কর্‌বো।

অগ্নিশিখা

শ্রী কাত্যায়নী দেবী

(১)

দিন ক্রমে প্রসন্ন হ'য়ে এল, অরবিন্দ স্বাস্থ্য ফিরে পেতে লাগ্‌ল। কিন্তু অলকার মনের গভীর ক্লেশ এখনও যায় নি, এখনও সে স্বামীর সঙ্গে সকল বিষয় খোলাখুলি কথা বল্‌তে পারেনি, অরবিন্দও কিছু জিজ্ঞাসা করেনি; তাই তার মনের ভার নামেনি, বোঝা হ'য়েই আছে।

অরবিন্দের আরোগ্যলাভের পর দু' একজন গ্রামের মাতব্বর এসে "কেমন হে বাবাজি, কেমন আছ?" ব'লে আপ্যায়িত ক'রে গেল। প্রতিবেশী মেয়েরা বড় কেউ আসেই না। মঙ্গলা কিছুদিন হ'ল চ'লে গেছে। একা একা অলকা কেমন হাঁপিয়ে ওঠে, সে বোঝে যে গ্রামের কেউ আর তেমন ক'রে তার কাছে আসে না, আগের মত আত্মীয়ভাবে তাকে আর তারা গ্রহণ কর্‌ছে না। অলকা হারিয়ে গিয়ে আবার হঠাৎ ফিরে এসে স্বামী-পুত্র নিয়ে সুখে ঘর কর্‌ছে এটা সকলের চোখে বেশ আনন্দদায়ক হ'ল না।

পুরুষদের মহলে, তাসের আড্ডায়, ছেলেদের ক্লাবে, মেয়েদের ঘাটের মজ্‌লিসে এই সব বিষয় বেশ গরম গরম আলোচনা হ'তে লাগ্‌ল। পাড়ার সমাজনেতারা এ অন্যায় নীরবে সহ্য কর্‌তে একেবারেই নারাজ; যুবকেরা সমাজসংস্কারের দিক দিয়ে তর্ক কর্‌তে লাগল যে এতে অন্যায় কিছু নেই। মেয়েরা অলকার বেহায়াপনার নিন্দা ক'রে পথ-ঘাট মুখর ক'রে তুল্ল।

দিনকতক যেতেই অলকার কানে এই সব কথা কিছু কিছু আস্‌তে লাগ্‌ল। কেউ বাড়ী এলে পান জল নেয় না, অলকা বুঝ্‌ল, তার অদৃষ্টে এই লাঞ্ছনা সুবহুল। কোন সামাজিক কাজে, বিবাহে কি জাতকর্ম্মে তাদের নিমন্ত্রণ হয় না। পাশের বাড়ীর মতিলাল মজুমদারের মেয়ে শৈলজা সর্ব্বদা তার কাছে আস্‌ত, এ পর্য্যন্ত সেও একবারও আসেনি, কিন্তু সে অলকাকে কি ভালই বাস্‌ত! সকলের অবজ্ঞা যে তাকে বইতে হবে একথা মনে ক'রে তার চোখ জলে ভ'রে আসে। নিজের মনে মনমরা হ'য়ে থাকে, অরবিন্দের সঙ্গেও প্রাণ খুলে মিশ্‌তে পারে না, কোথায় যেন কে কেটে তাদের আলাদা ক'রে দিয়েছে!

সেদিন রবিবার। পাড়ার পুরুষদের আপিস কাছারীর তাড়া নেই, সকলে একে একে অরবিন্দের বৈঠকখানায় এসে হাজির হ'তে লাগ্‌লেন। রামকিঙ্কর, ব্রজমাধব, গিরিশ ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি গণ্যমান্য লোককে একত্রে ঘরে আস্‌তে দেখে অরবিন্দ বুঝ্‌ল তাঁরা আস্‌ছেন যুদ্ধ কর্‌তে! ঘরে আস্‌তেই অরবিন্দ বল্লে, "আসুন আসুন, বসুন, বস্‌তে আজ্ঞা হউক—" ইত্যাদি ব'লে সকলের পায়ের ধূলা নিয়ে সশ্রদ্ধ সৌজন্যে একপাশে বস্‌ল। বৃদ্ধেরা বল্লেন, "এইতো বস্‌ছি, তুমি রোগা শরীরে ব্যস্ত হ'য়ো না। যে কাজকর্ম্ম—কতবার মনে করি আসি তা হ'য়ে উঠে না। বাবাজী এখন কেমন আছ?"

"আজ্ঞে আপনাদের আশীর্ব্বাদে এখন অনেক ভাল আছি।"—অরবিন্দ রঘুকে ডাক দিয়ে বল্লে, "যা ভিতর থেকে পাণ এনে দে, আর তামাক দে এঁদের।"

রামকিঙ্কর বল্লেন, "না, না, পাণ তামাকের দরকার কি?"

রঘু পাণ এনে দিয়ে তামাক আন্‌তে গেল; কিন্তু পাণ কেউ নিলেন না দেখে অরবিন্দ কথার অবতারণা করে বল্লে, "আপনারা কি আমার বাড়ীতে পাণ জল গ্রহণ অন্যায় মনে কর্‌ছেন?"

গিরিশ শর্ম্মা হেসে বল্লেন, "হ্যাঁ, না না বাবাজী, কি জান শাস্ত্রে আছে হাতের জল শুদ্ধ না হ'লে ঐ কি বলে যেন—ঐ বউমা'ই তো পাণ জল দেন, তা দেখ এখন দরকার কি এ সব?"

"আপনারা বরাবর তাঁর হাতের জল পাণ এমন কি

অন্ন-ব্যঞ্জন খেয়েও তৃপ্ত হ'য়ে গেছেন, তাঁর এমন কি দুর্ভাগ্য হ'ল যে পাণটুকুও আপনারা গ্রহণ করলেন না?"

ব্রজমাধব এগিয়ে বল্লেন,"বলি কি বাবাজি, রাগ ক'রোনা, এসব শাস্ত্রের বিধি! আমরা হ'লাম গ্রামের মাথা, দশখানা গ্রাম আমাদের বিধি নিয়ে চলে। তোমরা বনিয়াদি ঘর,তেমন কিছু বলতে পারি না,না হ'লে কি এমন ক'রে গাঁয় বাস করা চল্‌ত? ঐ সেবার পরাণ রক্ষিতের ছেলের বউকে ঘাট থেকে ধ'রে নিয়ে গিয়েছিল, তা কই পেলে সে বউ নিয়ে ঘর করতে? ও যে শাস্ত্রে হবার যো নেই; স্ত্রীজাতি বড় পবিত্র কিন্তু একবার হস্তান্তর হ'লেই তা আর গ্রহণযোগ্য থাকে না। তবে তুমি জ্ঞানী বিদ্বান ছেলে, তুমি কিছু না বুঝে' করবে না, এই আমাদের ভরসা।"

অরবিন্দ বল্লে, "হ্যাঁ, বুঝ্‌লাম সবই। আপনাদের শাস্ত্রের দোহাই যে আজ সমাজের কত ক্ষতি করছে তা আপনারা দেখেন না সেই জন্য আজ সোনার বাংলা শ্মশান হ'তে চলেছে। ওদের খুঁজ্‌তে বা'র হ'য়ে দেখেছি সমাজ কোথায় নেমেছে! যত সমাজ-পরিত্যক্তাদের পল্লীতে ঘুরেছি, দেখেছি এমনি ক'রে কত ঘরের লক্ষ্মী বিনা দোষে, সামান্য দোষে, এমন কি বউ রাগী, বউ অবাধ্য, বউএর ছেলে হয় না—এই সব দোষ ধরাতেও কত জন ঘরের আশ্রয় থেকে পথে দাঁড়িয়েছে। তাদের দোষ-ত্রুটি সংশোধন ক'রে ঘরে তুলে নেবার জন্য সমাজে মাতব্বর নেই কিন্তু অন্যায়ের পক্ষে সায় দিতে লোকের অভাব হয় নি। সমাজে আশ্রয় পায় নি তাই তাদের পেটের ভাত জোগাতে গিয়ে বসেছে পাপের পাঁকে ব্যবসা খুলে'! কি বল্‌ব, আপনারা গুরুজন, আজ আমায় একঘরে করেছেন, করতে পারেন, বেশী উৎপাত হয় দেশ ছেড়ে চ'লে যাব, কিন্তু বিনা দোষে সন্তানের মা, স্বামীর স্ত্রী যে, তাকে ভিটেছাড়া ক'রে কোন পুণ্য আমি চাই না।"

অরবিন্দ দেখেনি অনেকগুলি নবীন ও প্রবীণ এর মধ্যে ঘরে এসে ঢুকেছেন।

রামকিঙ্কর আরক্ত মুখে ব'লে উঠ্‌লেন, "এ তোমার অন্যায় আব্দার, সমাজে শাসন না করলে চলে? আজ একজন অন্যায় ক'রে অবাধে ঘরে এলে, কাল আর একজন আসবে, তা হ'লে ঘরের পবিত্রতা থাক্‌বে কি ক'রে?"

বৃদ্ধেরা মাথা নেড়ে বল্লেন,"ঠিক বলেছেন, এ যে সংসারাশ্রম, বড় কঠিন ঠাঁই!"

অরবিন্দ হাত জোড় ক'রে বল্লে, "অপরাধ নেবেন না, আজন্মসংস্কারে আমার মনেও ঠিক এই ধারণা ছিল, কিন্তু প্রথার আগুনে পুড়ে' সংসারের যে চিত্র দেখে এসেছি তাতে বুঝেছি ধর্ম্ম কি কেবল স্ত্রীলোকের বেলায়? যে দুরাচাররা এমন অসহায় অবলাদের শত ছলে নির্য্যাতন করছে তারা কি পাপী নয়, বাচস্পতি মশায়? তারা তো পুরুষ, কোন্ বিধান তাদের জন্য সমাজ রেখেছে? দুরন্ত পুরুষ শক্তির কবলে প'ড়ে যে অবলা ভীতা পল্লীমেয়েরা নিত্য চোখের জলে পৃথিবীর বুক ভিজিয়ে দিচ্ছে তারা কি স্বেচ্ছায় এই পাপের পথে যায়? ক'জন মেয়েকে আপনারা জানেন যে নিজের পতনের পথ নিজে তৈরী করেছে? বলুন, সকলের মধ্যেই এ বোধ আছে, সকলের ঘরেই স্ত্রীকন্যা আছেন, বলুন—তাঁদের দিয়ে কি কোন অন্যায় হ'তে পারে কেউ বিশ্বাস করেন?"

একজন প্রৌঢ় ভদ্রলোক ব'লে উঠ্‌লেন "এ তোমার কেমন কথা ভদ্রঘরের স্ত্রীকন্যাদের নিয়ে?"

"কেন আমার স্ত্রী কি ভদ্রপরিবারের স্ত্রী—কন্যা নয়? সে সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণবংশের মেয়ে, গাঙ্গুলী বাড়ীর পুত্রবধূ, সে যদি চক্রান্তে প'ড়ে কোন দুর্গতি ভোগ ক'রে এসেই থাকে, তবে তাকে ত্যাগ করার কি আছে? যদিও আমি জানি যে কোন আত্মীয় ভাইয়ের কাছে 'ছল, আমার খোঁজ পায়নি তাই এখানে আস্‌তে পারে নি। কিন্তু সে কথা সমাজ বিশ্বাস করতে চাইবে না, আমি তার পক্ষে ওকালতীও কর্‌ব না, কেবল আমি চাই আমার মত যারা এমন বিপদে প'ড়ে অনায়াসে সমাজের ভয়ে পতিপ্রাণাকে, সন্তানের জননীকে বিনা আপত্তিতে ত্যাগ করে, তারা নিজেরাই অন্যায়াচারী, তাদের সঙ্গে কোন যোগ না থাক্‌লেও আমি দুঃখিত হব না।"

ব্রাহ্মণমণ্ডলী রাগে কাঁপ্‌তে কাঁপ্‌তে বল্লেন, "কি এত বড় অপমান!—আমাদের সঙ্গে কোন যোগ রাখ্‌বেন না? আজ চোদ্দ পুরুষ তোমাদের এখানে বাস, তোমার মুখে এতবড় কথা! ঘেন্না ধরালে,—লেখাপড়া শিখে বুলি শিখেছ, লঘু-গুরু জ্ঞান সব চ'লে গেছে। যত সব নাস্তিক পাষণ্ড

সমাজে তৈরী হ'চ্ছে! চল হে, ওর ছায়া মাড়ানও উচিত নয়। বল্‌তে এলাম ভাল কথা তা উল্টে অপমান?—একটা প্রায়শ্চিত্ত কর্‌লেই হ'ত তা নয় যত ইংরাজী চাল!"

প্রবীণ দল উঠে যায় দেখে অরবিন্দ বল্‌লে, "আপনাদের অপমান আমি করিনি কিন্তু আপনারা বৃদ্ধ হ'য়ে আমার ঘরের স্ত্রীকে যে অপমান কর্‌তে এসেছিলেন আমার জীবন থাক্‌তে তা হবে না এইটুকুই কেবল আপনাদের বুঝিয়ে দিলাম। পরাণ রক্ষিত গরীব, সপরিবারে খৃষ্টান হ'য়ে গেছে, সে খবর রাখেন তো? হারাণ মণ্ডলের বিধবা মেয়েকে মুসলমানে নিয়ে গিয়ে নিকে করেছিল তাই সমাজ তাদের নেয় না; তারা সমাজের বাইরে আছে। এই ক'রে ক'রে ক্রমে হিন্দুসমাজ ধ্বংস হ'য়ে আস্‌ছে। তা যদি আজ দেখ্‌তে পেতেন, তবে বুঝ্‌তেন যে আর কিছুদিন পরে পূজার নৈবেদ্য যোগায় এমন হিন্দুও বাংলায় থাক্‌বে না।"

অরবিন্দের কথায় বৃদ্ধের দল কিছুমাত্র শান্ত না হ'য়ে ঘর ছেড়ে সব চ'লে গেলেন।

(ক্রমশঃ)

কেন্দ্রসমিতির কথা

কল্যাণী-সঙ্ঘ

সিংভূম জেলান্তর্গত চক্রধরপুর গ্রামের প্রবাসী বাঙ্গালী মহিলারা নিজেদের কল্যাণকামনায় "কল্যাণী-সঙ্ঘ" নামে একটি মহিলাসমিতি গঠন করিয়াছেন। উক্ত সঙ্ঘের নিমন্ত্রণে কেন্দ্র সমিতির প্রচারক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কামাখ্যা-চরণ শাস্ত্রী গত ২০শে জুলাই সেখানে যান। ২১শে জুলাই স্থানীয় ইণ্ডিয়ান্ ইন্‌ষ্টিটিউট হলে সঙ্ঘের উদ্যোগে মহিলাদের একটি সভা হয়। পণ্ডিত মহাশয় ম্যাজিক লণ্ঠন সহযোগে শরীরপালন, ব্যায়াম, শিশুকল্যাণ ও ধাত্রীবিদ্যা এবং ধ্রুবচরিত্র অবলম্বনে মাতৃত্বের আদর্শ সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। সঙ্ঘ একটি শিল্পবিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন এবং কেন্দ্র সমিতি তাঁহাদের শিল্পশিক্ষার জন্য একজন শিক্ষয়িত্রী নিযুক্ত করিয়াছেন।

বেলতলা বালিকাবিদ্যালয়ে বক্তৃতা

গত ২৬শে জুলাই বেলতলা বালিকাবিদ্যালয়ের ছাত্রী ও শিক্ষয়িত্রীদের একটি সভা হয়। কেন্দ্র সমিতির প্রচারক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কামাখ্যাচরণ শাস্ত্রী ও শ্রীযুক্ত ননীগোপাল গোস্বামী এম্‌-এ ম্যাজিক লণ্ঠন সহযোগে "নারীমঙ্গল প্রচেষ্টায় ছাত্রীদের কর্ত্তব্য" সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। প্রায় ৪০০ শতের বেশী ছাত্রী উপস্থিত ছিল।

ঢাকুরিয়া মহিলাসমিতি

গত ১লা আগষ্ট ঢাকুরিয়া মহিলাসমিতির একটি বিশেষ অধিবেশন হয়। স্থায়ী সভানেত্রীই সভানেত্রীত্ব করেন। কয়েকটি বালিকা উদ্বোধনসঙ্গীত করিয়া ব্যায়াম, স্কিপিং, পোলড্রিল, আবৃত্তি, ছোরা খেলা ও লাঠি খেলা প্রদর্শন করে। বালিকাগণ খুব ছোট ছোট হইলেও ক্রীড়াকার্য্যে খুব নিপুণতা প্রদর্শন করিয়াছে। কেন্দ্র সমিতির প্রচারক শ্রীযুক্ত ননীগোপাল গোস্বামী এম্‌-এ ম্যাজিক লণ্ঠন সহযোগে মহিলাসমিতির উপকারিতা, শিশু-কল্যাণ ও ধাত্রীবিদ্যা শিক্ষা সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন।

শ্রীনিকেতন মহিলাসমিতি

শ্রীনিকেতন পল্লীসেবা বিভাগের কর্তৃপক্ষ বাঁধগোড়া-গঞ্জ মহিলাসমিতি নামে মহিলাদের শিল্প-শিক্ষার জন্য একটি প্রতিষ্ঠান গঠন করিয়াছেন। তাহার সম্পাদিকা শ্রীযুক্তা ননীবালা রায় উক্ত সমিতিকে কেন্দ্র সমিতির অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন।

দেরাদূন মহিলাসমিতি

দেরাদূন-প্রবাসী বাঙ্গালী মহিলারা পরস্পর মিলন-কেন্দ্র রূপে দেরাদূনে একটি মহিলাসমিতি স্থাপন করিয়াছেন। সম্পাদিকা শ্রীমতী স্বর্ণপ্রতিমা রায় উক্ত সমিতিকে কেন্দ্র সমিতির অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন।

সরোজনলিনী শিল্পবিদ্যালয়ে চিত্রবিদ্যা শিক্ষার ব্যবস্থা

কলিকাতা সহরে যতগুলি শিল্পবিদ্যালয় আছে, বিশেষ করিয়া যে সকল বিদ্যালয়ে কেবল মাত্র মহিলারা নানাবিধ শিল্প শিক্ষা করেন, তাহার কোনটিতেই চিত্রণ বিদ্যা শিক্ষার বিশেষ বন্দোবস্ত থাকে না। ছাত্রীরা সেলাইয়ের কাজে বা আসন, কার্পেট প্রভৃতি বোনার কাজে, নূতন ঠাটের (design) জন্য মাথা ঘামাইতে শেখে না। কেবলমাত্র পূর্ব্বাবিষ্কৃত ঠাটেরই (design) পুনরাবৃত্তি করে। চিত্রণ-বিদ্যায় জ্ঞান না থাকায় এবং গোড়া হইতে এইরূপ নকলনবিশিতে হাত পাকাইয়া ফেলায় চির জীবনের জন্য নূতন কিছু গ্রহণ বা প্রকাশের ক্ষমতা প্রত্যেক ছাত্রীর ভিতর হইতে অন্তর্দ্ধান করে। শিক্ষাকাল (course) শেষ হইলে দেখা যায় যে ছাত্রীরা কেবল মাত্র পদ্ধতিটাই (technique) শিখিয়াছে, কিন্তু এই বহু সাধনালব্ধ পদ্ধতির প্রয়োগের দ্বারা নূতন কিছু করিবার ক্ষমতা পায় নাই। হয় কোন পুস্তক হইতে না হয় কোনও 'ঠাট' হইতে নকল করিয়া কাজ চালাইতে শিখিয়াছে। এই শিক্ষার কুফল সমস্ত জীবন ধরিয়াই প্রত্যেক ছাত্রীরই বহন করিয়া চলিতে হয়। সরোজনলিনী শিল্পবিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষীয়েরা এই বিষয়টির গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়াছেন। তাঁহারা একটি নূতন বিভাগ খুলিয়া যাহাতে প্রত্যেক ছাত্রী চিত্রবিদ্যায় পূর্ণজ্ঞান লাভ করিয়া, নিজেই প্রত্যেক জিনিষের 'ঠাট' (design) অঙ্কিত করিয়া লইতে শিখিতে পারে তাহার ব্যবস্থা করিয়াছেন। প্রতিভাবান শিল্পী শ্রীযুক্ত সুধাংশু-কুমার রায় চিত্রণ বিভাগের ভার গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার যেমন আধুনিক শিল্পে (modern art) গভীর পটুতা তেমনি বাংলার প্রাচীন লোকশিল্পের (folk art) জীবন্ত ধারার (living tradition) সহিতও পূর্ণ সংযোগ রহিয়াছে। তিনি বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে আল্পনা, দেয়াল-চিত্র (mural painting), বিভিন্ন পদ্ধতির বাংলার নিজস্ব লোককলা প্রভৃতি বিষয়েও শিক্ষাদান করিবেন।

সভাপতির সম্বর্দ্ধনা

সরোজনলিনী দত্ত নারীমঙ্গল সমিতির সভাপতি মাননীয় রাজা স্যার মন্মথনাথ রায় চৌধুরী বর্ত্তমান বর্ষে ইণ্ডিয়ান ফুটবল এসোসিয়েসনের সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। সর্ব্ববিধ জনসেবার কার্য্যে রাজা বাহাদুর বিশেষ খ্যাতিলাভ করিয়াছেন। বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সভাপতিরূপে নিরপেক্ষভাবে কার্য্য করিয়া তিনি সর্ব্বসাধারণের প্রিয় হইয়াছেন। গত ৮ই আগষ্ট তাঁহাকে সম্বর্দ্ধনা করিবার জন্য ইণ্ডিয়ান ফুটবল এসোসিয়েসনের আনুকুল্যে গ্রাণ্ড হোটেলে একটি ভোজ-সভার অনুষ্ঠান হইয়াছিল। রাজা বাহাদুরের এই নূতন সম্মানলাভে আমরা খুসী হইয়াছি।

কমিটির সদস্য

গত ২৪শে আগষ্ট তারিখে কেন্দ্র সমিতির পরিচালক-সভায় ৺চন্দ্রমাধব ঘোষ মহাশয়ের স্থলে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ বিভিন্ন কমিটির সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন :—

পরিচালক-সভায় সদস্য—কুমার শ্রীযুক্ত হিরণ্যকুমার মিত্র।

স্কুল কমিটির সদস্য শ্রীযুক্তা মৃণ্ময়ী রায়।

অভিনয় কমিটির সম্পাদক—মিঃ টি, সি, বোস।

বঙ্গলক্ষ্মী পরিচালন কমিটি

নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ "বঙ্গলক্ষ্মী" পরিচালন কমিটির সদস্য হইয়াছেন :—শ্রীযুক্তা হেমলতা দেবী (সভানেত্রী), শ্রীযুক্ত মনোজ বসু (সম্পাদক), ডাঃ শ্রীযুক্ত পঞ্চানন নিয়োগী এম, এ, পি, এইচ, ডি, পি, আর, এস, শ্রীযুক্তা দীপ্তি দেবী, বি, এ, বি, টি, শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন ভট্টাচার্য্য এম, এ, বি, এল, ডাঃ শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র রায় এল, এম, এস।

চন্দ্রমাধব ঘোষ স্মৃতি তহবিল

চন্দ্রমাধব ঘোষ স্মৃতি-তহবিলে এ যাবৎ নিম্নলিখিত দান পাওয়া গিয়াছে :—

১। মিঃ এন্, বক্সী ৫০৲
২। ডাঃ এইচ, এন, রায় ১০৲
৩। শ্রীযুক্ত মনোজ বসু ৫৲
৪। শ্রীযুক্তা হেমলতা দেবী ৫৲
৫। শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র পাল ২৲
৬। শ্রীযুক্তা মাতঙ্গিনী রায় ২৲
৭। শ্রীযুক্তা সুহাসিনী চৌধুরী ১৲
৮। শ্রীযুক্ত অনিলচন্দ্র গুপ্ত ২৲

নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণের নিকট হইতে দানের প্রতিশ্রুতি পাওয়া গিয়াছে :—

১। জনৈক বন্ধু ১০০৲
২। শ্রীযুক্ত গুরুসদয় দত্ত ১০০৲
৩। মিঃ কে, সি, রায় চৌধুরী ১০০৲
৪। চন্দ্রমাধব বাবুর বন্ধু ও আত্মীয়বর্গ ১০০৲
৫। শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ বক্সী ৫০৲
৬। রায় বাহাদুর অবিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত বৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ৩০৲
৭। শ্রীযুক্তা নীরজবাসিনী সোম ২৫৲
৮। মিঃ এইচ, কে, দে, বার-এট্-ল ১৫৲
৯। রায় বাহাদুর আই, এস, মুখার্জ্জি ১৫৲
১০। মিঃ টি, সি, বোস ৫৲
১১। শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার ৫৲
১২। মিসেস ফাজিতুলনেসা জোহা ৫৲
১৩। শ্রীযুক্ত মাণিকলাল দে ৫৲
১৪। ডাঃ পঞ্চানন নিয়োগী পি, এইচ, ডি ১০৲

১৫। শ্রীযুক্ত জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ ২৲

১৬। জনৈক বন্ধু ২৲

১৭। শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন ভট্টাচার্য্য ২৲

চন্দ্রমাধব বাবুর অনেক পরিচিত বন্ধুবান্ধব আছেন। তাঁহাদের সকলের নিকট উপস্থিত হওয়া সম্ভব নহে। তাঁহার স্মৃতি-ভাণ্ডারে কেহ কিছু দিবার ইচ্ছুক হইলে চন্দ্রমাধব স্মৃতি-তহবিলের সম্পাদক মিঃ টি, সি, বোসের নিকট পাঠাইতে হইবে।

স্থান পরিবর্ত্তন

সরোজনলিনী নারীমঙ্গল সমিতির কার্য্যালয় ও নারী শিল্প শিক্ষালয় আগামী ১লা অক্টোবর হইতে ৪৫নং বেনিয়া টোলা লেনের বাড়ী ছাড়িয়া ৬০ বি, মির্জাপুর ষ্ট্রীটে যাইবে। বর্ত্তমান গৃহে স্থানাভাব হওয়ায় কর্ত্তৃপক্ষ কিছুদিন যাবৎ বৃহত্তর গৃহের অনুসন্ধান করিতেছিলেন। নূতন বাড়ীতে বর্ত্তমান বাড়ীর অপেক্ষা তিনগুণ স্থান আছে।

Printed by A. C. Sirkar at the Classic Press. 9-3 Ramanath Majumdar Street Calcutta.
and published by him, at 45 Beniatola Lane, Calcutta.

ঋষি-কন্যা

শিল্পী : শ্রীনরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী

Printed by C. H. Aran & Co.

"বাঁচ্‌লে সবাই তবেই বাঁচি,—
সবার ভালো তাই ত' যাচি।"

৭ম বর্ষ] আশ্বিন, ১৩৩৯ [১১শ সংখ্যা

আহ্নিকী

শ্রী প্রিয়ম্বদা দেবী বি-এ

এই যে প্রকৃতিকে আমি এত ভালবাসি, দুঃখ-বেদনায় একান্ত পীড়িত হ'য়ে যখন তার কাছে সান্ত্বনা যাচ্ঞা করে' আসি, তখন পূর্ণ সান্ত্বনা তো পাই না।

জলভরা চোখের সম্মুখে, বিশ্বের প্রকাশ আব্‌ছায়া হ'য়ে আসে—যে মুখ দেখ্‌তে ব্যাকুল হই, তা' দেখ্‌তে পাই না।...এস আমার সুন্দর, অশ্রুজলের অন্তরাল দূর করে' দিয়ে, সব ঘোম্‌টা, পর্দ্দার আড়াল ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করে' প্রকাশিত হও। বৃষ্টিধৌত, শ্যাম-স্নিগ্ধ, উজ্জ্বল সূর্য্যকরপ্লাবিত দিনের মত, নয়ন-মন হরণ করে' নাও! অধিকার করে' বস, একেবারে আচ্ছন্ন কর,—তোমার বাহিরে যেন কিছুই থাকে না।

থাকুক্ আমার বুক ভরে' অধীর দুঃখ, অনেক দুঃখ, কেবলি দুঃখ,—ওগো প্রভু, সেই তো আমার প্রাণের চেতনা, প্রেমের আনন্দ। মুখ আমার মৌন হয়েই থাকুক্, অন্তর আমার যেন ভাষার উচ্ছ্বাসে নিরন্তর উদ্বেলিত হ'তে থাকে। অন্তর্দৃষ্টি প্রেমের অবিরাম লীলার মধ্যে আপনাকে নিমগ্ন করে' দেবতার মত অনিমেষ চিরচৈতন্য লাভ করুক্।

প্রাণ আমার অধীর হ'য়ে কাঁপ্‌ছে কেন? কোথা হ'তে তোমার স্পর্শ আমার অন্তরে প্রবেশ কর্‌ল? মন দেখে বলেই তো চোখে দৃষ্টি আসে; আজ আমার মন যে শুধুই দেখায় ভরে' আছে।

কিছুই নাই; যে প্রত্যক্ষ আমাদের সবই আচ্ছন্ন করে' রাখে, তার দিক দিয়ে হিসাব করে' দেখ্‌তে গেলে এটা বড় দুর্ভাগ্য মনে হ'তে পারে, কিন্তু দেশকালের বাহিরে যে গণনা, যেখানে মানুষ কারো নয়, কেবল অন্তহীন দেশকালের যাত্রী, তার পক্ষে এ যে মুক্তির পরমানন্দ! যে মানুষকে পদব্রজে সুদূর তীর্থযাত্রা করতে হবে, তার ভার যত কম হ'য়ে যায় ততই ভাল।

অন্তরের নিরন্তর ব্যথা এ যে প্রভু তোমারি নৈবেদ্য—একে গ্রহণ করে' সার্থক কর। স্তবগান গাইব সে ভাষা আর নাই,—সে যে আনন্দের প্রকাশ। কোথায় পাব আলো প্রভু, কে আমায় ধূপ দীপ ফুল চন্দন সুগন্ধ দেবে? সবই যে দগ্ধ হ'য়ে গেছে, সমস্তই নিঃশেষে শুষ্ক,—আছে শুধু নিয়ত চোখের জলে ধোয়া মনের ব্যথা, তাই হোক্ পূজার উপাদান।

মন বিদ্রোহী হ'চ্ছে, বল্‌ছে, পৃথিবীতে এত দুঃখের কি আবশ্যকতা ছিল? দুর্ব্বলশক্তি ক্ষীণ মানুষ—তা'কে নিয়ে এ কি খেলা? এ যে কণ্টক-পথে নিরন্তর যাত্রা...এই যে বেদনার সমষ্টি, এ কি কখনো প্রেমের দান, দয়াল ঠাকুরের বিধান হ'তে পারে? অশান্ত মন আজ রক্তপতাকা তুলে বল্‌ছে—যুদ্ধং দেহি।

যে প্রেম ক্ষণভঙ্গুর নয়, যে প্রেম অমৃতের প্রয়াসী, যে প্রেম তুচ্ছ মানবসমাজের সমস্ত বিধানের ঊর্দ্ধে, সেই অবিনশ্বর আনন্দ এবার যেন জীবনপাথেয় হয়। প্রেম যে পঙ্কজেরি মত সম্পূর্ণ, অনুপম ও সুন্দর—পূজার শ্রেষ্ঠ উপাদান।

মানুষ তার সীমাগত স্বার্থাকুল দৃষ্টিতে কত-টুকুই বা দেখ্‌তে পায়?
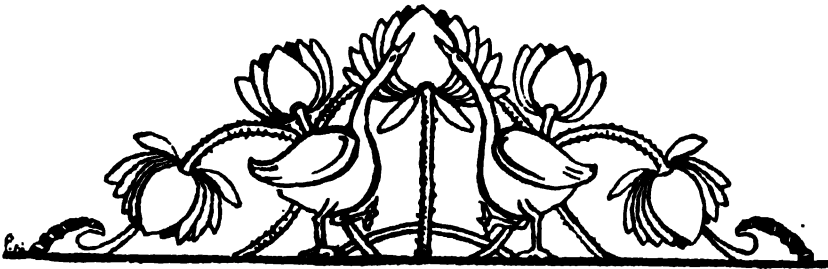
সেকালের কথা

পোষাক-পরিচ্ছদ

রায় শ্রী জলধর সেন বাহাদুর

এবার সেকালের পোষাক-পরিচ্ছদের কথা বলি। এ কথাটা আগেই ব'লে রাখ্ছি যে, আমার সেকালের কথা সহর নগরের কথা নয়; যে সময়ের কথা বল্ছি, তখন সহর নগর দেখিনি বল্লেই হয়। অবশ্য, ছেলেবেলায় একবার কলিকাতায় এসেছিলাম—বেড়াতে নয়, চক্ষুরোগের চিকিৎসা করতে। সে কথা পূর্ব্বের একটা প্রস্তাবে 'বঙ্গলক্ষ্মী'র পাঠক-পাঠিকাগণের কাছে নিবেদন করেছি। একে ছেলেমানুষ, তাতে চক্ষুরোগে কাতর; কাজেই সে সময় কলিকাতা সহরের লোকের পোষাক-পরিচ্ছদ দেখে থাকলেও সে সম্বন্ধে এতকাল পরে একটা স্পষ্ট ধারণা করতে পারব না; সে নিতান্তই শোনা কথা বা পড়া-কথা হ'য়ে পড়বে। আমি যাদের পোষাক-পরিচ্ছদের কথা বলব, তারা সবাই পাড়াগাঁয়ের লোক এবং তাদের মধ্যে রাজা মহারাজা নেই, এমন কি খুব বড় দরের জমিদারও নেই, এ কথা এখানেই নিবেদন ক'রে রাখ্ছি। পয়সাওয়ালা লোক আমাদের অঞ্চলে সেকালে ছিলেন বই কি; কিন্তু তাঁরা সবাই মহাজন—ব্যবসায়ী লোক। পয়সা থাকলেও তাঁদের চা'ল-চলনে, আচার ব্যবহারে, পোষাক-পরিচ্ছদে কোনরকম ব্যয়বাহুল্য হবার যো ছিল না; তাঁরা সাধারণ মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকের মতই জীবন যাপন করতেন। অনেকে আবার তাও করতেন না, অতি দরিদ্রের মত থাকতেন। তাঁদের দেখলে, তাঁদের চা'ল-চলন, পোষাক পরিচ্ছদ দেখলে কেউ ভাবতেই পারতেন না যে, তাঁদের ঘরে দশ কুড়ি হাজার টাকা আছে, বা তাঁদের ব্যবসায়ে ঐ পরিমাণ, কি তার চাইতেও বেশী টাকা খাটে। অর্থাৎ সে সময় জমিদার শ্রেণী ছাড়া অপর কারও বিলাস-ব্যসনের দিকে দৃষ্টিই ছিল না, অনাড়ম্বর ভাবেই জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করাই তাঁদের রীতি ছিল। সুতরাং, সেকালের লোকের পোষাক-পরিচ্ছদের কথা বলতে গিয়ে সাধারণ গৃহস্থ মানুষের কথাই বলব।

সাধারণতঃ সেকালের লোকে ধুতি আর চাদরই ব্যবহার করতেন। আমরা যখন সাত-আট বছরের তখনও বিলাতী কাপড়ের আমদানী আমাদের দেশের হাটে-বাজারে খুব কমই দেখেছি; তাঁতের কাপড়েরই তখন বেশী প্রচলন ছিল। জোলা আর তাঁতিরাই এই সব ধুতি চাদর তাঁতে বুনত। আমরা ছেলেবেলায় দেখেছি, আমাদের সামান্য পল্লীতেই ত্রিশ-চল্লিশ ঘর তাঁতি ছিল। তাদের প্রত্যেকের বাড়ীতেই তাঁত ছিল; বাড়ীর সমর্থ লোকের হিসাবেই প্রতি বাড়ীতে তাঁতের সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট ছিল। আমাদের গ্রামেই একটা পাড়া ছিল; তার নাম তাঁতিপাড়া। আর সে পাড়ায় যে কত লোক ছিল, তারা যে কি আনন্দে তাঁত চালাতো, তাদের অবস্থা যে কত স্বচ্ছল ছিল, এখন তা মনে করলেও চোখে জল আসে। সে তাঁতিপাড়া এখন জনশূন্য; এখন আমাদের গ্রামে তাঁত নেই বললেই হয়। বিদেশী কাপড়-চোপড়ের প্রতিযোগিতায় টিকতে না পেরে তাঁতি-বংশ, বলতে গেলে, একেবারেই লোপ পেয়েছে। তবে, এখনও কোন কোন জেলার বিশেষ বিশেষ স্থানে তাঁতের কাপড় হয়; শান্তিপুর, ফরাসডাঙ্গা, চন্দ্রকোণায় অনেক তাঁত চলে; ঢাকাতেও তাঁতের অস্তিত্ব লোপ হয় নাই। এই কিছুদিন আগে আমি মেদিনীপুর জেলার একটা গ্রামে গিয়েছিলাম। গ্রামের নাম আনন্দপুর। সেখানকার অধিবাসীদের পনর আনাই তন্তুবায়। আর তাঁদের সকলের বাড়ীতেই তাঁত আছে; বাড়ীর মেয়েরা পর্য্যন্ত তাঁতের কাজের সাহায্য করেন। সমস্ত গ্রামখানি ঘুরে দেখে আমাকে বলতেই হোলো যে গ্রামের নাম আনন্দপুর রাখা ঠিকই হয়েছে। গ্রামের লোকেরা বললেন, এখন আর কি আছে, এমন সময় ছিল, যখন এই গ্রামে দশ হাজার তাঁত চলতো—তার সঙ্গে তুলনায় এখন ত কিছুই নেই। কথাটা শুনে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলতে হোলো। দিশী বস্ত্রের এমনই দুর্দ্দশা হয়েছে।

কিন্তু, সে দুঃখের কথা যাক্। তবে, এ কথাগুলো যে 'ধান ভানতে শিবের গীত' নয়, এ কথা সকলেই স্বীকার কর্‌বেন।

বলেছি, সাধারণ লোকে গ্রীষ্মকালে ধুতি আর চাদরই ব্যবহার কর্‌তেন। সে চাদরও কেহ বড় একটা, খুলে গায়ে দিতেন না; চাদর পাট ক'রে কাঁধের উপর ফেলে রাখা হোতো। অনাবৃত দেহ তখন অসভ্যতাসূচক ছিল না। কেহ কেহ গ্রীষ্মকালেও হাতকাটা বেনিয়ান ব্যবহার কর্‌তেন, কিন্তু তাঁদের সংখ্যা খুবই কম ছিল। শীতকালে মোটা জোলার চাদর দিয়েই প্রায় সকলের শীত নিবারণ হোতো। ওরই মধ্যে যাঁরা একটু অবস্থাপন্ন তাঁরা অন্য সময় মোটা চাদরই ব্যবহার কর্‌তেন; কোন স্থানে নিমন্ত্রণ-আদিতে যেতে হ'লে শাল ও জামিয়ার ব্যবহার কর্‌তেন; বালাপোষ অতি সৌখীন গাত্রবস্ত্র ছিল। শাল জামিয়ার বালাপোষই হোক্ আর মোটা চাদরই হোক্, তার সঙ্গে সকলেই একখানি অন্য চাদর জুড়ে নিতেন। যাদের ঘরে শাল কি জামিয়ার থাকৃত, তাদের পদস্থ ব'লে সম্মান করা হোতো, কারণ শাল জমিয়ার ঘরে থাকা বনিয়াদী বড়-মানুষের চিহ্ন বলেই তখনকার লোকে মনে কর্‌ত। ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতেরা বেনিয়ান ব্যবহারই কর্‌তেন না, কাটা-কাপড় পরিধান করা তাঁরা অহিন্দু-জ্ঞাপক ব'লে মনে কর্‌তেন; তাঁরা শীতকালে লাল বনাত ব্যবহার কর্‌তেন, গ্রীষ্মকালে সেই ধুতি আর চাদর। গামোছা এখন স্নানাগারে স্থান পেয়েছে, সেকালে তা ছিল না; সকলেই সর্ব্বত্রই গামোছা ব্যবহার কর্‌তেন; কোথাও যেতে হ'লেও সকলের সঙ্গেই একখানি গামোছা থাকৃত; অপরের ব্যবহৃত গামোছা কেহ ব্যবহার কর্‌তেন না।

তখন জুতার ভদ্রতাসঙ্গত নাম ছিল বিনামা; কেহ কেহ পাদুকা শব্দও ব্যবহার কর্‌তেন। পাদুকা কথাটার অর্থবোধ হয়, কিন্তু জুতার কেন যে 'বিনামা' নামকরণ হয়েছিল, তা আমি বল্‌তে পারিনে, পাঠক-পাঠিকাগণ শব্দ-এ।বদ্‌গণের কাছে এ তথ্য জিজ্ঞাসা কর্‌বেন। এই পাদুকা, বা বিনামা, বা জুতার প্রচলন খুব বেশী ছিল না। অনেকেই নগ্নপদেই চলাফেরা কর্‌তেন। শীতকালেই যা একটু জুতা চল্‌ত, তাও চটি এবং নাগরা জুতা। তখন পথ-ঘাট এমন সুগম ছিল না, বাঁধা রাস্তা অতি কমই ছিল; মাঠের মধ্যে জমির আলের উপর দিয়েই চলাফেরা কর্‌তে হোতো। গ্রামের মধ্যে যে সব রাস্তা ছিল, তাও বর্ষার সময় জলকাদায় পূর্ণ থাকৃত। কাজেই যিনি সে অবস্থাতেও সখ ক'রে জুতা চালাতেন, তাঁকে সারা পথই বল্‌তে গেলে জুতা হাতে নিয়েই চল্‌তে হোতো, পায়ে দেবার অবকাশ অতি কমই মিল্‌তো। সুতরাং নগ্নপদ তখন লজ্জার কারণ ছিল না। সেকালে বাড়ীতে অনেকেই কাঠের খড়ম ব্যবহার কর্‌তেন। মধ্যে কিছুদিন খড়মের ব্যবহার উঠেই গিয়েছিল; এখন ফিতে বাঁধা খড়ম চল্‌তি হয়েছে। রুমাল নামক ক্ষুদ্র বস্ত্রখণ্ডের অস্তিত্বই তখন ছিল কিনা সন্দেহ। আর মোজা বা ষ্টকিন—ও দ্রব্য আমরা ছেলেবেলায় চোখেও দেখিনি—জুতারই তেমন প্রচলন ছিল না, ষ্টকিন পায়ে দেবে কি ক'রে। আমরা একটু বড় হ'লে নানা রঙ্গের ছাপা দোলাই ব্যবহার করেছি। আরও একটা জিনিস তখন দেখেছিলাম; তাকে আমরা বল্‌তাম বোট্ কেলাট্; যাঁরা ইংরাজীনবীশ ছিলেন, তাঁরা কথাটা শুদ্ধ ক'রে বলতেন বোট্-ক্লথ্ (Boat cloth); বোধ হয় নাবিকেরা ব্যবহারের সুবিধার জন্য বকলস লাগানো ঐ গাত্রবস্ত্র ব্যবহার কর্‌তেন।

এ সব ত গেল পুরুষের পোষাক। মেয়েদের সেকালে জামা সেমিজ ব্লাউজ প্রভৃতি বিলাতী-নামধারী গাত্রাবরণের ব্যবহার দেখিনি। মুসলমান বড়ঘরাণা মেয়েরা না কি পেশোয়াজ ব্যবহার কর্‌তেন শুনেছি, দেখ্‌বার সৌভাগ্য কখনও হয় নাই। মেয়েরা জোলার ব তাঁতির দশ হাত লম্বা শাড়ী পর্‌তেন, আর কিছু না। যাঁদের অবস্থা ভাল, তাঁদের মেয়েরা ঢাকাই শাড়ী, ফরাসডাঙ্গা, শান্তিপুরে ডুরে শাড়ী ব্যবহার কর্‌তেন; অতি ভাগ্যবানের গৃহলক্ষ্মীরা বেনারসী পর্‌তেন ক্বচিৎ কদাচিৎ। ঐ মহামূল্য বস্ত্র অতি কম লোকের ঘরেই পাওয়া যেত। মেয়েরা তখন ঐ দশ-হাতী শাড়ীই এমন ঘুরিয়ে ফিরিয়ে আঁটশাট ক'রে পর্‌তেন যে, তাঁদের অঙ্গের কোন অংশই অনাবৃত থাকৃত না এবং শ্লীলতাহীন ব'লেও মনে হোতো না। এখন কিন্তু হয়। বোধ হয় চোখের দোষই ইহার কারণ; আমার মত বৃদ্ধের ত ইহাই মনে হয়। এতদ্বারা কেউ মনে কর্‌বেন না যে, আমি এখনকার মেয়েদের উনকুটি চৌষট্টি রকম বেশের নিন্দা কর্‌ছি। তা মোটেই নয়। সময়ের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে আর-সবেরও যখন পরিবর্ত্তন হ'চ্ছে, তখন পোষাক-পরিচ্ছদেরই বা পরিবর্ত্তন হবে না কেন? ভদ্রতার মাপকাঠি কি সকল কালেই সমান থাকে। তখন 'বাবু' বল্‌তে যা বুঝাতো এখন তা বোঝায় না—এখন বাবু অর্থেই খোষ-পোষাকী বুঝ্‌তে হবে—অর্থাৎ যাকে বলে 'কাপুড়ে বাবু।'

'আজ এখানেই 'নটে গাছটি মুড়ালো'।

নবপত্রিকার উৎসব

কুমারী ছায়া দেবী

দুর্গাপ্রতিমা পূজা বাঙলার বিশেষত্ব। বাঙলার বাহিরে এভাবে প্রতিমা গঠন করিয়া জাঁকজমক সহকারে পূজা কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহা বাঙলার ও বাঙালীর নিজস্ব সৃষ্টি। কিন্তু বাঙলার বাহিরেও এই শরৎকালে একটি উৎসব সকল প্রদেশে সকল সম্প্রদায়ের ভিতর হইয়া থাকে—তাহা হইল নবরাত্রির উৎসব। ভারতবর্ষের প্রত্যেক প্রদেশের দশকর্ম্মান্বিত হিন্দু মাত্রেরই গৃহে আশ্বিনের শুক্লা প্রতিপদ হইতে নবমী তিথির শেষ যাম পর্য্যন্ত এই নয় রাত্রের জন্য চণ্ডিকার ঘট স্থাপিত হয়; দেবীর পূজা ও মার্কণ্ডেয় চণ্ডীপাঠ হইয়া থাকে। সৌর, গাণপত্য, শৈব, এমন কি রামানুজাচার্য্যীয়, বল্লভাচার্য্যীয়, নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণও নবরাত্রের ব্রত এবং উৎসব করিয়া থাকেন। দেবীর মৃণ্ময়ী মূর্ত্তি গঠন করিয়া কোথাও পূজা হয় না; সর্ব্বত্রই 'ঘটে' দেবীর পূজা হইয়া থাকে। ভারতবর্ষের সকল প্রদেশের হিন্দু গৃহস্থের ধারণা যে, নবরাত্রের সময় গৃহে চণ্ডীপাঠ না করিলে অমঙ্গল ঘটে। কাশ্মীর, কান্যকুব্জ, মিথিলা এবং বাঙলার শাক্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে নবরাত্রের উৎসবের একটা বৈশিষ্ট্য আছে। দেবী যে দেশে যে নামে পরিচিতা সেই দেশের নবরাত্রির উৎসব শাক্তগণের মধ্যে সেই দেবীর নামে পরিচিতা।

সাধারণ লোকের ধারণা আছে যে দুর্গোৎসব বসন্তকালে হইত; রামচন্দ্র রাবণবধের সময় শরৎকালে দুর্গাপূজা করিয়াছিলেন। ইহা একটি সম্পূর্ণ ভুল ধারণা। রামচন্দ্র যে শরৎকালে দুর্গাপূজা করিয়াছিলেন তাহা কোন্ প্রাচীন পুস্তকে আছে? বাল্মীকির রামায়ণে রাবণবধের পূর্ব্বে দুর্গাপূজার কোন উল্লেখ নাই; কুম্ভকোণমের ছাপান রামায়ণে নাই, তুলসীদাসের রামায়ণে নাই—আছে কেবল একমাত্র কৃত্তিবাসে। মূল গ্রন্থপাঠের অভাবে অশিক্ষিত কথকওয়ালাদের নিকট হইতে এই ভুল সংস্কার সাধারণের ভিতর স্থান পাইয়াছে।

বর্ত্তমান দুর্গোৎসব বেশী দিনের নয়। শ্রীশ্রীচণ্ডী অপেক্ষাকৃত আধুনিক পুস্তক। তাহাতে দেখিতে পাওয়া যায় মেধস ঋষির কথা শুনিয়া সুরথ রাজা মাটির মূর্ত্তি গড়িয়া পূজা করিতে আরম্ভ করেন। পুস্তকে আছে সুরথ রাজা তিন বৎসর পূজা করিয়াছিলেন। এইস্থানে প্রথম মূর্ত্তির কথা দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু সে মূর্ত্তি যে কি তাহা ঋষি বলেন নাই। সে মূর্ত্তি দ্বিভুজা, কি চতুর্ভুজা, কি দশভুজা, কি অষ্টাদশভুজা; সে মূর্ত্তির সহিত লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্ত্তিক, গণেশ থাকিতেন কি না তাহা আমরা জানি না। কিন্তু এইস্থানেই প্রথম শারদীয় পূজার কথা দেখিতে পাই। চণ্ডীতে দেখিতে পাই দেবী স্বয়ং বলিতেছেন, "শরৎকালে মহাপূজা ক্রিয়তে যা চ বার্ষিকী।" তিনি আরও বলিতেছেন, "বৎসরের মধ্যে একবার করিয়া পুষ্প, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য দিয়া পূজা করিলে আমার প্রীতি হয়।"

দুর্গাপূজার আসল পরিচয় অনেকেই জানে না। দুর্গাপূজার প্রধান কার্য্য হইল "নবপত্রিকার" পূজা। নবপত্রিকাপূজাই হইল শারদোৎসব। প্রাচীন কালে নানা উৎসব হইত। ঋতু-পরিবর্ত্তনের সময় প্রাচীনকালে মানব একটা না একটা উৎসব করিত। যখন ভাল ঋতু আসিত তখন উৎসবের মাত্রাটাও বৃদ্ধি পাইত। বর্ষা আর্দ্র ঋতু। এ সময় লোকের নানা কষ্ট। পথ-ঘাট সব ভাল নয়, সেজন্য এক গ্রাম হইতে অন্য গ্রামে যাওয়া কষ্টকর হইত। আহারাদিও তেমন পাওয়া যাইত না। সদাসর্ব্বদা বৃষ্টির জন্য লোকের মন ও মেজাজও ভাল থাকিত না। বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ বিহার হইতে বাহির হইতেন না; ব্রাহ্মণদের মতে নারায়ণ এ সময় শুইয়া থাকেন। তারপর আর্দ্র ঋতু বর্ষা যাইয়া উজ্জ্বল শরৎ আসিল। আকাশ পরিষ্কার

হইল ; মানুষ সূর্য্যদেবের মুখ দেখিল ; দেহে বল পাইল ; মনে আনন্দ ও প্রাণে সাহস আসিল। পথ-ঘাট ভাল হইল ; গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে লোকের আনাগোনা চলিল। এই সময় লোকের মনে উৎসব করিবার বাসনা হওয়াও স্বাভাবিক।

কিন্তু কি লইয়া কৃষিপ্রধান দেশের চাষাড়ে জাত উৎসব করিবে! তখন তো আর প্রতিমা ছিল না ; অতএব সকল দেশেই লতা-পাতা লইয়া উৎসব হইত। এদেশেও গাছপালা লইয়া উৎসব আরম্ভ হইল। বর্ষার পর গাছপালারও শোভা এবং অবয়ব বৃদ্ধি পাইয়াছে। সেই সব গাছপালা লইয়া উৎসব করা সহজ। এই উৎসব হইল নবপত্রিকার উৎসব। নয়টি লতাপাতা লইয়া নবপত্রিকা—কলা গাছ, শুঁড়িকুচুর গাছ, হলুদ গাছ, জয়ন্তীর ডাল, বেলের ডাল, দাড়িম গাছ, অশোকের ডাল, মানকচুর গাছ ও ধানের গাছ। এই নয়টি হইল নবপত্রিকা এবং যাহাকে চলিত কথায় বলে "কলা-বৌ"। অনেকে 'কলা বৌ'সম্বন্ধে কিছু জানে না ; সাধারণের ধারণা 'কলা-বৌ' গণেশের স্ত্রী। কিন্তু উহা ভুল ধারণা ; স্ত্রী হইলে বামে থাকিত, দক্ষিণে বসিত না। আসলে 'কলা-বৌ' হইল নবপত্রিকা। পূর্ব্বেই বলিয়াছি দুর্গোৎসবের প্রথম ও প্রধান কার্য্য হইল নবপত্রিকা-পূজা। শরৎকালে এই নয়টি গাছের খুব পাতা বাহির হয়। শরৎকাল ছাড়া অন্য ঋতুতে এই নবপত্রিকার অনেক গাছ পাওয়া যায় না। যাঁহারা বাসন্তী পূজা করেন তাঁহারা জানেন নবপত্রিকা সংগ্রহ করিতে কিরূপ কষ্ট পাইতে হয়। দুর্গার যেমন অধিবাস করিতে হয়, তেমনি এই নয়টি গাছেরও অধিবাস করিতে হয়। অধিবাস হইয়া গেলে তখন এই নয়টি গাছ নয়টি দেবতা হইয়া যান। কলাগাছ হন ব্রহ্মাণী ; কচু হন কালিকা ; হরিদ্রা হন দুর্গা ; জয়ন্তী হন কার্ত্তিকী ; বেল হন শিবা ; দাড়িম হন রক্তদন্তিকা; অশোক হন শোকরহিতা ; মানকচু হন চামুণ্ডা ; আর ধান হন লক্ষ্মী।

নবপত্রিকার স্নান একটি বিরাট ব্যাপার। সাধারণে উহাকে "কলা-বৌ" নাওয়ান বলে। সপ্তমীর দিন প্রত্যুষে পূজার সর্ব্বপ্রথম কাজ নবপত্রিকার স্নান। নানা বাদ্য বাজাইয়া নবপত্রিকা ঘাটে লইয়া যাইতে হয়। দুর্গোৎসবের প্রথম ও প্রধান অঙ্গ—স্নান : প্রথম নবপত্রিকার স্নান, তাহার পর দেবীর স্নান। দুর্গোৎসব হইল রণ-চণ্ডীর পূজা ; এ পূজায় বংশীরব হইবে না, সমরসময়োপযোগী ঢাক ঢোল কাড়া নকরা বাজাইতে হয়, নচেৎ ভাববিপর্য্যয় ঘটিবে। ঘাটে প্রত্যেক দেবতাকে স্বতন্ত্র মন্ত্র পড়িয়া স্নান করাইতে হয়। রাজার অভিষেকে যেমন নানান জলের প্রয়োজন হয় তেমনি নবপত্রিকার স্নানেও নানান জলের প্রয়োজন হয়। ধনী ব্যক্তি ব্যতীত দুর্গোৎসব কেহ করিতে পারে না ; কারণ ইহাতে বহু ব্যয়। ইহা ছাড়া উগ্রচণ্ডা, প্রচণ্ডা, চামুণ্ডা, চণ্ডোগ্রা, চণ্ডনায়িকা, কাত্যায়নী, ভগবতী, ব্রহ্মাণী, মাহেশ্বরী, বৈষ্ণবী, নারসিংহী, ডাকিনী, শাকিনী এ সকল দেবীরও স্নান করাইতে হয়। ইঁহাদের স্নানের দ্রব্য স্বতন্ত্র। ইহার পর আটটি ঘাটের জলে নবপত্রিকাকে স্নান করাইতে হয় এবং সে সময় নানান রাগে বাজনা বাজাইতে হয়। নবপত্রিকার যে নয়টি দেবী আছেন তাঁহাদের তিন দিনই ষোড়শোপচারে পূজা করিতে হয়। কেবল মানকচুর যে দেবতা "চামুণ্ডা", তাঁহার একটা বিশেষ পূজা আছে—তাহার নাম "সন্ধিপূজা"। সন্ধিপূজায় অন্য কোন দেবতার অধিকার নাই, কেবল চামুণ্ডারই অধিকার। দেবীর বিসর্জ্জন হইয়া গেলে স্বতন্ত্রভাবে নবপত্রিকার বিসর্জ্জন হয়। প্রথমে নবপত্রিকার পূজা বা উৎসব আরম্ভ হয়। কালক্রমে যখন মূর্ত্তি-পূজা আরম্ভ হইল তখন নবপত্রিকার পূজা পরিত্যক্ত না হইয়া সঙ্গে জুড়িয়া গিয়াছে।

দুর্গাপ্রতিমার সহিত দুর্গা-আরাধনা এবং পূজার খুব অল্প সম্বন্ধ। দুর্গাপ্রতিমার বহু পরিবর্ত্তন হইয়াছে। এক সিংহবাহিনী মূর্ত্তিরই যে কত পরিবর্ত্তন হইয়াছে তাহা বলা যায় না। প্রথমতঃ সিংহবাহিনী মূর্ত্তি দ্বিভুজা, তারপর চতুর্ভুজা, অষ্টভুজা, দশভুজা এবং শেষে অষ্টাদশভুজায় পরিণত হয়। বাঙলা দেশে সাধারণতঃ দশভুজার প্রতিমা গড়াইয়া পূজা করা হয়। ইহা ছাড়া অনেকে নিজ মনোমত প্রতিমা গড়িয়া পূজা করেন, যথা শিব দুর্গা ইত্যাদি। দেবী পূর্ব্বে সিংহবাহিনী ছিলেন। সে সিংহবাহিনীর সিংহ এখনকার আফ্রিকান্ সিংহের নকল ছিল না। সে সিংহের ছিল ঘাড় খুব লম্বা, মুখখানা কতকটা ঘোড়ার মতন কতকটা

মকরের মতন, সাদা, রোগা ও লম্বা। অন্যান্য স্থানের সিংহবাহিনী মূর্ত্তিতে অবশ্য অন্যপ্রকারের সিংহমূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। পূর্ব্বে সিংহবাহিনীকে মহিষাসুর-মর্দ্দিনী মূর্ত্তিতে দেখিতে পাওয়া যাইত। লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্ত্তিক, গণেশ কিছুই থাকিত না—কেবল সিংহবাহিনী ও মহিষাসুর।

বাঙলা দেশের বর্ত্তমান দুর্গাপ্রতিমা কে প্রথম গঠন করিয়াছিলেন তাহার সঠিক ইতিহাস আজও অজ্ঞাত। বাঙলা দুর্গাপ্রতিমার ভিতর অনেক ভাববিপর্য্যয় আছে। শিল্পের দিক্ দিয়া দুর্গাপ্রতিমা তদানীন্তন বাঙালী জাতির শ্রেষ্ঠ পরাকাষ্ঠা। বাঙলার দুর্গাপ্রতিমায় একটি বিষয় বিশেষ দৃষ্টি করিবার আছে—"বক্র-কটি" বা Three block system। বাঙলা দেশের সমস্ত দেবদেবীর ভিতর কেবলমাত্র দুর্গা ও শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তিতে "বক্র-কটি" নিয়ম দেখিতে পাওয়া যায়। বক্র-কটি বা Three block system হইল—পা হইতে কোমর, কোমর হইতে ঘাড় এবং ঘাড় হইতে মাথা বাঁকাইয়া মূর্ত্তির সৌন্দর্য্য দেখাইতে হইবে। বাঙলা দেশের আর কোন মূর্ত্তিতে ইহা দেখিতে পাওয়া যায় না।

সরস্বতী বহু পুরাতন দেবী। লক্ষ্মী বেশী পুরাতন দেবী নহেন। অথচ আশ্চর্য্য এই যে বর্ত্তমানে লক্ষ্মী বা সরস্বতী-মূর্ত্তি যে পদ্ধতিতে তৈয়ারি হয় সে-রূপ পুরাণের স্তবস্তোত্রে নাই। গণেশ অতি আধুনিক দেবতা। বর্ত্তমানে যে সিদ্ধিদাতা গণেশের আমরা পূজা করি তিনি বৈদিক যুগের গণপতি নহেন। সমগ্র দেবতাবর্গের মধ্যে গণেশ ভিন্ন আর কাহারও স্কন্ধে একটি জন্তুর মুণ্ড স্থাপিত হয় নাই; অথচ পঞ্চদেবতার পূজায় ইঁহার পূজাই সর্ব্বাগ্রে। পুরাণে ইঁহার উৎপত্তি সম্বন্ধে যে গল্প আছে তাহা হাস্যকর ব্যাপার। আর্য্য সভ্যতার দেবতামণ্ডলীর ভিতর অন্য দেশের দেবদেবী ও বাহনও যথেষ্ট স্থান পাইয়াছে। ইহাতে দুঃখ করিবার কিছু নাই। সমস্যার কথা হইতেছে যে মার্কণ্ডেয় পুরাণের পূর্ব্বে গণেশ দেবতার সাক্ষাৎ মেলে না। রামায়ণ মহাভারতে গণেশ দেবতার নাম নাই। বাণভট্টের পুস্তকে প্রথম হস্তিমুণ্ডধারী গণেশের সাক্ষাৎ পাই এবং মালতীমাধবে সর্ব্বপ্রথম গণেশের পূজা দেখিতে পাওয়া যায়। সেজন্য মনে হয় গণেশ আধুনিক দেবতা। বর্ত্তমানে আমরা যে টেড়িকাটা, তাজপরা বাবু-কার্ত্তিক দেখিতে পাই ইহাও শাস্ত্রে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। মহাভারতে বনপর্ব্বে মার্কণ্ডেয় ঋষি কার্ত্তিকের জন্মকথা বলিয়াছেন। তাহাতে দেখিতে পাই, দক্ষদুহিতা স্বাহাদেবী হইলেন স্কন্দের জননী। অগ্নির ঔরসে ও স্বাহার গর্ভে স্কন্দের জন্ম হয়। প্রজাপতির কন্যা দেবসেনার সহিত কার্ত্তিকের বিবাহ হয় এবং দেবরাজ ইন্দ্র ছিলেন এই বিবাহের ঘটক। বাহন ও মুকুট সম্বন্ধেও যথেষ্ট ব্যতিক্রম দেখিতে পাওয়া যায়। এই হইল মোটামুটি বর্ত্তমান বাঙলা দেশের দুর্গাপ্রতিমার পূজা।

দুর্গাপ্রতিমার সংস্কার বিশেষ প্রয়োজন। প্রতিমার সহিত ধ্যানের মিলন হয় না। যাঁহারা প্রতিমার সহিত ধ্যানের মিল করিবার চেষ্টা করিয়াছেন তাঁহারা আমার কথা বুঝিতে পারিবেন। আজ বাঙলা দেশে গৃহস্থের পূজা অর্থনৈতিক অবস্থার জন্য ক্রমশঃ উঠিয়া যাইতেছে এবং তৎস্থানে সার্ব্বজনীন দুর্গোৎসব প্রচলিত হইতেছে। ইহা যথার্থ রণচণ্ডীর পূজা এবং জাতীয় ভাববৈশিষ্ট্যের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া প্রতিমা পূজা করিতে হইবে। বর্ত্তমানে যে প্রতিমার ভাবসংস্কার করিতে হইবে সে বিষয়ে সংশয় নাই। রণচণ্ডীর পূজার সমস্ত আয়োজন বীর্য্য-ব্যঞ্জক হইবে। বাবু-কার্ত্তিক দেখাইয়া দেশের যুবকদের মেরুদণ্ড-হীন করিবার প্রবৃত্তি আমাদের ত্যাগ করিতে হইবে। জাতি আজ উন্নতির পথে আগুয়ান। কোনরূপ দুর্ব্বলতা কোন প্রতিষ্ঠানে চলিবে না। ভাবই জাতির সম্পদ। ভাব-বিহীন জাতির কোন মূল্য নাই। যে জাতিতে যত উচ্চভাব প্রকাশিত সে জাতি তত উন্নত। সেজন্য বিলাসদুর্ব্বল অলস-ভাব আমাদের অগ্রে ত্যাগ করিতে হইবে। প্রতিমা সাধকের জন্য নহে,—প্রতিমা সাধারণের জন্য সৃষ্ট হইয়াছে। সাধারণ যাহাতে সাহসী ও শক্তিমান হয় সেই ভাব আজ আমাদের সর্ব্বত্র দেখাইতে হইবে। নিছক অতীতের মোহে আমাদের ক্ষণিক নিস্তেজ আনন্দ আসিতে পারে কিন্তু তাহাতে আমাদের জাতীয় সমৃদ্ধি বৃদ্ধি হইবে না। জাগ্রত জাতির চিহ্ন হইল ভবিষ্যৎ সৃষ্টি। সেজন্য চাই আজ যথার্থ ধ্যান-ভাবোদ্যোতক প্রতিমা।
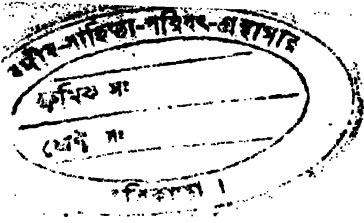
গত রজনীর রজনীগন্ধা—

শ্রী অচ্যুত চট্টোপাধ্যায়

গত রজনীর রজনীগন্ধা আমি—
পান করিয়াছি শিশিরের শেষকণা ;
মোর আঁখিতটে নিদালি মেয়েরা নামি'
সুরু করিয়াছে মরণের উপাসনা।
আকাশ-বাসরে শশিলেখা পড়ে ঢুলে',
শিথিল শিথানে কবরী পড়েছে খুলে'।
শুনেছি নিশার শেষ নিশ্বাস হায়,
তরুশাখা ঐ মর্ম্মরি' শিহরায়!
রাতের বাতাস চকিতে গেল যে থামি'...
গত রজনীর রজনীগন্ধা আমি।

আগত দিনের কুমারীরা, জানি মোরে
চিনিতে না পারি' দূরে চ'লে যাবে স'রে ;
যেখানে জাগিছে লঘু অলিপদ-পাতে
নব কুরুবক, আমিও যে গত রাতে
জেগে বসেছিনু সেকথা কি মনে হবে, --
ওগো কুমারীরা, এ-পথে আসিবে যবে!
মনে পড়ে যদি ফেলো তবে আঁখিজল
শেষ শয্যায় যেখানে শুয়েছে দল!
বিদায় বিদায়,—রৌদ্র আসিছে নামি,'
গত রজনীর রজনীগন্ধা আমি—!

ঝরার বেলায়

শ্রী প্রভাবতী দেবী সরস্বতী

সকালে বাড়ী হইতে বাহির হইয়া বেলা প্রায় তিনটার সময় শ্যামাচরণ যখন ফিরিয়া আসিলেন, তখন তাঁহার পা-দু'খানি ক্ষীণ দেহখানির ভারও বহিতে আর সক্ষম নয়। দারুণ রৌদ্রে ঘুরিয়া মুখখানা লাল হইয়া উঠিয়াছে, মাথায় ছাতা থাকিলেও তাহাতে চৈত্র মাসের নিদারুণ রৌদ্রতাপ নিবারিত হয় নাই।

সুনীতা তখনও আহার করে নাই, তখনও সে বারান্দায় চুপ করিয়া বসিয়া আছে। রন্ধন অনেকক্ষণ শেষ হইয়া গিয়াছে ; দাদু বলিয়া গিয়াছিলেন সে যেন সকাল সকাল আহার করিয়া লয়, কারণ সম্প্রতি সে অসুখ হইতে উঠিয়াছে। দাদু বলিয়া যাওয়া সত্বেও সে আহার করিতে পারে নাই। পুত্র চন্দ্রনাথ ভাত খাইয়া মায়ের কোলেই ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল, সুনীতা তাহাকে আস্তে আস্তে তুলিয়া ঘরের মেঝের একটা মাদুর পাতিয়া শোয়াইয়া দিয়া আসিয়াছে।

শ্যামাচরণ আসিবামাত্র সে উঠিয়া পড়িল, তাড়াতাড়ি তাঁহার হাত হইতে ছাতাটা লইয়া এক কোণে রাখিয়া দিয়া একখানা আসনে তাঁহাকে বসাইয়া বাতাস করিতে লাগিল। একটা নিশ্বাস ফেলিয়া শ্যামাচরণ বলিলেন, "চন্দ্র কোথায়, দিদি,—সে কি ঘুমিয়েছে?"

সুনীতা উত্তর দিল, "অনেকক্ষণ ঘুমিয়েছে দাদু—।"

"থাক্, ঘুমাক্ খানিকটা, নাহ'লে এই রোদেই তো আবার ছুটোছুটি করবে। তুই পাখা রাখ্ ভাই, আর বাতাস করতে হবে না।"

স্নিগ্ধকণ্ঠে সুনীতা বলিল, "তুমি বড় ঘেমে উঠেছ দাদু, এই রোদে অত পথ হেঁটে এসেছ, বাতাস দিলে একটু ঠাণ্ডা

হবে এখন। বসো, আমি আর খানিকটা বাতাস দিই।"

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া সে জিজ্ঞাসা করিল, "তারপর যে জন্যে গেলে তার কি হ'ল দাদু?"

শ্যামাচরণ একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "কিছু হ'লো নারে ভাই, শুধুহাতে কেউ একটা পয়সা দিতে চায় না। এমন কিছু নেই যা বাঁধা রেখে এখন হাজার দুয়েক টাকা নিয়ে উমাপতিকে পাঠাতে পারি।"

সুনীতা একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল; গোপন করিবার যথাসাধ্য চেষ্টা করিলেও সে নিশ্বাসের শব্দ শ্যামাচরণের কানে পৌঁছিল—চমকাইয়া তিনি মুখ তুলিলেন।

সুনীতা আর্দ্রকণ্ঠে বলিল, "তাহ'লে কি হবে দাদু, উনি তাহ'লে আর দেশে ফিরতে পারবেন না, সেখানে—সেই বিদেশে সামান্য টাকার জন্যে জেলে যাবেন?"

শ্যামাচরণ মৃদু হাসিতে গেলেন—"সামান্য টাকা—" কিন্তু মুখে হাসি ফুটিল না,—মুখখানাই বিকৃত হইয়া উঠিল মাত্র।

"একটা উপায় আছে ভাই, যদি বাড়ীখানা বন্ধক দিতে পারি তাহ'লে এখনই টাকাটা পাওয়া যায়। রাজেন্দ্রপ্রসাদ তাই বলছিল; একবছরের মত সে টাকাটা দেবে, বাড়ী বন্ধক রাখবে। সুদ যদিও বেশী দিতে হবে, আর একবছর মাত্র সময়, তবু এ রকম না করা ছাড়া আর অন্য উপায় কই টাকা পাওয়ার।"

সুনীতা যেন স্তম্ভিত হইয়া গেল—"বাড়ী বন্ধক দেবে দাদু—বাড়ী—?"

শ্যামাচরণ শুষ্ক হাসিয়া বলিলেন, "বলেছি তো, আর উপায় নেই—আর কোথাও কোন রকমে টাকা পাব না। তোর তো গায়ে একখানি গয়না পর্য্যন্ত রাখিস নি দিদি,——নইলে আজ টাকার ভাবনা কি ছিল, সে জন্য ভিটেই বা বন্ধক দিতে হবে কেন?"

সুনীতা চক্ষু ফিরাইল।

অবশেষে হইলও তাহাই।

একবৎসরের জন্য বেশী সুদের আশায় বাড়ী বন্ধক রাখিয়া মাড়োয়ারী রাজেন্দ্রপ্রসাদ দুই হাজার টাকা ধার দিলেন। শ্যামাচরণ ইহা হইতে একটি পয়সাও সংসার-খরচের জন্য লইলেন না, সব টাকাগুলি সেই দিনই বিলাতের মেলে পাঠাইয়া দিয়া হাসিমুখে বাড়ী ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, "তোর কথাই রইল ভাই, সব টাকাই আজ তাকে পাঠিয়ে দিয়ে এলুম,—এবার চন্দ্রনাথের বাপ এল বলে'।"

সুনীতা মুখ নত করিলেও সে মুখে যে আনন্দের হাসি ফুটিয়া উঠিয়াছিল তাহা বৃদ্ধ দাদামহাশয়ের চক্ষু দুইটিকে এড়াইতে পারিল না। তিনি মহানন্দে ঘরে প্রবেশ করিয়া আজ দুই বৎসর পরে তানপুরা পাড়িয়া তাহার গায়ের ময়লাগুলি সাফ করিলেন এবং তাহার পরই গান ধরিয়া দিলেন—

"দেখব তোমার মুখের হাসি
তাইতো এলেম ঘরে ফিরে—"

একদিন ছিল যেদিন শ্যামাচরণের অবস্থা দেশের মধ্যে বেশ ভালোই ছিল। তিনি গ্রামের পুরোহিত ছিলেন, যাহার যে কোন কাজ পড়িত তিনিই করিয়া দিতেন।

সংসারে ছিলেন স্ত্রী, দুইটি পুত্র, পুত্রবধূ, পৌত্রী সুনীতা, পৌত্র সুবিনয়। অভাবের জ্বালা ছিল না, ব্যাধির প্রকোপ ছিল না, বড় সুখে ও স্বচ্ছন্দে জীবন কাটিয়া যাইতেছিল।

শ্যামাচরণ যেন তন্দ্রাচ্ছন্ন ভাবে জীবনপথে চলিতেছিলেন, কোনদিন কিছু ভাবেন নাই, কোনদিকে চাহেন নাই। পত্নী সংসারের ভার মাথায় লইয়াছিলেন, কনিষ্ঠ পুত্র দুর্গানাথ কলিকাতায় থাকিয়া কলেজে শিক্ষালাভ করিতেছিলেন।

হঠাৎ বিপরীত দিক হইতে একটা ধাক্কা খাইয়া শ্যামাচরণের তন্দ্রা দূর হইয়া গেল; প্রথমটা তিনি হতচেতন হইয়া পড়িয়াছিলেন, জ্ঞান ফিরিলে দেখিলেন পথের সাথী যাহারা আসিয়াছিল তাহারা সব যে কোথায় দিয়া কোন্‌খানে চলিয়া গেছে, শ্মশানে দাঁড়াইয়া একা তিনি, পায়ের কাছে পড়িয়া সপ্তম বর্ষীয়া বালিকা সুনীতা।

সেই মুহূর্ত্তে তাঁহার মনে পড়িয়া গেল, 'কা তব কান্তা...'

বৃদ্ধের চোখ দিয়া একটি ফোঁটা জলও পড়িল না, তিনি বিস্ফারিত নয়নে মৃত্যুর খেলা দেখিতে লাগিলেন।

লোকে বলিল—"সাংখ্যতীর্থ মশাই এবার পাগল হ'য়ে যাবেন, এত শোক—এক মাসও গেল না—কলেরায় ছেলে বউ সব মারা গেল—উনি কি সইতে পারবেন?"

কিন্তু তাহারাই দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া গেল শ্যামাচরণ সব শোক ঝাড়িয়া ফেলিলেন, নাতনীটিকে লইয়া আবার নূতন করিয়া সংসার পাতিলেন। মাঝে সংসারে অনাসক্তি আসিয়াছিল, এবার তাঁহার আসক্তি যেন দ্বিগুণ হইয়া দাঁড়াইল।

নরেনের পিসী সকলকে শুনাইয়া মন্তব্য প্রকাশ করিলেন—"মাগো মা, মিন্‌ষের বয়েস হ'য়ে সত্যিই বায়াত্তুরে ধরেছে গো,—নইলে এতগুলোর শোক সাম্‌লালে কি করে'? ওমা! এখন কি ওর সংসার পাতিয়ে আবার বস্‌বার সময় হয়েছে?"

শ্যামাচরণ কাহারও কথায় কান দিলেন না, নিজের আনন্দে নিজেই বিভোর হইয়া রহিলেন।

পৌত্রীটিকে সুপাত্রে অর্পণ করিয়া একদিন তিনি কাশীবাস করিবেন এ আশা তাঁহার মনে ছিল, তাই তিনি অর্থের প্রতি না চাহিয়া যথাসর্ব্বস্ব খরচ করিয়া শিক্ষিত ছেলে উমাপতির সহিত সুনীতার বিবাহ দিলেন।

কিন্তু উমাপতির মন গৃহে বসিল না, তাহার জনৈক বন্ধু বিলাতে যাইতেছিল, উমাপতিও বিলাতে যাইবে বলিয়া ঝোঁক ধরিল।

বৃদ্ধের মাথায় আকাশ ভাঙিয়া পড়িল ও সুনীতা নীরবে চোখের জল ফেলিল। কিন্তু অনেক বুঝাইতেও কোন ফল হইল না।

তাহার পর কেমন করিয়া যে সে একদিন বিলাত চলিয়া গেল, খরচ কোথায় পাইল সে কথা তখন না জানিতে পারিলেও পরে দেখা গেল—সুনীতার গায়ে একখানি গহনাও নাই।

বিস্ফারিত চোখে শ্যামাচরণ তাহার পানে তাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "সে-সব চুরি করে' নিয়ে গেছে সুনীতা? তুই আমায় তখনই জানালি নে কেন, আমি তাকে পথ হ'তে গ্রেপ্তার করিয়ে আন্‌তে পার্‌তুম যে।"

বিবর্ণ হইয়া গিয়া সুনীতা বলিল, "না দাদু, তিনি তো চুরি করেন নি, আমার কাছে চাইতে আমি নিজে সব গয়না দিয়েছি।"

বৃদ্ধ মলিন মুখে তাহার পানে চাহিতেই সে তাড়াতাড়ি ঘরের মধ্যে চলিয়া গেল।

তখন কোথায় ছিল চন্দ্রনাথ—সে যে আসিতেছে এ সংবাদও কেহ জানে না। উমাপতি চলিয়া যাওয়ার সাত মাস পরে এই শিশুটি যখন ভূমিষ্ঠ হইল, তখন সংসারে টিকিয়া থাকিবার ও বাঁচিয়া থাকিবার একটা উপলক্ষ পাইয়া দাদু ও পৌত্রী উভয়েই যেন বাঁচিয়া গেলেন।

শ্যামাচরণের সমস্ত কাজকর্ম্ম গিয়াছিল অথচ দিন চলিবার মত আর উপায় ছিল না। বহুকাল পরে তাঁহার কেবল মাত্র জীবিকানির্ব্বাহের জন্যই পাঁজিপুথি লইতে গিয়া দেখিলেন, একদিন যেগুলি রাখিয়াছিলেন আজ তাহার অনেকগুলিই নষ্ট হইয়া গেছে।

কতকগুলি কবে পোকায় কাটিয়া ফেলিয়াছে, কেহই সেই পাঁজিপুথিগুলার দিকে চাহিয়া দেখে নাই; কতকগুলি কবে চন্দ্রনাথ তাহার সঙ্গী-সঙ্গিনীদের সহিত মিলিয়া ছিঁড়িয়া নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছে।

উমাপতি বিলাত গিয়া একটিও সংবাদ দেয় নাই, হয় তো দেওয়ার আবশ্যকতাও বোধ করে নাই।

সম্প্রতি দীর্ঘ তিন বৎসর পরে উমাপতির একখানি পত্র আসিয়াছে। সে সেখানে বড় বিপদগ্রস্ত, অন্ততঃ পক্ষে হাজার দুই টাকা তাহার দরকার। অনেক দেনা বাধিয়া গেছে, এই টাকাটা পাইলে সে দেনা পরিশোধ করিয়া দেশে ফিরিয়া আসিতে পারে। যদি টাকা না পায় তাহাকে জেলে যাইতে হইবে এবং সে আর কখনও দেশেও ফিরিবে না।

শ্যামাচরণ পত্র পড়িয়া অনেকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন, তাহার পর কঠোর সুরেই বলিলেন, "না, আর নয়, পাপিষ্ঠটা জেলেই যাক্,—তার উপযুক্ত শাস্তি হওয়াই দরকার বলে' মনে করি। যে লোক বিয়ে করে' রেখে এমন ভাবে স্ত্রীর গহনা নিয়ে পালাতে পারে, তারপর একখানা পত্র দিয়ে খবরটাও নেয় না, তার কথা তুই ভুলে যা সুনীতা!

মনে কর্ সে তোর কেউ নয়,—সে কোনদিন আসে নি, আমরা যেমন ছিলুম আজও তেমনই রয়েছি।"

কিন্তু কথাটা বলা যত সহজ, কাজে করা তত সহজ ছিল না, সেই জন্যই এ সঙ্কল্প দূরে ভাসিয়া গেল। সুনীতা তাঁহার সামনে একটি কথাও বলিল না, নীরবে নতমুখে দাঁড়াইয়া রহিল।

তাহার নত মুখের পানে তাকাইয়া বৃদ্ধ দাদু তাহার মনের কথা বুঝিয়াছিলেন। ইহার পর তিনি নিজেই যেমন করিয়াই হোক্ উমাপতিকে দেশে ফিরাইয়া আনিবার জন্য মহাব্যস্ত হইয়া উঠিলেন এবং অবশেষে পিতৃপুরুষের ভিটা বন্ধক দিয়াও দুই হাজার টাকা লইয়া উমাপতিকে পাঠাইয়া দিলেন, সঙ্গে সঙ্গে জানাইলেন টাকা পাওয়া মাত্র সে যেন ঋণ শোধ করিয়া দেশে ফিরিয়া আসে, ওখানে যেন আর একদিনও না থাকে।

দাদা ও পৌত্রী আশাপথ চাহিয়া দিন কাটান কবে উমাপতি আসিবে।

আড়াই বৎসরের শিশু চন্দ্রনাথ কিছু বুঝে না, মায়ের বুকের উপর পড়িয়া দুইহাতে তাহার গলাটা জড়াইয়া ধরিয়া মুখের উপর মুখখানা রাখিয়া প্রশ্ন করে—"মা, বাবা কই—বাবা?"

তাহার সাথী রতু, ধলা—সকলেরই বাবা আছে, কতদিন সে তাহাদের সহিত মিশিয়া তাহাদের বাপকে বাবা বলিয়া ধমক খাইয়া চুপ করিয়া গিয়াছে। পুত্রকে আড়ালে লইয়া গিয়া নিজের চোখের জল মুছিতে মুছিতে তাহার আরক্তিম নিটোল গণ্ডে চুম্বন দিয়া রুদ্ধকণ্ঠে সুনীতা বলিয়াছে—"ছি যাদু, যাকে তাকে বাবা বল্‌তে নেই। তোমার বাবা আছেন, তিনি তোমার জন্য কত জিনিষ বিলেত হ'তে আন্‌বেন।

অবুঝ শিশু মায়ের মুখে হাত বুলাইতে বুলাইতে প্রশ্ন করে—"বাবা কি আন্‌বে?"

মা উত্তর দেয়—"রাঙা কাপড়, পুতুল—"

শিশু জিজ্ঞাসা করে—"আল কি?"

মা বলে—"আর জুতো, জামা।"

চন্দ্রনাথ আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া তাড়াতাড়ি মায়ের কোল হইতে নামিয়া পড়িয়া নাচে—"আমাল বাবা আজা কাপল আন্‌বে গো—"

বৃদ্ধের দুটি চোখ জ্বালা করে—তিনি অন্যমনস্ক হইয়া কি ভাবেন।

লোকে বলে, এদেশের ছেলেরা বিলাতে গেলে একেবারে বদ্‌লাইয়া যায়—ঘরের কথা, আত্মীয়-স্বজনের কথা আর তাহাদের মনে থাকে না।

শ্যামাচরণ ভাবেন, উমাপতিও যদি এইভাবে বদলাইয়া গিয়া থাকে—

মনে করিতেও বুকটা যেন শিহরিয়া উঠে,—তাঁহার সুনীতা তাহা হইলে কি অভাগিনীই থাকিয়া যাইবে, হতভাগ্য শিশুটি পিতার স্নেহাদর কোনদিন লাভ করিতে পাইবে না।

সুনীতা এ সব ভাবনা কোনদিন ভাবে নাই। তাহার মন এখন উঁচুসুরে বাঁধা—সে কোন দিকে চায় না, নিজের আনন্দে নিজেই বিভোর থাকে।

দিনের পর দিন, মাসের পর মাস কাটিয়া গেল,—উমাপতি পল্লীগ্রামে ফিরিল না।

শুষ্ক মুখে সুনীতা একদিন ডাকিল—"দাদু—"

যেন সদ্য ঘুম হইতে জাগিয়া উঠিয়া শ্যামাচরণ পৌত্রীর পানে চাহিলেন—"ও, তাই তো দিদি, আমায় একবার কলকাতায় যেতে হবে যে। আচ্ছা, আগে একবার খোঁজ নিই, কি বলিস্? এই বুড়ো মানুষ, হঠাৎ তো একলা বা'র হওয়া যায় না, তুই-ই বল্।"

ও পাড়ার সুবোধ কলিকাতায় থাকে, ছুটিতে বাড়ী আসিয়াছে; সেদিন বৈকালে শ্যামাচরণ তাহারই কাছে ছুটিলেন।

উমাপতির কথা জিজ্ঞাসা করিতেই সে মুখ বিকৃত করিল—"তার কথা ছেড়ে দিন না দাদু, যে লোক স্ত্রীর গহনা চুরি করে' বিলেতে পালায়, তবু যে তাকে বিশ্বাস করেন, এই বড় আশ্চর্য্যের কথা।"

শ্যামাচরণ মাথা চুল্‌কাইয়া বলিলেন, "না, বিশ্বাস আর অবিশ্বাস কি। কথা হ'চ্ছে—তার পরিবার, ছেলে আমি আর কতকাল পাহারা দেব বল দেখি? দেখ্‌ছ তো চল্‌তে

পা কাঁপে, লাঠির সাহায্য না নিয়ে একটি পা চল্‌বার ক্ষমতা নেই, চোখে তাও ভালো দেখতে পাই নে। যার জিনিষ তাকে দিয়ে যেতে পার্‌লেই এখন নিশ্চিন্ত হই ভাই, আমি আর ওদের আগ্‌লাতে পারি নে।"

সুবোধ বলিল, "আপনি তার সম্বন্ধে কি জান্‌তে চান বলুন তো দাদু।"

শ্যামাচরণ জিজ্ঞাসা করিলেন, "উমাপতি ফিরেছে?"

সুবোধ আশ্চর্য্য হইয়া গিয়া বলিল, "কেন সে খবর দেয় নি কিছু? সে ফিরেছে তো আজকের কথা নয়, আজ প্রায় মাসখানেক হ'ল সে প্র্যাক্‌টিস্ কর্‌ছে।"

বৃদ্ধ বুঝিতে পারেন না, মুখের পানে হাঁ করিয়া তাকাইয়া থাকেন—"প্র্যাক্‌টিস্?—"

সুবোধ বলিল, "হ্যাঁ,—সে ব্যারিষ্টার হ'য়ে এসেছে যে, হাইকোর্টে কাজ কর্‌ছে।"

একটু থামিয়া সে বলিল, "আপনি কিসের জন্য দু'হাজার টাকায় বাড়ী বাঁধা দিলেন দাদু—ওরই জন্যে কি? এ বাড়ী আর কোনদিন ছাড়িয়ে নিতে পার্‌বেন মাড়োয়ারীর হাত হ'তে?"

শ্যামাচরণ বলিলেন, "উমাপতি যে ব'লেছিল সে টাকা দেবে দেশে ফিরে—"

তাচ্ছিল্যের ভাবে সুবোধ বলিল, "হ্যাঁ—সে দেবে তবে আপনি আপনার ভিটে ছাড়িয়ে নেবেন? নিজে গাছতলায় দাঁড়াতেন সেও সহ্য কর্‌তে পার্‌তেন, ওই নাতনী আর কচি ছেলেটাকে কোথায় কার আশ্রয়ে রাখ্‌বেন বলুন দেখি।"

শ্যামাচরণ মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে চিন্তিত মুখে বলিলেন, "সে তার স্ত্রীপুত্রের ভার নেবে না?"

সুবোধ উত্তর দিল, "আমি বল্‌ছি—নেবে না।"

শ্যামাচরণ তাহার মুখের পানে খানিক বিহ্বলভাবে তাকাইয়া রহিলেন, দীর্ঘনিশ্বাসের মতই তাঁহার মুখ হইতে বাহির হইল—"তবে—?"

সুবোধ শুষ্ক হাসিয়া বলিল, "তবে আর কি, কর্ম্মফল ভোগ করুন গিয়ে।"

সে চলিয়া যাইতেছিল, আত্মহারা বৃদ্ধ তাহার হাতখানা চাপিয়া ধরিলেন, "দাঁড়াও, একটা কথা—"

ফিরিয়া সুবোধ বলিল, "তার সম্বন্ধে আমি এইটুকু বল্‌ছি দাদু,—সেখানে আপনার নাতনীর জায়গা আর হবে না,—উমাপতি এখানকার সঙ্গে সম্পর্ক তুলে দিয়েছে।"

শ্যামাচরণ রুদ্ধ কণ্ঠে বলিলেন, "আমি যদি ওদের নিয়ে যাই, ছেলেটার মুখের পানে চেয়েও কি তার মন গল্‌বে না সুবোধ?"

সুবোধ শান্তকণ্ঠে বলিল, "সবাই তো আপনার মত স্নেহপ্রবণ নয় দাদু,—অনেক লোক এ রকমও আছে যারা ছেলেপুলে মোটে পছন্দ করে না, উমাপতি যদি সেই রকমই হয়?—"

হাত দু'খানা কচ্‌লাইতে কচ্‌লাইতে শ্যামাচরণ বলিলেন, "কিন্তু ও যে বড্ড ছেলেপুলে ভালোবাস্‌ত সুবোধ, কতদিন পথ হ'তে ছেলেপুলে কোলে করে' এনেছে—। আজ নিজের এমন সোনার চাঁদ ছেলেকে সে নেবে না—আদরও কর্‌বে না?"

চোখ ফাটিয়া বুঝি জল আসে—তিনি অতি কষ্টে নিজেকে সাম্‌লাইতেছিলেন, কিন্তু বুকটার ভিতর তখন ফাটিয়া যাইতেছিল।

তাঁহার ভাব দেখিয়া সুবোধ ব্যথা পাইতেছিল,—কিন্তু সত্য কথা বলা ছাড়া উপায় নাই। সে সান্ত্বনার সুরে বলিল "তাই কর্‌বেন দাদু, সুনীতা আর খোকাকে নিয়ে আমার সঙ্গে একবার কলকাতায় যাবেন, দেখি সামনাসামনি হ'লে সে হয় তো নিজেকে সাম্‌লেও যেতে পারে। আপনি ব্যস্ত হবেন না, আমি আপনাকে নিয়ে যাব, মাসখানেক দেরী করুন।"

কম্পিতপদে শ্যামাচরণ বাড়ীর দিকে ফিরিলেন।

দাদুকে হঠাৎ চুপচাপ হইয়া পড়িতে দেখিয়া সুনীতা আশ্চর্য্য হইয়া গিয়াছিল, অথচ মুখ ফুটিয়া কোন কথা সে জিজ্ঞাসা করিতে পারিল না।

আজ যাই কাল যাই করিয়া কলিকাতা গমনে বিলম্ব হইতে লাগিল; অবশেষে একদিন সকল জড়তা দূর করিয়া শ্যামাচরণ বলিলেন, "চল্ দিদি, কাল সকালেই কলকাতায় যাই, তোর বাক্স-টাক্স গুছিয়ে নে। খোকার যা যা আছে নিস্, ওকে এখন ওখানেই থাক্‌তে হবে কি না।"

সুনীতা জিজ্ঞাসা করিল, "হঠাৎ যে কলকাতায় যাব দাদু—?"

জোর করিয়া মুখে হাসি টানিয়া আনিয়া শ্যামাচরণ বলিলেন, "উমাপতি তোদের যেতে লিখেছে রে, ভয় নেই, —না বল্‌তে আমি তোদের নিয়ে যাচ্ছি নে।"

উমাপতি তাহাদের যাইতে লিখিয়াছে—এ আনন্দ যেন বুকে রাখা যায় না, উছ্‌লাইয়া উঠিতে চায়। সুনীতার আনন্দোজ্জ্বল মুখের পানে তাকাইয়া দাদুর বুকখানা ছিঁড়িয়া যায়, চোখে জল আসিয়া পড়ে।

খোকার এতটুকু জিনিষ পর্য্যন্ত সুনীতা বাক্সের মধ্যে গুছাইয়া লইল। মনে করিয়া কাঠের রং-ওঠা বল, ভাঙা কাচের টুকরা পর্য্যন্ত—কিছুই সে বাদ দিল না।

অবশেষে একদিন দুর্গা দুর্গা বলিয়া শ্যামাচরণ পৌত্রী ও শিশুটিকে লইয়া সুবোধের সহিত ট্রেনে উঠিয়া বসিলেন।

সুনীতার মুখে হাসি আজ চাপা পড়িতেছিল না, সেই মুখখানার পানে তাকাইয়া শ্যামাচরণ ভাবিতেছিলেন—যদি উমাপতি ফিরাইয়া দেয়, যদি সে কঠিন আঘাত করে, এ হাসি চিরদিনের মতই এ মুখ হইতে মিলাইয়া যাইবে...হয় তো এ ফুল ঝরিয়া পড়িবে, আর তাহাকে সঞ্জীবিত করা যাইবে না।

শিয়ালদহে পৌঁছিয়া সুবোধ একখানি গাড়ী ভাড়া করিয়া সকলকে তাহাতে উঠাইল।

পথে বিরাট জনস্রোতের প্রতি সুনীতা আশ্চর্য্য হইয়া তাকাইয়া রহিল, চন্দ্রনাথ মহানন্দে কলরব আরম্ভ করিয়া দিল।

প্রকাণ্ড বড় বাড়ীখানার সম্মুখে গাড়ীখানা আসিয়া দাঁড়াইল।

শ্যামাচরণ সচকিত হইয়া উঠিলেন—"এ কার বাড়ী সুবোধ?"

সুবোধ একটু হাসিয়া বলিল, "এটা মিঃ সেনের বাড়ী দাদু, উমাপতি এঁরই মেয়েকে—"

বলিতে বলিতে সে সুনীতার মুখের পানে চাহিয়া চুপ করিয়া গেল।

গেটের ধারে একখানি মোটর দাঁড়াইয়া ছিল, তাহাতে বসিয়া ছিল একটি সুন্দরী তরুণী, মোটরের দরজার কাছে একটি যুবক দাঁড়াইয়াছিল, সম্ভব মেয়েটিকে তুলিয়া দিতে আসিয়াছে।

এই তিনটি প্রাণী গেট দিয়া প্রবেশ করিবার সময়েই যুবকের দৃষ্টি তাহাদের উপর পড়িল; তাহার মুখখানা বিবর্ণ হইয়া উঠিল, কিন্তু মুহূর্ত্তে সে নিজেকে সাম্‌লাইয়া লইল।

হর্ণ দিয়া মোটর ছাড়িয়া গেল।

"সুবোধ যে, কি মনে করে'-?"

অগ্রসর হইয়া আসিয়া সুবোধ বলিল, "তবু ভালো চিন্‌তে পার্‌লে। আমি ভেবেছিলুম বোধ হয় বেহারার হাত দিয়ে ভেতরে কার্ড পাঠিয়ে ঘণ্টাখানেক দাঁড়িয়ে থাক্‌তে হবে,—হয় তো চিন্‌তেই পার্‌বে না।"

অদূরে দণ্ডায়মানা পুত্রক্রোড়ে সুনীতার পানে পলকের দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া উমাপতি গম্ভীরমুখে বলিল, "বিলেত হ'তে ফিরে এখনও সপ্তম স্বর্গে উঠ্‌তে পারিনি ভাই,—দু' হাজার টাকা গায়ে বিছের জ্বালা দিচ্ছে। একদিন একই সঙ্গে পড়েছি এ কথাটা বোধ হয় জীবনে কোনদিন ভুল্‌ব না। যাক্, কি দরকার বল দেখি?"

সুবোধ বলিল, "এঁদের পৌঁছে দিতে এসেছি তোমার কাছে—" বলিয়া সে অঙ্গুলিনির্দ্দেশে সুনীতাদের দেখাইয়া দিল।

"আমার কাছে—"

উমাপতি অন্যমনস্কভাবে চন্দ্রনাথের মুখখানার দিকে তাকাইয়া রহিল।

সুবোধ বলিল, "আকাশ হ'তে পড়্‌লে যে? তোমার স্ত্রী—দাদাশ্বশুর—যিনি ভিটে বাঁধা দিয়ে দু' হাজার টাকা পাঠিয়েছেন; আর এটি তোমার ছেলে—"

উমাপতি যেন চম্‌কাইয়া উঠিল,—"আমার ছেলে—তুমি বল্‌ছো কি সুবোধ?"

সুবোধের দুই চোখে আগুন জ্বলিয়া উঠিল, তথাপি সে নিজেকে সংযত করিয়া শান্তকণ্ঠেই বলিল, "হ্যাঁ, তোমারই ছেলে—"

উমাপতি শ্লেষের হাসি হাসিল, "না, ও কথাটা ব'লো না সুবোধ, আমি ও কথা সহ্য কর্‌তে পার্‌ব না। আমি সবই শুনেছি, শুন্‌তে তো কিছু বাকি নেই বন্ধু... কেবল সেই

জন্যেই আমি গ্রামে যাইনি, ওঁদের সঙ্গে সম্পর্ক রাখ্‌তেও চাইনে—।"

একটু থামিয়া সে আবার বলিল, "আমি অবশ্য ওঁদের কাছে ঋণী এ কথা আমি স্বীকার কর্‌ছি। আমি যা নিয়েছি, আশা করি দুই এক মাসের মধ্যেই সব শোধ দিয়ে দেব, সুদ যদি ধরেন—তাও দেব। দয়া করে' ওঁদের আর টেনে এনো না আমার কাছে, এই মিনতি কর্‌ছি।"

সুনীতার চোখের সম্মুখে সমস্ত পৃথিবী যেন কালো হইয়া গেল, সে থর্ থর্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল। তাহার কোল হইতে ছেলেটি পড়িয়া যায় দেখিয়া সুবোধ তাহাকে নিজের কোলে টানিয়া লইল।

বৃদ্ধ শ্যামাচরণ যেন হাঁফাইয়া উঠিতেছিলেন—এতক্ষণে তাঁহার কথা বলিবার শক্তি যেন ফিরিয়া আসিল। আর্ত্ত-কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, "তুচ্ছ টাকা—আমার সর্ব্বস্ব যাক্—সর্ব্বস্ব নিয়ে তুমি কেবলমাত্র বল উমাপতি—তোমার স্ত্রীকে তোমার ছেলেকে তুমি গ্রহণ কর্‌বে। ও অপবাদ দিয়ো না উমাপতি—আমাদের বাঁচাও—রক্ষা কর—।"

নিতান্ত নিরুপায়ভাবেই তিনি দুই হাত কচ্‌লাইতে লাগিলেন।

সুবোধ তীব্রকণ্ঠে বলিল, "তোমার কথা আমি বুঝ্‌তে পার্‌লুম না উমাপতি—"

উমাপতি বলিল, "বোঝাটা এমন কিছু শক্ত নয় সুবোধ,—আমি বল্‌তে চাই ও ছেলে আমার নয়। বিলেতে এ রকম ভাবে ব্যবসা চলে জানি, এ দেশেও যে চলে তা জানতুম না, তাই দেখে আশ্চর্য্য হ'য়ে গেছি। আর মর্ম্মাহিত হয়েছি এই ভেবে যে তুমি আমার বন্ধু হ'য়ে আমার কাছে ওঁদের—"

সুবোধ হাত তুলিল, দৃপ্তকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, থাক্ থাক্, আর না, যথেষ্ট বলেছ, ওর বেশী শুন্‌বার প্রবৃত্তি আমাদের আর নেই। সতীর নামে মিথ্যে অপবাদ দিয়ো না উমাপতি, তোমার অন্তরের দেবতাকে নিভৃতে জিজ্ঞাসা করো—সে কি জবাব দেয় তা শুনো। মুখ সংযত করো, যা তা বলে' যেয়ো না। তোমায় বল্‌বার মত কথা আমি খুঁজে পাচ্ছিনে,—তোমাকে উপযুক্ত জবাব দিতে গেলে আমাকেও অতি নীচ হ'তে হয়। কিন্তু না, আমি নীচ হ'তে চাই নে, ভগবান যে এই মুহূর্ত্তে আমায় রক্ষা কর্‌লেন এ জন্যে তাঁকে আমি ধন্যবাদ দিই। আসুন দাদু, ওঠো সুনীতা,—এ কথার পরে এখানে এক মুহূর্ত্ত থাকা আর আমাদের উচিত নয়। অনেক আশা নিয়ে এসেছিলে সুনীতা, তার দ্বিগুণ নিরাশা নিয়ে এখন বাড়ী ফিরে চল।"

শক্তি ছিল না তথাপি সুনীতা উঠিল। দাদুর হাত-খানা ধরিয়া সুনীতা চলিল,—দাদুর মুখে একটি শব্দ মাত্র ছিল না।

পিছনে চন্দ্রনাথকে কোলে লইয়া সুবোধ চলিল।

অবোধ শিশু জিজ্ঞাসা করিল, "মা—আমার বাবা কই?"

সুনীতা একবার ফিরিয়া তাহার পানে তাকাইল, কি বলিতে গিয়া ঠোঁট দুখানা থর্ থর্ করিয়া কাঁপিয়া উঠিল, সঙ্গে সঙ্গে ঝর্ ঝর্ করিয়া চোখ দিয়া জল ঝরিয়া পড়িল।

দিন চলিয়া যায়—দিন থাকে না। প্রকাণ্ড বড় বাড়ী-খানা আজও আছে। সুবোধ সুদ সহ টাকা মিটাইয়া দিয়া এই পরিবারটিকে স্থিত করিয়া রাখিয়াছে।

এত বড় বাড়ী, মানুষ মাত্র একটি—সে সুনীতা।

এই বড় বাড়ীতে একা সে প্রেতিনীর মত ঘুরিয়া বেড়ায়—দিন-রাত সে ঘুরে, তাহার বিশ্রাম নাই। সমস্ত দিন লোকে এ বাড়ীর দরজা বন্ধ দেখে, সন্ধ্যায় একটি ঘরে একটি আলো টিপ টিপ করিয়া জ্বলে, জানালায় দাঁড়াইয়া দূরের পানে চাহিয়া থাকে সুনীতা।

এতটুকু অবলম্বন তাহার নাই—হায়! সব হারাইয়াছে! স্নেহময়হৃদয় দাদু গিয়াছেন; সে শোক সাম্‌লাইতে না সাম্‌লাইতে কোল হইতে চন্দ্রনাথ কোথায় ছিট্‌কাইয়া পড়িল—সে আর তাহার নাগাল পায় না।

মাত্র একমাস গিয়াছে—

সুনীতার মনে হয় না চন্দ্রনাথ নাই, মনে হয় সে কাদের বাড়ীতে খেলিতে গিয়াছে। সুনীতা কাজকর্ম্ম করে, রন্ধন করে, ভাত বাড়িতে বসিয়া আপনার অজ্ঞাতসারেই ডাকে—"চন্দ্রনাথ—খোকা—"

তখনই মনে পড়িয়া যায়—চন্দ্রনাথ নাই। মাত্র একমাস

আগে খোকা তাহার বুকের মধ্যে মুখখানা রাখিয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে, সে ঘুম আর ভাঙে নাই। ঘুমাইবার আগে সে একবার ভাঙা সুরে বলিয়াছিল—"আমার বাবা কই ?"

শিশুহৃদয়ে এই ক্ষোভটাই বুঝি বিরাট হইয়া জাগিয়াছিল, সেই জন্যই সে মায়ের গলাটা দুইহাতে জড়াইয়া ধরিয়া তাহার বুকের মধ্যে মুখখানা লুটাইয়া কাঁদিয়াছিল, "আমি বাবাল কাথে দাব মা,—"

অপলক দৃষ্টিতে সুনীতা বাহিরের পানে তাকাইয়া থাকে, বুকের মধ্যে কেবল একটা কথাই ঘুরিয়া ফিরিয়া বাজে— "আমি বাবাল কাথে দাব, আমাল বাবা কই ?"

ওরে হতভাগা শিশু,—কোথায় তোর বাবা, কে তোর বাবা ? নিষ্ঠুর—নিষ্ঠুর, একটিবার সেই পুত্রকে সে কোলে লইল না, একটিবার একটি আদরের ডাক দিল না, সে ঘৃণায় মুখ ফিরাইয়া লইয়াছে, সে স্পষ্টই জানাইয়াছে—পুত্র তাহার নয়।

উঃ! মাগো—

সুনীতা শিহরিয়া উঠিয়া একেবারে নীল হইয়া যায়। এ কথা যে বলিয়াছে সে তাহার স্বামী, তাই না :সে আজ নির্ব্বাক্, তাই না সে আজ অভিশাপও দিতে পারে না। বড় বেদনায় হৃদয় যখন নিঃসাড় হইয়া পড়ে তখন নিজের অজ্ঞাতেই সে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিবার সঙ্গে সঙ্গে জাগিয়া ওঠে—

সে যে তাহার স্বামী,—দাদু উপদেশ দিয়াছেন—তাহার ইহ-পরকালের উপাস্য।

আর্ত্ত ভাবে সে হাতদু'খানা কপালে রাখিয়া বলিয়া উঠে—"মাগো, একবার বলে' দাও—আমি কি করব ? একবার দেখিয়ে দাও—আমার উপায় কোথায় ?—কোন্ দিকে ? আমি যে স্বামীর 'পর হ'তে ভক্তি বিশ্বাস হারাচ্ছি,—আমার সব যে যায়! আমায় পথ দেখাও,—আমার উপায় বলে' দাও।"

পোড়া চোখে জলও তো আসে না। দাদু চলিয়া গেলেন, সে নীরবে তাঁহার মাথাটা কোলে লইয়া বসিয়া ছিল। খোকা চলিয়া গেল, তাহার মাথাটা মায়ের বুকে পড়িয়া ছিল। সুনীতা স্তব্ধভাবে দেখিয়াছিল কি রকম ভাবে মানুষ চিরনিদ্রায় নিদ্রিত হইয়া পড়ে। ছোট্ট খোকাটা—সেও কেমন আস্তে আস্তে মায়ের বুকে ঘুমাইয়া পড়িল! তাহার পর সুনীতা যে তাহাকে এতবার ডাকিল, সে আর চাহে নাই।

চোখে জল আসিল না,—বুক যেন পাষাণ হইয়া গিয়াছে।

সামনে পূজা আসিতেছে।

আকাশের বুকে ছেঁড়া মেঘের টুকরাগুলা অসীমের পথে ছুটিয়া চলিয়াছে, সুনীতা সেইগুলার পানে তাকাইয়া থাকে।

গ্রামের ভিক্ষুক একতারা বাজাইয়া রুদ্ধ দরজার বাহিরে গান গায়—

"বছরের পরে উমা এলো ঘরে
পুরবাসী তোরা আয়রে আয়—।"

সুনীতা শুধু তাকাইয়াই থাকে।

এই পূজা বৎসরে বৎসরেই হয়, উমা আসেন যান, আবার আসেন। বাংলা আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠে, কিন্তু মানুষ যে যায় সে তো ফিরিয়া আসে না।

এ বাড়ীতে কেহ আসে না, সুনীতাও কাহাকেও চায় না। সে স্মৃতির নেশায় বিভোর হইয়া থাকিতে চায়, কেহ আসিলে সে নেশা ছুটিয়া যায়—সে বিরক্ত হইয়া উঠে। সে সমস্ত বাড়ীময় ছুটিয়া বেড়ায়, এখনও মানসচক্ষে দেখিতে পায়—খোকা ওখানে খেলা করিতেছে, ঘরের এই জায়গাটিতে ঘুমাইতেছে। মনে হয় সে জাগিয়া এখনি হাসির রোল তুলিয়া অশান্তভাবে সমস্ত বাড়ীময় ছুটিয়া বেড়াইবে, বাড়ীর এই গভীর নিস্তব্ধতা এখনই ছুটিয়া যাইবে।

সেদিন আকাশে মেঘ করিয়াছিল,—মাঝে মাঝে সেই মেঘের ফাঁকে সূর্য্যের আলোকও ভাসিয়া উঠিতেছিল।

সুনীতা জানালার পাশে দাঁড়াইয়া বাহিরের পানে তাকাইয়া ছিল। উঠানের ধারে পেয়ারা গাছের তলায় কত পাকা পেয়ারা পড়িয়াছে,—আজই বুঝি প্রথম সেদিকে দৃষ্টি পড়িল।

উঠানের দরজা খোলা ছিল ; সুবোধ খানিক আগে আসিয়াছিল,—মাঝে মাঝে সে আসিয়া দেখিয়া যাইত। সুনীতার অবস্থা দেখিয়া সে শঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছিল, এ অবস্থায় থাকিলে শীঘ্রই সে উন্মাদ হইয়া যাইবে।

কে যেন দরজা ঠেলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল। কে যেন ডাকিল—"খোকা—"

সুনীতা বড় বেশী রকমেই চমকাইয়া উঠিল, বুকের মধ্যে একটা মরিচাপড়া তার হঠাৎ যেন ঝন্ ঝন্ করিয়া উঠিল।

কে গো, কে ডাকে ? খোকা—? খোকা কি আর আছে, সে কি আর সাড়া দিবে ?

দরজার উপর দাঁড়াইয়া কে ডাকিল,—"সুনীতা—"

সুনীতা মুখ ফিরাইল—

উমাপতি আসিয়াছে।

এ কি স্বপ্ন না সত্য ? সুনীতা বিস্ফারিত চোখে চাহিয়া রহিল।

এই শীর্ণাকৃতি পুত্রশোকাতুরা জননীমূর্ত্তির পানে তাকাইয়া উমাপতি একেবারে নিস্তব্ধ হইয়া গেল। প্রথম দৃষ্টিতে দেখিয়া সেও যেন বিশ্বাস করিতে পারিল না—এই সুনীতা।

খানিক চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া উমাপতি শুষ্ক হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "একদৃষ্টে অমন করে কি দেখ্‌ছ সুনীতা ?'

একটা নিশ্বাস ফেলিয়া সুনীতা বলিল, "দেখ্‌ছি সত্যিই তুমি এসেছ কিনা। দেখি তোমার হাতখানা—"

সত্যই সে উমাপতির হাতখানা নিজের হাতের মধ্যে লইয়া কয়েকবার হাত বুলাইয়া দেখিল এ স্বপ্ন না সত্য,—এ মূর্ত্তি বায়বীয় কিনা।

হাতখানা ছাড়াইয়া লইয়া পিছনে একপা সরিয়া গিয়া উমাপতি বলিল, "ও কি হ'চ্ছে. তুমি কি পাগল হয়েছ সুনীতা ?"

সুনীতার মুখে একটু হাসি ভাসিয়াই মিলাইয়া গেল,—"না গো, এখনও পাগল হইনি, পাগল হলেও যে ভালো ছিল।"

তাহার দুইখানা হাত দুই হাতের মধ্যে চাপিয়া ধরিয়া উমাপতি বলিল, "ক্ষমা চাইতে এসে'ছি সুনীতা, বল, আমি তোমায় যে অপমান করেছিলুম, আমার ক্ষমা কর্‌বে ? সতীকে কলঙ্কিনী বলেছি,—সেদিন হ'তে সেই জন্তে আমার বুকটা জ্বলে' পুড়ে' ছাই হ'য়ে গেল সুনীতা···আমি আর থাক্‌তে পার্‌ছিলুম না, তাই ছুটে এসেছি। ···একবার বল আমায় ক্ষমা কর্‌লে ?"

দিন দিলে ভগবান—কিন্তু এত দেরীতে—?

বুকটা ফাটিয়া যাইতেছিল—চোখে জল নাই।

একটা নিশ্বাস ফেলিয়া সুনীতা বলিল. "আমি তোমায় ক্ষমা করেছি—।"

উমাপতি বলিল, "দাদু কই—তাঁর কাছে—"

বাধা দিয়া শান্ত কণ্ঠে সুনীতা বলিল, "তাঁর কাছে আর ক্ষমা চাইতে হবে না। ওখানে তিনি যে আঘাত পেয়েছিলেন তার ব্যথা সাম্‌লাতে পারেন নি। আজ পাঁচ মাস হ'ল দাদু ইহজগৎ ত্যাগ করেছেন।"

"দাদু নেই—?"

উমাপতি চুপ করিয়া রহিল, একটি কথাও তাহার মুখে ফুটিল না।

একখানা আসন পাতিয়া দিয়া সুনীতা বলিল, "বসো। তোমার আজ খাওয়া হয়নি, আমি তোমার ভাত চড়িয়ে দিয়ে আসি।"

সে চলিয়া গেল।

ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়া যায়—খোকা কই ?

মুহূর্ত্তের জন্য মাত্র ছেলেটিকে উমাপতি দেখিয়াছিল। মনে পড়ে সে কোলে আসার জন্য হাত দু'খানা বাড়াইয়াছিল,—তাহার চোখে মুখে কি ব্যগ্রতাই না ফুটিয়া উঠিয়াছিল।

এই ছেলেটির মুখখানা উমাপতি ভুলিতে পারে নাই, সে অহোরাত্র সেই মুখখানাই মনের মধ্যে দেখিতে পাইতেছিল। সেই আকর্ষণেই সে সমস্ত ফেলিয়া এখানে ছুটিয়া আসিয়াছে। অন্তরে অনেকখানি আকাঙ্ক্ষাই জাগিয়াছে—সে দাদুর পায়ে ধরিয়া ক্ষমা চাহিবে, নিজের স্ত্রীপুত্রকে নিজের কাছে লইয়া গিয়া সংসার পাতিয়া বসিবে। আর না, জীবনের অনেকগুলা দিনই সে মিথ্যা খেলা করিয়া কাটাইয়াছে, এবার সে স্ত্রীর স্বামী—

সন্তানের পিত বলিয়া সকলের কাছে নিজের পরিচয় দিবে।

জায়গা করিয়া ভাত বাড়িয়া দিয়া সুনীতা ডাকিল—"ভাত দিয়েছি—এসো—"

আসনে বসিয়া উমাপতি জিজ্ঞাসা করিল—"খোকা কই—চন্দ্রনাথ—"

সুনীতা একটা চাপা নিশ্বাস ফেলিল—"খাও, বল্‌ছি।"

তাহার স্তব্ধ মুখের পানে তাকাইয়া সন্দেহাকুল মনে উমাপতি বলিল,—"আগে বল সুনীতা, খোকা কই—"

সুনীতা স্থির দৃষ্টি স্বামীর মুখের উপর রাখিল—ধীরকণ্ঠে বলিল, "সে তো নেই।"

"নেই—খোকা নেই—?"

উমাপতি বজ্রাহতের মত তাকাইয়া রহিল।

"না গো, নেই—নেই। তোমার আমার মাঝে মস্ত বড় একটা ব্যবধান তুলে দিয়ে সে চলে গেছে। আজ তুমি যাকে সামনে দেখ্‌ছ—সে তোমার স্ত্রী নয়, সে খোকার মা—যে খোকা আর নেই, মা'র বুকের মধ্যে মস্ত বড় একটা ক্ষত তৈরী করে' যে বিদায় নিয়েছে··"

হতভাগ্য পিতা দুই হাতে নিজের বুকখানা চাপিয়া ধরিল।

"সুনীতা—"

সুনীতা ধীরকণ্ঠে বলিল, "এই যে আমি আছি।"

দুই হাতে তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া উমাপতি তাহার কোলের উপর নুইয়া পড়িল।

"আমি যে অনেক আশা নিয়েই এসেছিলুম, সুনীতা। যে তোমার আমার মাঝে সেতু হ'য়ে এসেছিল সে আজ নেই, তার সঙ্গে আমি কি তোমাকেও হারালুম সুনীতা? আমার পানে একবার চাও, আমার বুকে হাত দাও, দেখ—ওখানে যা কিছু ছিল এই মুহূর্ত্তে সব ধ্বংস হ'য়ে গেল। বল, আমি তোমাকেও কি হারালুম—?"

"স্বামী—"

সুনীতা উমাপতির স্কন্ধে মুখখানা রাখিল; খোকার মৃত্যুর পর এই প্রথম তাহার চোখ দিয়া ঝর্ ঝর্ করিয়া জল ঝরিয়া পড়িল।

মাতৃভাষাই শিক্ষার শ্রেষ্ঠ বাহন

শ্রী রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় এম্-এ

শৈশবে ও বাল্যকালে আমরা পিতামাতা ও অন্য আত্মীয়স্বজন এবং প্রতিবেশীদের মুখের কথা শুনিয়া যে জ্ঞানলাভ করি, তাহা মাতৃভাষার সাহায্যেই করি। সুতরাং শৈশবে ও বাল্যে পুস্তকাদি হইতে যে জ্ঞানলাভ করি,তাহাও মাতৃভাষার সাহায্যে করাই যে স্বাভাবিক এবং তাহাই যে প্রকৃষ্টতম উপায়, সে বিষয়ে প্রমাণ ও যুক্তির প্রয়োগ অনাবশ্যক। কৈশোরে ও যৌবনে জ্ঞানলাভও যে মাতৃভাষার সাহায্যেই ভাল হয়, তাহাই কেবল আমাদিগকে বিবেচনা করিতে হইবে। ভারতবর্ষ পরাধীন দেশ বলিয়া এবং সেই কারণে আমাদিগকে অল্প বয়স হইতেই ইংরেজী শিখান হয় বলিয়া, এরূপ আলোচনা এদেশে আবশ্যক বোধ হয়। মাতৃভাষাই শিক্ষার শ্রেষ্ঠ বাহন, না বিদেশী কোন ভাষা শিক্ষার শ্রেষ্ঠ বাহন, এরূপ আলোচনা স্বাধীন ও সভ্য কোন দেশে হয় বলিয়া অবগত নহি।

ইংরেজী শিক্ষা করা যে আমাদের পক্ষে উচিত ও আবশ্যক, তাহা নিশ্চয়ই স্বীকার্য্য। মানুষের জ্ঞান বিদ্যার সকল বিভাগেই বাড়িয়া চলিতেছে। নূতন জ্ঞানের সহিত পরিচয়ের জন্য কোন-না-কোন শ্রেষ্ঠ পাশ্চাত্য ভাষা জানা দরকার ; কারণ, ভারতবর্ষের কোনও ভাষায় কোন বিদ্যার উচ্চতম ও নবীনতম জ্ঞানের পুস্তক, পত্রিকা আদি প্রকাশিত হয় না। ফরাসী, জার্মান, ইংরেজী প্রভৃতি পাশ্চাত্য ভাষায় এইরূপ পুস্তক পত্রিকাদি প্রকাশিত হয়। আমাদিগকে অন্য কারণে ইংরেজী শিখিতে হয়। তাহাতে জ্ঞান-অর্জ্জন সম্বন্ধীয় এই উদ্দেশ্যও সিদ্ধ হয়। ইংরেজী ছাড়া অন্যান্য পাশ্চাত্য ভাষা যদি কেহ শিখিতে পারেন ত আরও ভাল। সকল বিষয়ে উচ্চতম ও আধুনিক জ্ঞান যাহা হইতে পাওয়া যায়, তাহার মধ্যে ইংরেজীই পৃথিবীতে সকলের চেয়ে বেশী লোকে ব্যবহার করে। অতএব, ভারতবর্ষের লোকেরা ইংরেজী জানিলে তাহার সাহায্যে সভ্য জগতের যত লোকের সহিত চিন্তা ও ভাবের আদানপ্রদান করিতে পারিবে, অন্য কোন ভাষার সাহায্যে তাহা পারিবে না। এইরূপ আদান-প্রদান একান্ত আবশ্যক ; কেন-না, তাহা ব্যতিরেকে আমাদিগকে কূপমণ্ডূক হইয়া থাকিতে হইবে। ইংরেজীর সাহায্যে ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের লোকেরা চিন্তা ও ভাবের বিনিময় করে, বাণিজ্য চালায় এবং নিখিল-ভারতীয় ধার্ম্মিক, সামাজিক, রাজনৈতিক প্রভৃতি প্রচেষ্টা চালায়। তাহার দ্বারা ভারতীয় মহাজাতি গঠনের সাহায্যও হইয়া আসিতেছে। ইংরেজীর সাহায্যে সকল মহাদেশের সহিত ভারতীয়েরা ব্যবসা বাণিজ্যও চালাইয়া থাকে। চাকরী, ওকালতী, ডাক্তারী, অধ্যাপকতা প্রভৃতির জন্য ইহা যে আবশ্যক, তাহা সকলেই জানে।

অতএব, মাতৃভাষাকে শিক্ষার বাহন করা উচিত, এরূপ বলিলে ইহা বলা হয় না, যে ইংরেজী শিক্ষা করা অনাবশ্যক। বস্তুতঃ যে-সব বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে মাতৃভাষার সাহায্যে শিক্ষা দেওয়া হয়, তাহাদের প্রত্যেকটিতে ইংরেজীও শিখান হইয়া থাকে। যেমন, অধ্যাপক কার্ভে মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত ভারতীয় মহিলা-বিশ্ববিদ্যালয়ে, স্বামী শ্রদ্ধানন্দের প্রতিষ্ঠিত গুরুকুলে, লালা দেবরাজের প্রতিষ্ঠিত জালন্দর কন্যা মহাবিদ্যালয়ে, ইত্যাদি। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় যে ১৯৩৭ সন হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষার জন্য মাতৃভাষাকে শিক্ষার বাহন করিতে সঙ্কল্প করিয়াছেন, তদ্বিষয়ক ব্যবস্থাতেও ইংরেজী শিখাইবার বন্দোবস্ত আছে।

আমরা যে যে কারণে ইংরেজী শিক্ষা করা আবশ্যক বলিয়াছি, তাহার সবগুলিই মনে রাখিয়া লোকে যে সন্তানদিগকে ইংরেজী শিখান, তাহা নহে ; চাকরী ও উপার্জ্জনের অন্যান্য উপায় সুগম হইবে বলিয়াই প্রধানতঃ ইংরেজী শিখান। এই উদ্দেশ্যটি ছেলেদের শিক্ষায় যতটা মুখ্য, মেয়েদের শিক্ষায় ততটা মুখ্য নহে। মেয়েদেরও আর্থিক বিষয়ে স্বাবলম্বী হওয়া বাঞ্ছনীয় বটে ; কিন্তু আমরা কেবল ইহাই বলিতেছি, যে, ছেলেদের মধ্যে প্রায় সকলেই

উপার্জ্জনের জন্য উচ্চ শিক্ষা পাইবার অভিলাষী হয়; মেয়েদের সম্বন্ধে ঠিক্ তাহা বলা চলে না। এই জন্য মাতৃভাষাকে ছেলেদের শিক্ষার বাহন করার বিরুদ্ধে যতটা আপত্তি শোনা যায়, মেয়েদের শিক্ষার জন্য মাতৃভাষার ব্যবহারের বিরুদ্ধে ততটা আপত্তি হইতে পারে না। অবশ্য আমাদের মতে, ছাত্র ছাত্রী কাহাদেরই শিক্ষায় মাতৃভাষা ব্যবহারের বিরুদ্ধে আপত্তি যুক্তিসঙ্গত নহে। পাছে কেহ ভুল বুঝেন এইজন্য ইহাও বলিয়া রাখা ভাল, যে, আমাদের মতে ছেলে মেয়ে উভয়েরই উচ্চ শিক্ষা হওয়া উচিত।

এশিয়া, ইউরোপ ও আমেরিকার সমুদয় সভ্য দেশে শিশু ছাড়া আর প্রায় সমুদয় পুরুষ ও নারী লিখিতে পড়িতে পারে। জাতির সকল প্রাপ্তবয়স্ক লোকের লিখিতে পড়িতে জানা বর্ত্তমান সময়ে সভ্যতার একটি লক্ষণ, এবং তাহা প্রগতির জন্য আবশ্যক। আমাদের দেশে আমরা যাহাকে সেকণ্ডারী শিক্ষা (অর্থাৎ উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের শিক্ষা) বলি, অনেক সভ্য দেশের প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে (এলিমেণ্টারী স্কুলসে) সেইরূপ শিক্ষা দেওয়া হয়। আমাদের দেশে সেকণ্ডারী শিক্ষা প্রধানতঃ ইংরেজীর সাহায্যে দেওয়া হয়। তাহার পর কলেজে ও বিশ্ববিদ্যালয় সকলেও ইংরেজীর সাহায্যে শিক্ষা দেওয়া হয়। এইরূপ ইংরেজীর সাহায্যে শিক্ষা ভারতবর্ষের নানা অঞ্চলে প্রায় দেড়শত বৎসর দেওয়া হইয়া আসিতেছে। তাহার ফলে ১৯২১ সালে ভারতবর্ষের সাড়ে একত্রিশ কোটি লোকের মধ্যে কেবল পঁচিশ লক্ষ লোক ইংরেজী লিখনপঠনক্ষম ছিল বলিয়া গণিত হয়। দেড়শত বৎসরে পঁচিশ লক্ষ লোক ইংরেজী লিখনপঠনক্ষম হইয়া থাকিলে ভারতবর্ষের বর্ত্তমান পঁয়ত্রিশ কোটি পরিচিত লোককে ইংরেজীতে লিখনপঠনক্ষম করিতে দুইশত দশ শতাব্দী অর্থাৎ একুশ হাজার বৎসর লাগিবে। এখন যেরূপ ধীরে ধীরে মাতৃভাষাতে প্রাথমিক শিক্ষাও অগ্রসর হইতেছে, তাহাতে সকল লোককে মাতৃভাষায় লিখনপঠনক্ষম করিতেও অতি দীর্ঘকাল লাগিবার কথা। কিন্তু ইংরেজী শিক্ষার মত এত বেশী সময় লাগিবে না, এত বেশী খরচও হইবে না, এবং আমাদের হাতে স্বরাজ আসিলে পাঁচ কিম্বা দশ বৎসরেই দেশ হইতে নিরক্ষরতা দূর করা যাইবে।

অনেকে বলেন, মাতৃভাষার সাহায্যে শিক্ষা দিবার পক্ষে উপযোগী উচ্চাঙ্গের পাঠ্যপুস্তক নাই। কিন্তু গণিত, বিজ্ঞান, ইতিহাস প্রভৃতি নানা বিষয়ে ছাত্র ছাত্রীরা ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার জন্য যে-সব বাংলা বই পড়ে, তাহাতে তাহারা প্রবেশিকা পরীক্ষার পাঠ্য ঐ সব বিষয়ের ইংরেজী বহির চেয়ে কম শিক্ষা পায় না। ছাত্রবৃত্তির জন্য যখন নানাবিষয়ে বাংলা বহি লিখিত হইয়াছে, তখন প্রবেশিকা পর্য্যন্তও ত নিশ্চয়ই লিখিত হইতে পারিবে। তাহার প্রমাণ দিতেছি।

ইংলণ্ড, জার্ম্মেনী প্রভৃতি দেশেও আগে উচ্চ শিক্ষা মাতৃভাষায় হইত না, লাটিন গ্রীকে হইত। ক্রমশঃ উচ্চ শিক্ষা যেমন মাতৃভাষায় হইয়াছে, অমনি উচ্চতম শিক্ষার জন্য মাতৃভাষায় পাঠ্যপুস্তকও লিখিত হইয়াছে, প্রয়োজনমত নূতন নূতন পারিভাষিক শব্দ রচিত হইয়াছে। ইউরোপে এই প্রকারে উচ্চতম শিক্ষার জন্য মাতৃভাষায় পাঠ্যপুস্তক রচিত হওয়ায় তথাকার নানা দেশের মাতৃভাষার সাহিত্যও সমৃদ্ধ হইয়াছে। আমাদের দেশেও উচ্চতম শিক্ষার জন্য মাতৃভাষা ব্যবহৃত হইলে এই প্রকার উচ্চাঙ্গের পাঠ্যপুস্তক মাতৃভাষায় রচিত হইতে পারিবে, এবং তাহার দ্বারা মাতৃভাষার সাহিত্য পুষ্ট হইবে। যত ইচ্ছা প্রয়োজনমত পারিভাষিক শব্দ প্রধানতঃ সংস্কৃত হইতে রচিত হইতে পারিবে। আরবী-ফারসীরও সাহায্য স্থলবিশেষে লইলে সুবিধা হইবে, যেমন হায়দরাবাদের ওস্‌মানিয়া বিশ্ববিদ্যালয় লইতেছেন। কোন কোন স্থলে ঠিক্ ইংরেজী শব্দই রাখা বাঞ্ছনীয় হইবে। প্রাচীন কালের উচ্চতম জ্ঞান ভারতীয়েরা সংস্কৃত গ্রন্থাবলীতে নিবদ্ধ করিতে পারিয়াছিলেন। সংস্কৃত প্রভৃতির সাহায্যে আমাদের এখন দেশভাষায় তাহা করিতে না-পারিবার কোন কারণ নাই। বাংলা মাসিক পত্রে বিজ্ঞানের অনেক কঠিন বিষয়ে প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। লেখকেরা আবশ্যকমত পারিভাষিক শব্দ রচনা করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন। প্রাচীন কালে হিন্দু বৈজ্ঞানিকগণ দরকার হইলে বিদেশী শব্দ গ্রহণ করিতেও সঙ্কোচ বোধ করিতেন না। যেমন, জ্যোতিষে ব্যবহৃত "হোরা" শব্দটি। উহা গ্রীক "হোরা" ("Hora") হইতে গৃহীত, যাহা হইতে ইংরেজী "আওয়ার" ("Hour") শব্দের উৎপত্তি। কলি-

কাতার অনেক কলেজে রাজেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, মহেন্দ্রনাথ রায়, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, প্রভৃতি বিখ্যাত অধ্যাপকেরা পদার্থবিদ্যা, গণিত, রসায়নীবিদ্যা প্রভৃতি বিষয়ের অধ্যাপনা অনেক সময় বাংলায় করিতেন; কেবল কোন কোন ইংরেজী পারিভাষিক শব্দ ব্যবহার করিতেন।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, উচ্চ শিক্ষা মাতৃভাষার সাহায্যে হইলে তাহার জন্য উচ্চাঙ্গের পাঠ্যপুস্তক রচিত হওয়ায় মাতৃভাষার সাহিত্য সমৃদ্ধ হইবে। এখানে "সাহিত্য" ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করিতেছি। উচ্চ শিক্ষা মাতৃভাষার সাহায্যে না হইলেও ভাল ভাল কবিতা, উপন্যাস, গল্প, সাধারণ প্রবন্ধ মাতৃভাষায় রচিত হইতে পারে, হইতেছেও; কিন্তু জ্ঞানগর্ভ অন্য নানাবিধ গ্রন্থ মাতৃভাষায় যথেষ্ট রচিত হইবে না, সুতরাং, মাতৃভাষার সাহিত্য অঙ্গহীন থাকিয়া যাইবে। জ্ঞানের নানা শাখার গ্রন্থ মাতৃভাষায় রচিত হইলে আর একটি সুবিধা এই হইবে, যে, যাহারা কম শিক্ষিত, এমন কি হয় ত নিরক্ষর, তাহাদের মধ্যেও কিছু কিছু উচ্চ জ্ঞান মুখে মুখে পরোক্ষভাবে গিয়া পৌঁছিবে।

ভারতবর্ষ একটি বৃহৎ দেশ। বাংলা তাহার একটি টুকরা। এই জন্য অনেক সময় আমরা নিজেদের সামর্থ্য সম্বন্ধে সন্দিহান হই। কিন্তু অনেক সভ্য দেশের লোকসংখ্যার সহিত বাংলা দেশের লোকসংখ্যার তুলনা করিলে আমাদের সন্দেহ দূর হইবে। আমরা এই রূপ তুলনামূলক একটি তালিকা নীচে দিতেছি। এই সব দেশে উচ্চতম শিক্ষা তাহাদের মাতৃভাষার সাহায্যে হয়, এবং উচ্চাঙ্গের পাঠ্যপুস্তক সমূহও ঐ সকল ভাষায় রচিত হয়।

দেশ	লোকসংখ্যা
অষ্ট্রিয়া	৬৬,০০,০০০
ডেন্মার্ক	৩১,০০,০০০
ফ্রান্স	৪,১০,০০,০০০
জার্ম্মেনী	৬,৩০,০০,০০০
গ্রেটব্রিটেন	৪,৫০,০০,০০০
গ্রীস	৭০,০০,০০০
হাঙ্গেরী	৮০,০০,০০০
ইটালী	৪,২০,০০,০০০
হল্যাণ্ড	৭৫,২৭,০০০
নরওয়ে	২৭,৮৯,০০০
পোল্যাণ্ড	২,৭০,০ ,০০০
পোর্টুগ্যাল	৬৪,০০,০০০
স্পেন	২,১৭,৬৭,০০০
সরকারী বাংলা প্রদেশ	৫, ০,২২,০০০

এই তালিকাটিতে দেখা যায়, জার্ম্মেনী ছাড়া অন্য সব দেশগুলিরই লোকসংখ্যা বাংলা প্রদেশের চেয়ে কম। সত্য বটে, ইংরেজী, ফরাসী ও জার্ম্যান ভাষা তাহাদের উৎপত্তির দেশ ছাড়া অন্যত্রও ব্যবহৃত হয়। কিন্তু মাতৃভাষায় তাহাদের উচ্চ শিক্ষা ও উচ্চ শিক্ষার জন্য উচ্চাঙ্গের পাঠ্যপুস্তক রচনা তাহাদের উপনিবেশাদি হইবার আগেই আরম্ভ হইয়াছিল। কিন্তু এই সব বহুদেশব্যবহৃত ভাষা ছাড়িয়া দিলেও দেখা যায়, ডেন্মার্ক, হাঙ্গেরী, গ্রীস, পর্টুগ্যাল, ইটালী, হল্যাণ্ড, নরওয়ে, সুইডেন প্রভৃতি অপেক্ষাকৃত অল্পসংখ্যক লোকের জন্মভূমি ভূখণ্ডেও মাতৃভাষায় উচ্চতম শিক্ষা প্রদত্ত এবং কঠিনতম বিষয়ে ঐ ঐ ভাষায় পাঠ্যপুস্তকসমূহ রচিত হইয়া থাকে। সুতরাং বঙ্গেও তাহা হইতে পারে। প্রভেদ এই, যে, বাংলা দেশ এখন স্বাধীন নয়, এবং সমৃদ্ধিশালী নয়। কিন্তু বঙ্গের রাষ্ট্রীয় অধিকার বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে সমৃদ্ধি বাড়িবে, উচ্চতম শিক্ষালাভের লোক বাড়িবে, এবং কঠিনতম বিষয়ে পুস্তক প্রকাশ করিবার অর্থ এবং যথেষ্ট ক্রেতা জুটিবে।

আমাদের দেশে পাশ্চাত্য শিক্ষা এবং পাশ্চাত্য ভাষার শিক্ষা প্রচলিত হওয়ায় যে উপকার হইয়াছে তাহা স্বীকার করি। কিন্তু তাহার কোন কোন কুফলেরও উল্লেখ আবশ্যক।

সংস্কৃত টোলে যে পণ্ডিত মহাশয় উচ্চতম শিক্ষা পাইয়াছেন এবং যে কৃষক হয় ত সম্পূর্ণ নিরক্ষর—ইহারা দুই জন ঠিক্ ভিন্ন ভিন্ন জগতের লোক এমন মনে হয় না। কিন্তু এক জন প্রবেশিকা পাস্ করা ছেলে ও একজন মজুরকে অনেক সময় যেন ভিন্ন জগতের লোক মনে হইবে। এক-পক্ষের জ্ঞানবত্তা ও অন্যপক্ষের অজ্ঞানতা ইহার একমাত্র কারণ নয়। কিছু ইংরেজীর জ্ঞান মানুষকে একটা স্বতন্ত্র শ্রেষ্ঠত্বের অভিমান দেয় বলিয়া এরূপ ঘটে। সকলেরই

অধিকাংশ শিক্ষা প্রধানতঃ দেশভাষায় হইলে অহঙ্কারের এই কারণটা অনেকটা না থাকায় দেশের ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে ব্যবধানের অন্ততঃ একটা কারণ কিছু কমিবে মনে করি। অবশ্য "উচ্চ জাতি" "নীচ জাতি" প্রভৃতি কুসংস্কার আরও বেশী ব্যবধানের সৃষ্টি করিয়াছে। কিন্তু ব্যবধানের অন্যান্য কারণ আছে বলিয়া ভাষাগত এই একটা কারণকে মন্দীভূত করা অনাবশ্যক, এরূপ মনে করা উচিত নয়।

পুরুষজাতীয় ভিন্ন ভিন্ন স্তরের মধ্যে পাশ্চাত্য শিক্ষা-জাত যে ব্যবধানের কথা বলিলাম, তাহা নারীদের মধ্যে আগে বেশী ছিল না; এখন ক্রমশঃ তাহার সৃষ্টি হইতেছে। তাহা প্রবল হইবার আগেই যদি ছাত্রীদের শিক্ষা প্রধানতঃ মাতৃভাষায় হয়, তাহা হইলে ব্যবধানটা দূর করিবার জন্য বিশেষ কষ্ট পাইতে হইবে না।

জাতীয় একতা ও সংহতি বৃদ্ধির জন্য এরূপ কোন ব্যবধান থাকা বাঞ্ছনীয় নহে। কিন্তু ব্যবধান আছে বলিয়া রাষ্ট্রনৈতিক নেতাদিগকে তাহা দূর করিবার বিশেষ চেষ্টা করিতে হইয়াছে। আজকাল সকল শ্রেণীর লোকদের পরিচ্ছদ আগেকার চেয়ে এক রকমের হওয়ায় এবং জাতীয় মহাসভা হইতে আরম্ভ করিয়া ছোট ছোট সভাসমিতিতে দেশভাষায় সমুদয় কাজ করিবার রীতি প্রবর্ত্তিত হওয়ায় জাতীয় সংহতি বৃদ্ধি পাইতেছে।

সমুদয় বিষয়ের শিক্ষা মাতৃভাষার সাহায্যে দিয়া কেবল ইংরেজী ভাষার শিক্ষা ইংরেজী পুস্তক ও কথোপকথনের সাহায্যে দিলে ছাত্র ছাত্রীরা ইংরেজীর যথেষ্ট জ্ঞান লাভ করিতে পারিবে না, কেহ কেহ এইরূপ আশঙ্কা প্রকাশ করিয়াছেন। এখন ইংরেজী যেমন করিয়া শিখান হয়, তাহাতে এই আশঙ্কাকে সম্পূর্ণ অমূলক বলিতে পারি না। কিন্তু সুপ্রণালী অনুসারে ইংরেজী শিখাইলে আমাদের ছাত্র ছাত্রীরা নিশ্চয়ই ঐ ভাষা এখনকার মত কাজ চালাইবার মত শিখিতে পারিবে মনে করি, হয় ত তার চেয়ে ভাল পারিবে। কারণ, আমরা দেখিতে পাই, ইংরাজ গবর্মেণ্ট ভারতবর্ষের শিক্ষা বিভাগে, প্রত্নতত্ত্ব বিভাগে ও তদ্রূপ অন্য কোন কোন কাজের জন্য, এবং কোন কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে কিছু বক্তৃতা দিবার জন্য যে সব ফরাসী, জার্ম্যান, ডচ্, চেক্, নরুজিয়ান প্রভৃতি পণ্ডিত আমদানী করেন, তাঁহারা নিজ নিজ দেশে উচ্চতম শিক্ষা নিজ নিজ মাতৃভাষাতেই লাভ করেন, ইংরেজীটা কেবল একটা ভাষা হিসাবে বিদ্যালয়ে সপ্তাহে কয়েক ঘণ্টা করিয়া শিক্ষা করেন; অথচ তাঁহারা এদেশে তাঁহাদের কাজ ইংরেজীতে করিয়া যান। তাহার কারণ, তাঁহাদের দেশে ইংরেজী ও অন্যান্য ভাষা শিখাইবার প্রণালী ভাল। আমাদের দেশে ঐরূপ সুপ্রণালী অবলম্বিত হইলে আমাদের ছাত্র ছাত্রীরাও অল্প সময়ে ইংরেজী শিখিতে, বলিতে এবং লিখিতে পারিবে।

মাতৃভাষার সাহায্যে জ্ঞান যত সহজে ও অল্প সময়ে অর্জ্জিত হয় এবং উহা মনের যেমন "অস্থিমজ্জাগত" হয়, বিদেশী ভাষার সাহায্যে তাহা হয় না। অল্প সময়ের মধ্যে মাতৃভাষার সাহায্যে যে অধিক জ্ঞান লাভ হয়, তাহার একটি মাত্র প্রমাণ উল্লেখ করিলেই হইবে। আমরা অনেকে বাল্যকালে দশ এগার বৎসর বয়সে ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষা দিবার জন্য বাংলা ভাষায় ইতিহাস, ভূগোল, গণিত, বিজ্ঞান প্রভৃতি যাহা শিখিয়াছিলাম, ইংরেজী ইস্কুলের ছেলেরা এণ্ট্রান্স পরীক্ষা দিবার জন্য পনর যোল বৎসর বয়সে ইংরেজী ভাষায় তাহা অপেক্ষা বেশী শিখিত না—এখনও বোধ হয় শিখে না।

এই প্রকার নানা যুক্তিমার্গ অবলম্বন করিয়া এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হইতে হয়, যে, মাতৃভাষাই শিক্ষার শ্রেষ্ঠ বাহন, এবং শিক্ষাকার্য্যে উহার ব্যবহার স্বাভাবিকও বটে।

গ্রাম

শ্রী সুবলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

কৃষ্ণা প্রথমা তিথির মহুয়া-মদির চাঁদ !—
সারাটি আঙিনা রূপালি সূতার জরীতে বোনা !
উপলাকীর্ণ নদী-তরঙ্গ যেতেছে শোনা !—
দূর তারকারে পল্লী জানায় ধন্যবাদ।

প্রান্তর হ'তে আসে বন-বায়ু, মাটির ঘরে,
উঠে ঝঙ্কার,—নিঝুম্ রজনী মুখরি' উঠে ;
মর্ম্মরে আর কল্লোলে তৃণ-কুসুম ফুটে ;—
পক্ষীরাজের হ্রেষাধ্বনিতে শ্রবণ ভরে !

কাঁপিতেছে ভাষা, নীহার-নিমীল দোপাটি-বনে,
নিদ্রিত গ্রাম,—যেন লঘু নীল পালকে ঢাকা !
সঘন-সবুজ সুপারি গাছের দুলিছে শাখা !—
নিবু নিবু করে মাটির প্রদীপ ঘরের কোণে।

ভীরু পরাণের ক্ষণ-রোমাঞ্চ,—হরিণীসম,—
অবনতমুখী, চুম্বনে বোজে চোখের পাতা !
গভীর মদির তিমিরে ডুবিছে আগামী মাতা,—
সুখ-নিশ্বাসে কমল-গন্ধ,—কি মনোরম !

দূর দিগন্তে ছায়া-শরীরিণী করিছে খেলা—
তারারা মিলায়,—শেষ-তারা শুধু জাগিয়া থাকে !
পূর্ব্বাশা-তীরে ঘনায় গোধূলি পাখীর ডাকে ;—
উষার আকাশে জবারুণ-রাগ-আসন মেলা !

পূর্ণগর্ভা গাভীটির পাশে আভীরা মেয়ে,—
ধীরে ধীরে হানে চম্পা-কোরক-করাঙ্গুলি !
—করুণ পরশে সারাদেহ তা'র উঠিছে দুলি'।
গভীর আরামে বড়ো-বড়ো চোখে রয়েছে চেয়ে !

শঙ্খ-ধবল পাল ছুটিয়াছে নদীর 'পরে,
থির কালো-জল ছলছল করে, গ্রাম-সীমায়
যবের শীর্ষে সোনালি আলো যে উছলি' যায়—
জাগে ভৈরবী—হাজারো পাখীর কণ্ঠস্বরে !

কখন নিবেছে মহুয়া-মদির রূপালি চাঁদ—
আঙিনার কোণে লক্ষ্মীর পদচিহ্ন আঁকা !
শুক্তি-শিশিরে, সঘন শ্যামল আঁচলে ঢাকা
দোলে গ্রামখানি,—কিশোরী সে বোনে মায়ার ফাঁদ
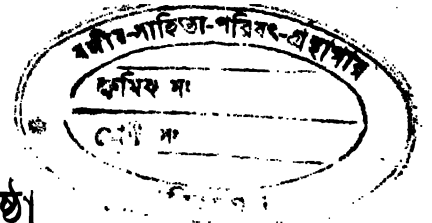
রায়বেঁশের পুনঃপ্রতিষ্ঠা

শ্রী গুরুসদয় দত্ত আই-সি-এস্

মাত্র দেড় বৎসর কাল হইল রায়বেঁশের আবিষ্কার করিবার সুযোগ ও সৌভাগ্য আমার হইয়াছিল। এই দেড় বৎসর কালের মধ্যেই ইহার আবিষ্কারের ফল যে কতদূর গড়াইয়াছে তাহা ভাবিয়া দেখিলে আমি নিজেই আশ্চর্য্য না হইয়া থাকিতে পারি না। এই দেড় বৎসর পূর্ব্বে বাংলার শিক্ষিত সম্প্রদায়ের নৃত্যকলা সম্বন্ধে যে কি সংস্কার ও মনোভাব ছিল তাহা ভাবিয়া দেখিলে এবং তাহার সঙ্গে এখন যে কি পরিবর্ত্তন হইয়াছে তাহা তুলনা করিলেই আমরা ইহা সম্যক উপলব্ধি করিতে পারিব। এই দেড় বৎসর পূর্ব্বে আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মনে নৃত্য সম্বন্ধে একটি অতি কদর্য্য ভাব ছিল এবং নৃত্য যে শিক্ষার অথবা ব্যায়ামের একটি মূল্যবান অঙ্গ অথবা শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে ইহার প্রচলন জাতীয় মঙ্গলের জন্য নিতান্ত প্রয়োজনীয় ইহা বলিলে তখন সাধারণ লোকের এবং শিক্ষিত সম্প্রদায়ের বেশীর ভাগ লোকেই ইহাকে যে বাতুলতা বলিতে দ্বিধা করিতেন না তাহা নিঃসন্দেহ।

ইহা সত্য যে, কোন কোন বিশিষ্ট শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে মেয়েদের মধ্যে নৃত্যের প্রচলনের চেষ্টা কয়েক বৎসর হইতে করা হইতেছিল এবং কলিকাতায় কখনও কখনও এ রকম নৃত্য প্রদর্শিত হইতেছিল কিন্তু এই প্রচেষ্টা শুধু কয়েকটি প্রতিষ্ঠানে এবং শুধু মেয়েদের মধ্যেই আবদ্ধ ছিল। ছেলেদের মধ্যে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে নৃত্যের প্রবর্ত্তনের চেষ্টা ইতিপূর্ব্বে হয় নাই বলিলেই চলে আর মেয়েদের মধ্যেও যে প্রচেষ্টা হইতেছিল তাহা ব্যাপকভাবে দেশের মধ্যে অথবা দেশের বালিকাবিদ্যালয়গুলির মধ্যে বিস্তৃতি লাভ করে নাই। বরং দেশের অধিকাংশ লোকই ইহাকে নিন্দার চক্ষে দেখিয়া আসিতেছিলেন। ইহার কারণ এই যে মেয়েদের মধ্যে ইতিপূর্ব্বে যে সকল নৃত্যের প্রচলনের চেষ্টা হইতেছিল, সেগুলি ছিল বাংলার বাহির হইতে আমদানি লাস্যনৃত্য যথা—মণিপুরের কৃষ্ণলীলার আদি-রসাত্মক রাস-নৃত্য এবং গুজরাটের গরবা-নৃত্য। এগুলি বাংলাদেশের শিক্ষিত জন-সাধারণের কাছে আদর লাভ করে নাই তাহার কারণ ছিল দ্বিবিধ। প্রথমতঃ বাংলার সংস্কৃতির সঙ্গে এগুলির কোন সম্পর্ক ছিল না এবং দ্বিতীয়তঃ এগুলির আদর্শ ছিল

রায়বেঁশে তাণ্ডব

লাস্যভাবাপন্ন এবং এগুলিতে কোন আধ্যাত্মিক প্রেরণার ভাব ছিল না।

রায়বেঁশের আবিষ্কার বাংলার শিক্ষিত সমাজে নৃত্যের স্থান সম্বন্ধে এই অবস্থার পরিবর্ত্তন করিয়া একটি যুগান্তর আনিয়া দিয়াছে; কারণ নৃত্যের আদর্শ যে কত গৌরবময় পৌরুষময় এবং সম্পূর্ণ বিলাসবিভ্রমবর্জ্জিত হইতে পারে রায়বেঁশে নৃত্যের আবিষ্কারের ফলে বাঙ্গালী আজ তাহা বুঝিতে পারিয়াছে। এই আবিষ্কারের ফলে সকল নৃত্য সম্বন্ধে কদর্য্যভাব পোষণ করা এখন অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে তেমনি আবার অপরদিকে বাংলার যুবকগণ রায়বেঁশে নৃত্যের পৌরুষময় ও উন্মাদনাময় প্রণালী চর্চ্চা করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া পড়িয়াছে। কেবল বালকদের মধ্যে নয় প্রৌঢ়দের মধ্যেও অনেক স্থলে এই উৎসাহ দেখা যাইতেছে এবং অন্ততঃ বীরভূম জেলার গ্রামে গ্রামে প্রাথমিক স্কুলের বালিকাগণও বালকদের সঙ্গে এই গৌরবময় নৃত্যে আপন আপন অভিভাবকের সম্পূর্ণ সম্মতিক্রমে

সুলতানপুর স্কুলের ছেলে ও শিক্ষকদের রায়বেঁশে নৃত্য

যোগদান করিয়া শারীরিক স্বাস্থ্যের ও শক্তির এবং বীরাঙ্গনা-প্রকৃতির ভিত্তি স্থাপন করিতেছে।

দেড় বৎসর পূর্ব্বে প্রথম আমি যখন প্রত্যেক বিদ্যালয়ে রায়বেঁশে নৃত্যের প্রচলনের চেষ্টা করিতে আরম্ভ করি এবং সাধারণের বিদ্রূপ-কটাক্ষের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া নিজেই ছাত্রদিগকে এই নৃত্য শিক্ষা দিতে প্রবৃত্ত হই তখন অনেকেই আমাকে প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য ভাবে বিদ্রূপ করিতে ছাড়েন নাই; কিন্তু এখন তাঁহাদের সেই মনোভাবের পরিবর্ত্তন হইয়াছে এবং তাঁহারা সকলেই যে কেবল তাঁহাদের বিদ্রূপ প্রত্যাহার করিয়াছেন তাহা নহে; তাঁহাদের

নটরাজের তাণ্ডবনৃত্য শুধু একটা প্রাচীন পুঁথি-ঘাঁটা কল্পিত প্রণালীর রঙ্গমঞ্চে অভিনয় হইতেই যে একমাত্র শিক্ষণীয় নয়, পরন্তু সেই রণতাণ্ডব নৃত্য যে বাংলার প্রাচীন সংস্কৃতিরই একটি বিশিষ্ট গৌরবময় অঙ্গ ছিল এবং তাহার জীবন্ত চর্চ্চা যে এখনও বাংলার পল্লীতে বাঁচিয়া আছে ইহা বাঙ্গালী জানিতে পারিয়াছে। রায়বেঁশে নৃত্যের গৌরবময় আদর্শ বাঙ্গালীকে নৃত্যের একটি অভিনব ও অভ্রান্ত মাপকাঠি মিলাইয়া দিয়াছে এবং সেই মাপকাঠির সহায়তায় বাঙ্গালী নৃত্যের ভালমন্দ আদর্শের তারতম্য বুঝিতে শিখিয়াছে। একদিকে যেমন বাংলার মানুষের পক্ষে

মধ্যে অনেকেই এখন রায়বেঁশে নৃত্য প্রচলনে সবিশেষ উৎসাহী হইয়া উঠিয়াছেন। অবশ্য বাংলার মনোভাবের এই পরিবর্ত্তন আনিতে আমাকে কম বেগ পাইতে হয় নাই। শারীরিক পরিশ্রম এবং অর্থব্যয় উভয়ই আমাকে এই ব্রতের সাধনায় যথেষ্ট পরিমাণে করিতে হইয়াছে। একমাত্র সিউড়ী প্রদর্শনী কমিটী ব্যতীত এ বিষয়ে অর্থসাহায্য কাহারও নিকট পাই নাই বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। তবে অন্যান্য প্রকার সাহায্য অনেক বন্ধুর নিকট হইতেই পাইয়াছি। এবং যে সফলতা রায়বেঁশে একটি মাত্র ধুতি পরিয়া অনাবৃত দেহে জীবন যাপন করিতেন ও আলো-হাওয়ার সংস্পর্শে অনাবৃত শরীরকে শক্তিমণ্ডিত ও স্বাস্থ্যমণ্ডিত করিয়া তুলিতেন, সেই বাঙ্গালীর ছেলেগণ আজকালকার বিদ্যালয়ের প্রাপ্ত আদর্শের ফলে শরীরটাকে জুতা জামা ও কামিজ কোট ইত্যাদি মণ্ডিত না করিয়া রাখিলে মর্য্যাদার হানি হয় বলিয়া মনে করিতে শিখিয়াছে। এই ভ্রান্ত আদর্শকে দূর করিয়া বীর-ধড়ি পরিহিত অনাবৃত দেহের মর্য্যাদা বাঙ্গালীর ছেলেকে আবার শিখাইতে রায়বেঁশে নৃত্য ও ব্যায়ামকলার চর্চ্চা

স্কুলের ছেলে-মেয়েদের রায়বেঁশে নৃত্য

নৃত্যের প্রচলনে এখন আসিয়াছে এবং অদূর ভবিষ্যতে আরও আসিবে বলিয়া আশা করা যায়, তাহার কৃতিত্বের অংশ তাঁহাদেরও সম্পূর্ণভাবে প্রাপ্য।

সুতরাং সঙ্গীতকলার ক্ষেত্রে, নৃত্যকলার ক্ষেত্রে এবং ব্যায়ামকলার ক্ষেত্রে আবার যে বাংলাদেশে রায়বেঁশের পুনঃপ্রতিষ্ঠা হইয়াছে তাহা বলা যাইতে পারে। ইহার ফলে ইতিমধ্যে বাংলার বর্ত্তমান জীবনের অনেকগুলি গলদ্ দূর হইবার সূত্রপাত হইয়াছে। যে বাঙ্গালীর পূর্ব্বপুরুষগণ অতি মূল্যবান সহায়তা করিতেছে। শারীর শিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টর শ্রীযুক্ত J. Buchanan মহাশয় বৎসরেক কাল পূর্ব্বে যখন প্রথমে সিউড়ীতে আসিয়া রায়বেঁশে নৃত্য দেখেন, তখন হাই স্কুলের ছেলেরা ও তাঁহাদের শিক্ষকগণ খালিগায়ে শুধু মালকোঁচা পরিয়া নৃত্য ও ব্যায়াম করিতেছে দেখিয়া তিনি আশ্চর্য্য হইয়া গেলেন এবং আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন কি করিয়া আমি বাঙালী ভদ্রলোকশ্রেণীর ছেলেদিগকে ও মাষ্টার-

দিগকে খালিগায়ে নৃত্য করিতে রাজি করিয়াছি। তিনি বলিলেন তিনি অন্যান্য জেলায় অনেক চেষ্টা করিয়াও ইহা করিতে পারেন নাই। ইহার উত্তরে আমি বলিলাম যে ইহা রায়বেঁশের প্রতিভার ফলে হইয়াছে।

শিক্ষক এবং ছাত্রগণ এই রায়বেঁশের প্রতিভার ফলে এক সঙ্গে নৃত্য করিতে শিখিয়াছে। শিক্ষকগণ প্রথমে ভাবিয়াছিলেন যে ইহাতে হয়ত তাঁহাদের মর্য্যাদার হানি হইবে এবং হয়ত ছেলেরা তাঁহাদিগকে আগেকার মতন সম্মান প্রদর্শন করিবে না কিন্তু এখন দেখিতেছেন যে ফল হইয়াছে ঠিক তাহার বিপরীত। ছেলেদিগের শুধু আপনাদিগের মধ্যে নয় শিক্ষকদিগের সঙ্গে নৃত্যের

প্রাইমারী স্কুলের ছেলে-মেয়েদের রায়বেঁশে নৃত্য

সূত্রে একটি নূতন ঐক্যের ভাব ও প্রেমের ভাব জাগিয়া উঠিতেছে এবং ছাত্রগণ শিক্ষকদিগকে আরও বেশী মর্য্যাদা প্রদর্শন করিতেছে। এই রায়বেঁশে নৃত্যের প্রতিভার ফলে হাই স্কুলের হেড মাষ্টারগণ ও এমন কি অনেক স্থলে পণ্ডিত ও মৌলভীগণও মালকোঁচা আঁটিয়া খালি গায়ে আপন আপন স্কুলের ছাত্রদের সঙ্গে পৌরুষ নৃত্যে এবং ব্যায়ামকলায় যোগদান করিয়া শিক্ষাক্ষেত্রে একটি নূতন সাম্যভাবের, মুক্তভাবের ও আনন্দময় ভাবের অবতারণা করিতেছেন।

স্বাস্থ্যের দিক দিয়া দেখিতে গেলে রায়বেঁশের পুনঃপ্রতিষ্ঠার ফলে জাতীয় জীবনের আরও প্রগাঢ় পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে। ব্রাহ্মণ-জাতীয় গ্র্যাজুয়েট শিক্ষকগণ ডোম্ বাউরি-জাতীয় রায়বেঁশেদের বংশধরদের সঙ্গে অবাধে নৃত্যে যোগ দিয়া এবং তাহাদিগকে ওস্তাদের পদে বরণ করিয়া আপনাদিগকে ধন্য মনে করিতেছেন এবং তাহাদিগের নিকট হইতে নৃত্য ও কসরত্ শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে রণডঙ্কা ও ঢোল বাজাইবার প্রণালীও শিক্ষা করিতেছেন।

ইহা সৌভাগ্যের কথা যে রায়বেঁশে আন্দোলনের সূত্রপাত হইবার ছয় মাসের মধ্যেই বাংলার শিক্ষা বিভাগের মন্ত্রী মহাশয়, বাংলার শিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টর এবং শারীর শিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টর সকলেই শিক্ষাক্ষেত্রে রায়বেঁশে নৃত্যের সবিশেষ উপযোগিতা উপলব্ধি করিয়া ইহার প্রভূত প্রশংসা করিয়াছেন এবং ড্রিলের পরিবর্ত্তে রায়বেঁশে নৃত্য ও রায়বেঁশে কসরত শিক্ষা দিবার প্রণালী প্রবর্ত্তিত করিবার জন্য শারীর শিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টর মহাশয় অনুশাসন প্রচার করিয়াছেন।

রায়বেঁশে নৃত্যের প্রবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে বাংলার প্রাচীন সংস্কৃতি-প্রসূত কাঠি নৃত্য, জারি নৃত্য, বাউল নৃত্য এবং কীর্ত্তন নৃত্যেরও প্রচলন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলিতে আমি করিতে সক্ষম হইয়াছি। ইহার কোনটিতেই বিলাস-বিভ্রমসূচক হাবভাব নাই। ব্যায়ামের সঙ্গে সঙ্গে এগুলি মনে নির্ম্মল আনন্দের ও স্ফূর্ত্তির বিকাশ এবং চরিত্রের নির্ম্মলতার ও উদারতার বিকাশ আনিয়া দেয়। সম্প্রতি বাংলার পল্লীগ্রামে ভদ্র পরিবারের মেয়েদের মধ্যে এখনও যে সব নির্ম্মল ব্রতনৃত্যের প্রচলন রহিয়াছে তাহার আবিষ্কার করিবার সুযোগ আমার হইয়াছে এবং মণিপুরী রাস-নৃত্য অথবা গুজরাটি গরবা নৃত্য হইতেও বাংলার নিজস্ব এই ব্রতনৃত্যগুলি যে অধিকতর নির্ম্মল ও উচ্চাঙ্গের রসকলা তাহা প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টাও আমি করিয়াছি।

গত ফেব্রুয়ারী মাসে সিউড়ীতে যে লোকনৃত্য শিক্ষাকেন্দ্র আমার তত্ত্বাবধানে খোলা হইয়াছিল তাহাতে বাংলার বহু জেলার উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ যোগদান করিয়াছিলেন এবং সেখানে নানাপ্রকার লোকনৃত্য, লোক-সঙ্গীত ও সমষ্টিনৃত্য ও সমষ্টিসঙ্গীত শিক্ষা করিয়া এগুলি

তাঁহারা আপন আপন বিদ্যালয়ে প্রবর্ত্তিত করিতেছেন। তাহার ফলে বাংলার অনেক সুদূর জেলার বিদ্যালয়েও ইতিমধ্যে লোকনৃত্য ও লোকসঙ্গীতের প্রবর্ত্তন হইতে আরম্ভ হইয়াছে। বিগত জানুয়ারী মাসে এবং এপ্রিল মাসে কলিকাতায় সুবিখ্যাত গল্ ন পার্কে দুইটি লোক-নৃত্য ও সঙ্গীত উৎসবের ব্যবস্থা আমার তত্ত্বাবধানে হইয়াছিল এবং ইহার ফলে বাংলার শিক্ষিত জনসাধারণ বাংলার নিজস্ব লোকনৃত্যের ও সঙ্গীতের এবং বিশেষ করিয়া বাংলার মেয়েদের মধ্যে প্রচলিত ব্রতনৃত্যের পুনরায় আদর করিতে শিখিয়াছেন বলিয়া আশা করা যায়। আমার রচিত অনেকগুলি সমষ্টিসঙ্গীতও (community songs) সমষ্টিনৃত্যের সঙ্গে গাহিবার প্রচলন অনেক বিদ্যালয়ে ইতিমধ্যে হইয়াছে। ইহাতে ছাত্রদের মধ্যে আনন্দজনক ব্যায়ামের সঙ্গে সঙ্গে একটা ঐক্যভাব জাগাইবার বিশেষ সহায়তা করিতেছে।

বাংলার নরনারীর মধ্যে বাংলার নিজস্ব সংস্কৃতিজাত বিশুদ্ধ নৃত্য ও সঙ্গীতের চর্চ্চা পুনঃপ্রবর্ত্তনের এই যে সূত্রপাত হইয়াছে,—তাহা সম্ভব হইয়াছে রায়বেঁশে নৃত্যের গৌরবময় আদর্শের ও প্রতিভার মর্য্যাদার ফলে, ইহ বোধ হয় সকলেই স্বীকার করিবেন। সুতরাং আমরা কামনা করি যে রায়বেঁশের এই পুনঃপ্রতিষ্ঠা বাংলার জীবনে চিরস্থায়ী ও চিরমঙ্গলদায়ক হোক্।

রায়বেঁশে তাণ্ডব
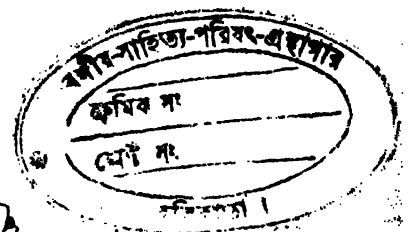
বঙ্গে স্বূফী-প্রভাব

মুহম্মদ এনামুল হক এম্-এ

বঙ্গে স্বূফী-প্রভাব অতি ব্যাপক ও গভীর। ইহা বাঙ্গালী হৃদয়ের উপর ঐস্লামিক মর্ম্মের এবং এদেশীয় চিন্তার উপর মুস্‌লিম ভাবের প্রভাব। পারস্য, বোখারা, সমরকন্দ আফগানিস্তান ও উত্তর-ভারতীয় "দরবীশ্" আখ্যাধারী স্বূফীরা, একদিন বাঙ্গলার ভাব-জগতের উপর কিরূপ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন, এখনও বঙ্গের বৈষ্ণব-সাহিত্যে, লৌকিক গাথায়, উচ্ছ্বাসময়ী কবিতায়, ভাব-প্রধান গীতিকায় এবং আউল, বাউল সাঁই, ফকীর, ধিক্‌র্ (জিকির) প্রভৃতি অসংখ্য মর্ম্মবাদী সাধক সম্প্রদায়ের মর্ম্ম-সঙ্গীতে, তাহার অপর্য্যাপ্ত আভাষ ও স্পষ্ট ছাপ দেখিতে পাওয়া যায়। এই দিক হইতে চিন্তা করিতে গেলে, বলিতে হয়, স্বূফীরাই খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ হইতে পঞ্চদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত বাঙ্গলার চিন্তাজগতে বিপ্লবী বীর ছিলেন। প্রকৃত পক্ষে, স্বূফীদের আগমনের পর হইতে বাঙ্গলার চিন্তাজগতে যে মহাবিপ্লব উপস্থিত হয়, তাহাই এদেশের ভাবধারার চিরাগত গতিকে এক নূতন পথে নবীন ভঙ্গীতে ও অভিনব গতিতে প্রবাহিত করিয়া দিয়া, ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীর বাঙ্গলাকে এক নব ভাবাবেশে প্রলুব্ধ, নূতন প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ ও অজানিত মর্ম্মের সন্ধানে মাতোয়ারা করিয়া তুলিয়াছিল। চিন্তারাজ্যে ও মর্ম্মজগতে যখন বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছিল, আনুষঙ্গিক ক্রিয়ারূপে কর্ম্মের জগতেও বিপ্লব দেখা দিয়াছিল। সুতরাং বাঙ্গলার স্বূফী-প্রভাবের ব্যাপকত্ব ও গভীরতা সহজেই অনুমেয়। ইহার ন্যায় গভীর ও ব্যাপক প্রভাবকে অল্প কথায় প্রকাশ করিতে গেলে, গোষ্পদে সমগ্র গগন নিরীক্ষণের অভিনয় করিতে হয়।

সে যাহা হউক, বঙ্গে মুসলমান রাজত্ব আরম্ভ হইবার বহু পূর্ব্ব হইতেই, এদেশে স্বূফী-প্রভাব পড়িতে থাকে। মুস্‌লিম রাজ্যের নানাস্থান হইতে "দরবীশ্" আখ্যাধারী স্বূফীরা একাদশ শতাব্দী হইতেই বঙ্গে দুই একজন করিয়া আগমন করিতে থাকেন, এবং এই আগমন-স্রোত মুস্‌লিম রাজ্য স্থাপনের পর হইতে ক্রমেই দ্রুত বর্দ্ধিত হইতে থাকে। পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষপাদ হইতে বিদেশীয় স্বূফীর বঙ্গাগমন ক্রমেই হ্রাস পাইতে থাকে এবং ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে তাহা একেবারেই লোপ পায় বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। খ্রীষ্টীয় একাদশ হইতে দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ পর্য্যন্ত বঙ্গে স্বূফী-প্রভাবের সূচনার যুগ; ত্রয়োদশ হইতে পঞ্চদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত ইহার প্রতিষ্ঠা ও বহুল-বিস্তৃতির যুগ, এবং ষোড়শ হইতে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ পর্য্যন্ত ইহার বিকৃতি ও দেশীয় ভাবধারার সহিত সংমিশ্রণের যুগ। সূচনার যুগে যে সকল স্বূফী বঙ্গে আসিয়াছিলেন, তন্মধ্যে অতি সংক্ষেপে নিম্নলিখিত কয়েকজনের নাম করা যায়:

১। সুল্‌ত্বান্ বায়িযীদ্ বিস্‌ত্বামী :—পারস্যের অন্তর্গত বিস্‌ত্বাম্ নগরের অধিবাসী ও অধিপতি সুল্‌ত্বান্ বায়িযীদ্ যৌবনে জীবনের সুখভোগ ত্যাগ করিয়া, সুদীর্ঘ ও কঠোর তপশ্চরণের পর, একজন বিশ্ববিখ্যাত তাপসে পরিণত হইয়াছিলেন। ৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে স্বদেশেই তাঁহার মৃত্যু ঘটে। তিনি চট্টগ্রামে আগমন করিয়াছিলেন বলিয়া লৌকিক গাথা ও প্রবাদ হইতে জানিতে পারা যায়। খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দী, এমন কি তৎপূর্ব্ব হইতে চট্টগ্রামে আরবীয় বণিকদের উপনিবেশ ছিল বলিয়া যে সকল প্রমাণ পাওয়া যায়, তাহাতে মনে হয় পারস্যের এই সাধকের চট্টগ্রাম আগমন অসম্ভব নহে। চট্টগ্রাম সহর হইতে পাঁচ মাইল উত্তরে, প্রকৃতির লীলানিকেতন নসীরাবাদ গ্রামের একটি ক্ষুদ্র পর্ব্বতচূড়ায়, এই সাধকের একটি কৃত্রিম সমাধি ও সাধনার স্থান আছে। প্রতি বৃহস্পতিবার অনেক লোক এই দরগাহে সমবেত হয়।

২। শাহ সুল্‌ত্বান্ রূমী :—ইঁহার শেষ উপাধি হইতে দেখা যায়, ইনি কস্তুন্তুনিয়া বা কনষ্টাণ্টিনোপলের অধিবাসী ছিলেন। ময়মনসিংহের নেত্রকোণা সাবডিভিশনের অন্তর্গত মদনপুরে এই বিখ্যাত সাধকের সমাধি আছে। ১০৭১

খ্রীষ্টাব্দে নবাব শায়িস্তা খাঁ কর্তৃক পীরোত্তর প্রদত্ত কোন ফার্সি দলিল হইতে দেখিতে পাওয়া যায়, এই সাধক ১০৫৩ খৃষ্টাব্দে (৪৪৫ হিজরী) তদীয় গুরু সায়্যিদ শাহ সুর্খ্‌ খুল্‌ তাস্তিয়া নামক কোন দরবেশ্‌ সমভিব্যাহারে মদনপুরে আগমন করিয়া, তদঞ্চলের তদানীন্তন কোচ্‌ রাজাকে "করামত্‌" বা আলৌকিক ক্রিয়াকলাপে মুগ্ধ করিয়া, তাঁহাকে ও তৎপ্রজা অনেক কোচ্‌কে ইস্‌লাম ধর্ম্মে দীক্ষিত করায় রাজা দরবেশ্‌কে সমস্ত গ্রাম দান করেন। ফার্সি দলিল দ্বারা এই প্রাচীন পীরোত্তর নূতন স্বত্রে মঞ্জুর করা হইয়াছিল। দরবেশ্‌ জীবনের শেষ অংশ মদনপুরেই অতিবাহিত করেন।

৩। শাহ্‌ সুল্‌তান্‌ বল্‌খী :—ইনি মধ্য এশিয়ার অন্তর্গত বল্‌খের অধিপতি ছিলেন বলিয়া জানা যায়। যৌবনে রাজ্যত্যাগ করিয়া দীর্ঘ সাধনার পর সিদ্ধত্ব লাভ করেন এবং ইস্‌লাম প্রচারোদ্দেশ্যে বঙ্গে আগমন করিয়া বগুড়া জেলার অন্তর্গত "মহাস্থান" নামক স্থানে তদানীন্তন মুস্‌লিম-বিদ্বেষী হিন্দু রাজা পরশুরাম ও তদীয় ভগ্নী তান্ত্রিক-ক্রিয়া-সিদ্ধা শীলাদেবীর সহিত যুদ্ধ করিয়া তাঁহাদিগকে যুদ্ধে পরাজিত করেন। বগুড়ায় তিনিই সর্ব্বপ্রথম ইস্‌লাম প্রচার করিয়াছিলেন ও একটি মস্‌জিদ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। তাঁহার জীবনকাল সম্বন্ধে বিশেষ কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ পাওয়া না গেলেও, প্রত্নতাত্ত্বিক ও অপরাপর পারিপার্শ্বিক বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য করিয়া আমাদের মনে হয়, তিনি খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর শেষভাগ কি দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে বঙ্গে আগমন করিয়াছিলেন। বগুড়ায় তাঁহার সমাধি এখন লক্ষ লক্ষ হিন্দু মুসলমানের তীর্থক্ষেত্র।

৪। মখ্‌দূম শয়্‌খ্‌ জলালু-দ্‌-দীন্‌ তবরীযী :—আইন-ই-আকবরী (Eng. Tra. Jarrett. Vol. III. p. 366), তারীখ-ই-ফরিশ্‌তহ্‌ (কাঃ দ্বাদশ অধ্যায়) ও তয্‌কিরহ্‌-ই-ঔলিয়া-ই-হিন্দ্‌ (উর্দ্দু, প্রথম ভাগ, পৃঃ ৫৪—৫৬) প্রভৃতি ফার্সি ও উর্দ্দু পুস্তকে, এবং "শেক শুভোদয়া" নামক প্রাচীন বিকৃত সংস্কৃত গ্রন্থে, এই দরবেশের যে বিস্তৃত কাহিনী লিপিবদ্ধ আছে, তাহা হইতে জানা যায়, তিনি শয়্‌খ শিহাবু-দ্‌-দীন্‌ সুহ্‌রবর্দীর (১১৫৭—১২৩৫ খ্রীঃ) শিষ্য, খব্‌াজহ্‌ কুত্‌বু-দ্‌-দীন্‌ বখ্‌তিয়ার কাকী (১১৪২—১২৩৬ খৃঃ) ও বহাউ দ্‌-দীন্‌ ধক্‌রিয়া মুলতানীর (১১৭৯—১২৩৭ খৃঃ) পরম বন্ধু ছিলেন। সংযুক্ত প্রদেশের ইটাওয়া বা "অট্টার" রাজ্যে তাঁহার জন্ম হইলেও, তিনি পিতৃপুরুষের উপাধি "তবরীযী" ব্যবহার করিতেন। সংযুক্ত প্রদেশেই তাঁহার শিক্ষা ও উত্তর ভারতের কোন পার্ব্বত্য অঞ্চলে তাঁহার সাধকজীবন আরম্ভ ও সমাপ্ত হয়। তিনি একজন বিখ্যাত পর্য্যটক ছিলেন এবং তদানীন্তন প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ মুস্‌লিম রাজ্য ভ্রমণ করিয়াছিলেন। ভ্রমণ করিতে করিতে তিনি যখন দিল্লীতে আসেন, তখন তাঁহার নামে কোন গায়িকার সতীত্বনাশের অপবাদ রটে ও রাজসমক্ষে তাঁহার বিচার হয়। এই বিচারে তিনি অলৌকিক-ভাবে নির্দ্দোষ বলিয়া প্রমাণিত হয়েন। অতঃপর তিনি দিল্লী ত্যাগ করিয়া বঙ্গে পৌঁছেন; তখন রাজা লক্ষণ সেন বাঙ্গলার অধিপতি। তাপসপ্রবর বঙ্গে পৌঁছিয়া মালদহের অন্তর্গত পাণ্ডুয়ায় বাস ও বিবিধ অলৌকিক কার্য্য প্রদর্শন করিয়া দলে দলে স্থানীয় লোককে ইস্‌লাম ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন। রাজা লক্ষণ সেন ও তদীয় মন্ত্রী হলায়ুধ মিশ্র সাধকের মাহাত্ম্যে বিমুগ্ধ হইয়া তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা-পরায়ণ হইয়া পড়েন। ১২২৫ খৃষ্টাব্দে তিনি পাণ্ডুয়ায় দেহ-ত্যাগ করেন। তাঁহার দরগাহ্‌ পাণ্ডুয়ায় "বাইশ হাজারী দরগাহ" নামে পরিচিত। এখনও বাঙ্গলার বিভিন্ন স্থান হইতে প্রতি বৎসর হাজার হাজার লোক তাঁহার দরগাহে সমবেত হয়।

এই সকল ঐতিহাসিক স্ফূীই বঙ্গে স্ফূী মত আনয়নের অগ্রদূত ছিলেন। কিন্তু নানা কারণে তাঁহারা স্ফূী-মতবাদকে বঙ্গে সুপ্রতিষ্ঠ করিতে পারেন নাই। এ দেশ তুর্কী কর্তৃক অধিকৃত হওয়ার পর হইতে উত্তর ভারতীয় স্ফূী সাধকের দ্বারা পরিচালিত, উৎসাহিত ও উদ্বুদ্ধ হইয়া, বাঙ্গলায় দলে দলে চিশ্‌তী সহ্‌রবর্দী, মদারী, কলন্দরী, কাদরী ও নক্‌শ্‌বন্দী স্ফূীরা প্রবেশ করিতে থাকেন। প্রধানতঃ তাঁহাদের দ্বারাই বঙ্গে স্ফূী-মত প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সময়ে যে সকল উত্তর ভারতীয় ও বিদেশীয় স্ফূী বঙ্গে আগমন করেন, তাঁহাদের সংখ্যা অগণ্য। তাঁহাদের মধ্যে কতিপয় প্রধান প্রধান ব্যক্তির নামোল্লেখ আবশ্যক। ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষভাগে, নিয়ামু-দ্‌-দীন্‌-ঔলিয়ার শিষ্য

শয়খ্ অখী সিরাজুদ্-দীন্ বদায়ুনী (মৃঃ ১৩৫৭ খ্রীঃ) বঙ্গের রাজধানী গৌড়ে প্রতিষ্ঠালাভ করেন। শয়খ নূর-দ্-দীন্ কুত্ব্-ই 'আলম (মৃঃ ১৪১৫ খ্রীঃ) রাজা গণেশের পুত্র যদুকে জলালু-দ্-দীন্ ফতহ্-ই-শাহ্ ইস্লাম ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন; গৌড়ে তাঁহার সমাধি এখনও প্রসিদ্ধ। দিল্লীর সুল্তান্ জলালু দ্দীন্ খিল্জীর ভাগিনেয় শাহ্ সুফীউদ্-দীন্ শহীদ্ (মৃঃ ১২৯৫ খৃঃ) হুগলী জেলার অন্তর্গত পাণ্ডুয়ার রাজাকে পরাজিত করিয়া ঐ অঞ্চলে ইস্লাম প্রচার করিয়াছিলেন। বর্দ্ধমানের হাজী বহ্রাম্ সক্কহ্, স্থানীয় হিন্দুযোগী জয়পালকে ইস্লাম ধর্ম্মে দীক্ষিত করেন। তিনি ১৫৬২ খৃষ্টাব্দে বর্দ্ধমানেই দেহরক্ষা করেন। "রিসাল-তু শ্ শুহাদা" নামক প্রাচীন ফার্সি পুস্তক হইতে জানিতে পারা যায়, উত্তরবঙ্গে শাহ্ ইস্মা'ঈল্ গাযী (মৃঃ ৪৭৪ খৃঃ) নামক প্রসিদ্ধ আরবীয় সাধক ইস্লাম প্রচার করিয়াছিলেন। রংপুরের কাঁটা দুয়ারে তাঁহার প্রসিদ্ধ সমাধি অদ্যাপি বর্ত্তমান। বঙ্গদেশের পূর্ব্বাঞ্চলে ও শ্রীহট্টে যিনি ইস্লাম প্রচার করিয়াছিলেন, তাঁহার নাম শাহ্ জলাল্ মুজর্‌দ্ রদ-ই য়মী। ইব্ন বতুতার ভ্রমণবৃত্তান্ত ও শিলালিপির প্রমাণের উপর নির্ভর করিলে দেখা যায়, তিনি শ্রীহট্টে ১৩৪৬ খৃঃঅব্দে দেহরক্ষা করিয়াছিলেন। চতুর্দ্দশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে চট্টগ্রামে পীর বদর ইস্লাম প্রচার করেন, তাঁহার সহযোগী মুহ্সিন্ ঔলিয়ার (মৃঃ ১৩৮৭ খ্রীঃ) দ্বারা চট্টগ্রামের দক্ষিণাঞ্চলে ইস্লাম প্রচারিত হইয়াছিল।

পঞ্চদশ শতাব্দীর পরবর্ত্তী কাল হইতে বাঙ্গলায় উত্তর-ভারতীয় ও বিদেশীয় দরবীশগণের আগমন স্থগিত হইয়া আসে। সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালী সুফীরা তাঁহাদের পরিত্যক্ত ক্ষেত্র অধিকার করিয়া বসিতে থাকেন। বঙ্গীয় সুফীরা দেশীয় প্রভাব হইতে মুক্ত ছিলেন না। এই সময় হইতেই, কতক স্বাভাবিক ও কতক পারিপার্শ্বিক কারণে, ধীরে ধীরে সুফী-মতবাদে বাঙ্গলার নিজস্ব চিন্তাধারা, হিন্দু যোগ, তন্ত্র ও মন্ত্র প্রভৃতির সংমিশ্রণ ঘটিতে থাকে। এই যুগের বঙ্গীয় সুফী-সাহিত্য প্রধানতঃ বঙ্গভাষায় লিখিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। সপ্তদশ শতাব্দীর পর হইতে যে সকল বঙ্গীয় সুফী-সাহিত্য পাওয়া যায়, তাহা "যোগ-কালন্দর" "জ্ঞান-প্রদীপ" "জ্ঞান সাগর" প্রভৃতি নামে পরিচিত, এবং সেই পুস্তকগুলি দেশীয় কুসংস্কার ও হিন্দু চিন্তায় এতই ভরপুর যে, তাহাদিগকে সুফী-সাহিত্য নামে অভিহিত করিতে ইচ্ছা হয় না।

বাঙ্গলার সুফী-মতবাদের ধারা যে পথ ধরিয়া অগ্রসর হইয়াছিল, তাহার অতি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস এইরূপ। প্রধানতঃ যাঁহাদের প্রবর্ত্তনায় এদেশে ইস্লাম প্রচারিত হয়, তাঁহারা দিগ্বিজয়ী তুর্কী, পাঠান কি মোগল নহেন, —তাঁহারা এদেশের নিঃস্ব, নিঃসহায় ও সংসারত্যাগী মুসলমান সাধকের দল, অর্থাৎ সুফী-সম্প্রদায়। এদেশে ইস্লাম-বিস্তৃতি সুফীদেরই অমরকীর্ত্তি, সুফীদেরই কাল-বিজয়ী গৌরবস্তম্ভ। "মৌলভী" ও মৌলানা আখ্যাধারী শাস্ত্রবিদ্গণ ধর্ম্মের নীরস, শুষ্ক ও বিস্বাদ আলোচনার দ্বারা ধর্ম্মপ্রচারের অভিনয় করিয়া যাহা সাধন করিতে পারেন নাই, বঙ্গের উদারহৃদয় সুফীরা প্রেমের গান গাহিয়া ও পতিত, দুঃখিত, লাঞ্ছিত ও ঘৃণিত মানবতার সেবা করিয়া তাহা অনায়াসেই সাধন করিয়াছিলেন। যাঁহারা মনে করেন বাঙ্গলার মুসলমান রাজা বাদসাহেরা কেবল ক্ষাত্রবীর্য্যবলে বাঙ্গালী হিন্দুকে ইস্লাম ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন, তাঁহারা ইতিহাস-অনভিজ্ঞ। দুই একটি বিশেষ ক্ষেত্রে মুসমানেরা বলপূর্ব্বক এদেশবাসীকে ইস্লাম ধর্ম্মে দীক্ষিত করিলেও তাহার সংখ্যা এতই নগণ্য যে, তাহা অনায়াসেই বাদ দেওয়া যায়। মুক্ত ও উদার ঐস্লামিক প্রাণ লইয়া এবং বিশ্বজনীনতার বাণী বহন করিয়া সুফীরাই বাঙ্গালীর হৃদয় জয় করিয়াছিলেন। তাঁহাদের "খান্‌কাহ্" বা আশ্রমগুলিতে পাপী পাপ মোচন করিত, তাপী স্বর্গীয় সান্ত্বনা পাইত, পীড়িত সেবা এবং ক্ষুধিত অন্নলাভ করিয়া নিজকে ধন্য মনে করিত। তাঁহারা জনসাধারণের সম্মুখে ইস্লামের যে দিকটা তুলিয়া ধরিয়াছিলেন, তাহাতে জাতিধর্ম্মের বিচার ছিল না, হিংসা-বিদ্বেষের স্থান ছিল না, অন্ধকারের অস্তিত্ব ছিল না,—তাহা ছিল উজ্জ্বল, মধুর ও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর। তাই দলে দলে লোক ঐ দিকে আকৃষ্ট হইয়াছিল, এবং অনেক ক্ষেত্রে তাহারা স্বেচ্ছায় জাতি ও ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া ইস্লাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিল।

বাঙ্গলার সূফীরাই মুসলমান বিজেতা ও হিন্দু বিজিত-দের মধ্যে মিলনের যোগসূত্র। ত্রয়োদশ শতাব্দীর বিজয়মদমত্ত তুর্কীরা যখন বাঙ্গলায় মুস্‌লিম সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপন করেন, তখন বিজিত হিন্দুরা কখনও, মুসলমানের ন্যায় বিদেশীয় ও বিজাতীয় লোকগুলিকে গ্রহণ করিতে পারেন নাই। আচারে, ব্যবহারে, ভাষায়,—সমাজ ও সভ্যতায় সম্পূর্ণরূপে পৃথক একটি জাতিকে কখনও আর একটি জাতি অত শীঘ্র গ্রহণ করিতে পারে না। সুতরাং এদেশের হিন্দু সমাজ মুসলমান সমাজ হইতে সম্পূর্ণ দূরে ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। ক্ষাত্রশক্তিবলে দেশজয় ও শাসন যত-খানি সহজ, হৃদয় জয় করা ততখানি কঠিন। তুর্কীরা অপরাজেয় ক্ষাত্রবীর্য্যবলে বাঙ্গলাকে জয় করিয়াছিল সত্য কিন্তু বাঙ্গালীকে জয় করিতে পারে নাই। বাঙ্গলায় মুস্‌লিম রাজ্য স্থাপনের পর হইতে যোড়শ শতাব্দীর প্রারম্ভ-কাল পর্য্যন্ত অবারিত স্রোতে সূফীরা যখন এদেশে আগমন করিতে থাকেন, তখন হইতে বাঙ্গালীর দৃষ্টি ঐস্লামিক মর্ম্মমুখী হইয়া পড়িতে থাকে; মুসলমানদিগের শিক্ষা, ধর্ম্ম ও সভ্যতার দিকে বাঙ্গালী আকৃষ্ট হন। বিজয়মদমত্ত তুর্কীদের আগমনে বাঙ্গালী জাতি মুসলমান বিজেতাদের পৌরুষ ও ক্ষাত্রবীর্য্যই দেখিয়াছিল,—মুসলমানদের প্রাণের সন্ধান লাভ তাঁহাদের ভাগ্যে শীঘ্র ঘটে নাই। বঙ্গে সূফী সম্প্রদায়ের আগমনে বাঙ্গালীরা সর্ব্বপ্রথম এই সুযোগ লাভ করিলেন। সংসারত্যাগী সাধকগণ জীবনের সুখভোগ হইতে দূরে সরিয়া নিয়ত প্রচার ও অলৌকিক ক্রিয়াকলাপের দ্বারা বাঙ্গালীর হৃদয় জয় করিতে থাকেন। অলৌকিকত্বে অতিরিক্ত বিশ্বাসপরায়ণ বাঙ্গালী জাতি সূফীদের অলৌকিকত্ব,ত্যাগ, বদান্যতা ও বৈরাগ্যের দৃষ্টান্তে যতই মুগ্ধ হইতে থাকে ততই তাহারা মুসলমানদের নিকটবর্ত্তী হইয়া পড়ে—ইহাই স্বাভাবিক। রাজসংস্রব হইতে দূরে থাকিয়া অধিকাংশ সূফী সাধকেরা সাধন ও প্রচারের জন্য বঙ্গের বিভিন্ন স্থানে যে পর্ণকুটীর নির্ম্মাণ করিলেন তাহা কি গৌড় কি ঢাকার গগনচুম্বী রাজপ্রাসাদমালাকে হার মানাইয়া দিল—হিন্দু মুসলমান নির্ব্বিশেষে বাঙ্গালীর পুণ্য তীর্থে পরিণত হইল। মুসলমান বিজেতাদের ক্ষাত্রশক্তি মুসলমান সাধকের আত্মিক শক্তির নিকট পরাজিত হইল। বাঙ্গলায় মুস্‌লিম্ রাজ্য স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে ইসলাম বিস্তৃতির ইতিহাস এইরূপ।

বঙ্গে মুসলমান রাজ্য সংস্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে সূফীদের প্রচার ও প্রবর্ত্তনায় ইস্‌লাম বিস্তৃতি লাভ করায় ইস্‌লামের মত একটি সম্পূর্ণ নূতন ধর্ম্ম ও মুসলমান সভ্যতার মত একটি নূতন কৃষ্টিমূলক বস্তুর সংস্রবে আসিয়া বঙ্গের ধর্ম্ম, সমাজ ও সভ্যতার ক্ষেত্রে এক নব ভাববিপ্লবের সৃষ্টি হয়। এই ভাববিপ্লব এদেশের প্রাচীন ধর্ম্ম, সমাজ ও সভ্যতাকে নানাভাবে ন্যূনাধিক প্রভাবিত করি-য়াছে। প্রভাব কোন কোন ক্ষেত্রে এত গভীর ও ব্যাপক যে তাহার সম্যক আলোচনা এস্থলে অসম্ভব। সাধারণতঃ ভাববিপ্লবে দেশের যে অবস্থা ঘটে ইস্‌লাম-বিস্তৃতিতে তাহারই পুনরাভিনয় হইয়াছিল। ফলে বাঙ্গলার প্রাচীন ধর্ম্ম, সমাজ ও সভ্যতা কোথাও কোথাও নব ভাব, নবীন কর্ম্ম ও নূতন ধর্ম্মের সহিত সমতালে পা ফেলিতে গিয়া নানারূপে জানিত ও অজানিত ভাবে সংস্কৃত হইয়া অগ্রসর হইতে লাগিল।

সে যাহা হউক, বাঙ্গলায় সূফী—তথা ঐস্লামিক প্রভাব স্থির নিশ্চিত। প্রধানতঃ সূফীদের প্রচার ও প্রবর্ত্তনায়, বাঙ্গলায় যে ইস্‌লাম-বিস্তৃতি ঘটিল তাহা আরবীয় পৌরুষ ও দৃঢ়তাব্যঞ্জক ইস্‌লাম হইতে শিথিল, কোমল ও মধুর হইয়া পড়িয়াছিল বলিয়া, স্বাভাবিক কারণে অনেক-খানি স্বতন্ত্র হইয়া পড়িল। প্রকৃত পক্ষে বলিতে গেলে, আরবীয় ইস্‌লাম হইতে ভারতীয় ও বঙ্গীয় ইস্‌লামের এহেন স্বাতন্ত্র্যই, বঙ্গে তাহার অসম্ভব কৃতকার্য্যতা লাভের প্রধান কারণ। ভারতীয় ও বঙ্গীয় ইস্‌লামের স্বাতন্ত্র টুকু মুছিয়া দিয়া,—ইহার শৈথিল্য, কোমলতা, মধুরতাকে প্রাচীন আরবীয় পৌরুষ ও দৃঢ়তা দান-মানসে,যোড়শ শতাব্দী হইতে ভারত তথা বঙ্গে, মুজদ্দদ্-ই-অল্‌ফ্-ই আনী (১৫৬৩—১৬১৪ খ্রীঃ), ঔরঙ্গজীব প্রভৃতির সংস্কারপ্রচেষ্টা চলিতে থাকে, এবং মিহদী, ওহাবী ও অহ্‌মদী প্রভৃতি সংস্কার-মূলক আন্দোলনের প্রবর্ত্তন হয়। এই সময়ে বাঙ্গলায় ইস্‌লাম-বিস্তৃতিতে এদেশের প্রাচীন ধর্ম্ম, সমাজ ও সভ্যতারও বিকৃতি ঘটে। সুতরাং অচিরেই হিন্দু সমাজেও

সংস্কার-আন্দোলন আরম্ভ হইল। এই সংস্কার-আন্দোলন দুই পথেই অগ্রসর হইয়াছিল—এক পথ ধরিয়া রক্ষণশীল দল চলিতেছিল; আর অন্য পথ ধরিয়া চলনশীল দল অগ্রগমন করিতেছিল। রক্ষণশীল দল হিন্দু সমাজ ও সভ্যতার প্রাচীন নিষ্ঠাচার ও বিশুদ্ধতাকে সমাজে পুনঃ প্রবর্ত্তন করিতে চেষ্টা করিলেন। তাঁহাদের এই আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করিলেন—স্মার্ত্ত রঘুনন্দন; তিনি গৌড়াধিপতি হুশয়ন্ শাহের (১৪৯৩—১৫১৯ খ্রীঃ) সমসাময়িক ছিলেন। রঘুনন্দন হিন্দু ধর্ম্ম ও সমাজকে ইস্‌লামের কবল হইতে রক্ষা করিতে গিয়া প্রাচীন স্মৃতি, শ্রুতি প্রভৃতি শাস্ত্রসমুদ্র মন্থন করিয়া যে নূতন শাস্ত্রীয় ব্যবস্থা প্রস্তুত করিলেন, তাহা এখনও বাঙ্গলার নিষ্ঠাবান ও আচারপরায়ণ হিন্দুদিগের দৈনন্দিন জীবনের নিয়ামক। চলনশীল দলও হিন্দু সমাজ ও সভ্যতাকে ইস্‌লামের হাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহাদের চেষ্টা রক্ষণশীল দল হইতে ভিন্ন ছিল। রক্ষণশীল দলের ন্যায় তাঁহারা অতীতের দিকে ফিরিয়া যাইতে চেষ্টা করিলেন না। তাঁহারা দেখিলেন, ইস্‌লামী সভ্যতার সংশ্রবে আসিয়া, কোন কোন ক্ষেত্রে হিন্দুর পতন ঘটিলেও অনেক বিষয়ে তাঁহারা উন্নতি লাভ করিয়াছেন। তাই তাঁহারা এই নবীন সভ্যতা হইতে দূরে সরিয়া আত্মরক্ষা করিবার চেষ্টা না করিয়া ইহার মঙ্গলময় দিক গ্রহণপূর্ব্বক হিন্দুকে হিন্দু রাখিয়া, মুসলমান সভ্যতার সহিত সমান তালে পা ফেলিয়া চলিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইলেন। এই চলনশীল দলের নায়কত্ব গ্রহণ করিলেন চৈতন্যদেব (১৪৮৪—১৫৩৩ খ্রীঃ)। এইরূপেই বাঙ্গলা দেশে ষোড়শ শতাব্দীতে নবীন বৈষ্ণবমতের উদ্ভব হইল ও নব বৈষ্ণব সম্প্রদায় গড়িয়া উঠিল। ইঁহারা গৌড়ীয় বৈষ্ণব নামে অভিহিত হন। গৌড়ীয় বৈষ্ণবমত প্রাচীন বৈষ্ণবমত হইতে অনেকখানি পৃথক, এবং এই পার্থক্যের একমাত্র কারণ পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীর বঙ্গীয় হিন্দু সমাজের উপর ইস্‌লাম ধর্ম্মের প্রভাব।

বাঙ্গলার রাষ্ট্র, সমাজ ও সভ্যতার ঐস্‌লামিক প্রভাবের কথা বাদ দিয়া, এদেশের ভাববিকাশের ধারার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে, দেখা যায়, সূফী সাহিত্য ও চিন্তা বাঙ্গালীর প্রাণে অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে রসসিঞ্চন করিয়াছে। পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীতে হিন্দু-মুসলমান নির্ব্বিশেষে বাঙ্গালী যে ফার্সি ভাষার চর্চ্চা করিতেন, আজ প্রায় পাঁচশত বৎসর পর তাহা স্বপ্নের মত মনে হইলেও, তাহা একান্তই সত্য কথা। জয়নন্দের "চৈতন্যমঙ্গল" হইতে জানা যায়, বাঙ্গালীরা ষোড়শ শতাব্দীতে "মনসরী" পাঠ করিত। এই "মনসরী" যে মৌলানা জালালুদ্দীন্ রুমীর "মস্‌নবী" (উচ্চারণ মস্‌নবী) তাহা সন্দেহ করিবার কারণ নাই। ফার্সি ভাষার সর্ব্বোৎকৃষ্ট রত্ন—সূফীসাহিত্য। সুতরাং যখনকার কথা বলা হইতেছে, তখন বাঙ্গালীরা সূফী সাহিত্যের রস-উপভোগে বিভোর ছিলেন। বৈষ্ণবদের সাহিত্য হইতে তাহার অসংখ্য উদাহরণ পাওয়া যায়। বৈষ্ণবদের পদাবলী-সাহিত্যে সূফী-সাহিত্যের যে আংশিক মিশ্রিত প্রতিধ্বনি শুনিতে পাই, তাহা নিতান্তই স্পষ্ট। উদাহরণ স্বরূপ এইস্থলে একটি কথার উল্লেখ করিব। সূফী ও বৈষ্ণব সাহিত্যে "সাকী" ও "রাধা"র প্রয়োগ এক। "সাকী" সবে মাত্র গোঁপরেখা দেখা দেওয়া পান্থশালার কিশোরবয়স্ক পরিচারক হইলেও, সূফীরা সাহিত্যের ক্ষেত্রে তাহাকে পরিচারিকার বেশে সাজাইয়া তাহার দ্বারা প্রেমশিরাজী বিতরণ করাইয়াছিলেন। সূফী "সাকী" কখনও স্বয়ং ভগবান, কখনও মিলনাকাঙ্ক্ষী মানবমনের বিগলিত মূর্ত্তিমান প্রেম,—আবার কখনও কখনও পরমেশ্বরের প্রেম মানুষের নিকট, বা মানুষের প্রেম পরমেশ্বরের নিকট নিবেদন করিবার জন্য দূতিকারূপে ব্যাখ্যাত হইয়া থাকে। গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের মতেও "রাধিকা" মিলনাকাঙ্ক্ষী মানবমনের মূর্ত্তিমতী প্রেমরূপা। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যেন কেবল লীলারস আস্বাদনের মানসে প্রেমকেই "রাধিকা"র মূর্ত্তিদান করিয়াছেন! "রাধিকা" শ্রীকৃষ্ণের পদে প্রেম-নিবেদন মানসে বৃন্দাবনের তালতমালকুঞ্জে উন্মাদিনীর বেশে ঘুরিয়া বেড়ান; "সাকী"ও প্রেম-শিরাজী হাতে সরাইখানার কক্ষে কক্ষে এবং শিরাজের গোলাপ-উপবনের রম্য বীথিতলে ভ্রমণ করে। "রাধিকা" যমুনার জলবাহিনী,—"সাকী" প্রেমের মদিরা-বাহী।

সাহিত্যের কথা বাদ দিলেও, গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্মতত্ত্বে

স্থফীদের প্রভাব কম নহে। চৈতন্যদেব স্বয়ং ফার্সি জা'নতেন কিনা, তাহা বৈষ্ণবদের ইতিহাস হইতে বিশেষভাবে জানা না গেলেও, অপরাপর প্রমাণ হইতে দেখা যায়, তাঁহাদের উপর স্থফীদের যথেষ্ট প্রভাব ছিল। চৈতন্যদেবের সহিত মুসলমান সাধকদের ভাবের আদান-প্রদান হইয়াছিল। বৈষ্ণব ইতিহাস হইতে জানা যায়, পাঠান বিজলী খাঁ ও তদীয় গুরু কৃষ্ণাম্বরপরিহিত কোন মুসলমান সাধু ধর্মতর্কে পরাস্ত হইয়া চৈতন্যদেবের হাতে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। পরবর্ত্তী বৈষ্ণব ঐতিহাসিকগণ নানা কারণে মুসলমানদের সংশ্রব হইতে চৈতন্যদেবকে মুক্ত করিতে গিয়া যে ইতিহাস লিখিয়াছেন, তাহা নানাকারণে বিশ্বাসযোগ্য নহে। চৈতন্যদেব স্বয়ং যে স্থফী প্রভাব হইতে মুক্ত ছিলেন না, তাহা সত্য কথা। ইস্লামের সার্ব্বজনীন ভ্রাতৃত্বের আহ্বান চৈতন্যদেবকে আকৃষ্ট করিয়াছিল; তাই তৎপ্রচারিত নব বৈষ্ণব ধর্ম্মে অহিন্দুরও প্রবেশাধিকার ছিল,—তাই যবন হরিদাস বৈষ্ণব দলে পূজিত হইয়াছিলেন। বৈষ্ণবদের কৃষ্ণতত্ত্ব অর্থাৎ ভাগবততত্ত্বে ভারতীয় স্থফীদের প্রভাব পরিস্ফুট। গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের ভগবান-পরিকল্পনায় বিশ্বব্রহ্মবাদিতার (Pantheism) যে ছাপ রহিয়াছে, তাহা উপনিষদ প্রমুখ ভারতীয় দর্শন-প্রধান শাস্ত্রীয় গ্রন্থের প্রভাবের ফল; কিন্তু, উহাতে যে দৃঢ়তাব্যঞ্জক একেশ্বরবাদিতা পাওয়া যায়, তাহা সম্পূর্ণভাবে ঐস্লামিক না হইলেও অন্ততঃ তার দৃঢ়তাটুকু ঐস্লামিক। কেন না, উপনিষদের একেশ্বরবাদ, ঐস্লামিক একেশ্বরবাদের ন্যায় দৃঢ়তাব্যঞ্জক ত নয়ই, বরং তাহা বিশ্বব্রহ্মবাদিতার ছায়ায় অনেকখানি ঢাকা পড়িয়া গিয়াছে। সুতরাং গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের একেশ্বরবাদিতা ইস্লামের দান না হইলে, এতখানি দৃঢ়তা লাভ করিত কিনা সন্দেহ।

চৈতন্যদেবের সমগ্র জীবন স্থফী-মর্ম্মবাদী সাধকের জীবনের সহিত একসূত্রে গ্রথিত। স্থফীদের "জিকিরের" ন্যায় তিনি "কৃষ্ণনামামৃত" পান করিতেন। এই নামামৃত পান করিতে করিতে স্থফীদের "ওজদের" ও "হালের" অবস্থার ন্যায় তিনিও "দশাগ্রস্ত" হইয়া পড়িতেন। স্থফীরা যেমন গান-বাজনার (সমা) সাহায্যে চিত্তকে উদ্দীপ্ত করিয়া সমবেত ভাবে "জিকির" করিতে করিতে "হলকহ্" করিতেন,—কীর্ত্তন সৃষ্টি করিয়া, চৈতন্যদেবও স্থফী-মানসিকতার পরিচয় দিয়াছেন। চৈতন্যদেব ও বৈষ্ণব সাহিত্যিকদের "প্রেম", স্থফীদের "ইশ্ক"এর ভারতীয় নাম মাত্র। চৈতন্যপূর্ব্ব ভারতীয় "প্রেম" হইতে, বৈষ্ণব "প্রেম" যে পৃথক তাহা কাহারও অবিদিত নাই। এই "প্রেম" ও স্থফীদের "ইশ্ক" একইভাবে ব্যাখ্যাত ও একইরূপে সাহিত্যে প্রযুক্ত হইয়াছে।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজের উপর স্থফীদের প্রভাব কত গভীর ও ব্যাপক তাহা এই সমাজের আচার-ব্যবহার ও বিশ্বাসের দিকগুলিকে এক একটি করিয়া পরীক্ষা করিলে দেখিতে পাওয়া যায়। এহেন পরীক্ষা এস্থানে অসম্ভব বলিয়া, আমরা গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের মাত্র একটি শাখার কথা উল্লেখ করিব। বঙ্গের সখীভাবক সম্প্রদায় গৌড়ীয় বৈষ্ণবদেরই একটি শাখা। শ্রীকৃষ্ণকে স্বামী এবং নিজদিগকে তাঁহার এক একজন সখী মনে করাই এই সম্প্রদায়ের বৈশিষ্ট্য। এহেন সখীভাব ধারণ করার ফলে, সখীভাবক সম্প্রদায় প্রকাশ্য ভাবে স্ত্রীপুরুষ নির্ব্বিশেষে রমণীর বেশভূষা পরিধান করিয়া থাকেন, ও শ্রীকৃষ্ণকে নিছক প্রেমভাবে আরাধনা করেন। এই সম্প্রদায়টি ভারতীয় "সদা-সোহাগ" স্থফী সম্প্রদায়ের অনুকরণে যে গঠিত হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই। আহমদাবাদের বিখ্যাত সহ্রবর্দী সম্প্রদায়ভুক্ত সাধক শাহমূসা "সদা-সোহাগ" (১৪৪৯ খ্রীঃ মৃঃ) ভারতীয় "সদা-সোহাগ" সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। শাহমূসা ভগবানকে স্বামী ও নিজকে তাঁহার স্ত্রী মনে করিতেন, এবং এহেন রমণীসুলভ মানসিকতার ফলে সারাজীবন তিনি রমণীর বেশভূষায় সজ্জিত হইয়া অতিবাহিত করিয়াছিলেন। তাঁহার দলভুক্ত দরবেশগণ এখন গুরুর পন্থানুসরণে রমণীর বেশভূষা পরিয়া এবং নিজদিগকে ভগবানের স্ত্রী বলিয়া ধরিয়া লইয়া সারাজীবন রমণীর জীবন অভিনয় করিয়া থাকেন। সুহ্রবর্দী সম্প্রদায়ভুক্ত সাধকদের মধ্যস্থতায় পশ্চিম-ভারতীয় এই "সদা-সোহাগ" মতবাদ বাঙ্গলায়ও প্রচলিত ছিল। সখীভাবক সম্প্রদায় তাহারই নূতন সংস্করণ।

বাঙ্গলায় ইস্লামের লৌকিক দিকের সৃষ্টি স্থফীদেরই কীর্ত্তি। সংসারত্যাগী মুসলমান সাধকদের

"আস্তান." ও "খানকাহ"গুলি হইতে বহুপূর্ব্বেই ধর্ম্মান্ধতা ও গোঁড়ামী নির্ব্বাসিত হইয়াছিল। মুসলমান সাধকগণ পরার্থে জীবনপণ করিয়াছিলেন,—মানবতার সেবায় তাঁহাদের জীবন উৎসর্গিত হইয়াছিল। তাই তাঁহারা হিন্দুমুসলমান নির্ব্বিশেষে বাঙ্গালীর শ্রদ্ধের ও পূজনীয় ছিলেন। বাঙ্গলার প্রাচীন দরবেশেরা আজিও যেমন মুসলমানের "শীরণী" লাভ করে. তেমনই হিন্দুর ভোগ ও পূজা পায়। বাঙ্গলার হিন্দু মুসলমান আজিও পীরের প্রসাদকে পুণ্যজনক ও গৌরবসূচক মনে করে। অবতারবাদী হিন্দুর নিকট দরবেশেরা অবতার বলিয়া বিবেচিত হইতেন। অন্যান্য মুসলমানেরা যেমন গোঁড়া ও নিষ্ঠাবান হিন্দুর নিকট অস্পৃশ্য ও ম্লেচ্ছ বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে, মুসলমান সাধকেরা কখনও তদ্রূপ বিবেচিত হন নাই। বাঙ্গলার হিন্দুদিগের মধ্যে কালক্রমে এইরূপ মানসিকতা প্রকাশ পাওয়ায়, পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীতে আসিয়া তাঁহারা ইস্‌লাম ধর্ম্ম ও মুসলমান জাতির প্রতি শ্রদ্ধাপরায়ণ হইয়া পড়িয়াছিলেন। ইহার ফলে, অনেকে ইস্‌লাম ধর্ম্মগ্রহণ করিয়াছিলেনও। কিন্তু যাঁহারা ইস্‌লাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন, তাঁহারা আচারে, ব্যবহারে, মনোভাবে, অন্তরের অকপট বিশ্বাসে সম্পূর্ণরূপে মুসলমান হইতে পারিলেন কিনা জানি না; তাহা দুই এক শতাব্দীর মধ্যে হয় ত সম্ভবপরও ছিল না। তবে যাঁহারা ইস্‌লাম গ্রহণ করিলেন না, তাঁহারাও ইস্‌লামের সঙ্গে মিল রাখিয়া বেশ সৌহৃদ্য সহকারে চলিবার চেষ্টা করিলেন। এইরূপে বাঙ্গালী হিন্দু মুসলমানের মানসিকতা পরিবর্ত্তিত হইয়া পড়ায়, দেশের হিন্দু ও মুসলমান সুধীগণ ধর্ম্মসমন্বয়ের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তাহার ফলে বাঙ্গলায় ইস্‌লামের মধ্যে একটি লৌকিক দিক গড়িয়া উঠিতে লাগিল। বাঙ্গলায় এদেশে লৌকিতার উদ্ভবে, সুফীদের হাত ছিল বলিয়া, তাহাতে তাঁহাদের প্রভাব অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে ফুটিয়া উঠিল। এই সময়ে কতকগুলি বিষয়ে বাঙ্গলায় ইস্‌লামের লৌকিক দিক মূর্ত্তিমান হইয়া দেখা দিল। যাবীমিঞা, পাঁচপীর, সত্যপীর ও মাণিক-পীর প্রভৃতি বাঙ্গলার হিন্দু বিশ্বাস ও ঐস্লামিক বিশ্বাসেরই মিলিত সৃষ্টিলীলা। এই লৌকিক বিশ্বাসে সুফীদের প্রভাব প্রচুর। সুন্দরবনের, মুসলমান ও হিন্দুর কাঠুরিয়া ব্যাঘ্রদেবতা "যাবীমিঞা" ও "কালুবাবী," প্রাচীন লৌকিক হিন্দু দেবতা দক্ষিণরায় ও কালুরায়ের বিকৃত ঐস্লামিক সংস্করণ। "পাঁচপীর"-বিশ্বাসে পীরের প্রভাব যতই থাকুক, হিন্দুর প্রিয় সংখ্যা পাঁচ (এস্থলে পঞ্চসতী, পঞ্চপংক্তি, পঞ্চবট, পঞ্চনদ, পঞ্চায়েত,পাঁচকড়ি প্রভৃতির কথা স্মরণীয়) যে পীরের সংখ্যাও পাঁচটিতে সীমাবদ্ধ করিয়া দিয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। "সত্যপীর" সত্যই পীর নহেন; তাঁহাকে ইস্‌লাম ও হিন্দু ধর্ম্মের মিলনাকাঙ্ক্ষী বাঙ্গালীমনের নবসৃষ্ট পীরমূর্ত্তি বলিয়া উল্লেখ করিতে পারি। "মাণিকপীর" বাঙ্গালীর সর্ব্বসিদ্ধিদাতা গণেশের রূপান্তর না হইলে ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিতে পারিতেন কিনা সন্দেহ।

ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে বাঙ্গলায় স্বাধীন চিন্তার বিকাশ হইয়াছিল; সুফীদের প্রভাবই তাহার অন্যতম কারণ। কোন কোন ক্ষেত্রে বাঙ্গলার এই চিন্তার মুক্তি উচ্ছৃঙ্খলতায় পর্য্যবসিত হইলেও বাঙ্গালীর চিন্তাজগতে এই দান নূতন। চিন্তার মুক্তি অনুন্নত জনসাধারণের মধ্যে যেমন দেখা দিয়াছিল উন্নত দলের মধ্যে তেমন নহে। বাঙ্গলার অনুন্নত জনসাধারণ শিক্ষার অভাবে ও সমাজের নিগ্রহে কোন দিন কোন বিষয়ে নূতনভাবে চিন্তা করিতে শিখে নাই। শিক্ষিত ও উচ্চশ্রেণীর লোকেরা চিরদিনই শাস্ত্রের দোহাই দিয়া চিন্তাজগতে অগ্রগমন করিতে নারাজ ছিল। চতুর্দ্দশ ও পঞ্চদশ শতাব্দীতে বাঙ্গলায় সুফীমত সুপ্রতিষ্ঠিত ও সর্ব্বত্র সম্প্রসারিত হইলে, অনুন্নত জনসাধারণই বেশীর ভাগ সুফীদের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পড়িয়াছিল। সুফীদের সংস্রবে আসিয়া বাঙ্গলার জনসাধারণ নূতন কথা ভাবিতে ও নূতন বিষয়ে চিন্তা করিতে শিখিল। পারস্য ও ভারতীয় সুফীদিগকে মুস্‌লিম্ শাস্ত্রবাদীদল হইতে অনেকটা স্বাধীন চিন্তাবাদী বলিয়া উল্লেখ করিতে পারা যায়। খ্রীষ্টীয় অষ্টম ও নবম শতাব্দীর আরবীয়-সাধনাপ্রধান সুফীদের চিন্তাধারা যেরূপই থাকুক না কেন, ত্রয়োদশ হইতে পঞ্চদশ শতাব্দীর পারস্য ও ভারতীয় সুফীরা ইস্‌লামের শাস্ত্রীয় গণ্ডী ছাড়াইয়া, স্বাধীন ভাবে তাঁহাদের মর্ম্মবাদী দার্শনিক মত খাড়া করিয়া ফেলিয়াছিলেন। স্বাধীন চিন্তাজীবী

স্বূফী সম্প্রদায়ের সংশ্রবে দীর্ঘজীবন বাস করার ফলে, বাঙ্গলার অনুন্নত সম্প্রদায় ক্রমেই চিন্তাশীল হইয়া উঠিতে লাগিল। এই সময় হইতে বাঙ্গলার জনসাধারণ ধর্ম্মকর্ম্ম বিষয়ে স্বাধীনভাবে চিন্তা করিতে শিখে ; এই সময় হইতেই স্থানে স্থানে এবং বিশিষ্ট বিশিষ্ট দলে মূর্ত্তিপূজা নিন্দিত হইতে থাকে,—প্রাচীন নিষ্ঠাচারের গণ্ডী ভাঙ্গিয়া যায়। চারিদিকে বিশ্বজনীনতার বাণী প্রচারিত হয় ; বাঙ্গালীর মন অন্তর্ম্মুখ হইয়া মরমী ও দরদী হইয়া উঠে। এই সময়ে বাঙ্গলার হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে যে স্বাধীনচিন্তাপ্রধান মরমী সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়, তন্মধ্যে আউল, বাউল, হজরতী, গোবরাই, পাগলনাথী, খুশীবিশ্বাস, সাহেবধনী, জিকির ও ফকীর সম্প্রদায়ের নাম উল্লেখযোগ্য। ষোড়শ শতাব্দী হইতে আরম্ভ করিয়া আজ পর্য্যন্ত বাঙ্গলার আকাশে, বাতাসে, নদীগর্ভে, সমুদ্রসৈকতে সর্ব্বত্র এই যে সকল মরমী দরদী সঙ্গীত নিত্যই বাঙ্গলার প্রাণকে আনন্দিত, স্পন্দিত ও উদাস করিয়া যায়, তাহা বাঙ্গলার উপরোক্ত মরমী ও দরদী সম্প্রদায়গুলির অন্তরের মূর্ত্তিমান স্বর ও সুর। এই উদাসীন সম্প্রদায়গুলির উদাস সঙ্গীত শুনিলে, স্বূফী সম্প্রদায় ইহাদের উপর কতখানি প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, তাহা সহজেই দেখা যায়।

ক্ষীর ও নীর

(গ্রন্থ-সমালোচনা)

উৎস—রায় শ্রী জলধর সেন বাহাদুর। প্রকাশক—শরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী এণ্ড্ সন্স, ২১ নন্দকুমার চৌধুরী লেন, কলিকাতা। আষাঢ়, ১৩৩১। মূল্য এক টাকা।

বাহিরে, সহরের ধূম ও ধূলিকলঙ্কী আকাশে, বর্ষার ধারা উৎস উৎসারিতকলোচ্ছ্বাসে শূন্য প্লাবিত করিয়া, বাতাস পরিষিক্ত করিয়া, বাতায়ন স্পর্শ করিয়া ঝরিয়া পড়িতেছিল ; এমনই এক দিনে, আধুনিক কামমুখ্য কথাজগতের তাপদগ্ধক্লিষ্ট, ভীত অধ্যায়ীর অন্তর্লোকে ঝরিয়া পড়িল জলধর-সাহিত্যের স্নিগ্ধ স্বচ্ছ নির্ম্মল রসবৃষ্টি—এই "উৎস"।

সুদূর 'হিমালয়'-'প্রবাস' হইতে বাউল-পরিব্রাজক—বাংলার পূর্ব্ব-জলধর একদা হৃদয় ভরিয়া যে ভারতীয় সাধনার প্রেমদ প্রাণসিদ্ধি বহন করিয়া আনিয়াছিল, এই উত্তর-'উৎস'ধারায় তাহারই পবিত্র রসাস্বাদ পাওয়া গেল পূর্ণপরিণততর রূপে।

একটি গার্হস্থ্য আখ্যায়িকার শান্ত আবেষ্টন সৃষ্টি করিয়া এই উৎসমুখ্য পরিবেষ্টিত হইয়াছে—বাংলার নিজস্ব শ্যামল হৃদয়ের কোমল করুণা।...অজ্ঞাত এক অবজ্ঞাত পল্লীর নিরক্ষর কৃষক-পরিবারের পিতৃভক্ত বালক তাহার পিতৃ-আত্মার তৃপ্তির জন্য যে অপূর্ব্ব তর্পণ রচনা করিয়া ধন্য হইয়াছিল,—তাহারই ক্ষুদ্র কাহিনী ইহাতে কথামৃতরূপে কল্লোলিত হইয়া উঠিয়াছে।

রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি পুরাণের যে উচ্চ আদর্শবাদ একদিন ভারতীয় একান্নবর্ত্তী পরিবার ও একাত্মবদ্ধ পল্লী—তথা সমাজ ও গণপদ গড়িয়া তুলিয়া বিভিন্ন জাতিবৈচিত্র্যের মধ্যেও বিচিত্র আত্মীয়তার যৌগিক প্রতিবেশ রচনা করিয়া জাতিকে ধর্ম্মপ্রাণ ও মর্ম্মবান্ করিয়াছিল,—এবং অমোঘ কালপরিবর্ত্তনে ক্রমশঃ যাহা আজ বিকৃত বিচ্ছিন্ন বিগলিত হইয়া পড়িয়াছে,—প্রবীণ ও প্রজ্ঞানী কথাকার তাহাকেই মূলতঃ গ্রহণ করিয়া এই কথাগ্রন্থ গ্রন্থন করিয়াছেন ; কিন্তু সেজন্য তিনি পশ্চাদ্বর্ত্তী হইয়া দূরাতীতের পুরাচরিত্র চিত্রণ করিতে বসেন নাই—বর্ত্তমান দেশ-কাল-পাত্রকে অবলম্বন করিয়াই এই চমৎকার চরিতালেখ্য অঙ্কন করিয়াছেন অভিনব শিল্পকুশলতায়। এবং, কোন আদর্শ বা উপদেশ আখ্যান-বিষয়কে অশ্বখণ্ডটার মত অনাবশ্যক ভারাক্রান্ত বা আচ্ছন্ন করে নাই,—রসাশ্রিত হইয়া তাহা

ছায়া-বিতানের মাধবিকার মতই স্বতঃস্ফুট সৌন্দর্য্যে আখ্যায়িকাকে মাধুর্য্যময় করিয়াছে। পিতা মাতা পুত্র ভ্রাতা ভ্রাতৃবধূ এবং আত্মীয় ও আশ্রিত-পরিজন লইয়া যে একালেও এমনই এক আনন্দ জগৎ রচনা করা যায়,এই স্বার্থ-সর্ব্বস্ব সহরসমাজের প্রাণহীন বাহ্যিক লৌকিকতার মৌখিক মায়াজালের মধ্যে তাহারই উজ্জ্বল ইঙ্গিত পাইয়া আমরা বিস্মিতসম্ভ্রমে গ্রন্থকারের অন্তরের দ্বারে দৃষ্টিপাত করিতেছি।

নব-ভগীরথ রমেশের চরিত্রসৃষ্টি আধুনিক বাংলা সাহিত্যে সম্পূর্ণ নূতন বলিলেও বোধ হয় অত্যুক্তি হইবে না। ইহা যেন গ্রাম-আত্মার বিস্মৃত মর্ম্মরূপ—বিগ্রহে রূপপরিগ্রহ করিয়াছে! ইহা শুধু আমাদিগকে মুগ্ধই করে না, স্তব্ধ ও আত্মসমাহিত করে। গ্রাম-আত্মার শঙ্খরবে "উৎস"রূপিণী ভাগীরথী আসিয়া মর্ত্ত্যলোকে অবতীর্ণা হইলেন কি?—সগরবংশ সত্যই কি সঞ্জীবিত হইয়া উঠিবে?

ইহার পর যোগেন্দ্র চরিত্র। পাঠান্তে স্বতঃই মনে প্রশ্ন আসে—"যোগেন্দ্র বাবুকে কি এই কলিকাতার পাষাণ-অবরোধের মধ্যে খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে?" দীর্ঘশ্বাস ত্যাগের সঙ্গে অমনই ভাবি, "সহরের এই শ্রীহীন রুক্ষতাকে স্নিগ্ধ করিতে সত্যই কি যোগেন্দ্র বাবু আছেন!"...বাহিরের দিক হইতে বিশেষ কিছু অসাধারণত্ব নাই;—পেন্সন-প্রাপ্ত প্রৌঢ়, একাধিক উচ্চশিক্ষিত উপযুক্ত পুত্রের পিতা এই যোগেন্দ্র বাবু পত্নী-পুত্র-পুত্রবধূ প্রভৃতি লইয়া নির্ঝঞ্ঝাট সংসারের মন্থর তরণীর কর্ণে বসিয়া বিশ্রামের প্রদোষবায়ু সেবন করিতেছেন। সাধারণ,—গতানুগতিক। কিন্তু এই সহরে যোগেন্দ্র বাবুকেই যখন দেখি, একজন অজ্ঞাতকুলশীল আশ্রয়ার্থী গ্রাম্য চাষার ছেলেকে, তাহার সহজাত সাধুতায় মুগ্ধ হইয়া (আভিজাত্যে আবিষ্ট হইয়া নয়), বুকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিতে, "তোমার মত পুত্রলাভ বহু সাধনার ফল বাবা!"—তখন তাঁহার সেই অকপট আন্তরিকতা তাঁহার অসাধারণ মনুষ্যত্বের প্রতি আমাদিগকে প্রবল ভাবেই আকর্ষণ করে। এই যোগেন্দ্র বাবু নিঃস্বার্থভাবে সেই চাষার ছেলেটির জন্য যাহা করিয়াছেন, নিজ সন্তানের জন্যও কোন আধুনিক স্বার্থপর পিতা (বিশেষতঃ সে সন্তান যদি অল্প-শিক্ষিত বা অনুপার্জ্জনশীল হয়) তাহা সর্ব্বথা করেন কি?

গৃহিণী বা যোগেন্দ্র বাবুর স্ত্রী আমাদের নিজস্ব বাঙালী সংসারেরই মা—"গোরা"র 'আনন্দময়ী' হইতেও যেন আমাদিগকে অধিকতর সহাস্য-স্নেহে আহ্বান করেন। আনন্দময়ীর সন্নিধি লাভ করি, ললাটে তাঁহার করস্পর্শ পাই,—কিন্তু এ 'মা' আমাদিগকে একেবারে প্রগাঢ়-মাতৃত্বে বুকে জড়াইয়া ধরেন। একজন অন্নদা অন্নপূর্ণা—হস্ত প্রসারিত করিলেই অন্নে পরিতৃপ্ত করেন; অন্যজন স্তন্যদা—বিমনাকে কোলে টানিয়া স্তন্য দান করেন। 'গৃহিণী'—বাঙালী হিন্দুর ঘরেরই 'মা'!

দীনেশ ঠাকুরপো ও বৌদি—এমন উজ্জ্বল-সুন্দর চিত্র আধুনিক সাহিত্যে বিরল। সখীত্বসর্ব্বস্ব রঙ্গবিলাসিনী বৌদি নহেন ইনি—সখীত্বের মর্ম্মরসোপানে মাতৃত্বের স্নেহ-ধারা ছলকিয়া যাইতেছে। হিন্দুর ঘরের আটপৌরে বৌ-ঠাকুরাণী—এই বৌদি।

দীনেশ, নরেশ, পরেশ,—এরা আমাদেরই আপন ঘরের ভাই, যাহাদিগকে আমরা পোষাকী-সভ্যতার এবং ধর্ম্ম-সংযমচরিত্রহীন শিক্ষার চাপে সহরের পথের ভীড়ে কোথায় হারাইয়া ফেলিয়াছি। গ্রন্থকার আমাদের এই হারানো ভাইগুলিকে আবার খুঁজিয়া বাহির করিবার সুস্পষ্ট সন্ধান দিয়াছেন।

সুভাষিত-সংগ্রহ মানসে আমরা এখানে কয়েকটি স্থানের কতিপয় পংক্তি উদ্ধৃত করিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারলাম না।—

(১) "রমেশ বল্ল, মা উপস্থিত থাকতে ত আগে আপনার পায়ের ধূলো নিতে পারিনে। কেমন মা, তা কি ঠিক?

আমি বল্লাম, তুমি ঠিক বলেছ। উনি হচ্ছেন অন্নপূর্ণা জগদ্ধাত্রী, ওঁর পূজা ত আগেই হবে।...

রমেশ বল্ল, তা আমি জানিনে, আমি জানি আগে মা, তারপর...।"

(২) "রমেশ বল্‌ল,...পিতৃভক্তির সীমা থাকতে পারে, কিন্তু মাতৃভক্তির সীমা নেই, শেষ নেই।...

গৃহিণী বল্‌লেন, মাতৃভক্তি নয় রমেশ, মাতৃস্নেহ—তার কোন সীমা নেই।"

(৩) "সত্যিই মা, আমি বুঝতে পারিনে,...ষ্টুপিডটা অমন স্বর্গভোগ ছেড়ে আমাদের ক'লকাতার এই নরকে থাকতে এল কেন? কিসের অভাব ওর? ঘরভরা ধান, ডোবায় মাছ, গোয়ালে দুগ্ধবতী গাই, উঠানের পাশে লাউ-কুমড়া শাক-তরকারীর ক্ষেত, আম-কাঁঠালের বাগান... এ কি কম সম্পদ...! তারপর অমন স্নেহময়ী দিদি, অমন দেবীস্বরূপিণী মা যার ঘরে, তার অভাব কিসের বল ত মা?"

(৪) "মায়ের কাছে ছেলে টাকা এনে দেবে, তার আবার হিসাব সে রাখতে যাবে কেন?"

(৫) (রমেশ এক পল্লীবাসী কৃষকের পুত্র। তাহার পিতার মৃত্যুর অন্যতম কারণ—গ্রামে সুপেয় জলের অভাব। রমেশের উক্তি:) "আমি তখন সেই লোহিতবরণ অস্তগামী সূর্য্যদেবকে সাক্ষী রেখে প্রতিজ্ঞা কর্‌লাম, যদি বেঁচে থাকি, তা হ'লে গ্রামের এই কলঙ্ক দূর করব—ঠাণ্ডা জল দিয়ে আমার পিতৃদেবের তর্পণ একদিন করব। মা গো, সেই প্রতিজ্ঞা-পালনের জন্যই আমি দেশ ছেড়ে, মা-দিদিকে ছেড়ে, চাকরী কর্‌তে এসেছি। আমার এমন শক্তি হবে না, এত উপার্জ্জনক্ষম আমি কোনদিনই হ'তে পারব না যে, হাজার দেড়হাজার টাকা খরচ করে' গ্রামে একটা ভাল জলের পুকুর কাটাতে পারি।...দেখেছিলাম, চারশ' টাকাতেই টিউবওয়েল হয়।...আর না হয় একশ' টাকাই বেশী লাগবে। এই পাঁচশ' টাকা যে করেই হোক্ আমাকে সংগ্রহ কর্‌তে হবে—নিজের দেহপাত করে' এই পাঁচশ' টাকা আমাকে জমাতে হবে। সেই টাকা দিয়ে বাড়ীতে একটা টিউবওয়েল করে' তারই জলে আমার পিতৃদেবের তর্পণ কর্‌ব—তাঁর ঠাণ্ডা জলের তৃষ্ণা নিবারণ কর্‌ব। তার পর আমি যে চাষার ছেলে তাই হব—চাষ করে' জীবন কাটাব। মা, আমার সেই প্রতিজ্ঞা-পূরণের সময় এসেছে—পাঁচশ' টাকা আমি উপার্জ্জন করেছি। এইবার আমার ছুটী।..."

(৬) আজ আমি বল্‌তে পারি, বিদ্যা, বুদ্ধি, আভিজাত্য কিছুই কিছু নয়; মানুষ হ'তে হ'লে ও-সবের বড় একটা দরকার হয় না। চাই হৃদয়! আর চাই ভগবানের কৃপা!

"বড় কঠিন সাধনা যার বড় সহজ সুর"—এই 'কথা-গ্রন্থের' সরল ভাষা ও সহজ ভঙ্গী ইহাই মনে করাইয়া দেয়। "ত্যাগেই ভোগ, লোভে নয়," প্রত্যেকটি চরিত্রে এই ঋষিবাণী প্রাণবান্ হইয়া যেন ফুটিয়া উঠিয়াছে। এ-দেশীয় উচ্চ শিক্ষায়তনের পাঠ্যপুস্তক তালিকায় এবং পুরস্কার-যোগ্য গ্রন্থশ্রেণীতে ইহাকে গ্রহণ করিলে আমরা আনন্দিত হইব। বিশেষ করিয়া, দেশের জননী ভগ্নী কন্যাদিগকে—আমাদের বঙ্গলক্ষ্মীদিগকে আমরা এই বইখানি অন্ততঃ একবারও পড়িয়া দেখিতে অনুরোধ করিতেছি।

শ্রী রাধাচরণ চক্রবর্ত্তী
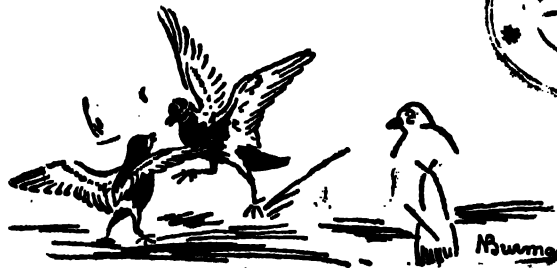
অগ্নিশিখা

শ্রী কাত্যায়নী দেবী

(১২)

অশান্ত, ক্রুদ্ধ যুবকের দল ঘর ছেড়ে চলে' যাবার পর কিছুক্ষণ বাক্যহীন হ'য়ে থাকল গৃহবাসীরা। তার পর অরবিন্দের মুখের পানে চেয়ে একটু হেসে পরেশ বলল,—"অরুদা, কাল ইয়ং মেনস্ ক্লাবে তোমার কথা নিয়ে তর্ক হচ্ছিল। তরুণরা বলছিল তুমি পুরাণপন্থী হবে। তাই আজ এঁদের নিয়ে এসেছিলাম তোমার মত শোনাতে; তা বেশ ভাল করেই শোনান হ'য়ে গেল! বিমল, সন্তোষ এরা বুঝল যে তোমার মতটা কি। দাঁড়াও না; এই তো পূজো এল বলে', আর দিন পনেরও নেই। এবার বাৎসরিক পূজায় সারা গ্রাম নিমন্ত্রণ করব আর বৌদি রাঁধবেন মায়ের ভোগ,—দেখি কোন্ ঠাকুর না আসেন—।"

অরবিন্দ হেসে বলল, "জানি পরেশ, মায়ের তাতে অরুচি হবে না; জগন্মাতা জানেন তাঁর সব সন্তান সমান! কিন্তু ঐ কয়জন ব্রাহ্মণ জানে তারাই সব—ওরা কয়জনে মিলে' সারা গ্রাম কেন সারা দেশটাই ওলট-পালট করে' তুলতে পারে। পূজার আয়োজন করে' কি হবে?—শুধু শুধু কতকগুলি টাকা নষ্ট।"

বিমল, সন্তোষ, অজিত সব একসঙ্গে বলে' উঠল, "না না তা হবে না, পূজো এবার করতেই হবে; এখানকার পূজা সারা গ্রামের আনন্দের জিনিষ—আমরা সারা গ্রামে প্রচার করে' দেখি, কে না আসে।"

কমল হেসে বলল,—"যাক্, চল বৌদির সাজা পানগুলি খাওয়া যাক্ আগে; ভাগ্যিস্ ওঁরা খাননি, তাই আমাদের ভাগ্যে জুটল।"

বিমল বলল, "এস হে পরেশ, দেখা যাক্ কি দাঁড়ায়। আজ হ'ল মাসের ২০শে, ও মাসের ৯ই বোধন; এখন থেকে লেগে না গেলে সময়মত সব হবে না।"

অরবিন্দ মৃদু হেসে বলল, "না হে, বেশী হৈচৈ করে' কাজ নেই, শেষটা আরো অশান্তি বাড়বে।"

"না না আপনি কিছু ভাববেন না।—প্রত্যেক বারের মত এবার ঠিক সেই রকম ত হবেই বরং ভাল হবে। গাঁয়ের মধ্যে পূজো বলতে এই একমাত্র—এ পূজা কি বন্ধ হ'তে পারে?"

অরবিন্দ বলল, "পূজো হবেই; তবে ব্রাহ্মণেরা যাতে একেবারে অসন্তুষ্ট না হন তাও দেখো।"

"আচ্ছা, আসি এখন—"

ছেলের দল চলে' গেল।

অরবিন্দ এতক্ষণে ক্লান্তি বোধ করে' তাকিয়া টেনে নিয়ে শুয়ে পড়ে' ভাবতে লাগল—কি করা যায়? এতদিন পর্য্যন্ত অলকাকে কোন কথাই সে জিজ্ঞাসা করেনি; তার মনে কেমন একটা ভয় আছে পাছে কিছু জিজ্ঞাসা করলে কোন অমঙ্গল প্রকাশ পায়। যদি কোন নিষ্ঠুর সত্য তার সকল সাধু সঙ্কল্পকে ধূলিসাৎ করে' দেয় এই ভয়ে সে কোন কথা বলেনি,—অলকাও কেমন যেন নিজেকে একটু পৃথক করেই রেখেছে। সে কি মনে করে সে অপরাধী?—তাই বা কে জানে। তার সেই অম্লান হাসির আনন্দের জোয়ারে যেন ভাঁটা পড়ে' গেছে; অলকার ব্যবহারে ম্লান নির্জীব ভাবই যেন দিন দিন ফুটে বের হ'চ্ছে। বিষ্ণুর কাছে যেটুকু শুনেছিল তাতে দূষণীয় কিছু পায়নি; তবে, তার অন্তরালে যদি কিছু থেকে থাকে তার জন্য সমাজের কাছে প্রকাশ করে' তাকে হেয় না করতে পারে কিন্তু সেই প্রেম সেই শ্রদ্ধা দিয়ে আর কি তাকে বুকে তুলে' নিতে পারবে সে? যদি না পারে, তবে, তবে—চিরদিন এই বঞ্চিত প্রাণকে কি দিয়ে সে ভুলিয়ে রাখবে? অরবিন্দ জানে কতখানি প্রেম নিয়ে কত বড় নির্ভরতার সঙ্গে সে তাকে আশ্রয় করে' থাকে। কার্য্যতঃ যদিও কোন অযত্ন সে তার নাও করে, তবু মনের উপেক্ষা—সে কি সে স'তে পারবে? কেন এমন করলে ভগবান! সংসারে যে তার কেউ নেই—আমার সংসার যে তারই হাতের ফুল! এমন জীবনের মধ্যদিনে এমন করে'

সন্ধ্যার যবনিকা কেন ঘনিয়ে আস্‌ছে, এর আড়ালে কি আছে, কিছুই ভেবে ঠিক কর্‌তে পারল না সে। ক্লান্ত শরীর গুরু চিন্তায় ক্লিষ্ট হ'য়ে শ্রান্তিতে মাথা ভার হ'য়ে এল তার,—বালিসের উপর মাথাটা এলিয়ে দিয়ে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে অরবিন্দ "ওঃ মাগো" বলে' দুই হাতে মাথাটা টিপে ধর্‌ল।

অলকা অরবিন্দের জন্য ভিতর থেকে এক বাটী দুধ নিয়ে এসেছিল; বাইরে লোকজনের সমাগম দেখে ও কথা শুনে কৌতূহলী হ'য়ে দাঁড়িয়ে গেল। সে ভুলে গেছে যে সে দুধ-হাতে দাঁড়িয়ে আছে এতক্ষণ; চিন্তার পর চিন্তা তাকে আচ্ছন্ন করে' এমন জড়িয়ে ধরেছিল যে নড়্‌বার শক্তিও যেন তার ছিল না। চমক ভাঙ্‌ল অরবিন্দর কাতর কণ্ঠস্বরে। হাতে দুধ নিয়ে সে কতক্ষণ দাঁড়িয়ে আছে,—দুধটুকু জুড়িয়ে গেছে। অনুতাপের ধিক্কারে মনটা ব্যথিত হ'য়ে উঠ্‌ল। নীচের দিকে তাকিয়ে 'বউ'কে ডাক্‌ল; মধুর বউ তাড়াতাড়ি উপরে উঠে এল—"কি মা, কি চাই?"

"এই দুধটা গরম করে' দিতে বল্‌গে' বামুন-দিদিকে, তার পর নিয়ে আয় শীগ্‌গির।"

অলকা আস্তে আস্তে ঘরের মধ্যে গিয়ে দেখে, অরবিন্দ দুই হাত চোখের উপর রেখে চিৎ হ'য়ে শুয়ে আছে, চোখের কোণ দিয়ে এক ফোঁটা জল গড়িয়ে আস্‌ছে—।

অলকা ঘরে এসে আগে বাইরের দোর বন্ধ করে' দিলে, তারপর চৌকীর পাশে বসে' আস্তে অরবিন্দের মাথায় হাত দিল,—চম্‌কে অরবিন্দ বল্‌লে, "কে?"

অলকা অশ্রুকাতর দুই চোখে হাসি ফুটিয়ে বল্‌ল, "বুঝ্‌তে পারিনি এতক্ষণ এই রোগা শরীরে কি বক্‌ বক্‌ কর্‌ছিলে···চল উপরে—"

"চল যাই" বলে' অরবিন্দ উঠে বস্‌ল।

মধুর বউ এসে বাইরে ডাক্‌ল—"মা—"

"এই যে—দুধটা খেয়ে নাও, কখন দুধ খাওয়ার সময় চলে' গেছে।"

অরবিন্দ দুধটা খেয়ে শেষ করে' শ্রান্তিতে আবার পরিত্যক্ত তাকিয়াটা টেনে নিয়ে শুয়ে পড়্‌ল। অলকা মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বল্‌ল, "আমি জানি সমাজে আরো কত কথা হবে, কিন্তু তুমি এই নিয়ে তর্ক করে' শরীর খারাপ কর্‌তে পার্‌বে না! আমি রঘুকে বারণ করে' দেব যেন কাউকে আস্‌তে না দেয়। অন্ততঃ দু'টো মাসও বিশ্রাম না নিলে শরীর ফিরাবে কি করে'?—"

অলকার হাতখানা বুকের ওপর টেনে নিয়ে অরবিন্দ বল্‌ল, "বুকের ব্যথা না ঘুচ্‌লে কি শরীর সারে অলক?"

অলকা জলভরা চোখে বল্‌ল, "আমি কি বুঝি না তোমার ব্যথা কোথায়? তুমি ভাব্‌ছ আমি আগের মত হই না কেন!—এই কয় মাস নিয়ত এত যন্ত্রণা মনের ওপর দিয়ে গেছে যে মনটা যেন পাথর হ'য়ে গেছে···তারপর ভাবি, যদি সমাজ আমায় ক্ষমা না করে, তবে কেন আমি লোভ করে' আমার সব কিছু পেতে চাইব?—মনটা ক্ষত-বিক্ষত হ'য়ে যাচ্ছে—শান্তি পাচ্ছি না। আজ তোমার কথা শুনে বুঝ্‌চি যে কত বড় অত্যাচারের বিরুদ্ধে তুমি দাঁড়াতে চাও। তারা আমায় যন্ত্রণা দিতে চাইছে, সে ন্যায় হোক্ অন্যায় হোক্ আমায় স্বীকার করে' নিতেই হ'ত, যদি প্রথম থেকে তুমি আমায় এমন করে' তুলে' না নিতে। কিন্তু তুমি যে তুলে' নিয়েছ সে কি কর্ত্তব্যবোধে না যথার্থ বিশ্বাস করে' এইটুকু জানার জন্য মন আমার ব্যস্ত হ'য়ে আছে।"

"অলকা, তুমি জান ত সংসারে তুমি ছাড়া আপন বল্‌তে আমার কেউ নেই,—তোমাকে হারিয়ে সংসার আমার অন্ধকার, একদণ্ড সেখানে টেকা আমার অসহ্য! তাই সেই ঘটনার পরে, কোন মতে টাকাকড়ির একটা ব্যবস্থা করে', পরেশকে সব দেখ্‌তে বলে' বেরিয়েছিলাম, আর এই ফির্‌ছি। মধ্যে ভাল-মন্দ বিচার করার কিছু সময় পাই নি, কেবল তোমাকে ব্যাকুল হ'য়ে খুঁজেছি—আজ তুমি এসেছ সঙ্গে সঙ্গে যত সব সমস্যা এসে উপস্থিত হয়েছে। এখন ভাব্‌বার সময় এসেছে, কিন্তু অলকা কি ভাব্‌ব বল ত? ঐ সমাজরক্ষক বৃদ্ধদের পদানুসরণ করে' তোমায় ত্যাগ কর্‌ব? বল অলকা, একবারটি বল আর কি আমার আছে?—আমি অর্দ্ধেক মরে' আছি—"

স্বামীর বুকের উপর মাথা লুটিয়ে অলকা বল্‌ল, "এতদূর মন্দভাগিনী ভগবান আমায় করেন নি,—যা আমার দেবভোগ্য অঞ্চল, তা পথের কুকুরের সাধ্য কি স্পর্শ করে। তবে পিশাচের পাপ-বাসনার তাপে দগ্ধ হ'য়ে

আর সর্ব্বদা নিজেকে বাঁচাবার জন্য সংগ্রাম করতে করতে দেহ-মন ক্ষতবিক্ষত হ'য়ে গেছে আমার...তুমি কি আমার সকল জ্বালা জুড়িয়ে আবার শীতল করে' নিতে পারবে না? তোমার স্পর্শে কি এ জ্বালা আমার ঘুচবে না কোনদিন-"

অরবিন্দের বুক বেয়ে অলকার চোখের জল গড়িয়ে পড়তে লাগল। আদরে অলকার মুখখানি তুলে' ধ'রে' অরবিন্দ বলল, "বাঁচলাম অলকা,—তোমার শক্তি আমায় জয়যুক্ত করবে, সব সমাধান হ'য়ে যাবে। আজ এই শুভ্র শরতের আকাশের মত মন আমার নির্ম্মল হ'য়ে গেল। তোমায় যে লোকে অসতী বলবে প্রাণ থাকতে সে কথা সইতে পারতাম না অলকা,—তাই তিলে তিলে মরে' যাচ্ছিলাম, কিন্তু আমার ভরসা হ'ত না তোমায় কোন কথা বলি—"

অলকা বলল, "আমার মনে এমন একটা সঙ্কোচ এসে দাঁড়িয়ে পড়েছিল যে তাকে কিছুতে সরাতে পারছিলাম না; তোমার মনের ব্যথা মুছে দেব কি করে' ভেবে পেতাম না। যাক্, আজ অনেক কথা হ'য়ে মনটা হাল্কা হ'য়ে গেল! চল ওপরে, গোপাল খুঁজছে, ঐ ডাকছে—"

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

কল্যাণী

কবিশেখর শ্রী কালিদাস রায় বি-এ

কথা তুমি কোনদিনই কহনি ক অকারণ,
দিয়াছ উত্তর
স্মিত ভাবে, স্মিত হাসে, প্রণয় প্রলাপে যবে
হয়েছি মুখর।
পরম বাগ্মিতাভরে জটিল সমস্যা যবে
করেছি ব্যাখ্যান,
দিয়াছ সংযত কণ্ঠে একটি কথায় তার
মন্ত্র-সমাধান।
শুনিনি করিতে তোমা হাস্য পরিহাস কভু
সখীজন সহ
কখনো কাহারো সাথে কোন ছল অছিলাতে
করনি কলহ।
কাহারেও কোনোদিন হইয়া মমতাহীন
করোনি ভৎর্সনা,
নিন্দা শুনে হাসিয়াছ পরনিন্দা কলঙ্কিত
করেনি রসনা।
লিপি তব অলঙ্কৃত, একটু হেসেছ শুধু
শুভ সুসংবাদে
ছলছল তব আঁখি হেরিয়াছি আনন্দের
গভীর আস্বাদে।
দুর্দ্দিনে ব্যসনে দৈন্যে উদাস নয়ন তব,
নীরব অধর,
তাই বলে মুহ্যমান হওনি, তোমার পাণি
হয়নি কাতর।
মুখ ফুটে কোনোদিন আপনার সন্তানেরে
করনি সোহাগ,
মুখপানে চেয়ে চেয়ে বুলায়েছ অঙ্গে তার
স্নেহ অনুরাগ।
পীড়িত হয়েছি যবে করিয়াছি আর্ত্তনাদ
হওনি অস্থির,
অনাময়ী পাণি তব বুলায়েছ তপ্ত অঙ্গে
অঙ্কে রাখি শির।
নিজে যবে রোগশয্যা গ্রহণ করেছ সখি
রয়েছ নির্ব্বাক,
চাওনি ক পরিচর্য্যা করেছ অসহ্য ব্যথা
বীর্য্যে পরিপাক।

কত দিন লাগিয়াছে বুঝিতে তোমারে, স্মরি
আজি লজ্জা হয়,
ভালবাস কি না বাস কতবার মূঢ় মনে
জেগেছে সংশয়।
তোমার তরল দৃষ্টি তোমার সরল ভঙ্গী,
স্নিগ্ধ স্পর্শখানি
একে একে ঘুচায়েছে আমার অবুঝ মনে
সর্ব্ব দ্বিধা গ্লানি।
তব সেবা-শৃঙ্খলায় অসীম গভীর ধীর
উদার সংযমে,
পরিচ্ছন্ন অবিলাসে ঘটাহীন বেশবাসে
চিনিয়াছি ক্রমে

অগাধ তোমার প্রেম পরিপূর্ণ হৃদয়ের
কাণায় কাণায়,
শান্ত স্বচ্ছ সুগভীর ফেনিলতা বুদ্বুদের
ঠাঁই নাই তায়।
তোমা পানে যত চাই অধীর মুখর দম্ভ
সব আসে থেমে
তোমার নয়ন হ'তে মধুর শাসনখানি
শিরে আসে নেমে।
ক্ষম সব অপরাধ চপলতা পরমাদ
হে মোর ইন্দ্রাণি,
ধন্য আমি তোমা সেবি কারুণ্যগম্ভীরা দেবি
হে সতি কল্যাণি!

সম্পাদিকার জল্পনা

নীতি-সমস্যা

ছোট থেকে শুনে এসেছি ও সংগ্রন্থে প'ড়ে শিখেছি, "দুর্নীতি দূরে ফেলো, সুনীতির সঙ্গ কর, জীবনে সাফল্য লাভ করবে।" এতদিনের পুরানো কথাটা হঠাৎ আজ মোড় ফিরে' মানুষের রাজ্যে এক নূতনতর ঢেউ তুলেছে—

"নূতন যুগের মানুষ যদি
সকল কথাই নূতন বল্,
বাঁধা পথের দিকটি ছেড়ে
যেদিক খুসী সেদিক চল্।"

—মানুষের এমনতরটি বলার কারণ আছে। অনেক দিন ধরে' অনেক মানুষ শেখা কথায় শিশুর মত পোষ মেনে থেকেছে,—শেখা বুলি তোতার মত আউড়েছে। ব্যর্থতার বোঝা ব'য়ে তারাই আজ বিদ্রোহের নিশান তুলে বলছে—

"ইহকালের সুখ হারালাম
পরকালের সুখের লোভে,
কাটিয়েছি কাল এমনি কত
মরছি এখন তারি ক্ষোভে।
ইহকালে আমরা বড়
ইহকালে আমরা স্বাধীন,
নূতন যুগের এই কথাটি
সবার মুখে—শিশু-প্রবীণ।"

স্তোক-দেওয়া নীতিবাক্যের দোহাই মেনে ইহকালের কোন-কিছুকে মানুষ ছাড়তে রাজী নয় আজ আর একটুও, একদফা তারা ঠকেছে বলে'। গোল বেধেছে ঐখানে—বিরোধ করছে মানুষ ঐ জায়গায়। আর এই নিয়ে মানুষের ব্যস্ত থাকার অবসরে ফাঁক পেয়ে মানুষের গোড়া-ঘেঁসা প্রবৃত্তিগুলো স্বাধীন মূর্ত্তিতে দৌড় দিতে সুরু করেছে সদর রাস্তায়। ফলে সাধারণ মানুষগুলো বিব্রত হ'য়ে পড়েছে তাদের দাপটে।

সামলে তুলবে মানুষই আবার এগুলি সব সুন্দর ভাবে, নিজের স্বভাবের গুণে।

পশু-রাজ্যে যেমন বৈচিত্র্যের অভাব নাই—কেউ বা মাংস খায়, কেউ বা পাতা চিবায়; কেউ বা ঘাড় ভাঙে,

কেউ বা মানুষের কোলে বসে' আদর কাড়ে; কেউ বা সুন্দর, কেউ বা ভীষণ চোখের কাছে;—এক বল্‌বার জো নাই তা'দি'কে কোন মতে; মানুষের স্বভাবেও তেম্‌নিতর বৈচিত্র্য ঘটে' আস্‌ছে চিরদিন—নয় কি? সবাইকে এক শাসনবাক্য মানাতে গেলে, এক নীতিবাক্য শোনাতে গেলে প্রকৃতি-ভেদে মানুষের মন চাপে পড়ে' সুনীতিকে দুর্নীতি ও দুর্নীতিকে সুনীতি করে' তুলে স্বভাব-দোষে, স্বভাব-গুণে।

দুর্য্যোধনের দুর্নীতি কিছুদিনের জন্য বড় হ'য়ে দেখা দিল দশের সামনে সে যুগে। কিন্তু তার শেষ হ'ল কোথায় গিয়ে, কে না জানে! পাণ্ডবের গৃহবিবাদে আত্মীয়বধে দ্বিধাসঙ্কোচ সুনীতির সুন্দর ভাবটি প্রকাশ করে; দায়ে পড়ে' যুদ্ধ তাঁদের মনের সঙ্গে সায় দেয় নি আদৌ। ভীষ্ম দ্রোণ বধে বিপক্ষ অর্জ্জুন শোকে কাতর হয়েছিলেন অনেক বেশী স্বপক্ষীয় কুরুসন্তান দুর্য্যোধনের চেয়েও; সত্য নয় কি?—শোনাও দুর্য্যোধনকে সুনীতি! মরণ ছাড়া তাকে সুনীতি শেখায় কে?

"মৃত্যু তার সে অধর্ম্ম করিল নিঃশেষ।
গাইল ধর্ম্মের জয় চিতাভস্ম শেষ॥"

রুচির রাজ্যেও মানুষের ভেদবৈচিত্র্য এর চেয়ে কিছু কম নয়। আহত ক্রৌঞ্চের বেদনায় ব্যথিত বাল্মীকির সুন্দর গীতধারায় কোথাও সাতকাণ্ড রামায়ণ রচনা,—কোথাও অসংখ্য নরহত্যার পরে মানুষের আনন্দে উদ্দাম নৃত্য! মদবিহ্বল চিত্তে কোথাও মাতালের উন্মত্ত প্রলাপোক্তি,—কোথাও বুদ্ধের দিব্যমূর্ত্তির কাছে শুদ্ধ শান্ত আত্মহারা মানুষের গাঢ় স্বরে দুটি শান্তিবচন উচ্চারণ! অসংখ্য ভেদবৈচিত্র্য নিয়েই পৃথিবী চলে' আস্‌ছে এতকাল। এরি মধ্যে সে আত্মা বা সুন্দরের দেখা পেয়েছে থেকে থেকে—যার দৌলতে দুর্নীতি সুন্দর নীতিতে পরিণত হ'য়ে উঠে স্বভাবতঃ।

স্বভাবের পথ ছেড়ে শুধু শাসনের পথে মানুষকে কোনকিছু দেওয়া চল্‌বে না আর এ যুগে। ঘুরে ফিরে মানুষ স্বভাবগুণে নিজেই সুন্দরের দ্বারে গিয়ে পৌছবে,—কারণ সেটিও মানুষেরি স্বভাব। মানুষ শেষ পর্য্যন্ত থাক্‌তে পারে না কোন অসুন্দর বা অকল্যাণের মধ্যে। অতএব ভয় নাই মানুষের শেষ পরিণাম সম্বন্ধে। সারা দিন পথে ঘুরে ছড়ানো মানুষ ফিরে' আস্‌বে আবার নূতন করে' নিজের পুরানো ঘরে।

স্ত্রীশিক্ষার নানা প্রচেষ্টা

স্ত্রীশিক্ষার সুফল ফল্‌তে সুরু করেছে দেশে অনেক দিন থেকে। প্রথম যুগের ডাঃ কুমারী যামিনী সেন প্রভৃতির জীবন তার দৃষ্টান্ত। তাঁর জীবনের বৃত্তান্ত কয়েক সংখ্যা বঙ্গলক্ষ্মীতে বেরিয়েছে, সবাই দেখেছেন। এই সুফলই এখন শতধা বিভক্ত হ'য়ে স্ত্রীশিক্ষার নানা প্রচেষ্টায় পরিণত হ'তে চলেছে। গত কয়েক বৎসরের মধ্যে শিক্ষিতা নারীদের উদ্যোগ ও সহায়তায় অনেকগুলি নূতন প্রতিষ্ঠান গ'ড়ে উঠেছে দেশের মধ্যে। সকল নারীর উন্নতির জন্য সমবেত ভাবে নারীরা চেষ্টা কর্‌তে প্রবৃত্ত হয়েছেন।

কলিকাতার ভবানীপুর অঞ্চলে শ্রীযুক্তা তটিনী দাস প্রমুখ উচ্চশিক্ষিতা মহিলারা মিলে একটি নূতন প্রতিষ্ঠান খাড়া করেছেন—এটি শুধু সমবেত চেষ্টার ফল, এতে কোন ধনী পৃষ্ঠপোষক বা মুরুব্বি নাই। অথচ নিজেদের মধ্যেও এঁদের মতান্তর, কথান্তর এবং সঙ্গে সঙ্গে মনান্তরের ঘটা দেখ্‌তে পাওয়া যায় না একটুও। এই নূতন প্রতিষ্ঠান দেশের মধ্যে নূতন ইঙ্গিত জানিয়েছে এবং নূতন সাড়া জাগিয়েছে নূতন করে' নারীদের প্রাণে। সদ্ভাবে কাজ পরিচালনা কর্‌তে পারাই শিক্ষার আদর্শ সুফল। কিন্তু এসব সত্ত্বেও এখনও কাজ বাকী আছে স্ত্রীশিক্ষা দেশব্যাপী কর্‌তে। অসংখ্য অন্তঃপুর-শিক্ষাকেন্দ্র সুপ্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্য্যন্ত কল্যাণ দেশব্যাপী হওয়া সম্ভব নয়। এর জন্যে শিক্ষিতা নারীদের বিশেষ ভাবে উদ্যোগী হ'তে হবে। যাঁরা বাস্ ভাড়া দিয়ে যাতায়াতে অক্ষম ও সংসার ছেড়ে কতক ঘণ্টার জন্য বাইরে থাকা যাঁদের পক্ষে সম্ভবপর নয়, গ্রামে ও সহরে পাড়ায় পাড়ায় তাঁদের জন্য কতকগুলি অন্তঃপুর-শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন করা একান্ত প্রয়োজন। সরোজনলিনী নারীমঙ্গল সমিতি এরূপ শিক্ষাকেন্দ্রে শিক্ষয়িত্রী প্রেরণ ও আর্থিক সাহায্য কর্‌তে সর্ব্বদা প্রস্তুত যদি পাড়ার স্থানীয় কোন শিক্ষিতা মহিলা এর ঝুঁকি নিয়ে কার্য্যপরিচালনায় তৎপর হন। এরূপ শিক্ষাকেন্দ্রের কত প্রয়োজন, শিক্ষিতা নারীরা অল্প চিন্তাতেই বুঝ্‌তে পার্‌বেন

পথ-কণ্টক

আজকাল দেশের অসংখ্য মেয়ে ঘরের বাইরে এসে দাঁড়িয়েছেন—অধিকাংশ উপার্জ্জনের জন্য, কতক সমাজসেবা ও দেশের অন্যান্য কাজে। অল্পবয়স্কা বিধবার সংখ্যা এই উপার্জ্জন-ক্ষেত্রে কিছু কম নয়। বাইরে কাজে আস্‌তে গেলে পুরুষের সঙ্গে নারীর দেখাসাক্ষাৎ ও আলাপ পরিচয় ঘটা অনিবার্য্য। বর্ত্তমান সাহিত্যের একদল তরুণ সেবক বিদেশী অনুকরণে নরনারীর সম্বন্ধকে রুচিবহির্ভূত করে' চিত্রিত কর্‌তে সুরু করেছেন। তাতে লেখার আর্ট বা কায়দা কিছুটা প্রকাশ পেলেও মানুষের মনকে পীড়িত কর্‌ছে খুব বেশী। দৃষ্টি কলুষিত হ'লে পুরুষের সঙ্গে যোগে কাজ করা মেয়েদের পক্ষে অসম্ভব হ'য়ে দাঁড়াবে—বিধবাদের ত কথাই নাই। কাজের পথে মেয়েদের চলাফেরায় এগুলি পথকণ্টক নিঃসন্দেহ। দেশ বিপর্য্যস্ত, চারিদিকে নূতন গঠন চল্‌ছে, এ সময়ে সকলেরই সাবধানে অগ্রসর হওয়া কর্ত্তব্য। ভাবতে গেলে আরও দেখা যায় অধিকাংশ স্থলেই এই সকল নাটক নভেলে চিত্রিত চরিত্রগুলি অতিরঞ্জিত ও অস্বাভাবিক। দৈনিক জীবনে এরূপ দৃষ্টান্ত একান্ত বিরল—এমন কি আদৌ নেই বল্‌লেই হয়। দেশের এই দুঃসময়ে কল্পিত এসব মায়াচিত্র এঁকে দেশের মধ্যে নারীদের চলার পথকে পঙ্কিল করে' তোলার সার্থকতা কি? তরুণ দল এ কথায় ক্ষুব্ধ হবেন না; দেশমাতার প্রতি ও নিজ নিজ গর্ভধারিণী জননীর প্রতি স্নেহদৃষ্টিপাত করে' নারীজাতির কল্যাণের জন্য সাহিত্যের মধ্যে এই অমার্জ্জিত কাঁচা সুরটুকু আমদানি করায় নিরস্ত হোন, এই প্রার্থনা।

লক্ষ্মীকেন্দ্র

কলিকাতার বাজারে আজকাল হরেকরকম নূতন নমুনার মিলের সাড়ী আম্‌দানি হয়েছে। দাম শান্তিপুরে, ঢাকাই সাড়ীর তুলনায় যথেষ্ট কম, অথচ দেখ্‌তে তাদের চেয়ে কম সুন্দর নয়। হাতে-বহরে বেশ বড়—প্রত্যেকটি বারো হাতি। গৃহস্থ ঘরের বৌঝিদের স্বল্পব্যয়ে সাধ মেটাবার সুযোগ ঘটেছে দেখে আমরা আনন্দ পাচ্ছি। ধনী ঘরের বৌঝিদেরও ঐ সকল কাপড় পরে' ঘরের বাইরে নানা স্থানে যাতায়াত কর্‌তে দেখ্‌ছি। ধনী-গৃহস্থ সমান পোষাকে বাইরে দেখা দিচ্ছেন, এ আর একটি আনন্দের বিষয়। মানুষ যতই পরস্পর সমান হ'য়ে দাঁড়াতে পারে পৃথিবীর ততই মঙ্গল। কেবল মনটা ব্যথিত হয় দেখে যে ঐ সকল কাপড়ের দোকানদাররা কেউ পার্শী, কেউ গুজরাটী, কেউ মাড়োয়ারী ইত্যাদি—বাঙালী দেখা যায় না প্রায়ই। মনে হয়, বাঙালীদের ভয় আছে ব্যবসায়ে নাম্‌তে। ব্যবসায় ব্যাপারটি জাতির লক্ষ্মীকেন্দ্র; এই কেন্দ্রটি পুষ্ট না থাকলে জাতি জীর্ণ হ'য়ে পড়্‌বেই। বাঙালীর ব্যবসায়-বুদ্ধি কম আছে বলে' আমাদের মনে হয় না, ব্যবসায় ব্যাপারে অহরহ মনোনিবেশ করা তাদের স্বভাবের পক্ষে কষ্টকর বলে' আমাদের বিশ্বাস। বাঙালী দু'এক ঘর বড় ব্যবসাদার যাঁরা আছেন তাঁরা যদি নিজেদের ব্যবসায়-কেন্দ্রের সঙ্গে ব্যবসা শেখাবার জন্য কোন ট্রেনিং স্কুল খোলেন তাতে দেশের কতক মানুষ ব্যবসায় ব্যাপারে শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা লাভ করে এবং তা হ'লে ব্যবসায়ের আতঙ্কটাও তাদের কমে' যেতে পারে কতক পরিমাণে। অনেক বাঙালী মেয়ের বিষয়বুদ্ধি খুব প্রখর; তাঁদের বুদ্ধির সাহায্য গ্রহণ করে' কিছুটা ভার তাঁদের উপর রেখে পরিবারের পুরুষরা ব্যবসায় ফাঁদলে হয় ত লোকসানের দায়ে না পড়্‌তেও পারেন। কয়েকজন ভদ্রঘরের বাঙালী মেয়েকে স্বামীর ব্যবসায়ের কাজে যথেষ্ট সাহায্য কর্‌তে আমরা স্বচক্ষে দেখেছি। সেক্ষেত্রে সাফল্যও ঘটেছে ভালো রকম। ঘরে ঘরে এ বিষয় আলোচনা করে' দেখা দরকার। চারিদিকে চোখ মেলে চেয়ে দেখা ভালো। বাংলার প্রতি পরিবার-কেন্দ্রে লক্ষ্মী এসে অধিষ্ঠান করুন, এই চাই।

চাঁদার চাপ

এক নিমন্ত্রণ-সভায় এক ভদ্রমহিলার সঙ্গে দেখা, পূর্ব্বে তাঁর সঙ্গে পরিচয় ছিল না। কথায় কথায় পরিচিত হ'য়ে তিনি দেশের কাজের কথা পাড়্‌লেন। বল্‌লেন—"আজকাল অনেক মেয়ে দেশের কাজে নেমেছেন। অন্তঃপুরে প্রবেশ করে' বারম্বার তাঁরা চাঁদা চান। না দিলেও লজ্জা করে, দিতেও পেরে উঠি না সব সময়।" মানুষটি দেখ্‌লুম

বেশ সরল, সহজ ও অমায়িক। মহিলাটি বয়স্কা বিধবা—একটু সেকেলে ধরণের। অল্প পরিচয়ে মনের কথা বলে' ফেল্‌লেন খোলাসা। একটু ভেবে বল্লুম,—"যা আপনি পারবেন তা'ই দেবেন, লজ্জার দায়ে ঠেকে দিতে হ'লে কষ্ট পাবেন সেটা ভালো নয়। কিছু দেবার সামর্থ্য আপনার আছে কি?" তিনি বল্‌লেন,—"হ্যাঁ, কিছু আমি দিতে পারি, অবস্থা আমার খারাপ নয়। তবে দশজনকে দশ ভাগে দিতে গেলে অবস্থায় কুলায় না।" বল্লুম,—"কাজের খবর নিয়ে যে কাজে আপনার প্রীতি সেই কাজে দেবেন—সর্ব্বত্র না'ই দিলেন।" বল্লেন,—"মুস্কিল ঐখানে; যিনি চাইতে আসেন তাঁর মুখ চেয়ে দিতে হয়,—কাজের দিকে চাওয়া চলে না সে সময়। আর, দেশের কাজের ব্যাপারও আমি ভালো করে' সব বুঝ্‌তে পারি না—।"

এই সরল মহিলার কথাটা আমার মনে গিয়ে বাধ্‌ল। কাজটা ভালো করে' না বুঝিয়ে ও দাতার মনের সঙ্গে মিল না খাইয়ে চাঁদা আদায় করাটা ভালো নয়, বুঝ্‌লুম। তিনি আরও বল্‌লেন,—"একটা কাজ ভালো করে' বুঝে' যদি তাতে দি তবে সহজে দশ টাকা দিতে পারি; কাজটারও তাতে অনেকখানি সুবিধা হয়। না বুঝে' এক টাকা করে' দশ জায়গায় দশ টাকা দেওয়া আমার নিষ্ফল বোধ হয়।"

বুঝ্‌লুম, রুচিভেদে মানুষের কার্য্যভেদ হওয়া উচিত। আরো বুঝ্‌লুম, না বুঝে' দান মানুষের মনের বোঝা বাড়ায়; সোজা মনকে ক্রমে বাঁকিয়ে তোলে; গৃহাগত অতিথিকে ছেঁদো কথায় ফেরাবার কলকৌশল শেখায়।—এটা ভালো নয়।

সাহিত্যিক দলের শুভ প্রচেষ্টা

কলিকাতা সহরের স্থানে স্থানে সাহিত্যিক দলের বৈঠক বসে প্রায় প্রতি সপ্তাহে। তরুণ সাহিত্যিক দল সেখানে নিজেদের মধ্যে সাহিত্যালোচনা করে' থাকেন মন খুলে'। কয়েক মাস অন্তর অন্তর বৈঠকগুলির একটি করে' বিশেষ অধিবেশন হয়। কোন একটি সঙ্ঘের এমনতর একটি বিশেষ অধিবেশনে আমরা নিমন্ত্রিত হয়েছিলুম। যাব না যাব দ্বিধা ছিল মনে—তরুণদের মধ্যে যাওয়াটা হয় ত বেখাপ হবে বলে'। কি জানি তাদের মনের সঙ্গে সুর মেলাতে পারব কি না এই বয়সে। ছাড় পেলুম না কোন মতে। পরিচিত দু'একটি অগ্রণী ছেলে একান্ত আগ্রহে ধরে' নিয়ে গেল দাবী করে'। যেতে হ'ল। কয়েকটি মহিলা সঙ্গে নিয়ে পৌঁছে দেখি, সভার ঘরটি ভরে' গেছে ছেলের দলে। ঘরটি খুব বড় না হ'লেও মোটেই ছোট নয়। সবাই যেন অপেক্ষা করে' আছে নূতন মানুষের জন্য। যেন ভাব্‌ছে—কে জানে তাদের আজকের সভাটি কেমনতর বা হয়। সভারম্ভে গান, পরে কবিতা ও প্রবন্ধ পাঠ, শেষে সুপ্রসিদ্ধা সাহিত্যসেবিকা প্রভাবতী দেবী সরস্বতীর গল্প পড়া। আরও একটি ছোট গল্প পড়ার পরে সভা হ'ল শেষ। দু'টো কথা বলতে হ'ল আমাকেও। ফেরার আগে ছেলেদের মুখে দু'চারটা কথা শুনে কৃতার্থ হ'য়ে ফিরেছি। একজন অগ্রণী হ'য়ে বল্‌লেন, "আপনাকে এর মধ্যে আনা আমাদের সাহিত্যচর্চ্চাটা বিপথে পরিচালিত না হয়, তার জন্যে। সাহিত্যে সাম্‌লে চল্‌তে শিখ্‌ব আপনি থাক্‌লে।" পরে আন্তরিকতায় ভরা আরো যা দু'পাঁচটা কথা শুনলুম তাতে বুঝ্‌লুম, বাঙালী সন্তান এখনো নিজের বৈশিষ্ট্য হারায় নি। সুপণ্ডিত পুত্র মূর্খ মাতাকে শ্রেষ্ঠ আসনে বসিয়ে পরিপূর্ণ শ্রদ্ধার অঞ্জলি দিতে পারে আজও এই বাঙলায়।

কুরুচির খোঁজ পেলুম না এঁদের এখানে লুকানো কোন কোণেও—আমার সৌভাগ্য!

সংবাদপত্রে সেকালের কথা

(পুরাতন সংবাদপত্র হইতে সঙ্কলিত)

শ্রী ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

কৃষ্ণানন্দ বিদ্যাবাচস্পতি

(এডুকেশন গেজেট ও সাপ্তাহিক বার্ত্তাবহ, ৩১ মার্চ্চ ১৮৭১)

৺কৃষ্ণানন্দ বিদ্যাবাচস্পতি।...নদীয়া জেলার অন্তর্গত মহেশপুর নিবাসী প্রসিদ্ধ পণ্ডিতবর কৃষ্ণানন্দ বিদ্যাবাচস্পতির পরলোকপ্রাপ্তির সংবাদ শুনিয়া আমরা অতিশয় কাতর হইয়াছি। এই মহাশয় সেই পুরাকালিক পণ্ডিতবর্গের ন্যায় বিপুলপ্রাণ ছিলেন। ইনি সর্ব্বশাস্ত্রবেত্তা ছিলেন, পর্ব্বতাকার গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, স্তূপাকার গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন, স্বপাকে আহার করিতেন, বেহালা বাজাইতে জানিতেন, ৯৬ বৎসর বাঁচিয়া ছিলেন। কৃষ্ণানন্দ বিদ্যাবাচস্পতি কত বড় পণ্ডিত ছিলেন, তাহা পাঠকবর্গ পশ্চাল্লিখিত কথাতেই বুঝিতে পারিবেন। কয়েক বৎসর হইল, তিনি এক দিন সংস্কৃত কালেজ বেড়াইতে গিয়াছিলেন। সেখান হইতে চলিয়া গেলে ন্যায়ের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন মহাশয় ছাত্রদের নিকটে এই বলিয়া কৃষ্ণানন্দের পরিচয় দিলেন যে, "আমি, শ্রীযুক্ত ভরতচন্দ্র শিরোমণি, শ্রীযুক্ত প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশ, আর শ্রীযুক্ত তারানাথ তর্কবাচস্পতি, এ চারি জনের যে শাস্ত্রজ্ঞান আছে তাহা একত্র করিলে যত হয়, তাহার অপেক্ষাও কৃষ্ণানন্দ বিদ্যাবাচস্পতির শাস্ত্রজ্ঞান অধিক হইবে।"

এই মহাশয় যে সমস্ত গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন, তন্মধ্যে নাঠ্য-পরিশিষ্ট নাটক সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রসিদ্ধ। এই নাটকখানি মুদ্রিত হইয়াছে। ইহাতে বিদ্যাবাচস্পতি মহাশয় নাটকচ্ছলে ব্যাকরণ শাস্ত্রর উপদেশ দিয়াছেন। আমরা একটী শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

সমানস্যার্থনিবহান্ সাধয়ত্যগ্রসাত্মনঃ।

নাটক পক্ষে অর্থ।

যেন জনেন গুরুঃ পুরস্কৃতঃ পূজিতঃ তস্য জনস্য শোকঃ সংসারদুঃখং ন জায়তে। স জনো মানস্থান্ মনোগতান্ অর্থনিবহান্ পুরুষার্থসমূহান্ যদ্বা মানস্থান্ মনোভিলাষিতান্ সকলার্থান্ অগ্রসা ঝটিতি সাধয়তি সাধনযোগ্যোভবতি।

বাঙ্গালা।—যে ব্যক্তি গুরুকে পূজা করে, তাহার সংসারদুঃখ জন্মে না। সে ব্যক্তি মনের পুরুষার্থসমূহকে ঝটিতি সাধন করিতে পারে।

ব্যাকরণ পক্ষে অর্থ।

পুরোঽগ্রে কৃতোগুরুর্দীর্ঘো যেন সমানস্য তস্য অকো নশে লোপে ভবতি। অগ্রসাত্মনঃ।

বাঙ্গালা।—অর্থাৎ যে অকের পর সমান দীর্ঘ অক্ থাকে, তাহার লোপ হয়। যথা অগ্রসা+আত্মনঃ=অগ্রসাত্মনঃ।

ধর্ম্মকর্ম্মে হিন্দু

(সংবাদ প্রভাকর, ২৮ জানুয়ারি ১৮৫৭। ১৬ মাঘ ১২৬৩)

জাতি মাত্রেই আপনারদিগের সাধ্যানুসারে ধর্ম্ম বিষয়ে ব্যয় করিয়া থাকেন, কিন্তু হিন্দুজাতির ধর্ম্মার্থ ব্যয় যদিও কালভেদে এবং অবস্থা ভেদে এইক্ষণে অনেক ন্যূন হইয়াছে, তথাচ যাহা আছে তাহাই বিস্তর বলিতে হইবেক, ইংরাজেরা চাঁদা অর্থাৎ অনেকের অর্থ একত্র কোন একটি সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করেন, কিন্তু হিন্দুদিগের মধ্যে এ রীতি নাই, তাঁহারা ধর্ম্ম সম্বন্ধে কোন কীর্ত্তি স্থাপন বিষয়ে অন্যের সাহায্য গ্রহণ করেন না, যিনি যে ব্যাপার স্বয়ং সম্পন্ন করণে সক্ষম হয়েন তিনি তাহাতেই হস্তক্ষেপ করিয়া থাকেন, সরোবর প্রতিষ্ঠা মন্দির নির্ম্মাণ পূর্ব্বক তাহাতে দেব দেবীর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা, নদনদীকূলে ও অন্যান্য জলাশয়ে সোপান নির্ম্মাণ, পুল বন্ধন, পথ নির্ম্মাণ, অভুক্তজনের গ্রাসাচ্ছাদন নির্ব্বাহ নিমিত্ত মঠ স্থাপন প্রভৃতি সৎকীর্ত্তি সকল এই হিন্দুস্থানের প্রায় সকল স্থানে পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে, অনেকের স্থাপন কর্ত্তাগণ স্বর্গারোহণ করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহারদিগের কীর্ত্তি কলাপ কল্প-

ক্রমের ন্যায় অগণ্য অনাথ জনের অভীষ্ট ফল প্রদান করিতেছে।

ধর্ম্মার্থ ব্যয় করণ বিষয়ে সকল জাতিরই উদ্দেশ্য এক, কেবল তাঁহারা ভিন্ন ভিন্ন উপায় অবলম্বন করেন, ইংরাজেরা যে উপায়কে উত্তমোপায় বলেন, যবনেরা আবার তাহা ভাল বলেন না, হিন্দুরা আবার তদ্বিপরীত মতাবলম্বী হয়েন, ইংরাজ ও যবনজাতির এপর্য্যন্ত স্বাধীনতা আছে, ক্রমশঃ পরিমাণে তাঁহারদিগের ক্ষমতা ও সৌভাগ্যের আধিক্যও হইতেছে, হিন্দুজাতির স্বাধীনতা নাই, তাঁহারা বহুকালাবধি পরাধীনতা শৃঙ্খলে বদ্ধ হইয়াছেন, তাঁহারদিগের সৌভাগ্যের স্রোত নিস্তেজ হইয়াছে, ধনবান্ লোকদিগের সংখ্যা ক্রমে ন্যূন হইয়া আসিয়াছে, এই দুরবস্থায় তাঁহারদিগের ধর্ম্ম বিষয়ে যেরূপ ব্যয় আছে, আমরা বোধ করি অন্য জাতি মধ্যে তাহা কিছুই নাই, ধর্ম্মার্থ কীর্ত্তি স্থাপন ব্যতীত পূজা, হোম, যাগ, যজ্ঞ, শ্রাদ্ধ, বিবাহ ইত্যাদি বিষয়ে প্রতি বৎসর প্রত্যেক পরিবারের যে ব্যয় হয় তাহা একত্র করিলে প্রচুরার্থ হইতে পারে, যে পরিবার অতি কষ্টে দিন যাপন করে, যাহারদিগের মাসিক আয় দশ টাকার অধিক নহে, তাহারাও ন্যূনকল্পে উক্ত বিষয়ে বার্ষিক দশ বারো টাকার অধিক ব্যয় করিয়া থাকে, অতএব সামান্য লোকেরা যখন আপনাপন আয়ের দশাংশেরও অধিক ধর্ম্ম বিষয়ে ব্যয় করিতেছে তখন ধনবান ও সম্পৎ সম্পন্ন লোকের ব্যয় তদপেক্ষা অধিক হইবে সন্দেহ নাই, যাঁহারা হিন্দুদিগের ধর্ম্মার্থ ব্যয় হয় নাই বলেন আমরা তাঁহারদিগকে অদূরদর্শি বলিয়া বাচ্য করি।

এই হিন্দু স্থানের স্বাধীন নৃপতিদিগের অক্ষয় কীর্ত্তির বর্ণনা করা দূরে থাকুক এই বঙ্গদেশের নৃপতি ও ভূম্যধিকারি এবং ধনাঢ্যগণের যে সকল কীর্ত্তি সংস্থাপিত রহিয়াছে, তাহারও বর্ণনা করা যায় না, রাজশ্রেষ্ঠ মহারাজ বর্দ্ধমানেশ্বর দেবালয় আতিথ্যালয় স্থাপন পূর্ব্বক প্রতি দিবস যে প্রচুরার্থ ব্যয় করিতেছেন, তাহাতে মহারাজ কীর্ত্তিচন্দ্র বাহাদুরের কীর্ত্তি পতাকা চিরোড্ডীয়মানা থাকিয়া পুণ্য প্রতিভা প্রকাশ করিতেছে, আহা! বর্ত্তমান কীর্ত্তিমান বিশুদ্ধ স্বভাব অধিরাজ বাহাদুর সেই পুণ্য ব্রত প্রতিপালনে নিয়ত নিযুক্ত রহিয়াছেন, এবং তাঁহার সুবিবেচনা সহকারে ক্রমশঃ সাধারণের উপকারের আতিশয্যই বিধান হইতেছে, আনন্দধাম অন্নপূর্ণা স্বয়ং বিরাজমান থাকিয়া সকল লোককে পরিতোষ করিতেছেন, চারিদিগে আনন্দধ্বনি ও অগৌর চন্দননাদি সৌরভে আমোদিত লোকমাত্রেই পুলকিত চিত্ত, ইংরাজ প্রভৃতি জাতিদিগের মধ্যেও ধনাঢ্যলোক অনেক আছেন, কোন্ মহাশয় মহারাজ বর্দ্ধমানেশ্বরের ন্যায় সাধারণ উপকার জনক কীর্ত্তি স্থাপনে তৎপর হইয়াছেন?

মহারাজ বর্দ্ধমানেশ্বরের ন্যায় প্রধান মনুষ্য এই বঙ্গদেশে আর কেহই নাই, অন্য কোন লোকের সহিত তাঁহার তুলনা হইতে পারে না, তিনি ভিন্ন অন্যান্য কীর্ত্তিমান লোকের সৎকীর্ত্তি সকলও বিস্তর, প্রাতঃস্মরণীয়া রাণী ভবানী, অহল্যা বাই প্রভৃতি কীর্ত্তিশালা মহিলাগণের কীর্ত্তি জ্যোতি আনন্দধাম বারাণসী ও গয়াধাম প্রভৃতি পুণ্যক্ষেত্রাদি চিরদিন প্রভাবান্বিত রাখিয়াছে, পুণ্যাত্মা ৺ লালাবাবুর সৎকীর্ত্তি সমূহ বৃন্দাবনধামকে চিরদিন উজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছে, ৺ রাজা সুখময় রায় উলুবেড়িয়া অবধি পুরুষোত্তমধাম পর্য্যন্ত বিস্তৃত পথ নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন, প্রাতঃস্মরণীয় ৺ কৃষ্ণ বসু মহাশয়ের কীর্ত্তি স্তম্ভ শ্রীক্ষেত্র, বারাণসী, বৃন্দাবন প্রভৃতি অনেক পুণ্য স্থানে সংস্থাপিত রহিয়াছে, স্বর্গগত পুণ্যাত্মা ৺ কালীনাথ রায় চৌধুরী মহাশয় বারাসত অবধি টাকী পর্য্যন্ত এক প্রশস্ত রাস্তা নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন এবং টাকী গ্রামে বিদ্যালয়, চিকিৎসালয়, আতিথ্যালয় সংস্থাপন করিয়াছেন। এইরূপ কীর্ত্তিকুশল মনুষ্যদিগের সৎকার্য্য সকল প্রকাশ করিতে হইলে এক মাসের প্রভাকরেও স্থানের সঙ্কীর্ণতা হয়, একারণ আমরা সকলের নামোল্লেখ করা বিবেচনা সিদ্ধ করিলাম না।

এতদ্দেশীয় লোকেরা যে সমস্ত বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন তাহাতে অন্য কোন লোকের সাহায্য গ্রহণ করেন নাই, তাঁহারদিগের স্ব স্ব সাধ্যক্রমেই সম্পন্ন হইয়াছে, তাঁহারা ধর্ম্মানুষ্ঠান বিষয়ে এইরূপ অনুরাগ প্রকাশ পূর্ব্বক সাহেবদিগের অনুষ্ঠিত বিষয়েও অর্থ দান করণে কৃপণতা ব্রতাবলম্বন করেন নাই, সাহেবেরা সময়ে সময়ে সদনুষ্ঠান সম্বন্ধে এই বঙ্গদেশে যে সমস্ত চাঁদার অনুষ্ঠান করিয়াছেন তত্তাবতেই বর্ষাকালের বারিধারার ন্যায় এদেশের লোক-

দিগের সাহায্য প্রদত্ত হইয়াছে, অতএব হিন্দুজাতির ধর্ম্মার্থ ব্যয় নাই এ কথা কোনমতেই স্বীকার করা যায় না, যদিও সৌভাগ্যের স্রোতঃ কালসহকারে নিস্তেজ হওয়াতে ঐ বিষয়ের অনুরাগের অনেক ন্যূনতা দৃষ্টি করা যাইতেছে, তথাচ যাহা আছে তাহা হিন্দুদিগের ন্যায় পরাধীন অন্য কোন জাতি মধ্যে কিছুই নাই ।

বাংলা ভাষার চর্চ্চা

(সংবাদ প্রভাকর, ১০ মে ১৮৫৬ । ২৯ বৈশাখ ১২৬৩)

প্রথমতঃ জাতীর ভাষানুশীলনের নিয়ম, সর্ব্বদেশে সকল জাতি মধ্যে প্রচলিত আছে, যেহেতু জাতীয় ভাষা ব্যতীত অন্য ভাষা দ্বারা সাধারণের শিক্ষার সুপ্রণালি হইতে পারে না, এবং ভাষায় উন্নতি ভিন্ন সভ্যতাদি সদ্গুণ সকল প্রকাশ হয় না, কিন্তু কি পরিতাপ! আমারদিগের রাজপুরুষেরা প্রথমাবধি এই সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ রুচির নিয়মের অনুগামি না হওয়াতে এই রাজ্যমধ্যে বিদ্যার বিমল জ্যোতি বিকীর্ণ হইতে পারে নাই, অদ্য সাহেবেরা যদ্যপি এই দেশ পরিত্যাগ করিয়া যান কল্য দেশস্থ প্রায় তাবৎলোকে অজ্ঞানতার ঘোরান্ধকারে নিমগ্ন হন, যাঁহারা ইংরাজী ভাষানুশীলন পূর্ব্বক কিঞ্চিৎ শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছেন অনুশীলন ও চালনা বিরহে তাহা মলিন হইয়া যায় তাহাতে কোন উপকার দর্শে না, রাজ ভাষা শিক্ষা করা প্রজার অতি কর্ত্তব্য বটে, কিন্তু অগ্রে জাতীয় ভাষায় সুশিক্ষিত না হইলে তাহাতে নিযুক্ত হওয়া উচিত নহে, যেহেতু তদনুশীলনে হিন্দুজাতির চিরোপকার হইবেক না, যদি কেহ বলেন যে রাজভাষা শিক্ষা বিষয়ে রাজা আনুকূল্য করিবেন, জাতীয় ভাষা শিক্ষা বিষয়ে প্রজারাই উদ্যোগি হইবেন, বিচার মতে আমরা এই কথা গ্রাহ্য করিতে পারি না, কারণ বিদ্যা বিষয়ে রাজপুরুষেরা রাজভাণ্ডার হইতে যে ধন ব্যয় করিতেছেন সে প্রজাদিগের ধন, সুতরাং প্রজার ধনে তাঁহারা প্রজার ভাষার উন্নতি সাধন না করিয়া কেবল স্বাজাতীয় বিদ্যার উপদেশ নিমিত্ত অধিকানুরাগ প্রকাশ করিলে পক্ষপাত করা হয় ।

পূর্ব্বে কতিপয় অদুরদর্শি স্ববোধ প্রাজ্ঞ সাহেবেরা এরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন যে প্রজাদিগের জাতীয় ভাষায় উপদেশ প্রদান করা বিধেয় নহে, ইংরাজী ভাষার দ্বারা জ্ঞান শিক্ষা প্রদান করিলেই কালে ইংরাজী ভাষা এদেশের প্রচলিত ভাষা হইবেক, তাঁহারদিগের এই গুরুতর ভ্রম নিবারণ নিমিত্ত বিংশতি বর্ষ পর্য্যন্ত আমরা লেখনীধারণ করিয়া পরিশ্রম করিতেছি তাহাতে কিছুই হয় নাই, তাঁহারা একাল পর্য্যন্ত রাজকোষ হইতে স্বজাতীয় ভাষার উন্নতি সাধন নিমিত্ত এত অর্থ ব্যয় ও পরিশ্রম করিয়াছেন তাহার ফল কি সিদ্ধ হইয়াছে? রাজ্যের প্রজা সংখ্যা গণনায় শতাংশের একাংশ লোকেও ইংরাজীতে সুশিক্ষিত হয়েন নাই, একাল পর্য্যন্ত প্রজাদিগের জাতীয় ভাষার দ্বারা শিক্ষা প্রদানের নিয়ম করিলে কত উপকার হইত, কত ব্যক্তি বিদ্বান পদে বাচ্য হইত এতদ্দেশের ভাষার কত উন্নতি হইত এইক্ষণে তাহার নিরূপণ করা যায় না, এবং প্রজারা জাতীয় ভাষায় সুশিক্ষিত হইলে আপনারা ইচ্ছা মতেই রাজ ভাষা ইংরাজী ভাষা অল্পায়াসে শিক্ষা করিত তাহাতে তাহারদিগের বিশেষ পরিশ্রম বোধ হইত না।

আমারদিগের সৌভাগ্য ক্রমে ঐ স্ববোধ প্রাজ্ঞ সাহেবেরা যদিও ক্রমে ক্রমে প্রস্থান করিয়াছেন বটে, এইক্ষণে যে সকল বিজ্ঞবর সাহেবদিগের প্রতি প্রজাদিগের বিদ্যানুশীলন বিষয়ের বিবেচনা করণের ভার সমর্পিত হইয়াছে তাঁহারদিগের সেই গুরুতর ভ্রম কিছুই নাই, তাঁহারা নিশ্চয় জানিয়াছেন যে জাতীয় ভাষার দ্বারা শিক্ষা প্রদান না করিলে সাধারণরূপে এদেশ মধ্যে বিদ্যানুশীলনের প্রথা প্রচলিত হইবেক না, কিন্তু তাঁহারদিগের এ বিষয়ে মুখে যত আড়ম্বর দেখা যায় কার্য্যে তাহা কিছুই দৃষ্ট হয় না, প্রায় দশ বৎসর অতীত হইল পূর্ব্বতন গবরনর জেনেরল লার্ড হার্ডিঞ্জ সাহেবের প্রস্তাবানুসারে কোর্ট অফ ডৈরেক্টর্স সাহেবেরা প্রজাদিগের জাতীয় ভাষানুশীলন নিমিত্ত স্থানে স্থানে পাঠশালা সকল সংস্থাপন করণের অনুমতি করিয়াছেন এবং দুই বৎসর হইলে দ্বিতীয় অনুমতি আসিয়াছে কিন্তু তাহার ফল সিদ্ধ কি হইয়াছে? ফলের মধ্যে কয়েক জন সাহেব সুপ্রেণ্টেণ্ডেণ্ট এবং সাহেব ও বাঙ্গালি ইনিস্পেক্টর মহাশয়েরা নিযুক্ত হইয়া জাতীয় ভাষানুশীলন নিমিত্ত যে ব্যয় নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তাহার প্রায় অধিকাংশ বেতন গ্রহণ করিতেছেন, কলিকাতা নগরে এক নরম্যাল স্কুল স্থাপিত হইয়া তাহাতে অনুমান ১৫০

ব্যক্তি বাঙ্গালা শিক্ষা করিতেছে, কোন কোন স্থানে ঐ কর্ম্মচারিদিগের উদ্যোগে ও গ্রাম্যলোকদিগের সাহায্যে দুই একটি বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহার নিয়মাদি কিছুই নির্দ্দিষ্ট হয় নাই এবং গবর্ণমেণ্ট কি পরিমাণে ঐ বিদ্যালয় সকলের প্রতি সাহায্য করিবেন তাহাও নির্দ্দিষ্ট হয় নাই, ২০।২৫ টাকা শিক্ষকদের বেতন নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, কিন্তু তাহারদিগের চট্টোগ্রাম, ভুলুয়া, ঢাকা, মেদিনীপুর, পুরী ইত্যাদি দূর দেশে যাইতে হইবেক, স্বজাতীয় ভাষায় সুশিক্ষিত কোন ব্যক্তি এত অল্প বেতনে দূরদেশে গমনে সম্মত হইবেন না, অতএব জাতীয় ভাষানুশীলনের যে উদ্যোগ হইয়াছে তাহাতে বিজ্ঞলোকদিগের অভীষ্ট সিদ্ধ হইবার কোন সম্ভাবনা দৃষ্ট হয় না।

ব্রাহ্মসমাজ ও দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর

(সম্বাদ ভাস্কর, ৫ মে ১৮৪৯)

...আগামি কল্য তত্ত্ববোধিনী সভার সভ্য মহাশয়েরা সভা করিবেন, এবং তত্ত্ববোধিনী সভার যে টাকা আছে ব্রাহ্ম্য সমাজের উপকারার্থ তাহা দিবেন কি না এই বিষয় বিবেচনা হইবে, অতএব আমারদিগের এই এক আনন্দের বিষয় তত্ত্ববোধিনী সভার নিয়মিত ব্যয় সমাধার পরে সভ্য মহাশয়েরা কিঞ্চিদর্থ সঞ্চিত করিতে পারিয়াছেন, এবং তদতিরিক্ত পরমানন্দের হেতু এই যে সঞ্চিত ধন ব্রাহ্ম্য সমাজের সাহায্যার্থ দিবেন, এতদ্দেশীয় লোকেরদের বিশেষত আমারদিগের জ্ঞানগুরু রাজা রামমোহন রায় এই ব্রাহ্ম্য সমাজ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, উক্ত সমাজ সংস্থাপন কালীন বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর, বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর, রায় কালীনাথ চৌধুরী, উক্ত রাজার সহকারী ছিলেন, তৎপরে জ্ঞানি রাজা যখন বিলাত গমনের উদ্যোগ করেন সেই কালেই প্রসন্নকুমার বাবু স্বতন্ত্র হইলেন, এবং সুবোধ রাজা বিলাত গমন কালে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র বাবু রাধাপ্রসাদ রায়, বাবু রমানাথ ঠাকুর, রায় বৈকুণ্ঠনাথ চৌধুরী এই তিন জনকে ব্রাহ্ম্য সমাজের অধ্যক্ষ করিয়া রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে পণ্ডিতাধ্যক্ষ রাখিয়া যান, তাঁহার অভিপ্রায় ছিল এই সকল মহাশয়েরা ধনাঢ্য এবং ব্রহ্মনিষ্ঠ, ইহারা প্রাণপণে ব্রাহ্ম্য সভার উন্নতি করিবেন, কিন্তু তাঁহার বিলাত গমনের কিঞ্চিৎ কাল পরেই উদ্যমদাতা রায় কালীনাথ চৌধুরী মহাশয়ের মৃত্যু হইল, এবং মাকিণ্টস কোম্পানিদিগের বাণিজ্যালয়ও গেল, ইহাতেই রাধাপ্রসাদ বাবু অবসন্ন হইলেন, এবং বোধ হয় ব্রাহ্ম্য সমাজের জন্য যে ধন রাজা রামমোহন রায় রাখিয়া গিয়াছিলেন মাকিণ্টাস কোম্পানির বাণিজ্যাগারের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়াতেই সেই ন্যস্তধন বিনষ্ট হইয়া থাকিবে, কিন্তু ব্রাহ্ম্য সমাজ পরমেশ্বরের উপাসনা স্থান, পরমেশ্বরোপাসকেরা অবশ্যই এই ধর্ম্মাগারের প্রতি স্নেহ করেন, অতএব অদ্বিতীয় বুদ্ধিমান বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর যিনি রাজা রামমোহন রায়ের প্রধান শিষ্য ছিলেন তিনিই স্বকীয় ব্যয়ে ব্রাহ্ম্য সমাজ রক্ষা করিতে আরম্ভ করিলেন, এবং যৌবনবিবেক পিতৃভক্তি পরায়ণ বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর সেই সময়ে স্বকীর্ত্তি পতাকা তত্ত্ববোধিনীর সহিত ব্রাহ্ম্য সভার সংযোগ করেন, বোধ হয় তদবধি ১২৫৪ বৎসরের শেষ পর্য্যন্তও দেবেন্দ্র বাবু উত্তমরূপে উভয় সভার কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিয়াছেন, তৎপরে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের উপর আপদমালা পতিতা হইয়াছিল, তাহাতেই আমরা তত্ত্ববোধিনীর ও ব্রাহ্ম্যসমাজের অনিষ্ট সম্ভাবনায় ভাবিত হইয়াছিলাম কিন্তু পরব্রহ্মনিষ্ঠ শিষ্টস্বভাব দেবেন্দ্র বাবু স্বকীয় পুণ্য প্রতাপে তাবদুপদ্রব হইতে বিমুক্তি পাইয়া পুনরায় সভার প্রতি সম্পূর্ণ মনোযোগ করিতে সক্ষম হইয়াছেন...।

প্যারীচাঁদ মিত্রের মাতার ধর্ম্মকর্ম্ম

(সম্বাদ ভাস্কর, ১৭ অক্টোবর ১৮৫৪)

মহাভারত, রামায়ণ, শ্রীমদ্ভাগবত, কাশীখণ্ড পারায়ণ ও কথনারম্ভ।—কলিকাতা নগরীর নিমতলা নিবাসি শ্রীযুক্ত বাবু মধুসূদন মিত্র মহাশয়ের মাতা ঠাকুরাণী গত রবিবার সংক্রমণ সময়ে এই শুভ কর্ম্মের সংকল্প করিয়াছেন, পাঠক ধারক সদস্য শ্রোতাদি কর্ম্মে সুপণ্ডিত ব্রাহ্মণ পণ্ডিত মহাশয়েরা নিযুক্ত হইয়াছেন এ রত্নগর্ভা গর্ভজাত রত্নচতুষ্টয় অর্থাৎ শ্রীযুক্ত বাবু মধুসূদন মিত্র, শ্রীযুক্ত বাবু নবীনচন্দ্র মিত্র, শ্রীযুক্ত বাবু প্যারীচাঁদ মিত্র, শ্রীযুক্ত বাবু কিশোরীচাঁদ মিত্র, মহাশয়েরা ধর্ম্মপরায়ণা গর্ভধারিণীর ধর্ম্মকর্ম্মের ত্রুটি রাখেন নাই, হিন্দুশাস্ত্রে যত তীর্থস্থানের মাহাত্ম্য লিখিত

আছে, জননীকে প্রায় তৎসমুদায় তীর্থ ভ্রমণ করাইয়াছেন আর তুলাদানাদি যে সকল প্রধান ২ দানব্রতাদির বিষয় হিন্দুশাস্ত্রে লেখেন পতিব্রতা সুব্রতা তত্তাবৎ করিয়াছেন,...। উক্ত ভট্টাচার্য্য ন্যায় স্মৃতি বেদান্ত কাব্যালঙ্কারাদি সর্ব্ব শাস্ত্রে মূর্ত্তিমান, মহারাজাধিরাজ বিক্রমাদিত্য বর্ত্তমান থাকিলে ইহাঁকে দশম রত্ন করিতেন।

সুকবি তারিণী শিরোমণি

(সম্বাদ ভাস্কর, ৮ জুলাই ১৮৫৪)

মহাকবী।—কালী নগরে বাবু গুরুদাস রায় মহাশয়ের সভায় নানা দেশীয় ব্রাহ্মণ পণ্ডিত মহাশয়গণের সমাগম হইয়াছিল এ মহাসভায় কোটালিপাড়া নিবাসি শ্রীযুক্ত তারিণীচরণ শিরোমণি মহাশয় স্বকৃত কবিতা সকল পাঠ করিয়া সভাস্থ সমস্তকে মোহিত করিলেন, কালিদাস শ্রীহর্ষাদির পরে তারিণীচরণ শিরোমণির ন্যায় উত্তম কবী অন্য কেহ জন্মিয়াছেন কি না ইহার প্রমাণ দেখিতে পাই না,

পণ্ডিত ভবশঙ্কর বিদ্যারত্ন

(এডুকেশন গেজেট, ২৬ এপ্রিল ১৮৭২)

কলিকাতার হাতিবাগানের বিখ্যাত পণ্ডিত ভবশঙ্কর বিদ্যারত্ন মহাশয় পরলোক গমন করিয়াছেন। ইনি এতৎপ্রদেশে অদ্বিতীয় স্মার্ত্ত বলিয়া খ্যাত ছিলেন, এবং সনাতন ধর্ম্মরক্ষণা সভাতে ইনি যেরূপে আপনার মতামত প্রকাশ করিতেন, তাহাতে সামাজিক বিষয়ে ইহাঁকে বিলক্ষণ দূরদর্শী বলিয়া বোধ হইত। ইহাঁর ৭০ বৎসর বয়স হইয়াছিল।...

প্রেমক্রম

শ্রী রাধাচরণ চক্রবর্ত্তী
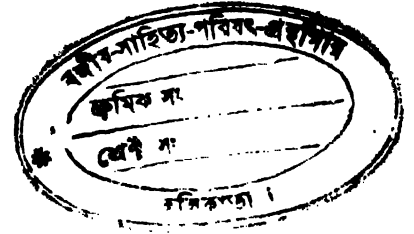
এ পথ যদি তোমার পথ্ ই হয় গো,
চল্‌ব আমি এই পথেই ;
এ স্রোত যদি তোমার প্রতি বয় গো,
ডুল্‌ব আমি এই স্রোতেই।
এই আঁধারে, এই ঝটিকায়,
অন্তবিহীন এই পথিটায়
কেউ সাথী নাই ?—করি না তাই ভয় ত' !
গরজে মেঘ, খুব গরজুক্ ;
এ পথ যদি তোমার পথ্ ই হয় গো,
চাইব না ক' আর পিছু-মুখ।

এ বেদনা হৃদয়-দহন, হায় গো,
তোমারি দান হয় যদি,
দাও আরো দাও, দাও আরো আমায় গো,
নাই কিছু নাই ক্ষয়-ক্ষতি।
ব্যথায় দহি—মৌন সহি ;
তোমার এ দান মহান্—বহি ;
হয় যদি প্রাণ হোক্ অবসান তা'র গো,
কর্‌ব না ক্ষোভ,—দুঃখ নেই ;
বইতে পেলাম তোমার যে দান হায় গো,
মর্‌ব আমি সেই সুখেই !

এ পথ যদি তোমার পথ্ ই হয় গো,
চল্‌ব আমি এই পথেই ;
এ স্রোত যদি তোমার গতি বয় গো,
ডুল্‌ব আমি এই স্রোতেই।
এই যে বিপদ, এই যে ব্যাঘাত,
স্থিতির বিনাশ, স্বতির আঘাত,
তোমার প্রেমের ক্রমবিকাশ নয় ক' ?—
শতদলের 'দল-মলা' নয় ?
স্থূল 'আমি'টার হোক্ না পরাজয় গো,
আমার প্রেমের শেষবেলা জয় !

বিধবা-আশ্রম

ডাঃ শ্রী রাধাকমল মুখোপাধ্যায় পি-এইচ্-ডি, পি-আর-এস্

ভারতবর্ষে শিক্ষার বিস্তারকল্পে দান প্রয়োগ অতি বিরল। অসংখ্য লোকে সন্তানহীন হইয়া দেহত্যাগ করে। কিন্তু তাহাদের উপার্জ্জিত অর্থ সমাজের শিক্ষা ও কল্যাণে নিয়োজিত হয় কই?

পূতলীলা বসন্তকুমারী দেবীর এই দান তাই দেশবাসীর পক্ষ হইতে ও এই অনুষ্ঠান দ্বারা যাঁরা আশ্রিত তাঁহাদের পক্ষ হইতে আমরা কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করি।

সার্ প্রতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় উত্তরভারতে শিক্ষাক্ষেত্রে একজন যুগ-প্রদর্শক ছিলেন। নিজে যেমন আপনার প্রতিভাবলে উকীল ব্যবসায়ীগণের মধ্যে অগ্রণী হইয়া High Courtএ বিচারকের এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে Vice Chancellorএর আসন লাভ করিয়াছিলেন, তাঁহার গৃহস্থালীও অনেক দিক হইতে পঞ্জাবীর আদর্শ হইয়াছিল। আমি যখন কিছুকালের জন্য তাঁহারই আমন্ত্রণে "সনাতন ধর্ম্ম কলেজের" অধ্যক্ষরূপে পঞ্জাবে যাই, তখন দেখি তাঁহার পরিবারের সহিত অনেক পঞ্জাবী পরিবারের বহুবৎসরের পুরাতন নিবিড় প্রীতির সম্বন্ধ। অনেক প্রবাসী বাঙালী যে আপনার গৃহে দেশবাসী ও প্রবাসীর ব্যবধান রাখে তিনি তাহা রাখেন নাই। অথচ তিনি বাঙালীর শিক্ষাদীক্ষা ও আদর্শই প্রচার করিতেন। এই পরিবারে শ্রীমতী বসন্তকুমারী অনুভব করিয়াছিলেন একটা ব্যর্থতা যার ফলে কালে এই অনুষ্ঠানটি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। পাশ্চাত্য আদর্শের সংস্পর্শে বাঙালী পরিবারে অনেক পরিবর্ত্তন দেখা গিয়াছে। একদিকে পাশ্চাত্য শিল্পানুষ্ঠানের প্রতিযোগিতায় বাঙালীর গৃহশিল্পগুলি বিনষ্ট হওয়াতে স্ত্রীলোকের উপার্জ্জনক্ষমতা হ্রাস পাইয়াছে। উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙলার ঘরে ঘরে কত কারু ও চারুশিল্প সজীব ছিল। চমৎকার দৌলতে দরজায় হাতী বাঁধিবারও পরিকল্পনা হইয়াছিল; কিন্তু আজ সব গৃহশিল্পই বিনষ্ট হইয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রীধনের মর্য্যাদাও লুপ্তপ্রায়। বলা বাহুল্য স্বামীর মৃত্যুর পর স্ত্রীলোকের পরনির্ভরতা অনেক নিদারুণ দুঃখ ক্লেশ ও হীনতার কারণ হইয়াছে। কত 'পরান্নভোজী' 'পরবসতশায়ী' বিধবার নিকট জীবন মৃত্যুরই মত; এবং মৃত্যু অভীষ্ট বিশ্রাম। অপরদিকে গৃহে গৃহে বিলাসিতার আড়ম্বর।

আত্মম্ভরিতা আজকাল প্রকাশ পায় দারিদ্র্যের মধ্যেও বিলাসের নির্লজ্জ আয়োজনে। তাই একটা নিষ্ঠুর পক্ষপাতদোষ দেখা দিয়াছে, গৃহজীবনে পুরুষ ও স্ত্রীলোকের বিপরীত আদর্শের প্রতিষ্ঠা ও বিষম সংঘর্ষ। ইহার ফলে কত যে দুঃখ ক্লেশ ও পাপ তাহার ইয়ত্তা নাই। যেই স্ত্রীলোক স্বামী হারাইল, অমনি সে সীতা-সাবিত্রী-দময়ন্তীরূপিণী হউক যদিও তাহার আগেকার জীবন সম্পূর্ণ বিপরীত সুরে বাঁধা। পরিবারিক জীবনে কি বাল্যে কি কৈশোরে শিক্ষায় ভোগের আদর্শকেই বড় করা হইয়াছে। গৃহে গৃহে বিলাসবৃত্তি ও কামনার চরিতার্থতাসাধন অথচ নববিধবাকে বলা হইল, তাহার জীবন পারত্রিক, এ সংসারের সঙ্গে তাহার প্রাণের যোগ নাই; তাহার জীবন পূজার অর্ঘ্য, তাহার অঙ্গাভরণ শুচিতা ও তাহার একমাত্র ধ্যান পুনরায় স্বামীদেবতা ও দেবতাস্বামীকে ফিরে পাওয়া। রামকর্ত্তৃক নির্ব্বাসিত হইয়া সীতা স্বামীকে নিবেদন করিয়াছিলেন, হে নৃপ! বর্ণাশ্রমধর্ম্ম পালন তোমার একান্ত ধর্ম্ম। আজ নির্ব্বাসনে আমি তপস্বিনী। সাধারণ তপস্বিনীর মত আমি যেন তোমার স্নেহ-পালন হইতে বঞ্চিত না হই। আর আমার একমাত্র ব্রতধ্যান হইল—

ভূয়ো যথা মে জননান্তরে ইপি
ত্বমেব ভর্ত্তা ন চ বিপ্রয়োগঃ।

বিধবার একমাত্র ধ্যান জন্ম-জন্মান্তরে যুগের পর যুগ তাহার স্বামী-বিচ্ছেদ না ঘটে।

এ আদর্শ ঠিক। কিন্তু এ আদর্শের অনুযায়ী গৃহে বা সমাজে শিক্ষার কোন ব্যবস্থাই নাই। চট্টোপাধ্যায়-গৃহিণী বাঙালী পরিবারে এই আদর্শের দায়িত্ব অনুভব করিয়া-

ছিলেন ; এবং তাঁহার দয়ার্দ্র চিত্ত অনাথা ও নির্য্যাতিতার অজ্ঞতা হীনতা ও ক্লেশ দূর করিবার জন্ম বদ্ধপরিকর হইয়াছিল। এই শিক্ষালয়ে একই সঙ্গে কার্য্যকরী শিল্পবিদ্যা ও ধর্ম্মশিক্ষা—তাঁহার শেষ জীবনে সমুদ্রসৈকতে যে বাসনা তাঁহার হৃদয় হইতে উঠিয়া সমুদ্রের ঢেউয়ের মত বিলীন হইয়াছিল তাহা বাস্তবে পরিণত করিবে। কারণ দেখিতেছি এই অনুষ্ঠানের পশ্চাতে সকলের সংঘবদ্ধ উদ্যোগ ও অধ্যবসায় ; এবং ইহার অধিনেত্রী শ্রীযুক্তা হেমলতা দেবীর ভাবুকতা ও কার্য্যকুশলতা যাহা নিতান্ত নগণ্য কর্ম্মকেও সিদ্ধি ও সার্থকতার দিকে লইয়া যাইতে পারে। শ্রীযুক্তা বসন্তকুমারীর আত্মা বিশ্বআত্মাতে মিলিয়াছে সত্য ; কিন্তু মানুষের অমরতা হয় দুই ভাবে। আত্মা চির অমর, কিন্তু যে মানুষের কর্ম্মশরীর শুধু সমাজের কল্যাণেই নিযুক্ত হয় তাঁহার শরীরও অমর, জনে জনে কালাতিবাহের সঙ্গে তাহা লোকচৈতন্যের প্রভাবে পুষ্টি ও বৃদ্ধি পাইতে থাকে। সেই অমরতাকে এই স্মৃতিরক্ষার দিবসে আমরা আন্তরিক শ্রদ্ধার তর্পণ দিই।

সপ্তদশ শতাব্দীর ফরাসী সাহিত্য

শ্রী ধীরেন্দ্রলাল ধর বি-এ

গতবারে ষোড়শ শতাব্দী পর্য্যন্ত ফরাসী সাহিত্যের কথা বলেছি, এবার সপ্তদশ শতাব্দীর কথা।—

ফরাসী সাহিত্যে কোন বিশেষত্ববহুল উন্নতি দেখা গেল না সপ্তদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে। প্রথম পঞ্চাশটি বছর—প্রথমার্দ্ধ বল্লেও হয়—এ সাহিত্য এগিয়ে চল্লো পূর্ব্ব বৈশিষ্ট্যেরই জের টেনে। প্রতিদিনের অভিনবত্বের মধ্য দিয়ে সাহিত্যের প্রাণ-স্পন্দন ধ্বনিত হয়, এবং নতুন সৃষ্টিবৈচিত্র্যের মধ্যেই এর সঞ্জীবনী ধারা। যখন এ বৈচিত্র্য আর ক্রমগতিশীল হ'য়ে এগিয়ে চলে না তখন সে সাহিত্যের মৃত্যু ঘটে। উল্লিখিত যুগে ফরাসী সাহিত্যেরও মৃত্যু ঘটেছিল তার বৈচিত্র্যহীনতায়—তার এগিয়ে চল্‌বার শক্তির অভাবে।

শক্তিশালী লেখক কেউ যে এ সময় লেখনী চালনা করেন নি, একথা বল্লে সত্যের অপলাপ হবে, তবে যে ক'জন জন্মেছিলেন তাঁরা সংখ্যায় মোটেই উল্লেখযোগ্য নন। প্রথম আমরা 'রেগ্‌ন্যার'এর নাম করতে পারি। ষোলশো তেরো খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ইনি জীবিত ছিলেন। প্রচ্ছন্ন-হাস্যরস সৃষ্টিতে ইনি ছিলেন অদ্বিতীয়। এঁর রচনার ভঙ্গী কখনো কোথাও নির্জ্জীব হ'য়ে যায় নি। এমনি জোরালো ভঙ্গীতে ইনি লিখ্‌তেন যে সে যুগে strong writer ব'লে ইনি প্রসিদ্ধি অর্জ্জন করেন। এঁর রচনার আদর্শ ছিল বিখ্যাত ইংরাজ কবি 'বায়রণের' আদর্শানুযায়ী উচ্ছৃঙ্খলতা আর প্রচলিত বিধিনিষেধের উপর কশাঘাত করবার স্পর্দ্ধা। এই সঙ্গে 'হিউমার' বলতে আমরা যা বুঝি তাও এঁর রচনার মধ্যে পাওয়া যায় বিশেষ ভাবেই।

'ম্যালহার্ব' ছিলেন 'রেগন্যার'এর সমসাময়িক। কিন্তু ইনি ছিলেন রেগন্যারের বিরুদ্ধ-পন্থী—রেগ্‌ন্যার যখন উচ্ছৃঙ্খলতা আর আঘাত করবার স্পর্দ্ধা নিয়ে 'হিউমার' আর 'স্যাটায়ার্' সৃষ্টি ক'রে যাচ্ছিলেন, ম্যাল্‌হার্ব্ তখন সমাজবন্ধনকে দৃঢ়ীভূত করবার, সুরুচি ও সুনীতির আদর্শকে উন্নত করবার আকাঙ্ক্ষা নিয়ে লেখনী পরিচালনা করছিলেন। কিন্তু সেই জন্যই ম্যাল্‌হার্ব্ সে যুগে জনপ্রিয় হ'তে পারলেন না। রেগ্‌ন্যারের কাছ থেকে অনাকাঙ্ক্ষিত ভাবে আকস্মিক যে প্রগতিবাদ পাঠকপাঠিকাদের মনের দ্বারে এসে ধাক্কা দিচ্ছিল, তারা সর্ব্বান্তঃকরণে তা অনুমোদন না করলেও,রেগ্‌ন্যারের সাহিত্যকে তারা না পড়েও পারেনি। অপর পক্ষে ম্যাল্‌হার্বের কাছ থেকে বিস্ময়াবহ কিছু না পেয়ে, ম্যাল্‌হার্বের প্রতিভা—তা সে যতই উঁচুদরের হোক্ না—তারা তাকে শ্রেষ্ঠত্বের আসন দিতে পারে নি। জীবিতাবস্থায় ইনি জনপ্রিয় হ'তে না পারলেও, এঁর মৃত্যুর পর এঁর সৃষ্টির সত্যিকারের সমঝদার পাওয়া গেল অনেক—

তখন ফরাসী-সাহিত্যে এঁর প্রতিভার শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার কর্‌লেন অনেকেই।

এই সময়ে নাট্যকার হিসাবে বিশেষ প্রসিদ্ধি অর্জ্জন করেন 'প্যেয়্ কর্ণিল্'। তখনও এদেশীয় সাহিত্যে উঁচুদরের বিয়োগান্ত নাটক ব'লে কিছুই ছিল না। ষোল-শো ছত্রিশ খ্রীষ্টাব্দে প্যের কর্ণিল্‌ই বিয়োগান্ত নাটকের উৎকর্ষ সাধন করেন। শুধু তাই নয় তিনি যে হোটলে থাক্‌তেন—হোতেল দ্য রাম্বোলেৎ—সেখানে ইনি একটি ছোটখাটো সাহিত্যসমিতি গ'ড়ে তোলেন—যা তদানীন্তন যুগের সকল সাহিত্যেরই আলোচনা ও সমালোচনায় বিশেষ ব্যস্ত থাক্‌তো। এই সমিতির সমালোচনার উপর তদানীন্তন সাহিত্যসৃষ্টি অনেকাংশে নির্ভরশীল হ'য়ে পড়ে। সেইজন্যই প্যের কর্ণিল্ সে যুগের সাহিত্যসেবকদের মধ্যে অন্যতম হিসাবে প্রসিদ্ধি অর্জ্জন করেন।

গদ্যসাহিত্যে দুজন ভালো লিখ্‌বার চেষ্টা করেছিলেন—'সেন্ত-ক্রাস্কর-দ্য-সেলস্' ও 'গীজ্-দ্য-ব্যালজাক্'। সেন্ত ক্রাস্কর-এর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি হ'চ্ছে 'ভী-দিভোত্'—নীতিমূলক বিধি-নিষেধগুলোকে দূরীকরণের চেষ্টায় এই বইখানির সৃষ্টি। আর গীজ-দ্য-ব্যালজাকের 'সক্রেত্-ক্রীস্যান' নামকরা বই। চিঠির মধ্য দিয়ে বইখানি লেখা, বিশেষ কোন বৈশিষ্ট্য না থাক্‌লেও রচনাভঙ্গীটি চমৎকার।

এঁদের পরেই সপ্তদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্দ্ধ সুরু হোল। ফরাসী সাহিত্যের ইতিহাসে এ যুগটি শ্রেষ্ঠ যুগ ব'লে কথিত হয়েছে—The Golden Age of the French Literature। এ যুগে ফরাসী সাহিত্যের বহু খ্যাতনামা সাহিত্যিক লেখনী পরিচালনা করেন।

কর্ণিল্‌এর নাম এ যুগে প্রথম উল্লেখযোগ্য। এঁর শ্রেষ্ঠ রচনাগুলো সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধেই রচিত হয়েছিল বটে, কিন্তু জনসাধারণের সঙ্গে তার পরিচয় ঘটে এই শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্দ্ধেই। ফরাসী নাটক বল্‌তে আমরা যা বুঝি তার সত্যিকারের ভিত্তি রচনা করেন ইনিই। প্রহসন এবং মিলনান্ত ও সামাজিক নাটক রচনায় ইনি ছিলেন অদ্বিতীয়। এঁর সামাজিক নাটকগুলোর মধ্যে সত্যিকার সমাজের আভাষ জাগে, কাল্পনিক সমাজের চরিত্র নিয়ে সামাজিক নাটক সৃষ্টি কর্‌তে ইনি চাননি। ঐতিহাসিক ঘটনা নিয়েও ইনি ঐতিহাসিক নাটক সৃষ্টি করেছেন অনেক,—কেননা তদানীন্তন জনসাধারণ রাজ-রাজড়ার কাহিনী শুন্‌তেই ভালোবাস্‌তো; তারা চাইতো সব শক্তিশালী রাজন্যবর্গকে নায়কনায়িকারূপে দেখ্‌তে, যাঁরা নিজেদের খুসীমত দুনিয়ার বুকে চল্‌তে পারেন। এঁর নাটকগুলোর মূল কথা হ'চ্ছে মানবাত্মার সঙ্গে প্রবৃত্তির দ্বন্দ্ব ও পরিণামে মানবাত্মার জয়লাভ। অনেকের মতে তাঁর আধ্যাত্মিকতা 'গোথে' বা বার্ণার্ডশ'র চেয়ে কোন অংশেই হীন নয়। ইনি নিজের দিক থেকে কোন মত প্রচার কর্‌তেন না, সাধারণের দৃষ্টিতে যা দেখা যায় তাই ইনি সৃষ্টি কর্‌তেন। এঁর বিখ্যাত বই হিসাবে 'লা-সিদ্', 'হোরেস', 'সিন্না', 'নিকোসিদ্', 'সাহ্‌কি' প্রভৃতির নাম করা যেতে পারে। এঁর রচনা সম্বন্ধে 'মল্যার' বলেন—His heroines have as much energy and determination as Barnard Shaw, heroes like Goethe, more than Barnard Shaw and Goethe, eloquent closely reasoned like Victor Hugo passing from sublime to rediculous, concentration of thought, mastery of concise expression."—এঁর কবিতার চমৎকারিত্ব সম্বন্ধেও মল্যার অনেক প্রশংসা করেছেন। The finest verse of the worldএর স্রষ্টা নাকি ইনিই। ইনি জীবিত ছিলেন ষোল-শো-চুরাশী খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত।

সে যুগে কর্ণিলের যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে 'রাসিন্'এর নাম বলা চাই-ই। সাধারণ বুর্জ্জোয়া শ্রেণীতে এঁর জন্ম হ'লেও উচ্চশিক্ষা দিতে এঁর পিতামাতা কার্পণ্য করেন নি। এঁর প্রতিভার অসাধারণত্ব প্রকাশ পায় এঁর প্রথম রচনা থেকেই। 'আঁদ্রোমাক্' নাটক—এঁর সর্ব্বপ্রথম রচনা—ফরাসী নাট্যসাহিত্যে নব যুগের সম্ভাবনা ঘনিয়ে তোলে। আঁদ্রোমাকের প্রভাব থেকে জনসাধারণ মুক্ত হবার আগেই পর পর ছ'খানি নাটক আত্মপ্রকাশ কর্‌লো—'ব্রিটানিকাস্,' 'বিরিনিস্,' 'মিথ্রিডেৎ,' 'ইফিজেনি,' 'বাজাজেৎ' 'ফিদায়্'। এঁর নাট্যখ্যাতি যখন ফরাসী সাহিত্যের আকাশের নক্ষত্রগুলিকে নিষ্প্রভ ক'রে তুলেছে, এঁর একটি বিরুদ্ধ দল সৃষ্টি হোল; তারা ধারাবাহিক ভাবে এঁর রচনার প্রতিবাদ কর্‌তে থাকে, কিন্তু তার ফলে এঁর খ্যাতি ক'মে

যওয়া অপেক্ষা আরো দীপ্ত হ'য়ে ওঠে। এই সময় ইনি বিবাহ করেন এবং রাজসভায় শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিকের পদে প্রতিষ্ঠিত হন। এই সময় 'ম্যাদাম্ দ্য-সেঁতেন' এঁর মনে প্রেরণা দেন, যার অনুভূতি এঁর 'এন্ত্রার' ও 'আথেলি' রচনায় সহায়ক হয়েছিল। কর্ণিকের মত এঁর রচনাতেও কামনা ও বিচার-বুদ্ধির দ্বন্দ্ব ফুটে উঠেছে। তবে কর্ণিল দেখিয়েছেন বিচারবুদ্ধির শ্রেষ্ঠত্ব কিন্তু ইনি দেখিয়েছেন কামনার প্রাধান্য। মহান্ কবির মত এঁর অন্তর্দৃষ্টি ছিল উদার ও অনন্যসাধারণ, আর প্রতিদিনকার সাধারণ ঘটনাগুলিকে ইনি লেখনীর প্রভাবে অতি রহস্যময় ক'রে তুল্‌তে পার্‌তেন। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ বছরটি পর্য্যন্ত ইনি জীবিত ছিলেন।

তারপর হচ্ছেন মোল্যার্। জীবনের অনেক কষ্ট আর ঝড়ঝঞ্ঝা সয়েও এঁর অন্তরটি ছিল চিরহাস্যময়। অসন্তোষের মধ্যে মনের এই হাস্যমুখরতা এঁর লেখনীর মুখে নিঃসৃত হ'য়ে শুধু ফরাসীদেরই কেন—জগৎকে হাস্যমুখর ক'রে তুলেছিল। এই হাস্যরসের চমৎকারিত্বের পরিবেষণের জন্য পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কমিক্ লেখক ব'লে ইনি অতি শীঘ্রই প্রসিদ্ধি অর্জ্জন করেন। অবশ্য এঁর রচনা একেবারে নির্দ্দোষ হোত না বা এঁর নাটকের সর্ব্বাঙ্গসৌন্দর্য্য সম্বন্ধে নিরেট প্রসংসার বড়াই করা যায় না, কিন্তু এঁর প্রসিদ্ধির মূলে সত্যই ছিল এঁর রচনার স্বাভাবিক শ্রী—যা বাস্তব অথচ সুন্দর। এইজন্য 'থিয়েটার ফ্রাঙ্কয়'তে যখন এঁর তার্তাফ্, লা মিসান্‌থ্রপ, ওন জুয়ান প্রভৃতি নাটকের অভিনয় হোত তখন থিয়েটারে তিল-ধারণেরও স্থান থাক্‌তো না;—জনসাধারণ এঁর স্বাভাবিকতা পছন্দ কর্‌তো,—ভালবাস্‌তো তাঁর সৃষ্টির বৈচিত্র্যকে।

এ শতাব্দীর কাব্যসাহিত্যের দিক থেকে 'বইলু' ও 'লা-ফন্তেন'এর নাম না কর্‌লে হবে না। ইংরাজ কবি ওয়র্ড-সোয়ার্থ ও বইলুর আদর্শবাদের পার্থক্য বিশেষ নেই। প্রকৃতির স্বাভাবিকতার বুকে ফিরে যাবার বাণীই ইনি প্রচার করেছেন এঁর কবিতার মধ্য দিয়ে। কবিতার ভাব ও প্রকাশভঙ্গীও ছিল চমৎকার। তা ছাড়া সময় বিশেষে প্রচ্ছন্ন হাস্যরসের সৃষ্টি করেও ইনি অনন্যসাধারণ কবি ব'লে স্বীকৃত হয়েছিলেন। শুধু সপ্তদশ শতাব্দী কেন—অষ্টাদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকেও ইনি অনেক শ্রেষ্ঠ কবিতা রচনা করেন।

লা-ফন্তেনকে এ শতাব্দীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি বল্‌লেও অত্যুক্তি হয় না। মনস্তত্ত্ব আর অনুভূতির ওপর এঁর ছিল অপূর্ব্ব সূক্ষ্ম দৃষ্টি—মানবচরিত্রে অনন্যসাধারণ অভিজ্ঞতা। প্রকৃতির কবি ছিলেন ইনি—প্রকৃতির একনিষ্ঠ উপাসক। এঁর রচনা ছিল গভীর ভাবাত্মক, আনন্দোজ্জ্বল ও কারুণ্যের মিশ্রণ। ভিক্তর হুগো ছাড়া এঁর মত প্রতিভাবান কবি এদেশীয় সাহিত্যজগতে আর কেউ জন্ম-গ্রহণ করেন নি। বস্তুতন্ত্র বল্‌তে আমরা যা বুঝি তা এঁর মধ্যে এত বেশী পাওয়া যায় যে সে যুগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বস্তু-তান্ত্রিক ব্যালজাকের মধ্যেও তত পাওয়া যায় না। তা ছাড়া ভাষার সংযম, লিখনভঙ্গীর গতি প্রভৃতিও এঁর খ্যাতি-লাভের বিশেষ সহায়ক হয়েছিল। এঁর নীতিকথাগুলিও বিশেষ প্রসিদ্ধ। ইসপ্ ও ফিড্রাসের অনুকরণে ইনি অপূর্ব্ব নীতিকথা লিখ্‌তে পার্‌তেন। এই নীতিকথাই আজ তাঁকে ফ্রান্সের ঘরে ঘরে পরিচিত করেছে। এঁর শিক্ষালাভ ঘটে প্যারীতে এবং বিবাহ করে' সেখানকার শাসনকর্ত্তার অধীনে তিনি চাকরী গ্রহণ করেন। কিছুদিন পরে হঠাৎ কি কারণে পত্নীর সঙ্গে তাঁর বিচ্ছেদ ঘটে। তারও পরে ইনি খ্যাতিলাভ কর্‌তে সুরু করেন। শেষ বয়সে নীতিকথা রচনার সার্থকতায় ফরাসী বিদ্যাপীঠের সদস্য নির্ব্বাচিত হন।

এই নীতিকথার দিক থেকে লা-রচেফুকাল্‌দ্'এর নামও আমরা কর্‌তে পারি।—ছোট ছোট নীতিমূলক গল্প লেখায় ইনিও ছিলেন সিদ্ধহস্ত—তার ওপর ইনি ফন্তেনের প্রভাবমুক্ত ছিলেন। এঁর রচনা ছিল ভাব-ব্যঞ্জক, ভাষা ছিল বেশ জোরালো। তবে এঁর রচিত গল্পের সংখ্যা এত কম যার জন্যই ইনি খ্যাতি লাভ কর্‌তে পারেন নি বিশেষ ভাবে।

প্যাস্‌ক্যাল্ খুব অল্প বয়সেই গদ্যসাহিত্যে নব্যধারার প্রবর্ত্তন করে' সুপ্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করেন। ইনি শুধু নিছক সাহিত্যিকই ছিলেন না, বিজ্ঞান, গণিত ও জ্যামিতিতে এঁর অসামান্য দখল ছিল। মাত্র উনিশ বছর বয়সেই ইনি গণিতের সিদ্ধান্ত সম্বন্ধীয় পরিমাণসূচক একটি যন্ত্র আবিষ্কার

করেন। আরো অনেক কিছুই ইনি হয়তো করতে পারতেন কিন্তু তেত্রিশ বছর বয়সেই ইনি বৈরাগ্য গ্রহণ করেন, এবং বৈরাগ্য গ্রহণের পর মাত্র ছ'বছর ইনি জীবিত ছিলেন। গদ্য ও কাব্যসাহিত্যে এঁর অসামান্য দখল ছিল। এঁর রচনার মধ্যে ব্যঙ্গ, হাস্যরসচাতুর্য্য সব কিছুই আমরা পাই। তা ছাড়া ধর্ম্ম, দর্শন ও নীতি সম্বন্ধীয় প্রবন্ধ লিখেও ইনি কম প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করেন নি। উঁচুদরের খণ্ডকবিতাও ইনি লিখেছেন বহু। কিন্তু এমন পাণ্ডিত্য ও যশ অর্জ্জন করেও ইনি গর্ব্বিত ছিলেন না,—সকল লোকের সঙ্গে সমভাবে ব্যবহার করতেন। মানবজীবনের ক্ষণস্থায়িত্ব সম্বন্ধে তিনি ছিলেন সচেতন। সেই জন্যই অহঙ্কার বা গর্ব্ব তাঁর মনের কোণে স্থান পায়নি কখনো।

তর্কশাস্ত্রে 'বুসে'র বিশেষ নাম আছে। তর্কশাস্ত্রীয় কয়েকখানি বই ইনি লেখেন। তা ছাড়া ইনি একজন প্রসিদ্ধ বাগ্মী ও প্রচারক ছিলেন সে যুগের। 'কলহ' সম্বন্ধেও এঁর কয়েকখানি বই আছে। এই বইগুলি এঁর সাধারণ জ্ঞান ও সত্যদৃষ্টির উপর নির্ভর করেই লেখা। এ যুগের ফরাসী সাহিত্যের এই নতুন দিকে বুসেই একমাত্র স্রষ্টা ও দিক্‌পাল ছিলেন।

চিঠির মধ্য দিয়ে রসসৃষ্টি করায় ম্যাদাম-দ্য-সিভাইন ছিলেন অদ্বিতীয়া। ইনি একমাত্র কন্যা ও বান্ধবীদের এমনি চমৎকার ভাষায় ও ভাবে চিঠি লিখে যেতেন যা ছোট গল্পের চেয়ে কম চিত্তাকর্ষক ছিল না। শেষে পাঠকদের আগ্রহাতিশয্যে এই চিঠিগুলিই বইয়ের আকারে প্রকাশিত হয় ও জনসাধারণের কাছে "চিঠির রাণী" নামে ইনি খ্যাত হন। সে যুগের সমাজ ও সাহিত্য সম্বন্ধে বহু তথ্যই এঁর এই চিঠিগুলির মধ্য থেকে পাওয়া যায়। এগুলি সত্যই উপভোগ্য—ছোটগল্পের মতই মনোহর।

এই শতাব্দীর অনুবাদ-সাহিত্যের বিশেষ পুষ্টিসাধন করেন "লাব্রুয়ার"। চিত্রকর হিসাবেও এঁর যথেষ্ট সুনাম ছিল। তদানীন্তন দর্শনশাস্ত্রে এঁর অসামান্য প্রতিষ্ঠা ছিল। এঁর মতে—মানব জন্মগ্রহণ করে, অবিরাম পরিশ্রম করে শ্রান্ত হবার জন্যই; সে বিশ্রাম চায়—এবং বিশ্রাম সে পায় মৃত্যুর অন্তরালে। সমাজের চিত্র ফুটিয়ে তুলতে ইনি ছিলেন অদ্বিতীয় এ সম্বন্ধে এঁর বিশেষ সূক্ষ্মদৃষ্টি ছিল। ইনি যে ভঙ্গীতে লিখতেন তা এঁর সাময়িক ব্যক্তিদের এমনি ভাবে প্রভাবান্বিত করেছিল যে এর পর অর্দ্ধ শতাব্দী ধ'রে লেখকেরা এঁর রচনাপদ্ধতিকে অনুকরণ করবার চেষ্টা করতেন। শুধু তাই নয়, ইনি যে দার্শনিকতার সূত্রপাত করেন তা পূর্ণতা লাভ করে ভল্টেয়ারের প্রতিভায় ও পরে ফরাসী বিপ্লবের অন্যতম কারণ হয়। সঙ্গীত-যন্ত্রে এঁর বিশেষ দখল ছিল।

এই শতাব্দীর সব ক'টি সাহিত্যিকেরই প্রতিভা কম-বেশী কেন্দ্রীভূত হয়েছিল 'ফিনিলঁ'র মধ্যে। ইনি সে যুগের প্রতিনিধি-স্থানীয় বললেও হয়—কবি, গল্পলেখক, ঔপন্যাসিক, অনুবাদক, দার্শনিক সব কিছু নামেই ইনি প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করেন। শেষে ফরাসী-সম্রাট এঁকে যুবরাজের গৃহশিক্ষক নিযুক্ত করেন। রাজানুগ্রহে এই গুরুভার বহন কালে ইনি সাহিত্যে বিশেষ যশ লাভ করেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর সাহিত্যও এঁর রচনার গৌরবে সমৃদ্ধ হয়েছিল। ইনিই সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ প্রতিভাবান লেখক, সুতরাং এইখানেই এই শতাব্দীর সাহিত্য সম্বন্ধে আলোচনা বন্ধ করতে পারি।

ভোলা

সন ১৩৩৮ সনের ভাদ্র মাসের প্রথম ভাগে, ভোলা মহকুমা মহিলাসমিতি—আসাম ও পূর্ব্ববঙ্গ জলপ্লাবন-পীড়িতের সাহায্যকল্পে "বঙ্গীয় সঙ্কটত্রাণ সমিতি"তে ৭৫৲ টাকা ও ৯৫খানা কাপড়,এবং অন্যতম প্রাদেশিক প্রতিষ্ঠানে ৪০৲ টাকা দান করিয়াছেন।

এই সমিতির উদ্যোগ ও সাহায্যে এখানে বীণাপাণি বালিকাবিদ্যালয় নামে একটি বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। ১৩৩৮ সনের ৭ই শ্রাবণ মাত্র ৩৩টি ছাত্রী নিয়া এই বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপিত হয়; ভগবানের অনুগ্রহে এই এক বৎসরের মধ্যে ছাত্রীর সংখ্যা ১৫০ দেড়শত হইয়াছে। বর্ত্তমান ৭ জন শিক্ষয়িত্রী ও ৩ জন শিক্ষক দ্বারা শিক্ষকতা কার্য্য চলিতেছে। অর্থাভাবে প্রয়োজন সত্ত্বেও আর শিক্ষক বা শিক্ষয়িত্রী রাখা যাইতে পারে নাই। স্থানীয় বার লাইব্রেরী ও মহিলা-সমিতি ইহার ব্যয় বহন করিতেছেন। মাঝে মাঝে কোন কোন সহৃদয় ব্যক্তির সাহায্যও পাওয়া যায়।

১৩৩৮ সনের ২৪শে আশ্বিন উক্ত বিদ্যালয়ের ছাত্রীগণ নানাবিধ আবৃত্তি ও "মধুসূদন দাদা" নামক ক্ষুদ্র একটি নাটিকা অভিনয় করে। আবৃত্তি ও অভিনয় সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইয়াছিল।

১৩৩৯ সনের ৭ই আষাঢ় তারিখে স্থানীয় উকিল শ্রীযুক্ত দক্ষিণারঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সভাপতিত্বে ছাত্রী-দিগকে বাৎসরিক পারিতোষিক বিতরণ করা হয় এবং মহিলাসমিতির চেষ্টায় ছাত্রীগণ "নিমাই সন্ন্যাস" অভিনয় করিয়া সমবেত ভদ্রমহোদয়গণ ও মহিলাদিগকে আনন্দ দান করে। অভিনয়টি অতি সুন্দর হইয়াছিল। অভিনয়ের পোষাকে অভিনেত্রী ছাত্রীগণের এবং উপস্থিত অপর ছাত্রী-গণের ফটো তোলা হয়।

এই সমিতির সাহায্যে স্থানীয় মহিলাবৃন্দ ক্রমশঃ একতাসূত্রে গ্রথিত ও নানা বিষয়ে উন্নত হইতেছেন। যাঁহারা সমিতির উপরে বিদ্বেষভাবাপন্ন ছিলেন, তাঁহারাও সমিতির কার্য্যকলাপে আকৃষ্ট হইয়া বর্ত্তমানে সহানুভূতি ও সাহায্য করিতেছেন। দুঃখের বিষয়,সমিতির ব্যয়ের অনুপাতে আয় নাই। মুষ্টিভিক্ষা ও সভ্যাগণের যৎসামান্য চাঁদাই ইহার প্রধান সম্বল অবশ্য নারীউন্নতিকামী কোন কোন সহৃদয় ব্যক্তির দানও মাঝে মাঝে পাওয়া যায়। আর্থিক অস্বচ্ছলতা ও নানা বাধাবিঘ্ন সত্বেও এই সমিতি ক্রমশঃ উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে। সম্ভবতঃ স্বর্গীয়া সরোজ-নলিনী দত্ত মহাশয়ার পবিত্র নামের প্রভাবেই আমরা এতটা অগ্রসর হইতে পারিয়াছি।

শ্রী সরযূবালা সেন গুপ্তা,
সম্পাদিকা

বাগেরহাট

গত ১লা আষাঢ়, ইংরাজী ১৫ই জুন ১৯৩২, বাগেরহাট মহিলাসমিতির যত্নে ও চেষ্টায় বাগেরহাট হাইস্কুল-গৃহে খুলনা ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড হইতে ১০০৲ টাকা সাহায্য লইয়া একটি স্বাস্থ্য ও শিশুমঙ্গল প্রদর্শনী খোলা হয়। এই প্রদর্শনী পাঁচ দিন স্থায়ী হইয়াছিল। এই সঙ্গে

বাগেরহাটের মহিলা শিল্প শিক্ষালয়ের বাৎসরিক উৎসব উপলক্ষে সাধারণভাবে একটি শিল্প প্রদর্শনীরও অনুষ্ঠান হইয়াছিল। এই স্বাস্থ্য ও শিশুমঙ্গল এবং শিল্প প্রদর্শনীর দ্বারোদ্ঘাটন বঙ্গের অন্যতমা শ্রেষ্ঠা মহিলা কবি শ্রীযুক্তা মানকুমারী বসু করেন। ১৫ই জুন বেলা ১টার সময় প্রদর্শনীর দ্বারোদ্ঘাটনের প্রায় দেড় ঘণ্টা পূর্ব্বে স্থানীয় হাইস্কুলের বিস্তৃত বারান্দায় একটি বিরাট মহিলাসভার অধিবেশন হয়। ঐ সভায় বাগেরহাট ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম বাসাবাটী, দশানি ও অন্যান্য স্থান হইতে অন্যূন পাঁচশত মহিলা আগমন করেন। ঐ সভায় শ্রীযুক্তা মানকুমারী বসু মহাশয়াকে একখানি মানপত্র প্রদান করা হয়। তৎসঙ্গে একখানি খদ্দরের কাপড়ও দেওয়া হয়। ঐ অভিনন্দনের উত্তরে শ্রীযুক্তা বসু মহাশয়া একটি সারগর্ভ সুললিত বক্তৃতা পাঠ করেন। পরে স্কুল ও সমিতির বার্ষিক কার্য্যবিবরণী অন্যতমা সম্পাদিকা শ্রীমতী লীলা মিত্র পাঠ করেন। পরে সভানেত্রী মহাশয়াকে ধন্যবাদান্তর সভা ভঙ্গ হয়। বেলা প্রায় ২॥০ ঘটিকার সময় শ্রীযুক্তা মানকুমারী বসু মহাশয়া প্রদর্শনীর দ্বারোদ্ঘাটন করেন। পরে বেলা প্রায় ৫ ঘটিকা পর্য্যন্ত প্রদর্শনী-গৃহে দলে দলে মহিলারা আসিতে থাকেন। সাড়ে পাঁচটার সময় বহু নিমন্ত্রিত ভদ্রলোক ও মহিলার সমক্ষে স্থানীয় ব্যায়াম সমিতির সভ্যরা (১৬ হইতে ২২ বৎসর পর্য্যন্ত বয়সের) নানাপ্রকার দৈহিক কসরৎ, ভারোত্তোলন, সাইকেল ক্রীড়া, সিকিইঞ্চি পুরু লোহার পাত বলয়াকারে বাঁকান, মোটর টানা প্রভৃতি খেলা দেখান।—শ্রীযুক্তা মানকুমারী বসু ক্রীড়কদের ভূয়সী প্রশংসা করেন। রাত্রি সাড়ে সাতটার সময় বঙ্গীয় সোস্যাল সার্ভিস লীগের শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত বসু মহাশয় ম্যাজিক লণ্ঠন সহযোগে "শিশুমঙ্গল" সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। স্বাস্থ্য প্রদর্শনী দুইটি ঘরে ও শিল্প প্রদর্শনী একটি বড় হলে হইয়াছিল।

২রা আষাঢ় বেলা ১২টার সময় প্রদর্শনী খোলা হয়। এ দিনও প্রদর্শনী খোলার সঙ্গে সঙ্গে দলে দলে মহিলা ও বালিকাগণ প্রদর্শনী দেখিতে আসেন। একটা লক্ষ্য করার বিষয় ছিল, যে-সমস্ত গৃহে স্বাস্থ্য ও [illegible] সম্বন্ধীয় চার্ট ও মডেল ছিল সেই সমস্ত স্থানে লোকের ভিড় খুব বেশী হয়। ইহা দ্বারা প্রমাণিত হয়, দেশ এখন শুধু বাহ্য চাক্‌চিক্যের দিকে না তাকাইয়া নিজেদের প্রকৃত উন্নতির পথ চিনিয়াছে। স্বাস্থ্য ও শিশুমঙ্গল প্রদর্শনী গৃহে স্থানীয় স্যানিটারী ইন্‌স্পেক্টর শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র দাসগুপ্ত মহাশয় চার্ট ও মডেলগুলি বুঝাইয়া বক্তৃতা দিয়াছিলেন। সমাজ সম্বন্ধীয় চার্টগুলি বক্তৃতা দ্বারা সমস্ত জনমণ্ডলীকে বুঝাইবার ভার শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ আইচ মহাশয় লইয়াছিলেন। বেলা ২টা হইতে স্থানীয় প্রচারিকা সংঘের ক্লাস প্রদর্শনীক্ষেত্রে এক গৃহে হইতেছিল—শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত বসু মহাশয়ের পরিচালনায় ও শিক্ষকতায়। এ স্থলে ইহাও উল্লেখযোগ্য, স্থানীয় কয়জন বিশিষ্ট মহিলা ও মফঃস্বলের কয়েকজন মহিলাকে লইয়া বাগেরহাটে একটি প্রচারিকা সঙ্ঘ খোলা হইয়াছে। এই সঙ্ঘের উদ্দেশ্য—মহিলারা ম্যাজিক ল্যাণ্টার্ণ সহযোগে শিশু ও প্রসূতিমঙ্গল এবং সাধারণ স্বাস্থ্য সম্বন্ধে গ্রামে গ্রামে বক্তৃতা দিবেন এবং প্রয়োজন হইলে যে কোন স্থানের স্বাস্থ্য প্রদর্শনীতে মহিলারা গিয়া অনুরূপ বক্তৃতাদি দিবেন: এই ব্যবস্থা সম্ভবতঃ ভারতে এই প্রথম। ৪টা পর্য্যন্ত মহিলাদের জন্য এই প্রদর্শনী খোলা ছিল। পরে ৬টা পর্য্যন্ত পুরুষদের জন্য প্রদর্শনী খোলা রাখা হয়। রাত্রে শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত বাবু ল্যাণ্টার্ণ সহযোগে খাদ্য সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন।

৩রা আষাঢ় প্রাতে ৭টার সময় প্রদর্শনী খোলা হয়। ১০টা পর্য্যন্ত প্রদর্শনী খোলা ছিল পুরুষদের জন্য। বেলা ১২টার সময় পুনরায় প্রদর্শনী মহিলাদের জন্য খোলা হয়। ২টার সময় পূর্ব্বদিনের মত প্রচারিকা সঙ্ঘের ট্রেনিং ক্লাস বসে। অদ্যকার অপর কার্য্যাবলী পূর্ব্বদিনের মত। পরে শ্রীযুক্ত বসু মহাশয় "নূতন স্বাস্থ্যতত্ত্ব" বিষয়ে সুন্দর ও সারগর্ভ বক্তৃতা ল্যাণ্টার্ণ সহযোগে করেন। তিন দিনই বক্তৃতার সময় বহু পুরুষ ও মহিলার সমাগম হয়।

৪ঠা আষাঢ়—এই দিন প্রাতে পুরস্কার নির্ব্বাচন কমিটি শিল্পদ্রব্যের পুরস্কার-প্রাপ্তদের নির্ব্বাচিত করেন। অপর কার্য্যাবলী পূর্ব্বদিনের মত। এ দিন রাত্রে ম্যাজিক ল্যাণ্টার্ণ বক্তৃতা হয় নাই।

৫ই আষাঢ়—অদ্যও বেলা ১২টার সময় প্রদর্শনী খোলা হয়। বেলা ৩টার সময় খুলনা জেলা বোর্ডের চেয়ারম্যান রায় যতীন্দ্রনাথ ঘোষ বাহাদুরের সভাপতিত্বে শিশুমঙ্গল প্রদর্শনীর পুরস্কার বিতরণী সভা হয়। এই সভায় প্রায় ২ শত পুরুষ ও ৫ শত মহিলার সমাগম হয়। হেল্‌থ অফিসার শ্রীযুক্ত মুরারীমোহন বসু মহাশয় ডাঃ শ্রীযুক্ত অরুণচন্দ্র নাগ মহাশয়কে সহকারী লইয়া সমবেত শিশুগণের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করেন। পরীক্ষায় অনেকগুলি শিশু উত্তীর্ণ হয়। সভাপতি মহাশয়কে শিল্প-শিক্ষালয়ের তরফ হইতে একখানি মানপত্র ও একখানি টেবিলক্লথ উপহার দেওয়া হয়। সমাগত শিশুদিগকে দুধ, আম, বিস্কুট, রসগোল্লা প্রভৃতি খাইতে দেওয়া হয়।

এই প্রদর্শনী সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য শ্রীযুক্ত ননীগোপাল মিত্র বি-এ, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণভূষণ ঘোষ ও শ্রীমান শান্তি সেন এবং অপর কয়েকটি যুবক যেরূপ অক্লান্তভাবে পরিশ্রম করিয়াছেন তজ্জন্য আমরা তাঁহাদিগকে আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। ডিষ্ট্রিক্ট-বোর্ড স্বাস্থ্য সমিতির সম্পাদিকা মহাশয়া, স্থানীয় বার লাইব্রেরী ও স্থানীয় সব্‌ডিভিসনাল অফিসার ও অন্যান্য ভদ্র মহিলাগণ আমাদিগকে এই কার্য্যে অর্থ ও পুরস্কারাদি দিয়া সাহায্য করিয়াছেন। তাঁহারাও আমাদের অসীম ধন্যবাদভাজন।

প্রদর্শনী-গৃহটি নানাবিধ সুন্দর কারুকার্য্য-সমন্বিত শিল্পদ্রব্যে পরিপূর্ণ ছিল। দেশী শিল্পদ্রব্যের দিন দিন উন্নতি ও প্রসার হউক ইহাই আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে প্রার্থনা করি। প্রদর্শনীক্ষেত্রে বাগেরহাটের শ্রীযুক্ত গিরীশচন্দ্র দাসগুপ্ত মহাশয়ের কন্যা কুমারী রাধারাণী দাসগুপ্তা একটি চা ও সরবতের ষ্টল খুলিয়াছিলেন। উহার সঙ্গে খাবার দ্রব্যও বিক্রীত হইত। এই জন্য প্রদর্শনীক্ষেত্রে আমরা কোন পুরুষ দোকানদার আসিতে দিই নাই—প্রয়োজনও হয় নাই। পরিশেষে ইহাও উল্লেখযোগ্য যে, শিল্পশিক্ষালয়ের শিক্ষয়িত্রী শ্রীমতী হরিদাসী শ্রীমানীর পরিচালনায় শিক্ষালয়ের ছাত্রীগণ স্বেচ্ছাসেবিকার কাজ যেরূপ দক্ষতার সহিত করিয়াছেন সে জন্য শ্রীযুক্তা শ্রীমানীকে আমরা আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। বালিকাদের কার্য্যেও সকলে যথেষ্ট প্রীতি লাভ করিয়াছেন।

পরে গত ৮ই আষাঢ় বেলা ৫ ঘটিকার সময় স্থানীয় ক্লাবগৃহে বাগেরহাটের S. D. O শ্রীযুক্ত রেবতীমোহন চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সভাপতিত্বে শিল্প-প্রদর্শনীর পুরস্কার-বিতরণী সভা হয়। শিল্প-শিক্ষালয়ের ছাত্রীদের জন্য ১৩টি পুরস্কার ও ৮ খানি সার্টিফিকেট দেওয়া হয়। সাধারণ ভাবে ১৩টি পুরস্কার ও ৫ খানি সার্টিফিকেট দেওয়া হয়। স্কুলে ও প্রদর্শনীতে হিন্দু-মুসলমান উভয় শ্রেণীর মহিলা ও বালিকাদের সমান অধিকার ছিল ও আছে। ৩টি মুসলমান বালিকা ও মহিলা পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়াছেন। শ্রীযুক্তা শ্রীমানীকে তাঁহার সারা বৎসরের কাজের দক্ষতার জন্য একটি রূপার সিন্দুর-কৌটা উপহার দেওয়া হইয়াছে।

শ্রী লীলা মিত্র,
শ্রী উষাসতী দেবী,
সম্পাদিকাগণ

দেরাদূন

দেরাদূনের মহিলাদিগের উন্নতিসাধনের উদ্দেশ্যে স্থানীয় করণপুর বঙ্গসাহিত্য-সমিতির গৃহে সন ১৩৩৮ ৯ই অগ্রহায়ণের পূর্ণিমা তিথিতে ভূতপূর্ব্ব 'অন্তঃপুর' সম্পাদিকা শ্রদ্ধেয়া হেমন্তকুমারী চৌধুরী মহাশয়া প্রবাসী মহিলা-সমিতি স্থাপিত করিয়াছেন।

সমিতির প্রধান উদ্দেশ্য নারীজাতির শিক্ষা, শিল্পোন্নতি এবং স্বাস্থ্য ও সামাজিক উন্নতির চেষ্টা। গত ভাদ্রী পূর্ণিমায় দেরাদুন প্রবাসী মহিলাসমিতি স্থাপনের দশ মাস পূর্ণ হইয়াছে।

সমিতির বর্ত্তমান সভ্যা সংখ্যা ২৫ জন এবং বালিকা ১০।১৫ জন, বালিকাদিগের নিকট চাঁদা নেওয়া হয় না। সমিতিতে ✓০ করিয়া সভ্যাগণের মাসিক চাঁদা ধার্য্য হইয়াছে।

আমাদের এই সমিতিতে যিনি যাহা জানেন তাহা পরস্পরের মধ্যে শিখাইবার নিয়ম এবং শেখান হয়। সভ্যারা প্রতি মাসে সমিতির কাপড় কিছু কিছু সেলাই করিয়াছেন; এই

কাপড় সমিতি-ভাণ্ডার হইতে কিনিয়া দেওয়া হয়। সমিতির সেলাই যাঁহারা করেন, সেই সেলাই বিক্রয় করিয়া কাপড়ের এবং সেলাইয়ের পারিশ্রমিক ⅓ অংশ বাদ দিয়া ⅔ অংশ সমিতির ভাণ্ডারে দান করা হয় এবং অবশিষ্ট তাঁহাদিগকে দেওয়া হয়। অনেকে নিজের পারিশ্রমিক গ্রহণ না করিয়া সম্পূর্ণ সমিতিতে দান করেন।

কুমারী সুপ্তিময়ী এই সমিতির ভাণ্ডারে শিল্পশিক্ষার জন্য প্রথম তাঁহার মাসিক বৃত্তি ১০৲ টাকা দান করিয়াছেন। এক্ষণে এই সমিতিতে সভ্যারা ব্যবহারোপযোগী শিল্প প্রস্তুত করিয়া থাকেন ও তাহা বিক্রয় হয়। সম্প্রতি স্থানীয় মহিলাসমিতির উন্নতি-সাধনেচ্ছায় সভ্যা শ্রীমতী দুর্গারাণী বন্দ্যোপাধ্যায় ২৫৲ টাকা দান করিয়াছেন।

এখানকার প্রস্তুত জিনিষের বিক্রয়ের ব্যবস্থা সমিতি হইতে করিয়া দেওয়া হয়। এখানে নানাবিধ শিল্প, যথা বস্ত্র সেলাই, পশমের কোট, বেনিয়ান, পুলোভার, ফ্রক, মোজা বোনা এবং ঢাকাই কাজ, এমব্রয়ডারী, কুশির কাজ ইত্যাদি শিক্ষা দেওয়া হয়।

এখানকার ডাক্তার সোম অনুগ্রহ করিয়া মাসে ২ বার করিয়া স্বাস্থ্যতত্ত্ব বিষয়ে মহিলাদের বুঝাইয়া দিতে স্বীকৃত হইয়াছেন—এজন্য সমিতি তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ।

আমাদের এই সমিতির সভানেত্রী হেমন্তকুমারী চৌধুরাণী প্রায় প্রতি সপ্তাহেই সমিতিতে শিক্ষামূলক কিছু কিছু পাঠ করিয়া থাকেন এবং মৌখিক উপদেশ ও উপমা দ্বারা সৎ জীবনের কর্ম্ম ও আদর্শে অনুপ্রাণিত করেন। বাঙ্গলা ভাষার চর্চ্চা স্বরূপ মাঝে মাঝে কোনও কোনও মহিলা নিজের রচনাও পাঠ করিয়া থাকেন। শ্রীযুক্তা হেমন্তকুমারী হিন্দীতেও মাঝে মাঝে হিন্দুস্থানী মহিলাদের জন্য উপদেশ দিয়া থাকেন।

এই মহিলাসমিতিতে বাহির হইতে সম্মানিতা মহিলারা আসিয়াও উপদেশ দিতে পারেন। গত ফেব্রুয়ারী মাসে দার্জ্জিলিঙ মহারাণী বিদ্যালয়ের প্রিন্সিপ্যাল শ্রীযুক্তা হেমলতা সরকার সমিতিতে উপস্থিত হইয়া পরলোকগতা কুমারী যামিনী সেনের দৃঢ় স্বাবলম্বী পরোপকারী পুণ্যশীল চরিত্রের বিষয় পাঠ করিয়া ও মৌখিক উপদেশ দানে মহিলাদের উপকৃত করিয়াছিলেন ও তাঁহার কন্যা কুমারী মীরা সরকারের সঙ্গীত শুনিয়া মহিলারা প্রীতিলাভ করিয়াছিলেন, এজন্য সমিতি তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞ।

এই সমিতিতে সর্ব্ব সম্প্রদায়ের বাঙ্গালী ও হিন্দুস্থানী মহিলাগণ যোগদান করিয়া থাকেন।

শ্রীযুক্ত বাবু হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় অনুগ্রহ পূর্ব্বক বঙ্গলক্ষ্মী পত্রিকা সমিতির সভ্যাগণের জন্য আনাইয়া দিয়াছেন। বালিকাদের জন্য শ্রীযুক্তা হেমন্তকুমারী চৌধুরী মুকুল পত্রিকা দিয়াছেন। এজন্য সমিতি উভয়ের নিকট কৃতজ্ঞ।

শ্রী স্বর্ণপ্রতিমা রায়,
সম্পাদিকা

বাঁধগোড়াগঞ্জ

ইং ১৯৩১ সনের অক্টোবর মাসে বাঁধগোড়াগঞ্জে একটি মহিলাসমিতি স্থাপিত হয়।

নভেম্বর মাসের সভায় স্থির হয় যে, প্রত্যেক মহিলা সভ্যাকে ৴০ এক আনা করিয়া চাঁদা দিতে হইবে।

বর্ত্তমান এই সমিতিতে ১২ জন মহিলা সভ্যা আছেন।

শ্রীনিকেতনের পল্লীসেবা বিভাগের মহিলা কর্ম্মী শ্রীমতী ননীবালা রায় সপ্তাহে ৩ দিন করিয়া নিয়মিত রূপে এইখানে আসিয়া ছাঁট কাট ও সূক্ষ্ম সেলাইয়ের কাজ শিক্ষা দিতেছেন।

১১ জন মহিলা সেলাই শিক্ষায় দক্ষতালাভ করিয়াছেন। শ্রীনিকেতন বিশ্বভারতীর অন্তর্গত পল্লীসেবা বিভাগ হইতে শ্রীমতী রায়ের বেতন ও যাতায়াত এ পর্য্যন্ত বহন করা হইয়াছে। ভবিষ্যতে নারীমঙ্গল সমিতি হইতে এই কার্য্যের জন্য কিছু আর্থিক সাহায্য প্রার্থনা করি।

শ্রী ননীবালা রায়

চক্রধরপুর—কল্যাণী-সঙ্ঘ

গত ১৭ই জুলাই সঙ্ঘের চতুর্দ্দশ অধিবেশনে সম্পাদিকা শ্রীমতী পঙ্কজিনী দে প্রস্তাব করেন যে, তাঁহার স্বামী ডাক্তার শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ দে মহাশয় চক্রধরপুর হইতে বদলী হওয়ায় বাধ্য হইয়া তিনি সঙ্ঘের সম্পাদিকার কার্য্যভার পরিত্যাগ করিতে মনস্থ করিয়াছেন; সঙ্ঘ কোনও উপযুক্ত মহিলাকে

ঐ ভার দিয়া তাঁহাদের কার্য্য চালাইয়া লউন। বহু বাদ-প্রতিবাদের পর স্থির হয় যে, দূরবর্ত্তিনী হইলেও শ্রীমতী পঙ্কজিনী দে-ই সম্পাদিকা থাকিবেন; কার্য্যশৃঙ্খলার জন্য দুইজন সহ-সম্পাদিকা নিযুক্ত হইবেন। সেই মতে সর্ব্ব-সম্মতিক্রমে শ্রীযুক্তা হেমন্তকুমারী গ্রহরাজ ও শ্রীযুক্তা স্বর্ণ-লতা সান্যাল যুগ্ম সহকারিণী সম্পাদিকা নির্ব্বাচিতা হইলেন। সম্পাদিকা মাঝে মাঝে আসিয়া দেখিয়া যাইবেন; প্রয়োজন হইলে পত্র পাইলেই আসিবেন। সহকারিণী সম্পাদিকাদের উপর কার্য্যভার অর্পণ করিবার সময় নিম্নলিখিত মত একটি নাতিদীর্ঘ সুমধুর বক্তৃতা করেন:—

সমবেত ভগিনীগণ!

শুভ শ্রীপঞ্চমী উপলক্ষ করিয়া গত ৯ই ফেব্রুয়ারী আমরা কয়েকটি মহিলা সমবেত হয়েছিলাম, একটা আশা নিয়েই ঐ মিলন; কিন্তু তখন আমাদের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বুঝ্‌তে বা ঠিক কর্‌তে পারিনি, তবু ঐ কয়েকটির মিলনে যে আনন্দ ছিল তাই আমাদের পথ নির্দ্দেশ ক'রে দিয়েছে।

ঐ মিলিত হবার আহ্বান করেছিলেন স্থানীয় বেঙ্গলী ড্রামেটিক ক্লাবের ভদ্র মহোদয়গণ। তাঁরা নিজেদের মিলনে ও কাজে যে আনন্দ অনুভব করেন, তাঁদের মাতা, ভগিনী ও কন্যাদের সেই আস্বাদ গ্রহণ করাবার নিমিত্ত এই সাদর আহ্বান।

৺শ্রীশ্রীসরস্বতী পূজার কাজের জন্য ঐ সাদর আহ্বানই সঙ্ঘসৃষ্টির প্রথম সূত্র; এজন্য সঙ্ঘের পক্ষ হ'তে তাঁদের আমি ধন্যবাদ দিচ্ছি এবং কৃতজ্ঞতা স্বীকার কর্চ্ছি।

ঐ দিনের ঐ মুহূর্ত্ত হতেই এই মহিলাসমিতির গঠন আরম্ভ হয়েছে। কয়েক দিন পরেই আমরা সমিতির নাম দিয়েছি "কল্যাণী-সঙ্ঘ," কারণ নারীর কল্যাণই এই সমিতির প্রধান উদ্দেশ্য।

তারপর ধীরে ধীরে এই সমিতির সেবার ভার আমার প্রতি খানিকটা বেশী ক'রে পড়েছিল। সঙ্ঘসেবিকার স্থানে নিজেকে দেখে, ইহা ঈশ্বরেরই ইচ্ছা জেনে ও ভেবে সঙ্ঘের সেবায় সাধ্যমত চেষ্টা করেছি। এই সেবাকাজে স্থানীয় সভ্যাগণের সহায়তা, শুভেচ্ছা এবং সর্ব্বাপেক্ষা মূল্য-বান তাঁদের একতা ও বিশ্বাসের বলে এবং ঈশ্বরের করুণায় সঙ্ঘ অনেকটা অগ্রসর হ'তে পেরেছে।

আপনাদের মিলিত শক্তি সঙ্ঘের প্রাণপ্রতিষ্ঠা কর্‌তে পেরেছে।

গত ৫ মাস আমি আপনাদের সকলের সহিতই খুব ঘনিষ্ঠভাবে মিশে কাজ কর্‌তে চেষ্টা করেছি। তার ফলে আপনাদের হৃদয়ের যে উচ্চ উদার পরিচয় পেয়েছি, তাতে আমি মুগ্ধ। যে কথা কতবারই আপনাদের বলেছি, আজও আবার তাই স্মরণ করিয়ে বলি—

এই সঙ্ঘের সৃষ্টিকারিণী জননীগণ! আপনাদের স্নেহ-ধারায় একে বাঁচিয়ে রাখ্‌বেন। প্রতি কল্যাণী! বিশ্বাস করুন, আপনাদের প্রতি জনের হাতে এর জীবন ন্যস্ত রয়েছে, প্রত্যেকে জানুন আপনাদের মাসিক চাঁদা বন্ধ কর্‌লেই আপনাদের সঙ্ঘকে উপবাসে ক্ষীণ হ'তে হবে। ঐ সাহায্যের হার এক আনা হোক্ বা এক টাকা হোক্ তাতে কিছু প্রভেদ নেই,—একটি জননীর স্নেহে বঞ্চিত হলেও তাকে আঘাত কর্‌বে। আপনারা সকলেই জান্‌বেন, ভাব্‌বেন, "সঙ্ঘ আমার, সঙ্ঘ আমাদের"। কাজে সাহায্য কর্‌তে না

পারেন, অর্থসাহায্যে অপারক হন, কর্‌বেন না ; ঐ অপারকতায় ক্ষতি হবে না, কিন্তু মনে শুধু স্থান দেবেন, প্রতি জনেই স্থান দেবেন "সঙ্ঘ আমার, সঙ্ঘ আমাদের"। সঙ্ঘের সর্ব্বকল্যাণ সাধিত হ'চ্ছে আপনাদের সমবেত ঐ ইচ্ছার শক্তিতে।

সঙ্ঘের সেবায় সাধ্যপক্ষে ত্রুটি করিনি, তবু বহু ত্রুটি র'য়ে গেছে। এখনো বাজারস্থিত বহু মহিলা সমিতির বাইরে আছেন ; আমরা তাঁদের ঠিক ভাবে বোঝাতে পারিনি তাই তাঁরা এখনো সকলে যোগ দিতে পার্‌ছেন না, এজন্য আমরা দুঃখিত।

তাঁদের একটা অসুবিধা, এই স্থান তাঁদের পক্ষে কিছু দূর পড়ে, তবে এটা চিন্তার বিষয়, একটা বড় জিনিষ গড়্‌তে গেলে প্রথমেই তা পাড়ায় পাড়ায় করা কখনই সম্ভব নয়। যদি তাঁরা উপস্থিত ঐ অসুবিধাটুকু গ্রাহ্য না ক'রে (যেমন ঐখানকার অনেক মহিলা কর্‌ছেন) আমাদের আহ্বানে সাড়া দেন, যোগ দেন, তবে সঙ্ঘ শীঘ্রই আরো বড় হ'য়ে উঠ্‌বে। তখন তাঁদের সকল অসুবিধা দূর কর্‌বার শক্তি সঙ্ঘ অর্জ্জন ক'রে তাঁদের লাভবান কর্‌তে নিশ্চয়ই পার্‌বে।

কিন্তু এও যথার্থ যে, কয়েক জনকে বা অনেক জনকেই নিঃস্বার্থভাবে শুধু অপরের জন্য যোগ দিয়ে সঙ্ঘের সেবা কর্‌তে হবে। এই প্রকার সম্পূর্ণ স্বার্থত্যাগিনী মহিলা আমাদের সঙ্ঘের ৮৪ জনের মধ্যে বহু জন আছেন।

আমরা সৌভাগ্য ব'লে মনে করি যে "সরোজনলিনী দত্ত নারীমঙ্গল সমিতির" সহায়তায় শ্রীযুক্তা অমলা সেন সঙ্ঘের মহিলাগণকে শিল্পশিক্ষা দিবার জন্য এখানে এসেছেন ও আছেন। ইনি বিশিষ্ট ভদ্রবংশীয়া শিক্ষিতা মহিলা, সঙ্ঘের সভ্যাগণকে তাঁর উপযুক্ত সম্মান ও আতিথেয়তা দিয়ে সঙ্ঘ মধ্যে রাখার যত্ন ও চেষ্টা রাখ্‌তে হবে। তাঁর সহিত গত এক মাসের পরিচয়ে আমরা আশা কর্‌তে পেরেছি, শ্রীযুক্তা সেন আমাদের ত্রুটি সহানুভূতির সহিত ক্ষমা ক'রে সঙ্ঘের কল্যাণে মনোযোগিনী হবেন।

মঙ্গলময় ঈশ্বরের করুণায় এই সঙ্ঘের নেত্রীত্ব-ভার শ্রীযুক্তা পঙ্কজলতা কাকোতি অনুগ্রহ ক'রে গ্রহণ কর্‌তে স্বীকৃত হ'য়ে আমাদের বাধিত ও উপকৃত করেছেন। এরূপ বিশিষ্ট মহিলার সহযোগিতার ফলে সঙ্ঘের উন্নতির পথ সুগম ও প্রশস্ত হ'লো দেখে অতীব আনন্দ অনুভব কর্চ্ছি, এবং আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ঈশ্বরচরণে নিবেদন ক'রে প্রার্থনা কর্চ্ছি যে, তিনিই সঙ্ঘের সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গল বিধান করুন।

শ্রী পঙ্কজিনী দে,
সম্পাদিকা

মেকী

শ্রী শরদিন্দু চট্টোপাধ্যায়

চার পাঁচখানি মাসিকপত্র সম্পাদকের নিকট হইতে বরাত আসিয়াছে, আগামী মাসে তাঁহাদের প্রত্যেককে একটি করিয়া গল্প দিতে হইবে।

"বাণী"র সম্পাদক ত সেদিন বাড়ীতে আসিয়াই হাজির। বৃদ্ধকে বিশেষ শ্রদ্ধা করি,—বিশেষ করিয়া বর্ত্তমান বাঙলা গল্পসাহিত্যের ধারা সম্বন্ধে তাঁহার মতামতের জন্য। ভদ্রলোকের আদর্শ সত্যই খুব উঁচু, আর বঙ্গসাহিত্যের আন্তরিক উন্নতিকামীও তিনি। তাঁহার সহিত একথা সেকথা হইতে হইতে অনেক কথাই আসিয়া পড়িল। তিনি বলেন,—দেখুন আমাদের গল্পসাহিত্য কি চিরকাল সেই বাঁধাধরা রাস্তা ধরেই চল্‌তে থাক্‌বে? তা'র গতিপথের কি কোন পরিবর্ত্তন হবে না? সেই মামুলি প্রেমের ন্যাকামি পাঠকদের যে অসহ্য হ'য়ে উঠ্‌ছে। আর না হয় ইউরোপীয় সাহিত্যের চর্ব্বিতচর্ব্বণ,—বিকৃত ব্যর্থ অনুকরণে নানা

কল্পিত অসম্ভব প্রব্লেমের সৃষ্টি, সিচুয়েশনের অবতারণা। সে সৃষ্টিই যখন সৃষ্টিনামের যোগ্য নয়, তা'র উষ্ণমস্তিষ্কপ্রসূত সলিউশনের কথা না তোলাই ভাল। বিবিধ যৌনসমস্যার সমাধান করায় আধুনিক লেখকদের উৎসাহের আর সীমা নেই। আবার গর্কির অনুকরণে একদল কোমর বেঁধে লেগেছেন বস্তিসাহিত্য সৃষ্টি করবার জন্য। তাও আবার সে সব বস্তি অনেক সময় ভারতীয় বস্তি কি রাশিয়ান কুস্তি ঠিক বোঝা যায় না। আমি ভাবি, কেন? আমাদের নিজেদের দেশে কি মৌলিক সাহিত্য সৃষ্টির উপাদানের কিছুমাত্র কমতি আছে?

আমি তাঁহার বাক্যের সমর্থন করিয়া বলিলাম, কিন্তু দেখুন, আমাদের দেশের সম্পাদকরাও এর জন্য কম অপরাধী ন'ন; তাঁরা গল্পের জন্য লেখকদের এত ঘন ঘন তাগিদ দেন যে তাঁরা ভাল জিনিষ সৃষ্টি করবার অবসরই পান না। যা হয় তা হয় ক'রে অনুবাদ, অনুকরণ আর অপহরণ করেই সস্তায় নাম করার সোজা পথে চলেন।

তিনি খুসী হইয়া বলিলেন ঠিক কথা; আমি কিন্তু সেজন্য আপনাকে মোটেই তাড়া দিচ্ছি না। আপনার ক্ষমতা আছে; আপনার কাছে আমি অনেক আশা করি। আমি চাই না আপনি অন্য সব সাধারণ সাহিত্যিকদের ভিড়ের মধ্যে হারিয়ে যান; আমি চাই আপনি তাঁদের সকলের ওপর মাথা তুলে দাঁড়াবেন, যা'তে সকলেরই দৃষ্টি অতি সহজেই আকৃষ্ট হয় আপনার দিকে। আপনি গড্ডলিকা-প্রবাহে গা ঢেলে না দিয়ে, একটা নতুন কিছু সৃষ্টি করুন।

বৃদ্ধের কথায় বিশেষ উৎসাহিত হ'লাম। সারাদিন যেন তাঁহার কথাগুলি নানা সুরে নানা ছন্দে বীণার তারের মত যশঃপ্রার্থীর বুকের মধ্যে বাজিতে থাকে।

চৈত্রের দুপুর; জানালা হইতে দূরে একটা পত্রবিরল পুষ্পিত শিমূলগাছ দেখা যাইতেছে, যেন শীর্ণা শ্রীহীনা এক তরুণী কল্পিত পূর্ব্বরাগাবেশে আরক্ত হইয়া উঠিয়াছে।

টেবিল চেয়ার টানিয়া খুব তোড়জোড় করিয়া বসিয়াছি গল্প লিখিতে। সুবিধামত বেশ ভাল একটা প্লট্ মাথায় গজাইতেছে না। অবশ্য গল্প লিখিতে হইলেই যে খুব জমকালো প্লটের আবশ্যক হয় না, তা' জানি, কিন্তু একটু ভাল আইডিয়াও ত' চাই।

নিজের জীবনের ব্যক্তিগত নানা অভিজ্ঞতার কথা ভাবিতে বসি,—স্মৃতির খাতার পুরাতন পাতা উল্টাইতে থাকি, যদি কিছু সুবিধা হয়। মানবজীবনে সুখদুঃখের মায়াচক্র ত' ঘুরিতেছেই। কিন্তু না, সব বৃথা; একটা "ইউনিক্" কিছু সৃষ্টি করিবার উপযোগী কোন আইডিয়াই যে মনে আসে না।

সারাদিন গভীর চিন্তার ফলে, কপালের মাঝখানের শিরাটা যেন দড়ির মত ফুলিয়া দপ্ দপ্ করিতেছিল; মাথাটাও যেন ভারি ভারি। রোদ পড়িয়া গেলে, বিকালের দিকে বাহির হইলাম ধর্ম্মতলার রাস্তায়—এস্প্ল্যানেডের দিকে একটু 'প্রোমেনেড্' করিতে, যদি মাথাটা একটু ঠাণ্ডা হয়।

চাঁদ্নি চক্ বরাবর গিয়াছি, এমন সময় নিমেষে এক কাণ্ড ঘটিয়া গেল। এক সাহেব অপর ফুটপাথের এক মুটেকে ডাক দিলেন,—এই কুলি! বেচারা কুলি, সাহেবের নিকট হইতে ভাল কিছু রোজগারের আশায় উন্মাদের মত দৌড়াইয়া যেমনি রাস্তা পার হইতে যাইবে, একখানা ট্যাক্সি আসিয়া তাহার ঘাড়ে পড়িল। সৌভাগ্যক্রমে ড্রাইভারটা সময়মত ব্রেক্ কষিয়াছিল তাই মুটেটার খুব সাঙ্ঘাতিক কিছু হইল না; কিন্তু তাহার দক্ষিণ হস্তের উপর দিয়া একখানা চাকা চলিয়া গিয়াছিল। বুঝিলাম অসহ্য যন্ত্রণা হইতেছে,—সম্ভবতঃ হাতের হাড়ও ভাঙিয়া গিয়া থাকিবে। কিন্তু সে সেই অবস্থাতেও কাত্রাইতে কাত্রাইতে বুকে হাঁটিয়া, তাহার ঝাঁকাটা একটু দূরে ঠিক্রাইয়া পড়িয়াছিল, সেইটাকে তাড়াতাড়ি কাছে টানিয়া আনিবার চেষ্টা করিতেছে।

ততক্ষণে সেখানে ভিড় জমিয়া গিয়াছে। কে একজন বলিল, আরে ব্যাটা, প্রাণে বেঁচে গেলি, তাই না কত; আবার ঝাঁকার জন্যে কেমন করছে দেখ না! আর একজন কে বলিল, ব্যাটারা চোখে পথ দেখে ত' চল্বে না? সাহেব ডেকেছে, তবে আর কি? দিলে ছুট্ কানার মতন—। আর একজন একটু সমবেদনাসূচক স্বরে

বলিল, অনেক পুণ্যি ছিল, তাই এ যাত্রা বেঁচে গেলি! বিশেষ কিছু হয় নি, খালি ডান হাতটা—

মুটেটা একবার আমার দিকে চাহিয়াছিল, কী করুণ হতাশ দৃষ্টি। সে ক্রন্দনবেগ চাপিয়া হিন্দুস্থানী ভাষায় বলিল, বাবুজী, আমাদের ডান হাত যাওয়ার চেয়ে ম'রে যাওয়াই ভাল।—তাহার চক্ষুর কোণে যে অশ্রু জমিয়াছিল, তাহা আর বাধা মানিল না।

সেখানে বৃথা কালক্ষেপ করিয়া লাভ নাই বুঝিয়া সে-স্থান ত্যাগ করিলাম। মনটা একটু খারাপ হইয়া গেল। কিন্তু সত্য কথা বলিতে কি খুসীও হইলাম কম নহে, বরং বেশীই। এই ঘটনাটাকে সাজাইয়া গুছাইয়া খুব করুণ করিয়া বলিতে পারিলে, বেশ ভাল একটি গল্প হইবে। মনে মনে প্লট সাজাইতে সাজাইতে সেদিন বাড়ী ফিরিলাম।

একমাস পরের কথা—

অন্ধকার রাত্রে বিছানায় শুইয়া শুইয়া সেই ঘটনাটাই একবার মনে মনে ঝালাইয়া লইতেছিলাম।…কখন ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম জানি না…হঠাৎ যেন ঘুম ভাঙিয়া গেল। মাথায় খেয়াল চাপিল, এই আব ছা অন্ধকার রাত্রির বিশেষ যে একটা রূপ আছে, তাহার সহিত একটু ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হইতে হইবে। জামাজুতা পরিয়া নিঃশব্দে বাড়ী হইতে বাহির হইয়া পড়িলাম। নিকটেই ওয়েলিংটন স্কোয়ারে ঢুকিয়া একটি বেঞ্চ দখল করিয়া বসিয়াছি। সারাদিনের কর্ম্মকোলাহলের পর এত বড় মহানগরী মাতৃ-ক্রোড়ে ঘুমন্ত শিশুটির মতই নিঃস্তব্ধ নিঃসাড়। রাস্তার ধারে একটা পোষ্টে ঠেস্ দিয়া লাঠিতে ভর করিয়া একটা অর্দ্ধনিদ্রিত পাহারাওয়ালা তাহার কর্ত্তব্য করিতেছে।

স্কোয়ারের মধ্যে একটু তফাতে একটা লোক, বোধ হয় মুটে মজুর কিম্বা ভিখারী হইবে, একটা শতচ্ছিন্ন কম্বলে আপাদমস্তক ঢাকিয়া ঘুমাইতেছে, আর মাঝে মাঝে বিশ্রী শব্দ করিয়া কাসিতেছে—যেন ভাঙা কাঁসার শব্দ।

হঠাৎ লোকটা চোখ রগ্‌ড়াইতে রগ্‌ড়াইতে উঠিয়া বসিল। এ কি!—লোকটা অপরূপ ভঙ্গীতে খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে আমারই দিকে আসে যে! তাহার দক্ষিণ হাতটা আবার নাই দেখিতেছি। কি জানি কেন আমার গা'টা যেন ছম্ ছম্ করিতে লাগিল।

কাছে আসিয়া আমাকে সেলাম করিয়া এখনই সে কিছু অর্থভিক্ষা চাহিয়া বসিবে। আমি মাত্র গতকল্য কাগজে "বেগার নুইসেন্সে'র বিষয়ে এক সুলিখিত প্রবন্ধ পড়িয়াছিলাম; মাথার মধ্যে তখনও সেটা ঘুরিতেছিল। খুব বিরক্ত হইয়া তাহাকে চলিয়া যাইতে বলিলাম।

লোকটা হঠাৎ হি হি করিয়া বিদ্রূপের হাসি হাসিয়া উঠিল। আমি চমকিত হইয়া তাহার দিকে এতক্ষণে ভাল করিয়া চাহিলাম…এ যে দেখিতেছি, সেদিনকার সেই মুটেটা। তাহার হাসি থামিলে, সে নিজের ভাষায় বলিল, বাবুজী, তুমিই না আমার মোটর চাপা পড়ার বিষয়ে একটা অতিকরুণ গল্প লিখে খুব নাম করেছ? আর আমি শুনেছি, সেই গল্প প'ড়ে লোকে নাকি চোখের জল রাখ্‌তে পারেনি।…তবে আজ—

ঘুম ভাঙিয়া গেল—ঘরের মধ্যে তখন রৌদ্রকিরণ আসিয় পড়িয়াছে। শুনিলাম, ঢং ঢং করিয়া ঘড়িতে ছ'টা বাজিতেছে। তাড়াতাড়ি বিছানা ছাড়িয়া উঠিলাম। তখনও বুক ধড়্ ফড়্ করিতেছে,—গা ঘামিয়া উঠিয়াছে। তবে কি সব . ?

সাহিত্যচর্চ্চা এক রকম ছাড়িয়া দিয়াছি বলিলেই হয়। সেদিন জনকতক সাহিত্যিক বন্ধুর সঙ্গে খুব সাজগোজ করিয়া বায়স্কোপে যাইতেছিলাম। প্রেসিডেন্সী কলেজের সম্মুখে ফুটপাথের উপর দেখি সেই হাতকাটা লোকটা সত্যই ভিক্ষা করিতেছে—তাহার পাশে একটা চার পাঁচ বছরের ছোট্ট মেয়ে।—বন্ধুদের চক্ষু এড়াইয়া একটা টাকা তাহার হাতে ফেলিয়া দিলাম। সে বিস্মিত পুলকিত হইয়া শুধু বলিল, ভালা করে ভগবান…

বন্ধুরা সমানভাবে কলরব করিয়াই অগ্রসর হইতেছিল। কিন্তু আমার মনের নিভৃত গভীরে বাজিতেছিল মহাকবি গোটের সেই অমর বাণী—

"—Never hope to stir the hearts of men,
And mould the souls of many into one,
By words which come not native from the
heart."

কেন্দ্রসমিতির কথা

চন্দ্রমাধব স্মৃতি-তহবিল

এ পর্য্যন্ত যাঁহারা চন্দ্রমাধব স্মৃতি-তহবিলে দান করিয়াছেন তাঁহাদের নাম ও দানের পরিমাণ নিম্নে প্রকাশিত হইল।

৮ই আগষ্ট	মিঃ এন, বক্সি আই, সি, এস	৫০৲
১৯শে "	শ্রীযুক্ত মনোজ বসু	৫৲
২২শে "	এ, সি, গুপ্ত	২৲
"	চারুচন্দ্র পাল	২৲
"	শ্রীযুক্তা সুবাসিনী চৌধুরী	১৲
"	মাতঙ্গিনী রায়	২৲
৩০শে "	শ্রীযুক্ত ভোলানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	১৲
৬ই সেপ্টেম্বর	মিঃ টি, সি, বোস	৫৲
"	মিঃ এইচ্, কে, দে	১৫৲
"	ডাঃ পি, নিয়োগী	১০৲
"	রায় বাহাদুর শরচ্চন্দ্র ব্রহ্মচারী	২৲
"	ডাঃ এইচ, এন্. রায়	১০৲
"	জনৈক বন্ধু	২৲
"	মিঃ জে, এন্, সরকার	৫৲
"	শ্রীযুক্তা হেমলতা দেবী	৫৲
"	মিঃ জে, সি, ঘোষ	২৲
১৬ই সেপ্টেম্বর	জনৈক বন্ধু	১০০৲
১৯শে "	শ্রীযুক্ত মাণিকলাল দে	৫৲
	মোট	২২৪৲ টাকা

হুগলী মহিলাসমিতি

বার্ষিক উৎসব

গত ১৭ই আগষ্ট হুগলী মহিলাসমিতির বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে স্থানীয় মিউনিসিপ্যাল অফিসের হলে মহিলাদের একটি সভা হয়। শ্রীযুক্তা হেমলতা দেবী, শ্রীযুক্তা হেমাঙ্গিনী সেন, শ্রীযুক্তা নীরপ্রভা চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুক্ত পণ্ডিত কামাখ্যা-চরণ শাস্ত্রী ও শ্রীযুক্ত ননীগোপাল গোস্বামী কেন্দ্রসমিতির পক্ষ হইতে সেই সভায় যোগদান করেন। সম্পাদিকা শ্রীমতী চারুলতা দাস বার্ষিক রিপোর্ট পাঠ করেন। শ্রীযুক্তা হেমলতা দেবী ও শ্রীযুক্তা নীরপ্রভা চক্রবর্ত্তী বক্তৃতা করিলে পর শ্রীযুক্ত ননী বাবু ম্যাজিকলণ্ঠন সহযোগে বক্তৃতা করেন।

লেক-এরিয়া শিশুমঙ্গল সমিতি

গত ২৩শে আগষ্ট লেক-এরিয়া শিশুমঙ্গল সমিতির উদ্যোগে স্থানীয় মহিলাদের একটি সভা হয়। প্রচারক শ্রীযুক্ত ননীগোপাল গোস্বামী এম, এ, ম্যাজিক লণ্ঠন সহযোগে "নারীমঙ্গল ও মহিলাসমিতি" সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। ডাঃ জে, সি, ঘোষ এই সভার সাফল্যের জন্য বিশেষ যত্ন লইয়াছিলেন।

মহিলা-কর্ম্মী শিক্ষাকেন্দ্র

কেন্দ্রসমিতির প্রচেষ্টায় বেনিয়াটোলা লেনস্থ বিদ্যালয়-গৃহে মহিলাদের জন্য একটি ট্রেনিং ক্লাস খোলা হইয়াছে। ইহাতে স্বাস্থ্যতত্ত্ব, মাতৃমঙ্গল ও শিশুকল্যাণ প্রভৃতি বিষয় ছাড়াও মহিলাসমিতি সংগঠন এবং তাহার ভিতর দিয়া কি উপায়ে নারীজাতির সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যা-গুলির সহজ সমাধান করা যাইতে পারে, সে সম্বন্ধে কার্য্য-করী শিক্ষা প্রদান করা হইবে। এই ট্রেনিং ক্লাসের ভার লইয়াছেন:—শ্রীযুক্তা নীরজবাসিনী সোম বি, এ, বি, টি, শ্রীযুক্তা হেমলতা দেবী, মিস্ প্রতিভা সেন বি, এ, শ্রীযুক্তা নীরপ্রভা চক্রবর্ত্তী, ডাঃ রমেশচন্দ্র রায়, রায় এ, সি, ব্যানার্জি বাহাদুর, রায় এস, সি, ব্রহ্মচারী বাহাদুর, মিঃ ডি, পি, সিংহ এম, এ, মিঃ এন, গোস্বামী এম, এ, পণ্ডিত কামাখ্যা-চরণ শাস্ত্রী, মিঃ টি, সি, বোস, মিঃ আর, পি, ব্যানার্জি বি, এ, এবং অন্যান্য ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহোদয়গণ।

গত ৩০শে জুলাই শনিবার হইতে আরম্ভ করিয়া প্রতি শনিবার এই ক্লাসের অধিবেশন নিয়মিত ভাবে হইতেছে। মিস্ প্রতিভা সেন, শ্রীযুক্তা হেমলতা দেবী, শ্রীযুক্তা

হেমাঙ্গিনী সেন, শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রপ্রসাদ সিংহ, মিঃ টি, সি, বোস এবং শ্রীযুক্ত ননীগোপাল গোস্বামী—ইঁহারা এই ক্লাসের অধিবেশনে বক্তৃতা করিয়াছেন।

বিভিন্ন বালিকাবিদ্যালয়ে বক্তৃতা

কেন্দ্রসমিতির প্রচারকগণ কলিকাতা এবং সহরতলীর বিভিন্ন বালিকাবিদ্যালয়ে শিল্প, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যরক্ষা সম্বন্ধে ম্যাজিক লণ্ঠন সাহায্যে বক্তৃতা করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। গত দুই মাসে এই কয়টি বালিকাবিদ্যালয়ে বক্তৃতা করা হইয়াছে :—

ভিক্টোরিয়া বালিকাবিদ্যালয়, কালীঘাট মহাকালী পাঠশালা, কমলা বালিকাবিদ্যালয় প্রভৃতি। বালিকা ছাত্রীরা যাহাতে ছোট বেলা থেকেই গৃহ-সংসারের সর্ব্বাঙ্গীন কুশলতার দিকে অবহিত হইতে শিক্ষালাভ করে, এই বক্তৃতায় তাহাই প্রধান লক্ষ্য।

ম্যাডান থিয়েটারের সাহায্য

গত ১২ই সেপ্টেম্বর মেসার্স ম্যাডান কোম্পানী তাঁহাদের এল্‌ফিনষ্টোন পিকচার প্যালেস্ নামক সুবিখ্যাত চিত্রালয়ে সরোজনলিনী এসোসিয়েশনের সাহায্যার্থ "সং অফ দি ওয়েষ্ট" নামক চিত্রখানি প্রদর্শন করিয়াছেন। উহার টিকিট বিক্রয় বাবদ প্রায় আটশত টাকা সমিতির তহবিলে আসিয়াছে। আমরা মেসার্স ম্যাডান কোম্পানীর নিকট হইতে এইরূপ সাহায্য প্রত্যেক বৎসর পাইয়া আসিতেছি। বাংলার নারীদের প্রতি তাঁহাদের এই সহানুভূতি কিরূপ তাহা ইহাতেই বুঝা যায়। আমরা কোম্পানীর উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি।

রাণাঘাটে মহিলাসভা

গত ১৭ই সেপ্টেম্বর রাণাঘাটের শ্রীযুক্ত পঞ্চানন গাঙ্গুলী ও শ্রীযুক্ত শিবনাথ চ্যাটার্জ্জির উদ্যোগে দে-চৌধুরী বাবুদের বাগান বাড়ীর হলে স্থানীয় ভদ্রমহিলাদের একটি সভা হয়। স্থানীয় বহু ভদ্রলোক, মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট, মুনসেফ বাবু এবং কেন্দ্রসমিতির পক্ষ হইতে শ্রীযুক্তা নীরপ্রভা চক্রবর্ত্তী, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কামাখ্যাচরণ শাস্ত্রী ও শ্রীযুক্ত ননীগোপাল গোস্বামী সভায় যোগদান করেন। রাণাঘাট লোক্যাল-বোর্ডের চেয়ারম্যান ও অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত পঞ্চানন গাঙ্গুলী মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। শ্রীযুক্তা নীরপ্রভা চক্রবর্ত্তী ও ননী বাবু মহিলাসমিতির প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে বক্তৃতা করিলে পর পণ্ডিত মহাশয় ম্যাজিক লণ্ঠন সহযোগে মহিলাসমিতির উদ্দেশ্য, গঠন ও পরিচালনপ্রণালী এবং কার্য্যধারা সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেটের পত্নী শ্রীযুক্তা রায় সভানেত্রী ও মিসেস পি, গাঙ্গুলী সম্পাদিকা স্থির করিয়া একটি মহিলাসমিতি গঠিত হইয়াছে।

Printed by ... Sirkar at the Classic Press. 9-3 Ramanath Majumdar Street Calcutta. and published by him, at 45 Beniatola Lane, Calcutta.

৭ম

বঙ্গলক্ষ্মী

"বাঁচ্‌লে সবাই তবেই বাঁচি,—
সবার ভালো তাই ত' যাচি।"

কার্ত্তিক, ১৩৩৯

মহাশুচি

এস হে আমার দেশের মানুষ
ভেদের কলুষ ফেলিবে ধুয়ে,—
শত প্রাণে প্রাণ মিলিছে যেথায়
মিলিবে সেথায় মাথাটি থুয়ে।
করেছিলে শুচি আপনার দেহ,
আপনার প্রাণ, আপনার গেহ,
সবাকারে ল'য়ে চল শুচি হ'য়ে
বিধাতার পায়ে পড়িবে নুয়ে।
আন সে তোমার আলোকের বাণী
সুপ্তি-ভাঙানি, আঁধার-নাশা,
মিলাইল যাহে দ্যুলোকে-ভূলোকে,
মানবের মুখে দিল যে ভাষা।
সবাকার সাথে যাও হে মিলায়ে,
নিজ সম্পদ দাও হে বিলায়ে,
মহাশুচিতার আলোক-পাথার
[illegible] বারে বার গেল যে ছুঁয়ে।

বাঙলার ভাস্কর্য্যশিল্প

শ্রী মনমোহন নরসুন্দর

কোন জাতির শিক্ষা সভ্যতা ও সাধনার পরিচয় জানিতে হইলে তাহার সাহিত্য ও শিল্পসৃষ্টির দিকে নজর দিতে হয়। সাহিত্য ও শিল্প উভয়েরই উদ্দেশ্য সৌন্দর্য্যসৃষ্টি। সাহিত্যে যাহা ভাষার বন্ধনে রসের সংমিশ্রণে সাহিত্যিকের লেখনী স্পর্শে সৌন্দর্য্যের প্রভায় প্রভাম্বিত হয় শিল্পী তাহাই তাঁহার দূরদৃষ্টি ও কল্পনার সাহায্যে মানব মনের অন্তর্নিহিত চিরন্তন সত্য ও সুন্দরকে মূর্ত্তির মধ্যে প্রকাশ করেন।

জগতে প্রাচীন সভ্য দেশগুলির দিকে তাকাইলে নজর পড়ে এশিয়ায় ভারতবর্ষ, আফ্রিকায় ইজিপ্ট এবং ইউরোপে গ্রীসের দিকে। গ্রীসের শিল্প-সভ্যতা অভিজ্ঞতার বাণী ইউরোপের দেশে দেশে যেমন ছড়াইয়া পড়িয়াছিল ভারতের সাধনার বাণীও তেমনি এশিয়ার চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু এই সবার উপরে বাঙলার একটা বৈশিষ্ট্য ছিল। সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা কাননকুন্তলা বাঙলার সঙ্গীত, তাহার শিল্পের ধারা, তাহার ধর্ম্মমঙ্গলের প্রভাব সকলের মধ্যেই একটা স্বতঃ-উৎসারিত সৌন্দর্য্যবৃত্তির পরিচয় ছিল। এমন ব্যাপকভাবে অনুশীলনের পরিচয় আর কোথায়ও পাওয়া যায় না। এদেশের বনে জঙ্গলে গ্রামে গ্রামে গাছতলায় গাছতলায় মন্দিরগাত্রে পাহাড়ে পর্ব্বতে ভাস্কর্য্যের ছড়াছড়ি। সুন্দরের সাধনায় এরা যেমন করিয়া আত্মনিয়োগ করিয়াছিল এমনটী আর কোথায়ও ঘটে নাই। এক একটা শিল্পী গোষ্ঠীই এদেশে গড়িয়া উঠিয়াছিল আর আজও তাহার জের চলিয়া আসিতেছে।

এই শিল্পকে বাঁচাইয়া রাখিবার জন্য বাঙালীর একটা দরদ ছিল। দেশে বাধা বিপদের অন্ত ছিল না। বিদেশীয়দের সঙ্ঘাতে, বিধর্ম্মীদের ধর্ম্ম-বিদ্বেষের প্রভাবে কত সুন্দর সুন্দর চিত্র, মূর্ত্তি ও মন্দির যে ধ্বংস হইয়াছিল তাহার ইয়ত্তা নাই। তবুও তাহার নিজের সাধনাকে বজায় রাখিবার জন্য চেষ্টার অন্ত ছিল না। প্রাগৈতিহাসিক যুগের সেই সাধন প্রচেষ্টার বাণী বহন করিয়া আসিতেছে বাঙলার কুম্ভকার, পটুয়া ও ভাস্করের দল। ঢাকার পটুয়াটুলী, কালীঘাটের পটুয়াপাড়া, দাঁইহাট ও মুর্শিদাবাদের ভাস্করপল্লী, বীরভূমের পটুয়া ও চিত্রকর দল তাহারই শেষ নিদর্শন।

ভাস্কর্য্যের শেষ চিহ্ন ও ধ্বংসাবশিষ্ট মূর্ত্তিগুলিকে দেখিলে মনে হয় ঐ শিল্পচর্চ্চা পশ্চিম ও উত্তর বাঙলায় যেরূপ প্রসার লাভ করিয়াছিল পূর্ব্ব বাঙলায় তেমনভাবে হয় নাই।

ভারতবাসীর ভাস্কর্য্যবিদ্যার অনুশীলনের গোড়ার কথা আলোচনা করিতে গেলে কথা আসে ধর্ম্মভীরু ভারতবাসীর কোন ধর্ম্মগ্রন্থ তাহাকে মূর্ত্তিনির্ম্মাণে প্রেরণা দিয়াছিল। অনেকেই বেদকে প্রাধান্য দেন। কিন্তু এ বিষয়ে মতভেদ আছে। বেদে নানারূপ দেব দেবীর পরিকল্পনা আছে বটে কিন্তু বৈদিক যুগে মূর্ত্তি পূজার কোন প্রকার নিদর্শন পাওয়া যায় নাই। বৈদিক যুগের পর উপনিষদের যুগ—তখন উন্নতিশীলতা ও স্থিতিশীলতা উভয়েরই প্রাধান্য ছিল, সেই হিসাবে উপনিষদ কিছু কিছু সাহায্য করিয়াছিল। বৌদ্ধ যুগেই ইহার প্রসার বাড়িয়াছিল। বৌদ্ধরা নিরাকারবাদী হইলেও জড়োপাসনার সংসর্গ ত্যাগ করিতে পারে নাই। চিতাভস্মের উপর স্তূপ নির্ম্মাণই তাহার প্রমাণ। নির্ব্বাণ-কালে আনন্দ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন "হে প্রভো, আমরা তথাগতের মৃতদেহের কিরূপে সৎকার করিব?"

বুদ্ধ উত্তর করিলেন— 'হে আনন্দ! তথাগতের শরীর পূজা করিয়া নিজের মোক্ষের পথে বাধা উপস্থিত করিও না। নিজের মোক্ষের চেষ্টায় তুমি আত্মনিয়োগ কর। তথাগতের প্রতি শ্রদ্ধাবান অনেক ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ এবং গৃহস্থ আছেন যাঁহারা তথাগতের শরীর পূজা করিবেন।" ভারহুতের ও সাঁচীস্তূপের বেদীকার লিপিমালায় বোধিবৃক্ষরূপে চৈত্য-বৃক্ষের পূজা ও স্তূপ পূজার প্রমাণ পাওয়া যায়। তখনও পর্য্যন্ত কোন প্রকার মূর্ত্তির উদ্ভাবন হয় নাই। ভাস্কর্য্য কলার ধারাবাহিক ইতিহাসের সূত্রপাত হয় খৃষ্টপূর্ব্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে শুঙ্গ বংশের অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে।

কিন্তু ইহা বিশেষ উন্নতি লাভ করিয়াছিল প্রথম শতাব্দীর মধ্যভাগে। সারনাথ, পাটলীপুত্র এবং বিদিসার ভগ্নাবশেষের মধ্যে তাহার কিছু কিছু নিদর্শন পাওয়া যায়। মথুরার শিল্পীরাই সর্ব্বপ্রথমে দেবদেবীর আকারের উদ্ভাবন করেন। বৌদ্ধমূর্ত্তি গান্ধারে জৈনমূর্ত্তি মথুরায় উদ্ভাবিত হইয়াছিল। পরবর্ত্তীকালে শককুষাণ-প্রভাব আর্য্যাবর্ত্তে মূর্ত্তিপূজা প্রচারে সাহায্য করিয়াছিল। তাহারা দিয়াছিলেন কায়, গুপ্ত যুগের শিল্পীগণ করিয়াছিলেন তাহাতে সজীবতা ও রসোদ্দীপনীশক্তির সঞ্চার।

বুদ্ধের মৃত্যুর পর কালক্রমে তাঁহার শিষ্য-প্রশিষ্যেরা বৌদ্ধমূর্ত্তি পূজা করিতে লাগিলেন এবং তাঁহার স্মৃতিরক্ষাকল্পে যে যে স্থানে বুদ্ধের চরণসম্পাত হইয়াছিল সেই সকল স্থানে স্তূপ, মন্দির, চৈত্য বিহার প্রভৃতি স্থাপন করিতে লাগিলেন। বৌদ্ধধর্ম্মের যতই প্রচার হইতে লাগিল ততই জনসাধারণের মনে বৌদ্ধপ্রভাব গভীর ভাবে অঙ্কিত করিয়া দিবার জন্য বৌদ্ধ মূর্ত্তির প্রয়োজন হইল। সাকার উপাসনা বহুকাল হইতেই এদেশে চলিয়া আসিতেছিল। সেই হিসাবে মৃৎমূর্ত্তি নির্ম্মাণের জন্য একদল শিল্পীগোষ্ঠীই এদেশে ছিল। বংশপরম্পরায় তাহারা ঐ কাজ করিত। যুগপরিবর্ত্তনে বাঙ্গালার ঐ শিল্পীদের যে বৌদ্ধসন্ন্যাসীদের কাছে ডাক পড়ে নাই তাহাই বা কে বলিতে পারে। অশিক্ষিত গতানুগতিক শিল্পী যে সব সময়ে নিজ পরিকল্পনায় ঐ সকল মূর্ত্তির রূপ দিয়াছিল তাহা কখনই হইতে পারে না। তাহার মধ্যে ছিল সাধকের পরিকল্পনা। বৌদ্ধমূর্ত্তিগুলির মধ্যে বাহিরের পরিণত দেহের সৌন্দর্য্য যেমন ফুটিয়াছে অন্তরের পবিত্র ধ্যানমগ্ন ভাবও তেমনি ফুটিয়া বাহির হইয়াছে। বাঙ্গালার সমস্ত মূর্ত্তির মধ্যেই এইভাব বিদ্যমান আছে। গ্রীসের মূর্ত্তিগুলির মধ্যে মানুষের বহিরাঙ্গকে ফুটাইয়া তুলিবার বাহাদুরী যথেষ্ট আছে কিন্তু অন্তরের সম্পদকে তাহারা ধরিতে পারে নাই। হিন্দুর দেবমূর্ত্তির মধ্যে উপাস্যের লক্ষণ বিদ্যমান; মুখমণ্ডলে ধ্যানমগ্ন উপাসকের ভাব। তখন যান্ত্রিক যুগ মানবমনের অতল গুহার কোন গভীর অন্ধকারে সুপ্ত ছিল তাহা কল্পনা করা যায় না। অস্ত্রের সাহায্যে পাথর ও পর্ব্বতগাত্র খোদাই করিয়া মূর্ত্তি নির্ম্মাণ কত কঠিন তাহা এ যুগের পাশ্চাত্য শিল্পীরও ধারণার বাহিরে। রাজপুত্রের সোনার কাঠির পরশে রাজকন্যার মৃতশরীরে প্রাণসঞ্চারের মত সে যেন স্বপনপুরীর কাহিনী। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বলিয়াছেন—"আমাদের দেশের ভাস্করেরা পাথরকে মোমের মত ব্যবহার করিতেন।"

মৃত্তিকা দ্বারা মূর্ত্তিনির্ম্মাণ আমার মনে হয় বহুকাল হইতেই দেশে প্রচলিত ছিল কিন্তু ভাস্কর্য্য বিদ্যার অনুশীলনে বৌদ্ধধর্ম্মই যে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী সাহায্য করিয়াছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। দেশ বিদেশে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারের ফলে শিল্পীর সংখ্যা বাড়িয়া গিয়াছিল এবং ধর্ম্মের সঙ্গে শিল্পের অনুশীলন বাড়িয়া গিয়াছিল। তাহার ফলে ভাস্কর্য্য বিচিত্রভাবের পরিপোষক হইয়া সুন্দরতররূপে পারিপার্শ্বিক বিচিত্র ঘটনাবলী ব্যক্ত করিয়া সাধারণের মনে নব নব দ্যোতনার উদ্রেক করিয়াছিল। ভাস্কর্য্যে দেশ ছাইয়া গিয়াছিল। বৌদ্ধ গয়ার মন্দির, পরেশনাথের মন্দির, অজন্তার গুহা ও রামগুহা তাহারি নিদর্শন। মিউজিয়ামে গেলে বৌদ্ধ ও বিষ্ণুমূর্ত্তিই বেশী দেখা যায় উহা বৌদ্ধ ও সনাতন হিন্দুযুগের সুকুমার মনোবৃত্তি ও শ্রেষ্ঠ শিল্পকলার পরিচয়।

মহেন্দজাড়োতে আবিষ্কৃত অন্যান্য বহু পদার্থের মধ্যে ভাস্কর্য্যগুলিও প্রমাণ করিয়া দিয়াছে যে ভাস্কর্য্য বিদ্যার অনুশীলনে ভারতীয়েরাই অগ্রণী। বাঙালী শিল্পীরও প্রভাব কম ছিল না। কবি জন্মভূমির এই শিল্প সাধনার গৌরবে গৌরবান্বিত হইয়া লিখিয়াছেন—

স্থপতি মোদের স্থাপনা করেছে বরোবুদুরের ভিত্তি
শ্যাম কম্বোজে ওঁকার ধাম মোদের প্রাচীন কীর্ত্তি।
ধেয়ানের ধনে মূর্ত্তি দিয়াছে আমাদের ভাস্কর
বীটপাল আর ধীমান যাদের নাম অবিনশ্বর।

ভাস্কর্য্যে বাঙালী শিল্পীর এই কৃতিত্বের কথা শুনিলে স্বভাবতঃ মনে আসে কেমন করিয়া বাঙলায় উহার প্রবাহ আসিয়া লাগিল এবং কিরূপেই বা তাহার প্রসার হইল। নদনদী মেখলা শ্যামা বঙ্গভূমির প্রাকৃতিক অবস্থানই বাঙালীকে সত্যশিবসুন্দরের সাধনায় নিয়োজিত করিয়াছিল। বৌদ্ধযুগের সময়ে তক্ষশিলা, নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শীলভদ্র ও অতীশ উভয়েই বাঙালী

ছিলেন। তাঁহাদের প্রভাবে ও প্রেরণায় বাঙালী শিল্পী যে বিহারে গিয়া শিল্পসাধনায় মনোনিবেশ করে নাই তাহাই বা কে বলিতে পারে। শিল্পপ্রাণ বাঙ্গালীর সেখানে সর্ব্বাগ্রে ডাক পড়িয়াছিল বলিয়া মনে হয়। পাথর খোদাই কার্য্যে স্বল্পকালের মধ্যে যখন তাহারা কৃতিত্ব লাভ করিয়াছিল তখন একদিকে বৃহত্তর বাঙলার শিল্প ও অপর দিকে ভারতের সাধনা ও শিল্প লইয়া বৃহত্তর ভারত গড়িয়া উঠিয়াছিল। ইহার পরবর্ত্তীকালে যখন পালরাজারা বাঙলার সিংহাসনে আরোহণ করিলেন তখন সারা বাঙলা বৌদ্ধ প্রভাবে ছাইয়া গেল। তাঁহারা বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারে বদ্ধপরিকর হন ও ভাস্কর্য্য অনুশীলনে বাঙালীকে উৎসাহিত করেন। তাঁহারা নিজ রাজধানীর বড় বড় মন্দির ও বৌদ্ধমূর্ত্তিতে পরিশোভিত করিলেন। বীটপাল ও তৎপুত্র ধীমানের অমর তুলিকা স্পর্শে সারা বাঙলায় নূতন শিল্পের প্রাণ প্রতিষ্ঠা হইল। বংশানুক্রমে তাঁহার অনুশীলনও কিছু দিন চলিল। পালরাজাদের পরে সেন রাজাদের সময়ে শৈবধর্ম্ম হিন্দুতান্ত্রিকতায় পর্য্যবসিত হইয়াছিল। অপরদিকে বৌদ্ধ ধর্ম্মও তাহার প্রাচীন আদর্শ হারাইয়া তান্ত্রিক ধর্ম্মে পরিণত হইল। একটি অপরটিকে গ্রাস করিয়া ফেলিল। কে কোনটিকে গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছিল সে বিষয়ে মতভেদ আছে। ইতিপূর্ব্বে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের পুনরুত্থান সুরু হয়, পরে কালক্রমে তাহার প্রবল তরঙ্গাভিঘাত বৌদ্ধরা সহ্য করিতে পারিল না নানা শাখায় বিভক্ত হইয়া নিজেদের ধর্ম্মমত অক্ষুণ্ণ রাখিতে চেষ্টা করিল। কৃষ্ণানন্দ পূর্ণানন্দ প্রমুখ বাঙলার তান্ত্রিকগণ তখন বৌদ্ধ গৃহস্থদিগকে তান্ত্রিকতার দিকে টানিতেছিল। পূর্ণানন্দ প্রচার করিয়াই বৌদ্ধ দেবদেবীর পূজার বিধি বিধানাদি রচনা করিতেছিল। শীতলা, ষষ্ঠী, বিশালাক্ষী, তারা এগুলি বৌদ্ধদেরই পরিকল্পিত। অনার্য্য দেশে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের বাহিরে আসিয়া বৌদ্ধধর্ম্মে কুমারী পূজা, পরকীয়া চর্চ্চা, ইন্দ্রিয় চরিতার্থতা ইত্যাদি নানা ব্যাভিচারের আকারে ধর্ম্মের ও সাধনার শ্রেষ্ঠ অঙ্গ বলিয়া পরিগণিত হইল। এবম্বিধ বিশৃঙ্খলার সময়ে রামাই পণ্ডিত নিজেদের অস্তিত্ব বাঁচাইয়া রাখিবার জন্য বৌদ্ধ ও হিন্দুর সমন্বয় সাধনে ইচ্ছা করিয়া সদ্ধর্ম্মের প্রচলন চেষ্টা করিতেছিলেন। তিনি সমস্ত দেবতাকে বাদ দিয়া ধর্ম্ম অর্থাৎ সাক্ষাৎ বুদ্ধকে ধরিলেন, হিন্দু দেবদেবীকে অস্বীকার করিলেন না—

ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর আদি দেবগণে
এক মনে স্তব করে দেব নিরঞ্জনে।

শিব বিষ্ণু ইত্যাদি দেবতাকে এবং নিজকে আবরণ দেবতার আসনে বসাইলেন, স্পষ্ট করিয়া বলিলেন—

কলিযুগের পণ্ডিত রামাই
কলিযুগের ভাই শুনায় উপায়।

এইরূপে পরোক্ষভাবে তিনি হিন্দুতান্ত্রিকতার সাহায্য করিলেন। তিনি ধর্ম্মঠাকুরের পুস্তক লিখিলেন, তাঁহার রচিত ছড়া সহযোগে ধর্ম্মপূজা চলিতে লাগিল। শিবের গাজন ধর্ম্মের গাজন সেই প্রচেষ্টা এখনও বহন করিয়া আসিতেছে। ক্রমে ধর্ম্মঠাকুরের পূজার স্বাতন্ত্র্য লোপ করিবার মানসে ধর্ম্মকে হিন্দু দেব দেবীর মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়া পূজা প্রদত্ত হইতে লাগিল। এইরূপে বুদ্ধের বিলোপ সাধন করিয়া ধর্ম্মকে হিন্দুয়ানীতে নিমজ্জিত করিয়া দিবার চেষ্টা চলিল। ইহার ফলে কামনা মূলক নানা দেব দেবীর পূজা প্রচলন হইল। ধর্ম্মকলহের এই প্রবাহে মূর্ত্তি শিল্প বিচিত্ররূপে প্রকটিত হইল। ফলে ভাস্কর্য্য কলার উন্নতিই হইল; বিচিত্র সুন্দর সুন্দর বিভিন্ন ভাবের মূর্ত্তিকে আমরা লাভ করিলাম। গত গ্রীষ্মের ছুটিতে রাজসাহীর বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতিতে রক্ষিত তারা, উমামহেশ্বর, বরাহ, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, সূর্য্য, মার্ত্তণ্ড, ভৈরব প্রভৃতি মূর্ত্তিগুলি দেখিয়া ধর্ম্মকলহের লাভের কথা আমার মনে হইয়াছিল। উহাদের প্রত্যেকটাই উৎকৃষ্ট প্রস্তর শিল্পের পরিচায়ক। সংগ্রহ কম কিন্তু প্রত্যেকটাই খুব মূল্যবান। মূর্ত্তিগুলি দেখিয়া মনে হয় শিল্পীরা বৌদ্ধ প্রভাব এড়াইতে পারে নাই। অভ্যস্ত হাত নব নব পরিকল্পনায় নানারূপ বিচিত্র দেবদেবীর মূর্ত্তি গঠন করিলেও শিল্পীর অজ্ঞাতসারে তাহাতে বৌদ্ধমূর্ত্তির ভাব আসিয়া পড়িয়াছিল। পশ্চিম বাঙলার গ্রামে গ্রামে গাছ তলায় ও দেব মন্দিরে অবস্থিত বিষ্ণুমূর্ত্তি, সূর্য্যমূর্ত্তি ও অনেক মহাদেব মূর্ত্তিকেও হঠাৎ বৌদ্ধ মূর্ত্তি বলিয়া ভ্রম হয়।

পশ্চিম ও উত্তর বাঙলায় ভাস্কর্য্যের ছড়াছড়ি, তাহার কারণ অনুসন্ধান করিতে গেলে অনুমান হয় শেষ হিন্দু রাজা-

দের রাজধানী ও স্থায়ীভাবে বসবাস ছিল পশ্চিম ও উত্তর বাঙ্‌লায়। আর ঐ সকল নির্ম্মাণের জন্য যে সকল পাথরের প্রয়োজন হইতে তাহা বোধ হয় বিহার প্রদেশ হইতেই সংগৃহীত হইত। পশ্চিম ও উত্তর বাঙ্‌লার পক্ষে উহা যেমন সুবিধা ছিল পূর্ব্ব বাঙলায় তাহা ছিল না। কিরূপে যে উহা দূর দূরান্তর হইতে আনীত ও প্রেরিত হইত তাহা কল্পনা করা সহজ নহে। ঐ সকল কথা চিন্তা করিলে মনে হয় বাঙালীর শিল্প সাধনা কি দুর্দ্দমই না ছিল! স্বাধীন বাঙলার সেই শিল্প-প্রচেষ্টা আজ কোথায়?

মাটী নয়, মোম নয়, গালা নয়—কঠিন পাষাণফলক, ছাঁচে ঢালাই করিবার উপায় ছিল না, আঘাতে চটিয়া গিয়া যে কিরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হইবে তাহা অনুমান করা দুঃসাধ্য। সেই পাথর খোদাই করিয়া সুঠাম, সুসঙ্গত, ভাব বৈচিত্র্যময় দেহ ভঙ্গিমা দান করাই যে কেবল তাহাদের কৃতিত্ব তাহা নহে। একই প্রকারের ছোট বড় মূ নির্ম্মাণ যে কতদূর সাধনা ও অনুশীলনসাধ্য তাহা আধুনিক কালের শিল্পী-মনের ও অগোচরে শুধু বিস্ময় উদ্রেক করে মাত্র। আমাদের বীরভূম জেলায় ষষ্ঠীতলায় যে সকল বিষ্ণুমূর্ত্তি দেখিয়াছি তাহাদের সকলগুলিরই আকার একই প্রকারের। মনে হয় কে যেন একই ছাঁচে ঢালাই করিয়া নির্ম্মাণ করিয়াছে। মুদ্রিত পদ্মের উপর ধ্যানস্তিমিত নেত্রে চতুর্হস্ত শিরোদেশে মুকুট শোভিত বিষ্ণু দণ্ডায়মান। হস্তে তার শঙ্খচক্র গদাপদ্ম। দুইদিকে দুইটী নারী এক হস্তে বীণা ও এক হস্তে চামর লইয়া দণ্ডায়মানা। সমস্ত মূর্ত্তিগুলি একখানি পাথরে খোদাই করা। মূর্ত্তির তলদেশে পাথরের যে বেদী কল্পনা করা হইয়াছে তাহাতে গণ্ডুড় মূর্ত্তি ও বিরাজমান। এই প্রসঙ্গে একটী কথা মনে হইল। ছোটবেলায় এক সময়ে মার সঙ্গে বামাক্ষেপার সাধন-পীঠ তারাপীঠ দেখিতে গিয়াছিলাম। মন্দির প্রাঙ্গণের এক পার্শ্বে একটি শিবমন্দির ছিল। সেই সময়ে শিবলিঙ্গ দর্শন করিতে গিয়া তাহারি পার্শ্বে দেওয়ালে লম্বমান ৪।৫ ফুট লম্বা একটী পাথরের মূর্ত্তি দেখিয়াছিলাম। তারপর বহুবৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে তবুও তাহার স্মৃতি মনের মধ্যে আবছায়ার মত ছিল। কয়েক মাস পূর্ব্বে সেই কথা মনে হওয়ায় আর একবার ভাল করিয়া দেখিয়া আসিয়াছি। তাহারি নিকটে ছোট একটী ষষ্ঠী মন্দিরে ষষ্ঠী বলিয়া পূজিত ঐ একই আকারের ছোট একটী বিষ্ণুমূর্ত্তি দেখিলাম। দেখিলে মনে হয় যেন ক্যামেরায় তোলা একই মানুষের একখানি full plate ও একখানি half plateএর ছবি।

হিন্দু ও বৌদ্ধ তান্ত্রিকতার মেশামেশির ফলেই ঐ সকল মূর্ত্তি গড়িয়া উঠিয়াছিল। তাহার প্রমাণ তান্ত্রিক দেবালয়-গুলিতেই উহার আধিক্য। নালান্দায় হিন্দুদের কালীমূর্ত্তির মত একটী মূর্ত্তি দেখা গিয়াছে—এক পুরুষ রমণীর বুকের উপর পা দিয়া দাঁড়াইয়া এবং সেই পুরুষের গলায় নরমুণ্ড-মালার পরিবর্ত্তে বুদ্ধমুণ্ডমালা। মনে হয় রমণীরূপ রিপুজয় করিয়া পুরুষ তাহার বুকের উপর পা দিয়া দাঁড়াইয়াছে সাত্ত্বিক সাধকবেশে এবং তাহার গলায় ঝুলিতেছে সাত্ত্বিক-তার প্রতীকস্বরূপ বুদ্ধমুণ্ডমালা। কাঁদির (মুর্শিদাবাদ) রুদ্রদেবের মন্দিরে দেখিয়াছি রুদ্রদেবের মূর্ত্তিখানি ঠিক বুদ্ধের মত। শুনিয়াছি উহার গাজন-উৎসবে শূন্যপুরাণের ধর্ম্ম-পূজার মত উৎসব চলিয়া থাকে। শবদেহ লইয়াও মাতা মাতি হয়। বৌদ্ধযুগের সময়ে এইরূপে হিন্দু ও বৌদ্ধ উভয়ের নানা দিক দিয়া সংমিশ্রণ হইয়াছিল; ঐ সকল মূর্ত্তিগুলিই তাহার সাক্ষ্য দিতেছে।

মন্দিরের সম্মুখভাগের শোভা ও বাঙালীর ভাস্কর্য্যের আর একটী নিদর্শন। ঐগুলি কোথাও লাল পাথরে কোথাও ইষ্টকফলকে প্রস্তুত। ঐ সকল মূর্ত্তি রামায়ণ, মহাভারত এবং পৌরাণিক আখ্যানমূলক ঘটনাসমূহকে কেন্দ্র করিয়া প্রস্তুত। মন্দির সম্মুখে উহার সমাবেশের মূলে বোধ হয় ধর্ম্মপ্রাণ বাঙালীর ধর্ম্মশাস্ত্র ও লোকশিক্ষার ইঙ্গিত আছে। বর্দ্ধমান, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, হুগলী প্রভৃতি জেলার অসংখ্য দেবমন্দিরে ঐ একই প্রকারের বহুমূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। কোঠাসুরে (বীরভূম) একবার এক ভগ্ন মন্দিরগাত্রে স্তূপীকৃত কয়েকখণ্ড ঐ প্রকারের মূর্ত্তি আমার নাড়াচাড়া করিবার সুবিধা হইয়াছিল। দেখিয়াছি উহা অপেক্ষাকৃত আঘাতসহ ইষ্টক ব্যতীত আর কিছুই নয়, ছাঁচে নির্ম্মিত। ঐ সকল মূর্ত্তির ধারা আলোচনা করিলে মনে হয় মন্দির নির্ম্মাতারা বা ভাস্করেরা বংশপরম্পরায় উহা লাভ করিয়া আসিতেছে। কোথাও কোথাও কমবেশীরূপে ব্যবহৃত অন্য প্রকারের মূর্ত্তিও দেখা যায়। বহু শতাব্দী ধরিয়া বহু

বাধাবিঘ্ন সহ্য করিয়া সংস্কৃত প্রাচীন মন্দিরগুলি এখনও যে ভাবে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া আছে তাহা দেখিয়া আশ্চর্য্য হইতে হয়। আধুনিক কালের মন্দির এত দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় না। ইহা বাঙালীর স্থাপত্যের বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দান করে।

তারাপীঠের তারমায়ের মন্দির বেশী দিনের নয়, মন্দিরগাত্রে প্রোথিত প্রস্তর ফলকের অস্পষ্ট লেখাগুলি উহার পরিচয় দান করে যে ১২২৫ সালে নিকটবর্ত্তী কোন স্থানের রাজমিস্ত্রীকর্ত্তৃক উহা নির্ম্মিত হয়। তাহাদের বংশধরগণ এখনও বিদ্যমান। মন্দিরের সম্মুখভাগে শিল্প-কার্য্যের সুন্দর নমুনা আছে। উহা পূর্ব্বোক্ত একই ধারাতে প্রস্তর-ফলকে খোদিত। উক্ত রাজমিস্ত্রীর বংশধরগণ এখন যেরূপ গৃহনির্ম্মাণকৌশল অবগত তাহার স্থান অতি নিম্নে। কিঞ্চিদধিক একশো বছরেই বাঙালীর এই অধঃপতন এই শোচনীয় দুর্দ্দশার কথা চিন্তা করিলে লজ্জায়, ঘৃণায় অন্তর অভিভূত হইয়া আসে। অনেকে বলেন শৈবধর্ম্মের প্রাধান্য বশতঃ পরবর্ত্তী কালে বাঙালী ভাস্করের নিপুণতা কেবল শিবলিঙ্গে ন্যস্ত থাকাও ভাস্কর্য্যের অবনতির একটা কারণ।

এত অল্প সময়ের মধ্যে বাঙালী তাহার শিল্প স্বাধীনতা আনন্দময় জীবনের সকল প্রকার আস্বাদ হইতে বঞ্চিত হইয়াছে। ঊর্দ্ধে অনন্ত নীল আকাশ চারিদিকে কাননকুন্তলা শ্যামা জন্মভূমির মনোরম প্রাকৃতিক শোভা, দিগন্তবিস্তৃত নিবিড় নীল আকাশের কোলে ধূমাচ্ছন্ন অচলের আকুল আহ্বান আজ বাঙালীর শিল্পীমনকে উদ্বোধিত করে না। চারিদিকে অগণিত ধ্বংসাবশিষ্ট, ভগ্ন, শিল্পের শেষ নিদর্শন টুকু দেখিয়াও তাহার সুপ্ত বিভ্রান্ত মন পীড়িত হয় না। তবুও উদয়াচলে রাঙারবি তাহার ক্ষীণ রশ্মিটুকু লইয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছে; চারিদিকে নবজাগরণের সূত্রপাত হইয়াছে তাই দীনা হীনা মলিনা বিগত-শ্রী জননী তাহার আপন সন্তানের আগ্রহদৃষ্টির পানে চাহিয়া আছেন।

যতই এই সকল প্রাচীনশিল্পকলা লইয়া আলোচনা হইবে ততই বাঙালী তাহার গৌরবময় অতীতের শিল্পসম্পদ সম্বন্ধে ক্রমে ক্রমে সুস্পষ্ট ধারণা লাভ করিবে। ফলে বাঙালীর প্রাচীনশিল্প আবার নূতনরূপ পরিগ্রহ করিবে। নানা কারণে মূর্ত্তিগুলির ছবি দিতে পারিলাম না বলিয়া আমার এই আলোচনা কতকটা অসম্পূর্ণ বলিয়া মনে করি। বারান্তরে সেই অভাব পূর্ণ করিবার ইচ্ছা রহিল।

উপদেশামৃত

শ্রীশিবরতন মিত্র

দেশ-কাল-পাত্র ভেদে শুদ্ধ অভিজ্ঞতাপুষ্ট শাসক-সম্প্রদায় প্রবর্ত্তিত বিধির পরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু, যাঁহারা ভগবানের কৃপায় দিব্য-দৃষ্টি লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা মর্ত্ত্য-জীবনের বিভেদ-ব্যবহার অতিক্রম পূর্ব্বক মহোচ্চগ্রামে অবস্থিত রহিয়া যে বিধি-বাণী প্রচারিত করেন, তাহা শাশ্বত ও চিরসত্য। আমরা এই প্রত্যক্ষদর্শী মহাজন কবিবৃন্দের স্বতঃ উচ্ছ্বসিত অমৃতময়ী বাণী শ্রবণ করিয়া ধন্য হই এবং জীবনের গতি নির্দ্দিষ্ট ও নিয়মিত করিয়া পরম উপকৃত হইয়া থাকি। যে দেশে এইরূপ ঋষি আবির্ভূত হন, সে দেশ ধন্য হয় যে ভাষায় তাঁহার অমর-বাণী প্রচারিত হয়, তাহা মহিমান্বিত ও সমুজ্জ্বল হইয়া উঠে।

আমাদের বঙ্গ ভাষায় প্রাচীন মহাজন রচিত যাবতীয় কাব্য ও পদাবলী মধ্যে এইরূপ অসংখ্য উপদেশবাণী ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। সকলের পক্ষে সেই সকল বাণী-রত্ন অনুসন্ধান করিবার অবসর থাকা সম্ভবপর নহে। বর্ত্তমান নিবন্ধে, আমরা সৌষ্ঠাপর্য্যক্রমে মহাজন কবিবৃন্দের রচনাবলী হইতে উপদেশামৃত সমাহরণ করিতে যত্নপর হইব। আমরা ক্রমে দেখিতে পাইব—একই ভাব, একই কথা, বিভিন্ন কবি বিভিন্ন সময়ে কিরূপ বিভিন্ন ভাষায় ব্যবহার করিয়া আমাদের বঙ্গ ভাষা ও সাহিত্যের বিশেষত্ব রক্ষা করিয়া আসিতেছেন এবং আমরা দৈনন্দিন কথাবার্ত্তায় তাঁহাদের শ্রীমুখ-নিঃসৃত অমৃতময়ী বাণী, প্রবাদ বা প্রবচন রূপে ব্যবহার করিয়া আমাদের মনোভাব প্রকাশে কিরূপ উপকৃত হইয়া আসিতেছি।

চণ্ডীদাস

ভগবদ্ভক্ত অদ্বিতীয় প্রেমিক কবি চণ্ডীদাস বীরভূম জেলার অন্তর্গত নান্নুর থানার অধীন নান্নুর গ্রামে খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীর শেষাংশে ব্রাহ্মণকুলে আবির্ভূত হন। ইনি স্থানীয় গ্রাম্য-দেবতা বাশুলী-দেবীর পূজকরূপে নিযুক্ত রহিয়া রাধাকৃষ্ণ-লীলাবিষয়ক বহু সংখ্যক সুমধুর পদাবলী রচনা করিয়া গিয়াছেন। ইঁহার রচনা সম্বন্ধে, বৈষ্ণবকবি কালুদাস যথার্থই গাহিয়াছেন—

উজ্জ্বল কবিত্ব ভাষার লালিত্য ভুবনে নাহিক হেন।
হৃদে ভাব উঠে মুখে ভাষা ছুটে উভয় অধীন যেন॥
সরল তরল রচনা প্রাঞ্জল প্রসাদ গুণেতে ভরা।
যেই পশে কানে সেই লাগে প্রাণে শুনামাত্র আত্মহারা॥

অধিক কি, শ্রীচৈতন্যদেবও, চণ্ডীদাস কবির গীতামৃত আস্বাদন করিয়া পরম আনন্দলাভ করিতেন।

এই স্থলে, চণ্ডীদাস কবির রচনাবলী হইতে উপদেশামৃত সংগৃহীত হইল।

অজ্ঞতা

সর্পের মস্তকে যদি রহে পদ্মমণি।
কীটের স্বভাব দোষে নহে তাহে ধনী॥
গোরচনা জন্মে দেখ গাভীর ভাণ্ডারে।
তাহার যতেক মূল্য জানিতে সে নারে॥

অদূরদর্শিতা

সুধার সমুদ্র সম্মুখে দেখিয়া
আইনু আপন সুখে।
কে জানে খাইলে গরল হইবে
পাইবে এতেক দুখে॥

অনুরাগ

চাহি ছাড়াইতে ছাড়া নহে চিতে
এখন করিব কি।

অন্তর্দাহ

(১)

চণ্ডীদাস ইথে কহে সদাই অন্তর দহে
পাসরিলে না যায় পাসরা।

দেখিতে দেখিতে হরে তনু মন চুরি করে
না চিনি যে কালা কিম্বা গোরা ॥

(২)

আর জ্বালা সইতে নারি কত উঠে তাপ।
বচন নিঃসৃত নহে বুকে খেলে সাপ ॥

(৩)

আমার অন্তর যেমতি করিছে
তেমতি হউক সে।

অন্তরঙ্গ

(১)

বাশুলী আদেশে দ্বিজ চণ্ডীদাস কয়।
পরের লাগিয়ে কি আপন পর হয় ॥

(২)

দ্বিজ চণ্ডীদাসে পুনঃ কয়।
পরের বচনে কি আপন পর হয় ॥

অবলা

বদন থাকিতে না পারি বলিতে
তেঁই সে অবলা নাম ॥

অবিবেচনা

(১)

কহে বড়ু চণ্ডীদাস কি হইবে বল
গোড়া কাটি আগে জল দিয়া ॥

(২)

তাহার চরিতে হেন বুঝি চিতে
হাত বাড়াইল চাঁদে।

অভাগিয়া

অভাগিয়া জনে ভাগ্য নাহি জানে
না পূরয়ে সব সাধ।
খাইতে নাহিক ঘরে সাধ বহু করে
বিহি করে অনুবাদ ॥

অরণ্যে রোদন

পর কি জানয়ে পরের বেদন
সে রত আপন কাজে।
চণ্ডীদাস কহে বনের ভিতর
কভু কি রোদন সাজে ॥

কাটা ঘায়ে নুন

চলিবার তরে দাও উপদেশ
পাথর চাপিয়া পিঠে।
বুকেতে মারিয়া চাকুর ঘা
তাহাতে নুনের ছিটে ॥

দরদী

বিরহ বেদন না জানে আপন
দরদের দরদী নয়।
চণ্ডীদাস ভনে পর দরদের
দরদী হইলে হয় ॥

দান

কি দিব কি দিব বঁধু মনে করি আমি।
যে ধন তোমারে দিব সেই ধন তুমি ॥

দুর্জ্জন

কহে চণ্ডীদাস করহ বিশ্বাস
যে শুনি উত্তম মুখে।
কেবা কোথা ভাল আছয়ে সুন্দরী
দিয়া পর মনে দুঃখে ॥

ধর্ম্মকাহিনী

চোরের মুখেতে ধরম কাহিনী
শুনিয়া পায় যে হাসি ॥

নব অনুরাগ

নবীন পাণির মীন মরণ না জানে।
নব অনুরাগে চিত্ত ধৈরজ না মানে ॥

নিবৃত্তি

সোনা লোহা তামা পিতল কি আছে।
চোরের কি কখন নিবৃত্তি আছে।

নিরপেক্ষতা

যায়ে না মরিয়ে বন্ধু মরি মিছা দায়।
চণ্ডীদাস কহে কার কথায় কিবা যায়॥

পন্থা

আকাশ জুড়িয়া ফাঁদ যাইতে পথ নাই।
কহে বড়ু চণ্ডীদাস মিলিবে হেথাই॥

প্রীতি বা প্রেম (প্রীতি-চর্য্যা)

পিরীতি-পরশে যার হিয়া নাহি দরবয়ে
সে কেন পিরীতি করয়ে সাধ॥

প্রীতি-দার্ঢ্য

(১)

চিত দৃঢ় করি থাকলো সুন্দরী
যেন কভু নাহি টলে।
কাহার কথায় কার কিবা হয়
বড়ু চণ্ডীদাস বলে॥

(২)

চণ্ডীদাস কহ ধৈর্য্য ধরি রহ
কে কিবা করিবে কার॥

প্রীতি-নির্দ্দেশ

দুই মন এক করিতে পারিলে
তবে সে পিরীতি হয়॥

প্রীতি পরীক্ষা

চণ্ডীদাস বলে শুন আমার যুকতি।
অধিক জ্বালা যার তার অধিক পিরীতি॥

প্রীতি-রস

চণ্ডীদাস কয় শুনলো সুন্দরী
পিরীতি রসের সার।
পিরীতি রসের রসিক নহিলে
কি ছার পরাণ তার॥

প্রীতি-রীতি

চিতের অনল কত চিতে নিবারিব।
না যায় কঠিন প্রাণ কারে কি বলিব॥
চণ্ডীদাস বলে প্রেম কুটিলতা রীত।
কুলধর্ম্ম লোকধর্ম্ম নাহি মানে চিত॥

(২)

চণ্ডীদাস বলে প্রেম কুটীলতা রীত।
কুলধর্ম্ম লোক লজ্জা নাহি মানে চিত॥

প্রীতি-লাভ

(১)

পিরীতি লাগিয়া পরাণ ছাড়িলে
পিরীতি মিলয়ে তারে।

(২)

সদা জ্বালা যার তবে সে তাহার
মিলয়ে পিরীতি ধন॥

প্রীতি-সংস্থান

নিশিদিন বন্ধু তোমায় পাসরিতে নারি।
চণ্ডীদাস কহে হিয়ায় রাখ স্থির করি॥

প্রীতি স্বরূপ

(১)

পিরীতি পিরীতি সব জন কহে
পিরীতি কেমন রীত।
রসের স্বরূপ পিরীতি মূরতি
কেবা করে পরতীত॥

(২)

পিরীতি বলিয়া এ-তিন আখর
ভুবনে আনিল কে।
মধুর বলিয়া ছানিয়া খাইনু
তিতায় তিতিল দে'॥

(৩)

পিরীতি সুখের সায়র দেখিয়া
নাহিতে নামিলাম তায়।
নাহিয়া উঠিয়া ফিরিয়া চাহিতে
লাগিল দুঃখের বায়॥

(৪)

বড়ু চণ্ডীদাসে কয় প্রেম কি অনল হয়
শুধুই সে সুধাময় লাগে।
ছাড়িলে না ছাড়ে সেহ এমতি দারুণ লেহ
সদাই হিয়ার মাঝে জাগে॥

(৫)

পরাণ ছাড়িলে পিরীতি না ছাড়ে
পিরীতি গড়ল কে॥

প্রীতি-স্বাতন্ত্র্য

নিষেধিলে নাহি মানে ধরম বিচার।
বুঝিনু পিরীতি হয় স্বাতন্ত্র্য আচার॥

প্রীতি-সূত্র—দুর্জ্জন প্রীতি

সুজনের সনে আনের পিরীতি
কহিতে পরাণ ফাটে।
জিহ্বার সহিত দন্তের পিরীতি
সময় পাইলে কাটে॥

প্রীতিসূত্র—সুজন প্রীতি

১

শুন গো সজনি আমার বাত।
পিরীতি করবি সুজন সাথ॥
সুজন পিরীতি পাষাণ-রেখ।
পরিণামে কভু না যায় টোট।
ঘষিতে ঘষিতে চন্দন সার।
দ্বিগুণ সৌরভ উঠয়ে তার॥
চণ্ডীদাস কহে পিরীতি-রীতি।
বুঝিয়া সজনি করহ প্রীতি॥

২

চণ্ডিদাস কয় সুজন যে হয়
এমনি না করে সে।
তাহার পিরীতি পাষানে লেখতি
মুছিলেও নাহি ঘুচে॥

৩—কানু-প্রীতি

(ক)

কানুর পিরীতি বলিতে বলিতে
পাঁজর কাটিয়া উঠে।
শঙ্খবণিকের করাত যেমতি
আসিতে যাইতে কাটে॥

(খ)

কানুর পিরীতি চন্দনের রীতি
ঘষিতে সৌরভময়।
ঘসিয়া আনিয়া হিয়ায় লইতে
দহন দ্বিগুণ হয়॥

(গ)

সুখের লাগিয়া পিরীতি করিনু
শ্যামবঁধুয়ার সনে।
পরিণামে এত দুখ হবে বলে
কোন অভাগিনী জানে।

(ঘ)

চণ্ডীদাস কহে শুন বিনোদিনী
মনে না ভাবিহ আন।
তুমি সে শ্যামের সরবস ধন
শ্যাম সে তোমার প্রাণ॥

(ঙ)

চণ্ডীদাস কহে কানুর পিরীতি
জাতি কুল শীল ছাড়া

(চ)

চণ্ডীদাস ইথে কহে সদাই অন্তর দহে
পাসরিলে না যায় পাসরা।
দেখিতে দেখিতে হরে তনু মন চুরি করে
না চিনি যে কালা কিম্বা গোরা॥

(ছ)

না বল না বল সই, সে কানুর গুণ।
হাতের কালি গালে দিলাম মাখিলাম চুণ॥

(জ)

চণ্ডীদাস কহে কানুর পিরীতি
যেন-দরিদ্রের হেম।

৪। শ্যাম-প্রীতি

যেন মলয়জ ঘসিতে শীতল
অধিক সৌরভ হয়।
শ্যাম বঁধুয়ার পিরীতি ঐছন
দ্বিজ চণ্ডীদাস কয়॥

প্রীতি-সাধন

পিরীতি পিরীতি সবজনে কহে
পিরীতি সাধন কথা।
বিরিখের ফল নহে ত পিরীতি
নাহি মিলে যথা তথা॥
পিরীতি অন্তরে পিরীতি মন্তরে
পিরীতি সাধন যে।
পিরীতি রতন লভিল যে জন
বড় ভাগ্যবান সে॥
পিরীতি লাগিয়া আপনা ভুলিয়া
পরেতে মিশিতে পারে।
পরকে আপন করিতে পারিলে
পিরীতি মিলয়ে তারে॥
পিরীতি সাধন বড়ই কঠিন
কহে দ্বিজ চণ্ডীদাস।
দুই ঘুচাইয়া এক অঙ্গ হও
থাকিলে পিরীতি আশ॥

প্রেমের তন্ময়তা

রাতি কৈনু দিবস, দিবস কৈনু রাতি।
বুঝিতে নারিনু বঁধু তোমার পিরীতি॥
ঘর কৈনু বাহির, বাহির কৈনু ঘর।
পর কৈনু আপন, আপন কৈনু পর॥

প্রেমের পরাকাষ্ঠা

ভানু কমলে বলে, সেহ হেন নহে।
হিমে কমল মরে, ভানু সুখে রহে॥
চাতক জলদ কহি সে নহে তুলনা।
সময় নহিলে সে না দেয় এক কণা।
কুসুম মধুপ কহি সেহ নহে তুল।
না আইলে ভ্রমর আপনি না যায় ফুল॥
কি ছার চকোর চাঁদ দুহু সম নহে।
ত্রিভুবনে হেন নাহি চণ্ডিদাস কহে।

বিধি-বিপর্য্যয়

(১)

চণ্ডীদাস কয় প্রেম হয় সুধাময়।
কপালক্রমে অমৃতেতে বিষ উপজয়॥

(২)

সুখের লাগিয়া এ ঘর বান্ধিনু
অনলে পুড়িয়া গেল।
অমিয়া সায়রে সিনান করিতে
সকলি গরল ভেল॥
সখি! কি মোর কপালে লেখি।
শীতল বলিয়া চাঁদ সেবিনু
ভানুর কিরণ দেখি!
উচল বলিয়া অচলে চড়িনু
পড়িনু অগাধ জলে।
লছমী চাহিতে দারিদ্র্য বেড়ল
মাণিক হারানু হেলে॥
নগর বসালাম সাগর বান্ধিলাম
মাণিক পাবার আশে।
সাগর শুখাল মাণিক লুকাল
অভাগী করম দোষে॥
পিয়াস লাগিয়া জলদ সেবিনু
বজর পড়িয়া গেল।
কহে চণ্ডীদাস শ্যামের পিরীতি
মরমে রহল শেল॥

৩

নীর লোভে মৃগী পিয়াসে ধাইতে
ব্যাধ শর দিল বুকে
জলের সফরী আহার করিতে
বড়শী লাগিল মুখে॥

নবঘন হেরি পিয়াসে চাতকী
চঞ্চু পসারল আশে।
বারিক কারণ বহল পবন
কুলিশ মিলল শেষে॥
লাখ হেম গাড়া যতনে বান্ধিতে
পড়ল অগাধ জলে।
হেন অনুচিত করে পাপবিধি
দ্বিজ চণ্ডীদাস বলে॥

বিরহ

১

চলে নীল শাড়ী নিঙাড়ি নিঙাড়ি
পরাণ সহিত মোর

২

চিতের অনল কত চিতে নিবারিব।
না যায় কঠিন প্রাণ কারে কি বলিব॥

বিরহ-ভোগ

১

বিধি যদি শুনিত মরণ হইত
ঘুচিত সকল দুখ।
চণ্ডীদসে কয় এমতি হইলে
পিরীতির কিবা সুখ॥

২

তোমরা চলিয়া যাও আপনার ঘরে।
মরিব অনলে আমি যমুনার তীরে॥
চণ্ডীদাস বলে কেন কহ হেন কথা।
শরীর ছাড়িলে প্রীতি রহিবেক কোথা।

বিরহ-শান্তি

অমিয়া আনিয়া পানা দুধে মিশাইয়া।
লাগিল গরল যেন মিঠ তেয়াগিয়া॥
তিতায় তিতিল দেহ মিঠ হবে কেন।
জলন্ত অনলে মোর পুড়িছে পরাণ॥
বাহিরে অনল জলে দেখে সর্ব্ব লোকে।
অন্তর জলিয়া উঠে তাপ লাগে বুকে॥
পাপ দেহের তাপ মোর ঘুচিবেক কিসে।
কানুর পরশে যাবে কহে চণ্ডীদাসে॥

বিরহ-শান্তি

১

হিয়ার ভিতরে পাঁজর কাটিয়ে
বিঁধিল বাণ যে মার॥

২

সখি! কেমনে জীব গো আর।
বুকে খেয়েছি শ্যামের শেল
পিঠে হৈল পার॥

বিষকুম্ভ পয়োমুখ

১

সোণার গাগরি যেন বিষে ভরি
দুধেতে পুরিয়া মুখ।
বিচার করিয়া যেজন না খায়
পরিণামে পায় দুখ॥

২

সোণার গাগরি বিষ জলে ভরি
কেবা আনি দিল আগে
করিনু আহার না করি বিচার
এ বধ কাহার লাগে॥

ভাগ্য শেষ

তোমারে ভাবিয়া নায়ে কড়ি দিয়া
ডুবে কি হইব পার॥

ভিক্ষা

চণ্ডীদাস কহে যদি দান নহে
কি আনি মাগিব তায়।
যে ধন মাগয়ে তাহা না পাইয়ে
অপযশ নাহি যায়॥

ভুক্তভোগী

তাপিত হইলে তাপ সে জানয়ে
তাপ হয় যে কত

মিলন

দ্বিজ চণ্ডীদাস কহে না কর ভাবনা।
সুজনে সুজন মিলে কুজনে কুজনা ॥

রস-গ্রাহিতা

১

রসিক রসিক সবাই কহয়ে
রসিক কেহত নয়।
ভাবিয়া শুনিয়া বুঝিয়া দেখিলে
কোটিকে গোটিক হয়

২

অভাগিয়া কাকে স্বাদ নাহি জানে
মজয়ে নিম্বের ফলে।
রসিকা কোকিলা জ্ঞানের প্রভাবে
মজয়ে চুত মুকুলে ॥

৩

রসজ্ঞ যে জন সে করয়ে পান
বিষ ছাড়ি অমৃতেরে ॥

* *

হংস চক্রবাক ছাড়িয়া উদক
মৃণাল দুগ্ধ সদা খায়।
তেমনি নহিলে কোথা প্রেম মিলে
দ্বিজ চণ্ডীদাসে কয় ॥

রসাস্বাদ

মনের মরম জানিবে কে।
সেই সে জানে মনের মরম
এ রসে মজিল যে ॥
চোরের মা যেন পোয়ের লাগিয়া
ফুকারি কান্দিতে নারে।

রূপ

চণ্ডীদাস কয় ভুবনে না হয়
এমন রূপ যে আর।
যেজন দেখিল সেজন ভুলিল
কি তার কুল-বিচার

লজ্জা

চারি দিকে চায় নাগর আঁচলে মুখ মুছে।
চণ্ডীদাস কহে লাজ না ধুইলে ঘুচে ॥

শ্যাম-নাম

সখি কেবা শুনাইল শ্যাম-নাম।
কাণের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো
আকুল করিল মোর প্রাণ।
না জানি কতেক মধু শ্যাম নামে আছে গো
বদন ছাড়িতে নাহি পারে।
জপিতে জপিতে নাম অবশ করিল গো
কেমনে পাইব সই তারে ॥
নাম পরতাপে যার ঐছন করিল গো
অঙ্গের পরশে কিবা হয়।

* * *

পাসরিতে করি মনে পাসরা না যায় গো
কি করিব কি হবে উপায়

শ্যামের বাঁশী

১

শ্যামের বাঁশীটি দুপুরে ডাকাতি
সরবস হরি লৈল।

২

যে ঝাড়ের তরল বাঁশী তারি লাগি পাও
ডালে মূলে উপাড়িয়া সাগরে ভাসাও ॥

সমবেদনা

বিরহ বেদন না জানে আপন
দরদের দরদী নয়।
চণ্ডীদাস ভণে পর দরদের
দরদী হইলে হয় ॥

সমাধি বা শেষ

চণ্ডীদসে কয় ব্যাধি সমাধি নয়
দেখিয়া হইনু ভোর।

সঙ্গ-দোষ

মুরলী সরল হয়ে বাঁকার মুখেতে রয়
শিখিয়াছে বাঁকার স্বভাব।
দ্বিজ চণ্ডীদাসে কয় সঙ্গ দোষে কি না হয়
রাহু মুখে শশী মসী লাভ॥

সুখ দুঃখ

১

সই, জানি কু-দিন সুদিন ভেল।
মাধব মন্দিরে তুরিতে আওব
কপাল কহিয়া গেল॥

২

কহে চণ্ডীদাস শুন বিনোদিনী
সুখ দুখ দুটি ভাই।
সুখের লাগিয়া যে করে পিরীতি
দুখ যায় তার ঠাঁই॥

সুজন

গড়ন ভাঙ্গিতে সই, আছে কত জন।
ভাঙ্গিয়া গড়িতে পারে সে বড় সুজন॥

২

গড়ন ভাঙ্গিতে সই আছে কত খল।
ভাঙ্গিয়া গড়িতে পারে সে বড় বিরল॥

স্বভাব

কহে চণ্ডীদাস আপন স্বভাব
ছাড়িতে না পারে চোরা॥

হটকারিতা

না বুঝিয়ে করে কাজ তার মুণ্ডে পড়ে বাজ
দুঃখ রহে জনম অবধি॥

হাসি

চণ্ডীদাস কহে হাসির কাছে।
আর কি জগতে অমৃত আছে॥

মহাকবি গেটে

শ্রী অবনীনাথ রায়

একটা ছোট তক্তপোষের এক কোনে টিনের একটা বাক্স ছিল—বাবাকে লুকিয়ে ছোটবেলায় যে বইগুলি ঐ টিনের বাক্সের ভিতর থেকে নিয়ে পড়তুম তাদের নাম আজো মনে পড়ে। সেগুলি হচ্চে ভবানী ঠাকুর, পাঁচ কড়ি দের নীলবসনা সুন্দরী, হত্যাকারী কে, গোবিন্দলাল, আর ফাউষ্টের বাংলা তরজমা। শেষের বইখানিতে শয়তানের রোমাঞ্চকর কীর্ত্তিকাহিনী পড়ে' সেই বয়সে মনে যে একটা অসম্ভূপুলক সঞ্চার হত সেটা এখনো অনুভব করতে পারি।

তখন জানতুম না যে ফাউষ্টের রচয়িতা কে। পরবর্ত্তী জীবনে সেটা জেনেছি। আরো সম্প্রতি সেই মহাকবির কথা স্মরণ করার একটা কারণ ঘটলো। তাঁর মৃত্যুর পর একশত বৎসর অতিক্রান্ত হয়েচে। সেই উপলক্ষ্য করে' দেশে বিদেশে তাঁর স্মৃতিপূজা হ'ল। এর থেকে একটা সত্য বিশেষ ক'রে আমাদের মনে জাগে—সেটা হচ্চে এই যে যাঁরা স্রষ্টা যাঁরা ঋষি অতএব দ্রষ্টা তাঁরা মৃত্যুর পরও বেঁচে থাকেন। আর তাঁদের সার্ব্বভৌমিক চিন্তাধারা দেশ কালকে অতিক্রম ক'রে মানুষের জীবন প্রভাবিত করে।

জোহান উলফ্‌গাঙ্ গ্যয়টে Johann Wolfgang Goethe) ১৭৪৯ খৃষ্টাব্দের ২৮শে আগষ্ট তারিখে জার্ম্মাণীর ফ্রাঙ্কফোর্ট সহরে (Frankfort-on-the Main) জন্মগ্রহণ করেন। আর ১৮৩২ খৃষ্টাব্দের ২২শে মার্চ্চ তারিখে উইমার (Weimar) সহরে তিনি দেহ

ত্যাগ করেন। অতএব দেখা যাচ্ছে যে মরবার সময় তাঁর বয়স ৮৩ বৎসর হয়েছিল এবং এই ১৯৩২ সালের ২২শে মার্চ্চ তারিখে তাঁর মৃত্যুর পর একশত বৎসর অতীত হ'য়ে গেছে।

কিন্তু একশত বৎসর পরেও লোকে তাঁকে ভুল্‌তে পারে নি কেন এ খবর জান্‌বার ইচ্ছা স্বাভাবিক। এর একমাত্র কারণ এইটুকু বলা যেতে পারে যে মহাকবি গেটে কেবলমাত্র কবি এবং সাহিত্যিক ছিলেন না, তিনি ছিলেন সমগ্র প্রতীচ্যদেশের অন্তরাত্মা, সমস্ত প্রতীচ্য ভূখণ্ড তাঁর মধ্যে ভাষা পেয়েছিল, প্রতীচ্য ভূলক্ষ্মীর বাণী তিনি মানব সমাজে প্রকাশ করেছিলেন। এ রকম যুগপ্রকাশক বেশী জন্মগ্রহণ করে না। গেটের সঙ্গে এক নিঃশ্বাসে নাম কর যায় এমন লোক বেশি নেই—সেক্‌স্‌পীয়র, ভিক্টর হিউগো, দান্তে এই রকম কয়েক জনের নামই মনে পড়চে।

গেটের মৃত্যু সম্বন্ধে একটা কথা কিছুতেই ভুল্‌তে পারা যায় না। সেটা হচ্চে তাঁর উইমার সহরটীর প্রতি একটা নিবিড় অনুরক্তি। এখানে তিনি ৩০ বছর বয়সে বাস করতে এসেছিলেন—আর ৮৩ বৎসর বয়সে মৃত্যু হ'লে তবে ঐ সহরটির সঙ্গে তাঁর ছাড়াছাড়ি হয়। এই সহরটি গেটের স্মৃতিতে বোঝাই। এমনকি যে ঘরে তিনি দেহত্যাগ করেন সে ঘরখানি সেদিন যেমন সাজান ছিল আজো তেমনি আছে। যে আরাম কেদারায় বসে থাকা অবস্থায় তাঁর প্রাণ দেহ ছেড়ে বেরিয়েছিল সে চেয়ারখানি আজো রক্ষিত আছে। মরার তিন দিন আগে থাক্‌তে এই চেয়ার খানির উপর তিনি বসে কাটিয়েছিলেন। তাঁর রোগের যন্ত্রণা এত অসহ্য হয়েছিল যে তিনি বিছানায় শুতে পারেন নি।

গেটে যখন লিখতে সুরু করেন তখন অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগ এবং যখন লেখা শেষ করেন তখন উনবিংশ শতাব্দীর প্রায় মাঝামাঝি। তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ ফাউষ্ট সুরু হয় ১৭৭৩ খৃষ্টাব্দে এবং তার দ্বিতীয় ভাগ শেষ হয় ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে অর্থাৎ মরার মাস সাতেক আগে। তাঁর রচনায় অষ্টাদশ শতাব্দীর ক্লাসিসিজ্‌ম্ ও নেই, উনবিংশ শতাব্দীর রোমাণ্টিসিজ্‌ম্ ও নেই, অপর পক্ষে দু'য়ের মিলন আছে। তাঁর প্রতিভা কোন বাঁধাধরা নিয়মের আনুগত্য করতে চায় নি। কেননা তিনি যে কেবলি সাহিত্য পড়েছিলেন তা' নয়, তিনি বিজ্ঞানেরও চর্চ্চা করেছিলেন যথেষ্ট। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে তিনি বহু নূতন তত্ত্ব আবিষ্কার ক'রে অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় দেন। একাধারে গীতি কবি এবং বৈজ্ঞানিক, এমন সমন্বয় বেশি দেখা যায় না। তাই মনস্বী এমার্সন বলেছিলেন যে গেটে হচ্চেন উনবিংশ শতকের জনগণের দার্শনিক,—শতবাহু, সহস্রলোচন। ১৮০৮ খ্রীষ্টাব্দে বিশ্বজয়ী সম্রাট নেপোলিয়নের সঙ্গে গেটের সাক্ষাৎ হয়। নেপোলিয়ন বলেছিলেন যে গেটে হচ্চেন একজন পূর্ণ মানুষ। তাঁর প্রতিভা ছিল সর্ব্বোতোমুখী। তিনি ধর্ম্ম, সমাজ, সাহিত্য, বিজ্ঞান, অর্থনীতি, শাকুনতত্ত্ব প্রভৃতি সমস্ত বিষয়ে চর্চ্চা করেছিলেন। অথচ এই সমস্ত পরস্পর বিরোধী বিষয়গুলি তাঁর মস্তিষ্কে একসঙ্গে মিশে তাল গোল পাকিয়ে যায় নি। তাল গোল পাকিয়ে অনেকে পাগল হ'য়ে গেছেন এরও প্রমাণ আছে, যেমন ফরাসী লেখক জেরার্ড দ্য নের্ভাল, গেটেরই স্বদেশীয় নীট্‌শে। এই কারণে গেটের প্রতিভার অসাধারনত্ব দেখে অনেকে বিস্ময় অনুভব করেন। গেটে বাস্তবিকই বিরাট সংস্কৃতির একটা ধারা রেখে গেছেন—সমালোচকেরা তাঁর শিক্ষাকে বলেন creed of culture বা কালচারের দৃঢ় ভিত্তিতে বিশ্বসিত নীতি। তিনি একাধারে গ্রীক ও লাতিন সভ্যতা ও কৃষ্টির উত্তরাধিকারী, আবার বিশ্বদেববাদী জার্ম্মাণ ঐতিহ্যেরও উত্তরাধিকারী ছিলেন। আমরা আধুনিক কালে মানুষ ঐ কালচারেরই উত্তরাধিকারী হয়েছি।

তাঁর সমস্ত নাটক, উপন্যাস, কবিতার বইএর নাম করা অসম্ভব, ফাউষ্ট ব্যতীত এগমণ্ট, ট্যাসো, ইফিজেনীয়া উইল্‌হেলম্ মেইষ্টার প্রভৃতি বহু প্রসিদ্ধ গ্রন্থের তিনি জনক। শুধু এইটুকু বল্লেই যথেষ্ট হবে যে তাঁর সমস্ত রচনা প্রকাশিত হয়েচে ১৪২ ভলুমে। আর এ ছাড়া তাঁর জীবনচরিত, ডায়েরী, পত্রাবলী, কথাবার্ত্তা প্রভৃতিও আছে।

বলা বাহুল্য গেটের চারিপাশে তৎকালে একটি সাহিত্যিক গোষ্ঠী গঠিত হয়ে উঠেছিল এঁদের মধ্যে তরুণ কবি শিলারের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এঁরা দু'জনে বিশেষ বন্ধু ছিলেন এবং পরস্পরের প্রভাবে বহু সুন্দর সুন্দর

গাথা রচনা করে গেছেন। মৃত্যুরপরেও এঁদের ছাড়াছাড়ি হয় নি। গেটে এবং শিলার উইমারের ডিউকদের গোরস্থানে পাশাপাশি শায়িত আছেন।

গেটের লেখার মধ্যে থেকে একটা সত্য ধরা পড়ে, তিনি যেন কখনই বর্ত্তমানকে একমাত্র বলে গণ্য করেন নি, কারবার করেছেন সুবৃহৎ অনাগত ভবিষ্যতের সঙ্গে। তাই তাঁর লেখা চিরন্তন হ'তে পেরেচে। নীট্‌শের বহু আগে গেটে বলেছিলেন যে খৃষ্টের প্রদর্শিত যে পথ অর্থাৎ যে পথে কেবলমাত্র দুঃখভোগ, অবমাননা আর নীতি স্বীকারই হচ্চে একমাত্র করণীয়, সে পথ মানুষের পক্ষে প্রশস্ত নয়। তিনি চেয়েছিলেন সুন্দর বিজয়ী জীবনের প্রতি শ্রদ্ধা। কিন্তু শেষ নাগাদ তিনি জীবনে এবং লেখায় ঐ ত্যাগেরই মাহাত্ম্য প্রচার করে গেছেন। মৃত্যুর অল্প আগেই তিনি "আরো আলো, আরো আলো" বলে চিৎকার করেছিলেন। এ উপনিষদের বাণী "তমসো মা জ্যোতির্গময়" এর প্রতিধ্বনি। উপনিষদের এ বাণী গেটের জীবনে ব্যর্থ হয় নি।

অগ্নিশিখা

শ্রী কাত্যায়নী দেবী

(১৩)

অলকার মন মেঘ মুক্ত সূর্য্যের মত আনন্দে ঝল্‌মল্ করছে, সে নিজে হাতে মায়ের পূজার যোগড় করতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। মঙ্গলাকে আগে চিঠি লিখতে বসল—

"আদরের বোনটি, তোমরা চলে যাবার পর বাড়ীটা আমার বড়ই খালি হয়ে গেছে। তবু তোমায় ধরে রেখে ভাই কে কষ্ট দেবার পাপ আর সঞ্চয় করতে ভরসা হয়নি, কিন্তু এখন তো শীঘ্র করে আসতে হচ্ছে,এবার ৺মার পূজার ভার পড়েছে মায়ের এই অযোগ্য সন্তানের উপর, আর সে ভার দিয়েছেন আমায় মহাদেব স্বয়ং, কাজেই অমান্য করবার সাধ্য নেই। আমরা একঘরে, কেন না সমাজ থেকে ধোপা নাপিত বন্ধ। কষ্ট কিছু হচ্ছে না, তবে অসুবিধা একটু হচ্ছে; ঝি, চাকর, ঠাকুর সবই পেয়েছি। পুরাণ লোক সব সমাজের ভয়ে মমতা ছাড়তে পারে নি। যেমন তোমার ঠাকুই জামাই, কত বল্লাম, কেন ধোপা নাপিত বন্ধ হয়ে থাকবে, না হয় ভায়ের বাড়ী পাঠিয়ে দাও, তা কোন আরজিই মঞ্জুর হল না। সমাজের সঙ্গে ঝগড়া করেই থাকতে হবে। সব তো রেগে আগুণ! এখন মায়ের কি ইচ্ছা মা দুর্গাই জানেন। তিনি এবার এই তাঁর এক ঘরে সন্তানের ঘরে আসন পাতেন কিনা তাই একবার দেখব। এবার পূজারী হবে আমার ভাইটী, উপযুক্ত দর্শনী মিলবে, আর নিমন্ত্রিত হবে দরিদ্র-নারায়ণ; যাদের কাছে প্রতি অন্নকণা নারায়ণ, তাদের মুখেই আমার হাতের ভোগ মায়ের প্রসাদী হয়ে উঠবে। তোমরা তো আসবেই আর যদি মেয়ের বিয়ে দিতে ভয় হয়, তবে আমার গোপাল আছে; কাজেই নির্ভয়ে চলে আসবে,বোধনের দুদিন বাকী, এর মধ্যে এসে পড়বে; রঘুসিং গাড়ী নিয়ে বসে থাকবে। প্রাণের আদর নাও, ইতি।

"তোমার দিদি না বেয়ান ?"

পল্লীগ্রামে কথা ছড়াতে দেরী হয় না, সেই দিনই ঘাটে, মাঠে, বাটে সর্ব্বত্র ছড়িয়ে পড়ল যে অরবিন্দ তার গৃহত্যাগী স্ত্রীকে পরিত্যাগ করবে না, এমন কি প্রায়শ্চিত্তও সে করবে না। বাড়ীর মেয়েরা সকলে মিলে অলকার নানা দোষ গুণের আলোচনা করে', পুরুষরা ধর্ম্ম নাশের আশঙ্কায় গলা-বাজি করে' সারা পাড়া গরম করে তুলে।—

সেদিন বোধনের ভোর, শরতের আকাশ অল্প মেঘাচ্ছন্ন, একটু একটু বৃষ্টির ফোঁটা পড়ছে; অরবিন্দর গেটের পাশের শিউলি গাছ দুটোয় অজস্র ফুল ফুটতে আরম্ভ করে' সারা পথ ফুলে ফুলে ঢেকে ফেলেছে, যেন তাদের শুভ্র কোমল পথ দিয়ে শারদ-লক্ষ্মীকে বরণ করে নিচ্ছে। ভোরের

আলোর সঙ্গে সঙ্গে আগমনীর বাঁশী বেজে উঠল, পথে বৈষ্ণব ভিখারী খঞ্জনী বাজিয়ে গেয়ে গেল—

"যাও যাও গিরি আনিতে গৌরী
উমা আমার বড়ই কেঁদেছে,—"

আধা ঘুম-ঘোরে অনেক মায়ের প্রাণে এই করুণ সুর করুণতর হ'য়ে বাজতে লাগল; যার সাধ্যে কুলিয়েছে এই সময় মেয়ে বাড়ী এনেছে, কত দীন দুঃখী শুধু হাতে মেয়ে আনতে গিয়ে ফিরে এসেছে; তাদের কত 'উমা' ঘরে ঘরে আজ মা বাপের কোলের জন্ম চোখের জল ফেলছে; তাদের মায়ের প্রাণে আজ বাঁশীর সুর করুণ কান্নার মত বাজছে।

সারা গ্রাম আনন্দের হাসি নিয়ে জেগে উঠল। পূজা বাড়ীতে বাজনা বাজছে।

ক্ষীণ মেঘ রৌদ্র স্পর্শে পালিয়ে গেছে, সোণার আলো শিশির ভেজা ঘাসে গাছের পাতার আগায় চক চক্ করে উঠল। অরবিন্দ অলকাকে ডেকে বল্লে, "দেখ, মেঘ দেখে মনটা আমার কেমন ভার হ'য়ে গিয়েছিল, এখন এই প্রসন্ন হাসি দেখে প্রাণটা আমার আনন্দে ভরে উঠছে, মনে হচ্ছে আমাদের জীবনের পথে যে ঝঞ্ঝাট এসেছে, তাও এই ক্ষণিকের মেঘের মত, প্রেমের তেজে দূরে চলে যাবে, নয় কি?"

অলকা স্বামীকে প্রণাম করে বল্লে, "তাই যেন চলে যায়, আর যেন দুঃখ পেতে না হয়, এই আশীর্ব্বাদ কর।"

একটু বেলা হ'তেই দলে দলে গরীব চাষা-ভূষারা এসে হাজির হ'তে লাগল, "বাবু, কি করতে হবে"।

অরবিন্দ দেখ্‌লে বাগ্দীপাড়া, দুলেপাড়া, নিকিরিপাড়া থেকে সব অনেক লোক এসেছে, পরাণ এসেছে এদের নিয়ে কাজ করতে; অরবিন্দ তাদের চারিদিকে কাজে লাগিয়ে দিল, কতক গেল আটচালা বাঁধতে, কতক লাগল মাঠ সাফ করতে, কতক লাগল বাড়ীর চারপাশ পরিষ্কার করতে। অরবিন্দ জিজ্ঞাসা করল, "হ্যারে পরাণ, কে তোদের কাজে পাঠাল রে?"

"আজ্ঞে কর্ত্তা, মায়ের পূজা তা আর পাঠাবে কে? যেই শুনলাম গাঁয়ের ঠাকুররা তোমাকে একঘরে করেছে, অমনি বল্লু, তবে আর কি, দা'ঠাকুর তো তাহ'লে আমাদের রে, তাই শুনে সবাই এল; ঠাকুর, তুমি কিছু ভাববেন না, আমরা সব ঠিক করে নেব, আমায় গাঁয়ের বার করে দিয়েছে বলে বড় দুঃখ হয়েছিল; ঠাকুর, তারপর দেখলাম ভালই করেছে, না হ'লে আমার মেয়ে ভেসে যেত, মায়ের কোল তো কেউ কেড়ে নেবে না। কর্ত্তা, আমরা পূজোয় আসব।" অরবিন্দ বুঝল পরেশদের দল সকলকে ডেকে আনবে।

মঙ্গলা বিষ্ণু এল। পরেশ তো আছেই, আরো দুচার জন করে বাড়ীতে হৈচৈ লেগে গেল। ষষ্ঠীর দিন থেকে সকলে দলে দলে পূজো বাড়ীতে ভিড় করতে লাগল। পরেশের মা এতদিন আসতে সাহস করেন নি, শেষটায় পরেশের তর্কে অনেকটা বুঝে তিনি এসে দাঁড়ালেন, "কি গো বৌমা, বলি যোগাড় কতদূর হ'ল?" অলকা তাড়াতাড়ি এসে পায়ের ধুলা নিয়ে বল্লে, "এই যে মাসীমা এসেছেন, বাঁচলাম, আমি ভেবেই পাচ্ছিলাম না একা কি করব, তাই সকাল থেকে মনে হচ্ছিল এবার বুঝি মা দুর্গা আমায় লজ্জায় ফেল্লেন, তা আপনি যখন এসেছেন, তখন সে ভয় আমার গেল।"

"তোমার বাড়ীর কাজ, একি পরের কাজ গা যে না এসে পারব, তবে নেহাৎ পেরে উঠি না এই যা—"

"তা মাসীমা, আর কি কেউ এবার আমাদের বাড়ী আসবেন না? জেঠিমা, খুড়িমা তাঁরা কি কেউ আসবেন না?" "না না আসবে না কেন? সবাই আসবে, তোমরা এত বড় বড় পণ্ডিত সব এনেছ কলকাতা থেকে, এত আয়োজন করেছ, গ্রামের সবাই আসবে; তবে কিনা একটু চক্ষুলজ্জা আছে তো, এত গর্জ্জন করল সব—"

"তবে কি মাসীমা বাড়ী বাড়ী নিমন্ত্রণ করবার জন্যে লোক পাঠাবে?"

"হ্যাঁ বাছা, তোমাদের কাজ তোমরা করে যাবে না কেন? তাতে যার রুচি সে আসবে না আসবে, তাতে আর কি করা—"

অরবিন্দ যথারীতি সকলকে নিমন্ত্রণ পাঠাল, বাড়ীর গাড়ীও মেয়েদের আনতে সকলের বাড়ীই গেল।

অষ্টমী, নবমী, দশমী তিন দিন সারা গ্রামের নিমন্ত্রণ, মস্ত বড় বড় আটচালায় রান্নার আয়োজন, কলকাতা থেকে

পঁচিশ জন বামুন এসেছে রাঁধতে ও মিষ্টি করতে, বড় বড় ভিয়ান বসেছে।

অন্য গ্রামের সব কামার, কুমোর, কলু, মালি, বাগ্‌দি সব দলে দলে এসেছে ঠাকুর দেখতে আর প্রসাদ নিতে, প্রকাণ্ড সামিয়ানার নীচে তারা বসে গেছে।

একদিকে জগৎজননী মা দুর্গা তাঁর অভয় কোল পেতে বসে আছেন, অন্যদিকে পাড়ার মাতব্বর ব্রাহ্মণ পণ্ডিতরা নিষ্ফল আক্রোশে রাগ করে গর্জ্জন করে শেষটায় চুপ করে গেছেন। তাঁদের বাড়ীর কোন মেয়েরাই আসতে সাহস করেনি। দু'চার ঘর থেকে যে সব মেয়েরা এসেছেন, তাঁরা শুধু কৌতূহলের বশবর্ত্তী হয়ে। মেয়েরা ও পুরুষরা যাঁরা দেখতে এসেছিলেন, তাঁরা ঠিক করেছিলেন কোন প্রসাদ গ্রহণ করবেন না।

নবমীর দিন ব্রাহ্মণমণ্ডলীর আহারের বিশেষ বন্দোবস্ত হয়েছিল; একটা পরিষ্কার প্রাঙ্গণ নিকিয়ে ঝকঝকে করা, তার ভিতর এক এক সারি করে পাঁচশত ব্রাহ্মণ কায়স্থের বসবার স্থান করা হয়েছে; অন্য অন্য সামিয়ানার তলে সর্ব্বদাই আহারের ব্যবস্থা রয়েছে—যত লোক আসছে খেতে পাচ্ছে। ছেলেদের কোলাহলে, বাদ্যের শব্দে, ধূপ ধূনা চন্দনে নির্ম্মাল্যে চারিদিক একটা আনন্দের মোহে যেন সকলকে আবেষ্টন করে রেখেছে। যে দুচার জন প্রধান নায়ক নিষ্ফল ক্রোধে বাহিরে কেবল গর্জ্জন করেই গায়ের ঝাল মিটাতে লাগলেন, তাতে অম্লান শারদ-লক্ষ্মীর আসন ম্লান হ'ল না।

অরবিন্দর বাবার বন্ধু ভুবনেশ্বর ন্যায়রত্ন খুব বড় পণ্ডিত। তাঁর ঋষিতুল্য সৌম্যমূর্ত্তি, দীর্ঘ গৌর তনুর উপর শুভ্র যজ্ঞোপবীত সকলের মনে সম্ভ্রম জাগিয়ে তুলছে। তিনি সকল দিকে দেখা-শুনা করছেন। মায়ের পূজা ষোড়শোপচারে সাঙ্গ হ'ল, ভোগ দেওয়া, অঞ্জলী দেওয়া শেষ হ'ল। প্রত্যেক ব্রাহ্মণের হাত ধরে ন্যায়রত্ন মশাই বল্লেন, "অরুর বাবা আর আমি ছিলাম দুই সহোদরের মত, আপনারা মনে করুন আজ আমার বাড়ীর উৎসবে এসেছেন। মায়ের মুখ দেখে সব ভুলে, সব তুচ্ছ করে তাঁর প্রসাদ নিয়ে আমাদের আনন্দ দান করুন।"

[illegible] আহার [illegible] দিয়ে শুধু পূজা দেখার ইচ্ছায় এসেছিলেন, তাঁরা শেষটায় প্রচুর আয়োজন দেখে এবং বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের অনুরোধে চোখ বুজে আহারে বসে পড়লেন; সবাই ভাবল, মায়ের ভোগ ব্রাহ্মণের রান্না আর দোষ কি? আর ন্যায়রত্ন মশাইএর মত লোক যখন এখানে আছেন, তিনি নিশ্চয় না বুঝে কিছু করছেন না। আগত নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণ-কায়স্থে পাঁচশত স্থান পূর্ণ হয়ে গেল। সকলে প্রচুর পরিমাণে বসে বসে খাচ্ছেন এবং কলকাতার ঠাকুররা এমন সুন্দর রাঁধে যাদের ধারণা ছিল না, তাঁরা তাদের প্রশংসা করছেন; ন্যায়রত্ন ডাক দিলেন, "কই গো মা লক্ষ্মী, তোমার পরমান্ন আন, আজ মায়ের প্রসাদে সকলে ধন্য হ'ন।"

একটা ঝকঝকে রূপার বড় বাটীতে রূপার হাতা ডুবিয়ে মাথায় ঘোমটা ঈষৎ টেনে দিয়ে অলকা অলক্তচরণে বৃদ্ধের নির্দ্দেশমত সভায় এসে দাঁড়াল! হতবাক্ ব্রাহ্মণমণ্ডলী বিমুগ্ধনয়নে তার দিকে তাকিয়ে রইল, একজন কে যেন বলে উঠল, "ন্যায়রত্ন মশাই, মা জগদ্ধাত্রী কি স্বয়ং নেবে এলেন?"

"হাঁ, মা আমার জগদ্ধাত্রীই বটে; দাও মা, দিয়ে যাও পাতে পাতে অরু, দে না আরো দুখানা ভাল সন্দেশ আর দরবেশ গাঙ্গুলী ভায়ার পাতে।"

সকল ব্রাহ্মণ হাত তুলে মুখ চাওয়া-চাওই করছে, কেউ এতটা আশা করেনি। সকলের ইতস্ততঃ ভাব দেখে বৃদ্ধ হেঁকে বল্লেন, "বন্ধুরা, ভাল করে চেয়ে চিন্তে খাবেন, মা আমার উপবাসী থেকে ব্রাহ্মণের ভোগ ও মায়ের ভোগ রান্না করেছেন আপনাদের অতৃপ্তিতে তাঁর ক্লেশ দ্বিগুণ হবে, নিন নিন্, আরো নিন, দাও, দাও মা, তুমি সকলের পাতে দিয়ে যাও।" সকলে পায়েসের মন মাতান গন্ধে ও অলকার হাতের পরিবেশনের লোভ সামলাতে না পেরে একে একে পায়েসের এমন সদ্ব্যবহার আরম্ভ করলেন যে একা অলকা দিয়ে ওঠে সাধ্য কি! শেষটা অরবিন্দ ও অন্য ছেলেরা সকলে দিতে আরম্ভ করলেন।

আহার শেষ হ'ল; ওধারেও অলকা গিয়ে অন্নব্যঞ্জন ভুবনেশ্বর বাবুর কথামত হাতে করে দুচার জনকে পরিবেশন করে এল। খাওয়া দাওয়া শেষ হতে হতে বেলা গড়িয়ে গেল।

অরবিন্দ অলকা স্নান করে একটী ঘরে বৃদ্ধ ন্যায়রত্ন

মশাইয়ের স্থান করে তাঁকে ডেকে বল্লে, "আপনি এবার প্রসাদ গ্রহণ করে আমাদের প্রসাদী দিন, তবেই আমাদের ব্রত উদ্‌যাপন হবে।"

"হ্যাঁ, নিশ্চয় দেব, আগে আর সব ব্রাহ্মণের আশীর্ব্বাদ নিয়ে যা তোরা, বাইরে সব দাঁড়িয়ে রয়েছেন। অরবিন্দ আর অলকা বাইরে পূজার বেদীর কাছে গিয়ে দাঁড়াল। পুরোহিত পূজার নির্ম্মাল্য নিয়ে তাদের মাথায় দিলেন। উপস্থিত সকল ব্রাহ্মণ তাদের মাথায় নির্ম্মাল্য দান করল, তারা মাকে প্রণাম করে উদ্দেশে সকল ব্রাহ্মণকে প্রণাম করল।

সন্ধ্যা আগমনীর সঙ্গে বাঁশির তানে কাশর ঘণ্টার বাজনে ক্ষীণ চন্দ্রালোকে উৎসব-প্রাঙ্গণ মঙ্গলশ্রীতে পরিপূর্ণ। আশীর্ব্বাদ অন্তে সকলের প্রসন্নতা লাভ করে আজ সকল গ্লানি মুক্ত হয়ে অলকার মনে ভারী একটা তৃপ্তি বোধ হচ্ছে।

সকল তত্ত্বাবধান শেষ করে অরবিন্দ শ্রান্তদেহে শুভ্র শয্যায় গা ঢেলে দিয়ে শুয়ে পড়েছে, অলকা মৃদু পদক্ষেপে ঘরে এসে অরবিন্দর কপালের উপর হাত রাখল, অরবিন্দ তার হাত দুখানা টেনে নিয়ে বল্লে, "অলকা, তুমি কখন আসবে তাই ভাবছিলাম, আজ আমার মনটা এত প্রসন্ন আর পরিষ্কার হয়ে গেছে যে তোমাকে তা বোলে বোঝাতে পারব না, তোমার কেমন লাগছে অলক?" পরিপূর্ণ তৃপ্তির সহিত স্বামীর দুই হাতের উপর মুখ রেখে অলকা বল্লে, "চল, মাকে প্রণাম করে আসি; ঐ আরতি সুরু হয়েছে, চিরদিন মা যেন আমাদের অন্তরে বাহিরে এমনি করেই বিরাজ করেন—"

গোপাল এসে আনন্দ কোলাহলে বাবা মার কোলে ঝাপিয়ে পড়ল।

"মা, বাবা, তোমরা আরতি দেখতে যাবে না? ঐ শোন শানাই বাজছে—"

এক হাতে পুত্রকে অপর হাতে স্ত্রীকে জড়িয়ে ধরে অরবিন্দ উঠে বল্লে, "এইতো মায়ের আরতি, চল গোপাল দেখে আসি। তোমার মামীমা কোথায়?"

তারা বার হ'তেই মঙ্গলা এসে দুজনকে প্রণাম করল; অলকা মঙ্গলাকে বুকে টেনে নিয়ে তার মাথায় চুমু দিয়ে বল্লে, "চল মঙ্গলি, মায়ের আরতি দেখে আসি—"

চণ্ডীমণ্ডপে উচ্চধ্বনিতে কাঁসর ঘণ্টা বেজে উঠল ঢং ঢং ঢং।

শেষ

শিউলী

শ্রী জগৎ ঘটক

কত প্রেম কত আশা
হৃদয়েতে সঙ্গোপনে ধরি';
ফুটেছিল ধরা 'পরে
শিউলী-সে স্বরগের পরী।
ব্যথাভরা অন্তরে
শুভ্রতায় ঢাকি' সারা'খন—
আপনার অভিমানে
আপনাতে সদা নিমগন।
জেগে রয় সারারাতি—
আসিবে যে প্রিয়তম তার—
পথ পাশে নিরালায়,—
আঁখি বাহি' বহে অশ্রুধার।

নিশি শেষে চাঁদিনী-সে
ব্যথাভরা নয়নে চাহিয়া
শিউলীর পানে,—শেষে
চলি' যায় অস্তপথ দিয়া।
ভোরের বাতাস আসি'
কাণে কাণে ক'য়ে যায় তায়—
'যার লাগি' রও জেগে
সে-ত আজ আসিবে না আর।'
ব্যর্থ প্রেম, ব্যর্থ আশা!—
অশ্রু সাথে নীরবে ঝরিয়া
নিরালা পথের পরে
শিউলী যে রহিল পড়িয়া।

বসন্তকুমারী বিধবাশ্রম

শ্রীসুখলতা রাও বি, এ,

নারীজাতির দুঃখ-মোচনের জন্য ভারতে যে সকল মহীয়সী নারী জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, স্বর্গীয়া বসন্তকুমারী দেবী তাঁহাদের মধ্যে অন্যতমা। সেকালের রক্ষণশীল ব্রাহ্মণপরিবারের কন্যা ও বধূ হইয়াও পরজীবনে তাঁহার ভিতরে যে সংস্কৃতির ভাব আসিয়াছিল, তাহা বাস্তবিকই প্রশংসনীয়। তাঁহার স্বামী ৺ স্যার প্রতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় যখন পঞ্জাব কোর্টে বিচারপতি নিযুক্ত হইয়াছিলেন, তখন বসন্তকুমারীর সহৃদয়তা ও উদারতা গুণে পঞ্জাবের নারীগণ তাঁহাকে অন্তরের সহিত শ্রদ্ধা করিত। স্বজাতি ও স্বদেশী নহে বলিয়া পাঞ্জাবী রমণীদের প্রতি তিনি কখনও বিদ্বেষের ভাব প্রকাশ করিতেন না।

তিনি অনেক সময় নারীজাতির কল্যাণের জন্য চিন্তা করিতেন। এই সময় হইতেই নারীজাতির বৈধব্যদুঃখ তাঁহার কোমল প্রাণকে ব্যথিত ও বিচলিত করিয়াছিল। আমাদের দেশে জ্ঞান-শিক্ষা-দীক্ষাবিহীনা বিধবাগণ ভ্রাতৃ-গৃহে কিংবা শ্বশুরগৃহে একমুঠো হবিষ্যের জন্য যে লাঞ্ছনা সহ্য করিয়া থাকে, আত্মনির্ভরতায় সম্পূর্ণ অক্ষম সেই সকল বিধবাদের দুঃখনিবারণের জন্য তিনি বদ্ধপরিকর হইলেন।

তাঁহার নিজের বৈধব্য ঘটিবার পর তিনি শেষজীবন শ্রীক্ষেত্রেই ধর্মকর্মের ভিতর কাটাইতেছিলেন। ১৯২৯ সালে তাঁহার অনেকদিনের স্বপ্ন সফল হইতে চলিল। পুরীতে অবস্থিত তাঁহার নিজস্ব বাড়ীটী তিনি একটী বিধবাশ্রমরূপে গড়িয়া তুলিলেন ও বিশেষ সুবিধার নিমিত্ত ইহাকে "সরোজনলিনী নারীকল্যাণ সমিতির" অন্তর্ভুক্ত করিয়া দিলেন। এই বাড়ীটী ও তৎসঙ্গে যথেষ্ট অর্থ তিনি এই আশ্রমকে দান করিয়া গিয়াছেন। এই আশ্রমটী ও ইহারই সংলগ্ন একটী বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হইবার অব্যবহিতকাল পরেই তিনি চিরনিদ্রায় অভিভূত হইলেন।

এই আশ্রম প্রতিষ্ঠাকার্য্যে বসন্তকুমারী যাঁহার সাহায্য পাইয়াছিলেন সেই উদারহৃদয়া নারী শ্রীযুক্তা হেমলতা দেবী তাঁহার আরব্ধকার্য্যের ভার স্বহস্তে গ্রহণ করিয়া সুচারুরূপে ইহা পরিচালিত করিতেছেন। আশ্রম-সংলগ্ন বোর্ডিংএ কয়েকজন বিধবা মেয়ে থাকেন, এতদ্ব্যতীত অনেক বিধবা ও কুমারী মেয়েরা বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভার্থে আসিয়া থাকেন। লেখাপড়া, সেলাই, ছাঁটকাট, গালিচা ও আসন বুনন, সুতা কাটা, তাঁত বোনা ইত্যাদি অনেক কার্য্যকরী বিষয় এখানে শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত স্কুলের মেয়েরা গীতবাদ্যও শেখে। অনেক বাধাবিঘ্নের মধ্যেও এই বিদ্যালয়টী ক্রমশঃ উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে। কিছুদিন পূর্ব্বে এই বিদ্যালয়ে যে পারিতোষিক বিতরণ সভা অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহাতে ছাত্রীদের নৃত্যগীত ও আবৃত্তি পাঠ অত্যন্ত মনোমুগ্ধকর হইয়াছিল।

বিশেষরূপে লক্ষিত হয় এই যে, এখানে বিষণ্ণবদনা, সর্ব্বসুখবঞ্চিতা, কঠোর ব্রহ্মচর্য্যপালনে নিরতা বিধবা নারী ও বালিকাগণ এক আনন্দের স্বাদ পাইয়াছেন। তাঁহাদের মুখের যে জ্যোতিঃ ও হাসি চিরতরে বিলুপ্ত হইয়াছিল, তাহা আবার ধীরে ধীরে ফুটিয়া উঠিতেছে। সংসারে সকলের ঘৃণার পাত্রী হইয়া না থাকিয়া তাঁহারা জগতে আপনাদের উপযুক্ত স্থান খুঁজিয়া লইতে চেষ্টা করিতেছেন, চিরদিন পরমুখাপেক্ষী হইয়া না থাকিয়া আত্মপ্রতিষ্ঠা-লাভে সচেষ্ট হইতেছেন। এই মহৎ কার্য্যের মূলে যে সদাশয়া নারীর অক্লান্ত চেষ্টা নিহিত ছিল, স্বর্গগতা সেই নারীর পুণ্যস্মৃতি সকলের মনে চিরদিন জাজ্বল্যমান রহিবে। এই জন্যই কবি বলিয়াছেন,

"নশ্বর জগতে সবই স্বপ্নসম মিলাইয়া যায়
শুধু মহতের কীর্ত্তিকথা মানবের প্রাণে গাঁথা রয়।"

"যেদিন তুমি রবে না আর কাছে"

শ্রী মমতা মিত্র

যে দিন তুমি রবে না আর কাছে,
পরের ঘরে হ'বে পরের সম,
চোখের আড়াল হ'লেও জেনো মনে
জীবনে মোর তুমিই প্রিয়তম।
তোমার কথা নিত্য স্মরণ করি'
কাট্‌বে দিবা, কাট্‌বে বিভাবরী,
আমার মনের মণিকোঠার মাঝে
রবে তোমার মূর্ত্তি অনুপম।

আজ্‌কে সখি এলেম তব কাছে
একটি কথা শুধাই শুধু তোরে,
শপথ আমার, মিথ্যা বলিস্‌ নে গো
সত্যি ক'রে বল্‌গো রাণি মোরে,—
পরের ঘরে ব্যস্ত নানা কাজে
আমায় কি তোর পড়বে মনো মাঝে?
স্মরণ ক'রে আমায় ক্ষণে ক্ষণে
অশ্রু কি তোর আস্‌বে আঁখি ভরে'?

আমায় যদি ভাব তুমি কভু
সেকথা ঠিক্‌ জান্‌ব বসে দূরে,
সান্ত্বনার স্নিগ্ধ-রস-ধারে
হৃদয়খানি উঠ্‌বে মম পূরে;
অন্তরে সেই স্মৃতি রয়ে রয়ে
উজান ঠেলে চল্‌বে বয়ে বয়ে,
লক্ষ্যহারার সন্ধ্যা সকাল বেলা
উঠ্‌বে ভরে স্মৃতি-মধুর সুরে।

শেষের বিচার

শ্রী দীপ্তি দেবী, বি-এ, বি-টি,

ব্ল্যাডমার সহরে থাকৃত এক ব্যবসাদার, নাম তার আইভন্‌ মিট্রিচ এক্সিনভ্‌। তার সম্পত্তির মধ্যে ছিল একখানা বসতবাটী আর খান দুই দোকান।

এক্সিনভের চেহারা ছিল ভালই, মাথা-ভর্ত্তি কোঁকড়া চুল, সোনার মত রং। মনখানা তার সদা প্রফুল্ল, কণ্ঠে তার গানের অভাব ছিল না। অল্প বয়সে সে নেশা-টেশা করত বটে, তার মাত্রা বেশী হয়ে গেলে হোল্লা যে করত না তাও নয়, তবে বিয়ের পর থেকে সে এসব প্রায় ছেড়েই দিয়েছিল, কদাচ কখন একটু-আধটু মদ খেত এই যা।

গ্রীষ্মকাল, নিজ্‌নি সহরে এক মস্ত মেলা বসেছে। আইভন্‌ মেলায় যাবার জন্ম প্রস্তত হয়ে স্ত্রী পুত্রকন্যাদের কাছে বিদায় নিতে যেতেই তার স্ত্রী বল্লে—"ওগো, আজ তুমি কোথাও বেরিও না, আমি তোমার বিষয় একটা বড় বিশ্রী স্বপ্ন দেখেছি।" আইভন্‌ হেসে বল্লে—"বুঝেছি; আসল কথা, তোমার ভয় হয়েছে যে আমি বোধ হয় মেলায় গিয়ে খুব হৈ হৈ করব—" স্ত্রী তার উত্তর দিল—"কিসের ভয় তা জানি না, তবে এই জানি যে আমি একটা বড় খারাপ স্বপ্ন দেখেছি। স্বপ্নে দেখ্‌লাম যে তুমি ফিরেছ, আর মাথার টুপিটা তুল্‌তেই দেখি চুলগুল তোমার সব শাদা।" আইভন্‌ হেসে বল্লে—"বাঃ, ও তো বেশ ভাল লক্ষণ! তুমি দেখে নিও, সব মালপত্র বেচে আমি তোমার জন্ম কত সুন্দর সুন্দর জিনিষ নিয়ে আস্‌ব মেলা থেকে।"

সকলের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করে আইভন্‌ বেরিয়ে

পড়্‌ল গাড়ী হাঁকিয়ে। মাঝে পথে আইভনের দেখা হ'ল এক পরিচিত ব্যবসাদারের সঙ্গে। রাতটা কাটাবার জন্ম দুজনে আশ্রয় নিল একই পান্থশালায়। দুই বন্ধুতে চা-টা খেয়ে শুতে গেল পাশাপাশি দুটো ঘরে। বেলা অবধি ঘুমানো আইভনের অভ্যাস নয়, তা ছাড়া ঠাণ্ডায় ঠাণ্ডায় বেরিয়ে পড়্‌বার আশায় রাত থাকৃতেই সে উঠে গাড়ী প্রস্তুত করার আদেশ দিল, তার গাড়োয়ানকে। পান্থশালার মালিক থাকৃত পিছনদিকের একটা ছোট বাড়ীতে; আইভন্ তাঁর কাছে গিয়ে দেনা-পাওনা চুকিয়ে পুনরায় যাত্রা সুরু কর্‌ল।

মাইল পঁচিশেক গিয়ে তাকে থামতে হ'ল ঘোড়াকে খাওয়াবার জন্যে। নিকটবর্ত্তী পান্থশালার ঢাকা বারান্দায় বসে চা করবার হুকুম দিয়ে, "গীটার" খানা বের করে আইভন্ বাজাতে সুরু করেছে এমন সময় টিং টিং করে ঘণ্টা বাজিয়ে একখানা গাড়ী এসে থাম্‌ল। আর তার থেকে নাম্‌ল এক ব্যক্তি, দুজন সৈনিক পুরুষ সঙ্গে নিয়ে। লোকটা আইভনের কাছে এসেই সে কে, থাকে কোথায়, এই সব অনেক রকম প্রশ্ন করতে লাগ্‌ল। সব খবরই তাকে দিয়ে আইভন্ বল্‌ল—"এক পেয়ালা চা দেব কি?" কিন্তু লোকটার তখনও প্রশ্ন করা শেষ হয় নি, সে জিজ্ঞাসা করেই চল্ল—"কালকের রাতটা কোথায় কাটিয়েছিলে? তুমি একা ছিলে না সঙ্গে আর একজন ব্যবসাদার ছিল? সকালে কি সেই লোকটার সঙ্গে দেখা হয়েছিল? রাত থাকৃতেই পান্থশালা থেকে বেরিয়ে পড়েছিলে কেন?"—এই লোকটা যে কেন এত প্রশ্ন করছে আইভন্ কিছুই বুঝে উঠ্‌তে পার্‌ল না, তবুও সে গত রাত্রের ঘটনা সব খুলে বলে জিজ্ঞাসা করল—"কেন মশায় আপনি আমায় এত জেরা করছেন? আমি চোরও নই ডাকাতও নই, আমি আমার নিজের কাজে বেরিয়েছি, আমায় অত প্রশ্ন করবার প্রয়োজন নেই।" তখন লোকটি সৈনিক দুজনকে ডেকে বল্লেন—"আমি এই ডিষ্ট্রিক্টের পুলিশ অফিসার, আর আমি যে তোমায় এত প্রশ্ন করছি তার কারণ হচ্ছে যে তুমি যে ব্যবসাদারের সঙ্গে কাল রাত কাটিয়েছ, আজ সকালে দেখা গেল যে তার গলায় ছুরি বসান। এই জন্যে তোমার জিনিষ পত্র আমরা তল্লাস করব।" ঘরে ঢুকে পুলিশ অফিসার ও তার সহচর দুজন আইভনের জিনিষ পত্র নেড়ে চেড়ে দেখ্‌ছে এমন সময় হঠাৎ অফিসারটি একটি ব্যাগের মধ্যে থেকে একখানা ছুরি টেনে বের করে বল্লেন:—"এটা কার ছুরি?" আইভন্ চেয়ে দেখ্‌ল; বুকটা তার কেঁপে উঠ্‌ল রক্তমাখা ছুরিখানা দেখে। "এই ছুরিতে রক্তের দাগ লাগল কি করে?" আইভন্ উত্তর দেবার চেষ্টা করল, কিন্তু স্বর যেন তার গলা দিয়ে বেরতেই চায় না, সে অতি কষ্টে বল্ল—"আমি জানি না; আমার নয়।" তখন অফিসারটি বল্লেন—"আজ সকালে সেই ব্যবসাদারকে গলা কাটা অবস্থায় পাওয়া যায়, তুমি ছাড়া এ কাজ আর কেউ করতেই পারে না। বাড়ীটা ভিতর থেকে বন্ধ ছিল, আর সে বাড়ীতে অন্য কোন লোকও ছিল না। তোমার ব্যাগ থেকে এই রক্তমাখা ছুরি বেরুল, আর তোমার চেহারা দেখেও তাই মনে হচ্ছে, এখন সব কথা আমায় খুলে বলতো? কেমন করে তাকে মারলে আর কত টাকাই বা লোপাট করেছ?"

আইভন্ যে এ কাজ করে নি, সে সেই যে লোকটার সঙ্গে চা খেয়েছিল তারপর আর তার সঙ্গে মোটে ওর দেখাই হয় নি, তার কাছে তার নিজের আট হাজার রুবল ছাড়া একটি কপর্দ্দকও নেই, ছুরিটাও তার নয়, এ সবই আইভন শপথ করে বল্ল, কিন্তু বল্লে কি হয়? কণ্ঠস্বর তার ভগ্ন, মুখ ফ্যাকাশে, হাত পাগুলো এমন কাঁপছিল যেন সত্যিই সে দোষী।

পুলিশের অফিসারের আজ্ঞানুসারে সৈনিক দুজন আইভনকে বেঁধে তুলল গাড়ীতে। হাত পা বেঁধে যখন তাকে গাড়ীতে ছুড়ে দিল তখন তার দুচোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ল।

আইভনের টাকাকড়ি জিনিষপত্র সব কেড়ে নিয়ে তাকে বন্ধ করে রাখল নিকটবর্ত্তী কোন সহরের কারাগারে। তারপর ভ্লাডমার সহরে আইভনের চরিত্র সম্বন্ধে খোঁজ খবর নেওয়া হল। সেখানকার ব্যবসাদারেরা ও অন্যান্য ভদ্রলোকের কাছ থেকে জানা গেল যে আইভন ছোটবেলায় বদ্-খেয়ালি করে সময় নষ্ট করত বটে কিন্তু আসলে লোকটা ভাল।

তারপর বিচারের দিন এল। রাইজানের এক ব্যবসাদারকে হত্যা করে তার বিশ হাজার রুবল চুরি করার অভিযোগ আনা হল আইভনের বিরুদ্ধে।

খবর পেয়ে আইভনের স্ত্রী একেবারে ভেঙ্গে পড়ল। কি যে সে বিশ্বাস করবে ভেবে পেল না। ছেলেমেয়েরা তার ছোট ছোট, একটি তো নেহাৎ কচি। সন্তানগুলিকে সঙ্গে নিয়ে গেল সে সেই সহরে যেখানে তার স্বামী ছিলেন কারাগারে। প্রথমে তার স্বামীকে দেখবার অনুমতি সে পায় নি, পরে জেলের কর্তৃপক্ষদের কাছে অনেক অনুনয় বিনয়ের পর সম্মতি পায়।

স্বামীকে কয়েদীর পোষাকে, শিকলে বাঁধা অবস্থায়, আর চোর ডাকাত খুনীদের সঙ্গে বদ্ধ দেখে সে সেই যে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে, অনেকক্ষণ তার আর জ্ঞান হয় নি। অবশেষে সে তার ছেলেমেয়েদের বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে গিয়ে বসল তার স্বামীর পাশে। আইভন্ তাকে সব কথাই খুলে বলল। স্ত্রী তখন জিজ্ঞাসা করল—"এখন তবে আমরা কি করব?" "সম্রাটের কাছে খবর পাঠাতে হবে, এমন করে কি তিনি নির্দ্দোষীকে মরতে দেবেন?" তখন আইভনের স্ত্রী বলল যে সে এর আগেই সম্রাটের কাছে আবেদন পত্র পাঠিয়েছিল কিন্তু তা মঞ্জুর হয় নি। আইভন চোখ নীচু করে বসে রইল, মুখ দিয়ে তার একটিও কথা বেরুল না। আইভনের স্ত্রী তখন বলল—"দেখ, শুধু শুধু আমি স্বপ্ন দেখি নি যে তোমার চুল সব শাদা হয়ে গেছে। মনে পড়ে? তোমার উচিত হয় নি সেদিন বাড়ী থেকে বেরুনো।" তারপর আইভনের চুলের মধ্যে হাত চালাতে চালাতে সে বলল—"ওগো আমি তোমার স্ত্রী, সত্যি করে বল এ কাজ কি তুমি করেছ?" দু'হাতে মুখখানা ঢেকে ফেলল্ আইভন্, চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ল টস্‌টস্ করে। ঠিক সেই সময় জেলার এসে জানাল যে আইভনের স্ত্রীকে এবার যেতে হবে ছেলে পিলে নিয়ে।

শেষবারের মত আইভন্ তার স্ত্রী পুত্র-কন্যাদের কাছে বিদায় নিল। তারা চলে গেল। তাদের সঙ্গে যা যা কথা হয়েছিল তা সব মনে পড়ল আইভনের। তার স্ত্রীও যে তাকে সন্দেহ করেছে একথা ভেবে সে নিজের মনে মনেই বল্লে—"ভগবানই একা সত্যটা জানেন, তাঁর কাছে ছাড়া আর কারু কাছে নিবেদন করা বৃথা। দয়ার প্রত্যাশা করা যায় এক তাঁরই কাছে।"

এর পর থেকে সে আর কারু কাছে কোন আবেদন জানাল না, সব আশা ছেড়ে দিয়ে কেবল স্মরণ করতে লাগ্‌ল ভগবানকে।

বেত্রাঘাত ও পরে সাইবিরিয়ার খনিতে কাজ করাই হ'ল আইভনের শাস্তির বিধান। দড়িতে গিরো বেঁধে তাই দিয়ে তাকে চাবুক মারা হ'ল, তারপর ঘা শুকুলে তাকে চালান করে দিল সাইবিরিয়াতে অন্যান্য কয়েদীদের সঙ্গে।

ছাব্বিশ বৎসর ধরে আইভন সাইবিরিয়াতে কাটাল কয়েদীদের মধ্যে। মাথার চুলগুলো তার হয়ে গিয়েছিল একেবারে শাদা তুষারের মত। মনের আনন্দ হারিয়ে, কুঁজো হয়ে সে চল্‌ত অতি ধীরে ধীরে। মুখের হাসি তার গিয়েছিল মিলিয়ে, সে কেবলই ডাক্‌ত ভগবানকে এক মনে।

জেলে থাক্‌তে আইভন জুতো সেলাই করতে শেখে। জুতো বিক্রি করে সে কিছু পয়সাও জমিয়েছিল, তাই দিয়ে একখানা সাধু ব্যক্তিদের জীবন চরিত কিনে পড়্‌ত সে কারাগারের ক্ষীণ আলোতে বসে। জেলের অধ্যক্ষরা আইভানকে তার নম্র স্বভাবের জন্যে বেশ স্নেহের চোখেই দেখ্‌ত। আর অন্যান্য কয়েদীরা তাকে যথেষ্ট সম্মান করত। আইভনকে "ঠাকুর্দ্দা", "পরমহংসদেব" এই সব বলে ডাকত তারা। কয়েদীদের কর্তৃপক্ষের কাছে কিছু জানাবার থাক্‌লে আইভনকেই দেওয়া হ'ত তার ভার। নিজেদের মধ্যে যদি কোন গোলযোগ বাধ্‌ত তো আইভনই সব মিটমাট করে দিত। বাড়ীর কোন খবরই আইভন পায় না, এমন কি তারা বেঁচে আছে কি নেই, তাও তার জানা ছিল না।

একদিন এসে জুট্‌ল নূতন এক কয়েদীর দল। সন্ধ্যে বেলা পুরাণ কয়েদীরা এই নবাগতদের ঘিরে বসে তারা কোন গ্রামের লোক, কি দোষে এখানে এসেছে, এই সব প্রশ্ন করতে লাগল। আইভনও কাছে বসে এদের কথা-বার্ত্তা শুন্‌ছিল।

এই নূতন কয়েদীদের মধ্যেই একজন, বয়স হবে তার

ষাট, লম্বা শক্তিশালী চেহারা, আধ পাকা দাড়ি গোঁফ বেশ ছোট কোরেই ছাটা। সেই এবার শোনাচ্ছিল তার নিজের ইতিহাস—"জানিস্ ভাই, একটা ঠিকে গাড়ীর ঘোড়া নিয়েছিলুম বলেই চুরির দায়ে ধরা পড়ি। আমি তাদের কত বোঝালুম যে কেবল চট্‌পট বাড়ী পৌঁছাব বলেই ঘোড়াটা নিয়েছিলুম, আর তা' ছাড়া গাড়ীর চালক আমার জানা লোক, তার কাজ হয়ে যেতেই আমি ঘোড়াটা ছেড়ে দিই, কিন্তু তা বল্‌লে কি হয়? ওরা কেউ আমার কথা শুনছে না। এদিকে আমি একবার সত্যিই একটা অন্যায় করেছিলুম যার জন্যে আমার এর আগেই এখানে আসা উচিত ছিল, কিন্তু তখন কেউ আমায় ধর্‌তে পারেনি; অথচ এখন আমি বল্‌তে গেলে বিনাদোষেই এসেছি—আরে না, না, আমি মিথ্যা বল্‌ছি, এর আগে সাইবিরিয়াতে এসেছিলাম বটে, তবে বেশীদিন এখানে থাকি নি।" একজন জিজ্ঞাসা কর্‌ল—"তোমার দেশ কোথায়?" "ব্লাড্‌মার থেকে আমি আস্‌ছি, আমার পরিবারের সকলেরই ঐ দেশে বাস। আমার নাম মাকার, ওরা আমাকে সেমিওনিচও বলে। আইভন এক্সিওনিভ্ মাথা তুলে জিজ্ঞাসা কর্‌ল—"আচ্ছা ব্লাড্‌মির সহরের এক্সিওনিভ্ বলে ব্যবসাদারদের সম্বন্ধে জান কিছু?" "কী! তাদের আবার জানি না? তাদের ত এখন বেশ ভাল অবস্থা। যদিও কাজ তাদের এই সাইবিরিয়াতেই আছে, আমাদেরই মত বোধ হয় পাপী সে! এখন বলত ঠাকুর্দ্দা, কি দোষে তুমি এখানে এসেছ?" আইভন তার দুঃখের বিষয় বেশী আলোচনা করতে ভালবাস্‌ত না। সে কেবল একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বল্ল—"আমার পাপের জন্য আমি এই ছাব্বিশ বছর কারাগারে আবদ্ধ আছি।" মাকার জিজ্ঞাসা কর্‌ল—"কি পাপের জন্য?" কিন্তু আইভন্ কেবল বল্ল—"কি জানি, নিশ্চয় এটা আমার প্রাপ্য শাস্তি!" এর বেশী তার আর কিছু বল্‌বার ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু তার সহচরেরা আইভন যে কি দোষে সাইবিরিয়াতে এসেছে তা এদের কাছে ব্যক্ত করে দিল। কেমন করে কে একজন এক ব্যবসাদারকে খুন করে ছুরিটা আইভনের ব্যাগের মধ্যে দিয়েছিল, আর তারই ফলে কেমন করে বিনা দোষে আইভন্ সাইবিরিয়াতে প্রেরিত হয় এই সবই তারা খুলে বল্ল। এই সব ব্যাপার শুনে মাকার একবার আইভনের দিকে চাইল, তারপর নিজের হাঁটু চাপ্‌ড়াতে চাপ্‌ড়াতে বল্ল—"হয়েছে, হয়েছে, একি আশ্চর্য্য ব্যাপার! সত্যিই আশ্চর্য্য! কিন্তু তুমি কী ভীষণ বুড় হয়ে পড়েছ ঠাকুর্দ্দা?" সবাই তার আশ্চর্য্য হবার কারণ জান্‌তে চাইল, আর এর পূর্ব্বে সে আইভনকে যে কোথায় দেখেছে তাও তারা জিজ্ঞাসা কর্‌ল। মাকার কিন্তু কেবল বল্ল—"আমাদের যে এখানে দেখা হ'ল, এটা একটা আশ্চর্য্যের বিষয় সন্দেহ নেই।" এ সব কথা শুনে আইভনের মনে হ'ল যে হয়ত এ লোকটা জানে কে সেই ব্যবসাদারকে হত্যা করেছে; তাই সে বল্ল—"মাকার, তুমি হয়ত এ বিষয় আগে থেকেই জান, আমায় এর পূর্ব্বে কোথায় দেখেছ বলতো?"

"এ বিষয় না শোনাই আশ্চর্য্য। পৃথিবীতে তো গুজবের অভাব নেই। কিন্তু ওটা এত পুরাণ কথা যে আমি কি শুনেছি তা' সব প্রায় ভুলেই গেছি।" "সে যাই হোক্, কে সে ব্যবসাদারকে খুন করেছিল তা হয়ত তুমি শুনেছ?" মাকার হেসে উত্তর দিল—"যার কাছ থেকে ছুরি পাওয়া গেছে সেই হয়ত খুন করেছে! যদিই বা কেউ ছুরিটা লুকিয়ে থাকে তা' হলেও যতক্ষণ না চোর ধরা পরে ততক্ষণ তো তাকে চোর বলা যায় না, জান ত? আর কেমন করেই বা কেউ তোমার ব্যাগে ছুরি ঢোকাবে? ব্যাগ তো তোমার মাথার নীচে ছিল, রাখ্‌তে গেলে কি তোমার ঘুম ভেঙ্গে যেত না?"

এর কথা শুনে আইভনের বুঝতে বাকি রইল না যে এই লোকটাই সেই ব্যবসাদারকে হত্যা করেছিল।

আইভন সেখানে থেকে উঠে গেল।

সারা রাত তার জেগেই কাট্‌ল। মন তার ভরে গেল অসীম দুঃখে, কত ছবিই না তার মনের মধ্যে ফুটে উঠ্‌ল। মেলায় যাবার দিন বিদায় নিতে গিয়ে তার স্ত্রীকে যেমন দেখেছিল সেই ছবিটা মনে পড়ে গেল। মনে হ'ল সে যেন সাম্‌নেই দাঁড়িয়ে আছে। তার মুখ চোখ আইভনের চোখের উপর ভেসে উঠ্‌ল। তার গলার স্বর, হাসির আওয়াজ সে যেন স্পষ্টই শুন্‌তে পেল। তারপর সে যেন তার ছেলে মেয়েদেরও দেখ্‌তে পেল। যেমন [illegible]

তাদের দেখে এসেছিল ঠিক তেমনটি। একটির পরণে ছিল একটা ছোট কোট, আর একটি ছিল তার মায়ের কোলে। তারপর তার নিজেকে মনে পড়্‌ল, যেমনটি সে আগে ছিল—একটি চিন্তাশূন্য যুবক। পান্থশালার ঢাকা বারাণ্ডায় বোসে সে কেমন নিশ্চিন্ত মনে "গীটার" বাজাচ্ছিল আর ঠিক সেই সময় পুলিশের লোক এসে তাকে কেমন করে গ্রেপ্তার করেছিল এ সব তার মনে পড়ে গেল। মনের চোখে সে দেখ্‌তে পেলে সে জায়গাটা, যেখানে দাঁড়করিয়ে তাকে চাবুক মারা হয়েছিল, যে তাকে মেরেছিল তাকেও দেখ্‌তে পেল, কত লোকই না সেখানে জড় হয়েছিল। শিকল, কয়েদী, এই ছাব্বিশ বছরের কয়দীর জীবন, আর তার এই অকাল বার্দ্ধক্য, সবই তার সাম্‌নে ছবির মত ফুটে উঠ্‌ল। মনটা তার এত খারাপ হয়ে পড়্‌ল যে সে হয়ত আত্মহত্যা করতেও দ্বিধা করত না। "এ সব ঐ বদ্‌মাইসটার কাজ আইভন্‌ মনে মনে ভাব্‌ল। মাকারের উপর তার এমন রাগ হ'ল যে সে ব্যস্ত হয়ে উঠল প্রতিশোধের জন্য। প্রতিশোধ নিতে গিয়ে যদি তার নিজের মৃত্যুও হয় তাতেও তার আপত্তি ছিল না। সারা রাত সে ভগবানকে ডাক্‌ল কিন্তু শান্তি পেল না। দিনের বেলা সে মাফারের কাছদিয়েও গেল না, চোখ তুলে সে তার দিকে চাইলও না।

হপ্তা দুই এমন করে কাটল। রাতে আইভনের কিছুতেই ঘুম হয় না। মনের অবস্থা এত খারাপ যে সে কি করবে কিছুই ঠিক করে উঠ্‌তে পারে না।

কয়েদীদের শোবার জন্য একটা করে সেল্‌ফের মত জায়গা আছে। একদিন রাতে আইভন্‌ যখন কারাগারের ভিতর পাইচারি করে বেড়াচ্ছে, এমন সময় সে দেখে যে একটা সেল্‌ফের নীচের মাটি ঝুর্‌ঝুর্‌ করে ঝরে পড়্‌ছে। নীচু হয়ে পরীক্ষা করতে গিয়ে দেখে যে মাটির নীচথেকে বেরুচ্ছে মাকার। ভীতিপূর্ণ চোখে সে চাইল আইভনের দিকে। আইভন্‌ তার দিকে না চেয়েই চলে যেতে উদ্যত দেখে মাকার তার হাতটা চেপে ধরে বল্ল যে সে এই দেয়ালে একটা গর্ত্ত করেছে। প্রতিদিন কয়েদীদের যখন রাস্তা দিয়ে কাজের জন্যে নিয়ে যাওয়া হয় সেই সময় সে ঐ মাটিগুল তার বুটের মধ্যে ভরে নিয়ে রাস্তায় ফেলে আসে।—"দেখ হে, চুপ্‌চাপ্‌ থাক, তুমিও পালাতে পারবে। আর যদি তুমি আমায় ধরিয়ে দাও তা' হ'লে আমায় ত' ওরা চাব্‌কে মারবেই কিন্তু তার আগে আমি তোমায় শেষ করব।" শত্রুর দিকে চেয়ে রাগে কাঁপ্‌তে লাগ্‌ল আইভন্‌। সে তার হাতখানা টেনে নিয়ে বল্ল —"আমার পালাবার কোন ইচ্ছা নেই, তুমি আমায় মৃত্যুর কি ভয় দেখাচ্ছ, তুমি ত' আমায় অনেক কাল আগেই মেরে ফেলেছ—আর তোমায় ধরিয়ে দেওয়া? সে বিষয় আমার হাত নেই, ভগবান আমায় যা বুদ্ধি দেবেন আমি তাই করব।"

পরদিন যখন কয়দীদের কাজের জন্যে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল সঙ্গের প্রহরীরা দেখে একজন কয়েদী নিজের বুটের মধ্যে থেকে খানিকটা মাটি ঝেড়ে ফেল্‌ছে। তৎক্ষণাৎ কারাগারের ভিতর তল্লাস সুরু হ'ল। আর দেখ্‌তে দেখ্‌তে দেয়ালের ভিতর একটা সুড়ঙ্গ বেরিয়ে পড়্‌ল।

জেলের গভর্ণর এসে সকলকে এ বিষয় জিজ্ঞেস কর্‌লেন কিন্তু কেউ কিছুই স্বীকার করল না। যারা জান্‌ত মাকারই এ কাজ করেছে তারা ভয়ে কিছু বল্‌তে সাহস কর্‌লে না পাছে মাকারকে তারা চাব্‌কে মেরে ফেলে। অবশেষে গভর্ণর আইভনকে সত্যবাদী জেনে তারদিকে চেয়ে বল্লেন—"তুমি তো কখন মিথ্যা বল না আইভন্‌। ভগবানের সাক্ষী করে বল তো কে ঐ গর্ত্ত কেটেছে দেয়ালে?" মাকার এমন ভাবে গভর্ণরের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে ছিল যেন তার কিছুই যায় আসে না। সে একবারও আইভনের দিকে ফিরে চাইল না। আইভনের ঠোঁট আর হাত কাঁপতে লাগ্‌ল। সে কিছুই বল্‌তে পার্‌ল না অনেকক্ষণ ধরে। একবার ভাব্‌ল—"যে আমার জীবনটা একেবারে নষ্ট করে দিল তাকে আমি বাঁচাতে যাব কেন? ওর হাতে যে কষ্ট পেয়েছি তার শাস্তিও এবার ভোগ করুক একটু। কিন্তু ওকে যদি ধরিয়ে দিই তাহলে এরা ওকে আস্ত রাখ্‌বে না, চাব্‌কে শেষ করবে। আর এমনও তো হ'তে পারে যে ওকে আমি অন্যায় করে সন্দেহ করছি?" গবর্ণর পুনরায় বল্লেন—"সত্যি করে বল ত বাপ, কে দেয়াল খুঁড়েছে?" আইভন্‌ চকিতে মাকারের দিকে চেয়ে বল্ল—"আমি বল্‌তে পার্‌লাম না মশায়!

ভগবানের ইচ্ছা নয় যে আমি কিছু বলি। আপনার যা ইচ্ছা হয় আমার নিয়ে করুন, আমি এখন সম্পূর্ণ আপনার হাতে।"

গবর্ণর অনেক চেষ্টা করেও আইভনের কাছ থেকে কিছুই বের করতে পারলেন না। অবশেষে বাধ্য হয়ে সব ছেড়ে দিতে হ'ল।

সেইদিন রাতে আইভন শুয়েছিল বিছানায়, একটু তন্দ্রাও এসেছিল এমন সময় কে যেন এসে বস্‌ল তার পাশে। অন্ধকারে সে মাকারকে চিনতে পারল। আইভন বল্ল—"আমার কাছ থেকে তুমি আর কি চাও? কেন এখানে এসেছ?" মাকার কথা কয় না দেখে আইভন্ শয্যা থেকে উঠে বসে বল্ল—"কেন এখানে এসেছ? চলে যাও এখনি, তা' না হ'লে আমি এখুনি গার্ডকে ডাকব।" ঝুঁকে পড়ে চাপা গলায় মাকার বল্ল—"আইভন, আমায় ক্ষমা কর।" "কিসের জন্যে" আইভন্ জিজ্ঞাসা করল। "আমিই সেই ব্যবসাদারকে খুন করে ছুরিটা তোমার জিনিষের সঙ্গে রেখে দিয়েছিলাম। তোমাকেও আমার মারবার ইচ্ছা ছিল কিন্তু বাইরে গোলমাল শুনে আমি তাড়াতাড়ি ছুরিখানা লুকিয়ে রেখে জানলা টোপকে পালাই।" আইভন চুপ করে রইল, কি যে সে বলবে ভেবে পেল না। মাকার বিছানা থেকে নেমে মাটিতে হাঁটু গেড়ে বসে বল্ল—"আইভন্, আমায় ক্ষমা কর! আমি সব কথা স্বীকার করব, তোমাকে তা' হ'লে এরা ছেড়ে দেবে, তুমি তোমার নিজের বাড়ী ফিরে যেতে পারবে।" আইভন্ বল্ল—"তোমার পক্ষে বলা সহজ। তোমারই জন্যে এই ছাব্বিশ বছর ধরে আমি যন্ত্রণা পেয়েছি। এখন আবার আমি কোথায় যাব? আমার স্ত্রী আর নেই, ছেলে মেয়েরা আমায় ভুলে গেছে—আমার স্থান কোথায়?—" মাকার উঠ্‌ল না, মাটিতে মাথা ঠুকতে ঠুকতে সে বল্ল—"আইভন্ আমায় ক্ষমা কর! চাবুকের ঘায়ে অত কষ্ট হয় নি, যা এখন হচ্ছে তোমার দিকে চেয়ে। তবুও তো তুমি আমায় দয়া করেছিলে, আমায় ধরিয়ে দাও নি। ভগবানের দোহাই, আমি যেমনই হই তুমি আমায় ক্ষমা কর।" ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে সে কাঁদতে লাগ্‌ল; তার কান্না দেখে আইভনেরও চোখে জল এল; সে বল্ল—"ভগবান তোমায় মাপ করবেন। হয়ত আমি তোমার চেয়ে শতগুণে খারাপ।" এই কথা গুলা বলতেই আইভনের মনটা যেন হাল্কা হয়ে গেল, বাড়ী ফিরে যাবার ইচ্ছাও তার বড় রইল না। কারাগার ছেড়ে যেতেও ইচ্ছা হ'ল না। সে কেবল বসে রইল শেষ দিনের আশায়।

আইভন যাই বলুক, মাকার তার নিজের সব দোষই স্বীকার করল।

মুক্তির আজ্ঞা এল, কিন্তু তার আগেই মৃত্যু এসে আইভনকে নিয়ে যায়।

(টলষ্টয় হইতে)

উপবন। শ্রীসুধাংশুকুমার রায়ের একখানি Wood cut।

কাঠ খোদাই (wood-cut) চিত্রে শ্রীমান্ সুধাংশু কুমার রায়

ডাঃ শ্রীসুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় এম, এ, ডি,লিট,

বর্ত্তমান বাংলার শিল্প ক্ষেত্রে যে সকল তরুণ শিল্পী স্বকীয় প্রতিভা বিকাশের দ্বারা আধুনিক ভারতীয় শিল্প ধারার গঠন, সম্ভবপর করিয়া তুলিয়াছেন ; শ্রীমান সুধাংশু কুমার রায় তাহাদেরি একজন। তরুণ ভারতীয় শিল্পীদিগের মধ্যে তিনি বিশেষ প্রতিভা সম্পন্ন এবং ভবিষ্যতে যে আরও উন্নতি করিতে পারিবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। ভারতীয় প্রাচ্য কলা সমিতির তিনি একজন প্রাক্তন ছাত্র। ছাত্রাবস্থায় তিনি শিল্পাচার্য্য অবনিন্দ্র নাথ ঠাকুর, গগনেন্দ্র নাথ ঠাকুর, ক্ষিতীন্দ্র নাথ মজুমদার ও চঞ্চল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতির সংস্পর্শে আসেন এবং তাঁহাদের ভাবধারার সহিতও তাঁহার পরিচয় ঘটে।

কলিকাতার সরকারি শিল্প বিদ্যালয়ের বর্ত্তমান প্রধান শিক্ষক, নিপুন কাঠ খোদাই (wood-cut) শিল্পী শ্রীযুক্ত রমেন্দ্র নাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয় যখন কিছুদিন পূর্ব্বে মসুলীপট্টমে অন্ধ্র জাতীয় কলাশালার চিত্র বিভাগের অধ্যক্ষ ছিলেন তখন শ্রীমান্ সুধাংশু কুমার রায় মসুলীপট্টমে তাঁহার নিকট দুইবৎসর চিত্র বিদ্যা শিক্ষা করেন। বিশেষ করিয়া গুরুর নিকট হইতে তিনি কাঠ খোদাই (wood-cut) পদ্ধতিটিও শিক্ষা করিয়াছিলেন। এবং এই বিষয়ে যে বিশেষ দক্ষতা লাভ করিয়াছেন তাহাতে সন্দেহ নাই।

বর্ত্তমান প্রবন্ধে শ্রীমান সুধাংশু কুমার রায়ের কয়েক খানি কাঠ খোদাই (wood-cut) চিত্র প্রকাশিত হইল। এই ক্ষেত্রে যদিও তাঁহার এই প্রথম প্রচেষ্টা তথাপি এই সকল চিত্র হইতেই, শিল্পীর বিষয়—বস্তু নির্ব্বাচনে বিজ্ঞতা এবং কাঠ খোদাইয়ের (wood-cut) সুকঠিন পদ্ধতিতে গভীর নৈপুণ্যের পরিচয় পাই এবং ইহা হইতেই

শিল্পী শ্রীসুধাংশুকুমার রায়।

শিল্পী শ্রীসুধাংশুকুমার রায় কর্ত্তৃক একখানি লিনোলিয়মের উপর খোদিত প্রতিকৃতি।

হংস। শিল্পী শ্রীসুধাংশুকুমার রায়ের খোদিত একখানি Wocd-cut।

ডাকবাংলো। শিল্পী শ্রীসুধাংশুকুমার রায়ের খোদিত একখানি Wood-cut।

শিল্পীর উজ্জ্বল ভবিষ্যতের কল্পনা করিতে পারি।

ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউটের গত শিল্প প্রদর্শনীতে ইহার একখানি কাঠখোদাই (wood cut) চিত্র সর্ব্বশ্রেষ্ঠ (Best picture in the exhibition in any medium) বিবেচিত হয় এবং তাঁহাকে এক খানি স্বর্ণ পদক পুরস্কার দেওয়া হয়। এতদ্ভিন্ন কলিকাতা মাদ্রাজ, লক্ষ্ণৌ প্রভৃতি অন্যান্য বড় বড় সহরের শিল্প প্রদর্শনীতেও ইহার কাঠ খোদাই (wood-cut) চিত্র, কলা-রসিকদিগের নিকট বহু সমাদর ও পুরস্কার লাভ করিয়াছে।

লিনলিয়ামের (Linoliam) উপর খোদাই করিয়া ইনি অনেকগুলি প্রতিকৃতি অঙ্কিত করিয়াছেন। বিশেষ করিয়া এই সকল প্রতিকৃতি অঙ্কনেই শিল্পীর প্রকৃত শক্তির প্রকাশ পাইয়াছে। প্রত্যেকটী প্রতিকৃতিতেই চরিত্রের বৈশিষ্ট অপূর্ব্ব-রূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে। যতদূর আশা করা যায় এই সকল সুন্দর প্রতিকৃতিগুলির প্রত্যেকটিই প্রাণবান ও পূর্ণ শক্তি-শালী করিয়া অঙ্কিত হইয়াছে কিন্তু শিল্পী কোথাও তাঁহার শক্তির অপচয় ঘটিতে দেন নাই।

প্রাকৃতিক দৃশ্য ও বৃক্ষ ইত্যাদির অঙ্কনেও শিল্পী প্রতিকৃতি অঙ্কনের ন্যায়ই গভীর দক্ষতা লাভ করিয়াছেন। সাধারণতঃ আলঙ্কারিক (Decorative) পদ্ধতিই এই সমস্ত চিত্রে ব্যবহৃত হইয়াছে।

গ্রামের মেয়ে। শিল্পী শ্রীসুধাংশুকুমার রায় কর্তৃক লিনলিয়মের উপর খোদিত একখানি প্রতিকৃতি।

আশাকরি আমাদের দেশের কলা রসিকেরা তরুণ শিল্পী শ্রীমান সুধাংশু কুমার রায়ের কাঠ খোদাই (wood-cut) ক্ষেত্রে এই প্রথম প্রচেষ্টাগুলিকে শ্রদ্ধায় ও সহানুভূতির চক্ষে দেখিবেন।*

* শিল্পী শ্রীসুধাংশুকুমার রায় মহাশয় তাঁহার কাঠ খোদাই (wood cut) চিত্রের শীঘ্রই একটি 'Album' বাহির করিবেন। বর্ত্তমান প্রবন্ধ তাহার ইংরেজি ভূমিকার অনুবাদ। [বঃ সঃ

ত্রিস্রোতা-তীরে

শ্রী যতীন্দ্র সেনগুপ্ত

ফিরে যাব ঘরে আজিকার মত তীরে নাই তরী বাঁধা ;
সার হ'ল শুধু সারাদিন মোর আঁখি-নীরে শুধু কাঁদা।
নদী-কূলে আজ কাটায়েছি বেলা একা একা ঢেউ গণি',
আজি অশ্রান্ত শুনেছি কেবল কল-কল্লোল ধ্বনি।
বাতাসের মুখে কাণ পেতে শুধু শুনেছি ঝাউয়ের বাঁশী,
মেঘল আকাশে তপনের মুখে হেরেছি মলিন হাসি।
পথের দু'পাশে দেখেছি কুমুদ নয়ন রয়েছে মুদি',
লজ্জাবতী সে গুণ্ঠন টানি' দুয়ার দিয়েছে রুধি'।
ঘরে যাব আজ ফিরে,—
আর বাজাবনা এমন করিয়া বুকফাটা বাঁশীটিরে।

কাঁকণ বাজায়ে আজিকার সাঁঝে নামিল না কেহ ঘাটে ;
নয়ন বৃথাই খুজিয়া ফিরিছে তা'রে এ শূন্য বাটে।
ওই দূর মাঠে ঘনায়ে আসিছে কাজল আঁধার রাতি ;
একলা যামিনী যাপিতে যে হ'বে নাহিক বাসর-সাথী !
যত তরী আজ এসেছিল বেয়ে, চলে গেল তারা দূরে ;
কিনারে কেহ ত ভিড়াল না তরী মোর বাঁশরীর সুরে।
কোন তরণীতে কবে সে আসিবে, জানি না কে প্রিয়া মোর,
তরী বেঁধে হেথা নদী পানে চেয়ে কাঁদিব জীবন ভোর।

সমাজের গলদ

শ্রী সুরমা সুন্দরী ঘোষ

বহুদিন হইতেই সমাজ সংস্কার, সংস্কার বলিয়া জোর গলায় ঢকাধ্বনি শুনিয়া আসিতেছি, তার ফলে ২০।২৫ বৎসরের মধ্যে সমাজের উন্নতি হইয়াছে অনেক কিছু তন্মধ্যে স্ত্রী-শিক্ষাই আরোহণ করিয়াছে সর্ব্বোন্নত স্তরে। এটা খুবই সুলক্ষণ বটে। কিন্তু কতকগুলি মহদ্‌গুণ যে সমাজের স্কন্ধে সিন্ধবাদ নাবিকের মত চাপিয়া বসিয়া আছে তাহা কিছুতেই নামিতেছে না কেন ? আমরা যত গলাবাজি করি সেটা হইতেছে সাময়িক, তার গোড়ায় রহিয়াছে শক্ত সার মাটি, কাজেই মূল উৎপাটন হয় না, দুদিনের আলোচনা আন্দোলনের টানাটানিতে ডালপালা ছিঁড়িয়া যায়, আবার আস্তে আস্তে দু'দিন পরেই অঙ্কুর গজাইয়া উঠে। আলোচ্য বিষয়ের প্রধান একটি হচ্ছে বরপণ বা পুত্র বিক্রয়। যাহারা স্বদেশী-ব্রতে খদ্দর-ধারী তাঁহারাই আবার বিবাহ ক্ষেত্রে বিলাতি বসনভূষণের দান সামগ্রী ও পাঁচ হাজার দশ হাজারের দাবী করিতে কুণ্ঠিত হন না।

"স্নেহলতার" আত্মবিসর্জ্জনের পর এ আন্দোলন হইয়াছিল খুবই প্রবল বেগে, কাজেই পণপ্রথাও কমিয়া আসিয়াছিল, সে সময় অনেক ছেলেরাই প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছিল, পণ নিয়া বিবাহ করিবে না ; সেজন্য ছেলের পিতারাও বাধ্য হইয়াছিলেন রজতখণ্ডের আশায় জলাঞ্জলি দিতে। ফলতঃ পণ প্রথাটা ছিল ধামা চাপা এখন আবার আস্তে আস্তে ধামা খোলা হইতেছে।

পূর্ব্বে বৈবাহিক ব্যাপারে ছিল প্রচলিত কৌলিন্য প্রথা। কুলিনের ছেলে ও মেয়েকে কুলমর্য্যাদা স্বরূপ পণ দিতে হইত। তখন কুল ছিল বংশগত, এখন হইয়াছে তাহা বিদ্যাগত কিন্তু সেটা মেয়ের বেলা নহে, শুধু ছেলের

বেলা। আধুনিক মেয়েরা ছেলেদের চেয়ে বিদুষী কম নয়, তাহারাও বি,এ, এম এ, পাশ করে কিন্তু বিয়ের বাজারে সেজন্য দাম বাড়ে না, বরং যৎসামান্য দাম আছে বলিয়াও কেহ গ্রাহ্য করে না, কিন্তু পুরুষের বিদ্যার মূল্য দ্বিগুণ,:আই,সি,এস,আই,এম, এস, হইলে তো চতুর্গুণ মূল্য নির্দ্ধারিত হইয়া থাকে। বড়ই আশ্চর্য্য ও ক্ষোভের বিষয়, উচ্চ শিক্ষা লাভ করিয়া বিলাত প্রত্যাগত যুবকেরাও সুন্দরী শিক্ষিতা মেয়েদের প্রত্যাখ্যান করেন টাকার বন্যার আকর্ষণে। যে দেশে নারীর গুণের আদর নাই সে দেশের পতন অবশ্যম্ভাবী।

এক্ষেত্রে কন্যার পিতারা প্রতিজ্ঞা করুন বরপণ দিয়া কন্যাদান করিবেন না ; আর কন্যারা তাঁহাদের গুণের মূল্য আছে কিনা দেখাইতে চেষ্টা করুন নিজ পায়ে দাঁড়াইয়া,—বিবাহ শৃঙ্খল হইতে মুক্ত থাকিয়া।

—যে রুমাল খানা হারিয়ে গেল—

শ্রী অমিয় জীবন মুখোপাধ্যায়

যে রুমাল খানি আমার হারিয়ে গেল, সেখানি ছিল তোমারি দেওয়া।

অপরের কাছে এই রুমাল খানির কোনোই মূল্য ছিল না—কারণ রুমাল খানা ছিল অত্যন্তই সাধারণ। এবং এতো সাধারণ যে কোনো মেয়েই তা'র প্রিয় কাউকে এরকম রুমাল উপহার দেবার জন্যে তৈরি ক'রেছে বলে দেখা যায় নি! একটি লতা নেই, একটি পাতা নেই, একটি ফুল নেই,—লাল নেই,নীল নেই, সবুজ হলদে নেই, বেগুনে নেই, গোলাপী নেই,—শুধু সাদা একখানি অতি সাধারণ রুমাল। তোমার দেয়া রুমাল খানিকে আমি বেলি ফুলের সাথে তুলনা করেছিলুম—বাইরে থেকে তার কিছুই নেই, অথচ সে আপনার অন্তরের সম্পদে আপনি পূর্ণ। মানুষের মন ভোলাবার তার কোনো আয়োজনই নেই, আর ঠিক সেই কারণেই যেন সে মানুষের মন এক মুহূর্ত্তে হরণ করে।

তুমি যেদিন আমায় রুমালখানি দাও সেদিনটির কথা আমার মনে পড়ে। দশদিন ধ'রে অনবরত বৃষ্টি, বাসা থেকে এক পা কোথাও বেরুতে পারি নি। ঘর দোর রাস্তা ঘাটের সাথে সাথে শরীর মনও ঠিক একই রকম স্যাঁত সেঁতে হ'য়ে উঠেছিল—বিকেলের দিকটাতে আবারো আকাশের মুণ্ডপাত করলুম। দিদি তো ভীষণ বিরক্ত গিয়ে এমন কথাই বলে বস্‌লো যে, আজকে যদি রাত্তিরের ভেতরেই বিষ্টি না থামে, তা হালে—

আমার মন ভীত হয়ে উঠ্‌লো, দিদি বুঝি আকাশটাকে একেবারে রসাতলে পাঠিয়ে দেয়। কিন্তু ঐ 'তা' হলে' পর্য্যন্ত বলেই দিদি গর্‌গর্‌ করতে লাগ্‌লো, আর কিছু বল্‌তে পার্‌লো না। জানি না মনে মনে আকাশকে সে কোনো অভিশাপ দিল কি না।

আকাশ কিন্তু দিদির ক্রোধে বাস্তবিকই ভয় পেয়ে গিয়েছিল—রাত্তির আর লাগলো না, সন্ধ্যের পর থেকেই তার মুখ-ভার কেটে যেতে লাগলো!

দশটা দিনের পর!

এমন তো আমি কিছুতেই আশা করতে পারি নি...!

জ্যোৎস্না কি এমন সুন্দরও হয়? আমার এই অল্প দিনের যৌবনেও আমি অনেক পূর্ণিমার রাত্তির দেখিছি, কিন্তু সেদিন যেমন দেখ্‌লুম, এমন তো আর দেখিনি! এই ক'টা দিন কি একটা গভীর দুঃস্বপ্নের ভেতর দিয়েই কাট্‌লো—উঃ কি তিক্ত হ'য়েই উঠেছিলুম! প্রথম দিনদুই ভালো লেগেছিল—বেশ ভালো লেগেছিল। বাইরে ঝিঁঝির ঝিমি-ঝিমি—আর একলা শুয়ে শুয়ে তোমাকে নিঃশেষ ক'রে মনের ভেতর অনুভব ক'র্‌বার চেষ্টা—এ দু'য়ে মিলে আমাকে যেন নিয়ে গিয়েছিল এক গানের রাজ্যে—কোন্ সুদূরে

এক মায়ালোকে! রাত্রের শয়ন এতো মধুর আর কখনো আমার হয়নি।

কিন্তু স্বপ্ন টুটে সহসা এলো এক দুঃস্বপ্ন। উঃ, ঘরগুলি ভিজে উঠ্‌লো। রদ্দুরের অভাবে কাপড় গুলি শুকোনো গেল না—সেগুলি উঠ্‌লো প'চে। বাজারে যাওয়ার জো নেই, দোকান যাওয়ার জো নেই, পথ ঘাট মাঠ সব গেল ভেসে। ঠাণ্ডা লেগে দিদির হ'ল ইনফ্লুয়েঞ্জা, আমার হ'ল খুশ্‌ খুশে কাশীর মতন্‌। ডাক্তারের কাছে যাওয়ার জো নেই—গাড়ী বন্ধ, ঘোড়া বন্ধ, সব বন্ধ! জুতো গুলো ভিজে —পা ঢোকাতে গায়ের ভিতর শিম্‌ শিম্‌ ক'রে ওঠে; বামুন ঠাকুর দু' দুবার দারুণ আছাড় খেয়ে উঠ্‌লো রান্না ঘরের সামের বারান্দায় পিছ্‌লে পড়ে!

এমনি জঘন্য কয়টা দিনের পরমুহূর্ত্তের এমন সুন্দর পূর্ণিমা!

হাজার দেশের রাজপুত্তুর রাজকন্যারা যেন হাজার বছর ধ'রে পাথর হ'য়ে ছিলো। কোথাকার এক অজানা দেশের অচেনা কে যেন এসে একটি সোণার কাটির ছোঁয়ায় সবাইকে বাঁচিয়ে দিলো। দৈত্য যে মায়ার বলে সবাইকে এমনি ঘুমে ঘুম পাড়িয়ে রেখেছিল তা' যেন ধোঁয়া হ'য়ে মিলিয়ে গেল। চারিদিকে সাড়া প'ড়ল।

দিদি বল্‌লো—আঃ বাঁচলুম!

যে যৌবন এমন আশ্চর্য্য, এমন সুন্দর, এমন মোহন ক'রে আমার চোখের সামে এই জ্যোৎস্নাকে তুলে ধর্‌লো, তা'র প্রতি শ্রদ্ধার আর আমার অন্ত রইলো না।

কেমন যেন একটু ইচ্ছে হ'ল তোমাদের বাসা থেকে বেড়িয়ে আসি। এই সুন্দর ক্ষণটিতে তোমার দিদিমার কথা আমার ভুল হ'য়ে গেল, তোমার যে পড়াশোনায় ব্যাঘাত হতে পারে সে কথা ভুল হয়ে গেল, তোমার সাথে একটু নিরালায় এখন আদৌ সাক্ষাৎ হওয়া সম্ভব কিনা, এটা রওনা হবার পূর্ব্বে একটু ভাববার কথাও ভুল হয়ে গেল!

কিন্তু কি আশ্চর্য্য! ঈশ্বর কি এই মুহূর্ত্তটিকে আমারি জন্যে সৃষ্টি করেছিলেন?

তোমাদের বাসায় ঢুকতেই তোমাকে দেখতে পেলুম বাইরের ঘরেই—কি একখানা কাগজ নাড়াচাড়া করছিলে।

আমাকে এমন সময়ে হঠাৎ দেখে আনন্দে একেবারে ভেঙে পড়বার মতন হয়ে জিজ্ঞেস করছিলে,—একি স্বপ্ন দেখছি নাকি?

আমি স্বল্প হেসে বলেছিলুম—ভেতরে যাবে না? বাবা কোথায়?

তুমি বল্লে,—বাবা এই বেরিয়ে গেলেন, কোথায় তাঁর একটা কাজে, আসতে দেরি হবে। আর দিদিমা ওপরে, শুয়ে শুয়ে মহাভারত পড়চেন। ভেতরে যাবে? চলো,— আর গিয়েই বা কি হবে, এখানেই বোসো না। দিদিমা আবার কটমটিয়ে চাইবেন।

কি দুষ্টুই ছিলে তুমি! সত্যি, তোমার বাবাকে ক'বে আমার সঙ্কোচ ছিল না—তিনি যে আমায় স্নেহ কর্‌তেন খানিকটা রেখে করতেন না, সবটুকুই কর্‌তেন। তোমাকে করে যেদিন প্রথম আমি সঙ্কোচ করি, তা'তে সেদিন তিনিই আমাকে তিরস্কার ক'রেছিলেন। মনে পড়ে,..., সেই প্রথম পরিচয়ের পরে ভাই ফোঁটার দিনকার কথাটা? আমি তোমার ভাই, তুমি আমার বোন্‌— দিদিমার এতো সাবধানে আমাদের দুজনকে এ হেন নিরাপদ জায়গায় দাঁড় করানটাও এমন মারাত্মক হ'য়ে উঠ্‌লো কেমন ক'রে? তাঁরি অমন সতর্ক দৃষ্টির সামেও আমার কপালে ফোঁটা দেবার সময়েই বা তোমার ক'ড়ে আঙলটি অমন কে'রে কেঁপে উঠ্‌লো কেন। আর তোমার হাত থেকে মিষ্টির পালা খানি নেবার সময়েই বা আমার কান দু'টো অত লাল হ'য়ে উঠেছিল কেন? সেই লালের গরম দিদিমা অনুভব করতে পার্‌লেন না? ঠাট্টা ক'রে একবার কাণে একটু হাতও তো দিয়েচিলেন!

সত্যি...,কেবলি ভাবি, তোমার বাবা কি ভালো মানুষই ছিলেন! লক্ষ মানুষের মাঝে ছিলেন তিনি একলা একটি মানুষ!

আর তোমার দিদিমাটি! উঃ, যমের মার মতো ভয় ক'রতে ইচ্ছে হ'ত আমার তাঁকে। তোমাদের বাড়ীতে একটু বেড়াতে এলেই তাঁর ঘন ঘন নিষ্ঠুর. উগ্র, বক্র কটাক্ষ, আমাকে যেন একেবারে উদ্‌ভ্রান্ত ক'রে তুল্‌তো। প্রথম প্রথম তো এমনতর ছিলেন না, কিন্তু তাঁর মনের ওপর কালো ছায়া ঘনিয়ে যে এলো কবে থেকে,—হাঁ, মনে

আছে; তুমি আর আমি ঘরে ব'সে গল্প ক'র্‌ছিলুম একদিন,—সে গল্প যেন আর ফুরোচ্ছিলই না—সে গল্প থেকে দুনিয়ার কোনো কিছুর বিষয়ই বাদ যাচ্ছিল না,ঠিক! কিন্তু বেচারি দিদিমা! সইতে আর কতো পার্‌বেন—বুড়ো মানুষ! বারে বারে ডাক দিতে লাগ্‌লেন, বাইরে ব'সে তাঁর সাথে একটু গল্প করার জন্যে। যাচ্ছি, যাচ্ছি, করেও যখন নিতান্তই অনাবশ্যক দেরী কর্‌ছিলুম, তখন হুড়মুড় ক'রে নিজেই ঢুকে পড়্‌লেন ঘরে। ঠিক সেই মুহূর্ত্তটিতেই কি একটা কথার পৃষ্ঠে তুমি মুখে আঁচল চাপা দিয়ে খিল খিল ক'রে হাস্‌ছিলে।

আমার সামে তোমার একটু মুচ্‌কি হাসি, তোমার যৌবন নন্দিত দেহের একটু গতি চাঞ্চল্য, বিশাল খোঁপাটির বারে বারে খুলে যাওরা রূপ অবাধ্যতা। এ সবের সাথে, আর আমার তোমাদের বাড়ীতে একটু বেড়াতে যাবার সাথে কি অদৃশ্য সম্বন্ধ ছিলো, তা' দিদিমাই জান্‌তেন। দিদিমার কাণ্ড দেখে অনেক সময়ে আমার হাসি পেত, কৌতুক বোধ হ'ত!

তবুও ভাবতুম, আর তোমাদের বাসায় যাবো না—বাস্তবিকই দিদিমা কি মনে করেন, কি বিশ্রী! এক সপ্তা' কাল যেতুম না—অম্নি আসতো তোমার একখানা চিঠি—একখানি গন্ধভরা গোলাপী খাম! দিদি একদিন তোমার একখানি চিঠি খুলে ফেলেচিল আর কি!

অত ক'রে আমাকে তোমর কাছে অবিশ্যি অবিশ্যি যাওয়ার জন্যে তোমার অনুরোধটুকু—আমি গেলে তোমার ভালো লাগে—এই কথাটুকু—কি মিষ্টিই যে লাগ্‌তো!

সেদিনের সেই জ্যোৎস্না রাত্রে অনেকক্ষণ তুমি আর আমি পাশাপাশি ব'সে ছিলুম, আকাশ সেদিন তা'র সমস্ত সৌন্দর্য্য-সম্পদ দিয়ে আমাদের দু'জনকে একসাথে আশীর্ব্বাদ ক'রেচিল।

সেই সময়টুকুর কথা আমার এতো মনে আছে!

আমি ব'লেচিলুম, দিদিমার মতো বয়েস হ'লে তুমিও ঠিক ওই রকমই হবে। তোমার নাতী নাতনীকে সর্ব্বদা তুমি সন্দেহ ক'র্‌বে—আর পদে পদে চালাবে তা'দের ওপর উৎকট শাসন।

হেসে উত্তর ক'রেচিলে আঁা, কি ব'ল্লে? ফের বলতো?

তারপরে বলেচিলে, দ্যাখো তিরিশ বচ্ছরের,—আচ্ছা, পঁয়ত্রিশ বচ্ছরের ওধারে (ত্রিশেও তেমন নয়, কিন্তু পঁয়ত্রিশের পরের বয়সকে আর যৌবন কাল বলা চলে না—এই বোধ হয় তুমি ভেবেছিলে) আমার আর বাঁচ্‌বার ইচ্ছে নেই। আমার দিন তো আসচে ফুরিয়ে। যা'রা নবীন হ'য়ে দেখা দেবে, তা'দের দিকে হিংস্র দৃষ্টিতে তাকানোর চিন্তাও আমার কাছে লজ্জা। একটি ছেলে বা মেয়ে পরস্পরকে ভালোবাস্‌লো—তা'দের এই মধুর অপরাধ যে বয়েসে আমি ক্ষমার চোখে দেখ্‌তে না পার্‌বো—সে বয়স আস্‌বার আগেই যেন আমার মাথায় বজ্রপাত হয়।

আমি হাসতে হাস্‌তে ব'লেচিলুম, তা' একটু লিবারেল্ হ'য়েই না হয় বুড়ো বয়েস পর্য্যন্তই বেঁচে থেকো! পঁয়ত্রিশ বছর তো এমন একটা—

বাধা দিয়ে তুমি ব'ল্লে, না, লিবারেল হ'য়ে বুড়ো বয়স পর্য্যন্ত বেঁচে থাকা যায় না। যৌবন এমনি কাল যে শৈশব বল, কৈশোর বল, প্রৌঢ়ত্ব বল, বার্দ্ধক্য বল—জীবনের সমস্ত কালই তা'কে ঈর্ষ্যার চোখে দেখে। এ দেখ্‌বেই—না দেখে পারে না। আর একটা মজার জিনিষ কি জানো, বুড়ো হ'য়ে যে লোক যৌবনের কোনো আতিশয্যকে নিরস্ত কর্‌তে চেষ্টা করে, সে তা'র মঙ্গল কামনার জন্যে সেটা করে না, সে শুধু করে তার নিজেরি অক্ষমতার জন্যে। যৌবনের আনন্দ লোকের অধিবাসীদের সে হিংসার চোখে দেখে, তাদের উচ্ছৃঙ্খলতা দেখে সে মনে মনে মুষড়ে শুকিয়ে যায়। যৌবনের পরিপূর্ণ উচ্ছ্বাসের সামে তা'রা ট্যান্টা-লাসের মতো!

আমার জীবনে কোনোদিন আমার এতোটা অধঃপতন আমি কিছুতেই সহ্য কর্‌তে পার্‌বোনা—কিছুতেই না।—

আমি তোমার মুখের ওপর দৃষ্টি রেখে মৃদু হেসে ব'লে চিলুম,। আচ্ছা মনস্তত্ত্ববিৎ, এখন ওসব থাক্। তারপরে একটু পরে আবার জিজ্ঞেস ক'রে চিলুম, আচ্ছা, এখন কি কর্‌তে ইচ্ছে হচ্চে তোমার।

তুমি আস্তে আমার কাঁধের ওপর মাথাটি এলিয়ে দিয়ে বলেচিলে, বলব, কি ইচ্ছে হ'চ্চে? শোনো তা'হলে।

আকাশ ভরা এমন আলোর উৎসব। আমার যেন কেমন লাগ্‌চে, আমার এম্নি ভাবে ম'রে যেতে ইচ্ছে হ'চ্চে। সত্যি আমার মর্‌তে ইচ্ছে হ'চ্চে—

সেদিন আমি হেসে ছিলুম, কিন্তু আজ আমার কান্না আসে। চাঁদের আলোরি অংশ ছিলে তুমি, তোমাকে কি ধ'রে রাখা যায়! স্বর্গের কোনো দেবকুমার হয়তো তোমায় আকাঙ্ক্ষা ক'রেছিলো, তাই তুমি সেদিনকার মতনই আরেক চাঁদিনী রাত্রে আকাশের অনন্ত আলোর মাঝে মিলিয়ে গেলে! ত্রিরিশ বছরের বা পঁয়ত্রিশ বছরের পরের বয়সে বাঁচ্‌বার অগৌরব তোমায় ব'ইতে হ'লো না, পার্থিব দেহ মন নিয়ে আমাকে ভুল ক'রে ভালোবেসে আমার স্পর্শ হয়তো তোমায় অশুচি ক'রেছিল, তা'র অপমান তোমায় আর অধিক দিন সইতে হ'লো না।

অনেকক্ষণ তোমার কাছে কাটিয়ে উঠে আস্‌বার সময়ে তুমি আমায় এই রুমালখানি দিয়েছিলে। ব'লেছিলে, চাঁদের শুভ্র আলোর সাথে রুমালখানা বড়ো মিলে গেচে —না? আজকের রাত্তিরের স্মৃতি ব'লে রেখে দিয়ো।

আমি বেরিয়ে এলুম, তোমার দিদিমা তখনো মহাভারত পড়্‌ছিলেন। তুমি দু'খানা মোটা মোটা বই খামখা হাতে করে নিয়ে যেন কতো গম্ভীরমুখে ওপরে উঠে গেলে—কি দুষ্টু!

আরম্ভেই পরিসমাপ্তি ঘট্‌তে পারে—যে কোনো জিনিষের সম্বন্ধেই আমার এমন ধারণা ছিল না, তোমার সম্বন্ধে তো একেবারেই না! তুমি ছিলে সুন্দর, তোমার আবার সমাপ্তি কোথায়? চিরদিনই তো তোমার আরম্ভ! আরম্ভই যে শেষ হবার কথা নয়।

তাই আমি কেবল প্রতীক্ষাই ক'রে চলেছিলুম—নিজের ব্যস্ততায়, তোমায় সঙ্গলাভের পরম মুহূর্ত্তগুলির মাধুরীকে হত্যা ক'রে ফেল্‌তে মন সরেনি। তাই তোমার কাছ থেকে কোনোদিনই কিছু চেয়ে নিইনি।

সেদিনকার রাত্রিকে স্মরণ ক'রে রাখ্‌বার জন্যে তুমি আমায় এই রুমালখানি দিয়েছিলে, সেদিন ওই রুমালখানায় কোনো দামই আমি দিই নি তেমন ক'রে! কত শত পুর্ণিমার স্মৃতি আমাদের দু'জনের জীবনের অক্ষয় সম্পদ হ'য়ে থাক্‌বে, ওই রাত্রিটা যতো সুন্দরই হোক, ওটাই তো একমাত্র নয়।

তখন কি ভেবেছিলুম, ওই রুমালখানি আমার কাছে এতো শীগ্‌গির এমন নিষ্ঠুরভাবে অমূল্য হ'য়ে দাঁড়াবে?

তোমার একখানি ফটো আমার কাছে নেই,— কিছুই নেই! শুধু ওই রুমালখানা! সকলের অবহেলার বস্তু কেবলমাত্র ওই সাদা, অত্যন্ত সাধারণ রুমালখানা!

কলেজ থেকে ফিরে এসে কি একটা জিনিষ বে'র ক'র্‌বার জন্যে সুটকেশটা খুল্‌লুম। অভ্যাসমতো তোমার রুমালখানা খুলে দেখ্‌তে চাইলুম।

কিন্তু রুমাল? রুমাল তো নেই! তোয়ালেখানার নীচেই তো ছিলো রুমালখানা! তোমার রুমাল নেই? আমার সেই স্মরণীয় রাত্তিরের চাঁদের আলোটুকু নেই? আমার বিশ্বাস ক'র্‌তে প্রবৃত্তি হ'লো না।

ধীরে ধীরে প্রত্যেকটি জিনিষ নাবাতে সুরু ক'র্‌লুম। তোয়ালেখানা নাবালুম, সদ্য ধোবাবাড়ী থেকে আসা দুটো সার্ট, তিন খানা ধুতি নাবালুম। ডান দিকেই ছিল মেরি ষ্টোপ্‌স্‌ ও ডাক্তার রবিন্সনের দু'খানি বই, এক বন্ধুর কাছ থেকে প'ড়তে এনেছিলুম। বই দু'খানা নাবালুম। এক খানা রাইটিং প্যাড ও কতগুলি কাগজ পত্তর তা'র পাশে ছিলো, সেগুলি নাবালুম! একে একে সুটকেশের প্রত্যেকটি জিনিষ নাবিয়ে ফেল্‌লুম, কিন্তু তোমার রুমাল নেই!

সহসা মনে হ'ল রুমালখানা কাপড়, জামার ভাঁজগুলির ভেতরে গিয়ে ঢোকেনি তো? ওগুলো খুলে ফেলে বেশ ক'রে ঝেড়ে দেখ্‌লুম—নেই!

সযত্নে বিছানাটি একটি একটি ক'রে তুলে ফেলেচি— তার নীচে যদি ভুল ক'রে কখনো রেখে থাকি।

খাটের নীচ দেখেচি, আলমারীর পেছনটা দেখেচি— টেব্‌লের ওপরকার বইখাতা সব সারিয়ে দেখেচি— আমার ছোট ঘরটির আনাচ কানাচ তন্ন তন্ন করে দেখেচি; কিন্তু বৃথা!

সেল্‌ফের ওপর আমার সখের ক্যামেরাটি র'য়েচে; কতগুলি বোর্ড, কয়েক ডজন নেগেটিভ প্লেট, ফ্রেম, কাঁচের গেলাশ, ডিশ, লণ্ঠন, ওষুধ পত্তর—ইত্যাদি দিয়ে

সেল্ফ্‌টি একেবারে ভর্ত্তি। সেখানটায় রুমালখানির যাবার বিন্দুমাত্রও সম্ভাবনা ছিল না। কিন্তু আমার অবুঝ মন! একে একে সেগুলিও পরীক্ষা কর্‌লুম, নেড়ে চেড়ে দেখ্‌লুম। রোডিন্টালের শিশিটার কর্ক বুঝি ভালো করে আঁটা ছিলো না—হাতের ঠেলা লেগে কা'ত হ'য়ে প'ড়ে এক বিশ্রী কাণ্ড ঘ'ট্‌লো!

দিদি অনেক সময়ে আমার অনেক জিনিষ আমায় না ব'লে নিয়ে থাকে। মনে হ'ল, দিদি তো নেয় নি? তৎক্ষণাৎ দিদিকে গিয়ে জিজ্ঞেস কর্‌লুম, কিন্তু দিদি রুমাল-খানার কথা কিছুই বল্‌তে পার্‌লো না। কতবার বল্লুম, লক্ষ্মী দিদি, নিয়ে থাকিস্ তো দিয়ে দে, এই রুমাল নিয়ে কিই বা করবি তুই বল্‌তো!

দিদি বল্‌লো, আহা, বল্‌চি যে নিইনি—রুমাল আমার কাছে নেই কিনা! আর গেচে একটা রুমাল তো গেচেই। চাস্ তো আমি তোকে এখুনি একটা, একটা কেন দুটোই দেবো 'খন। রুমাল এমন কিছু মহামূল্য সামগ্রী নয়।—

আমি চলে এলুম। রুমাল মহামূল্য সামগ্রী নয়—দিদি ব'ললো, কিন্তু আমার মনই জান্‌লো শুধু যে সে কথা কতদূর সত্যি। তোমার রুমাল আমার কাছে মহামূল্য নয় - একথা পার্ট ইকোয়াল টু দি হোল্ এর চাইতেও অনেক—অনেক বেশী অ্যাব্‌সার্ড। দিদি হয়তো সেই রুমালখানা দিয়ে অনায়াসে হারিকেন্‌ও সাফ কর্‌তে পার্‌তো, কিন্তু আমি সেখানায় একটি চুমু দিতেও একটু কুণ্ঠিত হ'তুম।

দিদি দুপুরবেলা ঘুমিয়েচে। আমি তা'র চাবিটা কলে কৌশলে হাত করলুম। চুপি চুপি গিয়ে তার বাক্সটা খুল্‌লুম। কোনো ভাবে যদি তা'র বাক্সের ভেতরে থেকে থাকে—হয়তো আমি রুমালখানা এক সময়ে দেখ্‌তে গিয়ে ভুল ক'রে বাইরে ফেলে রেখেছিলুম, আর তুলিনি। দিদির কাপড় চোপড় বা কোনো কিছুর সাথে যদিই তা'র বাক্সের ভেতরে চ'লে গিয়ে থাকে!

দিদির ট্রাঙ্কটা যে কি দিয়ে ভর্ত্তি নয় তাই ভাবি। উঃ, একজন মানুষের এতো কাপড়ও প'রতে লাগে। কাপড়-গুলোর নামও আমি জানিনে। কাপড়গুলো থাক্, তা'র বাক্সের ভেতর আরো যে কতো সব সৌখীন জিনিষ র'য়েচে—তার বেশীর ভাগেরই নাম আমি জানি না। দিদির এমন চমৎকার ক'রে গোছানো জিনিষ পত্র এমন ক'রে ওল্টাতে ভয় ক'র্‌তে লাগলো, তবুও যথা সম্ভব দেখলুম॥

দিদির ডজন খানেক রুমাল শেষ হ'য়ে গেচে, আরো তৈরি ক'রচে—সবগুলি শেষ হ'লে আমাদের সবাইকে দু' দুখানা—আর যা'র আব্দার বেশী তাকে তিন খানা ক'রে উপহার দেবার তা'র ইচ্ছে। দিদির হাতের কাজগুলি কি চমৎকার! প্রত্যেকখানা রুমাল সযত্নে ভাঁজ ক'রে এক কোণে রেখে দিয়েচে, তার এক খানাও এদিক ওদিক হয় নি।

আমি কি তোমার রুমাল খানা এর চাইতে এতটুকুও কম যত্নে রেখেছিলুম? আর তা তো কারুরি নেবার কথা নয়, অন্যের কাছে এর তো কোনো দামই নেই, সকলের যা' দিয়ে কোনোই প্রয়োজন নেই—এমন এই জিনিষটুকু সবাইকে আড়াল ক'রে আমি এমন সাবধানে রেখেছিলুম, তাই আমার হারিয়ে গেল! এমনি সাধারণ যে অন্য কারু হয়তো ভালো ক'রে লক্ষ্য ক'রবারও সময় হ'তো না; কিন্তু আমার কাছে তা'র এতখানি অর্থ ছিল। আমাকে এই ভাবে রিক্ত ক'রে পৃথিবীর কতটুকু লাভ বাড়লো, তাই ভাবি।

একদিন শ্যামবাজারের দিকে কি একটা কাজে বাসে চড়ে যাচ্ছি। ওয়েলেস্‌লীর মোড় থেকে একটি মহিলা উঠলেন, ব'স্‌লেন এসে ঠিক আমার পেছনের বেঞ্চে।

বেথুন কলেজের কাছে এসে গেট্‌টা পার হ'তেই তিনি উঠে দাঁড়ালেন। বাস্‌টা বেশ জোরে চ'ল্‌ছিল, ড্রাইভারটা ঐ গতির উপরেই হঠাৎ ব্রেক চেপে দিলো (শেষে দেখলুম একটি রিক্সাওয়ালা চাপা পড়তে পড়তে বেঁচে গেচে), আর সঙ্গে সঙ্গেই টাল সম্‌লাতে না পেরে মহিলাটি হুড়মুড় ক'রে প'ড়ে গেলেন আমার ঘাড়ের ওপরে। আমার কাঁধটা তিনি জোরে চেপে ধ'রেছিলেন, নইলে হয়তো একেবারেই প'ড়ে যেতেন!

কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই তিনি নিজেকে সাম্‌লে নিয়ে লজ্জিত মুখে বল্‌লেন, কিছু মনে ক'র্‌বেন না ভাই, হঠাৎ—

আমি ব্যস্ত ভাবে বললুম, না, না, এতে আর—

জড়িত পায়ে তিনি নেবে গেলেন—বীডন্ ষ্ট্রীট ধ'রে।

শ্যামবাজার থেকে ঘুরে বাসায় ফিরে এসে দিদির কাছে

গল্পটা কয়লুম। কথায় কথায় দিদি ব'ল্লো, আমিও কাল কি পরশুর দিকে যাবো ভাবচি বীডন্ ষ্ট্রীটে একটু লীলাদের বাড়ী। বেচারীর জ্বর হ'য়েছে, ছ'দুবার যাওয়ার জন্যে লিখেচে।

লীলা বলে মহিলাটি দিদির বন্ধু।

পরের দিনই দিদি লীলাদেবীর বাড়ী বেড়াতে গেল!

ফিরে এসে দিদি কাপড় ছাড়তে ছাড়তে ব'ললো, আরে,... বেশ মজা হয়েচে। সেদিন যে মেয়েটির সাথে তোর ঠোকাঠুকি হয়েছিল না, সে লীলার বিশেষ বন্ধু। সেও লীলাকে দেখতে এসেচিল। নানা কথাবার্ত্তা হ'তে হ'তে মেয়েটি তা'র সেদিনকার এই ঘটনার কথা গল্প কয়তে ক'রতে বল্‌চিল, সত্যি ভাই, যা' লজ্জা পেয়ে গিয়েচিলুম—

আমি তো চট ক'রে বুঝে ফেললুম, তোর কথা বল্লুম। খুব তো খানিক হাসাহাসি হ'ল। মেয়েটির নাম হ'চ্চে অরুণা—ভারি চমৎকার মেয়ে। আমার সাথে ওই টুকু সময়ের ভেতরেই বেশ ভাব হ'য়ে গেচে। দু'একদিনের ভেতরেই আমাদের বাসায় আস্‌বে বেড়াতে। বার বার ক'রে আস্‌তে বলে দিয়েচি। এলেই তোর সাথে আলাপ করিয়ে দেব।

দিদিকে অসংখ্য ধন্যবাদ! আজ অরুণাদির মতো দিদি আমার আর একটিও নেই।

অরুণাদিও নিজের ইচ্ছামত আমার জিনিষ পত্র ঘাঁটা ঘাঁটি করেন, তিনি যদি রুমাল খানা দেখে টেথে থাকেন, এই জন্যে সেদিন তিনি বেড়াতে আসবামাত্র তাঁকে রুমাল খানার কথা জিজ্ঞাসা কয়লুম।

তিনি বল্‌তে পার্‌লেন না; আর দিদির মতনই শুধু ব'ল্‌লেন, ওর জন্য আর এতো মাথা ঘামাচ্চো কেন, তুমি কখানা রুমাল চাও বল, আমি তৈরি ক'রে দেব!

অরুণাদি, তুমিও আমার মনের ব্যথা জানতে পার্‌লে না।

দিদির একখানা মরচে ধরা কাঁচি—যা' নাকি হাজার বার টান মেরে মেরে এদিক ওদিক ফেলেচি কতদিন, সে খানা তো কিছুতেই হারায় না! আমার ফটো তুলবার সরঞ্জামের ভেতরকার এক খানা ভাঙা লাল কাঁচের টুকরো—কত দিন যে এখানে ওখানে পড়ে থাকতে দেখেচি, কিন্তু তাও তো হারায় নি! কবে আমার এক বন্ধু আমায় কাছে চিঠি লিখেছিল, চিঠিখানা পড়া হ'য়ে গেলে ছিঁড়ে ফেলেছিলুম। একটি টুকরো দিয়ে কোন বইয়ের ভেতর কার এক খানা পাতা ঠিক ক'রে রেখেছিলুম। এই সামান্য টুকরোটি আজ পর্য্যন্ত সেই বইখানার ভেতরে ঠিক আছে, একটুও নড়েনি; আর তোমার হাতের একমাত্র চিহ্ন, আমার পরম আদরের এই রুমাল খানা এতো সহজে হারিয়ে গেল!

দশ টাকার সেই পাঁচ খানি নোটের কথা এখনো স্পষ্ট মনে আছে। দোকান থেকে জিনিষ কিনে বাসায় এলুম, এসেই পকেটে হাত দিয়ে দেখি, দশটাকার নোট্ পাঁচ খানি নেই! উর্দ্ধশ্বাসে ছুট্‌তে ছুট্‌তে আবার দোকানে ফিরে গেলুম—একটু খুঁজ্‌তেই বেঞ্চির তলা থেকে ভাঁজ করা নোট্‌গুলি বেরিয়ে পড়ল। এই সময়টার ভেতরে এত লোক যাতায়াত করেচে, অথচ এটা কারুর চোখে পড়েনি, কেউ তুলে নেয় নি!

দিদির দামি সেপ্‌টিপিন্‌টি হারিয়ে গেল—খুঁজ্‌তে গিয়ে ঝি চৌবাচ্চার পাশের নর্দ্দমাটার ভেতরে সেটি কুড়িয়ে পেল—আধঘণ্টার ভেতরেই। শুধু কুড়িয়ে পাওয়া নয়—সে তক্ষুনি তা' দিদির হাতে এনে দিলো, এমন আশ্চর্য্য ব্যাপারও পৃথিবীতে ঘট্‌লো! বামীর মতো গরীব ঝি একটা দামী সোনার জিনিষ পেয়ে তা' অনায়াসে দিয়ে দিলো—কল্‌কাতার বাজারে এটা আশ্চর্য্য ছাড়া আর কি?

এমন আশ্চর্য্য ব্যাপারও ঘটে থাকে, কিন্তু এই তুচ্ছ জিনিষ টুকু আমি ফিরে পাবো, এমন সহজ ব্যাপার টুকুই শুধু ঘট্‌তে পারে না! কিছুই হারায় না—তোমার দেওয়া রুমাল খানিই কেবল হারিয়ে যায়। সবি পাওয়া যায়, তোমার দেওয়া রুমাল খানির খালি খোঁজ মেলে না।

* * *

বড়োই ক্লান্ত হয়ে পড়েচি,...! বাসায় আর এমন একটি স্থান নাই, যেখানে দেখা আমি বাকি রেখেচি, কিন্তু তোমার দেওয়া রুমাল খানি আমি পাইনি। এ যে ঠিকই হারিয়ে গেচে, এ বিশ্বাস এখন আমার সত্যি সত্যিই কয়্‌তে হবে।

সেদিনকার রাত্রে তোমার সুন্দর হাত থেকে লাভ করা ওই শুভ্র, অনাড়ম্বর রুমাল খানি যে আমার বড়ো গোপন গর্ব্বের ধন ছিল! আমার এই গর্ব্বটুকু সমস্ত দুনিয়ার অসহ্য হ'য়ে উঠেছিল, তাই এমন করে সে তাকে চূর্ণ করল।

আমি কাউকে তোমার কথা বলিনি,···কারুর কাছে কোন দিন তোমার গল্প ক'রে বেড়াই নি! আমার অন্তরের নিভৃতের মন্দিরে যে তোমারি প্রতিষ্ঠা ক'রে ছিলুম, আমার কামনার পূর্ণার্ঘ্য যে তোমারি করে তুলে দিয়ে ছিলুম, সে কথা আর কাও:কেই জানাইনি। তুমি যে আমায় ভালো বেসেছিলে, এই অতি সামান্য জিনিষটুকুই আমাকে একেবারে আচ্ছন্ন ক'রে ছিলো। তোমার পূজার বেদীমূল আমি সম্পূর্ণ নির্জ্জন করেই রেখেছিলুম—বাইরের কোলাহল আমার এই মধুর ধ্যান পাছে ভাঙিয়ে দেয়!

বিকেলের দিকটায় মোটেই ভালো লাগ্ছিল না, বাসায় আর মন টিক্‌ছিল না, তাই লেকের ধারে এসে একটু বসেচি। কিন্তু এখন বুঝতে পারচি, আমার জ্বর এসেচে। দুপুর থেকেই গাটার ভেতরে কেমন করছিল, তখনো বুঝ্‌তে পারিনি! তাইতো, কপালটাতো খুবই গরম দেখ্‌তে পাচ্চি, মাথার ভেতরে কেমন যেন জড়িয়ে জড়িয়ে আসচে।

লেকের ধা:রর লোকগুলো অমন তাড়াতাড়ি ক'রে চ'লেচে কেন? লেকের জলগুলো এমন কালো হ'য়ে উঠ্‌ল কেন? ওঃ, আকাশটা কালো মেঘে ছেয়ে ফেলেচে দেখ্‌চি! কিন্তু আমি যে উঠ্‌তে পারচি না!

ওই কালো মেঘের ওপারেই তুমি আছ, তাই না'···? জ্যোস্না রাত্তির আর কি তোমার ভালো লাগে?··· লাগেনা, নিশ্চয়ই লাগেনা। কারণ, আমারো যে ভাল লাগে না! আমি যখন তোমার কাছে যেতে পারবো,··· তখন পূর্ণিমা আবার আমাদের কাছে সুন্দর হ'য়ে উঠ্‌বে! তুমি আমায় ভালোবাসতে, একথা মিথ্যা নয়, না,···? হ্যাঁ, তুমি আমার প্রতীক্ষায় থেকো। তুমি জ্যোৎস্নার আলোয় গিয়েছিলে। আমি এমনি এক দুর্দ্দিনে, অন্ধমেঘ ভেদ করে তোমার কাছে গিয়ে পৌঁছ্‌ব।

একি! আমার হাতের ওপর এক ফোঁটা জল পড়ল কোত্থেকে? তুমি কি এসেচো—একি তোমারি চোখের জল! আমার কথা তুমি শুনতে পেয়েচো বুঝি?

আজ্‌কেই আমার সেই মুহূর্ত্ত এলো বুঝি? আমার ···, চাও, চাও, আমার আরো নিবিড় করে চাও—

আরো এক ফোঁটা জল আবার এসে পড়লো। তোমার চোখের জল আর আমার চোখের জল আমার বাহুর ওপরে মিশে একাকার হ'য়ে গেল!

সম্পাদিকার জল্পনা

প্রেরণার বেগ

পৃথিবীর সকল দেশের সকল মানুষ প্রেরণার বেগে ছুটে চলেছে,—থামানো যাবে না তা'দি'কে আজ কোন উপায়ে। প্রেরণা এক ধরণের নয়; তার মধ্যেও বৈচিত্র্য আছে নানা ভাবের। অনুকরণ অনুসরণে সাম্‌নে চলার ভাবটি লুকোতে গেলেও ধরা পড়ে। প্রেরণার বেগটি তা থেকে স্বতন্ত্র জিনিষ। সে ঝড়-বাদল মানে না, কাঁটা-খোঁচায় ডরে না,—ঠেলার বেগে এগিয়ে চলে মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে। মানুষ তার বশে চলে;—বশ মানাতে পারে না তাকে নিজের কোঠায় এনে। একেই বলে ঐশ্বরিক শক্তির বেগ বা প্রেরণা। 'খোদার উপর খোদ্‌গিরি' অর্থাৎ নিজের বাহাদুরি চল্‌বে না এর গতির মুখে। ভবিষ্যৎ দেখা যায় না চোখের গোড়ায়, তবু অদৃশ্য লোক থেকে চোখে যেন আলো এসে পড়ে এর চলার পথে। পৃথিবীর নূতন ভবিষ্যতের আভাষ এসে পড়েছে মানুষ-রাজ্যে;—তারই আশায় ছুটেছে মানুষ ঊর্দ্ধ মুখে,—নূতন হবে, নূতন করে' তুল্‌বে সবকিছুকে। কে জানে সে কেমনতর ভবিষ্যৎ! অনুমানে আভাষ দেয়, যেন জড়-চেতনে জড়ানো মানুষ জড়-স্তরের মাত্রা ছাড়িয়ে কতকটা চেতন-স্তরে উঠে পড়্‌বে সুন্দরতর হ'য়ে। তার গতি হবে স্বচ্ছন্দ, কাজ হবে অপর্য্যাপ্ত অথচ সহজ। জড়রাজ্য ভেদ করে' যাবার সময় কতকটা কষ্ট ত হবেই; সকলকে তার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। এদেশের ভাগ্যে যে ঐক্যের প্রেরণা নেমেছে, তার রূপটি চোখে দেখ্‌তে ও রসটি ভোগ কর্‌তে হবে ষোল আনা এদেশের সবাইকে—বাঁচো মরো যে পথ ধরে' যেমন খুসী। বিধাতা কাজ হাসিল করে' নেবেন নিজের পছন্দে।

মানব-ঐক্যের বর্ত্তমান রূপ

সকল মানুষকে সমান করে' তুল্‌তে ও সমান অধিকার দিতে বহুবার বহু মহাপুরুষ চেষ্টা করে' গেছেন বহু প্রকারে। তাঁদের ছড়ানো বীজ পৃথিবীতে অঙ্কুরিত হ'তে আরম্ভ করেছে বহু- দিন থেকে। দুর্গম পথঘাট অতিক্রম করে দুঃসহ তপঃক্লেশ সম্বল করে', দেশ-বিদেশে মানব ঐক্যের বাণী প্রচার কর্‌তে তাঁরা প্রাণপাত করেছেন। আজ এই মানব ঐক্যের শ্রেষ্ঠতম যুগে তাঁরা একান্তভাবে স্মরণীয়। প্রত্যেক মানুষ নিজের বুকে সেই মহাপুরুষদের চরণধ্বনি শুন্‌তে পারে ক্ষণকাল স্থিরভাবে মন দিলেই। বিজ্ঞানের দৌলতে আজ রেলরোড, টেলিগ্রাফ, ডাকবিভাগ, ছাপাখানা—আরও শত সহস্র বৈজ্ঞানিক প্রণালী-উদ্ভূত কার্য্যকরী শক্তির প্রভাবে মানব-ঐক্যের সেই বড় কথাটি ছোট-বড় সকলের দ্বারে এসে পৌঁছেছে সহজে,—এক মুহূর্ত্তে এক যুগের কাজ সাধন করে' তুলছে মানবজাতির সৌভাগ্যের খবর নিয়ে। সে আজ ধনী-দরিদ্রকে সমান কর্‌বে, নিকৃষ্টকে উৎকৃষ্ট করে' তুল্‌বে,—বাধা ভাঙ্‌বে সকল মানুষের সব দিকের উন্নতি-পথের। এ সময়ে হিন্দু সম্প্রদায়ের অনুন্নত শ্রেণীর লোকরাই কি পড়ে' থাক্‌বে ভগবানের ইচ্ছার প্রতিকূলে? হিন্দুর উচ্চবর্ণের লোকদের এতে ভয়ের কি আছে? তাঁদের সদভ্যাস, সুরুচি, শুচিতা, বিদ্যাচর্চ্চা, উঁচুদরের ব্যবসাদির—ওকালতি, ডাক্তারি—ব্যাঘাত না ঘটিয়ে যদি নিম্নবর্ণের লোকেরা সেগুলি আরও করে, তবে নিম্নবর্ণের সেই উন্নতিটি জাতির মহা সম্পদে পরিণত হবে। এ থেকে জাতিকে বঞ্চিত কর্‌বে এমন নির্ব্বোধ কে আছে? বহু শতাব্দী-সঞ্চিত সংস্কার ছিঁড়্‌তে উচ্চশ্রেণীর হিন্দু মেয়েদের অনেকের প্রাণে বাজ্‌ছে—শুন্‌তেও পাচ্ছি, দেখ্‌ছিও। তাঁদের কাছে এই নিবেদন, মায়ের হৃদয় পেতে এই সকল অনুন্নত শ্রেণীর ছেলে-মেয়েদের তাঁরা নিজের বুকে ধারণ করুন। এরা তাঁদের সংস্কার-ছেঁড়া ধন হ'য়ে দেশের বুকে জেগে থাক্‌বে।

সমাজ-বিপ্লব

মানুষ জাতটির মধ্যে বিশেষ শক্তি নিয়ে জন্মগ্রহণ করে' থাকেন কতকগুলি মানুষ প্রায়ই। নিজের স্বাভাবিক

পাওয়া শক্তিটির চর্চ্চা করে' ধীরে ধীরে তাঁরা সাধারণ মানুষের স্তর থেকে অ-সাধারণের স্তরে উঠে পড়েন। আশপাশের ছোটকে বড় করা, অক্ষমকে সক্ষম করা তাঁদের কাজ। নিঃস্বার্থ ভাবে সেটুকু করে' গেলে, পৃথিবীর, অন্য কথায় নিজ নিজ দেশ বা জাতির যথেষ্ট কল্যাণ হয় তাঁদের দ্বারা। ঐ ব্যক্তিগত প্রভাবটুকুকে গণ্ডীবদ্ধ করে' সম্প্রদায় বেঁধে ফেল্‌লে তাঁদের জীবনের পরে সেটুকু বিশেষ অনিষ্টকর হ'য়ে দাঁড়ায় জাতির পক্ষে, দেখা যাচ্ছে। দল বাঁধায় গোল বাধে ঐখানে। 'আজ খোলা পথের দিন এসেছে।—দেওয়া-নেওয়া যাকিছু সব খোলা রাস্তায় দাঁড়িয়ে করে' চল্‌তে হবে, তবেই স্বস্তির নিশ্বাস ফেল্‌বে মানুষ জাত। পৃথিবীর সঙ্গে মিলিয়ে দিতে হবে মানুষের যা আছে সব কিছু। সমাজ-শক্তির বেড়া দিয়ে, শাসন মানিয়ে চেপে রাখা হয়েছে যাদের এতকাল, পৃথিবীর খোলা পথের হাওয়া এসে ঢুকেছে তাদের ঘরে,—সাড়া পৌঁছেছে তাদের প্রাণে। ছাড়তে হবে তাদের জন্য অনেক কিছু,—দিতে হবে তা'দি'কে অনেক অধিকার। কে জানে তাদের মধ্যে কত মহাপুরুষ মহানারী জন্মাতে না পারে সুযোগ পেলে! ঐ শ্রেণীর মধ্যে বিশিষ্ট মানুষের উদ্ভব ইতিহাসের পাতায় অনেকবার দেখা গেছে। সচেতন হ'য়ে সহজে এটুকু মিলিয়ে নিলে গোল চুকে; নতুবা সমাজের বুকে মহা-বিপ্লব অবশ্যম্ভাবী। ছোট বড় হবে, অধীন স্বাধীন হবে সুনিশ্চিত; মানে মানেই এটি করে' ফেলা ভালো।

মিলন-ক্ষেত্র

উচ্চবর্ণে নিম্নবর্ণে পংক্তি-ভোজের খবর পাওয়া যাচ্ছে চারিদিক থেকে। স্কুল কলেজগুলি অগ্রণী—দেবমন্দিরেও এ সম্বন্ধে উদ্যোগ-আয়োজন চলছে কিছু কম নয়। হৃদয়-বান হিন্দু আজ হৃদয় পেতেছে আব্রাহ্মণ চণ্ডালের জন্য সমান ভাবে। সঙ্গে সঙ্গে গ্রামের সমিতি, বালিকাবিদ্যালয় ও কলিকাতা সহরের কর্পোরেশন স্থাপিত নিম্ন প্রাথমিক বালিকাবিদ্যালয়গুলিতে অচিরাৎ দলে দলে নিম্নশ্রেণীর মেয়েরা শিক্ষার জন্য ঢুকে পড়ছে দেখা যাবে, আশা করা যায়। ছেলেদের ব্যবস্থা ত আগে হ'তেই সুরু হয়েছে।

শিক্ষায় সমান হ'লে কে কাকে চেপে রাখে?

অনেকে বল্‌বেন, "সব জাতের মেয়ে-পুরুষ শিক্ষিত হ'য়ে উঠ্‌লে দেশের জাতব্যবসাগুলি লোপ পেতে বস্‌বে সমূলে। জেলেনী মাছ বেচ্‌তে, গয়লানী দুধের মাখন তুল্‌তে, তাঁতিনী তুলা পিঁজ্‌তে ও সুতায় মাজা দিতে ভুলে যাবে জন্মের মত। ফলে দেশে ছোটদরের অর্থকরী বিদ্যা যাও বা দু'চারটা এখনও অবশিষ্ট আছে, তাও ঘুচে গিয়ে ছোট বড় সবাই 'হা অন্ন, হা অন্ন,' করে' ঘুরে বেড়াবে দুয়ারে দুয়ারে। ভালো করে' ভেবে দেখ্‌তে গেলে দেখা যাবে, এ কথাটির ভিত্তি তেমন পাকা নয়। ব্যবসায় বুদ্ধি একটি স্বতন্ত্র জিনিষ—যার থাকে সেই কৃতকার্য্য হয়। পাকা ব্যবসাদারের ছেলে বাপের আঁট্‌সাঁট্‌-গোছানো ব্যবসাটি ব্যর্থ করেছে, দেখা গেছে অনেক সময়। অতএব কোন বিশেষ ব্যবসায় কোন শ্রেণীর বা পরিবারের একচেটে হবে, এমন বলা যায় না। অন্নের অভাব হ'লে 'রোজগারের পথ দেখে' বলে' দিতে হবে না কাউকে। প্রাণের দায়ে সবাই তখন রোজগার কর্‌তে ছুটবে ও নিজের শক্তি, রুচি অনুযায়ী একটি পথ ধরে' নেবে—যেটি পারে। বুদ্ধি মার্জ্জিত হ'লে ও জাতি সম্বন্ধে জ্ঞান বাড়্‌লে জাতির মঙ্গল বুঝ্‌তে শিখ্‌বে প্রত্যেক মানুষ, সেটি সব চেয়ে বড় কথা। অর্থাগমের অসংখ্য প্রতিষ্ঠান দেশের মধ্যে গড়্‌তে হবে। তাতেই দেশের মানুষ শিক্ষা লাভ কর্‌বে রকম রকম বিষয়ে। মূল কথা, কর্ম্ম বর্ণগত না হ'য়ে বুদ্ধি, শক্তি ও রুচিগত হবে, এটিই স্বাভাবিক।

সমিতির দুর্য্যোগ

সহর অঞ্চলে যে জিনিষ যতটা চোখে না পড়ে, সহর ছেড়ে গ্রামের দিকে এক পা বাড়ালেই সুস্পষ্ট মূর্ত্তিতে সেগুলি ধরা পড়ে' যায়। অদূরবর্ত্তী গ্রামে ঢুক্‌লেই চোখে ঠেকে—মানুষ দল বেঁধে পথে চল্‌ছে না, অনেকগুলি মানুষ একত্র বস্‌তেও আতঙ্কিত হ'চ্ছে। এ অবস্থায় মেয়েদের সমিতিতে জড় হ'তে পারা আরোই বিঘ্নসঙ্কুল। বাড়ীর বাবুরাও ভয় পান,—মেয়েদের বলেন, "তোমাদের দল বেঁধে কোথাও গিয়ে জুটতে হবে না। যেমন আছ থাকো বাপু চুপচাপ, ঘরের কোণে। দেশকাল খারাপ। সন্ধ্যার

বেড়াতে নিয়ে যাব বরং ফাঁকা জায়গায়,সেটা অনেকটা সহজ আছে ;—কাজ নেই সমিতির বালাইয়ে।" এমনতর বাধা ঠেলেও মেয়েরা আঁকুবাঁকু করছে সমিতিতে গিয়ে কিছু শেখ্‌বার জন্যে। এক জায়গায় দেখ্‌লুম—পনের টাকা বেতনে একটি দর্জ্জি রেখে সমিতির কল্যাণে মেয়েরা কাট-ছাঁট শিখ্‌ছেন মাথাপিছু মাসিক দু' আনা চাঁদা দিয়ে।—সুন্দর ব্যবস্থা, গৃহস্থ মেয়েদের সুন্দর সুযোগ। বিপত্তির সময় বাধা ঠেলে এগোতে হবে,—উপায় নাই। অর্থ-সমস্যায় দেশ হাহাকার করছে। মেয়েরা পরিশ্রমে দু' পাঁচ টাকা যা বাঁচাতে পারে তা'ই কম লাভ নয় এখনকার দিনে। চোখে দেখেছি, একটি মেয়ে কারো কাছে না শিখেও তৈরি জামার মাপ মিলিয়ে জামা ফ্রক ইত্যাদি তৈরি করে' মাসে ১৫৲।১৬৲ উপার্জ্জন করছে অনায়াসে। দুপুরবেলা রাস্তায় যখন মানুষ চলে কম, বাড়ী বাড়ী গিয়ে সে তৈরি জামা বেচে আসে। নিজে কাঁচা সাবু-ভিজানো খেয়ে দিন কাটায়—খরচ বেশী নাই ; এতেই সে বেশ স্বাবলম্বী। বুদ্ধি খাটাতে শিখ্‌লে খুব অল্পেও অনেক কিছু করা যায়। এই বিষম দুর্দ্দিনে সেই পথই আমাদের ধরতে হবে।

সমিতিতে কুমারীর ভীড়

নিজ কলিকাতার আশপাশের সহরতলীগুলিতে সমিতি ফাঁদ্‌তে গিয়ে দেখা যাচ্ছে দলে দলে কুমারী মেয়ে এসে সমিতিতে ভর্ত্তি হ'তে চায়। এরা স্থানীয় বালিকাবিদ্যালয়ের পাঠ শেষ করেছে। এখন কিঞ্চিৎ উচ্চশিক্ষা ও শিল্পশিক্ষার তাদের প্রয়োজন। বাড়ীর অভিভাবকরাও ঐটুকুর জন্য সমিতিতে কুমারী মেয়ে ভর্ত্তি করা সম্বন্ধে খুব ব্যগ্র। সমিতির কাজটি প্রথম সুরু হয় বিধবা ও অন্তঃপুরের বৌদের শেখানোর উদ্দেশ্যে। তাঁদের দলে এখন কুমারীদের ভিড় দেখে সমিতি অন্তঃপুরশিক্ষালয়ে পরিণত হ'তে চলেছে। সহরতলীর কুমারী মেয়েদের কলিকাতার শিক্ষালয়ে বাসে যাতায়াত আদৌ সম্ভবপর নয়। কাজেই পাড়ায় পাড়ায় সমিতি-কেন্দ্রে শিখ্‌তে যাওয়া ছাড়া তাদের উপায় কি? কলিকাতার বোর্ডিংয়ে থেকে শেখা তাদের পক্ষে আরও অসম্ভব। গৃহস্থের তত টাকা সঙ্কুলান হয় কোথায় থেকে? সম্প্রতি এক সমিতি পরিদর্শন্ করতে গিয়ে সেটি যে এই ভাবের একটি অন্তঃপুরশিক্ষালয় গড়ে' উঠ্‌ছে, চোখে দেখে এলুম। যখন প্রয়োজন আছে তখন এরূপ শিক্ষালয়কে সমিতির অন্তর্গত করে' নিতে হবে, বুঝ্‌লুম। কসবার রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র ব্রহ্মচারী মহাশয়ের এ সম্বন্ধে উদ্যোগ ও আয়োজন অতীব প্রশংসনীয়। এই সাধু চেষ্টার জন্য তাঁকে আমরা কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

কর্পোরেশনের সাহায্য পেলে এরূপ শিক্ষালয়ের ব্যবস্থা আরও উন্নত হ'তে পারে।

দেশের মেয়ে সরোজিনী দত্ত

খাঁটি বাঙালী পরিবারের নিজস্ব ধাঁচায় গড়া মেয়ে শ্রীযুক্তা সরোজিনী দত্ত বৈধব্যের পর পিতার আজ্ঞায় স্কুলে ভর্ত্তি হন ও ১৯১৫ সালে ম্যাট্রিক পাশ করেন। ক্রমে এম-এ পর্য্যন্ত পরীক্ষা শেষ করে' বেথুন কলেজে উদ্ভিদ্ বিদ্যার অধ্যাপক নিযুক্ত হন। দশ বৎসর যোগ্যতার সহিত কাজ করার পর কর্ত্তৃপক্ষের ইচ্ছায় উন্নততর যোগ্যতা লাভের জন্য তিনি Study leave নিয়ে বিলাত যান। সেখানে দু' বৎসর অধ্যয়নের পর লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের এম-এস-সি ডিগ্রি নিয়ে দেশে ফিরেছেন গত আগষ্ট মাসে ও এখানকার কাজে যোগ দিয়াছেন ১লা সেপ্টেম্বর থেকে।

বাঙালীর মেয়ের উচ্চশিক্ষালাভ ও উচ্চতর ডিগ্রি পাওয়া কম গৌরবের কথা নয় জাতির দিক থেকে। এ ত গেল এক তরফ। অন্যদিকে ফেরার পর দেখা হওয়ায় দেখ্‌লুম, মানুষটির ধাঁচা বদল হয়নি এতটুকু, যেমন ছিলেন তেমনিটি ফিরেছেন হুবহু। কোথায় কাঁটা-চামচ, টেবিল চেয়ার সোফায় শোয়া-বসার বিশিষ্ট আয়োজন?—ফিরেই রুগ্না বোনের সেবায় লেগেছেন ও তাঁর ঘর-কন্নার কাজ দেখ্‌তে সুরু করেছেন দেশের মাটিতে পা ফেলা মাত্র। নিজের ঘর-সংসার নাই তবু বোনের সংসার বজায় রাখার দায় পোয়াতে হবে তিনি জানেন, কারণ তিনি বাঙালী মেয়ে।

দেশী ধরণ বজায় রেখে বিদেশী জ্ঞান ও শিক্ষা আয়ত্ত করা কত সুন্দর ও দেশী সমাজের পক্ষে সেটি কত কল্যাণকর ভেবে দেখা খুব দরকার। বিদেশী মাটিতে দেশী প্রাণের শিকড় বসাতে যাওয়া কতখানি বিপদজনক চোখ খুলে দেখার সময় এসেছে। সারাদিন বাইরে ঘুরে সন্ধ্যায় নিজের ঘরে এসে বিশ্রামের সুখটুকুর দর যাঁরা বোঝেন ও সকল অবস্থার মধ্যে শান্তির স্বাদ যাঁরা পেতে চান, দেশের বুকে মাথা রাখার সুবুদ্ধিটুকু তাঁরা কখনও খোয়াবেন না, আমাদের স্থির বিশ্বাস।

৺ব্রজেন্দ্রনাথ দে, এম, এ, আই, সি, এস,

১৮৫২ খৃঃ অব্দের ২৩শে ডিসেম্বর ৺ব্রজেন্দ্রনাথ দে, কলিকাতার সিমলা পল্লীস্থ তাঁহার মাতুলালয়ে জন্মগ্রহণ করেন। ভবানীপুরনিবাসী ৺দুর্গা চরণ দে তাঁহার পিতা এবং তৎকালিক শিক্ষিত সমাজের অগ্রণী স্বর্গীয় প্যারীচরণ সরকারের ভাগিনেয়ী তাঁহার মাতা। তাঁহার যখন জন্ম হয়, তখন তাঁহার মাতার বয়স মাত্র ১৩ বৎসর। তাঁহার নয়টী ভাই ভগিনীর অন্য সকলেই অতি শিশুকালেই মৃত্যুমুখে পতিত হন; কিন্তু তিনি বাল্যকাল হইতেই অতিশয় সংযত ও সুনিয়ন্ত্রিত জীবন যাপন করিতেন বলিয়াই এত দীর্ঘ পরমায়ু লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। শিশুকাল হইতেই তিনি অত্যন্ত বিনয়ী ও বাধ্য ছিলেন এবং বয়সের অনুপাতে তিনি অত্যন্ত মেধাবী ছিলেন; তখন হইতেই তাঁহার বুদ্ধির প্রাখর্য্য দেখা যাইত!

শৈশবে ভবানীপুরের দুইটী স্কুল ও চোরবাগানের একটী স্কুলে তাঁহার প্রাথমিক শিক্ষালাভ হয়; তাহার পর ১৮৬২ খৃঃ অব্দে, যখন তাঁহার বয়স মাত্র ১০ বৎসর, তখন তাঁহার পিতা কার্য্যব্যপদেশে লক্ষ্ণৌ চলিয়া যান; কিন্তু, ঐ দশ বৎসরের শিশু ব্রজেন্দ্রনাথ তখনই তাঁহার বৃহৎ পরিবারের বহু কার্য্যে সহায়তা করিতেন। এই সময়ে প্রাথমিক বিদ্যালয় হইতে বর্ত্তমান হেয়ার স্কুলে তাঁহাকে ভর্ত্তি করান হয়। অতঃপর ১৮৬৫ খ্রীঃ অব্দে তাঁহার মাতার সহিত তিনি লক্ষ্ণৌ চলিয়া যান এবং সেখানে ৫ম শ্রেণীর পরিবর্ত্তে সেখানকার ক্যানিং কলেজের ৫ম শ্রেণীতে ভর্ত্তি হন; আশ্চর্য্যের বিষয়, তিনি উক্ত কলেজের বার্ষিক পরীক্ষায় উক্ত ক্লাসে সর্ব্বপ্রথম স্থান অধিকার করেন এবং পরে যে ৬।৭ বৎসর ঐ কলেজে তিনি অধ্যয়ন করেন, প্রতিবৎসরই তিনি তাঁহার ক্লাসের পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়া থাকেন।

১৮৬৭ খৃঃ অব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় তিনি প্রথম বিভাগের ৪র্থ স্থান অধিকার করেন। ১৮৬৯ খ্রীঃঅব্দে তিনি এফ, এ, পরীক্ষায়ও প্রথম বিভাগের ৪র্থ স্থান লাভ করেন। ১৮৭১ খ্রীঃঅব্দে পিতামাতার সহিত তিনি কলিকাতায় ফিরিয়া আইসেন এবং বহুবাজারে প্রসিদ্ধ বসুবংশের ৺বাবু রাখালদাস বসু মহাশয়ের ৯ বৎসর বয়স্কা কন্যা নগেন্দ্রনন্দিনীকে বিবাহ করেন। অতঃপর লক্ষ্ণৌ ফিরিয়া তিনি বি, এ, পড়িতে থাকেন। এই সময় স্থানীয় ইংরাজী কাগজে তাঁহার কবিতা ও প্রবন্ধাদি মাঝে মাঝে বাহির হইত। তিনি বি, এ, পরীক্ষায় বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে ৬ষ্ঠ স্থান ও এম, এ, পরীক্ষায় ২য় স্থান অধিকার করেন।

১৮৭২ খৃঃ ২৪শে জুলাই আই, সি, এস, পরীক্ষা দিবার নিমিত্ত তিনি বিলাত যাত্রা করেন। এজন্য তাঁহার কলেজ হইতে মাসিক ৫০৲ টাকা হিসাবে ৬ মাস কাল তাঁহাকে একটী বৃত্তি দেওয়া হয়। বিলাতে অবস্থান কালে আনন্দমোহন বসু, শ্রীনাথ দত্ত, লালমোহন ঘোষ, অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়, পি, কে, রায়, স্যার কে, জি, গুপ্ত প্রভৃতির সহিত তাঁহার বন্ধুত্ব হয়।

১৮৭২ খৃঃ আই, সি, এস পরীক্ষায় তিনিই একমাত্র ভারতীয় নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। অতঃপর দুই বৎসর তাঁহাকে বিলাতে শিক্ষানবীশ থাকিতে হয়। এই সময়ের মধ্যে তিনি ব্যারিষ্টারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং সংস্কৃতে "বোডেন বৃত্তি"র জন্য অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ম্যাক্সমূলার ও [illegible]স্কিন প্রভৃতির নিকট শিক্ষালাভ করিতে থাকেন। যথাসময়ে তিনি এই "বোডেন বৃত্তি" লাভ করেন।

সর্ব্বপ্রথমে তিনি বিহারের আরা জেলার সহকারী ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেকটার নিযুক্ত হন।

১৮৭৭ খৃঃ অব্দের ৩০শে সেপ্টেম্বর, তিনি যখন কলিকাতায় পূজার ছুটীতে আসিয়াছিলেন, তখন তাঁহার পিতা ৪৭ বৎসর বয়সে মারা যান। বিহার প্রদেশের বিভিন্ন মহকুমা ও জিলায় তিনি যখন প্রধান কর্ম্মচারীরূপে কার্য্য করিতেন, তখন তত্তৎস্থানীয় রাজা প্রজা, ধনী দরিদ্র—সকলশ্রেণীর লোকেরই তিনি বিশেষ সৌহৃদ্য আকর্ষণ করিয়াছিলেন এবং সে সব স্থানে তিনি খুব জনপ্রিয় ছিলেন।

১৮৮২ খৃঃ অব্দে রাণীগঞ্জ মহকুমায় তাঁহাকে স্থানান্তরিত করা হয়। রাণীগঞ্জ থাকাকালীন তিনি রাণীগঞ্জ "পটারী

ওয়ার্কসের" কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে এইরূপ একটী অভিযোগ অবগত হন যে, কলিয়ারীর একজন কর্ম্মচারী পত্তনী-মহলের রায়তদের উক্ত ওয়ার্কসের কার্য্যে যোগ দিতে দিতেছে না; তিনি অনুসন্ধান করিয়া ব্যাপারটীর সত্যতা জানিতে পারেন এবং তাহাকে জানাইয়া দেন যে, যদি পরে আর কখনও এইরূপ অভিযোগ শোনা যায়, তবে তিনি আইনানুযায়ী ব্যবস্থা করিতে বাধ্য হইবেন। ইহার পর আবার স্থানীয় বহুলোকের স্বাক্ষরিত একখানি অভিযোগ-পত্র প্রাপ্ত হন যে, স্থানীয় কলিয়ারীর ম্যানেজাররা সাধারণ লোকদের গাড়ী জোর করিয়া লইয়া যায়; তিনি তখনই আদেশ জারি করেন যে, আর কখন যেন মালিকের বিনা অনুমতিতে তাহাদের গাড়ী না নেওয়া হয়। এই সব ঘটনায় জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট মহোদয় তাঁহার প্রতি একটু বিরক্ত হন এবং তাহার জন্ত তাঁহার কর্ম্মজীবনে কিছু অসুবিধা ভোগ করিতে হয়। তৎপর তাঁহাকে বাঁকুড়ায় সহযোগী ম্যাজিষ্ট্রেটরূপে বদলী করা হয় এবং তাহার পর হুগলীতেও সহযোগী ম্যাজিষ্ট্রেটরূপে তাঁহাকে বদলী করা হয়। হুগলীতে তিনি প্রায় ছয় বৎসর ছিলেন। হুগলী থাকাকালীন তিনি হুগলী ও চুঁচুড়া সহরে কলের জল সরবরাহের জন্ত বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন। এই সময়ে ইলবার্ট বিল" লইয়া খুব একটা গোলযোগ চলিতেছিল; গবর্ণমেণ্ট সকলকার মত মিঃ দে'র নিকটও তাঁহার মন্তব্য চাহিয়া পাঠান; কিন্তু মিঃ দে, অতি দৃঢ়তার সহিত স্পষ্ট ভাষায় মন্তব্য প্রকাশ করেন যে, বিচারক্ষেত্রে ভারতীয় ও ইউরোপীয়ের কোন প্রভেদ না রাখিয়া একই ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট বিচার হওয়া বাঞ্ছনীয়।

এই সময়ে মিঃ দে,সংস্কৃত, পারশিয়ান ও অন্যান্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং ১১০০০৲ টাকা আর্থিক পুরস্কার লাভ করেন। ফরিদপুরের জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট থাকাকালীন তিনি, আত্মীয়-স্বজনের আপত্তি সত্ত্বেও বহুদিনের রক্ষিত প্রাচীন-পন্থা ও পর্দ্দানশীনতা দূর করিয়া তাঁহার পত্নীকে আধুনিক-ভাবে ও শিক্ষায় সুশিক্ষিত করিয়া তুলিতে মনস্থ করিয়াছিলেন।

১৮৯৪ খৃঃ অব্দের মার্চ্চমাসে মিঃ দে, তাঁহার স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততিদের লইয়া বিলাত যাত্রা করেন। এই বৎসর অক্টোবর মাসে পুনরায় ভারতে ফিরিয়া আসেন।

একবার বাঁকুড়ার কতকাংশ বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্ভুক্ত করিবার কথা হয়; এই সময়েও মিঃ দে, বাঁকুড়ায় ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন, তাঁহারই চেষ্টায় ঐ প্রস্তাব রহিত হইয়া যায়।

মিঃ দে-ই ম্যাজিষ্ট্রেট থাকাকালীন, হুগলী, খুলনা, মালদহ প্রভৃতি বাংলার বহু জেলায় কৃষি ও শিল্প প্রদর্শনীর প্রথা প্রবর্ত্তিত করেন।

১৯১০ খ্রীঃ অব্দে ৩৫ বৎসর চাকরী করার পর তিনি অবসর গ্রহণ করেন। তাহার অবসর গ্রহণের পর বিভিন্ন সংবাদপত্রে তাঁহার অজস্র প্রশংসা প্রকাশিত হয়।

বিখ্যাত ইংরাজী পত্রিকা "পাইওনিয়ার" লিখিয়াছিলেন যে, মিঃ দের মত ম্যাজিষ্ট্রেট যদি বাংলার সর্ব্বত্র থাকিত, তবে আর বাংলার রাজনৈতিক গোলযোগ উপস্থিত হইত না।

অবসর প্রাপ্তির পর তিনি কলিকাতাতেই বসবাস করিতে থাকেন।

তিনি "এসিয়াটিক সোসাইটী অফ বেঙ্গলের" সদস্য ছিলেন এবং এই সময় তিনি সম্রাট আকবরের জনৈক কর্ম্মচারী নাজিমুদ্দিন আহমেদ রচিত একখানি পার্শি পুস্তকের অনুবাদ কার্য্য আরম্ভ করেন; তাহার লেখা প্রায় শেষ হইয়াছে, মাত্র শেষখণ্ডের সূচীপত্র লেখার ভার সোসাইটীর কর্ত্তৃপক্ষের উপর রহিয়াছে।

১৯২৫ খৃঃ ১৯শে জানুয়ারী তাঁহার চতুর্থ কন্যা স্বনামধন্যা স্বর্গীয়া সরোজনলিনী দত্ত দেহ ত্যাগ করেন।

শ্রীযুক্ত দে ১৯৩২ সনের ২৮শে সেপ্টেম্বর প্রায় ৮০ বৎসর বয়সে মৃত্যুমুখে পতিত হন।

পল্লীকর্ম্মীর অভিজ্ঞতা

পল্লীগ্রামে কোন কাজ করা খুবই শক্ত মামলত্। কথাটা যে সত্য সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। এর জলন্ত দৃষ্টান্ত আমরা শরৎবাবুর "পল্লীসমাজে"র মধ্যেই পাই। এ যে শুধু উপন্যাসের কাল্পনিক চিত্র তা নয়, নিছক সত্য। রমেশ তার পল্লীর জন্য আপ্রাণ পরিশ্রম করিল—কিন্তু তার মাথায় পড়িল লাঠি, গেল জেলে। বেণী ঘোষাল বা গোবিন্দ খুড়োর মত পল্লীদেবতার অভাব নাই। কিন্তু যে প্রকৃত কাজ করিতে চায় তাকে হইতে হইবে প্রচণ্ড সহিষ্ণু। রমেশ যখন অভিমান করিয়া জেঠাইমাকে বলিল—"জেঠাইমা, আমি আর এখানে থাকব না,এরা আমাকে চায় না।" তখন জেঠাইমা বলিলেন—"বাবা, যেহেতু ওরা তোমায় চায় না সেহেতু তোমারই এখানে থাকা দরকার,ওরা যে কী অজ্ঞান তা কি বুঝছ না?"

শরৎবাবুর আরেকটা খুব সুন্দর কথা আছে যার ভাবটা এই যে আমাদের সব চাইতে বড় অভিসম্পাত এই যে সব কাজেই বিদেশীর চাইতে দেশী লোকের সঙ্গে লড়াই করিতে হয় অনেক।

কিন্তু দেশী লোকের "অজ্ঞানতাটা" কিসের এবং "লড়াইটা" হয় কেন—তার কারণ খুঁজিলে দেখা যায় যত গলদ আমাদের নিজেদের চরিত্রের। পল্লীগ্রামে কোন কাজ করিতে গিয়া আমার যেটুকু অভিজ্ঞতা হইয়াছে আজ সে অভিজ্ঞতাগুলির কথা এখানে কহিব। আশা করি পল্লী কর্ম্মীদের মধ্যে কেউ কেউ আমার কথায় সায় দিবেন।

(১) কতকগুলি লোক আছে যারা চায় যে কোন পাবলিক্ কাজেই তাদের মতামত ও পরামর্শ গ্রহণ করা পূর্ব্ব হইতেই আবশ্যক। হয়ত তাদের মধ্যে "চুনোপুঁটি" বা অতি সাধারণ বিদ্যাবুদ্ধির লোকই অনেক; তবু তারা চায়। যদি একেবারে গোড়াতে তাদের Consult না করা হয় তবে তারা এমন বাঁকা হয় যে শেষে একটা প্রতিষ্ঠান ভাঙ্গিবার চেষ্টায় থাকে। একটা জিনিষ গড়া কঠিন, ভাঙ্গা সহজ। সুতরাং ঐ সব লোকদেরও উপেক্ষা করিলে চলিবে না। সুতরাং নিরাপদ প্রণালী বা Safe procedure এই যে, পল্লীতে কোন প্রতিষ্ঠান করিতে হইলে তার পূর্ব্বে সকলকেই আহ্বান করিয়া তাদের Consult করিয়া তবে কাজে অগ্রসর হওয়া ভাল অর্থাৎ wise।

(২) আবার কতকগুলি লোক আছে যারা খুঁটিনাটি লইয়া গোল করে। যেমন—কোন প্রতিষ্ঠানের সভাপতি, সম্পাদক ইত্যাদি নির্ব্বাচন বা কার্য্যকরী সমিতি গঠন বা কার্য্যসূচী নির্দ্ধারণ ইত্যাদি বিষয়ে অনেক "ফ্যাকড়া"—Technicalities নিয়া হৈচৈ করে। যদিও প্রকৃত দেশ হিতাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তির ওসব করা উচিত নয়,কারণ Spirit টা থাকা উচিত অন্য রকমের। তবু যেহেতু এরূপ গোলমাল বাধে, সুতরাং উল্লিখিত বিষয়গুলিও পল্লীর সাধারণ সভাতে সর্ব্বসমক্ষেই সম্পন্ন হওয়া দরকার।

(৩) আবার আরেক প্রকারের কতকগুলি লোক আছে যারা নামটা বড় বেশী চায় নামের কাঙ্গাল। খবরের কাগজে 'অমুকের' নাম দেওয়া হইল কিন্তু অমুকের দেওয়া হইল না, এ নিয়াও বাধে গোল। সুতরাং যারা ওরকম নামের কাঙ্গাল তাদের নামটা প্রচার করাও এক রকম নিরাপদ।

(৪) চতুর্থ প্রকারের আবার একজাতীয় আদমি আছে যারা হয়ত গোসা করে এজন্য যে অমুক বাবুর কাছে প্রতিষ্ঠানের উন্নতিকল্পে পরামর্শ লইতে যাওয়া হয় কিন্তু আমাদের কাছে কেন আস না ইত্যাদি। এসব বিষয়েও যিনি কর্ম্মী, যিনি কোন কাজে lead নিবেন তাঁহার সকলকে আহ্বান করিয়াই যতটা সম্ভব সকলের পরামর্শ নেওয়া

উচিত। অবশ্য যদিও সব প্রতিষ্ঠানেরই "পরামর্শ সমিতি" বা "কার্য্যকরী সমিতি" থাকে তবু অনেক সময় কোন ব্যক্তিবিশেষের কাছে কর্ম্মীকে পরামর্শ বা উপদেশের জন্ত ঘন ঘন যাতায়াত করিতে হয়। কিন্তু তাতে ঐ হয় বিপদ।

অনেক শ্রেণীর লোক আছে যারা শুধু করে হিংসা। অর্থাৎ অমুকে একটা প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিলেন, তিনি একটা সুনাম অর্জ্জন করিয়া ফেলিলেন—এটা তাদের সহ্য হয় না। সুতরাং এসব কারণের জন্ত, যিনি কর্ম্মী হইবেন তাঁকে খুব সাবধান হইতে হইবে। তাঁকে হইতে হইবে অতিরিক্ত বিনয়ী এবং যাতে তাঁর নাম কাগজে পত্রে বেশী না থাকে বা আদৌ না থাকে—সেটা তাঁর দেখা উচিত।

যদিও এটা সত্য কথা যে যেই কোন প্রতিষ্ঠান গড়ে বা কোন ব্যাপারে lead নেয় তাকেই সব চাইতে সে বিষয়ে বেশী স্বাধীনতা এবং ক্ষমতা দেওয়া উচিত। কিন্তু অনেকে যে তা বুঝে না ঐ ত হয় মুস্কিল! পল্লীগ্রামে একটা মজা এই যে কোন ভালমন্দ প্রতিষ্ঠান যদি কেউ না গড়ে—তবে আপদবালাই কিছুই নাই। যে তিমিরে সেই তিমিরেই তারা থাকিবে, সেই বেশ। কিন্তু যদি একটা কিছু কেউ করে তবেই বাস,—ওটাই যত আন্দোলন, সমালোচনা ও দলাদলির মামলত হইয়া দাঁড়ায়। ইংরেজীতে যাকে বলে Bone of contention।

আমার মনে হয় আমাদের মত যারা "সাধারণ লোক" তারা যদি গ্রামের কোন কাজ করিতে চায় তবে 'শনি পূজা'র পূজারীর মত হওয়া দরকার- অর্থাৎ সবাইকে যথাসম্ভব খুসী রাখিয়া।

আমার একথাগুলিই যে সত্য এবং সর্ব্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য তা নয়—সাধারণ কর্ম্মীদের পক্ষে ও-পথ। তবে যাদের অসীম মনো বল, ধন-বল বা জনবল আছে তাদের কথা আলাদা। তারা নিজেরা কারো পানে না তাকাইয়াই অনেক কাজ করিতে পারেন। তবে ধনবল বা জনবল যাদের আছে তাঁরা যেমন একটা কাজ প্রগতির সঙ্গে সাধন করিতে পারিবেন—মনোবল লইয়া কাজ করিলে অত সহজে হইবে না, তবে হয়ত একদিন, হয়ত কেন, একদিন সকল মানুষকেই মনোবলের কাছে মাথা নোয়াইতে হয়।

প্রেরণা

শ্রী গুরুসদয় দত্ত

কেন নেচে' উঠে দেহ মন আনন্দে ?
কার মিলন-আশায়
সুখ দুখ বেদনায়
বাজে তান হৃদয়ের স্পন্দে ?
চলেছে জগৎ নেচে'
যুগে যুগে অবিরত
সৃষ্টি প্রলয়ে কার ছন্দে ?—
জীবনে মরণে কার
সীমাহীন প্রেরণার
সুধাময় [illegible] হিয়া বন্দে ?

শালিখা মহিলাসমিতি

এই শিশু সমিতির পক্ষ হইতে আমি ইহার ষষ্ঠ বর্ষের ক্ষুদ্র কার্য্য বিবরণী আপনাদের অবগতির জন্য নিবেদন করিতেছি। সকল সদনুষ্ঠানের উন্নতির বিপক্ষে অন্যান্য বিপত্তি ছাড়া, অর্থকষ্ট যেমন চিরন্তন অন্তরায়, আমাদের এই ক্ষুদ্র সমিতির পক্ষে তাহা অধিকতর প্রযুজ্য। তাহা সত্ত্বেও আমরা এই তীব্র প্রতিযোগিতার দিনে যে আরও পূর্ণ এক বৎসর কাল যথাসাধ্য কার্য্য করিয়া কথঞ্চিৎ অগ্রসর হইতে পারিয়াছি তাহা কেবল বিধাতার আশীর্ব্বাদ ও কর্ম্মিণীদের একনিষ্ঠা, শিক্ষার্থিণীদের আন্তরিক অধ্যবসায় ও সাধারণের শুভেচ্ছার জন্যই হইয়াছে।

সীবন-শিল্পের প্রচার ও তাহার উন্নতি, দুঃস্থা স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে ও অনাথা বিধবাদিগের মধ্যে এই শিক্ষার বিস্তার ও তাহাদের কথঞ্চিৎ আর্থিক কষ্টের লাঘব, সমিতির মুখ্য উদ্দেশ্য। গত ছয় বৎসরকাল সমিতি নীরবে এই কার্য্য করিবার চেষ্টা করিয়া আসিতেছে। প্রতিষ্ঠানের প্রথম বৎসর ছাত্রীসংখ্যা ৮ জন হইতে অদ্য ২২ জন ছাত্রী প্রতিদিন নিয়মিত ১০টা হইতে ৫টা পর্য্যন্ত শিক্ষাগারে থাকিয়া সীবন-শিল্পের নানাপ্রকার কারুকার্য্যের শিক্ষালাভ করিতেছে।

গত ৫ বৎসরে ২ জন ছাত্রী সমিতি হইতে শিক্ষালাভ করিয়া স্বাধীনভাবে এই কার্য্যে লিপ্ত থাকিয়া নিজের ও সন্তান সন্ততিদিগের গ্রাসাচ্ছাদন অনায়াসে নির্ব্বাহ করিতেছেন। নিতান্ত আলস্যে ও ঔদাসীন্যে সময়ক্ষেপ না করিয়া বিধবাগণ দ্বিপ্রহরে এই শিক্ষাগারে নিয়মিত উপস্থিত হইয়া শিক্ষা গ্রহণপূর্ব্বক আর্থিক কষ্ট দূরীকরণ ও তৎসহ নিজেদের মানসিক উৎকর্ষ সাধনে সমর্থ হন।

গত ৫ বৎসর কাল বিনা অর্থে এই সমিতি ২১ নং রামলাল মুখার্জ্জি লেনে অবস্থাপিত ছিল। উপরোক্ত বাড়ীর মালিকের এই অকৃত্রিম কৃপার জন্য সমিতি চিরদিন তাঁহার কাছে কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ থাকিবে। এই বৎসর শ্রাবণ মাসের ১৫ই তারিখে সমিতির শিক্ষাগার ১৫ নম্বর রামলাল মুখার্জ্জি লেনে মাসিক ২০৲ টাকা ভাড়াতে স্থানান্তরিত হইয়াছে।

গত বৎসরের কার্য্যবিবরণীতে উল্লিখিত শ্রীমতী ইন্দুমতী দেবী সমিতি গৃহে সর্ব্বদা উপস্থিত থাকিয়া শিক্ষার্থিণীদিগকে যত্নপূর্ব্বক শিল্পশিক্ষা দেন। সংবাদপত্র পাঠ ও গার্হস্থ্য ধর্ম্ম সম্বন্ধে নিয়মিত আলোচনা করা হয়।

এই লোকহিতকর অনুষ্ঠানে সাধারণের উৎসাহ ও যথাসাধ্য সাহায্য একান্ত প্রার্থনীয়। অর্থদ্বারা সব সময় সাহায্য সকলকার পক্ষে সম্ভব নয়; আমাদের একান্ত অনুরোধ যদি তাঁহারা তাঁহাদের নিজ নিজ দৈনন্দিন ব্যবহার্য্য, যথা, সেমিজ, বডি, পেটিকোট, ফতুয়া, সার্ট, পিরাণ, ব্লাউজ প্রভৃতি জামা তৈরীর ভার আমাদের হস্তে করেন তাহাতেই সমিতি তাঁদের নিকট বিশেষ ধন্যবাদার্হ হইবে।

পরিশেষে সমিতির একান্ত অভাবের কথা সংক্ষেপে আপনাদের কাছে নিবেদন করিতেছি। বিবরণীর প্রথম অংশে উল্লিখিত আছে যে এবৎসর শ্রাবণ মাস হইতে সমিতিকে মাসিক ২০৲ টাকা হিসাবে বাড়ী ভাড়া লইতে

হইয়াছে সুতরাং মাসিক খরচ সমিতির সাধ্যাতীত বৃদ্ধি হইয়াছে। ইহার উপর সমিতির দুইটি সেলাই কলের বিশেষ দরকার হইয়া পড়িয়াছে। আমাদের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ, জনসাধারণ এই কল্যাণকর অনুষ্ঠানের এই অভাবটি পূরণ করেন। সামান্য সামান্য আর্থিক সাহায্য করিলেই আমাদের এই অভাব অচিরে মোচন হইবে।

সমিতির সুচারুরূপ কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে হইলে অর্থের প্রয়োজন। তাহার জন্য বর্ত্তমান সভ্যাগণের সংখ্যা বৃদ্ধি হওয়া একান্ত আবশ্যক। উপস্থিত সভ্যাগণের কাছে আমাদের নিবেদন যেন তাঁহারা স্ব স্ব আত্মীয়া ও বন্ধুদিগকে এই সমিতির পৃষ্টপোষকতার জন্য অনুরোধ করেন। আন্তরিক চেষ্টা করিলে নিশ্চয়ই তাঁহাদের চেষ্টা ফলবতী হইবে।

আলোচ্য বর্ষে সমিতির আয় মোট ২০৮৪৸/৫, এবং ব্যয় ১৪৪১।৶০, নগদ মজুত ৬৪৩৵/৫ আনা আছে।

সম্পাদিকা
শ্রীভানুমতী দেবী

বাগেরহাট মহিলাসমিতি

প্রায় সাত বৎসর পূর্ব্বে বাগেরহাটে প্রথম মহিলা সমিতির প্রতিষ্ঠা হয়। সে সময় আমাদের প্রকাশ্য দিবালোকে এই সহরের এক পল্লী হইতে অপর পল্লীতে যাতায়াত করা পরম অপরাধ বলিয়া পরিগণিত হইত। কিন্তু সেই সময় বাগেরহাট ও বাসাবাটীর কয়েকজন দৃঢ়চিত্ত উৎসাহী রমণী বহু দিনের সেই জীর্ণ সংস্কারের মূলে কুঠারাঘাত করিয়া মহিলা সমিতির সভ্যা হন এবং অন্ততঃ সপ্তাহে একদিন করিয়া স্থানীয় বালিকা বিদ্যালয়-গৃহে মেলামেশা, সংবাদপত্র ও গীতা পাঠ এবং নানাবিধ সৎপুস্তকাদি পাঠে নিজেদের অবস্থা অনেকটা উন্নত করিয়া তুলেন। এই সাত বৎসরে বাগেরহাট মহিলাসমিতির তত্ত্বাবধানে সরোজনলিনী কেন্দ্র-সমিতির অনুগ্রহে তিনবার সেলাই ক্লাস হয়; প্রতিবার চারিমাস করিয়া ক্লাস হয়। সরোজনলিনী কেন্দ্রসমিতি প্রথমবার শ্রীমতী শিবরাণী ঘোষকে শিক্ষয়িত্রীরূপে আমাদের নিকট প্রেরণ করেন এবং তাঁহার বেতন প্রতিমাসে ৩০৲ টাকা হিসাবে ১২০৲ টাকা কেন্দ্রসমিতিই দেন। পরে আর দুইবারে ৮ মাস শ্রীমতী নলিনী দত্ত বাগেরহাটে মহিলা সমিতির সেলাই ক্লাসে শিক্ষয়িত্রীর কাজ করেন। তাঁহার বেতনের অর্দ্ধেক অর্থাৎ ১২০৲ টাকা কেন্দ্রসমিতি দেন অপর অর্দ্ধেক আমরা মহিলাসমিতি হইতে দিই। পরে একবার স্থানীয় ডাক্তার শ্রীযুত অরুণচন্দ্র নাগ এম্. বি, মহাশয়ের পরিচালনায় কেন্দ্রসমিতির প্রদত্ত ১৫০৲ টাকা গ্র্যাণ্ট পাইয়া স্থানীয় ভদ্রমহিলা এবং পেশাদার ধাই সর্ব্ব-সমেত ১৫ জন ছাত্রী লইয়া একটী ধাই-ট্রেণিং ক্লাস হয়। পর বৎসর ডাঃ শ্রীযুত যতীন্দ্রনাথ ব্যানার্জ্জি এম, বি, মহাশয়ের তত্ত্বাবধান ও পরিচালনায় দশ জন ছাত্রী লইয়া আর একটী ধাই ট্রেণিং ক্লাস খোলা হয়; কিন্তু সে সময় দেশে রাজনৈতিক অবস্থার দ্রুত পরিবর্ত্তন ও তীব্র আন্দোলনের মধ্যে পড়ায় সে ক্লাসটী শেষ হয় নাই। আশা আছে, শীঘ্রই ধাই-ট্রেণিং ক্লাসটী শেষ হইবে। বলাবাহুল্য এ ক্লাসটীর জন্যও কেন্দ্রসমিতি দেড় শত টাকা গ্র্যাণ্ট দেন। এ পর্য্যন্ত বাগেরহাট মহিলা সমিতির পরিচালনায় দুইবার শিল্পপ্রদর্শনী, দুইবার শিশুমঙ্গল প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয় এবং প্রতিবারই মহিলা সমিতি এ জন্য প্রচুর খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন। ইহা ব্যতীত বাংলার ভিতর প্রথম মহিলা সম্মেলন বাগেরহাটই ডাকেন; তৎসঙ্গে স্বাস্থ্য-প্রদর্শনী খোলা হয়। এ কাজের সাফল্যেও বাগেরহাটবাসী যথেষ্ট গর্ব্বিত। ইহা ব্যতীত বন্যা ও দুর্ভিক্ষপীড়িত স্থানে সাহায্য দান, স্থানীয় হরিমন্দিরের রাস্তা নির্ম্মাণ প্রভৃতি নানারূপ সৎকার্য্যও মহিলা সমিতি দ্বারা অনুষ্ঠিত হয়। সরোজনলিনী কেন্দ্র সমিতি হইতে সমিতি স্থাপনার প্রথম বৎসর হইতে সুন্দর শিল্পকার্য্যের জন্য, মহিলা সমিতির কার্য্যের সাফল্যের জন্য, প্রতি বৎসরই পুরস্কার পাইয়া থাকেন। সুন্দর কাঁথার জন্য সমিতির অনেকা সভ্যা কেন্দ্র সমিতি হইতে স্বর্ণ পদক প্রাপ্ত হন। আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, শ্রীযুক্তা হেমাঙ্গিনী সেন প্রভৃতিকে সমিতি হইতে অভিনন্দন প্রদান করা হইয়াছিল। বর্ত্তমানে আমরা বিশেষ করিয়া গত এক বৎসরের কার্য্যাবলীই আলোচনা করিব। গত বৎসর মে মাসের শেষভাগে সমিতির চেষ্টায় ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের সাহায্য লইয়া স্থানীয় মহিলা ও বালিকাগণকে অল্প সময়ের মধ্যে কিছু অর্থকরী এবং সংসারের নিত্য প্রয়োজনীয়

শিল্পশিক্ষা দিবার উদ্দেশ্যে গত জুন মাসে এখানে একটী অন্তঃপুর-শিল্প-শিক্ষালয় খোলা হইয়াছে। উক্ত শিক্ষালয়টী বর্ত্তমানে স্থানীয় প্রসিদ্ধ উকিল শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র সেন মহাশয়ের বাটীতে একখানি ঘর ভাড়া লইয়া আরম্ভ করা হইয়াছে। ছাত্রী-সংখ্যা বর্ত্তমানে ৪১। গত জুন মাসে স্কুল আরম্ভ করার সময়ে সরোজ নলিনী নারীশিল্প শিক্ষালয়ের সার্টিফিকেট প্রাপ্তা মহিলা হাওড়া জেলার ব্যান্ট্রা স্কুলের ভূতপূর্ব্ব শিক্ষয়িত্রী শ্রীযুক্তা আশালতা দাসগুপ্তা এই স্কুলে মাসিক ৩০৲ টাকা বেতনে শিক্ষয়িত্রী নিযুক্ত হন। তাহার শিক্ষাদান কৌশলে স্কুলটীর উপর স্থানীয় ভদ্র মহোদয় ও ভদ্র মহিলাগণের সুদৃষ্টি পতিত হয়। তৎপরে জুলাই মাসের শেষে তাঁহার শারীরিক অসুস্থতা নিবন্ধন স্কুলের কাজ তিনি পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন। এস্থলে ইহা উল্লেখ করা যায় যে, উক্ত শিক্ষয়িত্রীর কার্য্য-কালের মধ্যে শ্রীযুক্ত শুকলাল নাগ, এম, এল, সি, খলিলর রহমান, রসিকলাল চক্রবর্ত্তী, রায় সাহেব ও আবদুলগণি পরিদর্শনে আসেন এবং স্কুলের শিক্ষাপ্রণালী ও ছাত্রীদের হাতের নানারূপ সুন্দর সুন্দর ছাঁটকাট সমন্বিত জামা সেলাই দেখিয়া ভূয়সী প্রশংসা করেন। পেনি হইতে আরম্ভ করিয়া পাঞ্জাবি ও সার্ট পর্য্যন্ত এবং সুন্দর সূচীকার্য্য সমন্বিত রুমাল ও টেবিল ক্লথ, টিপয় কভার প্রভৃতি দেখান হয়; এবং তাঁহারা, এই স্কুলে হিন্দু ও মুসলমান উভয় শ্রেণীর ছাত্রীগণই সমান যত্নে শিক্ষা পাইবার অধিকারিণী দেখিয়া বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করেন। ইহাও উল্লেখযোগ্য যে, পরিশেষে তাঁহারা স্কুল ঘরটীর আয়তন সম্বন্ধে একটু আলোচনা করেন এবং বলেন যে ঘরটী আরও বড় না হইলে ছাত্রীদের স্থান সংকুলান হওয়া অসম্ভব, তবে ইহাও বলেন যে, স্কুলটী চলিতে থাকিলে জেলাবোর্ড স্কুলের স্থায়ী ঘরের জন্য সাহায্য করিবেন। বলা বাহুল্য, স্কুলটী প্রধানতঃ জেলাবোর্ডের সাহায্য ও সহানুভূতিতে লালিত পালিত হইতেছে। এজন্য জেলাবোর্ডের সুযোগ্য চেয়ারম্যান রায় যতীন্দ্রনাথ ঘোষ বাহাদুরকে স্কুল কর্তৃপক্ষ অসীম কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতে-ছেন এবং তাঁহার উৎসাহ ও সাহায্য দান ব্যতিরেকে এই প্রতিষ্ঠানটী কোনরূপেই যে চলিত না ইহাও নিঃসন্দেহ।

পরে গত আগষ্ট মাসের প্রারম্ভে সরোজনলিনী নারী-মঙ্গল সমিতির কর্তৃপক্ষদের অনুগ্রহে আমরা আর একজন ঐ স্থানের সার্টিফিকেট প্রাপ্তা মহিলা শ্রীযুক্তা হরিদাসী প্রামানিককে শিক্ষয়িত্রীরূপে আনিতে সক্ষম হই। তাঁহারও শিক্ষাদান কৌশল প্রশংসনীয় এবং তাঁহার মিষ্ট ব্যবহার ছাত্রীগণকে মুগ্ধ করিয়াছে।

গত ২৭।৮ তারিখে জেলাবোর্ডের চেয়ারম্যান বাহাদুর স্বয়ং শিল্প শিক্ষালয়টী পরিদর্শনে আসেন। স্কুলের উদ্দেশ্য ও শিক্ষাদান প্রভৃতি দেখিয়া ও জানিয়া তিনি বিশেষ পরিতুষ্ট হন এবং অবিলম্বে স্কুলের নিজস্ব একটী সেলাই কলের প্রয়োজনীয়তা বিশেষরূপে উপলব্ধি করেন। স্কুল গৃহটী ছোট, ইহা তিনিও লক্ষ্য করেন। স্কুলের মাসিক ব্যয় বর্ত্তমানে ৫০৲ টাকা কিন্তু জিলাবোর্ড হইতে বর্ত্তমানে মাসিক ৩০৲ টাকা হারে আমরা সাহায্য পাইতেছি এবং আর ২০৲ কুড়ি টাকা বর্ত্তমানে স্থানীয় ভদ্র মহোদয়গণের নিকট হইতে চাঁদা গ্রহণ করিয়া ও মহিলা-কর্ম্মী-সংসদের তহবিল হইতে পূরণ করা হইতেছে। চ্যায়ারম্যান বাহাদুর বলিয়াছেন—"প্রতিষ্ঠানটী বিশেষ সহানুভূতির যোগ্য।" শিক্ষালয়ে মণিপুরী তাঁত বসান হইয়াছে।

স্থানীয় বহু ভদ্রমহোদয় ও মহিলাগণকে লইয়া স্কুলের ম্যানেজিং কমিটি গঠিত হইয়াছে।

স্থানীয় বিজ্ঞ প্রবীণ ভদ্রমহোদয়গণ সময় মত উপদেশ ও পরামর্শদানে আমাদিগকে উপকৃত করিয়া থাকেন। এক্ষণে সাধারণের সহানুভূতি এই প্রতিষ্ঠানটীর স্থায়িত্ব ও উন্নতি কামনা করিয়া আমরা প্রার্থনা করিতেছি। আশাকরি এই প্রতিষ্ঠানটী কখনই সাধারণের স্নেহ ও সহানুভূতি হইতে বঞ্চিত হইবে না।

গত ২৫শে এপ্রিল ডিষ্ট্রীক্ট স্কুল ইন্‌স্পেক্টর মহাশয় শিল্প-শিক্ষালয় পরিদর্শনে আসেন এবং স্কুলের কাজ দেখিয়া অত্যন্ত প্রীতিলাভ করেন, তবে তিনি স্কুলের জন্য শীঘ্রই একটী নিজের বাটী নির্ম্মাণ করিতে সঙ্কল্প করিয়া অনতিবিলম্বে অর্থ সংগ্রহে মনোনিবেশ করিতে বলেন। এজন্য আমরা জন সাধারণের সহানুভূতি ও সাহায্য প্রার্থনা করি।

জেলা বোর্ডের সাহায্যে স্থানীয় মহিলাদের লইয়া খুলনা জেলার প্রতি গ্রামে মাতৃ-মঙ্গল, শিশু-মঙ্গল ও সাধারণ

[illegible] ব্যাপক অঞ্চলে [illegible] সহযোগে বক্তৃতা দেওয়ার [illegible] জন্য একটী প্রচারিকা সঙ্ঘ আমরা খুলিতেছি। এই সঙ্ঘের প্রচারিকাগণ অবস্থা এবং ইচ্ছা অনুসারে পাথেয় এবং পারিশ্রমিকও পাইতে পারিবেন। আমরা খুলনা জেলার যে কোন শ্রেণীর ভদ্র মহিলাগণকে এই প্রচারিকা সঙ্ঘভুক্ত হইবার জন্য নিবেদন করিতেছি। জাতির স্বাস্থ্য প্রথমতঃ ও প্রধানতঃ মায়েদের হাতে, তাই আজ জাতির উন্নতি কামনায় এই প্রচারিকা সঙ্ঘ গঠন করিতে অভিলাষী হইয়া জননী ও ভগিনীগণকে আহ্বান করিতেছি। বিস্তারিত বিবরণ জানার জন্য "সম্পাদিকা মহিলা কর্ম্মী সংসদ, বাগেরহাট" এই ঠিকানায় পত্র লিখুন। প্রচারিকা সঙ্ঘের জন্য জেলা বোর্ড ১২৫৲ টাকা মূল্যের শ্লাইড দিয়া আমাদের অসীম উপকার করিয়াছেন; এজন্য জেলাবোর্ডের চেয়ারম্যান বাহাদুর ও হেল্‌থ্ অফিসার মহোদয়ের ঋণ অপরিশোধ্য। একটী ল্যাণ্টার্ণও কিছুদিনের জন্য জেলাবোর্ড দিবেন।

এই ব্যতীত শিশু-মঙ্গল, মাতৃ-মঙ্গল ও বিভিন্ন দেশের ও কালের নারী-প্রগতি এবং সাধারণ স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় একটী মিউজিয়মও আমরা শীঘ্রই খুলিব স্থির করিয়াছি। এজন্যও আমরা জেলাবোর্ডের নিকট বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ।

বাংলার গৌরব ও খুলনার মুকুটমণি আচার্য্য দেবের কৃপায় মহিলাগণের জন্য একটী পাঠাগার স্থাপন করিবার জন্য ৫০ টাকা মূল্যের পুস্তক পাইয়াছি।

খুলনার অন্যতম দেশ-প্রেমিক শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ মিত্র কমলা বুক ডিপোর স্বত্বাধিকারী মহাশয় অত্র পাঠাগারের জন্য ২০৲ টাকা মূল্যের পুস্তক দান করিয়া আমাদের উপকার করিয়াছেন; তজ্জন্য আমরা তাঁহাকে আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি এবং চক্রবর্ত্তী চাটার্জ্জী কোম্পানীর সত্বাধিকারী রমেশ চাটার্জ্জী মহাশয় আমাদের এই পাঠাগারের জন্য ১০৷১২৲ মূল্যের পুস্তক প্রদান করিয়া আমাদের অশেষ ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন।

আমরা অবিলম্বে "কল্যাণী পাঠাগার" নাম দিয়া একটী পাঠাগার সাধারণের গোচরে আনিবার ইচ্ছা পোষণ করিতেছি। এজন্য চাই সমগ্র খুলনাবাসী নর নারীর ঐকান্তিকতা, সহৃদয়তা বর্ত্তমানে আমরা যে কয়টী গঠনমূলক কাজে হস্তক্ষেপ করিয়াছি তাহা কখনও ২।৪ জনের চেষ্টায় টিকিয়া থাকিতে পারিবে না—তাই বাগেরহাট ও খুলনার সমস্ত সহৃদয় ভদ্রমহোদয় ও মহিলাগণের নিকট সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ, এই প্রতিষ্ঠানগুলি তাঁহাদের সর্ব্বপ্রকার সাহায্য সহানুভূতি ও আন্তরিকতার দ্বারা সাফল্যমণ্ডিত করিয়া তুলুন। পরিশেষে ইহাও জ্ঞাতব্য যে জেলা বোর্ড হইতে মাসিক পনর টাকা অর্থ সাহায্য লইয়া বাগেরহাট মহকুমার তিনটী বিধবা মহিলা কলিকাতায় অর্থকরী বিদ্যাশিক্ষার্থে গিয়াছেন। সমগ্র খুলনা জেলায় নয়টী মহিলা এই বৎসর এই অর্থ সাহায্য পাইলেন, তন্মধ্যে একজন মুসলমান মহিলা, একজন নমঃশূদ্র মহিলা। জেলা বোর্ডের নির্দ্দেশ পাইয়া মহিলা কর্ম্মী-সংসদ কতিপয় মহিলাকে টীকাদান কার্য্যের জন্য ট্রেণিং দিবার আয়োজন করিয়াছেন। শীঘ্রই মহিলা টীকাদারের ট্রেণিং ক্লাস আরম্ভ হইবে। যে সমস্ত মহিলা উপরোক্ত কাজ করিতে এবং শিখিতে ইচ্ছুক তাঁহারা বিস্তারিত বিবরণ জানার জন্য অবিলম্বে মহিলা কর্ম্মী-সংসদের সম্পাদিকার সহিত সাক্ষাৎ করুন অথবা পত্র ব্যবহার করুন। বর্ত্তমান বর্ষে মহিলা সমিতির সুপরিচালনায় দক্ষতার পুরস্কারস্বরূপে শ্রীযুত বাবু গুরুসদয় দত্ত, আই, সি, এস, প্রদত্ত ৫০৲ টাকা মূল্যের একটী সুবর্ণপদক সমিতির অন্যতমা সম্পাদিকা লীলা মিত্র পাইয়াছেন। এজন্য সমিতির প্রত্যেকেই বিশেষরূপে আনন্দিত। খুলনা জেলা বোর্ডের এইরূপ সৎকার্য্য প্রতি জেলা বোর্ডের অনুকরণীয় হওয়া বাঞ্ছনীয়।

আলোচ্যবর্ষে এই সমিতির আয় ৬০০৲ এবং ব্যয় ৫৮৯৲ টাকা, নগদ জমা ১১৲ টাকা মাত্র।

শ্রীউষাসতী দেবী
শ্রীলীলা মিত্র
সম্পাদিকাদ্বয়

কার্ত্তিকপুর মহিলাসমিতি

বহুদিন পূর্ব্বে সরোজনলিনী নারীমঙ্গল সমিতির তৎকালীন প্রচারক শ্রীযুক্ত শৈলেশচন্দ্র সেন বি, এ, কার্ত্তিকপুরে একটী মহিলাসমিতি স্থাপন করেন। আজ কয়েক বৎসর যাবৎ উক্ত সমিতিটী লুপ্তপ্রায় হইয়াছে। সম্প্রতি কয়েক

মাস হইল, কার্ত্তিকপুরের কতিপয় উৎসাহী ও কর্ম্মঠ মহিলার প্রচেষ্টায় সমিতিটী পুনরায় সুপ্রতিষ্ঠিত ও সঞ্জীবিত হইয়াছে। সমিতির প্রধান উদ্দেশ্য জাতিধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে মহিলাদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও শিল্পের উৎকর্ষ সাধনপূর্ব্বক আত্মোন্নতির বিধান করা। এতদুদ্দেশ্যে (১) প্রতি রবিবার স্থানীয় বিভিন্ন বাটীতে সমিতির সাপ্তাহিক সভার অধিবেশন হয় ও তাহাতে মহিলাদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও শিল্প সম্বন্ধে নানা জ্ঞাতব্য বিষয় আলোচিত হয়। উক্ত সাপ্তাহিক সভাগুলিতে স্বাস্থ্য বিষয়ক চার্ট ঝুলাইয়া ভ্রাম্যমান প্রদর্শনীর মত স্বাস্থ্য বিষয়ক তথ্যগুলি সকলকে বুঝাইয়া দেওয়া হয়। (২) সোমবার সঙ্গীতের ক্লাস হয় এবং বালিকারা সঙ্গীত চর্চ্চা করিয়া থাকেন। (৩) মঙ্গলবার ধাত্রীবিদ্যা ক্লাস হয় এবং বয়স্থা, বিবাহিতা, বিধবা ও গ্রাম্য ধাত্রীগণ তাহাতে শিক্ষালাভ করেন। সম্প্রতি ধাত্রীবিদ্যা ক্লাসটি ফরিদপুর জেলা বোর্ডের সাহায্যপ্রাপ্ত হইয়াছে। (৪) বুধবার শিল্পের ক্লাস হয় এবং মহিলাগণ ছাট, কাট, সেলাই ও অন্যান্য শিল্পকার্য্য শিক্ষা করেন। উল্লিখিত কার্য্যসূচী রীতিমতভাবে অনুসরণ করা হইতেছে।

এবার পূজার ছুটীতে মহিলাসমিতির এক বিশেষ সভার অধিবেশন হয়। তাহাতে কার্ত্তিকপুরের আগন্তুক প্রবাসী সকল ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহোদয়গণই উপস্থিত ছিলেন। মিসেস্ শ্রীমন্তকুমার দাসগুপ্ত সভানেত্রীর আসন গ্রহণ করেন। সভাতে মেদিনীপুরের অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত শ্রীমন্ত কুমার দাসগুপ্ত, শ্রীযুক্ত সুধীরকুমার সেন চৌধুরী, এড্‌ভোকেট শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন চৌধুরী, আই, এফ্, এস্, প্রভৃতি সমিতির কার্য্যে আনন্দ ও উৎসাহ প্রকাশ করিয়া সুন্দর বক্তৃতা প্রদান করেন।

আগামী বড় দিনে মহিলাসমিতির পক্ষ হইতে একটি স্বাস্থ্য, শিল্প ও শিশুমঙ্গল প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হইবে। ফরিদপুরের হেল্‌থ অফিসার, সরোজনলিনী নারী সমিতির প্রচারক, বঙ্গীয় হিতসাধন মণ্ডলীর ডাক্তার শ্রীনিশিকান্ত বসু প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ প্রদর্শনীতে যোগদান করিবেন। কলিকাতা রেডক্রস সোসাইটীর মিসেস এ, কট্‌ল্, এজন্য কিঞ্চিৎ অর্থ সাহায্য ও কতক সুন্দর চার্ট পাঠাইয়া দিয়াছেন। কার্ত্তিকপুরের প্রবাসী ভদ্র মহোদয় ও ভদ্রমহিলাগণ এই প্রদর্শনীর জন্য কিছু কিছু অর্থ সাহায্য করিলে কৃতজ্ঞতার সহিত সাদরে গৃহীত হইবে।

শ্রীনলিনী দাস
সম্পাদিকা

বিদায়-বরণ

কল্যাণী সংঘ ; চক্রধরপুর

গত ২৪শে জুলাই ১৯৩২ উক্ত কল্যাণী সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদিকা শ্রীমতী পঙ্কজিনা দের স্থানান্তর গমন উপলক্ষে তাঁহাকে অভিনন্দন প্রদান করেন। চক্রধরপুর ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউটে স্থানীয় কল্যাণী সঙ্ঘের মহিলারা বিদায় বরণ অনুষ্ঠানটী, বাংলা দেশের পল্লী সমাজে যেরূপ ধান্য দুর্ব্বা শঙ্খ ও উলুধ্বনি প্রভৃতি দ্বারা সম্পন্ন হয়, ঠিক্ সেই ভাবেই সম্পন্ন করিয়াছেন। সভার প্রারম্ভে সঙ্ঘের অন্যতম সহকারী সম্পাদিকা শ্রীমতী হেমন্ত প্রহরাজ একটী সুসজ্জিত মোটরে সম্পাদিকা শ্রীমতী দে ও সভানেত্রী শ্রীমতী পঙ্কজ লতা কাকতিকে লইয়া আইসেন। তাঁহারা সভায় প্রবেশ মাত্র সমবেত প্রায় শতাধিক মহিলা শঙ্খ ও উলুধ্বনি দ্বারা তাঁদের অভ্যর্থনা করেন। কুমারী তরুলতা চট্টোপাধ্যায়, কুমারী হিরণ্ময়ী সান্যাল ও কুমারী মৃণালিনী বন্দ্যোপাধ্যায় নাম্নী ৩টী বালিকা দ্বারা বিদায় সঙ্গীত গীত হওয়া মাত্র শ্রীমতী দেকে শঙ্খ, সিন্দুর, আলতা, ফুল, মালা, ধান্য, দুর্ব্বা, চন্দন প্রভৃতি দ্বারা বরণ করা হয়, এবং সংঙ্ঘ হইতে একটী সিন্দুর পূর্ণ রূপার সিন্দুর কৌটা ও এক জোড়া শাখা উপহার দেওয়া হয়। এই মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানটী সম্পন্ন করিবার পর, সভার কার্য্য আরাম্ভ হয়। সহঃ সম্পাদিকা শ্রীমতী হেমন্ত প্রহরাজ সংঙ্ঘের পক্ষ হইতে অভিনন্দন পাঠ ও প্রদান করেন। অন্যতম সহঃ সম্পাদিকা শ্রীমতী সুবর্ণ সান্যাল, শ্রীমতী অমলা সেন প্রভৃতি মহিলারা সময়োপযোগী বক্তৃতা করেন; এবং বিন্দুবাসিনী বন্দোপাধ্যায় একটী সুমধুর কবিতা পাঠ করেন। সম্পাদিকা শ্রীমতী দে অভিনন্দনের উত্তর দেন। সমবেত মহিলাগণ ও বালক বালিকাগণ জলযোগ করেন, এবং সমবেত মহিলাগণের ফটো গ্রহনান্তর সভা ভঙ্গ হয়।

রবীন্দ্র শিল্প

শ্রীপরিমল গোস্বামী

রবীন্দ্রনাথের কবিতা যেদিন বাংলাদেশে প্রথম আবির্ভূত হইল, সেদিন এদেশের পক্ষে ছিল পরম দুর্দিন। অশাস্ত্রীয় ছন্দে এবং অবোধ্য ভাষায় তিনি যে আবর্জ্জনা সৃষ্টি করিতেছিলেন তাহার ওজন এবং বিস্তৃতির পরিমাণ দেখিয়া দেশের লোক ভীত হইয়াছিল।

এই রচনা শুধু কবিতায় আবদ্ধ ছিল না। প্রবন্ধে, গল্পে, উপন্যাসে, নাটকে লোকে পাগল হইবার উপক্রম করিল। দেশ সুদ্ধ লোক নিরাশায় দমিয়া গেল তবু লেখক দমিলেন না। ইহার একমাত্র কারণ তিনি ছিলেন জমিদার পুত্র, প্রভূত অর্থ তাঁহার হাতে ছিল—এবং এরূপ অর্থ অন্য লোকের হাতে থাকিলে সেও ঐরূপ রাশীকৃত জঞ্জাল সৃষ্টিতে পরাঙ্মুখ হইত না, একথা জোর গলায় প্রচারিত হইল।

সংবাদ পত্র গদ্যে পদ্যে কবিকে আক্রমণ করিল। এমন দেখা গেল চতুর লোক মোসাহেবির পরিবর্ত্তে রবিবাবুর নিন্দা করিয়া ধনী লোকের নিকট হইতে প্রার্থিত বস্তু লাভ করিতেছে।—যে হতভাগ্য রবিবাবুর লেখার মধ্যে কোনো অর্থ দেখিতে পাইত তাহার আর নাকালের অন্ত থাকিত না।

বিজ্ঞেরা কবিকে সদুপদেশ দিলেন—বাপুহে এ সবের মধ্যে কেন?–দিব্য আরামে খাও দাও, ঘুমাও এবং জমিদারীর কাজ দেখ।–লক্ষ্মীর ক্রোড়ে যাহার স্থান হইয়াছে সরস্বতীর বীণা লইয়া খেলা করা তাহার পক্ষে শোভন নহে।

এ খুব বেশি দিনের কথা নহে, তবু এই অল্পদিনের মধ্যেই দেশে হঠাৎ সুদিন কেমন করিয়া আসিল তাহা বলা শক্ত। দুশ্চিন্তাগ্রস্ত বিনিদ্র দেশের মুখর সমালোচকগণ সহসা চুপ করিতে লাগিলেন এবং ক্রমে বিস্মিত নেত্রে কবির প্রতি চাহিয়া বিশ্বের স্তুতিবাদের প্রতিধ্বনি করিয়া বলিতে লাগিলেন—তাইত লেখাগুলি ত মন্দ নয়।

ইহার পরেই শুনা গেল,—লেখাগুলি তুলনহীন। রবিবাবুও রবীন্দ্রনাথরূপে নবীন পাঠকের চিত্ত অধিকার করিলেন। নূতন শিক্ষিত সম্প্রদায় তাঁহাকে শ্রেষ্ঠ কবি বলিয়া অভিনন্দিত করিলেন। পূর্ব্বে যাঁহারা বিদ্রূপ করিতেছিলেন তাঁহারা লজ্জিত হইলেন। ধর্ম্মপ্রাণ আর্য্য বলিয়া গর্ব্বিত থাকার দরুণ অনেক গীতাঞ্জলির ভিতরে প্রথমে কেবল নাস্তিকতাই দেখিতে পান। কিন্তু তাঁহাদের আর্য্য ভাব শিথিল হইবার সঙ্গে সঙ্গে কিছুই আর অসঙ্গত থাকিল না।

ইহার পর সকলে স্বীকার করিলেন যে বর্ত্তমান যুগ রবীন্দ্র যুগ। মাঝখানে দুর্ব্বোধ্যতা এবং মিস্‌টিসিজ্‌ম্ লইয়া খুব আন্দোলন হইয়াছিল এবং অনেকেই বলিতেছিলেন যে কবিতার অর্থ এরূপ সরল হওয়া উচিত যে দাশুরায়ের পাঁচালীর সঙ্গে তাহাকে যেন সব সময়েই তুলনা করা যায়, এবং মিস্‌টিসিজ্‌ম্ বলিয়া কোনো কথা যেন কবিতার সম্বন্ধে কখনো না উঠে।

অবশেষে অনেক বিতণ্ডার পর দেখা গেল যে মিস্‌টিসিজ্‌ম্ আমাদের দেশের সাধকেরই চিন্তার এক রীতি—উহা ফ্যারাডের বিদ্যুৎ প্রবাহ হইতে ধার করা নহে।

ত্রিশ চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার লেখার দ্বারা তিনি স্বদেশের শান্তি ভঙ্গ করিয়াছিলেন—আজ আবার তেমনি তাঁহার চিত্র প্রকাশ করিয়া দেশের ল' অ্যাণ্ড-অর্ডার ভঙ্গ করিতেছেন।

লোকে বলিতেছে আবার এ সবের মধ্যে কেন?—দিব্য আরামে খাও, দাও, ঘুমাও এবং কবিতা লেখ। সরস্বতীর ক্রোড়ে স্থান পাইলে বড় জোর চিত্রাঙ্গদার মত কাব্য রচনা করা যায়—চিত্রাঙ্কন করা যায় না।

বন্ধুগণ একবাক্যে বলিতে লাগিলেন, ভাই কবির উপরে আর ভক্তি রাখিতে পারিতেছি না,—তিনি ছবি আঁকা ধরিলেন কেন?

বলা গেল—এটা অদ্ভুত সন্দেহ নাই, তবে যাহাই হউক, চুপ করিয়া মানিয়া যাও।

প্রশ্ন হইল—এটা অন্যায় কথা, যে জিনিষ আনন্দ দেয় না তাহাকে মানিব কেন ?

উত্তর দেওয়া গেল—আর কিছুই না, ভবিষ্যৎ লজ্জার হাত হইতে বাঁচিবার জন্য।—রবীন্দ্র নাথের কবিতা কবিতা নয় বলিয়া যাহারা হাসিয়া উড়াইয়া দিয়াছিল, তাহারা আজ লজ্জা পাইতেছে।

—এটা অন্ধ ভক্তির কথা, আমরা অন্ধ হইতে পারিব না।

—নূতন করিয়া হইবার দরকার করে ন—আমরা ভক্তি করিবার জিনিষ মাত্রেই অন্ধভাবে ভক্তি করি। রবীন্দ্রনাথ যদি কবিতায় সত্যকার আনন্দ দিয়া থাকেন তবে তাঁহার চিত্রকে ভাল বাসিয়া গ্রহণ করিতে এত আপত্তি কেন ? আমরা যাহাকে ভালবাসি তাহার আনন্দের দান গ্রহণ করিতে উকিলের পরামর্শ লই না।

আইন্‌স্টাইন থিওরি-অব-রিলেরটিভিটি প্রচার করিয়াছেন, জগদীশচন্দ্র উদ্ভিদের বোধ শক্তির কথা প্রচার করিয়াছেন। আমারা সাধারণ লোক উহা কিছুই না বুঝিয়া শুধু শুনিয়াই মানিয়া লইয়াছি। মানিয়া লইয়াছি কেন ?

কারণ পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিকগণ মানিয়া লইয়াছেন। আমরা তাঁহাদের মানাকে অনুসরণ করিয়া মানিয়াছি। অথচ এই মানার মধ্যে লেশমাত্র কৃপা মিশ্রিত নাই।

কিন্তু রবীন্দ্র নাথের ছবি—

রবীন্দ্রনাথের ছবিও যে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ চিত্র সমালোচকগণ মানিয়া লইয়াছেন। আমরা তাঁহাদের মানিয়া লওয়াকে না হয় অনুসরণ করিলাম। আমাদের বাংলাদেশের শিল্পী যদি নূতন সৃষ্টির দ্বারা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সমঝ্‌দারদিগকে পুলকিত করিয়া থাকেন, তবে তাহাতে আমাদের ঈর্ষা করিবার হেতু দেখি না।

কিন্তু বৈজ্ঞানিকের যন্ত্র যে দেখা যায়, বুঝা যায়, অন্তত তাহা হইতে হাতে হাতে যে ফল পাওয়া যায়, তাহাকে ওজন করা যায়, তাহার মূল্যাবধারণ করা চলে।

সে কথা ঠিক। সাহিত্যে, শিল্পে হাতে হাতে কোনো ফল পাওয়া যায় না,—তাহার লক্ষ্যই যে আনন্দ দেওয়া। এই আনন্দ যন্ত্রে মাপিবার কোনো উপায় নাই, এবং নাই বলিয়াই শিল্প যে বিজ্ঞান নহে ইহা প্রমাণ করিতে বিস্তর বেগ পাইতে হয় না।

এক ভাবে দেখিতে গেলে সাহিত্য, শিল্পকে মাপিবার কোনো মানদণ্ড নাই বলিয়া বিশ্বের সমস্ত শিল্প সৃষ্টিকে কিছু-না বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া খুব সহজ।

ইহা যাচাই করিবার যে মাপকাঠি আছে তাহা কোনো দোকানে পাওয়া যায় না, পাওয়া যায় গুণীদের মনে। সাহিত্যের মূল্যপাত করিবার মানদণ্ড শ্রেষ্ঠ সাহিত্য সমালোচকগণ, শ্রেষ্ঠ সাহিত্য-রচনা হইতে আবিষ্কার করিয়াছেন। শিল্পের মানদণ্ড শ্রেষ্ঠ শিল্পসমালোচকগণ ঠিক ঐরূপেই শ্রেষ্ঠ শিল্পরচনা হইতে আবিষ্কার করিয়াছেন। আগে সৃষ্টি হইয়াছে—আদর্শ স্থির হইয়াছে পরে। কিন্তু এই আদর্শ চির-স্থির নহে। নব নব প্রতিভার কাছে চির-দিন আদর্শের পরিবর্ত্তন হইয়াছে।

রবীন্দ্রনাথের কবিতা এবং ছন্দ পূর্ব্বের আদর্শকে পরিবর্ত্তিত করিয়াছে, একথা চীৎকার করিয়া অস্বীকার করিতে করিতে শেষ পর্য্যন্ত চীৎকার থামাইয়া স্বীকার করিয়াছি। তাঁহার গীতি কবিতার অনুযোগ ছিল, তাহার স্পষ্ট কোনো অর্থ নাই। তারপর বহু গবেষণা করিয়া ইহা দেখা গেল,—আমাদের অনুভূতি এরূপ সূক্ষ্ম, এবং হৃদয়ের ইমোশান এরূপ প্রবল, এবং হাজার রকম অনুভূতি একই সঙ্গে প্রকাশ লাভের জন্য এরূপ ব্যাগ্র যে তাহাকে পাথী সব করে রবের মূর্ত্তিতে কিছুতেই প্রকাশ করা যায় না। তবু এই ব্যগ্রতাই যদি একটা রূপ পায়, তবে তাহাকেই আমারা কবিতা বলিয়া শেষ পর্য্যন্তও স্বীকার করিলাম।

এতদিন রেখা বা বর্ণশিল্পের দিকে আমরা তাকাই নাই, সুতরাং ওদিকেও যে গীতি চিত্র বলিয়া কোনো কিছুর সম্ভাবনা থাকিতে পারে তাঁহা মনেই আসে নাই। বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে অবনীন্দ্রনাথের প্রতিভা এই ক্ষেত্রের সন্ধান লাভ করে। তিনি আজ পর্য্যন্ত সমালোচনার হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইলেন না। লোকে বিকৃত ভঙ্গীতে দাঁড়াইয়া বলে

এটা অবনীন্দ্রনাথের ছবি। দেশের এমন বিমুখ এবং অজ্ঞতার অবস্থার মাঝখানে রবীন্দ্রনাথ আর এক নূতন টেক্‌নিক্‌ লইয়া আসরে নামিলেন। সুতরাং এবারে দাঁতের পরিবর্ত্তে নখ বাহির হইবার উপক্রম হইয়া উঠিয়াছে।

কোনো কিছুকে মানিব না বলিয়া বক্রভাবে দণ্ডায়মান হইলে উপায় নাই। সাহিত্য, শিল্প, নীতি, বিজ্ঞান ইহার কোনোটার আদর্শ ই চিরকালের জন্য বাঁধিয়া দেওয়া চলে না, সমস্তই পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। আবার যে আদর্শই যখন বলবৎ থাক, তখনকার মানিয়া লওয়া জিনিসগুলি সেই সব আদর্শের সঙ্গে পূর্ণরূপে মেলে না। সুতরাং কষিয়া সমালোচনা করিলে সব জিনিষকেই ভূমিসাৎ করিয়া দেওয়া যায়।

এ কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে যে-জিনিসটিকে আমরা মানিয়া লই, অর্থাৎ যাহাকে আমরা প্রশংসা করি, তাহাকে একমাত্র ভালবাসিয়াই করি এবং একমাত্র শ্রদ্ধা ভালবাসার অভাবেই কোনো জিনিসের মূল্য দিতে আমরা কৃপণতা করি। এই ভালবাসা বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত, এবং বিশ্বাস করিতে গেলেই সশ্রদ্ধ হওয়া আবশ্যক।

যদি প্রশ্ন উঠে বিচার না করিয়া কোনো কিছু মানিব কেন? সে ভাল কথা, কিন্তু এখানেও বিশ্বাস এবং শ্রদ্ধা না থাকিলে উপায় নাই। উদার ভাবে সত্যকে জানিবার আকাঙ্ক্ষা তাঁহাদের মধ্যে আছে কি, যাহারা রবীন্দ্র-শিল্প দেখিয়া চীৎকার করিয়াছেন?—কোন্ আদর্শের সঙ্গে মিলাইয়া বিচার করা হইয়াছে?—Creative art এর আদর্শ কি? কাব্য রচনার প্রচলিত কোন্ আদর্শ মানাতে রবীন্দ্রনাথের কবিতাকে আমরা কবিতা হিসাবে গ্রহণ করিয়াছি?

যদি এরূপ কোনো বিধি থাকে যে এতকাল ধরিয়া শিল্পীরা যে পথে চলিয়াছেন উহাই আদর্শ—তাহা হইলে প্রশ্ন উঠে, কোন্ দেশের শিল্পীকে আদর্শ ধরা যাইবে? ভারতবর্ষের শিল্পীকে? যদি ভারতের প্রাচীন শিল্পীই আদর্শ হয়, তাহা হইলে অবনীন্দ্রনাথকে লোকে বুঝিতেছে না কেন?—যদি বর্ত্তমানের কোনো শিল্পী হয় তবে সে কে?

য়ুরোপের শিল্পই যদি আদর্শ হয়, তবে সেখানকার কোন্ যুগের চিত্র শিল্প আদর্শ হওয়া উচিত?—এসব প্রশ্নের উত্তর নাই।

যদি কথা উঠে প্রকৃতির বহিরাবরণ নকল করাই শিল্পের আদর্শ, তাহার উত্তরে এই বলা যায় যে শব্দ-শিল্পে ইহার ব্যতিক্রম করিয়াই রবীন্দ্রনাথ শব্দ শিল্পী হিসাবে খ্যাত লইয়াছেন।

আসল কথা, আমাদের কেন যেন মনে হয় আর্ট সম্বন্ধে মতা ত প্রকাশ করিবার অধিকার আমাদের সকলেরই আছে। যেন ওদিকে সাধনা থাকিবার কোন্ দরকারই করে না। কিছুদিন আগে দেখিয়াছিলাম, এক হাতুড়ে ডাক্তার সমবেত অর্দ্ধশিক্ষিত রোগীদের কাছে রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে এমন সব কথা বলিতেছিল যাহা শুনিয়া চট করিয়া তাহারা বুঝিয়া গেল—রবীন্দ্রনাথের কবিতা ম্লেচ্ছ কবিতা। অথচ এই ডাক্তার কোনো দিন অণুবীক্ষণ যন্ত্র না বুঝিয়াও তাহার বিরুদ্ধে কোনো কথা বলিতে সাহস করে না। এই ঘটনাটিতে আমরা ইহাই বুঝি যে সাহিত্য এবং শিল্প সম্বন্ধে কোনো মতামত প্রকাশ করিতে কাহারো মনে কোনো দ্বিধা নাই।

আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে যে-য়ুরোপ প্রকৃতিকে নকল করিবার বিদ্যায় চূড়ান্তভাবে হাত পাকাইয়াছে, এবং যাহাদিগকে বারবার নকল করিবার চেষ্টা করিয়াও আজ পর্য্যন্ত আমরা কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারিলাম না, সেই য়ুরোপ তাহার কৌতূহলী মন লইয়া, তাহার নূতনকে গ্রহণ করিবার চিরন্তনী ক্ষমতা লইয়া রবীন্দ্র-শিল্পকে গ্রহণ করিয়াছে, আর আমরা সমস্ত পাঁজিপুঁথি চোখ বুঁজিয়া মানিবার বিদ্যায় পাকা হইয়াও উহাকে মানিতে পারিতেছি না।

সমস্ত জিনিষেরই দুইটি দিক আছে—একটি অস্তির দিক, অন্যটা নাস্তির দিক। যিনি কেবল মাত্র নাস্তির দিকটাই আবিষ্কার করিয়াছেন, আর যিনি কেবল মাত্র আস্তির দিকটাই দেখিতেছেন, উভয়ের মধ্যে হয়ত কোনো বিরোধ নাই। অতএব যাহার যেমন ইচ্ছা প্রাণ খুলিয়া চীৎকার করা যাক।

তবে ঐ একমাত্র আশঙ্কা—শেষ পর্য্যন্ত লজ্জায় পড়িতে না হয়।

কৃপাকণা—শ্রীসংজ্ঞা দেবী প্রণীত; মূল্য ছয় আনা।

শ্রীগুরুর কৃপায় তত্ত্বজ্ঞান লাভের জন্ম তীব্র আকাঙ্ক্ষা লেখিকাকে এই পুস্তকখানি রচনার প্রেরণা দিয়াছে। স্থানে স্থানে সরল প্রাণের কথাগুলি হৃদয়গ্রাহী।

"খেলা সারিবার খেলাটি খেলিতে
বড় যে বাসনা জাগিছে, মা, চিতে"

—কথাগুলি পড়িয়া লেখিকার আধ্যাত্মিক রস-পিপাসু মনের পরিচয় পাওয়া যায়। পুস্তকের প্রতিপাদ্য বিষয় গীতার সেই মহৎবাণী

"মামেকং শরণং ব্রজ"

তত্ত্বানুসন্ধিৎসু ব্যক্তিদের নিকট পুস্তকখানি আদরণীয় হইবে।

রহস্যধারা—শ্রীসৌরেশচন্দ্র চৌধুরী প্রণীত, ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস, ২২।১, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতায় প্রাপ্তব্য। মূল্য আট আনা।

বিভিন্ন মাসিক পত্রে প্রকাশিত এই প্রবন্ধগুলি পুস্তকাকারে প্রকাশ করার জন্য লেখক ধন্যবাদার্হ।

প্রথম ভাগ, দ্বিতীয় ভাগ, ধারাপাত, বোধোদয় ব্যাকরণ ইত্যাদি যে সব পুস্তকের সহিত বাঙালী বাল্যাবধি পরিচিত তাহারই মধ্যে যে এমন সরস রহস্যধারা বহমান ছিল তাহা জানিতাম না। বাল্যকালে পড়িবার সময় ঐ সমস্ত বইয়ের উৎকট শব্দের বানান মুখস্থ করা কারা যন্ত্রণার মতই মনে হইত। লেখক সেই সমস্ত শব্দগুলিকে প্রবন্ধের মধ্যে এমন সরস ভঙ্গিতে বিন্যস্ত করিয়াছেন যে পড়িয়া প্রচুর আনন্দের সঙ্গে সঙ্গে প্রচুর শিক্ষা লাভ হয়। প্রত্যেক যুবকের এই বইখানি পাঠ করা উচিত।

চন্দ্রশেখর ও বঙ্কিমচন্দ্র—লেখক, মৌলভী একরামুদ্দীন্। মূল্য ।৴ আনা।

চন্দ্রশেখর বি, এ, পরীক্ষার পাঠ্য নির্দ্দিষ্ট হওয়ার পর লেখক ছাত্রদের উপকারার্থে পুস্তকখানি রচনা করিয়াছেন। পরীক্ষার্থী ছাত্রগণ ছাড়া সাধারণ পাঠকও চন্দ্রশেখরের সহিত এই বইখানি পড়িলে বিশেষ উপকৃত হইবেন বলিয়া আমরা মনে করি। বঙ্কিমচন্দ্রকে ও তৎসহ তাঁহার সৃষ্ট চরিত্রগুলিকে বুঝিবার পক্ষে বইখানি যথেষ্ট সাহায্য করে।

—ধ্রুবতারা

১। **বিপ্লব ও বিভীষিকা**
২। **স্বদেশী ও বয়কট**
৩। **সাম্প্রদায়িক সমস্যার নির্দ্ধারণ**

বঙ্গীয় গভর্ণমেণ্টের প্রচার বিভাগ হইতে প্রকাশিত এই তিনখানি বই আমরা সমালোচনার জন্য পাইয়াছি। এ সম্বন্ধে যে যে বিষয়ের আলোচনা হওয়া উচিত সবই তাঁহারা পরিষ্কারভাবে বলিয়াছেন। যাঁহারা এ বিষয়ের বিশেষ তথ্য জানিতে চাহেন তাঁহারা বইগুলি পড়িয়া দেখিতে পারেন। নরহত্যা ও গুপ্ত আঘাতাদির দ্বারা জাতির গঠনকার্য্যে বিঘ্ন উৎপাদনের বুদ্ধি আদৌ কল্যাণকর নহে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস।

—বঃ সঃ

গ্রাহকগণের প্রতি নিবেদন

পরম মঙ্গলময় পরমেশ্বরের কৃপায় বঙ্গলক্ষ্মী আগামী অগ্রহায়ণ মাস হইতে ৮ম বর্ষে পদার্পণ করিবে। নূতন বৎসর হইতে যাহাতে বঙ্গলক্ষ্মীর প্রবন্ধ গৌরব ও সৌষ্ঠব বৃদ্ধি পায় তাহার জন্য আমরা পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা অধিকতর চেষ্টা করিতেছি। বর্ষ শেষে আমাদের গ্রাহকগণের নিকট নিবেদন এই যে, যাঁহারা এখন বঙ্গলক্ষ্মীর গ্রাহক আছেন, তাঁহারা আগামী বৎসরের জন্য ও গ্রাহক থাকিয়া নারীজাতীর উন্নতিকর কার্য্যে সাহায্য করিবেন। যাঁহাদের গত ১৩৩৮ সালের অগ্রহায়ণ মাসে প্রদত্ত বঙ্গলক্ষ্মীর বার্ষিক মূল্য বর্ত্ত-মান সংখ্যায় শেষ হইয়া গেল তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া তাঁহাদের দেয় বার্ষিক চাঁদা ৩৷০ আগামী ১০ই অগ্র-হায়ণের মধ্যে মনিঅর্ডার যোগে পাঠাইয়া বাধিত করিবেন। যাঁহাদের পক্ষে আগামী বর্ষে গ্রাহক থাকা সম্ভব হইবে না, অনুগ্রহপুর্ব্বক তাঁহারা ৩০শে কার্ত্তিকের মধ্যে নিষেধাজ্ঞা প্রেরণ করিবেন। মনিঅর্ডার যোগে টাকা অথবা নিষেধাজ্ঞা না পাইলে ১০ই অগ্রহায়ণের পর অগ্রহায়ণ সংখ্যা ভিঃপিঃ খরচ সহ বার্ষিক মোট ৩৸৶০ আনা চার্জ্জ করিয়া ভিঃ পিঃ প্রেরণ করিব। ভিঃপিঃতে মূল্য আদায় করিতে গেলে ৩৸৶০ লাগিবে। আর একটি বিষয় গ্রাহকগণকে স্মরণ করাইতেছি যে ডাকঘরের নুতন আইন অনুযায়ী ভিঃপিঃ প্যাকেট তিনদিনের অধিক পোষ্ঠাফিসে জমা রাখা হয় না; তিন দিনের মধ্যে ভিঃপিঃ গ্রহণ না করিলে উহা আমাদের নিকট ফেরৎ আসিবে। অনুগ্রহ পুর্ব্বক আমাদের গ্রাহক ও গ্রাহিকাগণ এইদিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিবেন, যাহাতে তাঁহাদের অবহেলা বশতঃ কোন ভিঃপিঃ ফেরৎ আসিয়া আমাদিগকে অযথা ক্ষতিগ্রস্থ হইতে না হয়।

বিনীত
কার্য্যাধ্যক্ষ
"বঙ্গলক্ষ্মী"

মধু চায় মধু

শ্রী নন্দগোপাল সেনগুপ্ত

'মধু চায়, মধু' মধুর কণ্ঠ, আমার দ্বারের কাছে—
বিষে ভরা এই গ্রীষ্ম দুপুর, মধু এর কোথা আছে ?
বাতাসের মুখে অগ্নি-কণিকা, উড়িছে ঘূর্ণী ধূলি,
গলিত পাচের বক্ষ দলিয়া ছুটিছে শকটগুলি ;
উদ্দাম বেগে জীবন চ'লেছে মরণের অভিসারে,
তারি চরণের তুমুল নিনাদ কানে লাগে বারে বারে।
ভরা দু'পহরে ঘরে শুয়ে আছি, বন্ধ করিয়া খিল্
বসি' চিলে ছাদে একটানা সুরে ফুকারে তৃষিত চিল্ ;
হাতে কাজ নাই, ঘুম নাহি আসে, ঝালাপালা
লাগে বড় ;
হঠাৎ দুয়ারে 'মধু চায়, মধু'—কণ্ঠ করুণতর !

মনে হ'ল, যেন ঐ ক্ষীণ স্বর আকাশের তীর হ'তে,
বরষার লিপি ব'য়ে নিয়ে এল' গ্রীষ্মের বায়ু স্রোতে !
দরজা খুলিয়া নীচে নেমে আসি, ভালো ক'রে
দেখি চেয়ে,
মধু-পসারিণী মোর দ্বারে এক রূপসী ইরাণী মেয়ে।
পৃষ্ঠে এলান' ফণীসম বেণী, ঢল ঢল দেহলতা—
রঙীন ঘাঘ্‌রা লুটায়ে দু'লায়ে যেন কহে কত কথা ;
বক্ষে ঢুলিছে তীক্ষ্ণ ছুরিকা রোদে জ্বলে ঝক্‌ঝকে,
তারি অনুরূপ দীপ্ত চাহনি দু'টি ঘন কালো চোখে।
খর রবি-করে রাঙা মুখ তার, মধুর পসরা শিরে,
স্বর্গের মধু এনেছে কি ব'য়ে এ বিষ বারিধি তীরে !

কেন্দ্র সমিতির কথা

রামকৃষ্ণ মিশন শিশুমঙ্গল প্রতিষ্ঠান

আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম যে মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুত মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়, সার হরিশঙ্কর পাল, ডাঃ শ্রীযুত বামনদাস মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুত রমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, স্বামী দয়ানন্দ প্রভৃতি পরহিতব্রতী ভদ্রমহোদয়গণের উদ্যোগে ১০৪ নং বকুলবাগান রোড, ভবানীপুরে উপরোক্ত প্রতিষ্ঠানটি স্থাপিত হইয়াছে।

বিজ্ঞান সম্মত ভাবে গর্ভিণীর তত্ত্বাবধান করা ও শিক্ষিতা ধাত্রী দ্বারা প্রসবকালীন সাহায্য ও সেবা করা এবং অন্ততঃ এক বৎসর পর্য্যন্ত নবজাত শিশুর পর্য্যবেক্ষণ করাই হইবে ঐ "শিশুমঙ্গল প্রতিষ্ঠান" টির কার্য্য। ইহার জন্য তাঁহাদিগকে বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়া গর্ভবতী মাতা ও শিশুদের খুঁজিয়া বাহির করিয়া বিজ্ঞান-সম্মত ভাবে সপ্তাহের পর সপ্তাহ তাঁহাদের পর্য্যবেক্ষণ, পরীক্ষা ও শিক্ষাদান করিতে হইবে। এদেশে এই প্রচেষ্টা সম্পূর্ণ নূতন। জাতি-বর্ণ-নির্ব্বিশেষে যতদূর সম্ভব বিনা খরচায় তাঁহারা সর্ব্বসাধারণের সেবা করিতে মনস্থ করিয়াছেন।

দেশে গর্ভিণী ও শিশুর অকাল মৃত্যুর হার দিন দিন বাড়িয়া চলিতেছে। ইহার কারণ যে আমাদের দেশের অজ্ঞতা ও অন্ধ কুসংস্কার তাহা অবিসংবাদিত সত্য। ইহার প্রতিকারার্থে এইরূপ প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা যে কিরূপ তাহা প্রত্যেক শিক্ষিত ব্যক্তিই অনুভব করেন। যাঁহারা এইরূপে জাতীয় মঙ্গলকার্য্যে হস্তপরিচালন করিতেছেন আমরা সেই ত্যাগব্রতী মহাজনদের সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গল কামনা করি ও এই কল্যাণকর প্রতিষ্ঠানটির উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি।

শোক-সংবাদ

আমরা গভীর দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে, কেন্দ্র-সমিতির পৃষ্ঠপোষক এবং কেন্দ্রসমিতির কার্য্যের প্রতি বিশেষ উৎসাহশীল শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ দে মহাশয় আর ইহলোকে নাই। গত ১২ই আশ্বিন বুধবার তিনি তাঁহার থিয়েটার রোডস্থ বাটীতে দেহত্যাগ করিয়াছেন। আমরা তাঁহার সংক্ষিপ্ত জীবনী অন্যত্র প্রকাশ করিলাম। আমরা তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের সহিত গভীর শোক ও সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

হিন্দু অবলা আশ্রম

হিন্দু অবলা আশ্রমের পরিচালকগণ আশ্রমের বালিকাদের নৈতিক উন্নতির মানসে সাপ্তাহিক নীতি-শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন। সরোজনলিনী দত্ত নারীমঙ্গল সমিতির প্রচারকগণ তাহার ভার গ্রহণ করিয়াছেন। গত সেপ্টেম্বর মাসে তাঁহারা তিনটী বক্তৃতা করিয়াছেন। প্রথম গত ২রা সেপ্টেম্বর পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কামাখ্যাচরণ শাস্ত্রী ম্যাজিক লণ্ঠন সাহায্যে "ধ্রুবচরিত্র" সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। তৎপর ৯ই সেপ্টেম্বর শ্রীযুক্ত ননীগোপাল গোস্বামী "শিশুমঙ্গল" সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন এবং তৃতীয় ২১শে সেপ্টেম্বর পণ্ডিত মহাশয় ও ননীবাবু শিক্ষা ও শিল্পকলা সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন।

ঢাকুরিয়া মহিলা সমিতি পরিদর্শন

গত ১৪ই সেপ্টেম্বর কেন্দ্র সমিতির সহযোগী সম্পাদিকা শ্রীযুক্তা নীরপ্রভা চক্রবর্ত্তী প্রচারকগণকে সঙ্গে করিয়া ঢাকুরিয়া মহিলা সমিতি পরিদর্শন করিতে যান। উক্ত সমিতির সভ্যা সংখ্যা খুব বেশী না হইলেও সভ্যাদের এবং সাহায্যকারী উৎসাহশীল কয়েটী যুবকের আগ্রহাতিশয্যে সমিতির কার্য্য দিন দিন উন্নতির পথেই অগ্রসর হইবে আশা করা যায়। তথায় কেন্দ্র সমিতির একজন শিক্ষয়িত্রী নিয়মিত শিল্প-শিক্ষা দিতেছেন। সভ্যারা চিকনের কাজ এবং সাধারণ শিক্ষাও কিছু কিছু লাভ করিতেছেন।

শালিখা মহিলা সমিতি

ষষ্ঠ বার্ষিক উৎসব

গত ২৪শে সেপ্টেম্বর শালিখা মহিলা সমিতির ষষ্ঠ বার্ষিক উৎসব সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। কেন্দ্র সমিতির পক্ষ হইতে শ্রীযুক্তা নীরপ্রভা চক্রবর্ত্তী, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কামাখ্যা-চরণ শাস্ত্রী ও শ্রীযুক্ত ননীগোপাল গোস্বামী উৎসবে যোগদান করেন। উদ্বোধন সঙ্গীতান্তে শ্রীযুক্তা নীরপ্রভা চক্রবর্ত্তী সভানেত্রীর আসন গ্রহণ করিলে সম্পাদিকা শ্রীমতী ভানুমতী দেবী ষষ্ঠ বার্ষিক কার্য্যবিবরণী পাঠ করেন। উক্ত সমিতির বাহিরের বিশেষ কোনও হৈ-চৈ না থাকিলেও কার্য্যোন্নতির দিকে সবিশেষ লক্ষ্য আছে। কার্য্যবিবরণী পাঠে বোঝা যায় যে, সমিতি দিন দিন উন্নতির পথেই অগ্রসর হইতেছে। শিল্প-কার্য্যের জন্য প্রয়োজনীয় বস্ত্রাদি কিনিতেই ৭২৮ টাকার বেশী ব্যয় হইয়াছে। শুধু শালিখা কেন, বিভিন্ন স্থানের বহু ভদ্রলোক ও ভদ্র মহিলা এই সমিতিকে সাহায্য করিয়াছেন।

ভারত শিউইং কর্ড

আমাদের সরোজনলিনী স্কুলের ছাত্রীগণ সকলেই ভারত ট্রেডিং কোম্পানীর "শিউইং কর্ড" ব্যবহার করিয়া বিশেষ পরিতুষ্ট হইয়াছেন। শেলাইএর কলে যে গুলি সূতা ব্যবহার হয় তাহা আমরা এতদিন বিদেশ হইতেই কিনিতাম। এখন এই সম্পূর্ণ দেশী কোম্পানীটি "ভারত শিউইং কর্ড" নামে যে গুলি সূতা বাহির করিয়াছেন, তাহা বিদেশী অপেক্ষা কোন অংশে নিকৃষ্ট নহে। সেলাইএর জন্য গুলি সূতা প্রচুর ব্যবহার হয়। বিদেশী সূতার পরিবর্ত্তে এই সম্পূর্ণ স্বদেশী সূতা ব্যবহার করিলে দেশের অর্থ তো বাঁচিবেই, দেশী কোম্পানীটিকে সাহায্য করিয়া আরও উন্নততর অন্যান্য সূতা প্রস্তুতেরও সুযোগ দেওয়া হইবে। এই সূতা বেশ শক্ত এবং সেলাইএর কলে স্বচ্ছন্দে চালিত হয়। সরোজনলিনী স্কুলের ছাত্রীগণ এখন এই সূতাই ব্যবহার করিতেছেন।

মহিলা সমিতির প্রতি নিবেদন

(১)

প্রতি বৎসর জানুয়ারী মাসে কেন্দ্র-সমিতির উৎসব সম্পর্কে বাংলাদেশের বিভিন্ন মহিলা সমিতির উৎপন্ন শিল্প দ্রব্যের একটী বিরাট প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান হইয়া থাকে। প্রতি বৎসরের স্থায় এবারেও সরোজনলিনী দত্ত নারীমঙ্গল সমিতির কর্ত্তৃপক্ষ আগামী জানুয়ারী মাসের ১৫ই তারিখ হইতে ঐইরূপ একটী প্রদর্শনীর উদ্বোধন করিবেন, স্থির করিয়াছেন। আপনাদের সাহায্য ও সহানুভূতি না পাইলে ঐ অনুষ্ঠান সাফল্যমণ্ডিত হওয়া অসম্ভব। সেই জন্তই এই অনুষ্ঠানসম্পর্কে কি করা প্রয়োজন তাহা নিবেদন করিবার জন্তই আপনাদিগকে এই পত্র দিতেছি। কেন্দ্র-সমিতির শিল্পবিদ্যা-মন্দিরে ঐ প্রদর্শনীর স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। সমিতিতে যে সকল শিল্পদ্রব্য উৎপন্ন করা হয় তাহা প্রদর্শনার্থ এবং বিক্রয়ের জন্ত আমাদের নিকট ৬০বি, মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীটে পাঠাইয়া দিবেন। প্রেরিত দ্রব্যের একটী তালিকা আপনারা রাখিবেন এবং একটী আমাদের নিকট পাঠাইয়া দিবেন। দ্রব্যগুলির প্রত্যেকটিতে নম্বর দিয়া দিবেন। যেগুলি বিক্রয় করিতে ইচ্ছা করেন, তাহার উপরে "বিক্রয়ার্থ" এই কথা লিখিয়া মূল্য নির্দ্দেশ করিয়া দিবেন এবং অপরগুলির উপরে "বিক্রয়ার্থ নহে" শুধু এই কথা লিখিবেন। তালিকাসহ দ্রব্যগুলি রেলওয়ে পার্শেলে ষ্ট্রীট ডেলিভারী (৬০বি মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট) দিবার কথা লিখিয়া এমন সময় পাঠাইবেন, যেন ৭ই জানুয়ারীর পূর্ব্বে আমাদের অফিসে পৌছে। বিক্রয়লব্ধ অর্থ এবং অবশিষ্ট দ্রব্যগুলি প্রদর্শনী শেষ হইয়া গেলে আপনাদিগকে ফিরাইয়া দেওয়া হইবে। আপনাদের সমিতি হইতে যে সকল প্রতিনিধি বার্ষিক উৎসবে উপস্থিত হইবেন, তাঁহারা প্রদর্শনী পরিচালনে আমাদিগকে সাহায্য করিলে বিশেষ উপকার হয়।

কোন সময়ের মধ্যে আপনাদের দ্রব্যাদি আমাদের নিকট পৌছিতে পারে, অনুগ্রহপূর্ব্বক যথাসম্ভব শীঘ্র তাহা জানাইয়া বাধিত করিবেন। কলিকাতার প্রদর্শনীতে নিম্ন-লিখিত দ্রব্যগুলিই বিশেষভাবে বিক্রয় হইয়া থাকে:—কাঁথা, সতরঞ্চ, টেবিল ক্লথ, মুগার কাজ করা টিপয় কাভার, উলের জামা, টুপী, মোজা, গলবন্ধ (কম্ফাটার), আলোয়ান প্রভৃতি; বিভিন্ন প্রকারের কাপড় ও পুঁতির ব্যাগ, ফুলের সাজি, ছেলেদের কাপড়, সতরঞ্চ, সতরঞ্চের আসন, গালিচার আসন, কাগজ বা মাটীর খেলনা, বাঁশী, সাবান, সেণ্ট, জ্যাম জেলি, আচার, মোরব্বা, বিভিন্ন প্রকারের চটের আসন, পাপোষ, মাছের আঁশের সাজি, এম্ব্রয়ডারী, নারিকেলের আঁশের বা চুলের ঘড়ির চেন্, কাপড়ের পাড়ের পর্দ্দা, বালিশের ঢাকনা, বিভিন্ন প্রকারের চিত্র, ঝিনুকের বোতাম, পেপার ওয়েট, কাঠের পুতুল, মাটীর এবং কাঠের ছাঁচ, নারিকেলের মালার বাটী, চায়ের পেয়ালা, ফুলদানী, ভাঙ্গা পাথরের সন্দেশের ছাঁচ, দড়ি বা শোনের সিকা, খেজুর এবং নারিকেলের পাতার টুপী, পাখা, ব্যাগ, কাগজের পাখা, বেতের ঝুড়ি, ঝাঁকা বাস্কেট, সাজি বিভিন্ন প্রকারের নারিকেলের খাবার (বোতলে পুরিয়া ছিপি আঁটা)।

কেন্দ্র সমিতির এই প্রদর্শনী সাফল্যমণ্ডিত করিবার বিষয়ে আপনাদের সাহায্য ও সহযোগিতা প্রার্থনা করিতেছি।

(২)

আগামী পৌষ মাসে সরোজনলিনী দত্ত নারীমঙ্গল সমিতি ৯ম বর্ষে পদার্পণ করিবে। আগামী বর্ষে উপযুক্ত-ভাবে ইহার কার্য্য পরিচালন করিবার জন্ত সমগ্র মহিলা সমিতির সভ্যাগণের মঙ্গলেচ্ছা প্রার্থনা করিতেছি। আশা করি, সভ্যাগণ সমিতির ভিতর দিয়া নারীজাতির মঙ্গল-কার্য্যসাধনে সাহায্য করিবেন। কেন্দ্র সমিতির কার্য্যের সফলতা মফঃস্বলের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মহিলা সমিতির উপর নির্ভর করে। নানাস্থানে ছোট ছোট মহিলা সমিতিসমূহের সমষ্টিগত কার্য্য কেন্দ্রীভূত হইয়া জাতিগঠনের সোপান নির্ম্মাণ করিতেছে। আশা করি, ক্রমে ক্রমে সমস্ত মহিলা সমিতি সুপরিচালিত, সুগঠিত এবং প্রকৃত উন্নতিমূলক কার্য্যের প্রতিষ্ঠানস্বরূপে পরিগণিত হইবে।

৮ম বৎসর পূর্ণ হওয়ার বিলম্ব না থাকায় অনতিবিলম্বে কেন্দ্র সমিতির বার্ষিক কার্য্যবিবরণী লিখিত হওয়া প্রয়োজন। তজ্জন্ত সমস্ত মহিলা সমিতির কার্য্যবিবরণী

আগামী ১৫ই অগ্রহায়ণের মধ্যে কেন্দ্র সমিতির কার্য্যালয়ে প্রেরণ করিতে হইবে। যে সকল মহিলা সমিতির এক বৎসর পূর্ণ হয় নাই, তাহাদিগকে যে কয়মাস স্থাপিত হইয়াছে, তাহারই কার্য্যবিবরণী প্রদান করিতে হইবে। কি কি বিষয়ে মহিলা সমিতির বিবরণী প্রদান করিতে হইবে, তাহার তালিকা নিম্নে প্রদান করা হইল:—(১) মহিলা সমিতি স্থাপনের ইতিহাস, (২) সমিতি স্থাপনের উদ্দেশ্য, (৩) সমিতির বর্ত্তমান সভ্যাসংখ্যা এবং বিশিষ্ট পরিচালিকাগণের নাম ও ঠিকানা, (৪) সমিতির দ্বারা জনসেবার কার্য্য, (৫) পরস্পর ভাবের আদান প্রদান ও মেলামেশার বিষয়ে চেষ্টা, (৬) মহিলাদের মধ্যে স্বাস্থ্যতত্ত্ব প্রচার, (৭) মাতৃমঙ্গল ও শিশুমঙ্গল কার্য্য, শিশু ও প্রসূতি পরিচর্য্যাগার স্থাপন, (৮) গৃহশিল্প-শিক্ষা:—(ক) গৃহশিল্প-শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা কিরূপ, (খ) কোন শিক্ষয়িত্রী আছেন কি না, (গ) কি কি বিষয়ে গৃহশিল্প শিক্ষা দেওয়া হয়, (ঘ) কতজন মহিলা কি কি প্রকার গৃহশিল্পের শিক্ষা করিয়াছেন, (ঙ) গৃহশিল্প শিক্ষা করিয়া কতজন মহিলা মাসিক কি পরিমাণ উপার্জ্জন করিতেছেন, (চ) আপন আপন গৃহের ব্যবহারোপযোগী যে সকল দ্রব্য সমিতির সভ্যারা প্রস্তুত করেন, তাহার মূল্য মাসিক কি পরিমাণ হইতে পারে, (ছ) প্রস্তুত দ্রব্যাদি বিক্রয়ের ব্যবস্থা কিরূপ আছে, (জ) কোন শিল্প প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান হইয়াছিল কিনা, হইয়া থাকিলে তাহার বিবরণ, (ঝ) নিম্নলিখিত শিল্প ও চারুকলার কোন্‌গুলি সমিতি প্রচলিত করিতে চেষ্টা করিতেছেন:—সেলাই, জামা, সেমিজ প্রভৃতি পোষাক-পরিচ্ছদের সেলাই ও কাট ছাঁট, রিপুকর্ম্ম, সূচি-শিল্প, চিকণের কাজ, লেস, আসন, কাঁথা, বেত ও বাঁশের কাজ, সুতা কাটা, বস্ত্র বয়ন, মণিপুরী তাঁতে তোয়ালে বোনা, পাটের ও শোনের দড়ি প্রস্তুত, নানা প্রকার মিঠাই ও সন্দেশ প্রস্তুত, মুড়ি ভাজা, বড়ি দেওয়া, লিখিবার কালী তৈয়ারী, সাবান প্রস্তুত, কাপড় ধোলাই ও ইস্ত্রি করিবার প্রণালী, রন্ধন, কাপড় ও কাগজের ফুল তোলা, তালের পাখা, পরিত্যক্ত দ্রব্যাদি হইতে নানাপ্রকার জিনিষ প্রস্তুত, সুপারী কাটা, পাপোষ, নানাপ্রকার উলের কাজ, রেশমের সুতা তৈয়ারী, কার্পেট প্রস্তুত, চিত্রাঙ্কন, আলিপনা, মাটির, কাপড়ের ও কাঠের গুঁড়া দ্বারা পুতুল ও খেলনা তৈয়ারী, সুতা ও কাপড়ে রং করা প্রভৃতি; (ঞ) দ্রব্যাদি প্রস্তুতের জন্য সমিতি হইতে জিনিষ সরবরাহ করা হয় কিনা? (৯) মহিলা সমিতির সভার অধিবেশনে কি কি বিষয়ে আলোচনা হয়, (১০) সমিতির স্থায়ী গৃহ আছে কিনা, (১১) সমিতির সভায় যাতায়াতের উপায়, (১২) সমিতি সম্বন্ধে সাধারণের সহানুভূতি কিরূপ, (১৩) যে সকল ভদ্রমহোদয় ও মহিলা সমিতিকে বিশেষ প্রকারে সাহায্য করিয়াছেন, তাঁহাদের নাম ও ঠিকানা, (১৪) কেন্দ্র সমিতি ১টি মহিলা সমিতিকে ৫০৲ টাকা, ১০টি সমিতিকে ২০৲ টাকা এবং ৫টি মহিলা সমিতিকে ১৫৲ টাকা করিয়া পুরস্কার দিবেন। উক্ত পুরস্কারের সমপরিমাণ টাকা কোন প্রকার উন্নতিমূলক কার্য্যে ব্যয় করিতে হইবে। কোন্ সমিতি এই পুরস্কার পাইলে কি ভাবে ব্যয় করিবেন? (১৫) সব্জীবাগনে এবং উদ্যান-রচনায় মহিলা সমিতির কার্য্য, (১৬) গো-পালন, কৃষি প্রভৃতি কার্য্যে সভ্যাগণের ব্যক্তিগত চেষ্টা এবং সমিতির সহায়তায় তাহার আলোচনা, (১৭) বয়স্কা মেয়েদের শিক্ষা বিধান বিষয়ে সমিতির কার্য্য, (১৮) পারিবারিক জীবনে অধিকতর নৈপুণ্যলাভের জন্য সমিতির সভ্যাগণের চেষ্টা, (১৯) বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ও তাহার পরিচালনে সাহায্য, (২০) পল্লীসংগঠনে মহিলা সমিতির কার্য্য, (২১) বিভিন্ন ধর্ম্ম ও জাতির মধ্যে একত্ব-প্রতিষ্ঠার জন্য সর্ব্বশ্রেণীর মহিলাগণকে সমিতিতে যোগদান করাইবার চেষ্টা, (২২) ধাত্রীবিদ্যা শিক্ষা, রোগীর সেবা, আকস্মিক বিপদে সাহায্যদান, টোটকা চিকিৎসা প্রভৃতি শিক্ষাদান বিষয়ে মহিলা সমিতির সভ্যাগণের সমবেত চেষ্টা, (২৩) স্থানীয় দুর্দ্দশাগ্রস্ত বিধবাদের জন্য সমিতির কর্ম্ম-প্রচেষ্টা, (২৪) সমিতির বিশেষ বিশেষ উল্লেখযোগ্য সংবাদ, (২৫) বার্ষিক আয়ব্যয়ের হিসাব।

বিনীতা
শ্রী হেমলতা দেবী
সম্পাদিকা,
সরোজনলিনী নারীমঙ্গল সমিতি

সিন্ধুতীরে

শ্রী—

বহু দিবসের বাঞ্ছিত তুমি
নয়ন-সমুখে এসেছ আজি,
তব অপরূপ রূপের কুসুমে
ভরে' উঠে মোর প্রাণের সাজি !
তোমার বিপুল সঙ্গীতে মোর
হৃদয়-তন্ত্রী উঠে রণিয়া
উত্তাল তব নৃত্যে আমার
নর্ত্তন করে মুগ্ধ-হিয়া !
কত কবিতার ঝঙ্কারে তুমি
মানব-চিত্তে বহালে সুধা,
হে অরূপ-রূপ-উৎস তোমায়
দেখিয়া মিটে না দেখার ক্ষুধা ;
ছন্দ বিহীন নৃত্য তোমার
নিষ্ঠুর, ক্রূর, বক্র হাসি,

উন্মাদ তব নর্ত্তন ওগো
জানিনে কেন যে দেখিতে আসি !
বিশাল তোমার বক্ষের 'পরে
স্তব্ধ-দৃষ্টি আত্মহারা—
সিন্ধু ! তোমার হিন্দোল গান
সৃষ্টির এক সৃষ্টি-ছাড়া !
নিলাম্বু, তব নীল বন্ধনে
বেঁধেছ যেথায় নীলাম্বরে
আমার দৃষ্টি-চক্র সেথায়
জানিনে কেন যে মূর্চ্ছি' পড়ে !
ঐখানে, ঐ নীল মায়া-লোকে
মনখানি মোর রাখিয়া দিয়া
তোমার চরণপান্তে সিন্ধু,
চলিলাম আজি বিদায় নিয়া ।—

অর্ঘ্যদান

শ্রী হেমলতা দেবী

হে সতি, তোমার প্রতি ভক্তি-উপহার
দিতেছি কৃতজ্ঞচিতে। আমা সবাকার
কল্যাণের লাগি' তুমি অসাধ্য সাধিলে ;
একান্ত স্নেহের ভরে যে নীড় বাঁধিলে,
তাহার আশ্রয়ে থাকি' মোরা চিরদিন
অর্জ্জিব আপন অন্ন,—ব্যর্থ, পরাধীন,'
পরাশ্রিত জীবনের গ্লানি বিসর্জ্জিব,
মানবের অধিকারে বাঁচিতে শিখিব।
ছিল মাতা, ছিল পিতা, ছিল বন্ধুচয়,
পারিল না দিতে কেহ এ হেন আশ্রয়।
তোমার আগ্রহ আর তোমার উদ্যোগ,
আনি' দিল আমাদের এ-মহা সুযোগ।
এ-তব পুণ্যের গাথা না হইবে শেষ,
রহিবে অক্ষয় কীর্ত্তি ব্যাপি' বঙ্গদেশ।

* বিদ্যাসাগর বাণীভবনের গৃহপ্রবেশ উপলক্ষে ছাত্রীগণ কর্ত্তৃক মাননীয়া লেডী বসুকে অর্ঘ্যদান।

স্থান পরিবর্ত্তন

গত ১লা অক্টোবর হইতে সরোজনলিনী নারী মঙ্গল সমিতির সমস্ত বিভাগ ৪৫ নং বেনিয়াটোলা লেন হইতে ৬০ বি, মির্জাপুর ষ্ট্রীটে উঠিয়া আসিয়াছে। সমিতির কর্ত্তৃপক্ষগণ বহুদিন হইতে ইহার সমস্ত বিভাগের উপযুক্ত স্থান সঙ্কুলানের জন্য সুপ্রশস্ত আবাসের অনুসন্ধান করিতেছিলেন। এখন নূতন বাড়ীতে বর্ত্তমান বাড়ীর অপেক্ষা তিনগুণ স্থান আছে। অতঃপর সমিতির ও ইহার শিল্প-শিক্ষালয় এবং বঙ্গলক্ষ্মী-সংক্রান্ত সমস্ত চিঠিপত্র, টাকাকড়ি ৬০ বি, মির্জাপুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা, এই ঠিকানায় পাঠাইয়া বাধিত করিবেন।

পুরী বসন্তকুমারী বিধবাশ্রমে স্মৃতিসভা

শ্রী আনন্দিতা দেবী

গত ৩ঠা আষাঢ় পুরী বসন্তকুমারী বিধবাশ্রমে স্বর্গীয়া বসন্তকুমারী দেবীর দ্বিতীয় বার্ষিক স্মৃতিসভার অধিবেশন হইয়াছিল। বিধবাশ্রমের চাতালটী এই উপলক্ষে পত্রপুষ্পে সুন্দররূপে সজ্জিত হইয়াছিল; এবং সম্মুখেই ৮ বসন্তকুমারী দেবীর একখানি আলেখ্য পুষ্পমাল্যে বিভূষিত হইয়া বিরাজিত ছিল। আশ্রমের এবং তৎসংলগ্ন বিদ্যালয়ের ছাত্রীবৃন্দ ও স্থানীয় ভদ্রজন ও মহিলাগণে চাতালটী পরিপূর্ণ হইয়া উহার সম্মুখেও চেয়ার দ্বারা বসিবার আয়োজন করিতে হইয়াছিল। মহিলারা অনেকে আশ্রম-গৃহের মধ্যেও আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। এইভাবে সকলের যোগদানে আশ্রমটী কতটা জনপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছে তাহার আভাস পাওয়া যায়। ওড়িয়া, বাঙ্গালী সকলেই এই সভায় সম্মিলিত হইয়াছিলেন। লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রাধাকমল মুখোপাধ্যায় মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। প্রথমে আশ্রমের বালিকাদের স্তব পাঠ হইয়া সভার কার্য্য আরম্ভ হয়। বালিকাদের এই স্তবপাঠটী বড়ই মর্ম্মস্পর্শী। অন্যদিনেও সন্ধ্যার সময় যে নিয়মিত স্তব গান হইয়া থাকে তাহা শুনিলে অভিভূত হইতে হয়। ইহার পর সম্পাদক শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রলাল মুখোপাধ্যায় আশ্রমের বিবরণ জানাইলেন। পরে আরও অনেকে স্বর্গীয়া বসন্তকুমারী দেবীর উদ্দেশে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করিয়া তাঁহার প্রতিষ্ঠিত আশ্রমের প্রয়োজনীয়তা জানাইয়া তাহাতে সবিশেষ সহানুভূতি প্রকাশ করেন। যাঁহার অক্লান্ত কর্ম্মনিষ্ঠায় সাধ্বী বসন্তকুমারী দেবীর সৎসঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত হইয়া ক্রমেই উন্নতি লাভ করিতেছে, সেই মহদাশয়া শ্রীযুক্তা হেমলতা দেবীকেও সকলেই ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিলেন। ইহার মধ্যে স্বামী কৃপানন্দ সরস্বতী মহাশয় উপস্থিত না থাকায় তাঁহার প্রবন্ধটী অন্যে পাঠ করিলেন। পরে সভাপতি শ্রীযুক্ত রাধাকমল মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের অভিভাষণ হইল। স্বর্গীয়া বসন্তকুমারী দেবীর পরিবারের বিশেষতঃ তাঁহার স্বামী প্রখ্যাতনামা বিচারপতি সার প্রতুল চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহোদয়ের সহিত তাঁহার পরিচয় থাকায় তিনি তাঁহাদের পারিবারিক জীবন এবং সুদূর পাঞ্জাবে ভিন্ন ভাষাভাষী ভিন্ন আচার ব্যবহারের জন সাধারণ সকলের মধ্যে তাঁহাদের প্রভাব এবং অন্তরঙ্গতার বিষয় জানাইলেন। তাঁহার বক্তৃতায় এ বিষয়ে সকলেই নূতন জ্ঞান লাভ করিলেন এবং ৮বসন্ত কুমারী দেবীর জীবন বুঝিবার পক্ষেও ইহা নূতন আলোক দান করিল: এইরূপ মহৎ পরিবেশের মধ্যে গঠিত হইয়াই যে তাঁহার জীবন বিকাশ ও পরিণতি লাভ করিয়া শেষে তাঁহাকে এই বিধবাশ্রমের পুণ্যকীর্ত্তি স্থাপনে সমর্থ করিয়াছিল ইহা জানিবার সুযোগ দিয়া তিনি সকলেরই কৃতজ্ঞতার পাত্র হইয়াছেন। ইহার পর রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত লোকনাথ মিত্র সভাপতি মহাশয়কে সর্ব্বসাধারণের পক্ষ হইতে ধন্যবাদ জানাইলেন। পরে শ্রীযুক্তা হেমলতা দেবী রচিত একটী গান আশ্রম সংলগ্ন বালিকাবিদ্যালয়ের ছাত্রীগণ কর্ত্তৃক গীত হইয়া সভাভঙ্গ হয়। সভার সমস্ত কার্য্যই যথাসময়ে (দুঃখের বিষয় পুরীধামে যাহা বড়ই দুর্লভ) এবং সুশৃঙ্খলার সহিত সম্পন্ন হয় এবং সমাগত সকলেই বিশেষভাবে শ্রীযুক্তা হেমলতা দেবী মহোদয়ার অভ্যর্থনা লাভ করিয়াছিলেন। সামাজিকতার অনুষ্ঠানে পানের আয়োজনেরও ত্রুটি হয় নাই।

এই আশ্রম ও বিদ্যালয়ের কার্য্যের বিষয় অন্য অনেক স্থলেই প্রকাশিত হইয়াছে ও হইতেছে জন্য সে বিষয়ে এখানে আর কিছু বলা হইল না। ইহাই মাত্র বলা যায়, এই আশ্রম ও বিদ্যালয় ক্রমেই পুরীর একটী গৌরবের বস্তু হইয়া উঠিতেছে।

কালো মেয়ে

শ্রীনিশিকান্ত রায় চৌধুরী

তুলনা ছুলিয়ে পুঞ্জিত ভাব-প্রবণতায়
নব-বর্ষার ঘন শ্যামল মেঘের সঙ্গে,
তরল প্রাণের আবেগ ভাসিয়ে
যমুনা নদীর কাজল-ধারায়,
কল্পনায় মোহমুগ্ধ রূপের রচনা কোরে—
কোরে পরাজিত অপরাজিতার উজ্জল সৌন্দর্য্য,—
আমি তোমার কালো রূপের জয়-গান
গাইতে পারবো না- ওগো, কালো মেয়ে।

তুমিতো আমাকে চেনো।
আমি অতিরঞ্জিত চিত্রের
চিত্রকর নই,
নই আমি রূপ স্রষ্টা ভাস্কর,
আমি কবি।

যে সঙ্গমে মিশেছে এক সঙ্গে
আলোকের অগাধ পাথারে
অন্ধকারের অতল-গভীর,
যে মধু মাসের মধু লোভে এলো
রঙীন প্রজাপতি, কালো ভ্রমর ;
যে পথে থাকে চেয়ে
রাজ পুত্রের রথের দিকে তারা দুটি বোন—
'সুরূপা, মলিনা ;
যেখানে কোনো দ্বন্দ্ব নেই
মণিমালায়, মুকুল মালায়,—
নেই প্রভেদ ধনীতে নির্ধনে,
স্বর্গের দেবীতে আর মর্ত্ত্যের মানবীতে ;
যেখানে সুখের গলা জড়িয়ে থাকে দুঃখ,
—হয় মিলনের রাখিবন্ধন
জীবনের [illegible] অনুভূতির উপলব্ধিতে,
[illegible]

ওগো কালো মেয়ে,
এসো তুমি।
বলো তোমার বনের কথা।
পূর্ণিমার বাসরে
যে মেয়েটি আমায় বেসে ছিল ভালো,
অমাবস্যার অভিসারে—তারই সুর
ভেসে আসুক তোমার সঙ্গে ;
গান ধরো তোমার,
তারই তালে তালে মুখরিত হোক
আমার বাঁশির প্রাণ।

Printed by A. C. Sirkar at the Classic Press, 9-3 R[illegible] Majumdar Street Calcutta.
and published by him, at 4[illegible]ne, Calcutta.

ফেলুনা থাকিতে আর আপনি কষ্ট ভোগ করেন কেন?

প্রত্যেক নারীর জীবনেই সঙ্কটময় সময় আসে। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ, যখন রক্ত শরীরের উপযুক্ত পুষ্টিসাধন করে না, যখন দেহযন্ত্র সমভাবে কার্য্য করে না, যখন স্নায়ুমণ্ডলী দুর্ব্বল হইয়া পড়ে এবং উত্তমরূপে হজম হয় না, তখন দেখা যায় যে, মহিলাগণ পীড়িত না হইলেও কখনও সুস্থ বলিয়া বোধ করেন না এবং সর্ব্বদাই অসুস্থ বলিয়া মনে করেন। **ফেলুনা** ব্যবহারে এই সমস্ত অনাবশ্যক পীড়ার অবসান হয়। **ফেলুনা** এই সমস্ত স্ত্রী-সুলভ রোগ আরোগ্য করিবার জন্য বিশেষভাবে প্রস্তুত।

"নারীজাতি কষ্টভোগ করিবে" এই বদ্ধমূল ধারণা ভুল বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে এবং তাহা **ফেলুনা** আবিষ্কারক ডাক্তারগণ কর্ত্তৃকই ভুল বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। এই সমস্ত ডাক্তারগণ বলেন যে, যান্ত্রিক কার্য্য সম্বন্ধীয় গোলমাল এতই যন্ত্রণাদায়ক ও পীড়াদায়ক যে, মাথাধরা গা-হাত কামড়ানি, দুর্ব্বলতা এবং অবসাদ, স্ত্রীলোকের আভ্যন্তরিক ইন্দ্রিয়াদি পরিষ্কার রাখিতে ও পুষ্টীসাধন করিতে এবং আবশ্যকীয় প্রধান প্রধান জিনিষের অভাব বশতঃই হইয়া থাকে। **ফেলুনা** স্ত্রীলোকের বিশেষ বিশেষ ইন্দ্রিয়ের উপর সরাসরিভাবে কার্য্য করে এবং ঐ সমস্ত ইন্দ্রিয়গণকে পরিষ্কার করিয়া উহাদের পুষ্টিসাধন করে, উহাদিগকে সবল করে এবং রোগমুক্ত করে।

অন্যান্য ঔষধ ব্যবহারে যদি আপনার কোনরূপ স্বাস্থ্যের উন্নতি না হইয়া থাকে, আমরা আপনাকে **ফেলুনা** ব্যবহার করিতে অনুরোধ করি। **ফেলুনা** উত্তেজক ঔষধ নহে যে, ইহাতে সাময়িকভাবে উপকার হইবে, ইহা ব্যবহারে আপনি চির জীবন সুখে থাকিবেন।

ফেলুনায় কোনরূপ জান্তব চর্ব্বি নাই এবং প্রস্তুতকাল হইতে হস্ত স্পৃষ্ট নহে।
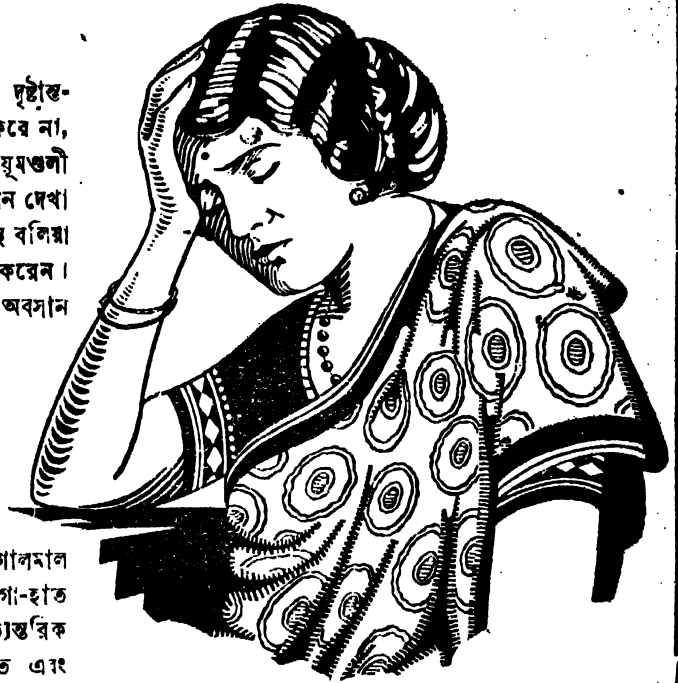
নিম্নলিখিত রোগে **ফেলুনা** ব্যবহার করিয়া বিশেষ ফল পাওয়া গিয়াছে:—

কোষ্ঠকাঠিন্য, রোষপ্রবণতা, অম্ল,
অনিদ্রা, শ্বেতপ্রদর, দৌর্ব্বল্য
অনিয়মিত ঋতু, বন্ধ্যাত্ব, রক্তস্বল্পতা,
অজীর্ণ, শিরোঘূর্ণন, অবসাদ
মূর্চ্ছা, দুর্ব্বলতা, প্রসবের পরে,
মাথাব্যথা, বুকজ্বালা বুক ধড়ফড়ানি,
প্রসবের পর পেট ফাঁপা, ক্লান্তি,
দৌর্ব্বল্য বদহজম, ইত্যাদি ইত্যাদি

Feluna

ফেলুনা গ্রহণ করিলে স্বাভাবিক ঋতুর কোনও গোলমাল হয় না। বরং সহস্র নারী মাসের পর মাস যে অস্বাভাবিক যন্ত্রণাভোগ করে তাহা নিবারিত হয়।

ফেলুনা লাল প্যাকেটে করিয়া বিক্রয় হয়।

ফেলুনা ভারতবর্ষ, বর্ম্মা, এবং সিংহলের বড় বড় ঔষধের দোকানে এবং ডাক্তারখানায় পাওয়া যায়। এক শিশি ২।০। ভিঃ পিতে পাঠানো হয়।

পোষ্ট বক্স নং ৭৬০, বোম্বাই।